মৃত ডাক্তার ভগবান্‌চন্দ্র রুদ্র এম, এ, এম্, ডি।

আমার বড় দুর্ভাগ্য। ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগির্ মহাশয়ের মৃত্যুর পর যাঁহাকে সম্বল করিয়া সম্মিলনীব্রত প্রতিপালন করিতেছিলাম, বর্ষান্তে কালের কুটিলস্রোতে আজ্ সে রত্নটী আবার ভাসিয়া গেল। বিগত বর্ষে প্রায় এমন দিনে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের চিকিৎসা-সম্মিলনীতে অন্যতর সম্পাদক খাস্তগির্ মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করিয়াছি; আজ আবার তদীয় পদস্থ ডাক্তার রুদ্রের নিধনবার্ত্তা নিবেদন করিতে হইতেছে। অকূলে যাহাকে অবলম্বন করিয়াছিলাম, অকালে সে কাল-কবলিত হইল, কূলপ্লাবী জল-কল্লোলে মিশিয়া কোথায় চলিয়া গেল! আমি আবার দিশাহারা, আশ্রয়-হারা, দৃষ্টিহারা, সাহসহারা, সহায়হারা হইয়া অকূলপাথারে ভাসিতেছি; ভাবিতেছি কূলকিনারা কি আর পাইব না, অবলম্বন কি আবার জুটিবে না?

কিন্তু সে ভাবনা এখন থাক্। আমার নিজের ভাবনা, আমার সম্মিলনীর জন্য ভাবনা এখন মাথার উপর থাকুক। যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, সহস্র বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়াও প্রাণান্তপণে তাহা সাধন করিব। সেজন্য তত ভাবি না, যাঁহার মরণবার্ত্তা আমি প্রচার করিতেছি, তাঁহার জন্য আমি একা ভাবিতেছি না, একা কাঁদিতেছি না; ডাক্তার রুদ্রের অকালমরণে সহরময় শোকের ছায়া পড়িয়াছে, অনেকের অন্তরেই দারুণ আঘাত লাগিয়াছে। সেই ফুল্লশতদলতুল্য অমূল্য মুখমণ্ডলে নিয়ত-বিরাজিত মৃদুহাসির স্নিগ্ধরশ্মি যে কখনও দেখিয়াছে, ইহ জনমে সে আর তাহা ভুলিতে পারিবে না; আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের ত কথাই নাই। যাহা গিয়াছে, তাহা দুর্লভ। যাহা গিয়াছে, তাহা কেবল আমার যায় নাই। এমন দুর্লভ রত্ন সংসারে সচরাচর মিলে না।

ডাক্তার রুদ্র, রূপে কার্ত্তিক, গুণে মহাত্মা ছিলেন। একাধারে রূপ-গুণের এমন সুন্দর সমাবেশ সংসারে অতিঅল্পই দেখিতে পাই। ভগবান্‌-চন্দ্রের চিরকৌমুদীময় মুখমণ্ডলে যে প্রসন্নতা, হৃদয় খুলিয়া দেখিলে সেখানেও তাই দেখিতে পাওয়া যাইত। যে বর্ণসৌন্দর্য্যে তাঁহার বাহ্যদেহ শোভমান ছিল, অন্তরেও সেই সৌন্দর্য্য নিরীক্ষিত হইত। বিদ্যায় তিনি পরম পণ্ডিত, চিকিৎসাশাস্ত্রে মেডিক্যালকলেজে এম্, ডি, আচরণে শিষ্ট, শান্ত, বিনয়ী ও মিষ্টভাষী ছিলেন। আর তাঁহার হৃদয় দয়ার ভাণ্ডার, অমৃতের প্রস্রবণ

ছিল। ছোটবড় সকলকেই সযত্নে চিকিৎসা করিতেন, বাঁ হাতে রোগীর নাড়ী টিপিয়া ভিজিটের জন্য ডান হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া কাজ সারিয়া আসিতেন না। অসমর্থদিগকে তিনি অর্দ্ধভিজিটে দেখিতেন, স্কুলের বালকদিগের নিকট হইতে ভিজিট লইতেন না, গৃহাগত দরিদ্রদিগকেও অবহেলা করিতেন না। এই সকল মহদ্‌গুণে এবং তাঁহার চিকিৎসানৈপুণ্যে এত অল্প বয়সে সহরে তাঁহার পসার এত শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু ভগবানের ভাগ্যে এ সুখসম্ভোগ অধিকদিন ঘটিল না। সবে ৩৮ বৎসর ২ দিন বয়সে, যৌবনের পূর্ণ অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দুরন্তকাল তাঁহাকে কবলিত করিয়া ফেলিল। বাঙ্গালীর যৌবনের উপর প্রায়শঃ কালের এরূপ ভ্রূকুটী-ভঙ্গী আর সহ্য হয় না!!

প্রথমেই বলিলাম যে, ডাক্তার রুদ্র অতি অল্পবয়সে জীবনলীলা সাঙ্গ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার অসম্পূর্ণ জীবনের জীবনী আর কি লিখিব? সে জীবনীতে ঘটনাবলীর বাহুল্য নাই, লিখিবার অধিক কোন কথাও নাই। বাল্যকালে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া, যৌবনে জয়লাভ করিয়া সংসারক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সংসারত্যাগ করিয়া গেলেন। সংসার লইয়াই মনুষ্যের জীবন। সে সংসারভোগ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। সুতরাং জীবনী আর লিখিব কি? তবে যেরূপে তিনি সংসারে প্রবেশ করেন এবং প্রবেশ করিতে না করিতে যেরূপে চকিতমধ্যে অতুল যশঃখ্যাতি লাভ করেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিম্নে যৎকিঞ্চিৎ বিবৃত করিব।

ডাক্তার ভগবান্‌চন্দ্র জেলা হুগলী, শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী মাহেশ গ্রামে প্রসিদ্ধ রুদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম নন্দকুমার রুদ্র। নন্দকুমার একজন অতিশয় সদাশয়, অমায়িক এবং যারপর নাই পরোপকারী লোক ছিলেন। তিনি নিজে ধনীসন্তান হইলেও কেবল পৈতৃক ধনসম্পত্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া কলিকাতাস্থ কোন সাহেব কোম্পানির একজন প্রধান কর্ম্মচারীরপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। একদিকে প্রচুর পৈতৃকসম্পত্তি এবং অপরদিকে চাকুরীরদ্বারা প্রভূত ধন-উপার্জ্জন; এই উভয় কারণে তাঁহার দানশক্তি দিন দিন এত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে, দেশস্থ যে কোন গরিব দুঃখীর দুঃখমোচনের জন্য

তিনি সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত থাকিতেন, ফলতঃ স্থানীয় লোকে অদ্যাপিও তাঁহাকে একজন প্রসিদ্ধ দাতা বলিয়া শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকেন।

নন্দকুমারের পাঁচটী পুত্র। তন্মধ্যে ১ম ঈশ্বরচন্দ্র, ২য় মৃত গিরীশচন্দ্র, ৩য় সুরেশচন্দ্র, ৪র্থ মৃত ভগবান্‌চন্দ্র এবং ৫ম অর্থাৎ সর্ব্ব কনিষ্ঠ মধুসূদন রুদ্র। পিতার মৃত্যুর সময় ভগবানের বয়ঃক্রম দুইবৎসরমাত্র। কিন্তু তথাপি অভিভাবকের গুণে ইহাঁর লেখাপড়া শিক্ষার কোনও ব্যাঘাত ঘটে নাই। ভগবান্‌চন্দ্র প্রথমে স্বীয় গ্রামে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও তাহাতে বৃত্তিলাভ করিয়া কলিকাতায় হিন্দুস্কুলে আসিয়া ইংরেজী পড়িতে আরম্ভ করেন এবং এখান হইতে অতি সুখ্যাতির সহিত ১ম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সীকালেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। অনন্তর দুইবৎসর পরেই এল, এ, পরীক্ষায় ১ম, বিভাগে উত্তীর্ণ হন, তারপর বিএর ১ম বর্ষও এখানেই পড়েন, কিন্তু এই সময় সহসা ভগবানের মেডিক্যাল-কালেজে পড়িয়া ডাক্তারী শিখিবার বড়ই ইচ্ছা জন্মে, কেননা ইহাঁদের কয়টী ভাইয়ের বাল্যাবস্থাতে সর্ব্বদা অসুখাদি হওয়াতে প্রায় অনেক সময়েই ডাক্তার আনার প্রয়োজন হইত, অথচ আবশ্যকমত ডাক্তার না আসাতে তজ্জন্য বিশেষ কষ্টভোগও করিতে হইত। এজন্য ভগবানের মাতার নিতান্তই ইচ্ছা হয় যে, আমার কয়টী ছেলের মধ্যে একটী ডাক্তারী পড়ে। মাতৃ-আজ্ঞা বিশেষতঃ আরও ২।৪টী ঘটনাতে ভগবানের হৃদয় বস্তুতই ডাক্তারী শিক্ষার জন্য যারপর নাই লালায়িত হইয়া উঠে। তখন তিনি প্রেসিডেন্সীর প্রধান অধ্যাপক সট্‌ক্লিপ সাহেবকে নিজের অভিপ্রায় জানান। ফলতঃ ভগ-বানের ন্যায় একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন সুযোগ্য ছাত্রকে সহসা ছাড়িয়া দিতে সাহেব রাজী হইলেন না। কিন্তু ভগবানের নিতান্ত পীড়াপীড়িতে অগত্যা সাহেব বলেন যে, যদি নিতান্তই তোমার মেডিক্যাল কালেজে পড়িতে ইচ্ছা হয়, তবে যাও, কিন্তু তোমাকে বি, এ, পরীক্ষা এখান হইতেই দিতে হই-বেক এবং এই কালেজে তোমার নামও বরাবর থাকিবে। ভগবান্‌ও গুরুবাক্য লঙ্ঘন অবিধেয় মনে করিয়া সাহেবের প্রস্তাবেই সম্মত হইয়া মেডিক্যাল্ কালেজে ভর্ত্তি হইলেন।

মেডিক্যাল্ কালেজে ভর্ত্তি হওয়ার পর সেই বর্ষেই ভগবানের অধ্যবসায় ও বুদ্ধিমত্তার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। যেহেতু বৎসরান্তে একই সময়

তিনি প্রেসিডেন্সীতে বিএ পরীক্ষা দিয়া ৪০ চল্লিশটাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন, এদিকে মেডিক্যাল্কালেজের ১ম বার্ষিক পরীক্ষাতেও অতি উৎকৃষ্টরূপে উত্তীর্ণ এবং তাহাতেও একটী বৃত্তিলাভ করেন। যাহাহউক, ইহার পর-বর্ষেই আবার ভগবান্ ফিজিক্যালসায়েন্সে এম্, এ, পরীক্ষা দিয়া অনর পাশ হন্। অনন্তর মেডিক্যালকালেজের প্রতি বাৎসরিক পরীক্ষাতেই অতি যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ এবং বরাবরই বৃত্তিলাভ করিয়া অবশেষে শেষ অর্থাৎ ৫ম বার্ষিক পরীক্ষায় অতি সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া অত্যল্প-দিনের মধ্যেই আবার অনর এম, বি, পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন এবং ইহার দুইবৎসর পরেই এম ডি পরীক্ষায় অতি প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি তাঁহার নিজের ও মেডিক্যাল কালেজের প্রভূত গৌরববৃদ্ধি করেন। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, এম্ডি, পরীক্ষা দেওয়ার পূর্ব্বে তিনি প্রতিনিয়ত উক্ত কলেজে থাকিয়া এতদূর পরিশ্রম করিয়া পড়িতেন যে, কলেজের সাহেব অধ্যক্ষেরা তাঁহার সেই পরিশ্রম দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতেন। ধাত্রী-বিদ্যাতেও ইহাঁর অসাধারণ শক্তি জন্মিয়াছিল। এস্থলে এই ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার একটী পরিচয় দিই—একদিন একটী প্রসূতির প্রসবকালে উদরস্থ সন্তানের প্রথমে দক্ষিণ হস্ত বাহির হয়। তখন অধ্যক্ষ চার্লস্ সাহেব সেখানে উপস্থিত না থাকায় অন্যান্য সমস্ত সাহেবই এই প্রসবকার্য্য সম্পা-দনের জন্য ভয়ানক ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠেন, কেননা তখন সেই অবস্থায় আর ১০।১৫ মিনিট থাকিলেই প্রসূতি ও সন্তান উভয়েরই জীবন নষ্ট হইবার সম্ভব। অথচ কোন সাহেবই সাহসপূর্ব্বক এই গুরুতর কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে পারিতেছেন না, তখন ভগবানই সাহসে দৃঢ়নির্ভর করিয়া বলেন যে, যদি আপনারা অনুমতি করেন ত' আমিই এবিষয়ে চেষ্টা করি। অনন্তর সাহেবেরা অনুমতি করিলে ভগবান্ তৎক্ষণাৎ আশ্চর্য্যরূপে সেই হস্ত প্রসূ-তির উদরের মধ্যে যথাস্থানে প্রবেশ করাইয়া তৎক্ষণাৎ নির্ব্বিঘ্নে প্রসব করান। অনন্তর প্রায় ২ ঘণ্টা পরে অধ্যক্ষ চার্লস্ আসিয়া এবং এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে গদগদ হইয়া ভগবানকে শতমুখে সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন।

মেডিকেলকলেজে উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই ভগবান্ ১ম দুই বৎসর উক্ত কলেজেই হাউস্ফিজিসনের কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। তারপর মাদ্রাজফেমিনে

গিয়া দুই বৎসর থাকেন এবং সেখান হইতে পুনর্ব্বার কলিকাতা পৌঁছিয়া আবার অনতিবিলম্বেই উদয়পুরের রাণার রেসিডেণ্টসার্জ্জন হইয়া সেখানে প্রায় দেড়বৎসর অতিবাহিত করেন। বলা বাহুল্য যে, একার্য্য বাঙ্গালীর মধ্যে আর কেহ কখন করেন নাই। অনন্তর উদয়পুর হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে গবর্ণমেণ্ট ভগবানকে পোর্টব্লেয়ারে যাইতে কহেন, কিন্তু আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া এতদূরদেশে যাওয়া তাঁহার বিশেষতঃ অভিভাবকগণের মত না হওয়ায় তাহাতে বিরত হন্ এবং চাকুরীতে ইস্তফা দেন। অনন্তর এই কলিকাতায় থাকিয়াই স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। নিজের যোগ্যতা ও ভাগ্যসুপ্রসন্ন থাকিলে যে মনুষ্যমাত্রেই সকল কার্য্যেই সফলকাম হইতে পারে, ভগবানের অত্যল্প কলের মধ্যে চিকিৎসাকার্য্যে এত অধিক সফলতাই তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। নচেৎ এই কলিকাতার সহরে এত সমস্ত বিজ্ঞ বিচক্ষণ প্রাচীন ও বহুদর্শী ডাক্তার থাকিতে ভগবানের ন্যায় অল্পবয়স্ক ব্যক্তির এত অল্প দিনের মধ্যে এত অধিক পশার প্রতিপত্তির ত' কোনমতেই আশা করা যাইতে পারিত না। যাহা হউক, এত পশার প্রতিপত্তি, এমন মানসম্ভ্রম, ফলকথা একাধারে লক্ষ্মীসরস্বতীর এবং রূপগুণের এমন আশ্চর্য্য সমাবেশ থাকিলেও তাঁহার ভাগ্যে কিন্তু একদিনের জন্যও প্রকৃত সুখভোগ ঘটে নাই। পাঠ্যাবস্থায় প্রভূত পরিশ্রম জন্য দারুণ কষ্টভোগ, চাকুরী অবস্থায় প্রবাসজন্য আন্তরিক অশান্তি এবং স্বাধীনভাবে চিকিৎসার সময় দুরন্ত বহুমূত্র রোগে দুঃখভোগ করিয়া, প্রকৃত সুখশান্তির মুখ তিনি একদিনও দেখিতে পান নাই। তথাপি কিন্তু ভগবানের কৃপায় ভগবানের মুখে অশান্তির চিহ্ন কেহ কখনও দেখে নাই। অন্তরের দুঃখ অন্তরে চাপিয়া আপনার অদৃষ্টে আপনার অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে, অকাতরে নিজের ও সংসারের কর্ত্তব্য পালন করিতেন। কর্ত্তব্যে তাঁহার দৃঢ় নিষ্ঠা ছিল, স্বার্থের দায়ে কর্ত্তব্য বিসর্জ্জন করিতেন না। রোগীর আরোগ্যলাভেই তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা ছিল। পৃথিবীতে উহা ভিন্ন আর ভাল চিকিৎসাপ্রণালী নাই, অধিকাংশ চিকিৎসকের মত, এদুর্ম্মতি তাঁহার ছিল না। কোনমতেরই গোঁড়া তিনি ছিলেন না। কবিরাজী বা হোমিওপ্যাথিমতে কোন রোগীর সমধিক উপকার লাভের সম্ভাবনা বুঝিলে এবং রোগী স্বয়ং বা তাঁহার আত্মীয়েরা ইচ্ছা

করিলে তিনি হাসিতে হাসিতে তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মতি প্রদান করিতেন।

ভগবানের দেহে, বহুমূত্ররোগের সঞ্চার অনেকদিন হইতেই হইয়াছিল। শেষ পৃষ্ঠব্রণে আক্রান্ত হইয়া গত ১৪ই শ্রাবণ শনিবার বেলা ৪ টার সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর প্রায় একবৎসর পুর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়। একটি কন্যা ও দুইটি শিশু পুত্রকে রাখিয়া, সংসার কাঁদাইয়া ভগবান্চন্দ্র অসময়ে সংসারলীলা সম্বরণ করিয়া গিয়াছেন।

চিকিৎসা-সম্মিলনী

৪র্থ খণ্ড।]   বৈশাখ. ১২৯৪ সাল।

গত বর্ষ।

বিজ্ঞান-বিতৃষ্ণ বাঙ্গালা দেশে রঙ্গরহস্যপ্রিয় এ হেন বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের মধ্যে চিকিৎসাবিষয়ক বিশেষতঃ অধিকাংশ কবিরাজী চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় একখানি মাসিক পত্রিকা তিন বৎসর অতিক্রম করিয়া আজ চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিল, একথা ভাবিতে গেলেও অপার আনন্দ উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে পত্রিকার প্রথম আরম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত ইহা উপযুক্ত সম্পাদক ও লেখক কর্ত্তৃক পরিচালিতসত্বেও ইহার প্রতিমাসে অনিয়মিত প্রকাশজন্য সাধারণকে বড়ই বিরক্ত এবং আমাদিগকেও গ্রাহক বর্গের নিকট যারপর নাই লজ্জিত হইতে হইয়াছে। বাস্তবিকও যথার্থ বলিতে হইলে সাময়িক পত্রিকার এতদূর অনিয়মিত প্রকাশ সম্পাদকগণের পক্ষে বড়ই অগৌরবের ও নিতান্তই বিড়ম্বনার বিষয়। সুতরাং সম্মিলনীর নির্ব্বিঘ্নে চতুর্থবর্ষে পদার্পণ যেমন এক আহ্লাদের কথা, অপর দিকে ইহার অনিয়মিত প্রকাশও তেম্নি আমাদিগকে অত্যন্ত দুঃখিত করিয়াছে। তবে এক কথা আছে, সাধারণ সংবাদ পত্রাদি যেমন প্রতিদিন বা সপ্তাহান্তে পড়িতে না পাইলে লোকের বড় একটা ধৈর্য্য থাকে না, কিন্তু এ শ্রেণীর পত্রিকা ঠিক্ মাসান্তে পড়িতে না পাইলে ততদূর ক্ষতি বা অসুবিধা হয় না। তবে কতকটা যে হয়, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কেহ মনে করিবেন না যে, সম্মিলনীসম্পাদকগণ এই বিশৃঙ্খলতা নিবারণে যত্ন বা চেষ্টা করেন না। ফলতঃ নিয়মিত প্রকাশে যত্ন বা চেষ্টার কোন ত্রুটিই হয় না, কাগজ, ছাপা, ও দপ্তরী প্রভৃতি সম্মিলনীর সমস্ত উপাদানবিষয়ে কোন বিঘ্নই ঘটে না, তবে এক প্রধান বিঘ্ন লেখকগণ লইয়া। কিন্তু সে বিঘ্ন অনিবার্য্য। কেন অনিবার্য্য তাহাও বলি। মনে

কর যে সমস্ত লোক সম্মিলনীর নিয়মিত লেখক, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই চিকিৎসাকার্য্যে বিশেষ রূপ পশার আছে। সুতরাং চিকিৎসকার্য্য উপেক্ষা করিয়া নিয়মিতরূপে প্রবন্ধাদি লেখা তাঁহাদের পক্ষে দুষ্কর। সুতরাং তাঁহাদিগের নিকট হইতে যথাসময়ে প্রবন্ধ পাওয়া গেলেই সম্মিলনী শীঘ্রই প্রকাশিত হয়; আর তাঁহাদের বিলম্বেই সম্মিলনী প্রকাশে বিলম্ব ঘটে। পরন্তু অবৈতনিক লেখক মহাশয়দিগের প্রতি কোনরূপ জোর যে চলে না, সে কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। যদি বল বেতন দিয়াই বা নিয়মিত লেখান না হয় কেন? এবড় শক্ত প্রশ্ন। এ প্রশ্নের প্রথম উত্তর এই যে, চিকিৎসাসম্মিলনীর আর্থিক অবস্থা এতদূর উৎকৃষ্ট নহে যে, প্রতিমাসে নিয়মিত পর্য্যাপ্ত অর্থব্যয় করিয়া প্রবন্ধ লেখান চলিতে পারে। ফলতঃ রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়া মাসে মাসে প্রবন্ধ লেখান যাইতে পারে কি না, আমাদের মূল্যদাতা গ্রাহক মহাশয়গণ নিজের যথাসময়ে মূল্যপ্রদান সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিলেই তাহা বেশ বুঝিতে পারিবেন। ফলতঃ যে দেশে একটী প্রবন্ধ সময় বিশেষে শতাধিকমুদ্রা মূল্যে বিক্রী হয়, যে দেশের লোক নিত্যপ্রয়োজনীয় বাজার খরচের ন্যায় প্রতিদিন সংবাদপত্র পাঠেরজন্য খরচ না করিয়াই থাকিতে পারে না, মোটকথা সংবাদ বা সাময়িক পত্রিকা যে দেশের লোকের জীবনস্বরূপ; সেই ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেই এ সকল কথা বেশ শোভা পায়, নচেৎ যে দেশের লোক এক পয়সা মূল্যের পোষ্টকার্ড দ্বারা পৌনে দুই পয়সা মূল্যের কাগজের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া নীরবে তিনবৎসর পর্য্যন্ত বসিয়া থাকে, মূল্য আদায়ের জন্য শত শত বার তাগাদা চিঠিপত্র লিখিয়াও টাকা পাওয়া দূরে থাকুক, উত্তর পর্য্যন্ত পাওয়া ভার; সেই হতভাগা দেশে দস্তুরমত টাকা দিয়া প্রবন্ধ লেখান দূরে থাকুক, যাঁহারা নিতান্ত কায়ক্লেশে কোন মতে কাগজ ও ছাপার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া কাগজটীকে জীবিত রাখিতে পারেন, আমরা তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। বলিতে কি, মূল্য প্রদানসম্বন্ধে গ্রাহকবর্গের এই ভীষণ অত্যাচারের কথা স্মরণ করিতে গেলে ক্ষোভ ও দুঃখে হৃদয় একবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে। আর এও বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সকলেরই মুখে শোন জাঁকাল বিজ্ঞাপনে মুগ্ধ হইয়া টাকা পাঠাইয়াছেন অথচ ২।৪ খানির অধিক পত্রিকা পান্

নাই। সুতরাং কলিকাতার অধিকাংশ পুস্তক বা পত্রিকা প্রকাশক বড় প্রবঞ্চক। অনুসন্ধানসমিতি আবার এসব কথা সংবাদ পত্রে মুদ্রিত করিয়া বড়ই বাহাদুরী লইতেছেন। সমিতির এ বিষয়ের বিশেষ কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে কি না, তাহা ধর্ম্ম জানেন, তবে সাধারণ দৃষ্টিতে তাঁহাদের এ উদ্দেশ্য যে খুব ভাল, সে বিষয়ে কোন কথা নাই। কিন্তু সমিতির নিকট আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, তাঁহারা'ত নিরীহ মফঃস্বলবাসীর চক্ষু ফুটাইয়া পরম বন্ধুর কার্য্যই করিতেছেন, কিন্তু সহরবাসী গরিব সম্পাদক বেচারীরা যে এক পয়সা মূল্যের পোষ্ট কার্ডের প্রতি নির্ভর করিয়া ক্রমাগত পত্রিকা পাঠাইয়া শেষে একদম নিরাশ হয়, তাহার প্রতিবিধান করে কে? ফলতঃ মফঃস্বলে বাসী একজন গ্রাহক কোন পত্রিকার জন্য অগ্রিম মূল্য ২।৪ টাকা পাঠাইয়া পরে পত্রিকা না পাওয়া, আর সহরবাসী একজন সম্পাদক ক্রমাগত সহস্রাধিক গ্রাহকের নিকট পত্রিকা পাঠাইয়া পরে অর্দ্ধেকেরও অধিক গ্রাহকের নিকট মূল্য না পাওয়া, এই উভয়ের মধ্যে অপরাধ যে অধিক কাহার, সে বিবেচনা বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী বিশেষতঃ সমিতিই করিবেন।

আর একটী নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় এই যে, এই মূল্য প্রদানসম্বন্ধে বড়মানুষ মহাত্মাদেরই ঔদাস্য অধিক। গরিব বেচারী তাগাদার বড় পীড়াপীড়ি দেখিয়া হয়ত যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ পাঠাইল, না হয় পত্রিকা লইতেই অস্বীকার করিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উপরোক্ত মহাত্মাদিগকে পারিবার যো নাই। তাগাদার উপর তাগাদা কর, লোকের উপর লোক পাঠাও, ওমা ভ্রুভঙ্গীও নাই। যেন তাঁহার সহিত সে পত্রিকার কখন পরিচয়ই হয় নাই। সে যাহা হউক, মূল্য প্রদান সম্বন্ধে আমাদের বিবেচনায় গরিব সম্প্রদায় অপেক্ষা ধনী সম্প্রদায়েরই ঔদাস্য অধিক। তাই বলিতেছি যে, অগ্রিম মূল্য দিয়া ২।৪ খানির অধিক পত্রিকা না পাওয়া অথবা প্রতিমাসে নিয়মিত পত্রিকা না পাওয়া যেমন বড়ই ক্ষোভের বিষয়, তেমনি আবার প্রাণপণ যত্নে প্রথম অবস্থায় ঘরের পয়সা ব্যয় ও শেষে মূল্য আদায়ের জন্য বার বার তাগাদা করিয়া সময় ও আবশ্যক মত মূল্য পাওয়া না গেলে তাহা বড় কম আক্ষেপের কথা নহে। সে যাহা হউক, এক সম্মিলনীর অনিয়মিত প্রকাশের কথা তুলিয়া বিশেষতঃ নিজেদের ক্রটী বলিতে গিয়া নানা কথা লিখিলাম।

কিন্তু কেহ এ কথা মনে করিবেন না যে, আমরা কোন ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া একথা লিখিলাম। ফলতঃ আমরা যে আজ কি দুঃখে এসব্ কথা প্রাণ খুলিয়া লিখিলাম, তাহা অন্য কেহ না বুঝুন, কিন্তু দেশীয় সম্পাদক বর্গের নিকট এসব কথা যে বড়মন্দ লাগিবেনা ইহা নিশ্চিত।

তারপর দ্বিতীয় কথা—সম্মিলনীর লেখকগণের মধ্যে এমন দুরবস্থা খুব কম লোকের যে, তাঁহারা টাকা পাইলেই নিয়মিত লিখিবেন, আর তাহা না হইলে লিখিবেন না। বলিতে কি, কোন কোন লেখকের সম্বন্ধে এ কথা বলাও বোধ করি অসঙ্গত নয় যে, প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেও তাঁহারা অর্থের দাস হইয়া নিয়মিত লিখিতে কখনই বাধ্য হন্ না। তবে যে লিখিতেছেন, সে কেবল তাঁহাদের অনুগ্রহ মাত্র। ফলতঃ এই তিন বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে সুযোগ্য লেখক কর্ত্তৃক সারগর্ভ প্রবন্ধ সম্মিলনীতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিলে ইহার নিয়মিত প্রতিমাসে মাসে প্রকাশ কোন মতেই সম্ভবেনা। তবে অনাবশ্যকীয় ও অপাঠ্য প্রবন্ধ দ্বারা চালাইতে হইলে প্রতিমাসে কেন, মাসের মধ্যে ২।৩ বার বাহির করিতে ও বোধ হয় কোন কষ্ট বা আপত্তি হইতে পারে না। অতএব সম্মিলনীর অনিয়মিত প্রকাশ জন্য যাঁহারা বড় ব্যস্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে কটাক্ষ করেন, তাঁহাদের সেই কটাক্ষের প্রত্যুত্তর আমার এস্থলে এই কথাতেই দিলাম। অতঃপর আমাদের আর যাহা বক্তব্য তাহা বলিতেছি—

সম্মিলনী আজ্ চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিল সুতরাং এই সময়ের মধ্যে ভাল মন্দ, আবশ্যকীয় অনাবশ্যকীয়, সুপাঠ্য অপাঠ্য কতরকমেরই প্রবন্ধ ইহাতে স্থান পাইয়াছে, লেখকগণের যত্নের কোন ত্রুটী দেখিনাই অথচ কেহ কেহ কানাকানি করেন যে, "হাঁ চিকিৎসা-সম্মিলনীতে যে সমস্ত প্রবন্ধ বাহির হইতেছে, তাহা অতি উপযুক্ত ও আমাদের আদরের বটে, কিন্তু আমাদের জানিবার এখনও অনেক কথা বাঁকী আছে।" একেমন কথা? সম্মিলনী আজ্ ত আর শেষ হইয়া গেল না। বিশেষতঃ প্রথম হইতে যে সমস্ত লেখক যেরূপ যত্নের সহিত প্রবন্ধাদি লিখিয়া আসিতেছেন, এখনও তাঁহারা ঠিক সেইরূপ যত্নেই লিখিতেছেন, বরং সম্মিলনীকে স্থায়ী হইতে দেখিয়া লেখক বর্গের যত্ন আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং এরূপ স্থলে এরূপ অসঙ্গত

আলোচনা যে তাঁহারা কেন করেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। তবে অবশ্য একথা নিশ্চিত যে, সকলের মতে সকল প্রবন্ধ ভাল না লাগিতে পারে। হয়ত ইতি পূর্ব্বে যাঁহারা স্বাস্থ্যবিষয়ক কোন প্রবন্ধ বা কোন রোগের বিষয় পাঠ করিয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছেন, এখন তাঁহাদের নিকট বৈদ্যক ঔষধ প্রস্তুতের প্রবন্ধ হয়ত ভাল না লাগিতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতে যে কাস, যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাস, প্রমেহ ও যাত প্রভৃতি রোগের বিষয় এবং আহারাচার প্রভৃতি স্বাস্থ্যবিষয়ক অন্যান্য প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন না, সে একথা তাঁহাদিগকে কে বলিল? ফলতঃ তা নয়, আসল কথা এই যে, মন বড় চঞ্চল, সর্ব্বদা এক বিষয় ভাল লাগে না, তাই সাধারণে এক বিষয় কিছু দিন পড়িয়াই বিরক্ত হইয়া পড়েন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এসব বিষয়ে ব্যস্ত হইলে চলিবে না। যিনি যাহাই বলুন, যাঁহার ধারণা যাহাই থাকুক, গত তিন বৎসরের লিখিত প্রবন্ধগুলি ভালই হউক আর মন্দই হউক, কিন্তু একথা আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি যে, ক্রমে ভবিষ্যতে সর্ব্বপ্রকার পীড়ার চিকিৎসা সম্বন্ধে কবিরাজী প্রভৃতি ত্রিবিধ মতে যে সমস্ত কথা লিখিবার ইচ্ছা আছে, যদি ঈশ্বরকৃপায় সম্মিলনী বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ততদূর পৌছায়, তবে গ্রাহক ও পাঠকগণ সম্মিলনী পাঠ করিয়া উত্তরোত্তর সমধিক সুখী ভিন্ন দুঃখিত হইবেন না।

আর এক কথা, চিকিৎসা-সম্মিলনীতে এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথির অপেক্ষা কবিরাজীর ভাগ কিছু অধিক থাকে বলিয়া সময় সময় কেহ কেহ আমাদিগকে বড় দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্রাদি লিখিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, সর্ব্বাপেক্ষা হোমিওপ্যাথির ভাগ অধিক থাকাই প্রার্থনীয়। অবশ্য রুচি বা প্রয়োজন অনুসারে যাঁহার যাহা বলিতে ইচ্ছা হয় বলুন, কিন্তু আমরা বলি যে, যে এলোপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির জন্য স্বয়ং রাজাই লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন—যে এলোপ্যাথি শাস্ত্র ইংরেজী, বাঙ্গালা, পার্শি, নাগরী প্রভৃতি অসংখ্য ভাষায় প্রায় পৃথিবীময় প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে—যাহা শিখিবার পক্ষে অহরহ অসংখ্য পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে—অপর দিকে যে হোমিওপ্যাথির উন্নতির জন্য জর্ম্মাণ, আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি বহুবিধ দেশের লোক উঠিয়া পড়িয়া

লাগিয়াছেন—যাহার জন্য প্রতি সহরে স্কুল, নিত্য নূতন নূতন পুস্তকের প্রচার হইতেছে—পক্ষান্তরে গরিব নিঃসহায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা সাধারণের বিশেষতঃ দেশীয় লোকের অনেকাংশে প্রত্যক্ষ পরম উপকারী হইলেও তাহার সম্বন্ধে যে কেহ দু কথা বলে বা তাহার পক্ষসমর্থন করে, এমন লোক খুব বিরল বা নাই বলিলেই চলে। সুতরাং এরূপস্থলে চিকিৎসা-সম্মিলনীতে কবিরাজী বিষয়ই অধিক স্থান পাওয়া উচিত অথবা নিন্দনীয় কি না, তাহা তাঁহারাই বিবেচনা করিবেন। আমরা কিন্তু বলি যে অনাথা, একেবারে নিঃসহায়া অথচ আমাদের পরমাত্মীয়া চিরবন্ধু আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রতি একটু অধিক দৃষ্টি রাখাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

বিগত বর্ষের লেখকগণের পরিচয় আর নূতন করিয়া দেওয়া অনাবশ্যক; তথাপি বলা আবশ্যক যে, লেখকগণ নিঃস্বার্থভাবে কেবল সাধারণের উপকারের জন্য যেরূপ যত্নের সহিত সম্মিলনীতে লিখিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের নিকট কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল যে যথার্থ কৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হয়, তাহা বলিতে অক্ষম। আশা করি, লেখকগণের এইরূপ যত্নও উৎসাহে সম্মিলনী ক্রমশঃই সাধারণের নিকট আদরণীয়া হইতে থাকিবেক।

বর্ষসমালোচন উপলক্ষে সংক্ষেপে সব বিষয়েই কিছু কিছু বলিলাম। কিন্তু গত বর্ষের মধ্যে আমাদের যে একটী বিশেষ ত্রুটী বা অপরাধ ঘটিয়াছে, সে অপরাধের আর মার্জ্জনা নাই। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার দোষে পাপ এতদূর ঘটিয়াছে যে, সে পাপের আর কোনমতেই প্রায়শ্চিত্ত নাই। ব্যাপারটী সেই পরীক্ষাতত্ত্ব লইয়া। উক্ত পুস্তকের মুদ্রণশেষ না করিয়া যে কি কুক্ষণেই উহার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, তাহা আর বলিবার নহে—সে কলঙ্কের কথা বাস্তবিকই আর মুখে আনিবার নহে। বলিতে লজ্জাবোধ হয় যে, পরীক্ষাতত্ত্বের কতকটা মুদ্রিত হইয়া এখনও সেই অবস্থাতেই পড়িয়া আছে। সংসারিক নানাবিধ ঝঞ্ঝাটে পোড়া অবসর এমন একটু ঘটেনা যে, অবশিষ্ট টুকুর মুদ্রণ শেষ করিয়া সাধারণের নিকট বঞ্চনা দোষ হইতে মুক্ত হই। যাহা হউক, কাজটা যে নিতান্তই অন্যায় হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই, অতএব

দেখি ভগবানের কৃপায় আর কতদিনের মধ্যে আমরা এদায় হইতে মুক্ত হইতে পারি।

পরিশেষে চিকিৎসা-সম্মিলনীর সর্ব্বপ্রধান উদ্যোগ ও সাহায্যকর্ত্তা শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী এম, এ জমীদার মহাশয়ের প্রতি বক্তব্য এই যে, যতীন্দ্র বাবু! আপনার উদ্যোগ ও সাহায্যে প্রতিপালিতা সম্মিলনী যে আজ ৮০০ শতেরও অধিক গ্রাহক লইয়া চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিল, ইহা আপনারই সমধিক গৌরব ও আহ্লাদের বিষয়। অতএব সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি যে; সম্মিলনী জীবিত থাকিয়া দিন দিন আপনার এইরূপ গৌরব ও আনন্দের বৃদ্ধি করিতে থাকুক্।

দেশীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।

আহার মাত্রা।

শরীর রক্ষার জন্য আহার, জীবগণের পক্ষে যে কিরূপ প্রয়োজনীয়, সে কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আহার এতাদৃশ প্রয়োজনীয় এতদূর উপকারী হইলেও এই আহারের মাত্রা অর্থাৎ পরিমাণের ইতর বিশেষ লইয়া অনেককে অনেক সময়ে বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে দেখা গিয়া থাকে, বাস্তবিকও ইহা নিশ্চিত যে, ভোজনের তারতম্যই প্রায় সকল রোগের কারণ—ভোজনের অনিয়মেই লোকে রোগ ভোগ করিয়া থাকে, সুতরাং আহারের মাত্রার বিষয় অর্থাৎ কিরূপ ভোজন করিলে গুরুতর ভোজন করা হয়, অল্প ভোজনেরই বা লক্ষণ কি, তাহা সকলেরই জানা থাকা আবশ্যক। অতএব নিম্নে আহারের মাত্রার বিষয় সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।

আহার করিতে হইলে স্বীয় কুক্ষি স্থানকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগ কঠিন খাদ্য দ্রব্য দ্বারা এবং একভাগ লেহ্যপেয় প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা পূরণ করিবেক। এবং অপর এক ভাগ বাতপিত্ত শ্লেষ্মার সঞ্চারের নিমিত্ত শূন্য রাখিবেক। যেহেতু এইরূপ মাত্রানুযায়ী আহার করিলে মনুষ্যগণ কখনই অপরিমিত আহার-জনিত ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয় না।

পরিমিত আহার করিলে নিম্ন লিখিত লক্ষণ গুলি প্রকাশ পায় যথা

আহার দ্বারা কুক্ষি স্থানে বা উদরের কোনস্থানে কোনরূপ পীড়া বা অসুখ বোধ হয় না, হৃদয়স্থান বেশ পরিষ্কার বোধ হয়, পার্শ্বস্থানে কোনরূপ ক্লেশ জন্মায় না। উদর বেশ লঘুবোধ হয়, ইন্দ্রিয়গণের প্রীতিজনক হয়, ক্ষুধাও পিপাসার নিবৃত্তি হয়; শয়ন, উপবেশন, গমন, নিশ্বাস প্রশ্বাস নির্গমন এবং হাস্যপরিহাস প্রভৃতিতে সুখজনক হয়, সায়ংকাল এবং প্রাতঃকালেই যথোপযুক্ত আহার জীর্ণ হইয়া ক্ষুধার অনুভব হয় এবং শরীরের বল বর্ণ ও বুদ্ধির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব এইরূপ আহারই প্রকৃত মাত্রানুযায়ী আহার জানিবে।

অপরিমিত আহার দুই প্রকার এক হীনমাত্রা ও অপর অধিকমাত্রা। তন্মধ্যে আহার রাশির হীনমাত্রায় প্রয়োগ বল বর্ণ এবং পুষ্টির ক্ষয়কারক, অতৃপ্তিকর, উদাবর্ত্ত রোগকারক অবৃষ্য, আয়ুর হানিকারক, শরীরের ও ওজধাতুর ক্ষয়কারক, মন বুদ্ধিও ইন্দ্রিয়গণের ক্ষয়কারক, শ্রীভ্রষ্টকর এবং অশীতি প্রকার বায়ুরোগের আশ্রয়।

অতিমাত্রায় আহার বায়ু পিত্ত কফ এই ত্রিদোষেরই প্রকোপকারক, এবং সর্ব্বরোগের আকর হইয়া থাকে। পরন্তু যে ব্যক্তি কঠিন বস্তু সকল আহার করিয়া পুনঃ পুনঃ জল পানদ্বারা অপরিসীম তৃপ্তিলাভ করে, তাহার পূর্ব্বোক্ত বস্তু সকল আমাশয়ের দোষ জন্মাইয়া ত্রিদোষের প্রকোপ জন্মাইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত অতিভোজন জন্য অজীর্ণ উপস্থিত হইয়া অতিভোজন শীল ব্যক্তির বাতাদি ত্রিদোষ কুপিত হইয়া নানা বিধ রোগ জন্মিতে পারে। তন্মধ্যে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উদরবেদনা, আনাহ (মল মূত্রের বদ্ধতা) অঙ্গমর্দ্দ, মুখশোষ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, বিষমাগ্নিতা শিরসঙ্কোচন, এবং শিরাস্তম্ভ প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি হয়। পিত্তের প্রকোপ বশতঃ পিত্তজ্বর, অতীসার, অন্তর্দাহ তৃষ্ণা, ভ্রম, মত্ততা এবং প্রলাপ উৎপন্ন হয়। শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ মন্দাগ্নি, শীত জ্বর, আলস্য এবং গাত্রদাহ উৎপন্ন হয়,

কেবল যে পূর্ব্বোক্ত অতিমাত্রায় আহার করিলেই অপক্ক দোষের উৎপত্তি হয়, তাহা নহে, অত্যন্ত রূক্ষ শুষ্ক ও শীতল অন্ন দ্বারা এবং অসময় ভুক্ত অন্নপানীয় দ্বারা এবং কামশোকাদি দ্বারা এইরূপ অপক্ক রসের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরন্তু চিন্তা শোক ভয় ও দুঃখ প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির উচিত মাত্রায় হিতজনক অন্ন পানও সম্যকরূপে জীর্ণ হয় না। ক্রমশঃ—

আয়ুর্ব্বেদ-তত্ত্ব।

বায়ু বিবরণ।

প্রাচীন আর্য্যগণ বায়ুকে জগৎপ্রাণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ বায়ু ভিন্ন প্রাণিগণ ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। সেই বায়ুই দিক্‌বিশেষ হইতে প্রবাহিত হইয়া বিশেষ বিশেষ দোষ ও গুণশালী হইয়া থাকে। অতএব প্রত্যেক দিক্ হইতে প্রবাহিত বায়ুর দোষ ও গুণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

পূর্ব্বদিকের বায়ুর গুণ।

পূর্ব্বদিক্ হইতে প্রবাহিত বায়ু গুরু, উষ্ণ ও স্নিগ্ধ, পিত্ত ও রক্ত-দূষক, বিদাহী, বায়ুবর্দ্ধক, অভিষ্যন্দী, স্বাদু ও লবণরস, এই বায়ু পরিশ্রান্ত ও কফজন্য শোষরোগের পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে হিতকারক বটে। কিন্তু এই বায়ু সেবন করিলে অর্শঃ, ক্রিমি, সন্নিপাত জ্বর, আমবাত, শ্বাস, বিষরোগ ও চর্ম্ম রোগ প্রভৃতির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (১)

দক্ষিণ দিকের বায়ুর গুণ।

দক্ষিণ দিক্ হইতে প্রবাহিত বায়ু, লঘু, শীতল, স্বাদুরস, শরীরের বল ও চক্ষুর দীপ্তিবর্দ্ধক, এবং রক্ত ও পিত্তজন্যরোগ নিবারক। (২)

পশ্চিম দিকের বায়ুর গুণ।

পশ্চিম দিক্ হইতে প্রবাহিত বায়ু, তীক্ষ্ণ, লঘু, শরীরস্থ জলীয় ধাতুর শোষক ও বলনাশক। এই বায়ু সেবন করিলে কফ, পিত্ত ও মেদো

---

(১) পূর্ব্বোঽনিলো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ সোষ্ণঃ পিত্তাস্রদূষকঃ। বিদাহী বাতলঃ শ্রান্তিকফশোষবতাং হিতঃ। স্বাদুঃ পটুরভিষ্যন্দী ত্বগ্‌দোষার্শোবিষক্রিমীন্। সন্নিপাতজ্বরংশ্বাসমামবাতঞ্চ কোপয়েৎ। (ভাব প্রকাশ)

(২) দক্ষিণঃ পবনঃ স্বাদুঃ পিত্তরক্তহরোলঘুঃ। বীর্য্যেণ শীতলো বল্যশ্চক্ষুষ্যো নতু বাতলঃ। (ভাবপ্রকাশ)

জন্য রোগের শমতা হয় বটে, কিন্তু শরীরস্থ বায়ু অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (৩)

উত্তর দিকের বায়ুর গুণ।

উত্তর দিক্ হইতে প্রবাহিত বায়ু, শীতল, স্নিগ্ধ, মৃদু, মধুর রস ও ক্লেদজনক, প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির পক্ষে এই বায়ু সেবনে শারীরিক বল বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু রোগীর পক্ষে ঐ বায়ু সেবনে বাতাদিদোষ প্রকুপিত হইয়া তত্তৎ রোগের বৃদ্ধি করে। (৪)

অগ্নিকোণ হইতে প্রবাহিত বায়ু রুক্ষ ও দাহকারক। নৈঋত কোণের বায়ু অম্লপাকজনক। বায়ুকোণের বায়ু তিক্তরস, ঈশান কোণের বায়ু কটুরস যুক্ত হইয়া থাকে।

একদা সকল দিক হইতে প্রবাহিত বায়ু সেবন করিলে উহাদ্বারা নানাবিধ কঠিন রোগ উৎপন্ন হইয়া আয়ুঃহ্রাস করে, অতএব কদাচও উক্ত প্রকার বায়ু সেবন বিধেয় নহে। (৫)

প্রবল বেগবাহি বায়ু সেবন করিলে শরীরের রুক্ষতা, বিবর্ণতা ও স্তব্ধতা জন্মে। কিন্তু উহা দ্বারা পিত্তের প্রবলতা ও দাহ বিনষ্ট হয়।

অতএব সকলের পক্ষেই পূর্ব্বোক্ত বায়ুর দোষ ও গুণ বিশিষ্টরূপে বিবেচনা করিয়া আবশ্যকমত সুখকর মন্দ মন্দ বায়ু সেবন করা কর্ত্তব্য। (৬) ক্রমশঃ—

বিক্রমপুর। ঢাকা। } শ্রীহরিমোহন দাস গুপ্ত কবিরাজ।

---

(৩) পশ্চিমঃ পবনস্তীক্ষ্ণঃ শোষণো বলহৃল্লঘুঃ,। মেদঃপিত্তকফধ্বংসী প্রভঞ্জনবিবর্দ্ধনঃ। (ঐ)

(৪) উত্তরো মারুতঃ শীতঃ স্নিগ্ধো দোষপ্রকোপকৃৎ। ক্লেদনঃ প্রকৃতিস্থানাং বলদো মধুরো মৃদুঃ। (ঐ)

(৫) আগ্নেয়ো দাহকৃদ্রুক্ষো নৈঋতো ন বিদাহকৃৎ। বায়ব্যস্তুভবেত্তিক্ত ঐশানঃ কটুকঃ স্মৃতঃ। বিষক বায়ুরনায়ুষ্যেঃ প্রাণিনাং বহুরোগকৃৎ। অতস্তং নৈবসেবেত সেবিতঃ স্যান্নশর্ম্মণে। (ভাবপ্রকাশ)

(৬) প্রবাতং রৌক্ষ্যবৈবর্ণ্যস্তম্ভকৃদ্দাহপিত্তহৃৎ॥ × × সুখং প্রবাতং সেবেতেতি॥ (সুশ্রুতঃ)

ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ প্রণালী।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

লৌহ ;——যত প্রকার লৌহ আছে, তাহার মধ্যে কান্ত নামক লৌহ উৎকৃষ্ট। কান্তলৌহের পরীক্ষা এইরূপ ;—নিমের পাতা বা ছাল বাটিয়া যে লৌহের উপর লেপ দিয়া অহোরাত্র রাখিলে নিমের তিক্তরস ঘুচিয়া মিষ্ট রস হয়, তাহাই কান্তলৌহ। এ লৌহ—সচরাচর পাওয়া যায় না ; কাজেই বজ্রনামক লৌহ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। বজ্রলৌহকে চলিত কথায় ইস্পাত বলে। চিলমার্কার বড় বড় উখা অকর্ম্মণ্য হইয়া বিক্রয়ার্থ সর্ব্বত্র নীত হয়, জারিবার জন্য তাহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইস্পাত শোধন করিয়া নানাবিধ পাক সমাধা করত পুটপাকে জারিতে হয়। একে একে সে সকল কার্য্যের বিধান বলিতেছি।

শোধন প্রণালী ;— ইস্পাত ভস্ত্রাগ্নিতে অর্থাৎ জাঁতার আগুণে পোড়াইয়া নেহাইর উপর রাখিয়া মুদ্গর আঘাতে পাত করিবে। পাত যত পাতলা করিতে পারা যায় ততই লাভ। এ কাজটী অবশ্য কর্ম্মকার দ্বারা করাইয়া লইতে হইবে। পাতগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া লইতে হইবে। নতুবা শোধন কার্য্যে অসুবিধা ঘটিবে।

পাত করা হইলে তাম্র শোধনের প্রণালী অনুসারে তৈলে, তক্রে, গোমূত্রে, কাঁজিতে এবং কুলত্থ কলাইয়ের ক্বাথে তিন তিন বার তপ্ত করিয়া ফেলিবে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে লৌহ শোধন করা হইলে পুনরপি লৌহপত্র ঈষৎ তপ্ত করিয়া দুধে ফেলিবে। যে দুধে লৌহ এইরূপে ফেলিতে হইবে, তাহার পরিমাণ সমস্ত লৌহের দ্বিগুণ অর্থাৎ শোধন করা লোহার পাত ওজন করিয়া যত ওজনে হইয়াছে, দুধ তার দ্বিগুণ লইয়া তাতে লোহার পাত তপ্ত করিয়া করিয়া তিনবার ফেলিবে। এই ক্রিয়াকে নিষেক ক্রিয়া বলে। দুধে নিষেক করা হইলে কাঁজিতে ঐরূপে নিষেক করিবে। তার পর গোমূত্রে। কাঁজি এবং গোমূত্রও লৌহের দ্বিগুণ লইবে। সর্ব্বশেষে ত্রিফলার ক্বাথে নিষেক করিতে হইবে। ত্রিফলা অর্থাৎ হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া। শুষ্ক ত্রিফলায় আটী বাদ দিয়া, মিলিত, লৌহের আট গুণ লইবে ; তারপর

ত্রিফলার চারিগুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধেক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। শেষবার যখন ত্রিফলার কাথে নিষেক করিবে, লৌহপাত গুলি সেবার অগ্নিবর্ণ করিয়া লইবে; এবং অতিত্রস্ত হাতে কাথে মগ্ন করিয়া করিয়া লইবে। এইরূপ করিলে লৌহ চূর্ণনীয় হয়।

নিষেক ক্রিয়ার পর লৌহের পাত গুলি বড় হামান দিস্তায় প্রচণ্ড আঘাতে চূর্ণ চূর্ণ করিয়া লইবে।

পুটপাক;——পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চূর্ণীকৃত লৌহে চোণা মাখাইয়া উপযুক্ত মুষার মধ্যে আবদ্ধ করতঃ দুই অঙ্গুল পুরু কাদার লেপ দিয়া শুষ্ক করিবে। তারপর গজপুটে ঘুঁটের আগুণে পোড়াইবে। শীতল হইলে মূষা হইতে বাহির করিয়া আবার হামান দিস্তায় ফেলাইয়া গুঁড়া করিবে। যে গুলি খুব গুঁড়া হইয়া গিয়াছে সে গুলি কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া স্বতন্ত্র করিয়া লইবে। মোটা দানা গুলিতে আবার চোণা মাখাইয়া আবার পোড়া দিবে। আবার গুঁড়া করিয়া শ্লক্ষ্মচূর্ণ গুলি পৃথক করিয়া আগেকার গুড়ার সঙ্গে রাখিয়া দিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে করিতে যখন সকল লৌহ গুড়া করা হইয়া যাইবে, তখন লৌহ চূর্ণ গুলি ওজন করিয়া দেখিবে। চূর্ণ যত খানি হইয়া থাকে তাহার দশভাগের একভাগ হিঙ্গুল, লৌহ খলে চূর্ণ করিয়া তাহাতে পূর্ব্বোক্ত লৌহ চূর্ণ দিয়া ধৃতকুমারীর রসে ২ প্রহর মাড়িবে। তাহার পর আবার পুটপাক করিবে। এইরূপে ৭ শাতবার পুটে পাক করিলে লৌহ ভস্ম হইবে। লৌহের মর্দ্দনাদি কার্য্যে কদাচ লৌহ ভিন্ন অপর অপর পাত্রে করিবেনা।

এইরূপে জারিত লৌহ স্নিগ্ধ বেগুণে বর্ণ ধারণ করিবে। সুস্থির জলে আস্তে আস্তে ছড়াইয়া ফেলাইয়া দিলে ভাসিতে থাকিবে। চখে দিলে কোন প্রকার ক্লেশ বোধ হইবে না। ক্রমশঃ—

মাগুরা (খুলনা) } শ্রীশীতল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন।

৭৫। কয়েক প্রকার খাদ্য যত সময়ে জীর্ণ হয়।

কোন এক এলেক্‌সিস্ সেইণ্টমার্টিন্ নামক সৈনিকের গুলির আঘাতে বুকের কড়ার নীচে এক ছিদ্র হয়। যে কয়েক প্রকার খাদ্য যতক্ষণে তাহার আমাশয়ে জীর্ণ হয়, ডাক্তার বমণ্ট সাহেব স্বচক্ষে ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

যে যে খাদ্যের পরীক্ষা করা হইয়াছিল	জত সময়ে জীর্ণ হয়।
১। মৎস্য ও মাংস খাদ্য	
(১) পশুর আতড়ী বা শূকরের শাবকের পদ	এক ১ ঘণ্টা
(২) কাঁচা ডিম (ফোঁটান) শাল্‌মন বা ট্রাউট (মুজী) নামক মৎস্য, বা মৃগ মাংসের কবাব।	ডেড় ১॥০ ঘণ্টা
(৩) বলদের যকৃৎ বা কড় (মুজী) নামক মৎস্য	দুই (২) ঘণ্টা
(৪) জলে সিদ্ধ মেষ শাবক, শূকর শাবকের কবাব, রাজহংসের কবাব।	আড়াই ২॥০ ঘণ্টা
(৫) জলে সিদ্ধ ভেড়ার মাংস বা গোমাংসের কবাব	তিন (৩) ঘণ্টা
(৬) পাতি হাঁসের বা কুক্কুটের কবাব	চারি (৪) ঘণ্টা
(৭) বড় শূকর (বরাহ) মাংসের কবাব	সওয়া পাঁচ ঘণ্টা
২। উদ্ভিজ্জ খাদ্য।	
(৮) ভাত	এক ঘণ্টা
(৯) জল শাগু	১, ঘণ্টা ৪৫ মিনিট
(১০) যবের মণ্ড	পাঁচ দণ্ড (২ ঘণ্টা)
(১১) সিম্ সিদ্ধ	আড়াই ঘণ্টা
(১২) রুটী ও আলু সিদ্ধ	সাড়েতিন ঘণ্টা
(১৩) কোপিশাক সিদ্ধ	ইত্যাদি ৪ চারি ঘণ্টা

৭৬। যে বেলার ভোজনে যাহা খাওয়া বিধি।

প্রথম বা প্রাতের লঘু ভোজন,

(১) ইউরোপীয় রকমের খাদ্য

সেকো রুটী মাখম তিন মিনিট (পল) সিদ্ধ করা ১।২টী নূতন পাড়া ডিম এবং কোকোয়া নামক পানীয় বালক বালিকারা ঐ খাদ্য বয়স অনুসারে কম খাইবে।

(২) দেশী রকমের খাদ্য

দুই তিন খানা হাতগড়া পাতলা রুটী, চিনি বা লুচী ভাজা তরকারী সঙ্গে তিন মিনিট (পল) সিদ্ধ করা ১।২ টী ডিম অল্প ঈষদুষ্ণ দুধ। অথবা আদসের বা তিন পোয়া সদ্য দোয়ান কাঁচা বা ঈষদুষ্ণ দুধমাত্র। শেষোক্ত খাদ্য অতি বলকারক ও সহজে জীর্ণ হয়। বালক বালিকারা ঐরূপ খাদ্য বয়স অনুসারে অল্প পরিমাণে খাইবে। কিম্বা ১।২ খানি লুচী একটা মেঠাই দিয়া খাইবে।

দ্বিতীয় বা মধ্যাহ্নের পূর্ণভোজন।

রুটী জল ও মৎস্য বা মাংস এবং শাক ফল ও অল্প দুধ বা চিনি দধি যুক্ত। অথবা ভাত ডাল মাছ বা মাংস অল্প দুধ বা চিনি মিশান দধি। নিত্য এক প্রকার খাদ্যে অরুচি জন্মে বলিয়া এক দুই বেলা অন্তর অন্তর ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উদ্ভিজ্জ ডাল মাছ বা মাংস ভিন্ন প্রকারে রন্ধন করিয়া খাওয়াতে হানি নাই। কিন্তু শুদ্ধ ফল মূল ও ডাল কড়াই ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ রীতিমত আহার করিয়া ও শরীর ও মনকে সবল ও পুষ্ট করা যায়। বালক বালিকারা ঐ রূপ আহার বয়স অনুসারে অল্প পরিমাণে করিলেই হয়।

দেশীয় লোকেরা ভাত ডাল, ভাত, মাছ, বা ভাত মাংস ও অল্প বা টকের ব্যঞ্জন ও কোন উদ্ভিজের আনাজ তরকারী দিয়া খাইতে পারে, শেষে দধির সঙ্গে চিনি ও কলা দিয়া খাইতে পারে, গ্রীষ্মকালে শরীর উত্তপ্ত হইলে দধির সঙ্গে লেবু বা তেতুলের সর্ব্বৎ পান করিতে পারে।

৭৫ কয়েক প্রকার খাদ্যের সারাংশের পরিমাণ।

ডাক্তার লিথ্‌বি কয়েক খাদ্য দ্রব্যের সার ভাগ যে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল। ডাক্তার জিউলশনের গ্রন্থেও উঁহা উল্লেখ আছে।

সংখ্যা	এক পাউণ্ড বা আদসের খাদ্য সামগ্রীতে	উষ্ণকর সার (কার্ব্বন) রতি	পুষ্টিকর সার (নাইট্রোজেন) রতি	সংখ্যা	এক পাউণ্ড বা আদসের খাদ্য সামগ্রীতে	উষ্ণকর সার (কার্ব্বন) রতি	পুষ্টিকর সার (নাইট্রোজেন) রতি
১	মটর (স্থিথণ্ডীকৃত)	১৩৪৯।।০	১২৪	১৮	দধি	৭৭	৬।।০
২	পাওয়া রুটী	৯৮৭।।০	৪৪	১৯	মাখম তোলা পনির (স্কিমচিস্)	৯৭৩।।০	২৪১।।০
৩	চাউল	১৩৬৬	[illegible]৪	২০	মেষমাংস	৯৫০	৯৪।।০
৪	যব	১৩৩০	৪৫।।০	২১	গোমাংস	৯২৭	৯২
৫	ভুট্টা বা জনার	১৫০৮	৬০	২২	মোটা শূকরের মাংস	২০৫৬।।০	৫৩
৬	বিলাতী যবের (ওট্‌স্) আটা	১৪১১।।০	৬৮	২৩	শূকরের শুষ্ক লোনা মাংস	২৯৯৩।।০	৪৭।।০
৭	রাঙ্গয়ের আটা	১৩৩৬।।০	৪৩	২৩	বলদের যকৃত	৪৬৭	১০২
৮	আলু	৩৮৪।।০	১১	২৫	কুক্কুটাদির মাংস	১০৯	৬৩৯
৯	শালগম	২৩১।।০	৬।।০	২৬	ডিম	৩৩৪	৪২০
১০	গাজর	২৫৪	৭	২৭	সাদাবর্ণের মৎস্য	৪৩৫।।০	৯৭।।০
১১	চুকন্দ মূল	৪৭৭	৬	২৮	সদ্য মাখম	৩২২৮	০
১২	শাকসব্জী	২১০	৭	২৯	চর্ব্বি	২৪০৯।।০	০
১৩	গুড়	২১৯৭।।০	০	৩০	লোনা মাখম	২২৯২।।০	০
১৪	চিনি	২৪৭৭।।০	০	৩১	বিয়ার্ এবং পোর্টার নামক সুরা	১৩৭	।।০
১৫	সদ্য দুগ্ধ	২৯৯।।০	২২	৩২	কোকোয়া নামক পানীয়	১৯৬৭	৭০
১৬	মাখম তোলা দুধ	২৬৯	২৬।।০				
১৭	ঘোল	১৯৩।।০	২২				

শেষ মন্তব্য—গোমাংস অপেক্ষা মেষ অথবা ছাগ মাংসের সারভাগ যে অপেক্ষাকৃত অধিক, তাঁহা শেষোক্ত বিবরণ পাঠে বেশ জানা যাইবে। সেই কারণে বিশেষতঃ গো মহিষাদি কৃষির জন্য বড় আবশ্যকীয় জন্তু বলিয়া হিন্দু ব্যবস্থাপকেরা তাহা ভক্ষণ করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়াছেন। (২) পাখীর মাংসে বসার ভাগ অতিকম এবং শুভ্রসারের (নাইট্রোজেনের) ভাগ অধিক হওয়াতে ভাতের সঙ্গে রুগ্ন ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত পথ্যের মধ্যে গণ্য। (৩) যবের আটা অপেক্ষা তণ্ডুলে পুষ্টিকর নাইট্রোজেনের ভাগ অপেক্ষাকৃত কম হওয়াতে সহজে জীর্ণ হয় বলিয়া জ্বর ইত্যাদি প্রদাহক পীড়াতে ভাতই উপযুক্ত পথ্য।

কুইনাইন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইতি পূর্ব্বোক্ত জ্বর সকলে অর্থাৎ অনুপর্য্যায়, সংক্রামক ও প্রাদাহিক প্রভৃতি জ্বর সকলে কুইনাইন প্রয়োগে উপকার ত হয়ই না, পরন্তু ঐ সমস্ত জ্বরে কুইনাইন্ প্রয়োগে কি কি চিহ্ন দ্বারা অপকার জানা যায়, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে। যথা—কোন কোন সময়ে উত্তাপ বৃদ্ধি করে, যে জ্বরে কিছুমাত্রও বিরাম থাকে, সেই জ্বর একবারে অনুপর্য্যায় অর্থাৎ অবিচ্ছেদী অবস্থায় পরিণত হয়, বিবমিষা, শিরোঘূর্ণন, মস্তক ভারবোধ ও অনিদ্রা হয়, কাণ ঝাঁ ঝাঁ করে, ক্ষুধামান্দ্য হয়, আহার্য্য এবং পানীয় বস্তুতে বিতৃষ্ণা জন্মে, নাড়ী পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল ও বেগবতী হয়, এবং রোগীর সাধারণ সুস্থতা একবারে তিরোহিত হইয়া তাহার দাহবৃদ্ধি হয় ও সে ছট্ ফট্ করে এবং তাহার সমুদায় শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, কুইনাইনের অধিক মাত্রায় অর্থাৎ ৫ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ বা তাহারও অধিকমাত্রায় শরীরের উত্তাপহারক ক্রিয়া প্রকাশ করে, এজন্য অধিকমাত্রায় কুইনাইনপ্রয়োগে জ্বরের উত্তাপ কমিলেই যে, কুইনাইনের ব্যবহারে জ্বরে বিশেষ ফল পাওয়া গেল, তাহা বিবেচনা করা

উচিত নহে, কারণ ঐ উত্তাপ হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে অবসাদনক্রিয়াও প্রকাশ পায়, এবং রোগীর দুর্ব্বলতা এবং নাড়ীরও দুর্ব্বলতা ও বেগের আধিক্য হইয়া থাকে, পরন্তু শেষে ক্রমে রোগীর ঘর্ম্ম হইতে হইতে তাহার শরীরের দুর্ব্বলতা এবং নাড়ীর দুর্ব্বলতা ও বেগের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া তাহার মৃত্যুপর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

অতিরিক্ত মাত্রায় অর্থাৎ ৫ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ মাত্রায় অথবা তদতিরিক্ত মাত্রায় কুইনাইন উত্তাপহারক এবং অবসাদন ক্রিয়া প্রকাশ করে, ইহার মধ্যে সচরাচর উত্তাপহারক ক্রিয়ার জন্যই কুইনাইন প্রাদাহিক এবং অন্যান্য রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমি নিজে উত্তাপহারক ক্রিয়ার জন্য যদিও কখনও কুইনাইন ব্যবহার করিনাই, কিন্তু অনেক স্থলে উক্ত ক্রিয়ার জন্য কুইনাইনের বহুল ব্যবহার দেখিয়া ও অবগত হইয়া আমার যতদূর বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তাহাতে কুইনাইনের উত্তাপহারক ক্রিয়ার প্রতি আমার কিছুমাত্রও শ্রদ্ধা নাই। যেহেতু এই উত্তাপহারক ক্রিয়ার জন্য কুইনাইন প্রয়োগ করিয়া আমি অনেক স্থলেই বিশেষ অপকার দর্শিতে দেখিয়াছি। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, কুইনাইন নিউমোনিয়া, য়্যাকিউড বাত এবং কিউডিসোলাইল বা সন্‌ষ্ট্রোক্ (অর্থাৎ একপ্রকার সর্দ্দিগর্ম্মিতে) রোগে উত্তাপহারক ক্রিয়ার বিশেষ পরিচয় দেয়। কিন্তু আমি এই তিন রোগের মধ্যে কোন রোগেই কিছুমাত্র উপকার দর্শিতে দেখি নাই। তবে কুইনাইনের যে উত্তাপহারক ক্রিয়া আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পর্য্যায়জ্বরেই অনেক সময়ে কুইনাইন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এই পর্য্যায় জ্বরের বিরাম অবস্থায় সচরাচর কুইনাইন প্রযুক্ত হইলেও রোগীর এবং রোগের কতকগুলি অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কুইনাইন প্রয়োগ করিতে পারিলে বিশেষরূপ উপকার লাভের সম্ভাবনা। অনেকের ধারণা এই যে, সবিরাম জ্বরের যে কোন অবস্থায় কেন না হউক, অধিকমাত্রায় ও পুনঃ পুনঃ কুইনাইন প্রয়োগ করিতে পারিলেই তাহা দ্বারা বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, অর্থাৎ জ্বর বন্ধ হইতে পারে, পরন্তু তাঁহারা আরও বলেন যে, এরোগে সময় অসময় কিম্বা রোগ বা রোগীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কুইনাইন্ প্রয়োগ করার

আবশ্যক হয় না, কিন্তু আমি এরূপ মতের পক্ষপাতী নহি, আমারও বিশেষ ধারণা আছে যে, কুইনাইন্ সবিরাম জ্বরের একটী প্রধান ঔষধ। কিন্তু ইহা রোগীর ও রোগের অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবহার করা উচিত। যথা—

(১) সবিরামজ্বরে রোগীর সচরাচর দাস্ত পরিষ্কার এবং অন্য কোন উপসর্গ অর্থাৎ বিবমিষা, বমন, মস্তক ভারবোধ, ও উদরাধ্মান প্রভৃতি লক্ষণ না থাকিলে কুইনাইন ব্যবহার করা যাইতে পারে। পরন্তু সবিরাম জ্বরে উপরোক্ত চিহ্ন গুলির মধ্যে কোনটী বর্ত্তমান থাকিলে রোগীর জিহ্বা প্রায়ই সমল অর্থাৎ মলাযুক্ত দেখা গিয়া থাকে। তজ্জন্য একমাত্র সমল জিহ্বা দেখিলেও কুইনাইন ব্যবহার করিবেনা।

(২) সবিরাম জ্বরে জ্বর বিচ্ছেদের সময় যদি অল্প অল্প ঘর্ম্ম হইতে থাকে এবং ক্রমে উত্তাপের হ্রাস হয়, অথচ পূর্ব্বোক্ত উপসর্গ গুলির মধ্যে কোনটীও না থাকে, তাহা হইলে কুইনাইন্ ব্যবহার হইতে পারে।

(৩) সবিরাম জ্বরে যদি অতি ঘর্ম্ম হইতে থাকে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যদি নাড়ী দুর্ব্বল ও দ্রুতগতি হয়, কিংম্বা জ্বর বিচ্ছেদের কালে রোগী বিহ্বল বলিতে থাকে অথবা হিক্কা কিম্বা অধিক দাস্ত হইতে থাকে, তাহা হইলে অগ্রে এই সকল উপসর্গের শান্তি না করিয়া কুইনাইন্ ব্যবহার করা উচিত নহে। আর যদিও কখন নিতান্ত প্রয়োজন বোধ হয়, তাহা হইলে ৩ গ্রেণের অধিক মাত্রায় না হয়, এমতভাবে কুইনাইনের সহিত প্রচুর পরিমাণে স্থায়ী উত্তেজক ঔষধ মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা উচিত।

এতদ্ভিন্ন কোন্ কোন্ স্থানে কিরূপ অবস্থায় কুইনাইন প্রয়োগ করা উচিত বা অনুচিত, তাহা স্বল্পবিরাম ও সবিরাম প্রভৃতি জ্বর চিকিৎসার সময় বিশেষরূপে বিবৃত হইবেক।

বৈশাখ, ১২৯৪। } শ্রীজগদ্বন্ধু বসু, এম, ডি।

ড্রপ্সি বা শোথ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

শোথ রোগের বিষয় পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি এবং এখন যাহা বলিব তাহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য শরীরের রক্ত সঞ্চালনের বিষয়ে কিঞ্চিত জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যাঁহারা রীতিমত ডাক্তারি বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা বোধ করি আমার প্রবন্ধ বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। যাঁহাদের শরীরতত্ত্বে জ্ঞান নাই, তাঁহারা বোধ করি এখনও ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহাদেরই সুবিধার জন্য শরীরের রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া অতি সরল ভাবে বিবৃত করিলাম।

আমাদিগের দেহে দুই রকমের রক্তবহানাড়ী আছে। লালরক্তবাহী নাড়ী এবং কাল রক্ত বাহী নাড়ী। প্রথম প্রকারের নাড়ীকে ধমনী কহে। এবং শেষোক্ত প্রকারের নাড়ীকে শিরা বা ভেইন কহে। জ্বর হইলে যে চিকিৎসকেরা ধাত পরীক্ষা করেন ঐ ধাত হস্তের একটী ধমনী বিশেষ। আর তোমার বাহুর চর্ম্মের নীচে ও পেটের উপরে যে সকল কাল কাল শিরা দেখিতে পাও ঐ গুলি ভেইন। রোগা মানুষের গায়ে ঐ সকল শিরা বেশ ভাল করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ধমনী ও শিরা সমস্ত শরীরময় ব্যাপ্ত আছে। শরীরের সর্ব্বস্থানে রক্ত প্রেরণ জন্য আমাদিগের বুকের বাম দিকে একটী যন্ত্র আছে, উহাকে হৃদয় বা হার্ট কহে। বুকের বাম দিকে স্তনের উপর যে যন্ত্র সর্ব্বদা ধুক ধুক করিতেছে উহা ঐ হৃদয়। ক্ষীণ মাংসহীন শরীরে এই ধুক ধুক করা বেশ টের পাওয়া যায়। অনেকক্ষণ দৌড়াইলে যে বুক ধড় ফড় করে তাহাও ঐ হৃদয় যন্ত্রের কার্য্য। হৃদয় একটী সগহ্বর (ফাঁপা) মাংসপিণ্ড মাত্র। তোমার হাত মুষ্টিবদ্ধ করিলে যত বড় ও যেরূপ দেখায়, তোমার হৃদয় ও প্রায় তত বড় এবং দেখিতেও প্রায় সেইরূপ। ঐ হৃদয়ের গহ্বর প্রথমত দুই কোটরে বিভক্ত। দক্ষীণ ও বাম কোটর।

এই দুইটী কোটর পরস্পর পৃথক। তার পর আবার প্রত্যেক কোটর দুই দুই কোটরে বিভক্ত। বামদিকে দুইটী এবং দক্ষীণ দিকে দুইটী। দক্ষীণ দিকের দুইটী কুঠরীর নাম দক্ষীণ অরিকেল এবং দক্ষিণ ভেনিট্রকেল। এবং বাম দিকের দুইটী কুঠরির নাম বাম অরিকেল এবং বাম ভেনিট্রকেল। প্রত্যেক দিকের অরিকল ও ভেনিট্রকেল পরস্পর সংযুক্ত। ঐ সংযোগ স্থলে দ্বার এবং কপাট আছে। ঐ সকল কপাটের এমনিই বন্দোবস্ত যে অরিকেল হইতে ভেনিট্রকেলে রক্ত যাইতে পারে কিন্তু ভেনিট্রকেল হইতে অরিকেলে রক্ত আসিতে চেষ্টা করিলেই কপাট পশ্চাদ্দিক হইতে বন্ধ হইয়া যায়।

হৃদয় দেহস্থ রক্তের আধার বা গোডাউন স্বরূপ। হৃদয়ের বাম ভাগের বড় কোটরের (বাম ভেনিট্রকেল) শীর্ষ দেশ হইতে একটী মোটানল বুকের উপর দিকে উঠিয়াছে। ঐ নলটী শরীরের সমস্ত ধমনীর মূলস্বরূপ। উহা হইতে শাখা প্রশাখা বাহির হইয়া হাত পা মাথায় সমস্ত শরীরে ধমনী ব্যাপ্ত হইয়াছে। যেমন একটী বৃহৎনদী শাখা প্রশাখা বাহির করিয়া সমস্ত দেশে জল যোগাইতেছে, সেইরূপ হৃদয়ের ঐ বৃহৎ ধমনী শাখা প্রশাখা দ্বারা সমস্ত শরীরে রক্ত যোগাইতেছে। হৃদয় ঐ রক্তের পম্পিং এন্‌জিন স্বরূপ। যেমন বৌবাজারের জলের কল সমস্ত জলের নলের ভিতর সজোরে জল প্রেরণ করিতেছে; সেইরূপ হৃদয়ও সমস্ত ধমনীর ভিতর দিয়া সজোরে রক্ত চালাইয়া দিতেছে। হৃদয় ক্রমাগত কামারের জাঁতার ন্যায় সংকোচিত ও প্রসারিত হইতেছে। এবং ঐ সংকোচনের (চাপের) জোরে সমস্ত ধমনীর ভিতর রক্ত চলিতেছে।

হৃদয়ের এত জোর যে ঐ জোর সমস্ত বড় বড় ধমনীতে প্রতিফলিত হইতেছে। অর্থাৎ হৃদয়ের সংকোচন ও প্রসারণ ধমনীতেও টের পাওয়া যাইতেছে। আমাদিগের হাতের নাড়ী যে দপ্ দপ্ করিতেছে তাহা ঐ হৃদয়ের প্রতিক্রিয়া মাত্র। হৃদয় দমে দমে রক্ত প্রেরণ করিতেছে, সুতরাং ঐ দম বড় বড় ধমনীতেও লাগিতেছে। ধমনীর ভিতর যেন উপর্য্যুপরি রক্তের ঢেউ চলিতেছে। হৃদয় যত জোরে রক্ত চালায়, ধমনীর ভিতর তত জোরে রক্ত চলে। যখন রোগীর হাত ধরিয়া দেখিলে ধাত নাই। তখন

জানিলে হৃদয়ের ক্রিয়াও স্থগিত হইয়াছে। "ধাত দুর্ব্বল" হইয়াছে ইহার অর্থ এই যে, হৃদয়ের ক্রিয়াও দুর্ব্বল হইয়াছে।

ধমনী গুলি ক্রমাগত শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া ধীবরের জালের সুতার ন্যায় সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত হইয়াছে। অবশেষে তাহারা এত সূক্ষ্ম হইয়াছে যে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিরেকে আর তাহাদিগকে দেখা যায় না। এই খানেই ধমনীর শেষ হইল। তারপর দেখ ঐ সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাড়ী হইতে আবার আর এক জাতীয় নাড়ী আরম্ভ হইয়াছে। এই গুলি ভেইনের উৎপত্তি স্থান। তারপর ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেইন আশে পাশের অন্যান্য ভেইনের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমে ক্রমে মোটা ও বড় বড় কাল কাল শিরা হইয়াছে। এই সকল কাল শীরাও সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়াছে। যেমন গঙ্গানদী উৎপত্তি স্থলে দুই একটী ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত স্রোতঃস্বতী হইতে আরম্ভ হইয়া তার পর যমুনা প্রভৃতি নদীর সহিত মিলিত হইয়া প্রকাণ্ড পদ্মা হইয়া সমুদ্রে পড়িতেছে, সেইরূপ শরীরের সমস্ত ভেইন সকল পরস্পর মিলিত হইয়া দুইটী মাত্র প্রকাণ্ড ভেইন হইয়া হৃদয়ের দক্ষীণ ধারে দক্ষীণ অরিকেলে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। শরীরের নিম্নার্দ্ধের ভেইন সকল মিলিত হইয়া "ইন্‌ফি-রিয়র ভিনাকেভা" নাম ধারণ করিয়াছ। আর শরীরের উপরার্দ্ধের (অর্থাৎ মাথার ও হাতের) ভেইন সকল মিলিত হইয়া "সুপিরিয়র ভিনাকেভা" নাম ধারণ করিয়াছে। এখন আরও একটু ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে, যে ধমনী উৎপত্তিস্থলে (হৃদয় হইতে) মোটা হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে শাখা প্রশাখা বাহির করিয়া সূক্ষ্ম হইয়াছে। কিন্তু ভেইন সকল উৎপত্তিস্থলে সূক্ষ্ম হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে নানা শাখা প্রশাখার সহিত যুক্ত হইয়া ক্রমে মিলন স্থলে আসিয়া মোটা ও বড় হইয়াছে। ধমনীর উৎপত্তিস্থল হৃদয় কিন্তু ভেইনের মিলন স্থল হৃদয়। শরীরের যে কোন স্থান হইতেই ভেইন উৎপন্ন হইয়াছে। হৃদয়ের দক্ষীণ ভাগ ভেইনের অংশ এবং হৃদয়ের বাম ভাগ ধমনীর অংশ। হৃদয়ের বামদিকে ধমনীর রক্তের ন্যায় লাল রক্ত থাকে কিন্তু দক্ষীণ দিকে ভেইনের রক্তের ন্যায় কালরক্ত থাকে।

রক্তই শরীরের পোষণ করে। রক্ত ধমনীর ভিতর ভ্রমণ করিতে করিতে উহার বিশুদ্ধতা গুণ ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। এবং শরীরের

নানা ধ্বংশ প্রাপ্ত পদার্থ (আবর্জ্জনা) উহার সহিত মিশ্রিত হওয়াতে উহা ক্রমে কালবর্ণের হইয়া উঠে। এই রক্ত আবার বিশুদ্ধ হইবার নিমিত্ত ভেইন সকল দিয়া পুনর্ব্বার হৃদয়ে ফিরিয়া আসে। যেমন ধমনীগণ হৃদয়ের লালরক্ত সমস্ত শরীরে লইয়া যাইতেছে সেইরূপ ভেইন সকল দেহস্থ কাল অপরিস্কৃত রক্ত হৃদয়ে আনয়ন করিতেছে। ঐ দেহস্থ কাল রক্ত বরাবর ভেইন দিয়া হৃদয়ের দক্ষীণ অরিকেলে আশিয়া জমিতেছে তথা হইতে দক্ষীণ ভেনিট্রকেলে গিয়া তার পর ফুষফুষে গমন করিতেছে। ঐ ফুষফুষে থাকিয়া রক্ত নিশ্বাসের বাতাস দ্বারা ক্রমে বিশুদ্ধ ও পুনর্ব্বার লাল হইয়া প্রথমত বাম অরিকেল ও তথা হইতে বাম ভেনিট্রকেলে আসিয়া জমিতেছে। তারপর আবার ধমনী বাহিয়া শরীরের সর্ব্বস্থানে গমন করিতেছে।

হৃদয়ের যে সংকোচনের বলে ধমনীর ভিতর দিয়া রক্ত প্রবাহিত হইতেছে সেই সংকোচনের বলেই আবার ভেইনের ভিতর দিয়া চালিত হইতেছে। ভেইনের ভিতর দিয়া কিন্তু বেশী জোরে রক্তের গতি হয় না, এই জন্য ভেইনগণ ধমনীর ন্যায় দিপ্ দিপ্ করে না। এই ঘটনার প্রকৃত কারণ বুঝা নিতান্ত কঠিন নহে। মনে কর একটী ধমনী (যেমন হাতের) ক্রমে ক্রমে হাতের চেট পর্য্যন্ত আসিয়া অতি সূক্ষ্ম সুক্ষ্ম শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এখন রক্তও হস্তের ধমনী বাহিয়া সজোরে প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু যে স্থলে ধমনী নানা শাখায় বিভক্ত হইয়াছে ঐ স্থলে মূল ধমনীর ভিতরকার রক্তের প্রবাহও বিভক্ত হইয়াছে সুতরাং ঐ স্থলে একেবারেই রক্ত প্রবাহের বেগ থামিয়া গিয়াছে। তার পর আবার ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-ধমনীর প্রান্ত হইতে ভেইন সকল আরম্ভ হইয়াছে। এবং ধমনী শাখার রক্ত ঐ ভেইন সকলের ভিতর যাইতেছে। সুতরাং ভেইনের ভিতর আর রক্তের প্রবাহের তত তেজ নাই। যেন আশু আশু চোঁয়াইয়া যাইতেছে। একটী ভেইন কাটিয়া গেলে টোপে টোপে রক্ত নির্গত হয় কিন্তু একটী ধমনী কাটিয়া গেলে সজোরে দমে দমে ছিট করিয়া রক্ত নির্গত হয়। ধমনী কোন রকমে ছিড়িয়া গেলে সজোরে রক্ত নির্গত হইয়া মানুষ মারা পড়িতে পারে এজন্য ধমনী গুলি অনেক মাংসের নীচে লুক্কায়িত রহিয়াছে। কিন্তু ভেইন ছিঁড়িয়া গেলে তত জোরে রক্ত পড়ে না এজন্য অনেক ভেইন শরীরের চর্ম্মের

অব্যবহিত নীচে দিয়াই চলিয়াছে। যে যন্ত্র শরীরের পক্ষে যত প্রয়োজন, যাহার সহিত জীবগণের জীবন মরণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, তাহা অতি যত্নে দেহের অভ্যন্তরে রক্ষিত হইয়াছে। ক্রমশঃ—

শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম, বি,

আয়ুর্ব্বেদে শোথরোগ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শোথ নিজে একটী স্বতন্ত্র রোগ হইলেও জ্বর-প্রভৃতি নানাবিধ রোগের উপসর্গ রূপেও ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব এখন দেখা যাউক, সাধারণতঃ কোন্ কোন্ রোগের কোন্ কোন্ অবস্থায় কি রূপভাবে শোথ জন্মিতে পারে।

(১) জ্বর রোগের নূতন বিশেষতঃ পুরাতন অবস্থায় যে অধিকাংশ লোকেরই শোথ জন্মিয়া থাকে, ইহা প্রায় চিকিৎসকমাত্রেই বেশ ভালরূপে অবগত আছেন। তন্মধ্যে নূতন জ্বরের অবস্থায় এই রোগ উৎপন্ন হইতে খুব্ কম দেখা যায়। বিশেষতঃ নূতন জ্বরে সুচিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে থাকিলে তাহার ত কোন রূপেই শোথ জন্মিতে পারে না। তবে অবশ্য স্থল-বিশেষে দেখা গিয়াছে যে, একেবারে কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত কোন কোন বৈদ্য নূতন জ্বরের নিতান্ত আমাস্থায় রোগীকে বিষাক্ত ঔষধ প্রদান করায় রোগী ভয়ানক ফুলিয়া পড়ে এবং অবশেষে তাহাতেই তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। কিন্তু এরূপ ঘটনা খুব বিরল। যেহেতু আমাদের দেশে নূতনজ্বরে অদ্যাপিও বিষ প্রয়োগের নিয়ম প্রচলিত থাকিলেও সর্ব্বত্রই যে রোগী বিষ পান করিয়া তৎক্ষণাৎ বা ২।১ দিনের মধ্যে ফুলিয়া পড়িবে এমন কোন কথা নাই। তবে একথা নিশ্চিত যে, বিষ প্রয়োগ দ্বারা রোগীর জ্বর সারার পর যখন সে ক্রমাগত শীতল দ্রব্যাদি ব্যবহার করে, তখন কিন্তু সেই অবস্থাতে

অনেকেরই শোথ জন্মিতে দেখা গিয়া থাকে। ফলতঃ নূতন জ্বরাবস্থায় চিকিৎসক বা রোগীর দোষে যাহাও কচিৎ ২।১ জনের শোথ জন্মিতে পারে, তাহা আর ধর্ত্তব্যের সুতরাং আলোচ্যেরও মধ্যে নহে"।

পুরাতন জ্বরের পরিণামে যে সমস্ত শোথ জন্মে, তাহার কারণ সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে বেশ স্পষ্টই প্রতীতি হইবেক যে, উক্ত রোগী জ্বরাবস্থায় নিশ্চয়ই বিশেষ কোন কুপথ্য করিয়াছে।" স্থল বিশেষে এই কুপথ্যের পরিমাণ এত লঘু হয় যে, তাহা কুপথ্য বলিয়া রোগী বা চিকিৎসক এই উভয়েরই ধারণা করা ভার; কেন হয় না তাহা বলি, ১৫।১৬ বৎসরের একটী বালকের বহুদিনের জীর্ণজ্বরে শরীর একেবারে অস্থিচর্ম্মসার হইয়া যায়। এ অবস্থায় আমি তাহার চিকিৎসা করি। কিন্তু ৫।৭ দিন ঔষধ দেওয়ার পর সে হটাৎ এক দিন খুব ফুলিয়া-উঠিল। বলাবাহুল্য যে ইতি পূর্ব্বে সে আর কখনও ফুলে নাই। আমি হটাৎ তাহার এই ফুলা দেখিয়া ইহার কিছুমাত্র কারণ স্থির করিতে পারিলাম না। রোগী ও রোগীর অবিভাবককে কত জিজ্ঞাসা করিলাম কিন্তু কিছুতেই ইহার কারণ স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। রোগী প্রথম হইতে যেমন স্নান বন্ধ করিয়া একবেলা ভাত ও রাত্রে দুগ্ধ বার্লি প্রভৃতি খাইয়া আসিতেছিল, এখনও ঠিক্ সেই নিয়মেই সে চলিতে ছিল, অথচ ৩।৪ দিন বা ৫।৭ দিন অন্তর তাহার এরূপ হওয়ার কারণ কি স্থির করিতে না পারিয়া কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। প্রথম ভাবিলাম যে রোগী হয়ত কাঁচা জল বা ঠাণ্ডা দুগ্ধ খায় এজন্য এইরূপ ফুলে, কিন্তু যখন শুনিলাম যে ২।৩ মাস হইতে সে এইরূপ জল ও দুগ্ধ খাইয়া আসিতেছে, তখন আর সে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। যাহাহউক, পরিশেষে সেই রোগী দ্বারাই স্থির হইল যে, যে দিন সে কিছু পিপাসাতুর হইয়া কলসীস্থ অতিঠাণ্ডা জল কিছু অধিক পান করিয়া থাকে, তাহার পর দিনেই সে ফুলিয়া পড়ে, কাজেই দেখা যাইতেছে যে এতদূর সূক্ষ্ম কারণ হইতেও যখন পুরাতন জ্বরে শোথ জন্মিতে পারে, তখন নানাকারণেই যে এ অবস্থায় শোথ জন্মিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? তদ্ভিন্ন এ অবস্থায় শোথ জন্মিবার প্রধান প্রধান কারণ গুলির আর উল্লেখ না করিলেই চলে। যথা—পুরাতন জ্বরে নিতান্ত জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় রোগী হটাৎ একদিন স্নান করিলে বা বিশেষ কোন ঠাণ্ডা লাগিলে অমনি তাহার পর দিন সে ফুলিয়া

উঠিল। অথবা অম্ল ও মিষ্টাদি ঠাণ্ডাদ্রব্য সেবনেও অনেক সময়ে এরূপ শোথ জন্মিতে পারে। তাহা ছাড়া এরোগে রোগীর দাস্ত বন্ধ বা খোলসা না হওয়াতেও শোথ জন্মে। ফল কথা এ অবস্থায় যে কোন কারণে রোগীর শরীরে অপক্ক রসের বৃদ্ধি পাইলেই শোথ জন্মিয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, এ অবস্থায় যে কোন উপায়ে হউক, সেই অপক্ক রসের শান্তি করিতে পারিলেই শোথের শান্তি হইতে পারে। অতএব সে কথা পরে বলিব।

(৭২) অতীসার, গ্রহণী, অর্শ, অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণ ও ক্রিমিপ্রভৃতি রোগের উপসর্গরূপেও অনেক সময়ে শোথ উৎপন্ন হইতে পারে। তন্মধ্যে গ্রহণী রোগের পরিণামে যে প্রায়শই শোথ জন্মে ইহা সকলেই অবগত আছেন। যাহাহউক, এ গুলির সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ বলিতেছি। অতীসারের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ যখন রোগীর অত্যন্ত দাস্ত হইতে থাকে, তখন সে অবস্থায় শোথ জন্মিতে পারে না, কিন্তু এমন দেখা গিয়াছে যে, অনভিজ্ঞ চিকিৎসক কর্ত্তৃক অহিফেণাদি ধারক ঔষধ প্রয়োগে রোগীর অপক্কমল বা আমরস রুদ্ধ হইয়া ভয়ানক শোথ জন্মিয়াছে। কিন্তু এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটিতে দেখা যায় না। তবে ধারক ঔষধ প্রয়োগে রোগীর অপক্ক মল রোধ করিলে শোথ জন্মিবার সম্ভাবনা বটে। পুরাতন গ্রহণী রোগে অধিকাংশ লোকেরই বিশেষতঃ বৃদ্ধ ব্যক্তির প্রায়ই উপসর্গরূপে শোথ জন্মিতে দেখা যায়। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, অনেক স্থলে কুপথ্যই এরূপ শোথের কারণ হইয়া থাকে। কেননা এরূপ দেখিয়াছি যে, কোন কোন পুরাতন গ্রহণী রোগী যখন একটু সুমৎস্যের ঝোলের সহিত খুব পুরাতন চাউলের ভাত খায়, তখন তাহার শোথাদি কোন উপসর্গই থাকে না, কিন্তু যে দিন সে কোনরূপ গুরুপাকী আহারাদি করে, তাহার পর দিনেই হয় তাহার ভয়ানকরূপে দাস্ত হইতে থাকিবেক, নচেৎ দাস্ত একবারে বন্ধ থাকিয়া তাহার শোথ উৎপন্ন হইবেক। যাহা হউক, এসব কথা শোথের চিকিৎসার সময় বিস্তৃতরূপে বলিব।

অর্শ রোগের সকল অবস্থায় যে শোথ জন্মে তাহা নহে। তবে যে সমস্ত অর্শরোগে অত্যন্ত রক্তস্রাব হয়, সময় বিশেষে ঔষধ দ্বারাই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, সেই রক্তের স্রাব বন্ধ হইলে সে অবস্থায় শোথ

জন্মিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আমি এমন দেখিয়াছি যে, একটী অর্শরোগীর অত্যন্ত রক্তস্রাব হইতে থাকায় তিনি আমার চিকিৎসাধীনে আসেন, আমার ইচ্ছা ছিল যে, আমি ক্রমে ক্রমে তাঁহার সেই রক্তপড়া নিবারণ করিব, কিন্তু পরিশেষে ৫। ৭ দিনের মধ্যেই রোগী এত অধিক ব্যস্ত হইয়া উঠেন যে, তিনি আমার বিনা অনুমতিতেই সেই আমাদের রক্তরোধক ঔষধ প্রত্যহ ৩।৪ গুণ অধিক মাত্রায় ভক্ষণ করেন। বলা বাহুল্য যে, এইরূপ করার ২। ৩ দিনের মধ্যে যদিও তাঁহার রক্তপড়া নিবারণ হইল বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনতিবিলম্বেই তিনি এত ভয়ানক ফুলিয়া পড়িলেন যে, শেষে তাঁহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করিতে অন্ততঃ ২ মাস কাল অতীত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন অগ্নিমান্দ্য ও ক্রিমিরোগেও উপসর্গরূপে শোথ জন্মিতে পারে। কিন্তু এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটে না। ফলতঃ এক শোথরোগ যে কতরকমে কতকত রোগের উপসর্গরূপে জন্মিতে পারে এবং তাহার চিকিৎসাই বা কি, তাহা ক্রমশঃ বলিবার ইচ্ছা রহিল ক্রমশঃ—

মদ্যপান—জনিত রোগ।

হোমিওপ্যাথি মতে।

(১) অতিরিক্ত মাত্রায় এবং অধিক দিন পর্য্যন্ত মদ্যপান করিলে সাধারণতঃ যকৃতে প্রদাহ উপস্থিত হইয়া পূঁজে পরিণত হইতে পারে। এবং কখন কখন বা এই যকৃৎ শুষ্ক হইয়া কমিয়া যাইতেও দেখা গিয়া থাকে। মদ্যপানজনিত রোগের মধ্যে এই দুইটীই প্রধান রোগ। এবং আমাদের দেশের অধিকাংশ ধনী লোক এই রোগে পীড়িত হইয়া থাকে। কিন্তু ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের লোকে অতিরিক্ত মাত্রায় এবং বহুকাল পর্য্যন্ত মদ্যপান করিলেও সে দেশ অত্যন্ত শীতপ্রধান বলিয়া আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয় লোকের ন্যায় তাহাদের ইহা দ্বারা এত অধিক অপকার ঘটিতে পারে না।

২। তদ্ভিন্ন অতিরিক্ত মদ্যপান ও অধিক দিন পর্য্যন্ত মদ্যপানে বৃক্ককে প্রদাহ জন্মিয়া রিন্যাল কলিক অর্থাৎ বৃক্ককসম্বন্ধীয় শূল উপস্থিত হইতে পারে। আর সে বেদনা এত কষ্টকর যে, রোগী যে কেবল অস্থির হইয়া পড়ে তাহা নহে। ইহাতে তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত হইতে পারে।

৩। তাহা ছাড়া অতিরিক্ত ও বহুকাল পর্য্যন্ত মদ্যপানে সপ্‌নিং অব্‌দীব্রেণ অর্থাৎ মস্তিষ্কের স্বাভাবিক গুটীর কাঠিণ্যের বৈলক্ষণ্য ঘটে। এরূপ অবস্থা ঘটিলে বুদ্ধিভ্রংশ, স্মরণশক্তির অভাব, মস্তক-কম্পন, সর্ব্বশরীর কম্পন, এবং সমস্ত স্বাভাবিক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটে।

৪। ইহা ছাড়া অতিরিক্ত মাত্রায় ও বহুকাল পর্য্যন্ত মদ্যপায়ী ব্যক্তির শরীরের বিবর্ণতা, হৃৎকম্প, বিশেষতঃ তাহার মুখমণ্ডলীর এবং নাসিকার অগ্রভাগ গাঢ় রক্তিমাবর্ণ হইয়া থাকে।

৫। পরন্তু অধিক মাত্রায় ও অধিক দিবস পর্য্যন্ত মদ্যপান করিলে পরিপাক যন্ত্রের এত বিশৃঙ্খলতা ঘটে যে, কেবল পরিপাক শক্তিরই হানি হয়, তাহা নহে; পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পুরাতন প্রদাহ উপস্থিত হইয়া শূল, উদরাময়, আমাশয়, রক্তামশায় রোগ জন্মে।

সচরাচর আমাদের দেশের অনেকের বিশ্বাস যে, মদ্যপানে যে কেবল পরিপাক শক্তিরই বৃদ্ধি হয় তাহা নহে, উহাদ্বারা বল, বর্ণ, বুদ্ধি ও স্মৃতি-শক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু এবিশ্বাস যে কতদূর ভ্রান্তিমূলক, তাহা বলা বাহুল্য। যেহেতু পরিপাক শক্তি শব্দের অর্থ খাদ্যদ্রব্যকে দ্রব করিয়া রস, রক্ত ও মলাদিতে পরিণত করা। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মেডিক্যাল কলেজ মিউজিয়মে মৃত্যুদেহ অর্থাৎ ছোট ছোট মৃত বালক বালিকাদিগকে যে বোতলের ভিতর স্প্রিটে ডুবাইয়া রাখা হয়, তাহা হইলে ত উঁহা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দ্রব হইয়া লয় প্রাপ্ত হইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু যেরূপ অবস্থায় ডোবান হয়, সেই অবস্থার কোন বৈলক্ষণ্য ঘটেনা। এবং স্পিরিটের যে কার্য্য, তাহার শরীরের উপর তাহা কিছু মাত্র লক্ষিত হয় না। আর বল, বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি যাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইল। তাহাদের বৃদ্ধি প্রথমাবস্থায় কিছু ঘটে সত্য, কিন্তু যখন এই মস্তিষ্ক ও বৃক্কক্ যন্ত্রাদি পুরাতন প্রদাহে পরিণত হয়। তখন আর বুদ্ধি শক্তি প্রভৃতির

বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক্, বরং ক্রমে উহাদের হ্রাসতাই দেখিতে পাওয়া যায়। আমার বোধ হয় যে, মদ্য, পাকস্থালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে অস্বাভাবিক উত্তেজনা উদ্ভূত করতঃ উহার পরিপাক রস নিঃসারক গ্রন্থি সকলকে প্রভূতপরিমাণে পরিপাক রস নিঃসৃত করায়। এবং পরিপাক শক্তি প্রথমাবস্থায় কিছু পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় বটে, কিন্তু ঐ অস্বাভাবিক কার্য্যনিবন্ধন উক্ত গ্রন্থি সকল ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং তাহাদের কার্য্যকারিতা অবশেষে একবারে লয় প্রাপ্ত হয়।

তদ্ভিন্ন মদ্যপানে যে রতিশক্তি আশুপ্রবল হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই প্রবলতার সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গনিবন্ধন এই শক্তির এতহ্রাস হইয়া পড়ে যে, শেষে পুরুষত্ব একবারে রহিত হইয়া যায়।

এতদ্ভিন্ন মদ্যপান যে বন্ধ্যাত্বের একটী বিশেষ কারণ, বেশ্যাবা তাহার একটী জলন্ত প্রমাণ। গ্রন্থকারগণ এইরূপ বলিয়াছেন যে, মদ্যপায়ীরা সাধারণতঃ প্রায়ই বন্ধ্যা।

তাহা ছাড়া তরলপ্রকৃতি বিশিষ্ট পুরুষেরা অতিরিক্ত মদ্যপান করিলে তাহাদের মদ্যোন্মত্ততা জন্মিয়া থাকে। এরূপ অবস্থা ঘটিলে রোগী সাধারণতঃ প্রায়ই আরোগ্যলাভ করে, কিন্তু কোন কোন স্থলে বা এই অবস্থা হইতে মৃত্যুপর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। তদ্ভিন্ন মদ্যপান করিলে ব্যক্তি বিশেষের বাতরোগ, চক্ষুরোগ, ও জিহ্বায় প্রদাহ প্রভৃতি অনেক গুলি রোগ জন্মিতে পারে।

ক্রমশঃ——

১২৯৩। জৈষ্ঠ,
কলিকাতা।

শ্রীহরনাথ রায় এল, এম্ এস
হোমিওপ্যাথিক প্রাক্টীসনার।

আয়ুর্ব্বেদে মদ্যতত্ত্ব।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

বর্ত্তমান সময়ে বিদেশীয় মদ্যতত্ত্ব আলোচনা করিয়া—ব্রাণ্ডী, রম, হুইস্কি বীয়ার প্রভৃতি মদ্যের অমৃতময় নাম গুলির স্মরণমাত্রেই মদ্যপায়ী যেমন

আনন্দে গদ গদ হন্, তাঁহাদেরই কর্ণকুহরের তৃপ্তি সম্পাদনার্থ বলা আবশ্যক যে, সে কালে এ হতভাগ্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও এইরূপ সুরা, অরিষ্ট ও আসব প্রভৃতি নানা শ্রেণীর মদ্য অতি প্রচুর রূপে প্রচলিত ছিল, নমুনা-স্বরূপ আজ একটী অরিষ্টের বিষয় নিম্নে লিখিত হইল।

দ্রাক্ষারিষ্ট।

দ্রাক্ষারিষ্টের অর্থ—কিস্‌মিস্ দ্বারা প্রস্তুত মদ্যবিশেষ। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে উৎকৃষ্ট বড় বড় কিস্‌মিস্ /৬।০ সছয়শের লইয়া পূর্ব্বদিবস রাত্রে কিছু জলের সহিত ভিজাইয়া রাখ, পর দিন সকালে ঐ কিস্‌মিস্ ১২৮ শের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ৩২ শের শেষ থাকিতে নামাইবে। পরে উহার সহিত ২৫সের ইক্ষুগুড় উত্তমরূপে গুলিয়া পরে দারুচিনি, ছোটএলাচ, তেজপাতা, নাগেশ্বরফুল, প্রিয়ঙ্গু, মরিচ, পিপুল ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক দ্রব্য ৮আটতোলা ওজনে লইয়া এই সমস্ত দ্রব্য ভালরূপে থেঁতো করিয়া উহার সহিত একত্রে মিশ্রিত করিবে। অনন্তর উক্ত সমস্ত দ্রব্য একটী বড় জালার মধ্যে ভরিয়া সেই জালার মুখে একখানি শরা ও তদুপরি নেকড়া ও কাদা-দ্বারা লেপিয়া উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে। মুখটী এমতভাবে বন্ধ করা চাই যে, যেন কোনরূপে উহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। এইরূপে ঠিক একমাস কাল রাখিয়া দিবে। ঠিক্ একমাস পরে শরা খুলিয়া দেখ জালার মধ্যে পরিস্কার অরুণাভ অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়াছে। অনন্তর উহা উত্তমরূপে ছাকিয়া বোতলে করিয়া রাখিয়া দাও। কিন্তু ছাকাটী এখনকার বুটাং কাগজ দ্বারা যেমন সুন্দররূপ হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। যাহা হউক, অরিষ্ট মাত্রানুসারে অর্থাৎ অৰ্দ্ধছটাক, একছটাক, অৰ্দ্ধপুয়া অথবা একপুয়া কিংম্বা তদরিক্ত মাত্রায় সেবন করিলে ইহাতে অশেষরূপ উপকার পাওয়া যায়। যদিও আয়ুর্ব্বেদ মতে এই অরিষ্ট দ্বারা যক্ষ্মা অর্থাৎ ক্ষয়কাস, সাধারণ কাস, সর্দ্দি এবং শ্বাস অর্থাৎ হাঁপানী প্রভৃতি রোগের শান্তি ও বল-বৃদ্ধি এবং দাস্তপরিস্কার হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে; কিন্তু আমরা সচরাচর ইহার ব্যবহার দ্বারা তদপেক্ষা অধিক গুণের পরিচয় পাইয়া থাকি, যথা—অজীর্ণদোষ, দমকাভেদ, অক্ষুধা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতিতে বিশেষ উপকার

দর্শে। তদ্ভিন্ন ইহা সেবনে মদ্যপান জনিত যে আনন্দ অর্থাৎ নেশা উপস্থিত হওয়া, বলাবাহুল্য যে, সে মজাও ইহাতে বিলক্ষণ রূপ আছে, তবে অবশ্য ইহার পান দ্বারা ঢলাঢলি পর্য্যন্ত ঘটে না। ফলতঃ যাঁহারা নিয়ত বিদেশীয় বীয়ার প্রভৃতি মৃদুবীর্য্য মদ্যপান করিয়া অপার আনন্দের উপভোগ এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থেরও শ্রাদ্ধ করেন, আমাদের বিবেচনায় তাঁহারা এই দেশীয় অরিষ্ট পান করিয়াও তদ্রূপ সুখী হইতে পারেন। লাভের মধ্যে অর্থব্যয়ের হাত হইতে পরিত্রাণ পান।

দ্রাক্ষারিষ্ট সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, উপরে এই ঔষধে গুড়ের যে পরিমাণ লিখিত আছে অর্থাৎ উহাতে ২৫শের গুড়দিলে উহা অত্যন্ত মিষ্টা-স্বাদ হয় এবং পান করিতেও কিছু কষ্ট বোধ হয়। এজন্য আমরা সচরাচর উহাতে গুড়ের মাত্রা ১০।১২ অথবা ১৫শের পর্য্যন্ত দিয়া থাকি। আরও এক কথা এই যে, উপরে সমস্ত দ্রব্যের যে মাত্রা লিখিত হইল, ইচ্ছা করিলে উহার অর্দ্ধমাত্রা, সিকিমাত্রা অথবা দুই আনা মাত্রাতেও এই ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে। ক্রমশঃ—

চক্ষুরোগ

অপরাপর রোগের সহিত চক্ষু রোগের সম্বন্ধ।

৩য় খণ্ড ৩৮৩ পৃষ্ঠার পর।

পরিপাকবিশৃঙ্খলা ঘটিয়া যেরূপ শারীরিক ও মানসিক কতপ্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটে, তদ্রূপ চক্ষুতেও তদ্দ্বারা কঞ্জংটিভাইটিস, মাইড্রিয়েসিস, মাইওসিস, কোর-ইডে রক্তাধিক্য এম্বি‌ওপিয়া, কোরইডাইটিস, গ্লকোমা, রেটিনায় রক্তাধিক্য, রেটিনাইটিস, টার্সাল অফথাল্মিয়া, ব্লেফারস্পাজম, হেমিওপিয়া, ডিপ্লোপিয়া, এবং ষ্ট্রাবিস্মস প্রভৃতি রোগ জন্মিতেও দেখা যায়; সুতরাং চাক্ষুষ এই সমস্ত রোগ চিকিৎসা করিবার সময়ে প্রত্যেক চিকিৎসককে তত্তৎ রোগের আদি-কারণ পরিপাকবিশৃঙ্খলা রোগেরই চিকিৎসা করিতে হয়। এই পরিপাক

বিশৃঙ্খলায় আবার কোষ্টবদ্ধ রোগ জন্মিয়া চক্ষুতে ইকাইমোসিস এবং মাইওসিস প্রভৃতি রোগ জন্মে। আশুপ্রাণনাশক অতি ভয়ানক ওলাউঠা রোগের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়াও অনেকে চক্ষুতে সপিউরেটিভ কেরাটাইটিস অথবা রেটিনাইটিস প্রভৃতি অতি ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হয়েন। বহুমূত্র রোগে—ক্যাটারাক্ট, আইরাইটিস, রেটিনাইটিস, নিউ-রেটিনাইটিস; রেটিনা হইতের রক্তস্রাব, সপিউরেটিভ কেরাটাইটিস সিক্লাইটিস, এবং য়্যামোরোসিস প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে। বাতরোগে—আইরাইটিস, সিক্লাইটিস, মাইড্রেসিস, ইপিস্ক্লারাইটিস, গ্লকোমা, ষ্ট্রাবিস্‌মস্, ডিপ্লোপিয়া, ব্লেফারোস্পাজামস, আইরিডো-কোরইডাইটিস, কেরিজ, ল্যাগ্‌ফ্‌থাল্‌মস এবং য়্যাম্লিওপিয়া, রেটিনাইটিস এবং চক্ষুর অভ্যন্তরে রক্তস্রাব প্রভৃতি রোগ জন্মে। উদারাময়ে—ক্যাটারাক্ট এবং য়্যাম্বিওপিয়া এবং রক্তামাশয়ে—ক্যাটারাক্ট রোগও জন্মে। যকৃতের পীড়ায়—চক্ষুতে কোরইডাইটিস্, গ্লকোমা, রেটিনায় রক্তাধিক্য, রেটিনাইটিস য়্যাপোপ্লেকটিকা এবং য়্যাম্লিওপিয়া প্রভৃতি রোগ ব্যতীত ন্যাবা ও রাতকাণা প্রভৃতি রোগও জন্মে। প্লীহা রোগে—য়্যাম্লিওপিয়া রোগ ঘটিয়া চক্ষুর বিলক্ষণ দৃষ্টিহানি হয়। এদিকে রক্তপড়া অর্শ রোগে হঠাৎ এক চক্ষুর দৃষ্টিনাশ এবং গ্লকোমা প্রভৃতি রোগ জন্মিতে দেখা গিয়াছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, পরিপাক-বিশৃঙ্খলা রোগ ঘটিয়া প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ উপায়ে চক্ষুতে উপর্য্যুক্ত সমস্ত রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্রমশঃ—

কলিকাতা। } ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণহরি ভট্টাচার্য্য।

ওলাউঠা চিকিৎসা।

হোমিওপ্যাথি মতে।

(ডাক্তার সরকারের পুস্তক হইতে)

বমন দ্বারা যখন পাকাশয়ের প্রদাহিক অবস্থা প্রকাশ পায়, তখন এইরূপ চিকিৎসা অবলম্বন করা উচিত।

স্পষ্ট প্রতিক্রিয়ার পর উদরাময় ঘটিলে প্রায় সাংঘাতিক হয় না। আমাদের বিবেচনায় যাবৎ মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়া স্থাপিত না হয়, তাবৎ ঈষৎ উদরাময় থাকাতে উপকার আছে। তন্নিমিত্ত যত ক্ষণ প্রস্রাব না হয়, পীড়ার প্রবলতা উপশম হইবার পর, যে কোন উদরাময় উপস্থিত থাকে, তাহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইবার আবশ্যক করে না; যেহেতু, ঐ উদরাময় তখন সচরাচর ঐ প্রস্রাবের পরিবর্ত্তে হইতে থাকে।

যাহা হউক, প্রস্রাব হইবার পূর্ব্বেই হউক অথবা প্রস্রাব হইবার পরেই হউক, যদি উদরাময় থাকে, এবং সেই উদরাময় নিবন্ধন যদি নাড়ী ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে তাহা নিবারণ করিবার জন্য অবশ্য যত্ন করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত স্থলে পীড়ার পূর্ণ প্রাদুর্ভূত অবস্থায় যে সকল ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল, পুনর্ব্বার সেই সকল ঔষধ উচ্চক্রমে দিলে উপকার হইতে পারে। ইহাতে যদি কোন প্রতিকার না হয়, তাহা হইলে আর সময় নষ্ট না করিয়া, যে সকল ঔষধে মূত্রাশোষণ হয়, এককালে তাহাই ব্যবস্থা করা উচিত; এবং এই মুত্রাশোষণ সহিত যখন ঐ উদরাময় আপনা হইতে নিবারণ হইবে তখন তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে।

প্রস্রাব হইবার পর উদরাময় থাকিলে ফস্ফরিক-এসিড, চাইনা, ফেরম্ এবং পোডোফিলম্ ব্যবস্থার্হ। যখন অত্যধিক পিত্তের সঞ্চয় নিবন্ধন, অর্থাৎ যখন যকৃতে অত্যন্ত উত্তেজনা বশতঃ ভেদ হয়, তখন পোডোফিল্ম দেওয়া উচিত। ফস্ফরিক-এসিড, চাইনা ও ফেরম সমন্ধে কোন বিশেষ নির্দ্দেশ হইতে পারে না। একটীতে কোন উপকার না হইলে অপর দুইটীর এক একটীকে প্রয়োগ করিতে পারা যায়। প্রথমতঃ সর্ব্বদা ফস্ফরিক-এসিডই দেওয়া হয়। উপরিউক্ত ঔষধগুলি প্রায় নিস্ফল হয় না। যদি কখন হয় তাহা হইলে গ্যালিকাসিড ট্যানিকাসিড, এসিটেট-অব-লেড, চাক প্রভৃতি ধারক ঔষধ সকল এবং অহিফেনাদি করিয়া ব্যবস্থা করিতে নিবৃত্ত হইবে না।

আধ্মান একটী অত্যন্ত কষ্টদায়ক রোগ, যদি নিবারণ করা না যায়, তাহা হইলে উদর-বক্ষ ব্যবধান-পেশীর ক্রিয়া-ব্যাঘাত করত অত্যন্ত সাংঘাতিক

হইয়া উঠে। বায়ুতে অন্নাধার নাড়ীর সমস্ত বা কিয়দংশ স্ফীত হইলে তাহাকে আধ্মান বলে। পৈশিক আবরণের হীনবীর্য্য ও দূষিত বা বিকৃত আশোষণ নিবন্ধন আধেয় সকল বিশ্লিষ্ট হইয়া অন্ত্রনালিতে এই বায়ুর উৎপত্তি হয়, অথবা অন্ত্রনালীর প্রাচীর (গাত্র) হইতেও এই বায়ু আশোষিত হইতে পারে; তন্নিমিত্ত ইহার চিকিৎসা করিতে হইলে, আবশ্যক মতে অন্ত্রনালীর আধেয় সকল বাহির করিয়া দিয়া ঐ নালীকে বলাধান করিতে হইবে, এবং যে গুলি বিকৃতগ্রস্থ হইয়াছে তাহা শুধরাইতে হইবে, এবং যে সকল সিক্রিশন অসম্পূর্ণ বা অভাব আছে, তাহা পুনঃস্থাপিত করিতে হইবে।

ক্রমশঃ—

মুষ্টিযোগ।

আমাশয়ের ঔষধ।

এক ছটাক কাচা দুগ্ধে অর্দ্ধ ছটাক আতপ তণ্ডুল ভিজাইয়া তাহাতে অর্দ্ধ ছটাক তেলাকুঁচা [বিম্ব] পাতার রস মিলাইয়া একঘণ্টাকাল রাখিতে হয়। পরে সেই চাউল রগড়াইয়া একটী পরিষ্কৃত নেকড়া দ্বারা ছাকিয়া চাউল গুলি পৃথক করিয়া ফেলিলে অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহা চারি বা পাঁচ ভাগ করিয়া দিবসে চারি বা পাঁচ বারে পান করিতে হয়।—ইহাতে এক দিনেই আমাশয়-জনিত সকল কষ্ট দুরীভূত হয়। প্রবলরূপে আমাশয়াক্রান্ত হইলে ২।৩ দিনে আরোগ্য হয়।

শ্রীআদিনাথ ঘোষ

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

(সম্পাদকীয়)

(১। দন্তশূলের ঔষধ।

সময় বিশেষে দন্তশূলের হাতে যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে দন্ত শূলহইলে (দাঁত চাকাইলে) তাহার যন্ত্রণা কিরূপ গুরুতর। ফলতঃ ভুক্তভোগী ভিন্ন এ যন্ত্রণার বিষয়—এ দপ্দপানীর ও জ্বালার কথা আর কাহাকেও বুঝাইবার উপায় নাই। এরূপ যন্ত্রণা নিবারণ জন্য সচরাচর অনেকগুলি ঔষধ ব্যবহৃত

হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যেগুলির বিষয় আমরা জানি, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

(ক) যে কোন রকমের দন্তশূলই কেন না হউক, যন্ত্রণা আরম্ভ হইলে সেই সময় গরম জলে অল্প ফিটকারী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতে সেই জল দ্বারা পুনঃ পুনঃ কুলি করিলে তদ্দ্বারা অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য কতকটা যন্ত্রণার লাঘব হইতে পারে। কিন্তু সচরাচর ইহাদ্বারা স্থায়ী উপকার ঘটিতে দেখা যায় না।

(খ) দন্তশূলের পীড়িত স্থানে খুব কড়া শুকনা তামাকের পাতা চূর্ণ করিয়া বা চিবাইয়া তাহার উপর লাগাইলেও লালাস্রাব দ্বারা উপকার দর্শিতে পারে। কিন্তু ইহার ফলও সচরাচর স্থায়ী হইতে দেখা যায় না। তবে কাহার কাহারো বা সময় বিশেষে যে বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায় ইহা সত্য।

(গ) দন্তশূল, দাঁতের কন্‌কনানি বা মাড়ির কোন স্থানে দপ্‌দপানি বোধ হইলে খয়ের ওকর্পূর সমান অংশে লইয়া জলের সহিত মিশ্রিত করত পীড়িত স্থানে পুনঃ পুনঃ লাগাইবে। ইহার দ্বারা জল কাটিয়া গিয়া আশু যন্ত্রণা নিবৃত্তি হইতে পারে কিন্তু ইহার ফলও সচরাচর স্থায়ী হইতে দেখা যায় না।

(ঘ) পীড়িত স্থানে তুঁতিয়া ভস্ম লাগাইলেও আশু উপকার দর্শিতে পারে কিন্তু ইহার ফল ও সর্ব্বদা স্থায়ী হইতে দেখা যায় না।

(ঙ) যন্ত্রণার সময় অধিক খয়ের সংযুক্ত পান উপর্য্যুপরি কয়েকটা খাইলেও অনেকটা উপকার দর্শিতে পারে।

(চ) যদি উপরোক্ত ঔষধগুলি ব্যবহার করিয়াও কোনরূপে যন্ত্রনার শান্তি না হয়, তখন স্প্রিরিট্ ক্লোরাফরম তুলায় ভিজাইয়া সেই স্থানে লাগাইবে। দন্তশূল সম্বন্ধে যে কোন রকমেরই ভয়ানক যন্ত্রণা কেন না হউক এই ঔষধ প্রয়োগে তৎক্ষণাৎ প্রায়ই তাহার শান্তি হইতে দেখা গিয়া থাকে। ইহা অতি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ। কিন্তু নিতান্ত বালকের পক্ষে ইহা প্রয়োজ্য নহে।

(ছ) যদি পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার ঔষধ দ্বারা বিশেষতঃ ক্লোরাফরম দ্বারাও যন্ত্রণার নিবৃত্তি না হয়, তখন কাজে কাজেই অস্ত্রপ্রয়োগ ভিন্ন আর উপায় নাই। অতএব সেই স্থান অস্ত্র দ্বারা একটু চিরিয়া দিয়া সেখান হইতে কতকটা রক্ত বহির্গত করাইতে পারিলেই যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইতে পারে।

এতদ্ভিন্ন এই দন্তশূলের যন্ত্রণার নিবৃত্তির জন্য অনেকে অনেক প্রকার

মুষ্টিযোগ ঔষধের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা তাহার গুণাগুণ কখনও পরীক্ষা করিয়া দেখিনাই।—

আয়ুর্ব্বেদে রোগ ও মৃত্যুপরীক্ষা।

৩য় খণ্ডে প্রকাশিত ৩৫৬ পৃষ্ঠার পর।

৮। স্বরস্য দুর্ব্বলীভাবং হানিঞ্চ বলবর্ণয়োঃ।
রোগবৃদ্ধিমযুক্ত্যাচ দৃষ্ট্বা মরণ মাদিশেৎ॥

৮। যাহার স্বর অত্যন্ত দুর্ব্বল, বল ও বর্ণের হানি এবং অযথারূপে রোগের বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়, সে রোগী নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইবেক।

৯। ঊর্দ্ধশ্বাসং গতোষ্মাণং শূলোপহতবংক্ষণং।
শর্ম্মচানধিগচ্ছন্তং বুদ্ধিমান্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

৯। যে ব্যক্তি ঊর্দ্ধশ্বাসগ্রস্ত, উষ্মাহীন এবং বংক্ষণে শূল ও যে কিছুতেই সুখ না পায়, বুদ্ধিমান ভিষক তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন।

১০। অপস্বরং ভাষমানং প্রাপ্তং মরণমাত্মনঃ।
শ্রোতারঞ্চাস্য শব্দস্য দূরতঃপরিবর্জ্জয়েৎ॥

১০। যে বিকৃতস্বরে আপনার মরণ (আমি মরিলাম আর বাঁচিবনা ইত্যাদি রূপে) আপনি বলে এবং কোনরূপ শব্দ শ্রবণ করে, তাহাকে দূর হইতেই পরিত্যাগ করিবে।

১১। যং নরং সহসা রোগো দুর্ব্বলং পরিমুঞ্চতি।
সংশয়প্রাপ্তমাত্রেয়ো জীবিতং তস্য মন্যতে॥
অথচেৎ জ্ঞাতরস্তস্য যাচেরন প্রণিপাততঃ।
রসেনাদ্যাদ্বিতি ক্রয়াস্মৈ দদ্যাদ্বিশোধনং॥
মাসেন চেন্নদৃশ্যেত বিশেষ স্তস্য শোভনঃ।
রসৈশ্চান্নৈবহুবিধৈর্লভতস্য জীবিতম্॥

১১। বুদ্ধিমান চিকিৎসকেরা দুর্ব্বল রোগীকে সহসা রোগমুক্ত দেখিয়া তাহার জীবন সংশয়াপন্ন মনে করিয়া থাকেন। অথবা যদিও তাঁহার আত্মীয়গণ প্রণিপাতাদি দ্বারা ঐ ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য নিতান্ত আগ্রহ

প্রকাশ করেন, তবে "রোগী মাংসের যুষদ্বারা আহার করুক" এই কথা বলিবে। পরন্তু ঈদৃশ অবস্থায় কোনরূপ বিশোধন ঔষধ প্রয়োগ করিবেনা। অনন্তর নানাবিধ মাংসরস দ্বারাও যদি এক মাসের মধ্যে কোন বিশেষ না দেখা যায়, তবে ঐ রোগীর জীবন নিশ্চয়ই দুর্লভ বলিয়া জানিবে।

১২। নিষ্ঠ্যূতঞ্চ পুরীষঞ্চ রেতশ্চাম্ভসি মজ্জতি।
যস্য তস্যায়ুষঃ প্রাপ্ত মন্তমাহুর্মণীষিণঃ॥

১২। যাহার নিষ্ঠ্যূত (থু থু) পুরীষ [বিষ্ঠা] এবং মূত্র জলে নিঃক্ষেপ করিলে নিমগ্ন হয়, তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন।

১৩। নিষ্ঠ্যূতে যস্য দৃশ্যন্তে বর্ণাবহুবিধা পৃথক।
তচ্চ সীদত্যপঃ প্রাপ্য ন সজীবিতুমর্হতে॥

১৩। যাহার নিষ্ঠীবনে থুথুতে বহুবিধ বর্ণ দেখাযায় এবং ঐ থুথু জলে নিক্ষেপ করিলে যদি জলের সহিত মিশিয়া যায় তবে তাহার জীবন দুর্লভ জানিবে।

১৪। পিত্তমুষ্মান্বগং যস্য শঙ্খ প্রাপ্য বিমূর্চ্ছতি।
সরোগঃ শঙ্খকোনামা ত্রিরাত্রাজ্জহাতি জীবিতং॥

১৪। উষ্মান্বগপিত্ত মস্তকেস্থান প্রাপ্ত হইয়া বৃদ্ধি অর্থাৎ অত্যন্ত উষ্মতা প্রাপ্ত হইলে সেই পিত্ত শঙ্খক রোগ বলিয়া অভিহিত হয়। এই রোগে তিন রাত্রের মধ্যেই জীবনধ্বংস হয়।

১৫। সফেণং রুধিরং যস্য মুহুরাস্যাৎ প্রমুচ্যতে।
শূলৈশ্চ তুদ্যতে কুক্ষিঃ প্রত্যাখ্যেয় সতাদৃশঃ॥

১৫। যাহার মুখ হইতে ফেণাযুক্তরক্ত নির্গত এবং শূল ও কুক্ষিতে সুচিভেদনবৎ বেদনা হয়, তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করাই শ্রেয়।

১৬। বলমাংসক্ষয়স্তীব্রো রোগবৃদ্ধিররোচকঃ।
যস্যাতুরস্য লক্ষ্যন্তে ত্রীনহান্ন স জীবতি॥

১৬। যে রোগীর বল ও মাংস ক্ষয়, তীব্রভাবে রোগবৃদ্ধি এবং অরুচি দৃষ্ট হয়, সে বড় জোর তিন দিবস জীবিত থাকে।

মনুষ্যের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইলে সেই মৃত্যু জানিবার নিমিত্ত এই সমুদায় এবং এইরূপ অন্যান্য লক্ষণ অবগত হওয়া উচিত।

ক্রমশঃ—

ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্ত্‌গির্‌।

A. C. Khastgir

আজ বড়ই ব্যথিতচিত্তে বড় শোচনীয় সংবাদ বহন করিয়া পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছি। চিকিৎসা-সম্মিলনীর অন্যতর সম্পাদক ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্ত্‌গির্‌ মহাশয় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। সেই হাস্যময় অথচ চিন্তামলিনমুখশ্রী, সেই উজ্জ্বল অথচ অচঞ্চল প্রশান্তচক্ষু; সেই সেই বয়সে প্রবীণ অথচ আয়াসে নবীন, উৎসাহে অসীম, উদ্যমে অদম্য, অধ্যবসায়ে অধীর, হিতব্রতে উন্মাদবৎ, যুবকপ্রায় ডাক্তার অন্নদাচরণের কৃপাভরসা আমাকে এ-জনমের মত ছাড়িতে হইয়াছে।

মৃত মহাত্মার জন্য অনেকেই শোক করিতেছেন, অনেকেই ব্যথিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মরণে যে দুঃখ, যে কষ্ট, যে ক্ষতি, যে অভাব আমি অনুভব করিতেছি তাহা অনেকের নাই, অনেকে তাহা বুঝিবেননা। তিনি ডাক্তার, আমি কবিরাজ, তিনি প্রৌঢ়, আমি যুবক, তিনি ব্রাহ্ম, আমি হিন্দু, অথচ তিনি সর্ব্বাংশে আমার সুহৃৎ ছিলেন। এ অসদৃশ সৌহৃদ্যের, এ অসম সম্মিলনের মর্ম্ম মর্ত্ত অনেকে বুঝিবেননা; যিনি বুঝিবেন, চিকিৎসা সম্মিলনীর মূল গ্রন্থি, শেষ লক্ষ্য একান্ত উদ্দেশ্য কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে তাঁহার আর কষ্ট হইবেনা; অন্যকে কষ্ট করিয়া বুঝাইলেও বুঝিবেননা।

কিন্তু অন্নদা বাবু কেবল যে আমার বন্ধু ছিলেন, তা নয়, তিনি আমার পরম বন্ধু, পরম সহায়, পরমোপকারী, পরমোপদেষ্টা, আর অনেকেই জানেন, এ সম্মিলনব্রতের একজন প্রধান সাধক ছিলেন। দুইদিক হইতে দুইজনে মিলিয়া এই মহাকঠোর ব্রতভার বুকে করিয়া বহন করিতেছিলাম, আজ তাঁহার বিয়োগে সে সমস্ত ভার আমার স্কন্ধে চাপিল, সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, ভগবানের ভরসায়, ধন্বন্তরির কৃপায় যেন দ্বিগুণ বলে, দ্বিগুণ উৎসাহে সে ভার ধারণ করিতে সক্ষম হই।

দুইয়ে এক ছিলাম আজ একে দুই হইতে হইবে। দুজনের ভার একাকী বহন করিতে হইবে। সেজন্য যে পরিশ্রম, যে কষ্ট, যে চিন্তাভার যা কিছু বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে আমি কাতর নহি, সেজন্য দুঃখও করিনা। দুঃখ এই যে, অন্নদাবাবুর মত একজন মহাব্রতীকে আমি হারাইলাম, বঙ্গদেশও একটী মহারত্নে বঞ্চিত হইলেন। গ্রাহক পাঠকের অনুগ্রহে মহাপণ্ডিত মহাদক্ষ ডাক্তার কবিরাজগণের সহায়তায়, চিকিৎসা সম্মিলনীর মহাব্রত পালন করিতে আমি কদাচই পরাঙ্মুখ হইবনা। কিন্তু আজ তিন বৎসরকাল এই মহৎ কার্য্যে অন্নদা বাবুর নিকট নিয়ত যে প্রভূত সাহায্য পাইয়াছি, তাহা ভুলিবার নয়, এ জনমে কখনও তাহা ভুলিতে পারিব না।

অন্নদা বাবুর নিকট আমি চিরঋণে আবদ্ধ। আমি সামান্য ক্ষুদ্র জীব, এ জনমে কখনও সে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। তবে মনুষ্য জন্মে উপকারকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে আমি অবশ্য বাধ্য। কৃতজ্ঞতার নিদর্শনরূপে মৃত মহাত্মার জীবনী সঙ্কলন করিয়া নিম্নে উপহার দিলাম।

কৃতজ্ঞতার উপহার বলিয়া এ জীবনচরিত্র অতিরঞ্জিত নহে। অতিরঞ্জনে তাঁহার অনিষ্ট বৈ ইষ্ট হইবে না। সুখের বিষয় এই যে, অন্নদা বাবুর জীবন-বৃত্তান্তে তুলিকার প্রয়োজন নাই, রঙ্গ চঙ্গেরও আবশ্যকতা নাই। যাহা স্বভাব-সুন্দর, তাহাতে অলঙ্কারের প্রয়োজন কি? অন্নদা বাবুর জীবনের সার কথা-গুলি সহজ ভাষায় বলিয়া গেলেই তাঁহার চরিত্র পাঠকের হৃদয়ে আপনি ফুটিয়া উঠিবে। সেই সাহসেই আমি ক্ষুদ্র হইয়াও একার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম, আর আমার কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনের পথও এত সহজ বোধ হইল।

ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্ত্‌গির্ জেলা চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তর্গত সুচক্রে-দণ্ডী গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ খাস্ত্‌গির বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। ইহাঁর পিতার নাম মুন্‌সী রামচন্দ্র খাস্ত্‌গির। রামচন্দ্র স্বীয় অধ্যবসায় গুণে প্রথমে উক্ত জেলার সরকারী উকীল হইয়া পরে মুন্‌সেফী কার্য্যে নিযুক্ত হন্। কিন্তু তিনি এরূপ তেজস্বী ছিলেন যে, উচ্চশ্রেণীর বিশেষতঃ বিশেষ সম্মানের চাকুরী হইলেও বৈতনভোগী হইয়া চাকুরী করা তাঁহার পক্ষে পোষাইল না। তাই তিনি অল্পদিন মাত্র মুন্‌সেফী করিয়া তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাধীনভাবে আবার ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে চট্টগ্রাম সহরে গভর্ণমেণ্ট সর্ব্ব প্রথমে একটী ইংরেজী স্কুল সংস্থাপন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তখনকার কালে ইংরেজী শিক্ষায় মহাপাপ বিশেষতঃ সমাজ ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিয়া উক্ত স্কুলে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহই সন্তানদিগকে পড়াইতে সাহস করেন নাই। কিন্তু স্বাধীনচেতা মুন্‌সী রামচন্দ্রই তখন নির্ভয়ে তাঁহার পুত্রত্রয়কে ও বংশের অন্যান্য সন্তানকে উক্ত স্কুলে সর্ব্বপ্রথমে পড়াইতে দেন। এবং সেই আদর্শেই শেষে অনেক হিন্দুসন্তান পড়িতে আরম্ভ করে।

রামচন্দ্রের তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বাবু উমাচরণ রায় খাস্ত্‌গির, মধ্যম মৃত ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্ত্‌গির এবং কনিষ্ঠ মৃত শ্যামাচরণ খাস্ত্‌গির। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ উমাচরণ বাবু স্বকীয় বিদ্যাবুদ্ধিবলে জজিয়তী কার্য্যে নিযুক্ত হন্। এবং এক্ষণে তিনি পেন্‌সন্ লইয়া স্বদেশে বসিয়া যুগলসহোদর বিরহে জীবন্মৃতবৎ কালাতিপাত করিতেছেন। ইনি একজন পরম দয়ালু ও অতি অমায়িক ব্যক্তি। কনিষ্ঠ ৺শ্যামাচরণ খাস্ত্‌গির স্থানীয় জজের হেড্‌ক্লার্ক

ছিলেন। সঙ্গীত বিদ্যায় ইহাঁর এতদূর অলৌকিক পারদর্শিতা ছিল যে, সাধারণে তাঁহাকে সাধক রামপ্রসাদের নিম্নেই আসন প্রদান করিয়াছিলেন। বাস্তবিকও ইনি সঙ্গীত বিদ্যায় একজন প্রকৃত সাধকই ছিলেন। তাহা ছাড়া জজের সহিত ইহাঁর বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠতাও ছিল। এমন কি, সে সময়ে চট্টগ্রামের মধ্যে জজের পরেই ইহাঁর ক্ষমতা পরিচালিত হইত।

যাহা হউক, অন্নদাবাবু এই সময় হইতে এত গভীর মনোনিবেশের সহিত পড়িতে আরম্ভ করেন যে, অচিরকাল মধ্যে তিনি সর্ব্বপ্রথমে চট্ট-গ্রামের মধ্যে জুনিয়র ছাত্রবৃত্তি পাশ করেন। পাশ হওয়ার পরে তাঁহার পিতা ইচ্ছা করেন যে, পুত্রকে ডেপুটী করিয়া দেন। কিন্তু খাস্তগির মহাশয়ের জ্ঞানপিপাসা এত অধিক ছিল যে, তিনি ডেপুটীগিরি উপেক্ষা করিয়া, পিতার বিনা অনুমতিতেই কেবল জুনীয়ার ছাত্রবৃত্তির প্রতি নির্ভর করিয়া সিনীয়ার পাশ করার মানসে সাধারণের নিষেধসত্ত্বেও চট্টগ্রাম হইতে ঢাকায় আসিয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। তবে অবশ্য তাঁহার এ বিশ্বাস ছিল যে,তিনি সিনীয়ার পাশ করিয়া পরে পিতার আদেশ মত ডেপুটীগিরি করিবেন। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার জীবনে এমন একটী ঘটনা উপস্থিত হয় যে, তদ্দ্বারা তাঁহাকে ডেপুটীগিরি করার ইচ্ছায় জলাঞ্জলি দিয়া ডাক্তারী শিখিবার জন্য নিতান্ত লালায়িত হইতে হয়। ব্যাপারটী এই—ঢাকায় অবস্থিতিকালে তাঁহারা সমবয়স্ক তিনটী বালক একত্রে এক বাটীতে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন। তন্মধ্যে একদিন রাত্রে তাঁহাদের মধ্যে হটাৎ একটী বালকের ওলাউঠা হয়। তিনটীর মধ্যে হটাং একজনের এইরূপ পীড়া উপস্থিত হওয়ায় তিনি ও অপর বালকটী নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত লইয়া পড়েন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তৃতীয় বালকটী পীড়িত বালকের সেবাসুশ্রূষা করা দূরে থাকুক্, তাহার নিকটে যাইতেও স্বীকার করিল না। অগত্যা পরম দয়ালু খাস্তগির মহাশয় নিতান্ত নিরুপায় হইয়া নিজেই একাকী তাহার সুশ্রুষায় নিযুক্ত হইলেন এবং ৩য় বালকটীকে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলেন। কিঞ্চিৎ পরে তিনি পীড়িত বালকটীকে স্তব্ধ ও অপেক্ষাকৃত সুস্থ মনে করিয়া তাহার পার্শ্বদেশে শয়ন করিলেন। এবং বালকটীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ক্রমে তিনিও নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। দুঃখের বিষয়

এই যে, ইত্যবসরে বালকটীর প্রাণবায়ু উড়িয়া গেল। এদিকে তৃতীয়বালক অনেক পর্য্যটনে কোন ডাক্তারকে আনিতে না পারিয়া অগত্যা নিতান্ত বিষন্ন-মনে বাসায় প্রত্যাগমন করিয়া দেখে যে, মৃত বালকটী খাস্তগির মহাশয়ের বক্ষঃস্থলে একখানি হাত রাখিয়া যেন অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। বালক সহসা গিয়া খাস্তগির মহাশয়ের গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল যে, অধিক রাত্র বলিয়া কোন ডাক্তারই আসিতে স্বীকার করিল না। অনন্তর তিনি ত্রস্তভাবে যেমন উঠিতে যাইবেন, অমনি দেখেন যে, মৃত বালকের একখানি হাত তাঁহার বক্ষঃস্থলে অতি শক্তভাবে চাপিয়া আছে। তিনি অতি কষ্টে হাতখানি নামাইয়া তখনই বুঝিলেন যে, বালক-টীর নিদ্রা নহে, অনন্ত নিদ্রায় মগ্ন হইয়াছে। তারপর তিনি ডাক্তার-গণের আচরণের বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিয়া ও হৃদয়ে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত মনোদুঃখে সেই অবস্থাতে সেই মৃত বালকবন্ধুর শবদেহ স্পর্শ করিয়াই প্রতিজ্ঞা করেন যে, যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে এজীবনে ডাক্তারী ভিন্ন আর কিছুই শিখিব না।

কিছুদিন পরে তিনি সিনিয়ার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথম ৪০ টাকা মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা হইতে কলি-কাতা মেডিক্যাল কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হন। এবং এখানে আসিয়াও তিনি মাসিক ২০ কুড়ি টাকা বৃত্তি পান্। অনন্তর মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় ডাক্তার খাস্তগির এমন উৎকৃষ্টরূপে উত্তীর্ণ হন যে, তিনিই প্রথম; ও বর্ত্তমান ডাক্তার চন্দ্র ২য় হন। অধ্যক্ষগণ তাঁহাকে বৃত্তি দিয়া বিলাতে পাঠাইতে উদ্যোগ করেন। কিন্তু তিনি বিবাহিত বিশেষতঃ খৃষ্টানধর্ম্ম অব-লম্বন করিয়া বিলাতে যাওয়া তাঁহার অভিপ্রেত নহে বলিয়া তিনি তাহাতে সম্মত হন্ নাই। কাজেই ডাক্তার চন্দ্রই সেই বৃত্তি লইয়া বিলাতে গমন করেন। কিন্তু কালের কি অনন্ত মহিমা, কি কুটিল গতি, যে খাস্তগির মহাশয় একদিন স্বজাতি ও স্বধর্ম্মানুরাগের অনুরোধে আপনার ভাবী উন্নতির আশা বিসর্জ্জন দিয়া বিলাত গমনের বাসনা ত্যাগ করিয়াছিলেন, কালচক্রের দুরন্ত আঘাতে অতঃপর তাঁহাকেই আবার মোহমুগ্ধ হইয়া সনাতন পৈতৃকধর্ম্ম, পৈতৃক আচার, চিরসংস্কারে জলাঞ্জলি দিয়া, আধুনিক উপধর্ম্মে দীক্ষিত

হইতে হইয়াছিল। অনেকেই বোধ হয় জানেন, ডাক্তার অন্নদাচরণ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এবং যে বিলাতগমনে তিনি নিজে সাহস করেন নাই, শেষ দশায় সেই বিলাত প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত মহাশয়কে কন্যা সম্প্রদান করিতেও কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই।

মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ডাক্তার খাস্তগির গভর্ণমেণ্টের চাকুরী লইয়া প্রথমে ব্রীটিস্ বর্ম্মা, পরে বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থান ও পশ্চিম প্রদেশের শ্রীবৃন্দাবন এবং মথুরা প্রভৃতি স্থানে অতি সুখ্যাতি ও দক্ষতার সহিত প্রায় ২৫ বৎসরেরও অধিক হইবে কার্য্য করেন। এবং মধ্যে কিছুদিন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষকতা কার্য্যও করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি মালদহের সিভিলসার্জ্জনের পদে নিযুক্ত হন্। কিন্তু উপরিতন সাহেব কর্ম্মচারীর সহিত বনিবনাও না হওয়াতে তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতার বহুবাজারে আগমন করিয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ডাক্তার খাস্তগিরির উপযুক্ততার পক্ষপাতী হইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্বীয়কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চাহেন। এবং কিছুদিনের জন্য অত্রস্থ ক্যাম্বেল মেডিকাল স্কুলে নিযুক্ত করেন। তাহার পর বাঙ্গালাদেশের কয়েক স্থানে কার্য্য করার পর গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে শিবসাগরের সিভিলসার্জ্জনের পদে নিযুক্ত করেন, কিন্তু তিনি অধিকদূর বলিয়া অস্বীকার করায় পরে বরাহনগরের দাতব্যচিকিৎসালয়ে নিযুক্ত হন্।

গভর্ণমেণ্টের চাকুরী করার সময় খাস্তগিরির সম্বন্ধে এস্থলে আর একটি কথার উল্লেখ করা আবশ্যক, যাহাতে সাধারণে তাঁহার বুদ্ধিমত্তার বিশেষরূপ পরিচয় পাইয়াছিলেন। লর্ড নর্থব্রুক যখন ভারতবর্ষে গভর্ণর জেনেরল ছিলেন, সেই সময়ে তিনি এই নিয়ম জারী করেন যে, বর্দ্ধমান অঞ্চলের ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ প্রভৃতি সম্বন্ধে সাহেববাঙ্গালী ডাক্তারদিগের মধ্যে যিনি একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন, তাঁহাকে একটী বিশিষ্ট পুরস্কার দেওয়া হইবে। বলা বাহুল্য যে, সেই পুরস্কারের লোভে অনেক ডাক্তারেই প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু সকলের মধ্যে ডাক্তার খাস্তগিরিই সেই পুরস্কার প্রাপ্ত হন্। তাহা ছাড়া সংপ্রতি ইজিপ্টের কমিশনে যে ম্যালেরিয়া ও ওলাউঠার বীজ একই বলিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন, খাস্তগির মহাশয়

প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে ঠিক্ তাহাই আবিষ্কার করিয়া কলিকাতার মেডিক্যাল সোসাইটীতে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালীর কথা বলিয়া সে সময়ে কেহ তাহা গ্রাহ্য করেন নাই।

বরাহ নগরে থাকার সময় ইনি অন্য একটী কার্য্য পাওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাহা না হওয়াতে পেন্‌সনের আর অত্যল্প দিবস অবশিষ্ট থাকাসত্ত্বেও তিনি স্বাধীনভাবে কার্য্য পরিত্যাগ করেন, এবং এইসময়ে হইতেই কলিকাতায় থাকিয়া দস্তুরমত চিকিৎসাব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় তাঁহার হোমিওপ্যাথিমতে ক্রমে শ্রদ্ধা জন্মিতে আরম্ভ হয়। এবং সেই জন্য ক্রমশঃ তিনি এই শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। প্রায় দশ বৎসর অতীত হইল, হোমিওপ্যাথিমতে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, তিনি সাধারণ এলোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের ন্যায় একটী বিষয়ে গোঁড়া ছিলেন না। যে বিষয়ে যাহা ভাল পাইতেন, তাহাই অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিতেন। বলা বাহুল্য যে, তিনি এই মতের বশবর্ত্তী হইয়াই প্রথমে চিকিৎসাসম্মিলনীতে যোগ দান করেন। চিকিৎসাসম্মিলনীর প্রথম সংখ্যা লইয়া তিনি এক দিন মৃত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে বলেন যে, মহাশয়! আপনি যেমন ধর্ম্মসম্বন্ধে নববিধান করিয়াছেন, দেখুন আমরাও তেমনি চিকিৎসাসম্বন্ধে নববিধান করিবার জন্য এই চিকিৎসা-সম্মিলনীর সূত্রপাত করিলাম। বাস্তবিকও তিনি সেই বিশ্বাসবলেই সম্মিলনীপ্রকাশের অনতিবিলম্বেই চিকিৎসাসম্মিলনীর ন্যায় উক্ত তিন মতে কলিকাতা মেডিকাল ইন্‌ষ্টিটিউসন্ নামক স্কুল স্থাপন করেন। দুঃখের এই যে, এই সমস্ত নানাবিধ ব্যাপার লইয়া তাঁহাকে এত অধিক পরিশ্রম করিকে হইত যে, অচিরাৎই তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়িল। মৃত্যুর তিন মাস পূর্ব্বে প্রথমে তাঁহার সামান্য জ্বর হয়। তারপর সেই জ্বর হইতে ক্রমে পেটের অসুখ, দুর্ব্বলতা, শোথ, হিক্কা, ও শ্বাস প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইয়া গত ৬ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার রাত্রি ৩টা ৫ মিনিটের সময় মানবলীলা সম্বরণ করেন।

কালচক্রের কুটিল আবর্ত্তনে পড়িয়া মৃত ডাক্তার অন্নদাচরণ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দীক্ষিত হইয়া

তিনি স্ত্রীস্বাধীনতা, স্ত্রী শিক্ষা, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি ব্রাহ্মজনোচিত অনেকগুলি কার্য্যে সদাই অগ্রসর থাকিতেন। তাঁহার প্রণীত (১) সচিত্র মানবজন্ম তত্ত্ব ও ধাত্রীবিদ্যা, (২) নবপ্রসূত শিশুর পীড়া ও চিকিৎসা এবং স্ত্রীজাতির ব্যাধি সংগ্রহ ও চিকিৎসা। (৩) আয়ুর্ব্বর্দ্ধন। (৪) শরীররক্ষণ। ও (৫) পারিবারিক সুস্থতা প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয় শিখিবার অনেক জিনিষ আছে। তাঁহার তিন পুত্র ও চারিটী কন্যা বর্ত্তমান। পুত্রত্রয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্র লাল, মধ্যম শ্রীমান্ হেমেন্দ্র লাল বিএ পাস করিয়াছেন, এবং কনিষ্ঠ শ্রীমান সুরেন্দ্র লালের বয়ক্রম ১০।১২ বৎসর। কন্যা চতুষ্টয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠা শ্রীমতী সৌদামিনী বেথুন স্কুলের উচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠাভ্যাস করেন, এবং কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিহারী লাল গুপ্তের সহিত পরিণীতা হন। দ্বিতীয়া শ্রীমতী মনমোহিনীও ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্না এবং কিছুকাল পরিচারিকার সম্পাদিকা ছিলেন। মৃতকেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত করুণাচন্দ্র সেন তাহার পাণীগ্রহণ করেন। তৃতীয়া শ্রীমতী বিনোদিনীও লেখাপড়া বেশ জানেন, চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন সেনের সহিত তাঁর বিবাহ হয়। কনিষ্ঠা শ্রীমতী কুমারী কুমুদিনী গতবর্ষে বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। আশা করি, ভগবান মৃত খাস্তগির মহাশয়ের পুত্র কন্যাদেরকে কুশলে রাখিবেন। এবং পুত্রগণ পিতার নাম রাখিতে সমর্থ হইবেন।

দেশীয় স্বাস্থ্য বিজ্ঞান।

পুরুষ বন্ধ্যা, কি স্ত্রী বন্ধ্যা ?

যে সমস্ত স্ত্রীলোকের সন্তানসন্ততি না হয়, লোকে তাহাদিগকে বন্ধ্যা বলে; সেইরূপ পুরুষের দ্বারাও সন্তান উৎপন্ন না হইলে সাধারণতঃ তাহার সম্বন্ধেও ঐরূপআখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি আশ্চর্য্যের কথা এই যে, স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয়ের মধ্যে বন্ধ্যাত্ব থাকিলেও দোষটা কিন্তু এক স্ত্রী ভিন্ন পুরুষের উপর বড় পড়িতে দেখা যায় না। সকলেই বলে—আহা অমুক স্ত্রীর সন্তানাদি কিছু হইল না, যেহেতু সে বন্ধ্যা বা বাঁজা; কিন্তু সর্ব্বত্রই যে কেবল স্ত্রী বন্ধ্যা নহে, পুরুষ মহাশয়দিগেরও স্বীয় দুষ্কর্ম্মদোষে সন্তান উৎপাদনে যে আর কিছুমাত্র সামর্থ্য থাকে না, সে কথা বলে কে ? প্রায়ই দেখা যায় যে কোন স্ত্রীর যথাসময়ে সন্তানাদি না হইলে তাহার আত্মীয়স্বজন ও স্বামীপ্রভৃতি মহাব্যস্ত হইয়া সেই বন্ধ্যা দোষের সর্ব্বদা প্রতিকার চেষ্টা করিয়া থাকেন। বাধকের ঔষধ খাওয়া, সন্ন্যাসীর মাদুলী পরা, বাবা তারকনাথে লইয়া হত্যাদেওয়া ইত্যাদি নানাবিধ ক্রিয়া কেবল স্ত্রীর সম্বন্ধেই করিতে দেখা গিয়া থাকে। স্থলবিশেষে এমনও স্বচক্ষে দেখা গিয়াছে যে, নিতান্ত অল্পবয়সে দুরন্ত অত্যাচারবশতঃ যে স্বামীর আর কিছুমাত্র ইন্দ্রিয়বল ও শুক্রেরবিশুদ্ধতা নাই, অথচ সেই স্বামীই আবার স্বীয় স্ত্রীর বাধকবেদনা নিবারণের জন্য শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিতে ক্রুটী করেন না ! সে যাহা হউক, স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয়েরই বন্ধ্যাত্ব দোষ থাকিলেও যে যে কারণে পুরুষ সন্তান উৎপাদনে অসমর্থ বা বঞ্চিত হয়, তাহা ইতিপূর্ব্বে তৃতীয় খণ্ড পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যক সম্মীলনীতে “ধনী লোক সন্তান লাভে বঞ্চিত কেন ?” এই প্রবন্ধে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে; সুতরাং পুরুষের বন্ধ্যাত্ব সম্বন্ধে এস্থলে আর অধিক কিছুই বলিবার নাই; তবে স্ত্রীজাতি সাধারণতঃ কি কি কারণে বন্ধ্যা হয়, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি।—

মরুভূমিতে সুপক্ক বীজ যথাসময়ে রোপিত হইলেও সেই বীজ হইতে

যেমন চারা জন্মিতে পারে না; যে হেতু ইহা প্রকৃতি বা স্বভাবসিদ্ধ যে, মরুভূমিস্থ মৃত্তিকায় উৎপাদিকা শক্তি একেবারে নাই বলিয়া তাহাতে রোপিত বীজ হইতে চারা জন্মিতে পারে না। সেইরূপ কোন কোন স্ত্রীজাতির মরুভূমির ন্যায় সন্তানোৎপাদিকা শক্তি একেবারে রহিত কি না, সে বিষয় ঠিক করিয়া বলা বড় সহজ ব্যাপার নহে, তবে ক্বচিৎ অনেকের মধ্যে দুই একটির হইতে পারে বলিয়া সম্ভব, কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা সচরাচর যে সমস্ত স্ত্রীলোককে বন্ধ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, তাহাদের মধ্যে সকলেই যে এই স্বাভাবিক বন্ধ্যার অন্তর্গত, একথা কোন মতেই বলা যাইতে পারে না, কেন বলা যাইতে পারে না তাহা শুনুন——

প্রথমতঃ ইহা প্রকৃতিসিদ্ধ যে, বিশুদ্ধ ক্ষেত্রে যথাকালে সুপক্ক বীজ রোপিত হইলে সেই বীজ হইতে নিশ্চয়ই বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে। সেইরূপ স্ত্রীরজঃ ও পুরুষের বীর্য্য এই উভয় পদার্থে কোনরূপ দোষ নাথাকিলে তাহা দ্বারা ও যে নিশ্চয়ই সন্তান উৎপন্ন হইবেক, ইহাতেও আর কিছু মাত্র সন্দেহ করা যাইতে পারে না; সুতরাং বন্ধ্যা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বের প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য যদি বেশ ভালরূপে অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে' অধিকাংশ স্থলে দেখা যাইবে যে, হয় স্ত্রীরজের বিশেষ কোন দোষ আছে, নয় পুরুষের শুক্রধাতুর কোনরূপ দোষ জন্মিয়াছে, নচেৎ স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই, একদা শুক্রশোণিতের বিশেষ কোন দোষ ঘটিয়াছে। আর কোন স্থলে না হয় স্ত্রী বা পুরুষের বন্ধ্যা দোষ আছে।

বেশ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা জানা যাইবে যে, স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাত্ব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়টী কারণ ভিন্ন অন্য কিছুই সম্ভবে না;—

১। প্রকৃতিগত বন্ধ্যা হওয়া।

২। ঋতুর সময় স্বামী সংসর্গের দ্বারা রজঃ বা ঋতু শোণিতের দোষজন্মান।

৩। স্বামীর সহিত অতি মৈথুনে রজোধিক্য, কষ্টরজঃ ও প্রদর প্রভৃতি রোগ হওয়া,।

৪। উপদংশ বা গরমী এবং ধাতের পীড়াগ্রস্ত স্বামীর সহিত সহবাস দ্বারা আর্ত্তব শোণিত একেবারে দূষিত হইয়া যাওয়া ও প্রদরাদি রোগ উৎপন্ন হওয়া।

৫। নানাবিধ পুরাতন স্থায়ীপীড়া জন্য শরীরের রক্তাল্পতা, সুতরাং আর্ত্তব শোণিতেরও অভাব বা অল্পতা ঘটা।

৬। কেবলমাত্র অতিশয় কামপ্রবৃত্তির বশীভূতা হইয়া পুরুষের সহিত সংসর্গ করা;

৭। স্ত্রীর শয়নের দোষে পুরুষের শুক্র ঠিক গর্ভাশয়ে না পৌঁছান।

৮। সংসর্গ কালে ক্রোধ, শোক বা ঈর্ষা অথবা অন্য কোন দুঃশ্চিন্তার বশীভূতা থাকা।

৯। সংসর্গ কালে স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয়ের পরস্পর প্রগাঢ় প্রেম না থাকা ইত্যাদি।

১০। তদ্‌ভিন্ন পুরুষের শুক্রাল্পতা, শুক্রের অবিশুদ্ধতা এবং পরুষাঙ্গের ক্ষুদ্রতা প্রভৃতি দোষেও স্ত্রী-জাতির সন্তান উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে।

তবেই দেখ এক সন্তান না হওয়ার পক্ষে স্ত্রী বা পুরুষ এই উভয়ের সম্বন্ধে কতরকমেই বাধা বিঘ্ন ঘটিতে পারে। বাস্তবিক নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, সন্তান উৎপন্ন না হওয়ার পক্ষে এত সমস্ত বাধা বিঘ্ন বর্ত্তমান থাকা সত্বেও সাধারণে যে কি জন্য কি ভাবিয়া কেবল স্ত্রীজাতির প্রতিই বন্ধ্যাত্বের দোষ চাপাইয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাহা বলিতে পারি না। ফলতঃ স্ত্রীজাতির বন্ধ্যাত্ব সম্বন্ধে এক স্বভাবই যে একমাত্র কারণ.একথা কোন মতেই হইতে পারে না, তবে যে সমাজ সর্ব্বত্রই একমাত্র স্বভাবকে কারণ বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, সে সমাজের নিতান্ত মূর্খতা মাত্র।

আর এক কথা, এই মূর্খতার সংখ্যা আমাদের দেশে দিন দিন এতই বৃদ্ধি পাইতেছে যে, তাহা চিন্তা করিলে অবাক্ হইতে হয়। বলিতে হাসি পায়, অনেক দিনের কথা হইবেক একটি ত্রিংশৎবর্ষ বয়স্ক যুবক কোন চিকিৎসকের নিকট আসিয়া বলেন যে, তাহার চৌদ্দপনর বৎসর বয়স্কা স্ত্রীর সন্তান না হওয়ার তিনি বিশেষতঃ তাঁহার পিতা মাতা বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তা হওয়ারই কথা বটে। কেননা কাল যেরূপ দাঁড়াইতেছে, দিন দিন যেরূপ মূর্খতা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাঁহাতে চৌদ্দ বৎসরবয়স্কা বালিকার সন্তান হওয়া কেন, আর কিছু দিন পরে ইহাও বোধ হয় শোনা যাইবে যে, এরূপ বালিকার পৌত্র হইতে না দেখিলে

লোকে আরও অধিক ব্যাকুল হইয়া পড়িবেক। বস্তুতঃ বড়ই আক্ষেপের বিষয় এইযে,যে বালিকা দ্বাদশ ত্রয়োদশ বৎসরে সাধারণতঃ ঋতুমতী হওয়াই অন্যায়, তাও না হউক বিবাহ দেওয়ার দোষে ঘটুক, কিন্তু চৌদ্দ পনর বা পনর ষোল বৎসরের মধ্যে সন্তানাদি না হইলেই যে পরিবার মধ্যে হাহা রব উঠে, ইহার বাড়া আশ্চার্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? এমনও অনেক দেখা গিয়াছে যে, স্ত্রীর ১৮ আঠার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সন্তানাদি না হওয়াতে তাহার স্বামী পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া মহা বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন।

এখন সকলে বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে স্ত্রীজাতির সন্তানাদি না হওয়ার পক্ষে সর্ব্বত্র কেবল স্বভাবই প্রধান কারণ নহে। আমার বিশ্বাস যে প্রধান কারণ ত নহে, পরন্তু পুরুষ মহাত্মাদিগকেই এ বিষয়ের প্রধান কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে,কেন পারে, তাহা একে একে বলিতেছি,—

১। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঋতুকালে স্বামীসহবাসদ্বারা স্ত্রীজাতির রজঃ বা আর্ত্তব শোণিতের দোষ জন্মে বলিয়া সেই দূষিত রক্তের দ্বারা গর্ভ উৎপন্ন হইতে পারেনা সুতরাং এস্থলে পুরুষেরই প্রধান দোষ স্বীকার করিতে হইবে।

২। স্বামীর সহিত অতি মৈথুনদ্বারা রজের আধিক্য বা কষ্টরজ এবং প্রদর রোগ হওয়াতেও গর্ভ উৎপন্ন হইতে পারে না, সুতরাং এ স্থলেও পুরুষের দোষ অধিক বলিতে হইবেক।

৩। উপদংশ বা গরমী এবং ধাতের পীড়াগ্রস্ত স্বামীর সহবাসে স্ত্রী জাতির আর্ত্তব শোণিত ও গর্ভাশয় প্রভৃতি দূষিত হইয়া যে সন্তানাদি উৎপন্ন হইতে পারে না, তাহার প্রধান কারণও পুরুষজাতি।

৪। তদ্ভিন্ন পুরুষের শুক্রাল্পতা, শুক্রের তারল্যাদি দোষ এবং হস্তমৈথুন বা অতিমৈথুনজন্য পুরুষাঙ্গের ক্ষুদ্রতা প্রভৃতি দোষেও যে, স্ত্রীজাতির সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে না, সে কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। ফলতঃ বেশ বিবেচনা পূর্ব্বক দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইবে যে, স্ত্রীজাতির যথা সময়ে গর্ভোৎপন্ন না হওয়াসম্বন্ধে পুরুষেরই অপরাধ অধিক। নিজে জিতেন্দ্রিয় হও, আগে স্ত্রীর ও নিজের দেহের অবস্থা ভালরূপে জ্ঞাত হও। পরে যথাসময়ে ঋতুর পর প্রগাঢ় প্রেমে সন্তানার্থী হইয়া সংসর্গ কর, অবশ্যই মনের মত সন্তান উৎপন্ন হইতে পারিবে। নচেৎ গরমী ও পারা এবং ধাতের

পীড়া প্রভৃতি দ্বারা দেহ একবারে জর্জ্জরিত হইয়া গিয়াছে, আবার স্ত্রীর আর্ত্তবশোণিতের অবস্থাও তাহাই, বেশ্যা বা পরস্ত্রীতে মন একবারে মাতিয়া রহিয়াছে, সর্ব্বদা সংসর্গ দ্বারা শুক্র ধাতু একবারে না থাকার সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এরূপ স্থলে নেহাং অনুরোধরক্ষার ন্যায় অথবা কেবল কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য যথেচ্ছভাবে সহবাস করিলে তাহাতে কি আর সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে ? না কষ্টেস্বষ্টে সন্তান উৎপন্ন হইলেও সেই সন্তানের ঔৎকর্ষের ইচ্ছা করা যাইতে পারে ? ফলতঃ যিনি যাহাই বলুন, কিন্তু অনেক স্থলে পুরুষ মহাত্মারাই যে স্ত্রীজাতির বন্ধ্যাত্বের একমাত্র কারণ, এবং স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয়েরদোষেই যে সন্তানোৎপাদনের ব্যাঘাত ঘটে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আশা করি, নিঃসন্তান দম্পতিযুগল, একবার মনোযোগের সহিত এই প্রবন্ধপাঠ করিয়া দেখিবেন।

আহার।

ধনী ও দরিদ্রের আহার।

কেবল যে সুরম্য অট্টালিকায় বাস ও ক্ষীরসরনবনী ভোজন করিলেই সুখ হয়, সুধু প্রকাণ্ড জুড়ী গাড়ী চড়িতে পারিলেই যে ঐহিক সুখভোগের চূড়ান্ত হইল, তাহা নহে। সংসারে আসিয়া প্রকৃত সুখসচ্ছন্দতার ইচ্ছা করিলে মনুষ্যগণের আহার, আচার, নিদ্রা, পরিচ্ছদ ও ধর্ম্মপ্রভৃতি আবশ্যকীয় সকলবিষয়েই সমানভাবে অধিকার থাকা চাই। নচেৎ কেবল ধনকুবের হইয়া অধার্ম্মিকের একশেষ হইলে—ব্যাধিদ্বারা জীর্ণ শীর্ণ বা অনাহারে ক্লিষ্ট হইয়া ধার্ম্মিকচূড়ামণী হইলে কিংবা ঘরে চাউলডাউলের অভাবস্বত্বে দিব্যি ক্যালাপেড়ে কাপড় এবং ৮। ১০ টাকার জুতা পরিধান ও মস্তকময় তেড়ী কাটিতে পারিলেই তদ্দ্বারা প্রকৃত ঐহিক সুখের সম্ভাবনা কোন মতেই নাই। ফলতঃ ইহাদের একের প্রাচুর্য্যথাকাসত্ত্বেও অন্যের বিন্দুমাত্র অভাবে যে, সংসার কিরূপ অসুখ বা অশান্তির আগার হইয়া উঠে, তাহা

এই ধনী ও দরিদ্রের আহার এবং নিদ্রাগত পার্থক্য দ্বারাই বেশ সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে।

মনেকর লক্ষাধিপ ধনী, যেমন সুখভোগের অসংখ্য ভোগ্যবস্তু স্বত্বেও অধিকাংশ সময়ংসামান্য একটু ক্ষুধা বিশেষতঃ সুনিদ্রার অভাবে বড়ই কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন, পক্ষান্তরে সেইরূপ আবার যে গরিব বেচারী সারাদিনের পরিশ্রমেও স্বকীয় উদারান্নেরই ভালরূপ সংস্থান করিয়া উঠিতে পারে না, সে ব্যক্তিও প্রচণ্ড ক্ষুধায় সময় কতকটা শাকান্নও যথাকালে সুনিদ্রার উপভোগ করিয়া অপার আনন্দলাভকরিয়া থাকে। তবেই এই হইল যে,সুখভোগটা কেবল ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যেই একচেটিয়া নহে। এক চেটিয়া নহে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ধনী ও দরিদ্র এই উভয়ের মধ্যেই বিষয়বিশেষে উক্ত রূপ সুখ ও দুঃখের সম্পূর্ণ ইতর বিশেষ থাকিলেও সাধারণে কিন্তু সে বিষয়ের বড় একটা পার্থক্য স্থির করিয়া লইতে সমর্থ হন্ না। যদি তাহাই হইতেন, তবে কি আর ঘোর দাম্ভিক ধনী, সতত দুশ্চিন্তা, ভোজন ও মৈথুনাদির অল্পতা বিশেষতঃ অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গ দ্বারা অধিকাংশসময় সমধিক উপদ্রুত থাকিয়াও গরিব অর্থাৎ কোনও ব্যক্তির বিষয়বিশেষের অভাব আছে বলিয়া তাহাকে অনাদর করিতে পারিতেন? বোধ হয় কখনই নহে। পক্ষান্তরে গরিব বেচারীর যদি এ জ্ঞান থাকিত যে, কেবল সুরম্যঅট্টালিকায় বাস অথবা প্রকাণ্ড জুড়ী গাড়ীতে আরোহণ দ্বারাই প্রকৃত সুখের অধিকারী হওয়া যায় না, যদি সে, বেশ বুঝিতে পারিত যে জঠরানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিলে সেই অবস্থায় শাকান্নভোজন দ্বারা রসনার চূড়ান্ত তৃপ্তিসাধন, এবং সারাদিন পরিশ্রমান্তে নিদ্রাতুর হইয়া তৃণশয্যায়শয়ন করিয়া সুনিদ্রার উপভোগ, এই উভয় বিধ সুখের নিকট ধনবানের পূর্ব্বোক্ত সুখসমূহ বড় একটা অধিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; তবে কি আর নির্ধন ব্যক্তি, ধনবানের নিকট অত অধিক দাসত্ব স্বীকার করিতে সম্মত হইতে পারিত? বোধ হয় কখনই নহে। ফল কথা আহারের তৃপ্তিসাধন যদি মনুষ্যগণের জীবনের একটী সর্ব্ব প্রধান সুখকর বলিয়া গণ্য হয়, সুনিদ্রা যদি মানবের পরম বন্ধু বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে গরিবকেই সে বিষয়ে অধিক ভাগ্যবান্ ও সম্পূর্ণ সুখী বলিতে হইবেক।

ধনী ও দরিদ্রের আহারের কথা বলিতে গিয়া এস্থলে আমাদের একটী

গল্প মনে পড়িল। গল্পটী এত মধুর ও শিক্ষাপ্রদ যে, বাজে কথা হইলেও পাঠকগণকে না শুনাইয়া থাকিতে পারিলাম না। গল্পটী এই—এই কলিকাতা সহরের কোন বাঙ্গালী মহারাজের সহিত এক জন সামান্যবেতন-ভোগী গরিব কেরাণী বাবুর কথঞ্চিৎ মেশামিশি ছিল। কেরানী বাবু প্রায়ই সকাল, সন্ধ্যা ও রাত্রি কালে মহারাজের নিকট যাতায়াত ও ২। ৪ টী মিষ্টকথা দ্বারা তাঁহার মনোরঞ্জন করিতেন। এবং মহারাজও তাঁহার উপর বিলক্ষণ সদয় ছিলেন। কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ একথা মনে করিবেন না যে, কেরাণী বাবু নেহাৎ মোসাহেবের ন্যায় মহারাজের নিকট যাতায়ত করিতেন। ফলতঃ গরিব হইলেও তাঁহার অন্তঃকরণ তাদৃশ গরিব অর্থাৎ ক্ষুদ্র ছিল না। বলা বাহুল্য যে, কেরাণী বাবুর হৃদয়ের এই মহত্ত্বতার জন্যই মহারাজ তাঁহাকে কিছু অধিক ভাল বাসিতেন। যাহা হউক, এক দিন রাত্রি প্রায় ৮ টার সময় কেরাণী বাবু মহারাজের বৈঠকখানায় গিয়া শুনিলেন যে, তিনি বাটীর ভিতর আহার করিতে গিয়াছেন। কিন্তু কিছু পরেই মহারাজ ভয়ঙ্কর হেউ হেউ রবে উদরের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বৈটক খানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজকে এরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়াই কেরাণী বাবু কহিলেন, কি মহারাজ, আজ বুঝি পলান্নাদি গুরুতর ভোজন করা হইয়াছে। ইহাতে মহারাজ পূর্ব্বোপেক্ষা কিছু বিষন্নভাবে উত্তর করিলেন, আহা রামবাবু; এ পোড়া অদৃষ্টে কি যে সুখ আছে যে আবার পোলাও কালিয়া ভোজন করিতে পারিব। সেই সকালে ১১ টার সময় অতি সূক্ষ্ম পুরাতন দাদখানি চাউলের অর্দ্ধমুষ্টি অন্ন একটু মাগুর মাছের ঝোলের সহিত ভোজন করিয়াছিলাম, সেই হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আর ক্ষুধার নাম মাত্রও ছিলনা। আর সেই সামান্য আহারেই আজ সমস্ত দিনটা কেমন দুর্গন্ধময় অম্ল ঢেকুর উঠিয়াছে, দুপুরের সময় কত চেষ্টাতেও একবার একটু নিদ্রা আসিল না। পরে সন্ধ্যার সময় গাড়ী চড়িয়া (অবশ্য প্রকাণ্ড জুড়ী গাড়ীতে) গড়ের মাঠে বেড়াইয়া আসায় তখন শরীরটা কিছু সুস্থ বোধ হইল। কিন্তু ক্ষুধার নাম মাত্রও নাই। তবে কি জান রামবাবু, রাত্রিতে উপবাসটা নাকি বড় ভাল নহে, তাই টাট্‌কা খৈয়ের অর্দ্ধ তোলা আন্দাজ গুঁড়া, অর্দ্ধ ছটাক বলকা দুগ্ধ ও একটু মিশ্রীর গুঁড়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া এই মাত্র খাইয়া আসিলাম। কিন্তু এমনই

পোড়া অদৃষ্ট যে, যেমন সেইটুকু পেটে গিয়াছে, অমনিই দেখ আবার উদ্গার উঠিতেছে ও শরীরটাতে কেমন অসুখ অসুখ বোধ হইতেছে। তা এ অবস্থায় যে রাত্রি একটু নিদ্রা হইবে; তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক রামবাবু, বলি তোমার ত আহারাদি সম্পন্ন হইয়াছে? রাম বাবু, আহা আমাদের আহারাদির কথা আর কেন বলেন মহারাজ, সেই সকালে ৭॥ টার সময় একটা আলু ভাতে ও শরাখানেক অড়োলের ডাউলের সহিত প্রায় অর্দ্ধসের চাউলের অন্ন দ্বারা উদরটা বোঝাই করিয়া আফিষে গিয়াছিলাম, আর এই রাত্রি আটটার সময় পুনর্ব্বার বাটীতে আসিয়া প্রায় তিন পোয়া আটার রুটী এক শরা অড়োল ডাউল, দুইটা কৈমাছ ভাজা ও এক পোয়া ইক্ষু গুড়ের সহিত আকণ্ঠ ভোজন করিয়া এই মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। এখানে একটু বিশ্রাম করিয়া যে রাত্রি ৯। ১০ টার সময় গিয়া শয়ন করিব,আর রাত্রের খবর কিছুই জানিবনা; মহারাজ একটু আগ্রহের সহিত উঃ বল কি রামবাবু, আমি যে তোমার কথা শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইলাম, -তিন পোয়া আটার রুটি, তুমি প্রত্যহ রাত্রে ভোজন কর!! রাম বাবু, তা বৈকি মহারাজ। মহারাজ, আহা রাম বাবু, তোমরাই সংসারে প্রকৃত সুখী, কেননা মনুষ্য জীবন ধারণ করিয়া যদি ইচ্ছামত আহারাদিই না করা গেল, তবে আর কেবল ঐশ্বর্য্যাদি দ্বারা সুখ কোথায়? মহারাজের এই কথা শুনিয়া রাম বাবু অপেক্ষাকৃত আনন্দ ও আস্পর্দ্ধার সহিত উত্তর করিলেন,মহারাজ! গাড়ী, ঘোড়া, বাড়ী,বাগান ও পরিচ্ছদপ্রভৃতি ঐহিক সুখকর সংসারের প্রায় সকল পদার্থেই আপনাদের সুখ এক চেটিয়া, তবে,আমাদের সুখের মধ্যে এই যে, দু বেলা ক্ষুধার সময় শাক কচু যা পাই, তদ্দারা তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করি। ও সারাদিন পরিশ্রমের পর রাত্রে সুখে নিদ্রা যাই। তা এ দুইটিও যদি মহারাজ আপনারা চান, তবে আর আমরা যাই কোথায়? মহারাজ কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন তা ঠিক্ বলিয়াছ রামবাবু, তোমরা কেবল আহার ও নিদ্রাগত সুখেরই অধিকারী নও, প্রকৃত পক্ষে এ সংসারে তোমারাই যথার্থ সুখী।

এক ধনী ও দরিদ্রের আহারের কথা তুলিয়া কতকগুলি বাজে কথা দ্বারা হয়ত পাঠকগণের বিরক্তি জন্মান হইল, কিন্তু আশা করি যে, গল্পটী

পড়িবামাত্রেই বিরক্ত না হইয়া ইহার আদ্যোপান্ত একবার চিন্তা করিয়া তবে বিরক্ত বা সন্তুষ্ট হইবেন। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, সেই ধনবানের অতুল-ঐশ্চর্য্যাদি সমস্ত সম্পদই বৃথা, যিনি ইচ্ছামত আহারাদি করিতে না পারেন, আর সেই গরিবের মৃত্যুই শ্রেয়স্কর, যে গরিব ক্ষুধার সময় শাকান্ন দ্বারা উদর পূর্ণ করিয়া তাহা জীর্ণ করিতে সমর্থ না হয়। ক্রমশঃ—

আধুনিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।

৭৮ অস্বাস্থ্যকর খাদ্য।

অস্বাস্থ্যকর খাদ্যে অনেক পীড়া জন্মায় বলিয়া সতর্কতার জন্য তাহার প্রধান কয়েকটা এ স্থানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) রুগ্ন পশুর মাংস।

এই সকল সদ্য হইলেও ভালমতে সিদ্ধ করিয়া রন্ধন করিলে বিশেষ হানিকর হয় না, কিন্তু অর্দ্ধ পক্কাবস্থায় খাইলে প্রায়ই বমন বা ভেদ উপস্থিত করে এবং কখন কখন জ্বরও জন্মায়।

(২) গলিত বা পচা মাংস।

পচা লেঙ্গচা উত্তম রূপে রন্ধন করিলে ও তাহা নিরোগী খাদ্য নহে। ইউরোপীয়দের মধ্যে অনেকে শীকার করা পাখী ও পশুর সদ্য মাংসকে বাসী ও দুর্গন্ধ করিয়া খাইতে ভালবাসে। ভাল জীর্ণশক্তি থাকিলে শীত-প্রধান দেশে ঐ রূপ আহারে বিশেষ হানি হয় না, কিন্তু এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যাহাদের জীর্ণশক্তি কম বা পেটের পীড়া আছে, তাহাদের ঐরূপ খাদ্যে বিশেষ বিপদের আশঙ্কা করা যায়।

(৩) মুখে ক্ষত থাকিলে পচা মাংস নিতান্ত অনিষ্টকর। গাল বা গলার ভিতর জিহ্বাতে বা মাড়িতে ভাঙ্গা দাঁতে বা অন্য কোন কারণে ক্ষত হইলে ইহাদের পচা মাংস খাওয়া একবারে নিষেধ। উহার বিষ একবারে রক্তে প্রবেশ করিয়া সাজ্ঘাতিক ফল জন্মাইতে পারে।

(৪) কৃমি ইত্যাদির কারণ—

এই সকলের বীজ বা ডিম অনাচ্ছাদিত খাদ্য বা পানীয় দ্রব্যের সঙ্গে উদরে প্রবেশ করিলেই শেষে নানা জাতীয় কৃমি জন্মে। ট্রিকাইনা নামক কীট অৰ্দ্ধপক্ক শূকরের মাংসের সঙ্গে উদরে প্রবেশ করিয়া শরীরের নানা ভাগে ছড়াইয়া পড়ে। আবার ঐ মাংসের আর এক প্রকার কীটের ডিম উদরে প্রবেশ করিলে ফিতার মত ৯।১০ হাত লম্বা আকারের কৃমি জন্মায় সেই মতে হাইডেটীড্ নামক জন্তুও জন্মে।

(৫) অস্বাস্থ্যকর দুগ্ধের পীড়া—

১। অধৌত পাত্রে বা বাসী খাদ্যসামগ্রী যে কুঠরীতে রাখা হয়, তথায় অনাবৃত পাত্রে দুগ্ধ রাখিলে সেই দুগ্ধ পানের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হয়। সেই রূপ পাইখানা ধোয়া জলের মহরী বা রাস্তার ধারের দুর্গন্ধযুক্ত নৰ্দ্দমার কাছে বসিয়া অনাবৃত পাত্রের দুধ যে বিক্রী করা হয়, তাহাও অপেয়। কারণ তাহাতে যে ভেদ আমাশা বা জ্বরাতীসার পীড়া জন্মাইতে পারে।

২য়। বায়ুতে যে জ্বর, ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের বীজ সময় সময় যথেষ্ট পরিমাণে ভাসিতে থাকে, অনাবৃত পাত্রের দুগ্ধে তাহা আকর্ষণ করিয়া নেওয়াতে সেই দুগ্ধ পান করিলে ঐ সকল রোগ হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে।

৩য়। জলমিশ্রিত দুধ। পরিস্কার জল মিশান হইলে কেবল দুধের পুষ্টিকর গুণের হ্রাস পায় কিন্তু নৰ্দ্দামা বা গাড়ীর ময়লা জল কূপের বা পুষ্করণীর জলে মিসিলে কিম্বা বিষ্ঠা কূপেতে বা পুষ্করণীতে ত্যাগ করিলে অথবা ময়লা কাপড় বা বিছানা ঐ সকলের জলে ফেলিয়া ধুইলে সেই জল তুলিয়া দুধে মিশাইলে সেই দুধ পান করাতেও উদরাময় বা জ্বরাতীসার হওয়ার আশঙ্কা থাকে, ঐরূপ দুগ্ধপানে শিশুদের হাগা হওয়ায় বিশেষ আশঙ্কা থাকে, এমন কি শিশুদের দুধের বোতল বা বাটী ঐরূপ জলে ধুইয়া তাহাতে করিয়া ভাল দুধ পান করাইলেও উহাদের পেটের পীড়া জন্মিতে পারে।

(৬) লোনা মাংসের অনিষ্টকারিতা।

জাহাজে নাবিকেরা নিয়ত লোনা মাংস খাইলে স্কর্ভি নামক এক ভয়ানক

রোগ জন্মে। আবার যাহারা অধিক লবণ খায়, তাহাদের প্রায়ই অল্প বয়সে চোকে ছানি পড়িতে পারে। যাহারা হিংস্রক জন্তুর ন্যায় শুদ্ধ মাংস বা মৎস্য ভোজন করে, তাঁহাদেরও ঐ রোগ জন্মে

(৭) কোন কোন্ মৎস্য আহারের পীড়া—

ইউরোপে মলেট, এঙ্কোভি, মসেল্‌স ইত্যাদি নামক মৎস্য আহারে চর্ম্মে আমবাত বা এক প্রকার পিত্তানি বাহির হয়। এদেশে বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে কাঁকড়া কোন ও কোন জাতীয় চিঙ্গড়ি মাছ খাইলে ও শরীরে আমবাত নির্গত হইতে দেখা যায়।

(৮) লাবণিক খাদ্যের অভাব

যে সকল শিশুদের শুদ্ধ আরারুট, সাগু বা টেপিওকা ইত্যাদি জলে সিদ্ধ করিয়া চিনি দিয়া খাওয়ান হয় তাহাতে অস্থি রচনাকর উচিত পরিমাণে লাবণিক পদার্থের অভাবে ঐ সকল শিশুর শরীরের অস্থি নানা মতে বেকিয়া যায়, তাহাতেই তাহাদের হয়ত পায়ের নলা বা পিঠের ডাঁড়া বেকিয়া যায় বা বক্ষের বিকৃতি হয়, অথবা মাথার খুলী পাতলা হয়, তাহাতে ঐ সকল অস্থির ভিতর দিকের যন্ত্রের ও নানা পীড়া বা দোষ পরে প্রকাশ পায়।

(৯) শুদ্ধ তরল খাদ্যের দোষ—

যাহারা শুদ্ধ তরল খাদ্য ব্যবহার করে, তাহাদের মাংসপেশীর সূত্র সকল শিথিল, রক্ত পাতলা ও মুখ স্ফীত দেখায়। ইহাদের শরীর স্বভাবতঃ দুর্ব্বল এবং স্নায়ুর উত্তেজনাবশতঃ সামান্য কারণে অধিক কষ্টভোগ করে।

(১০) অতিরিক্ত আহার—

অলসতার সঙ্গে অতিরিক্ত আহার করার অভ্যাস থাকিলে তাহাদের যে অম্ল রোগ বা পেটের পীড়া জন্মে, তাহা কোন ঔষধে ভাল হয় না। কিন্তু দ্বিগুণ ব্যায়াম বা পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলে ও আহার অর্দ্ধেক কমাইতে পারিলে সামান্য ঔষধে বা আপন হইতে রোগ ভাল হয়।

৭৯। আর কয়েক অনিষ্টকর খাদ্য।

(১) পুরাতন ডাল—

ছোলা, মটর, অড়হর. ইত্যাদি ডাল পুরাতন ছাতাপড়া বা দুর্গন্ধি হইলে

ভাল সিদ্ধ হয় না এবং তাহা খাইলে ভেদ বা আমাশার পীড়া জন্মায়

(২) রুগ্ন রাই শস্য—

রুগ্ন রাই দিয়া রুটী প্রস্তুত করিয়া খাইলে খেচনী বা টঙ্কার রোগ কিম্বা উহার সঙ্গে জ্বরও হইতে পারে।

(৩) ধাতুর কলঙ্ক—

শিশার পাত্রে রাখা খাদ্য বা জল দীর্ঘকাল আহার বা পান করিলে শিশশূল বা অন্ত্রশূল রোগ জন্মে। তাঁবার ডেগের টিন বা কলাই উঠিয়া গেলে পরে উহাতে ভাত ব্যঞ্জন করা নিষেধ; কারণ, ঐ সকল আহার করিলে স্নায়ুর পীড়া বিশেষতঃ হৃৎকম্প রোগ জন্মিতে পারে।

(৪) অন্যান্য খাদ্যের ভাঁজ—

মাখমে চব্বী, ঘৃতে নারিকেল তৈল প্রায় ভাঁজ দেওয়া হয়। শির্কার আচারে তুতিয়া দিয়া নীলবর্ণ করা হয়। এই প্রকার মিশ্রিত সকল আহারে নানা পীড়া জন্মায় এ জন্য সতর্ক হওয়া আবশ্যক। ক্রমশঃ—

ড্রপ্‌সি বা শোথ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; ভেইনের ভিতর রক্তের গতি রোধ হইয়া ভেইন সকল অতিশয় পূর্ণ হইলেই শোথ জন্মাইতে পারে। এক্ষণে তাহার দু একটী দৃষ্টান্ত দেখ;—স্ত্রীলোকের গর্ভ সঞ্চার হইলে তাহাদের পায়ে শোথ জন্মে এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই শোথ ভাল হইয়া যায়। এই শোথের কারণ এই যে, পায়ে যে দুটী বড় বড় ভেইন আছে, তাহাদের গোড়ার গর্ভের চাপ পড়িয়া উহাদের মধ্য দিয়া আর ভাল করিয়া রক্ত চলেনা সুতরাং ঐ সঞ্চালিত স্থলের নিম্নে সমস্ত অংশে শোথ জন্মে। সেইরূপ যকৃতবৃদ্ধি রোগ হইলে উদরের ভিতরকার পোর্টাল ভেইন নামক শিরায় যকৃতের চাপ লাগিয়া উদরগহ্বরে জল সঞ্চয় হয় এবং যকৃদুদর রোগ জন্মে।

আবদ্ধ ভেইন যত বড় ও হৃদয়ের যত নিকটবর্ত্তী হয়, শোথও তত্তই শরীর-ব্যাপী হয়। পায়ের একটী ক্ষুদ্র ভেইন আবদ্ধ হইলে কেবল আবদ্ধ স্থানের নিম্ন ভাগে মাত্র শোথ জন্মে, কিন্তু হৃদয়ের নিকটে যে দুইটী বড় ভেইন রহিয়াছে (ভিনা কেভা সুপিরিয়র ও ইন্‌ফিরিয়ের) তাহারা আবদ্ধ হইলে শোথ সর্ব্ব শরীরব্যাপী হয়। যে ভেইন দিয়া যে অঙ্গের রক্ত হৃদয়ে ফিরিয়া আসিতেছে, সেই ভেইন বদ্ধ হইলে সেই স্থানমাত্রের শোথ জন্মে। যে কোন কারণেই হউক, ভেইনের ভিতর রক্তের উজান বা উল্টা গতি হইলেই শোথ জন্মে। একটী নদীর স্রোতের মুখে যদি বাঁধ দেওয়া যায়, তবে কিরূপ ফল হয় দেখ। যদি জলে বাঁধ ডেঙ্গাতে না পারে, তবে ক্রমে ক্রমে বাঁধের উল্টাদিকে জল জমিয়া তারপর উজাইতে আরম্ভ করে। তারপর ঐ জল ক্রমশঃ নদী ছাপাইয়া মাঠ ঘাট প্লাবিত করে। হৃদয় যন্ত্রের পীড়া হইলে যে শোথ রোগ জন্মে তাহাও ঐ রক্তের উজানগতি বশত হইয়া থাকে। হৃদয়ের দক্ষীণ অরিকেলের যে স্থলে বড় ভেইন আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ঠিক ঐ স্থল যদি পীড়ার দ্বারা অবরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া শোথ হয়। একটী স্ত্রীলোকের শরীরের উপর অর্দ্ধাংশের অর্থাৎ হাতের মুখের শোথ হইয়াছিল, কিন্তু নিম্নার্দ্ধে শোথ জন্মিয়া ছিলনা। ঐ স্ত্রীলোক মরিলে দেহ ব্যাবচ্ছেদে দেখা গেল, যে তাহার সুপিরিয়র ভিনাকিভা (যাহার দ্বারা হাতের ও মাথার রক্ত হৃদয় ফিরিয়া আসিতেছে) পীড়িত ও অবরুদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে। অনেক স্থলে কোন ভেইন অবরুদ্ধ হইলেও শোথ হয় না। সেইরূপ স্থলে এই বুঝিতে হইবে যে, ঐ ভেইন অবরুদ্ধ স্বত্ত্বেও তাহার নিকটস্থ অন্যান্য ভেইন দিয়া রক্তের গতি হইতেছে। অর্থাৎ এক ভেইনের কার্য্য অন্যান্য ভেইন সমষ্টির দ্বারা নির্ব্বাহিত হইতেছে। যেমন নদীর মুখে বাঁধ দিলে বাঁধের আশ পাশের খাল বা নিম্ন জমি দিয়াও জল যায়, শরীরের ভিতরও ঐরূপ ব্যাপার সংঘটিত হয়। অবরুদ্ধ স্থান দুরারোগ্য ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, ক্রমে অবরুদ্ধ ভেইনটী শুষ্ক ও ছিদ্রবিহীন (নিরেট) হইয়া যায় এবং তাহার আশ পাশের ভেইন (যাহা দিয়া বাধা প্রাপ্ত রক্ত চলিতেছে) ক্রমে আকারে বড় হইয়া মূল ভেইনের ন্যায় মোটা হয়। একটী লোকের পেটে কাল কাল শিরা গুলি অত্যন্ত মোটা এবং কোঁকড়ান দেখাইত। জীবদ্দশায়

তাহার কোনই কারণ নির্ণীত হইল না। কিন্তু সে মরিলে তাহার দেহ পরীক্ষায় দেখা গেল যে, তাহার ভিনা কেভাইনফিরিয়র এক স্থলে অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এস্থলে বলিতে হইবে যে, পেটের ভেইন সকলের দ্বারাই ভিনাকেভা ইনফিরিয়রের কার্য্য চলিতেছিল।

হৃদয়ের ভিতর যে সকল দ্বার ও কপাট আছে তাহার যে কোনটিতে পীড়া হইয়া রক্তের স্বাভাবিক গতি রোধ হইলেই রক্ত উজাইয়া শরীরের ভেইন সকল পূর্ণ করিয়া শোথ জন্মাইয়া দেয়। দক্ষীণ পার্শ্বের ত কথাই নাই, হৃদয়ের বাম দিগের কোটরের দ্বার পীড়িত হইলেও ভেইনমধ্যে রক্তের উজান গতি হয়। মনেকর বামদিকের অরিকেল ও ভেণ্ট্রিকেলের ভিতর যে দ্বার আছে তাহা পীড়ার দ্বারা সঙ্কীর্ণ হইয়াছে এখন কি ঘটিতেছে দেখ, ;— বামদিকের অরিকেল হইতেবাম দিকের ভেণ্ট্রিকেলে ভাল হইয়া রক্ত যাইতে পারিল না ; সুতরাং রক্ত, ফুস্ফুষে আসিল, সুতরাং ফুস্ফুষ পীড়িত ও শোথ যুক্ত হইল,তারপর বরাবর ফুষফুষ হইতে রক্ত উজাইয়া হৃদয়ের দক্ষীণ ভেণ্ট্রিকেলে এবং তথা হইতে দক্ষীণ অরিকেলে আসিয়া বরাবর ভেইন মুখো উজাইয়া চলিল। ঐ উজানগতি নিবন্ধন শরীরের সর্ব্বাঙ্গে শোথ হইল।

আবার কোন কোন স্থলে শোথ হইয়াছে, অথচ কোন ভেইন অবরুদ্ধ হয় নাই অথবা তাহার হৃদয়ও পীড়াগ্রস্ত নহে, এমনও দেখিতে পাওয়া যায়। চিকিৎসকমাত্রেই অবগত আছেন যে শরীর কোনরূপে রক্তহীন হইলেই শোথ রোগ উপস্থিত হয়। যথা ;—পুরাতন অতিসার ও উদরাময়গ্রস্ত রোগী এবং প্লীহা রোগী পরিণামে শোথগ্রস্ত হইয়া থাকে। এই সকল রক্তহীন রোগীর শোথ হইবার কারণ কি ? অনেকে বলেন, এরূপস্থলে রক্ত অত্যন্ত পাতলা হয় সুতরাং উহা অতি সহজেই ভেইন সকলের গাত্রে চোয়াইয়া বাহিরে নির্গত ও সঞ্চিত হইয়া শোথ উৎপন্ন করে। আবার এই সকল স্থলে ভেইনের গাত্রও অত্যন্ত পাতলা হয়, সুতরাং রক্তের জলীয়াংশ ভেইনের গা দিয়া নির্গত হইবার সুবিধা হয়। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে, এই সকল কারণ নিচয়ের নিম্নে সেই একই প্রধানকারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এখানেও ভেইন সকলে রক্ত আবদ্ধ হইয়া শোথ জন্মিয়াছে। যেমন রোগী রক্তহীন ও দুর্ব্বল হইয়াছে, তেমনি তাহার হৃদয়ও দুর্ব্বল হইয়াছে। সুতরাং হৃদয় আর

পূর্ব্বের ন্যায় সজোরে রক্ত চালাইতে পারিতেছেনা। রক্ত, ধমনী বহিয়া যোগে যাগে যাইতেছে, কিন্তু ধমনীর শেষশাখায় ও ভেইনের উৎপত্তিস্থলে গিয়া আট্‌কাইয়া যাইতেছে এবং ভেইন পূর্ণ হইয়া ভেইনের গা চোঁয়াইয়া জলীয়াংশ নির্গত হইয়া শোথ উৎপন্ন করিতেছে। এইরূপ অবস্থায় শরীরের যে অঙ্গ হৃদয় হইতে যত দূরবর্ত্তী এবং যে অঙ্গ যত নিম্নে অবস্থিত, সেই অঙ্গে তত শোথ জন্মিতেছে। এই কারণবশতঃ দুর্ব্বল রক্তহীন রোগীর হাত পায় এবং চোখ মুখে শোথ হয়। এই কারণ বশতই দুর্ব্বল রোগী পা ঝুলাইয়া বসিলে তাহার পায়ে শোথ নামে, এবং যে পার্শ্বে শুইয়া থাকে সেই পার্শ্বের চোখ মুখ বেশী ফুলিয়া উঠে। পুরাতন রক্তহীন অতিসার গ্রস্ত রোগীর হাত পা ফুলিয়া উঠিলেই জানিবে রোগ খুব কঠিন হইয়াছে। মহানুভব শুশ্রুত কহিয়াছেন, যদি অতিসার, শোথ, জ্বর এবং মাংসহীনতা (ক্ষীণতা) একত্র বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে সে রোগী দুশ্চিকিৎস্য। এরূপ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। অতিসার শোথ হইলেই জানিবে উহার হৃদয় অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছে। আবার অতিসার বর্ত্তমান থাকায় উহার শরীরের জলীয় ভাগ নির্গত হওয়া সত্ত্বেও শোথ জন্মাইতেছে। (জোলাপ দিয়া দাস্ত আনান শোথ রোগের একরূপ চিকিৎসা)। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, রোগীর শরীরের সমস্ত রক্ত অসার ও অত্যন্ত পাতলা হইয়াছে এবং উহার হৃদয়ও অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছে। তার সঙ্গে আবার জ্বর, এখন কোন্ দিক রক্ষা করিবে?

একক্ষণে পুরাতন শোথের (প্যাসিব্‌ বা ক্রণিক ড্রপ্‌সি) বিষয় বলিলাম। বারান্তরে একুটে ড্রপ্‌সি বা তরুণ শোথের বিষয় বলিব।

ক্রমশঃ——

বৈশাখ, ১২৯৪। } শ্রীপুলিন চন্দ্র সান্যাল এম, বি।

আয়ুর্ব্বেদে শোথরোগ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

ইতি পূর্ব্বে জ্বর, অতিসার গ্রহণী প্রভৃতি রোগের কিরূপ অবস্থায় সম্ভবতঃ শোথ জন্মিতে পারে, তাহা বলিয়াছি। অতঃপর অন্যান্য কোন্ কোন্ রোগের কোন্ কোন্ অবস্থায় শোথ জন্মে, ক্রমে তাহা বলিতেছি।

ঐ উপরোক্ত কতকগুলি রোগ ব্যতীত অন্য যে সমস্ত রোগে উপসর্গরূপে শোথ জন্মে, তন্মধ্যে পাণ্ডু বা কামলা এবং উদররোগেই সম্ভবতঃ স্পষ্টরূপে ও অধিক পরিমাণে শোথ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। কেননা পাণ্ডুরোগ হইলে প্রায়ই সেই রোগীর চক্ষের কোণে শোথ জন্মে। এবং কফ বা পাণ্ডুরোগে শরীরের হস্তপদাদি বা উদরাদিস্থানেও শোথ জন্মিতে দেখা যায়। তদ্ভিন্ন আর একটী বিশেষ কথা এই যে, যে কোন পাণ্ডুরোগই কেন না হউক, তাহাদের অঙ্গবিশেষে বিশেষ কোন শোথ না জন্মিলেও রোগীর আকৃতি বা চেহারা বিশেষতঃ চর্ম্ম এমনই একরূপ অনির্ব্বচনীয় আকার ধারণ করে যে, তাহাদিগকে দেখিবা মাত্রেই যেন তাহাদের শরীর ফুলিয়াছে এমত বোধ হয়। পরন্তু পাণ্ডুরোগে যদি রোগীর কোষ্ঠে বহুল পরিমাণে ক্রিমি থাকে, তবে তাহার চক্ষের কোণ, পা, নাভি ও লিঙ্গ স্থানে প্রায়ই শোথ জন্মে। তাহা ছাড়া পাণ্ডুরোগী যখন অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে, তখনও প্রায়ই রোগীর সর্ব্বাঙ্গে শোথ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু এই অবস্থায় শোথ বিশেষতঃ তাহার সহিত অতীসার ও জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে রোগীর প্রাণ রক্ষা করা ভার হইয়া থাকে। আর কামলা রোগে যে রোগী প্রায়ই ভয়ানক ফুলিয়া পড়ে, সে সম্বন্ধে বোধ হয় আর অধিক কিছুই বলিতে হইবে না, ফলতঃ পাণ্ডু বা কামলা এই উভয় রোগেই অনেক সময়ে শোথ জন্মিয়া থাকে।

রক্তপিত্তরোগে প্রায়ই শোথ জন্মিতে দেখা যায় না। তবে ক্বচিৎ এমনও দেখা গিয়াছে যে, এই রোগের প্রথমাবস্থায় বিশেষ কোন রক্তরোধক ঔষধ দ্বারা বলপূর্ব্বক সেই রক্তের গতিরোধ করিলে রোগীর অঙ্গবিশেষে শোথ জন্মিতে পারে। কিন্তু এরূপ ঘটনা অতি বিরল।

যক্ষ্মা বা ক্ষয়রোগ কিংবা কাসরোগের প্রথমাবস্থায় প্রায়ই শোথ জন্মিতে দেখা যায় না। তবে এরূপ দেখা গিয়াছে যে, এই সমস্ত রোগের শেষ অবস্থায় ইহার সহিত ক্রমে জ্বর ও পেটের অসুখ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হওয়ায় রোগীর হাত, পা ও পেট ফুলিয়া থাকে। এই অবস্থায় শোথ বড় ভয়ানক, এস্থলে প্রায়ই রোগী রক্ষা পায় না। ক্রমশঃ——

স্ত্রীলোকের মাসিক রজঃস্রাব বা ঋতু।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এক বিষয় লিখিতে আর এক বিষয় আসিয়া পড়িল। স্ত্রীলোকের রজঃস্রাব লিখিতে লিখিতে বৃষের ও বলদের স্বভাবের ইতর বিশেষ লিখিতে বসিলাম। অতএব এ সম্বন্ধে এখন আর কিছু না বলিয়া মূল বিষয়ের অনুসরণ করাই যুক্তিসিদ্ধ। পরে সময় বিশেষে জীবদেহের উপর শুক্রের ক্রিয়া সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

মহাত্মা চরক বলেন "যেমন ইক্ষুতে রস, তিলে তৈল এবং দধিতে ঘৃত সর্ব্বত্র অনুগত ভাবে বিদ্যমান থাকে, শুক্রও সেইরূপ দেহের সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়াও ত্বকে আধিক্যরূপে বর্ত্তমান থাকে *। সেই শুক্র স্ত্রী পুরুষের সংযোগ, চেষ্টা, সংকল্প এবং পীড়ন বশতঃ আর্দ্র বস্ত্র হইতে জলের ন্যায় স্বস্থান হইতে চ্যুত হইয়া থাকে। হর্ষ বশতঃ এই শুক্র সর, সূক্ষ্ম, পিচ্ছিল, গুরু, চল, এবং দ্রব বলিয়া মারুতের বেগে চালিত হইয়া দেহ হইতে ক্ষরিত হয়"।

* রস ইক্ষৌ যথা দগ্নি সর্পিস্তৈলং তিলে যথা,
সর্ব্বত্রানুগতং দেহে শুক্রং সংস্পর্শনে তথা।
চরক।

উপরিউক্ত মত পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আয়ুর্ব্বেদ মতে ও ইউ-রোপীয় আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রর মতে শুক্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিলক্ষণ মত ভেদ আছে। মহাত্মা চরক ত্বককেই শুক্র ধাতুর প্রধান স্থান বলিয়াছেন কেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। সম্মীলনীর কোনও পাঠক যদি এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে ইচ্ছা করেন, করিতে পারেন।

শুক্র তরল আঠাবৎ পদার্থ। ডিম্বের ভিতরকার শ্বেতবর্ণ পদার্থের ন্যায় পিচ্ছিল। ইহা শ্বেতবর্ণ অথবা ঈষৎ হরিদ্রা বর্ণ। ইহার একরূপ বিশেষ ঘ্রাণ আছে। শুক্র অনুবীক্ষণ যন্ত্র সহকারে পরীক্ষা কারিলে ইহার ভিতর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূত্রবৎ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, উহাদিগকে শুক্রের কীটানু এবং ইংরাজি ভাষায় " স্পারমেটোজোয়া " বলে। এই গুলির আকার প্রকার বেঙ্গাচির (বেঙ্গের ছানা) ন্যায়। বেঙ্গাচির যেমন লেজ ও মাথা আছে, ইহাদেরও সেইরূপ লেজ ও মাথা আছে। ইহারা লম্বে প্রায় এক ইঞ্চের ১-৫০০ অথবা ১-৬০০ ভাগ হইবে। ইহাদের মাথায় একটী ক্ষুদ্র কাল টিপ আছে। ইহারা লেজ নাড়িয়া নাড়িয়া শুক্রের ভিতর অনবরতঃ সন্তরণ করিয় বেড়াইতেছে। ইহারা সাঁতার দিতে দিতে কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিকে চলিয়া যাইতেছে। ইহাদের গতির বেগ প্রতি তের মিনিটে প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চ। অর্থাৎ ইহারা গড়ে অর্দ্ধ ঘণ্টায় প্রায় এক ইঞ্চি পথ চলিতে পারে। শুক্র বাহিরে রাখিয়া দিলে স্পারমেটোজোয়া ২৪ ঘণ্টার অধিক কাল জীবিত থাকেনা। কিন্তু স্ত্রীলোকের যোনিতে ও জরায়ুতে শুক্র অবস্থিত হইলে ইহারা সাত আট দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে। শুক্রে জল মিশাইলে স্পারমেটোজোয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। অম্ল দ্রব্য অথবা কষায় দ্রব্য সংস্পর্শেও ইহারা মারা পড়ে। যে সকল স্ত্রীলোকের যোনিরস্রাব (মিউকস) পীড়া বশতঃ অম্লগুণ বিশিষ্ট হয়, তাহাদের সংস্পর্শে স্পারমেটোজোয়া বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং ঐ সকল স্ত্রীলোক বন্ধ্যা হয়। সহবাসের পরক্ষণেই শীতল জল দিয়া যোনি ধৌত করিলে স্পারমে-টোজোয়া বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে। স্পারমেটোজোয়া সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব বিশেষ কিনা সে পক্ষে অনেক সন্দেহ থাকিলেও, ইহা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে যে, ইহারাই শুক্রের সারাংশ এবং ইহাদেরই সংযোগে স্ত্রী ডিম্ব হইতে নূতন জীবের উৎপত্তি হয়। যে সকল পুরুষের শুক্র এই সকল কীটানু-

বিহীন, তাহারা সন্তানোৎপাদনে সক্ষম হয় না। শুক্র হইতে স্পারমেটোজোয়া ছাঁকিয়া ফেলিয়া ঐ শুক্রে স্ত্রীর জরায়ু মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেও, তদ্দ্বারা সন্তান উৎপাদন হয় না। ইহা পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে।

স্ত্রীপুরের পরস্পর মিলন সময়ে, এই সকল কীটানুর দুই চারিটী, শুক্রের সহিত জরায়ুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং স্ত্রীডিম্বের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া উহা হইতে নূতন জীব সৃষ্টি করে। স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়ের ঠিক কোন্ স্থানে আসিয়া কীটানু সকল স্ত্রীডিম্বের সহিত মিলিত হয়, তদ্বিষয়ে নানা জনের নানামত। সহবাসের অতি অল্পক্ষণ পরেই কোন স্ত্রী জন্তুকে বধ করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, যে উহার জনেন্দ্রিয়ের প্রায় সকল স্থলেই স্পারমেটোজোয়া বিচরণ করিতেছে। অতএব জরায়ু ওভেরি অথবা ফ্যালপিয়ান নল ইহাদের যে কোনটীতেই ডিম্বের সহিত স্পারমেটোজোয়া মিলিত হইতে পারে। তবে সম্ভবতঃ ফ্যালপিয়ান নলের (নল জরায়ু ও ওভেরিকে পরস্পর যুক্ত করিতেছে) অভ্যন্তরে এই মিলন সংঘটিত হয়। স্ত্রীর ঋতুর সময় গ্রাফিয়ান ফলিকল বিদীর্ণ হইয়া নির্গত ডিম্ব ফ্যালপিয়ান নলে উপস্থিত হয় এবং তথায় স্পারমেটো জোয়া গ্রহণ করিয়া জরায়ুতে উপনীত হইয়া সেইখানেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

স্ত্রীলোকের ওভেরিই স্ত্রীলোককে স্ত্রী প্রকৃতি প্রদান করে এবং ঐ ওভেরি আছে বলিয়াই স্ত্রীলোক ঋতুমতী হয়। যে সকল স্ত্রীলোককের আজন্ম ওভেরি নাই, তাহারা পুরুষাকৃতিবিশিষ্ট হয় এবং তাহাদের ঋতু হয় না। ওভেরিদ্বয়ের পীড়ার জন্য ডাক্তার মহাশয়েরা অস্ত্র চিকিৎসা দ্বারা অনেক স্ত্রীলোকের ওভেরিদ্বয় উৎপাটন করিয়া দিতে বাধ্য হন। এই সকল স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ওভেরি উৎপাটন করার পর ঐ সকল স্ত্রীলোকের আর ঋতু হয় না। ডাক্তার টামাস, নয় জন স্ত্রীলোকের ওভেরি উৎপাটন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে আট জনের ঋতু হওয়া বন্ধ হইয়াছিল, কেবল এক জনের মাত্র ঋতু হইয়াছিল। যেসকল স্থলে ওভেরিদ্বয় কাটিয়া দিলেও ঋতু দেখা দিয়াছে, সেসকল স্থলে এই অনুমান করিতে হইবে যে, ওভেরিদ্বয় সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত হয় নাই, উহার কতকাংশ থাকিয়া গিয়াছিল। অথবা পুরুষের অণ্ডকোষদ্বয় ছেদন করার পরও যেমন কোন

কোন পুরুষ কিছুদিনের জন্য পুরুষত্বহীন হয় না সেইরূপ ওভেরিদ্বয় কাটিয়া দেয়ার পরও কোন কোন স্ত্রীলোক কিছুদিনের জন্য স্ত্রীধর্ম্ম হারায় না। মধ্য এসিয়ার অনেক প্রদেশে ধনীও সম্ভ্রান্ত লোকের জেনানায় স্ত্রী পাহারা নিযুক্ত করার অভিপ্রায়, অনেক স্ত্রীলোকের অতি শৈশবে অস্ত্রকার্য্য দ্বারা ওভেরি কর্ত্তন করিয়া দেওয়া হয়। এই সকল ওভেরিহীন স্ত্রীলোক তত্তৎ প্রদেশে হিজরা বলিয়া অভিহিত হয়। এই সকল হিজ্‌ড়েদের স্তন উত্থিত হয় না আকার প্রকার ও স্বভাব অনেকটা পুরুষের ন্যায় হইয়া যায় এবং ইহাদের ঋতু হয় না বা পুরুষ সহবাসেচ্ছা থাকে না।

প্রতি মাসে প্রতি ঋতুর সময় গ্রাফিয়ান্ পরিপক্ব ও বিকীর্ণ হয়। অতএব স্ত্রীলোকের ডিম্ব নির্গত হওয়াই ঋতুর উদ্দেশ্য। কিন্তু ঋতুর সময় জরায়ু হইতে রক্তস্রাব কেন হয়, তদ্বিষয়ে কিছুই স্থির করিয়া বলা যায় না। গ্রাফিয়ান ফলিকল পরিপক্ক হওয়ার সময় ওভেরি জরায়ু এবং যোনি অত্যন্ত উত্তেজিত এবং রক্ত পূর্ণ হয়। অতএব বোধ হয়, এই উত্তেজনা নিবারণার্থই জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের ঋতু ও ইতর জন্তুর স্ত্রীজাতীয়ের সাময়িক উষ্ণতা এই উভয়-বিধ ব্যাপার পরস্পর সাদৃশ্য আছে। ঋতুর সময়ে সকল জীবেরই ডিম্ব নির্গত হয়। ঋতুর সময় যেমন স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয় রক্তপূর্ণ ও স্ফীত হয়, ইতরজন্তুদিগের ও গরমের সময় ঠিক্ সেইরূপ হইয়া থাকে। কোন কোন ইতর জন্তুর যেমন কুকুরের রক্তস্রাব পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অন্যান্য জন্তুদিগের রক্তস্রাব না হউক একরূপ পিচ্ছিল স্রাব হইয়া থাকে। এই উষ্ণতার সময় ইতর জন্তুরা পুংজাতীয়ের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত সচেষ্ট হয়। কিন্তু উহারা এই সময় ব্যতিত অপর কোনও সময়ে পুং জাতীয়কে নিকটস্থ হইতে দেয় না। বরঞ্চ অতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করে, উষ্ণতার সময় ব্যতিত অন্য সময়ে পুং সহবাস হইলেও ইতর জন্তুর গর্ভ সঞ্চার হয় না। মনুষ্য জাতির স্ত্রীজাতীয়ের লক্ষিত স্বভাব পর্য্যালোচনা করিলে ইতর জন্তুদিগের স্বভাব হইতে অনেক বিভিন্নত হইবেক। কিন্তু বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্য ও পশুর মোটের উপর প্রায় একই নিয়মাধীন মনুষ্যদিগের

স্ত্রীজাতীয়েরা যদিও সকল সময়েই পুরুষ সহবাসেচ্ছা প্রকাশ করে, কিন্তু ঋতুর সময়ে, ও তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে যে এই ইচ্ছা সমধিক বলবতী হয় তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে স্থল বিশেষে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেসকল স্ত্রীলোকের ঋতুর সময় অপেক্ষাকৃত অধিক স্রাব হয়, তাহারা সেই সময় এত দুর্ব্বল ও অসুস্থ হইয়া পড়ে, যে সেই সময়ে তাহাদের সহবাসেচ্ছা বরঞ্চ সমধিক অল্প হইয়া যায়। কিন্তু এরূপ স্থলেও ঋতু হইবার দিন কতক পূর্ব্বে সহবাসেচ্ছা প্রবল হয়। ইহা-বোধ হয় যে এ সম্বন্ধে ইতর জন্তু ও মনুষ্যে অধিকাংশে মিল আছে। তবে যে ঋতুর সময় ব্যতিতেও অন্য সময়ে মানব স্ত্রী সহবাসেচ্ছা প্রকাশ করে, তাহার এইমাত্র কারণ বোধ হয়, যে, ইহা সৃষ্টি কার্য্যের ক্রমিক উন্নতির নিয়মানুসারে সংঘটিত হয়। অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণির জন্তু হইতে আরম্ভ করিয়া জীব যতই উচ্চ শ্রেণীতে আরোহণ করিয়াছে, ততই তাহা-দের স্ত্রী পুরুষ সংযোগে প্রবৃত্তি শুদ্ধ সন্তানোৎপাদনের উদ্দেশ্য সাধন ব্যতিতও আহার বিহারাদির ন্যায় একটী নিয়মিত সুখভোগের সাগ্রমীতে পরিণত হইয়াছে। মনুষ্য যেমন ইতর জন্তুদিগের হইতে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে, সেইরূপ এ বিষয়েও শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। অতি নিম্ন শ্রেণীর জীবগণ জীবনভোগ করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করে না। কেবল অপর জীবের উৎপাদন জন্যই যেন তাহাদের জন্ম হয় এবং সেই উদ্দেশ্য সফল হইবা মাত্র জীবনলীলা সম্বরণ করে। অতি নিম্নশ্রেণীর ক্ষুদ্র কীট (যেমন রেশম কীট—গুঁটিপোকা) গুঁটি কাটিয়া বাহির হইবা মাত্র স্ত্রীশরীরে সংযুক্ত হয় এবং তদবস্থাতেই প্রাণত্যাগ করে। উহাদের স্ত্রীজাতীরাও ডিম্ব প্রসব করিয়া মরিয়া যায়। কিন্তু এইরূপ নিম্নশ্রেণী হইতে যতই উচ্চ শ্রেণিতে উঠা যায় ততই দেখিতে পাওয়া যায় যে স্ত্রী সহবাস অত্যন্ত আয়ুঃক্ষয়কর এবং দুর্ব্বলকর হইলেও ক্রমেই উহার ধ্বংশ-কারী ক্ষমতার লোপ হইয়া বিলাসের সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছে। ভেক প্রভৃতির সহবাস জীবনধ্বংশকর না হইলেও অত্যন্ত কষ্টদায়ক বলিয়া বোধ হয়। তারপর পক্ষীদিগের আচরণ দেখ। কোন কোন পক্ষী যেমন চড়াই ও হংস পুনঃ পুনঃ স্ত্রীগমন করিয়াও ক্লান্ত হয় না। এবং পক্ষীজাতীর

মধ্যে যেমন নির্ম্মল দাম্পত্য প্রণয় দেখিতে পাওয়া যায় এমন বোধ হয় আর কোন জীবে দৃষ্টিগোচর হয় না। কোন কোন চতুষ্পদ জন্তু উষ্ণতার সময় মাত্র স্ত্রীসহবাসে সক্ষম হয় এবং সেই সময়ে তাহারা কিছু দুর্ব্বল ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যায় যথা ;—কুকুর শৃগাল প্রভৃতির লোম উঠিয়া যায়। মনুষ্য, সকল জীব জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মনুষ্যের স্ত্রীজাতীয়েরা প্রতিমাসে ঋতুমতী হয়, এবং উহাদের পুরুষ জাতীয়েরা স্ত্রীগমন করিতে সর্ব্ব সময়েই সক্ষম ও প্রস্তুত থাকে। মনুষ্যজাতি নিয়মিত স্ত্রীসহবাস করিলে যে তাহাদের শরীরের পক্ষে অনিষ্ট হয় এবং পরমায়ুক্ষয় হয় এরূপও বোধ হয় না। বরঞ্চ অবিবাহিত পুরুষাপেক্ষা বহু আপত্যশালী পুরুষকে দীর্ঘজীবী হইতে দেখা গিয়াছে। এখনকার দুই একজন বঙ্গীয় গ্রন্থকার ইতর জন্তুর অনুকরণে মনুষ্যদিগেরও কেবলমাত্র ঋতুর সময়ে স্ত্রীগমন করা যুক্তি সিদ্ধ এবং অন্য সময়ে স্ত্রীগমন বিজ্ঞানানুমোদিত নয় এরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে পশুর সহিত মনুষ্যের তুলনা করা এবং পশু জীবনের নিয়ম হইতে মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্যাবধারণ করা নিতান্ত বিড়ম্বনা বলিয়া অনুমিত হয়। একথা খুব সত্য, যে অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ অত্যন্ত দোষের। কিন্তু যখন মানব স্ত্রীজাতীয়েরা ঋতুর সময় ব্যতিতও অন্য সময়েও সহবাসেচ্ছা প্রকাশ করে এবং গর্ভধারণে সক্ষম হয়, তখন শুদ্ধ যে, ঋতুর সময়েই পশুদিগের অনুকরণে স্ত্রীগমন যুক্তি সিদ্ধ এবং অপর সময়ে গমন করা প্রকৃতির বিরুদ্ধ ইহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। জীবের যে সংস্কার ও প্রবৃত্তি আপনা হইতে জন্মায় তাহাই প্রাকৃতিক। এবং ভিন্ন ভিন্ন জীবের সংস্কার ও প্রবৃত্তি বিভিন্ন প্রকারের। জীবমাত্রেই একই নিয়মের অধীন নহে। নানাবিধ ইতর জন্তুর মধ্যে ব্যবহারগত নানা ইতর বিশেষ আছে কুকুর প্রভৃতির স্ত্রীজাতীয়েরা নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতিত অন্য কোন সময়ে পুরুষ জাতীয়কে গ্রহণ করেনা। ইহাদের পুরুষ দিগেরও সেই সময় ব্যতিত অন্য সময়ে স্ত্রীগমণের ক্ষমতা থাকেনা। আবার গো ছাগ প্রভৃতি জন্তুগণের পুং জাতীয়েরা সকল সময়েই স্ত্রীসহবাস করিতে প্রস্তুত ও সমর্থ থাকে কিন্তু উহাদিগের স্ত্রীজাতীয়েরা একই নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য সময়ে পুংজীবকে নিকটে আসিতে দেয় না। কিন্তু মনু-

ব্যের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই প্রায় সকল সময়েই সহবাসেচ্ছা প্রকাশ করে এবং তাহাতে সক্ষম হয়। অতএব সকল বিষয়েই পশুদিগের ব্যবহারকেই ঐশ্বরিক নিয়ম বলিয়া তদ্দৃষ্টান্তে মনুষ্য চরিত গঠন করিতে যাওয়া নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। মনুষ্য ও পশুতে কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও অনেক বিষয়ে বিলক্ষণ ইতর বিশেষ দেখা যায়। মনুষ্যকে যদি পশুর আচরণ দেখিয়া নীতি সংগ্রহ করিতে হয়, তবে মনুষ্যকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া অভিহিত করা অন্যায়। ক্রমশঃ——

শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল
এম, বি।

চক্ষুরোগ।

অপরাপর রোগের সহিত চক্ষুরোগের সম্বন্ধ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এদিকে অত্যন্ত কাশি হইয়া উৎকাশি রোগে ও শিশুদিগের সশব্দক উৎকাশি রোগে এবং হুপিং কফ রোগেও চক্ষুর শ্বেতক্ষেত্রের কিয়দংশ ইকাইমোসিস রোগে ভয়ানক লাল হইয়া উঠে। উহাতে ইডিমা রোগে চক্ষুর পাতাও স্ফীত হইতে পারে। অত্যন্ত হাঁচি হইয়াও অনেক সময়ে চক্ষুতে উপর্য্যক্ত রোগোৎপত্তি হয়। এতভিন্ন হৃদপিণ্ডের পীড়ায় কোরইড অথবা রেটিনায় রক্তা-

ধিক্য ঘটে। উহাতে এম্‌ব্লিওপিয়া, রেটিনাইটিস্, রেটীনাইটিস এপোপ্লেক্টিকা, দর্শন স্নায়ুর এট্রোফি, চক্ষুর পাতায় ইডিমা, এবং চক্ষুতে কিমোসিস প্রভৃতি রোগও ঘটে। নক্সভমিকা, সীসা; ভিনিগার, গাঁজা, তামাক, কুইনাইন, আফিঙ, ধুতুরা এবং এট্রোপিনী প্রভৃতি বিষাক্ত দ্রব্য দ্বারা শরীর বিষাক্ত হইলে চক্ষুতে এম্‌ব্লিওপিয়া এবং য়্যামোরোসিস প্রভৃতি রোগ ঘটিয়া চক্ষু চিরকালের মত অন্ধ হইয়া যায়। এইরূপে ব্রাইট্‌স্ ডিজিজ প্রভৃতি কিড্‌নির পীড়ায় চক্ষুতে রেটিনাইটিস এপোপ্লেক্টিকা, দর্শন স্নায়ুর এপো প্লেক্সি, পাতার স্ফীতি, কিমোসিস এবং ইপিড্রোসিস প্রভৃতি রোগ ঘটে। মূত্র-বিশৃঙ্খলায়-চক্ষুতে রেটিনাইটিস, কিমোসিস এবং কঞ্জংটিভাইটিস প্রভৃতি রোগ জন্মে। ঘর্ম্ম-বিশৃঙ্খলায়—এম্‌ব্লিওপিয়া, ইপিড্রোসিস এবং কঞ্জংটিভাইটিস রোগ জন্মে। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেও কোন কারণে ঋতুবিশৃঙ্খলা ঘটিলে, রেটিনায় রক্তাধিক্য ঘটে। ঐ কারণে, শেষ ঋতুলোপে—গ্লকোমা; রজসাধিক্যে---সিক্লাইটিস, রজসাভাবে—রেটিনাইটিস এপোপ্লেক্টিকা এবং এক্সপথালমিক গয়েটার প্রভৃতি চাক্ষুষ রোগ জন্মে। গর্ভাশয় ও জরায়ুর বিশৃঙ্খলায়—কোরইডাইটিস, গ্লকোমা, রেটিনার হাইপারীমিয়া, রেটিনাইটিস এপোপ্লেক্টিকা এবং এম্‌ব্লিওপিয়া প্রভৃতি রোগ হইয়া থাকে। গর্ভ-ধারণ করিয়াও অনেকে অপ্টিক নিউরাইটিস রোগ ভোগ করিয়া থাকে। সন্তান্ প্রসবান্তে অনেক প্রসূতি রেটিনাইটিস, রেটিনাইটিস এপোপ্লেক্টিকা এবং য়্যামোরোসিস প্রভৃতি রোগাক্রান্ত হইয়া দৃষ্টিনাশের নিমিত্ত চিকিৎসার্থিনী হয়। সেইরূপ অতিরিক্ত স্তন্য প্রদান করিয়াও প্রসূতি এম্‌ব্লিওপিয়া, য়্যামোরোসিস এবং অপ্টিক নিউরাইটিস প্রভৃতি চাক্ষুষ রোগাক্রান্ত হয়। ক্লোরোসিস রোগে চক্ষুতে এক্সপথ্যাল্‌মিক গয়েটার রোগ জন্মে। স্কর্ভি রোগে—আমরা রাতকাণা হইতে পারি; এবং ডিফ্‌থিরিয়া রোগে চক্ষুতেও ডিফ্‌থারিটিক্ কঞ্জংটিভাইটিস এবং আপ্টক নিউরাইটিস রোগ জন্মে। ক্রমশঃ——

১নং কৃষ্ণসিংহের গলি
সিমলা, কলিকাতা, } ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণহরি ভট্টাচার্য্য।

বৈদ্যমতে চক্ষুরোগ।

সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও আর নাই। চক্ষুরোগের কথা দূরে থাকুক্, পুরাতন জ্বর, আমরক্ত, আমাশয়, রক্তপিত্ত, ও প্রমেহপ্রভৃতি যে সমস্ত রোগের অহরহ বৈদ্যচিকিৎসা দ্বারা অতি আশ্চর্য্যরূপে আশু প্রতাকার হইতে দেখা যায়, বৈদ্যমতে সেই সমস্ত রোগের বিষয় লিখিয়াই যে সমাজে কল্‌কে ভার, তা সেই সমাজে আজ্ কিনা যে চক্ষুরোগে লোক ক্রমাগত ২০ বৎসর পর্য্যন্ত ভুগিয়া অন্ধদশায় উপনীত হইলেও ভরসা করিয়া বৈদ্য চিকিৎসার নাম পর্য্যন্তও একবার মুখে আনিতে সাহস পায় না। সেই চক্ষুরোগের বিষয় লিখিতে আরম্ভ করিলাম। সুতরাং ইহা আস্পর্দ্ধার কথা বটে। কিন্তু কি করিব, প্রথমেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে,যে কোন রোগের বিষয় সম্মিলনীতে লেখা আরম্ভ হইবে, ভাল হউক, আর মন্দই হউক, ত্রিবিধ-মতে লিখিতেই হইবেক। কাজেইএ স্থলে আর সে সব কথা না ভাবিয়া সে ভাল মন্দের বিচার আর না করিয়া আমাদের পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞামত আজ্ বৈদ্যমতে চক্ষুরোগের বিষয় লিখিতে আরম্ভ করা গেল।

কিন্তু একটী কথা আছে, আলোচনার অভাবে বৈদ্য চিকিৎশাস্ত্রের বিশেষতঃ আবার চক্ষু চিকিৎসাবিষয়ের অস্তিত্বসম্বন্ধে বর্ত্তমান সমাজে নাই বলিয়া যত অধিক জনরব, বাস্তবিক্ কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রমতে চক্ষুরোগ সম্বন্ধে যে কিছুই নাই তাহা নহে। তবে অবশ্য এখানকার সম্বন্ধে তুলনা করিলে কোন কোন বিষয়ে কিছু অভাব বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। যাহা হউক, সেই অভাবটী কতদূর, তাহা প্রতিপাদনকরাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আবার বৈদ্যশাস্ত্রমতে চক্ষুচিকিৎসাসম্বন্ধে কোন কোন বিষয়ে অভাব বোধ হওয়ার একটী বিশেষ কারণ আছে। কেননা এখনকার কালে যেমন কথায় কথায় চক্ষুরোগ, সে কালে কিন্তু এ পোড়া চক্ষুরোগ এত অধিক জন্মাইত না। যেহেতু, সেকালে এমন অল্প বয়সে অর্থাৎ ১৫। ১৬ বৎসরের মধ্যে এন্স, বিএ বা সিভিলসারভিস্ পাশের জন্য চক্ষুকে এত অধিক ব্যবহার করার প্রয়োজন হইত না। বিশেষতঃ তখন চক্ষুরোগের বিশিষ্টকারণ মেহ,

গরমী ও পারার দোষ প্রভৃতি দ্বারা লোককে এত অধিক আক্রান্ত হইতেও দেখা যাইত না। আর এখানকার মত একটী উৎকৃষ্ট সভ্যতাও সেকালে প্রচলিত ছিলনা। সেই অসভ্যতাটী চক্ষে কাজল দেওয়া। বস্তুতঃ বিদেশীয় বাহ্যিক চাক্‌চক্যে মজিয়া গিয়া হিন্দুসন্তান যে একে একে কি ভয়ানক সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতেছেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। বলিতে কি, যে কাজলের প্রভাবে এক সময়ে হিন্দু সন্তানগণ শতাধিক বর্ষ বয়সেও চস্‌মা প্রভৃতি কৃত্রিম উপায়কে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অক্লেশে দূরস্থিত বস্তু সকল দর্শন করিয়া অপার আনন্দলাভ করিতেন, আর আজ্ কিনা আমরা তাঁহাদেরই সন্তান হইয়া ১৫। ১৬ বৎসরে পদার্পণ না করিতেই সর্ট ছাইড্ (অর্থাৎ দৃষ্টির অল্পতা) হইয়াছে বলিয়া চস্‌মা পরিধান না করিয়াই পারি না। তাও না হয় চক্ষের কোনরূপ দোষ জন্মাইলেই চস্‌মা পরা হউক, কিন্তু কেবল তাহা নহে, পোড়া চস্‌মা যে আবার ছোক্‌রা বিশেষের সকের জিনিষ হইয়া উঠিতেছে, এ দুঃখ আর রাখিবার স্থান নাই। বলিতে লজ্জাবোধ হয় যে, বিদেশীয় পড়াশুনার ধমকে পড়িয়া অনেক বালক প্রাতঃকালে উঠিয়া একবার চোখে মুখে শীতল জল দিতেও অবসর পায় না। তাই প্রথমে বলিয়াছি যে, সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও আর নাই। হিন্দুগণের সে হিন্দুয়ানী রক্ষাও আর নাই, সে চক্ষে কাজল দেওয়াও আর নাই। যেমন নাই, শাস্ত্র না মানিয়া তাহার ফলও সর্ব্বদা হাতে হাতে হিন্দুগণকে অহরহ ভোগ করিতে হইতেছে। ফলতঃ প্রত্যহ দাঁত না মাজিলে তাহাতে ময়লা পড়িয়া যদি শীঘ্রই নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, গাত্রমার্জ্জনা দ্বারা শরীরের ময়লা দূর না করিলে যদি দক্রু প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় না হয়, তবে প্রত্যহ নিয়মিত চক্ষুতে কাজল দিয়া চক্ষু পরিস্কার না রাখিলে তাহার যে অসময়ে দোষ জন্মিবে না, এ কথা কে বলিতে পারে? সে যাহা হউক, চক্ষুরোগের সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কথা বলিতে গিয়া নানা কথা বলিলাম, অতএব এসব্ ষট্‌কালী এখন থাক্, দেখা যাউক, বৈদ্যশাস্ত্র এরোগ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন।

কেহ মনে করিবেন না যে, বৈদ্য মতে নেহাৎ "ফুল্লোআর মলোগোচের" ২।৪ কথাতেই চক্ষুরোগের বিষয় বর্ণিত আছে। ফলতঃ তা নয়, বিদেশীয়

চক্ষু-চিকিৎসকগণ যেমন চক্ষুর শুক্লভাগ, কৃষ্ণভাগ ও পরদা প্রভৃতি চক্ষুর সমস্ত অংশ অবলম্বন করিয়া অতি তন্ন তন্নরূপে লক্ষণ ও চিকিৎসার বিষয় বলিয়াছেন, আমাদের যতদূর বিশ্বাস, তাহাতে হিন্দু চিকিৎসকগণ তদপেক্ষা বড় কম বলেন নাই। তাঁহারা চক্ষুরোগকে সাধারণত নেত্রসর্ব্বগত, নেত্র কৃষ্ণগত, নেত্রদৃষ্টিগত, নেত্র শুক্লগত, নেত্র সন্ধিগত, নেত্র বর্ত্মগত, এই পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া উহাদের আবার প্রত্যেকের সংখ্যা বিভাগ দ্বারা মোট ৭৬ প্রকার চক্ষুরোগের বিষয় অতি তন্ন তন্নরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব ক্রমশঃ তাহার কারণ ও লক্ষণবলা যাইবে।

সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগের কারণ।

রৌদ্র কিংবা অগ্নিসন্তাপে উত্তাপিত হইয়া জলে অবগাহন, সর্ব্বদা বহুদূরস্থিত দ্রব্য দর্শন, রাত্রিজাগরণ, অতিঘর্ম্ম, চক্ষুতে ধূলা বা ধূম প্রবেশ, ছর্দ্দি অর্থাৎ বমনের বেগরোধ, অতিশয় বমন, রাত্রিতে নিয়ত দ্রবান্ন সেবন, মল, মূত্র ও বায়ুর বেগরোধ, সর্ব্বদা রোদন, ক্রোধ করা, শোক করা, মস্তকে আঘাত, অতিশয় মদ্যপান, এক ঋতুর কার্য্য অন্য ঋতুতে করা অর্থাৎ যে ঋতুতে যেরূপ আহার বা পরিধান আবশ্যক, তাহা না করা। অতিশয় শারীরিক ক্লেশ, অতিশয় স্ত্রীসংসর্গ, চক্ষের জলের রোধ করা, সর্ব্বদা চক্ষু অপরিষ্কার রাখা অর্থাৎ কাজলাদি দ্বারা ময়লা দূর না করা, এবং নিয়ত খুব সূক্ষ্ম বস্তু নিরীক্ষণ হেতু চক্ষুরোগ জন্মিয়া থাকে।

প্রথমতঃ ঐ সমস্ত কারণে বাতাদি চারিপ্রকার অভিষ্যন্দ অর্থাৎ চক্ষু হইতে জলস্রাব ঘটে, এবং তাহা হইতে ক্রমে অধিমন্থাদি সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ জন্মিয়া থাকে।

তন্মধ্যে বাতাভিষ্যন্দে চক্ষুতে সূচীভেদবৎ বেদনা, চক্ষুর জড়িমা, কর্‌করিকা, রুক্ষতা, মস্তক বেদনা, রোমাঞ্চ, ও চক্ষু হইতে জলস্রাব হয়। কিন্তু দৃষ্টিশক্তির কোনও দোষ ঘটে না। পিত্তাভিষ্যন্দে চক্ষুজ্বালা, চক্ষু হইতে ধূম নির্গমনের ন্যায় বোধ, অধিক পরিমাণে উষ্ণ জলস্রাব, চক্ষু পীতবর্ণ হয়, এবং চক্ষু পাকিয়া থাকে। পরন্তু জ্বালা অধিক হয় বলিয়া রোগী চক্ষুতে শীতল বস্তু প্রদান করিতে ইচ্ছা করে। কফাভিষ্যন্দে চক্ষুতে শোথ

চুলকান, ভারবোধ, শীতলতা বোধ হয় এবং চক্ষু হইতে পিচ্ছিল জলস্রাব হইয়া থাকে। অপর রোগী, চক্ষুতে উষ্ণবস্তু লাগাইতে ইচ্ছা করে। রক্তাভিষ্যন্দে পিত্তাভিষ্যন্দজনিত প্রায় সমস্ত লক্ষণই উপস্থিত হইয়া থাকে।

ঐ সমস্ত বাতাদি অভিষ্যন্দ রোগ উৎপন্ন হওয়া মাত্র যদি উহাদের চিকিৎসা করা না যায়, তাহা হইলে উহারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অধিমন্থ প্রভৃতি নানাবিধ চক্ষুরোগ জন্মাইতে পারে। এই অধিমন্থও আবার বাতাদি ভেদে চারি প্রকার। তন্মধ্যে মস্তকের অর্দ্ধভাগ ও চক্ষু যেন উৎপাটিত ও মথিত হইতেছে এরূপ বোধ হওয়া ও চক্ষুতে অত্যন্ত বেদনা হওয়া; এই লক্ষণ সর্ব্বপ্রকার অধিমন্থেরই সাধারণ লক্ষণ। বিশেষতঃ বাতজ অধিমন্থে বাতজ অভিষ্যন্দের সমস্ত লক্ষণ, ও উক্ত সাধারণ লক্ষণ। পিত্তজ অধিমন্থে পিত্তজ অভিষ্যন্দের সমস্ত লক্ষণ ও উক্ত সাধারণ লক্ষণ, কফজ অধিমন্থে কফজ অভিষ্যন্দের সমস্ত লক্ষণ ও উক্ত সাধারণ লক্ষণ এবং রক্তজ অধিমন্থে রক্তজ অভিষ্যন্দের সমস্ত লক্ষণ ও উক্ত সাধারণ লক্ষণ জন্মিয়া থাকে। পরন্তু এই অধিমন্থ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি নিয়মিত সুচিকিৎসা না করাইলে কফ্‌জনিত অধিমন্থ সাতদিনে, রক্তজ অধিমন্থ পাঁচ দিনে, বাতজ অধিমন্থ ছয় দিনে এবং পিত্তজ অধিমন্থ তিন দিনে দৃষ্টিনাশ করিতে পারে।

চক্ষুরোগের তরুণাবস্থায় চক্ষুতে অত্যন্ত বেদনা, ফুলা, করকরিয়া, সূচী বেধনবৎ বেদনা, এবং চক্ষু রক্তবর্ণ হয় ও উহা হইতে জলস্রাব হইয়া থাকে। আর চক্ষুরোগের নিরামাবস্থায় চক্ষুর বেদনার অল্পতা, ফুলার ও জলস্রাবের শান্তি এবং চক্ষুতে চুলকানি হয় ও উহার বর্ণ পরিস্কার হইয়া থাকে। পরন্তু শোথযুক্ত চক্ষু পাকিলে চক্ষু কণ্ডু অর্থাৎ চুলকান ও জলযুক্ত, পিচ্ছিল, ও পাকা যজ্ঞডুমুরের বর্ণের ন্যায় হইয়া থাকে। বর্ণ আর শোথরহিত চক্ষু-পাকে শোথযুক্ত নেত্র পাকের শোথভিন্ন অন্য সমস্ত লক্ষণই হইয়া থাকে।

বাতজনিত অধিমন্থ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যথাসময়ে চিকিৎসিত না হইলে উক্ত রোগ সহসা চক্ষুকে শোষণ ও নানা প্রকার উগ্র বেদনায় পীড়িত করে। এই রোগের নাম হতাধিমন্থ। এবং ইহা অসাধ্য বলিয়া জানিবে। তদ্ভিন্ন যে চক্ষুরোগে বায়ু কখন ভ্রূদেশে কখন বা চক্ষুদ্বয়ে যাইয়া নানাপ্রকার উগ্রবেদনা

জন্মায়, তাহার নাম বাতপর্য্যায়। যে চক্ষুরোগে চক্ষু মুদ্রিত ও জ্বালা যুক্ত হয়, এবং অক্ষিপুট (চক্ষের পাতা) কঠিন ও রুক্ষ, চক্ষুতে অপরিস্কার দর্শন এবং চক্ষু উন্মীলনে বেদনা বোধ হয়, সেই চক্ষুরোগকে শুষ্কাক্ষিপাক বলে। যে চক্ষুরোগে মস্তক, ঘাড়, গ্রীবার পশ্চাদ্‌ভাগ, এবং কর্ণও হনুস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া ভ্রূ ও চক্ষুতে বেদনা জন্মায়, তাহার নাম অন্যতোবাত চক্ষুরোগ। সেইরূপ অতিশয় অম্ল সেবনে অক্ষির মধ্যভাগ যে ঈষৎ নীলবর্ণ ও চতুঃপার্শ্ব রক্তবর্ণ হয় এবং নেত্রে জ্বালা, শোথ, সমস্ত অক্ষির পক্কতা ও জলস্রাব হয়, তাহাকে অম্লাধ্যুষিত চক্ষুরোগ কহে। শিরোৎপত্তি চক্ষুরোগে চক্ষুর শিরাজাল কখন তাম্র বর্ণ কখন বা রক্ত শূন্য হয় এবং কখন বা বেদনা থাকে, এবং কখন থাকে না। প্রথমাবস্থায় চিকিৎসা না করাইলে ক্রমে ইহা শিরাপ্রহর্ষে পরিণত হইতে পারে। যে রোগে চক্ষু তাম্রবর্ণ ও গাঢ় স্রাবযুক্ত হয়, এবং রোগের দৃষ্টি শক্তিনাশ হয়, সেই রোগীর নাম শিরা-প্রহর্ষ।

ক্রমশঃ——

ওলাউঠা চিকিৎসা।

হোমিওপ্যাথি মতে

(ডাক্তার সরকারের পুস্তক হইতে।)

ওলাউঠার পরিণাম স্বরূপ এই বিকৃতিতে যে সমস্ত ঔষধ ব্যবস্থার্হ, তাহা এই—নক্স-ভমিকা, মার্কুরিয়স, সল্‌ফর, কার্বো-ভেজিটাব্লিস্‌ এবং লাইকো-পডিয়ম, ইত্যাদি।

নক্স্‌-ভমিকা—যখন অন্ত্রনালীর সিক্রিশনের কোন দূষিত বা বিকৃত প্রকৃতি নিবন্ধন আধ্মান না হইয়া অন্ত্রের অবসন্নতা বশতঃ আধ্মান হয়, তখন

সচরাচর নক্স্-ভমিকা দেওয়া যায়। বিশেষতঃ যখন পাকাশয়ের আধ্মান হয়, এবং যখন পিত্তনালী ও পিত্তকোষের অবসন্নভাব নিবন্ধন অন্ত্রনালীতে পিত্ত-পতনের ব্যাঘাত জন্মে, অথবা যখন পিত্তাধিক্য হয়, তখন ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

মার্কুরিয়স্—যখন যকৃতের দূষিত সিক্রিশন্ নিবন্ধন আধ্মান জন্মে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যখন মুখ দুর্গন্ধময় হয়, তখন মার্কুরিয়স্ দেওয়া বিধি।

সল্ফর।—যখন শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শৈরিক রক্তাধিক্য নিবন্ধন সমস্ত অন্নাধার নাড়ীর দূষিত সিক্রিশন হয়, তখন সলফর ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। চিকিৎসার্থে যে স্থলে অধিক মার্করি ব্যবহার করা হইয়াছে, অথবা যে স্থলে মার্করি প্রয়োগে কোন ফল দর্শে নাই, সেই সকল স্থলে সল্ফর বিশেষ ব্যবস্থার্হ।

কার্ব্বো-ভেজিটাবিলিস্।—যখন বিকৃত সিক্রিশন শুধরাইতে হয়, তখন ইহা প্রয়োগ করা যায়। ডাক্তার হিউস বলেন, যে স্থলে অজীর্ণ, ভক্ষ্যের অন্তরুৎষেক নিবন্ধন বায়ু উৎপন্ন না হইয়া অন্ত্রের প্রাচীর হইতে বায়ু উৎপন্ন হয়, এবং যে স্থলে কোষ্ঠবদ্ধ না থাকিয়া উদরাময় থাকে, সেই স্থলে ইহা অত্যন্ত প্রশস্ত ঔষধ।

লাইকোপডিয়ম।—বিকৃতি সিক্রিশন শুধরাইতে ইহা কার্ব্বো তুল্য ক্ষমতাপন্ন। যখন কোষ্ঠবদ্ধ হয়, এবং যখন ঘনঅন্ত্রের আধ্মান হয় তখন ইহাতে বিশেষরূপ প্রতিকার করে।"

উপরিউক্ত ঔষধ সকলে কোন প্রতিকার না হইলে, তৃতীয় ক্রমের, চাইনা, এসাফিটিডা, ক্যাপ্সিকম ও ক্যাম্ফারাদির স্মরণ করা উচিত।

কখন কখন ক্যাষ্টরাইল রহিত বা ক্যাষ্টরাইল সহিত, এসাফিটিডা ও ঈষদুষ্ণ সোপ-ওয়াটার, অথবা টার্পেণ্টাইল ও ঈষদুষ্ণ সোপ-ওয়াটারের পিচকারি দিলে অন্ত্রের আধেয় (মল) নির্গত হইয়া আশ্চর্য্যরূপ উপকার হয়, অতএব তাচ্ছিল্য করা উচিত নহে। যাহা হউক, অত্যন্ত অবসন্নতার স্থলে পিচকারি দেওয়া কোন প্রকারেই বিধেয় নহে। কারণ অন্ত্র উহা বাহির

করিয়া দিতে না পারিয়া উদরে থাকিয়া যায়, এবং যে জন্য পিচকারি দেওয়া হইল, তাহার কোন প্রতিকার না হইয়া বরং আরও অপকার, হইতে থাকে।

উদরের উপর শীতল জল-সিক্ত নেক্ড়ার স্থানিক প্রয়োগে, বোধ হয়, উদরের ত্বাচীয় স্নায়ুমণ্ডল দিয়া অন্ত্রের স্নায়ুমণ্ডলের উপর শৈত্যক্রিয়া হওয়াতে ভিতরের বায়ু সকল ঘনীভূত হইয়া আধ্মানের অনেক উপশম হয়।

এই সময়ে অম্লরসে কোন অপকার হয় না, এবং উহা রোগীকে বড় ভাল লাগে। অন্যান্য অম্ল অপেক্ষা নেবু উৎকৃষ্ট। আধ্মানিক অবস্থায় মিষ্ট নিষিদ্ধ, সুতরাং ত্যাগ করা উচিত। অঙ্গার আছে বলিয়া টোষ্টওয়াটরে উপকার হয়। এমন স্থলে ব্রাণ্ডি দেওয়া যাইতে পারে।

পাকাশয়-নালীর নানা স্থানের প্রাদাহিক অবস্থা সকলের সঙ্গে সঙ্গে অল্প বিস্তর জ্বর থাকে, অতএব তদ্বিবরণ জ্বরের অধ্যায়ে লেখা গেল। ক্রমশঃ—

মদ্যপানের ক্ষতি।

অহিফেনের কর ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষের আবকারী আয় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রায় ২৬,০০,০০,০০ টাকা এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৪০,০০,০০,০১৲ টাকা। কি ভয়ানক বৃদ্ধি! এতদ্ভিন্ন চীনদেশ বাসীদের নিকট প্রায় ৯ কোটী টাকা প্রতি বৎসর অহিফেনের কর আদায় হয়। এই তের কোটী টাকা আবকারী আয়, ভূমির রাজস্বের অর্দ্ধেকেরও অধিক। তামাকের কোন কর নাই। বিভিন্ন দেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর প্রায় দেড় কোটী টাকার মদ আমদানি হয়।

১৮৮৪ সালে আবকারী আয়।

এদেশীয় রাজাদের রাজ্য	৫৭,০০,০০৲
মধ্য প্রদেশ সকল	২,৪৯,০০,০০৲
বৃটিশ বর্ম্মা	২,২৪,০০,০০৲
আসাম	২,২১,০০,০০৲

বঙ্গদেশ	১০,৫০,০০,০০৲
উত্তর পশ্চিম প্রদেশ	৫,২৪,০০,০০৲
পঞ্জাব	১,৩৬,০০,০০৲
মাদ্রাজ	৭,৭৭,০০,০০৲
বোম্বাই	৮,২০,০০,০০৲
	৪০,৫৮,০০,০০৲
চীনবাসীর নিকট হইতে অহিফেনের কর আদায়	৮৮,০০,০০,০০৲
	১,২৮,৫৮,০০,০০৲

১৮৮৪ সালে বঙ্গদেশে আবকারী আয়।

দেশীমদ	৪,৮৫,৫২,০০৲	মাজম	২৩,০০৲
রম	৯,৮৭,০০৲	মাদৎ	৯,১০,০০৲
আমদানি মদ	২২,৮২,০০৲	চণ্ডু	২,৮৫,০০৲
তাড়ি	৬৭,৪৩,০০৲	শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত স্পীরিট	৪০০৲
পাচুই	১৫,৮৮,০০৲	গাঁজা	১,৯৮,৭৬,০০৲
চরস	১৬০০৲	আফিম	১,৮৮,৩৯,০০৲
সিদ্ধি	৩,৪৩,০০৲	বিবিধ	৩৭০০৲

মোট ১০,০৪,৮৫,০০৲

১৮৮৪ সালে কলিকাতায় (হাবড়া ও সুবর্ব লইয়া) আবকারী আয়।

দেশী মদ	১,০৪,৪২,০০৲	সিদ্ধি	১২,৪০০৲
রম	৮,৩২,০০৲	মাজম	৬০০৲
আমদানি মদ	১৩,৭২,০০৲	মাদৎ	২০,০০০৲
তাড়ি	৬,৪২,০০৲	চণ্ডু	৬৪০০৲
পাচুই	৯০০৲	গাঁজা	১৯,১২০০৲
চরস	১১০০৲	আফিম	৩৩,৭৯,০০৲
		বিবিধ	৭০০৲

মোট ১,৯০,০০,০০৲

দেশী মদে বঙ্গদেশে গবর্ণমেন্টের ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ১,৮৫,২৯,০০ টাকা আয় ছিল, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ৫,০০,০০,০০, টাকা আয় হইয়াছে।

এক সাইজ্ কমিসন স্থির করিয়াছেন যে বঙ্গদেশে ১৩ জনের মধ্যে এক জন দেশী মদ খায়।

বঙ্গদেশে স্ত্রীলোক ও বালক প্রায় মদ খায় না। এখানে ৬ কোটী লোকের বাস। ইহার অর্দ্ধেক স্ত্রীলোক; এবং পুরুষদিগের মধ্যে ৩ ভাগের ২ ভাগ বালক বাদ দিলে এক কোটী লোক থাকে। ঐ এক কোটী লোকের মধ্যে যদি ৪৫ জন লক্ষ লোক মদ খায়, তাহা হইলে দেশের কি কম দুর্দ্দশা!

একসাইজ কমিসনের মতে কলিকাতায় (হাবড়া ও সুর্ব্ব লইয়া) ৪ জনের মধ্যে একজন দেশী মদ খায়। গয়া ও হাজারীবাগে ৪ জনের মধ্যে একজন; পাটনা ডিষ্টি ট্রে ৩ জনের মধ্যে একজন. দার্জ্জিলিঙ্ জেলার ২ জনের মধ্যে একজন খায়।

এই ত গেল আবগারীর আয়। লোকেদের এই সকল মাদক দ্রব্য ক্রয় করিতে যে ব্যয় হয়,তাহা আবকারী আয় অপেক্ষা অনেক অধিক। ভারতের কত উর্ব্বরা ভূমি এই সকল বিষ উৎপন্ন করিতে আবশ্যক হয় এবং কত লোক এই সকল বিষ উৎপন্ন ও বিক্রয় করিতে জীবন অতিবাহিত করে, তাহা জানি না। অনুসন্ধান করিয়া এই সকল বিষয় এ পুস্তকের ২য় সংস্করণে দিবার ইচ্ছা রহিল।

এই গরিব ভারতবাসীদিগের পক্ষে, যাহাদের মধ্যে কোটী কোটী লোকের দিনান্তেও এক বেলা অন্ন জুটে না, এই ক্ষতিই যথেষ্ট। ইহাতে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক ক্ষতি যোগ করিলে চমকিত হইতে হয়, প্রাণে বড় কষ্ট হয়।

লর্ড সাষ্টসবরি ১৬ বৎসর পাগলা গারদ সকলে অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, শতকরা ৬০ জন লোক কেবল মদ্যপান জন্য পাগল হইয়াছে।

৩০০ জন্মাবধি উন্মাদের ইতিহাস বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে ১৪৫ জন উন্মাদের সন্তান। ইহাদের মধ্যে ৭টী সন্তানের পিতা ও মাতা উভয়েই মাতাল ছিল।

পারিস নগরে একটী হাঁসপাতালে ৮৩ জন মৃগীরোগাক্রান্ত ব্যক্তি ছিল।

তন্মধ্যে ৬০ জন মাতালের সন্তান। এই ৬০ জন লোকের পিতামাতার ৩০১ জন সন্তান জন্মে। তন্মধ্যে ১৩২ জন বাল্যাবস্থাতেই মরিয়া যায়। বাঁকি জীবিত ১৬৯ জনের মধ্যে কেবল ৬৪ জন সুস্থ ছিল।

ডাক্তার নর্ম্যান বলেন, যে পক্ষাঘাত রোগ শতকরা ৯০টী মদ্যপান জন্য ঘটে।

১৮৭৫ সালে ইংলণ্ডে যত মাতাল দণ্ডিত হইয়াছে, তাহার বার আনা ভাগ ৭টী প্রধান নগরের লোক।

কর্ণেল সাইকস বলেন, সৈন্যদিগের মধ্যে প্রতি বৎসর গড়ে যত অমদ্য পায়ীর মৃত্যু হয়, তাহার প্রায় দ্বিগুণ পরিমিত মদ্যপায়ীর ও চতুর্গুণ অপরিমিত পায়ীর মৃত্যু হয়।

ডাক্তার নর্ম্যানকার বলেন যে, ১৫৪০ জন বাতরোগীর মধ্যে কেবল এক জন মাত্র জন্মাবধি মদ্যপান করে নাই। কিন্তু সেই ব্যক্তিরও পূর্ব্বপুরুষ মদ্যপ্রিয় ছিল।

এই প্রসিদ্ধ ডাক্তার বলেন যে, বার আনা হৃদ্‌রোগ মদ্যপান হইতে উৎপন্ন হয়।

১৬১৯ খৃষ্টাব্দে ৬০ জন লোক একখানা ডেনিস জাহাজ চড়িয়া হড্‌সন্‌বে নামক প্রসিদ্ধ শীতপ্রধান স্থানে শীতকাল কাটাইতে চেষ্টা করিয়াছিল তাহারা সকলেই উৎকট উৎকট মদ্য ব্যবহার করিত। ইহাতে বসন্তকাল আসিতে না আসিতেই ৫৮ জন মরিয়া গেল। সেই স্থানে আর একখানা জাহাজে ২২ জন মাল্লা ছিল। তাঁহারা সেরূপ মদ্যপান করিত না এজন্য তাহাদের মধ্যে কেবল দুই জন মরিয়া গেল।

পেস্‌লি নগরে ৬১০০০ লোকের মধ্যে এক সময়ে ৩৩০ জন ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হয়। তন্মধ্যে ২০০ লোক মদ খাইত না। ইহাদের কেবল এক জনের এই রোগ হয়।

ভারতবর্ষে ইউরোপীয় সৈন্যদিগের এক বৎসরের মৃত্যুসংখ্যা।

মাতাল	১০০০	জনের	মধ্যে	৪৪	জন।
পরিমিত পায়ী	১০০০	জনের	মধ্যে	২৩	জন।
অপায়ী	১০০০	জনের	মধ্যে	১১	জন।

পোর্ট্‌স মাউথ নগরের সৈন্যদলের অবস্থা।
১৮৭৮ অক্টোবর হইতে ১৮৭৯ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত।
সৈন্যর মোট সংখ্যা ৫২৩৯।

	অপায়ী	পায়ী
	১৫১৫	৩৭২৪
মৃত্যুসংখ্যা	০	৫
হাঁসপাতালে ছিল	৫৯	৩৫৭
অপারগ	৩	১৮
দণ্ডিত	০	১৮
দোষী	২০	৩৪৭
নিম্নশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল	০	১২
সেভিংব্যাঙ্কে জমা রাখিয়াছিল	৩৭৮৮ পাউণ্ড	৩৭১১ পাউণ্ড

প্রতি বৎসর ইউনাইটেড ষ্টেটে মদে ১৭০ কোটী টাকা খরচ হয় এবং ৪০ হাজার লোক মরে। ইহা রুটী ও মাংসের খরচের অপেক্ষা অধিক।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ২০ অপেক্ষা অধিক বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যুসংখ্যা দেখিয়া স্থির করা গিয়াছে যে অন্যান্য শ্রেণীর লোক যদি ২ জন মরে, মদ্য ব্যবসায়ী ৩ জন মরে।

১৮৭৬ সালের মে মাসে বৃটিশ ডাক্তারদিগের সুরাপান নিবারিণী সভা স্থাপিত হয়। এই সভার সভ্যগণ ১৮৭৬ সালের ৩০ জুন হইতে ১৮৭৭ ৩১ মার্চ্চ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি প্রকাশ করেন।

৩৭৫ জন স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব করে।

	তাহার মধ্যে অপায়ীর সংখ্যা	পায়ীর সংখ্যা
	৯১	২৮৪
প্রসবের পর রক্তস্রাব	২	১৩
কষ্টে প্রসব করে	১	৩০
প্রসবের পর ৪ সপ্তাহ মধ্যে প্রসূতির জ্বর		১৯

	অপায়ী	পায়ী
প্রসূতির মৃত্যু		১
প্রসবের পর ৪ সপ্তাহ মধ্যে জীবিত প্রসূত সন্তানের মৃত্যু		৭

২২৮ জন ব্যক্তির নানা কারণে মৃত্যু হয়। তাহার মধ্যে ৮টী মৃত্যুর প্রধান কারণ সুরাপান।

৭টী মৃত্যুর গৌণ সুরাপান।

৩৮টী মৃত্যু সুরাপানের সাহায্যে ঘটিয়াছিল।

ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়ারলণ্ডে মদ্য পানে যে সকল অশেষ প্রকার ক্ষতি হইতেছে তাহার মধ্যে দুই চারিটী নিম্নলিখিত হইল।

রাজস্বের তিন ভাগের এক ভাগ আবকারী আয়। ১৮৭০ হইতে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বার বৎসরে মদে ১ হাজার ছয় শত কোটী টাকা খরচ হইয়াছে, মদ্য পানের গৌণ খরচ, অর্থাৎ মদ্যপান করিয়া লোকে যে অনেক প্রকারে অর্থ অপব্যয় করে, প্রায় এত টাকা কেবল মাত্র ইহার শিকি টাকা রাজকীয় ধনভাণ্ডারে গিয়াছে।

এই বার বৎসরের গড় লোক সংখ্যা তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ ধরিলে প্রত্যেক লোক গড়ে ৪০ টাকা খরচ করে।

বৃটিশ জাতি রুটী, মাখন, পনির এবং দুগ্ধে যত টাকা খরচ করে, সমুদায় একত্র করিলে মদের খরচের সহিত সমান হয়।

মনে কর ঐ দেশের সমুদয় মদের দোকান (১৮০,০০০) গুলি এক রাস্তার ধারে পাশাপাশী সাজান আছে এবং মনে কর প্রত্যেক মদের দোকানের মোহাড়া ৩০ হাত লম্বা, তাহা হইলে ঐ রাস্তাটী ৩৫০ ক্রোশ লম্বা হইবে। এই জাতির সমুদায় আয়ের পাঁচ ভাগের এক ভাগ মদে ব্যয় হয়।

প্রতি বৎসর মদ্য পানে প্রায় ১২০,০০০, অকালমৃত্যু হয়। মনে কর প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির শ্মশান যাত্রিদল রাস্তার লম্বা দিকে ৪০ হাত স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং সমুদয় মৃত ব্যক্তিকে একেবারে গোর দিতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে তাহা হইলে ঐ রাস্তা ৩২০ ক্রোশ লম্বা হইবে।

এই স্থানে যত মাতাল আছে তাহার মধ্যে শতকরা প্রায় ২৫। ৩০ জন স্ত্রীলোক।

	মদের খরচ	মাতাল ধরা পড়ে	পাপ কার্য্যের জন্য দণ্ডিত হয়
১৮৬০ সালে	৮,৪০,০০,০০,০০,...	...৮,৮৩,০০০...	... ...২৫,০০,০০,
১৮৮০ সালে	১২,২০,০০,০০,০০,...	...১৭,২৮,০০,	... ...৫১,০০,০০,
১৮৮৬ সালে	১২,৩০,০০,০০,০০		

প্রতিবৎসর ৭০০। ৮০০ নাবিক জাহাজ মগ্ন হইয়া মরে। কিন্তু প্রতি সপ্তাহে উহার দ্বিগুণ মাতালের মৃত্যু হয়।

১৮৫৭ হইতে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের লোকসংখ্যা শতকরা ২২ জন বাড়িয়াছে, কিন্তু মদের খরচ শতকরা ১২০ বাড়িয়াছে।

১৮৬০ হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে পাগলের সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে। ইংলণ্ডে ৮১৬টী চোরের আড্ডার মধ্যে ৭২৫ টী মদের দোকান।

কলিকাতা। } শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বসাক।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

লেখক মহাশয়ের অনুরোধ ক্রমেই এই প্রবন্ধ মুদ্রিত হইল। কিন্তু নেশাখোর মহাশয়দিগের ইহাতে চৈতন্য হইবে কি?

ঔষধপ্রস্তুত ও প্রয়োগ-প্রণালী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

স্বর্ণ মাক্ষিক :—স্বর্ণমাক্ষিক উপধাতু শ্রেণীমধ্যে পরিগণিত। তুঁতে যেমন তাঁবার উপধাতু, হীরাকস যেমন লৌহের উপধাতু, স্বর্ণমাক্ষিক সেইরূপ সুবর্ণের উপধাতু। ইহাতে কিঞ্চিৎ সুবর্ণের অংশ বিদ্যমান থাকে, এবং এই উপধাতু ব্যবহারে স্বর্ণ ব্যবহারের আংশিক ফল পাওয়া যায়।

যে স্বর্ণমাক্ষিকে পাথরের অংশ না থাকে, ভাঙ্গিলে সোণার ন্যায় আভা এবং চিক্কণতা প্রকাশ পায়, এবং যাহার বহির্ভাগে ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহাই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

স্বর্ণমাক্ষিক আগে শোধন করিয়া তারপর যথাবিধানে পুটে পাক করিয়া লইতে হয়। অশোধিত স্বর্ণমাক্ষিক ব্যবহারে অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি অনেক পীড়া জন্মিতে পারে।

শোধন প্রণালী ;—স্বর্ণমাক্ষিক আগে বেশ চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। যে পাত্রে চূর্ণ করিবে তাহা যেন খুব দৃঢ় হয়, যেন চূর্ণ করিবার সময় ক্ষরিত হইয়া মাক্ষিকের সঙ্গে মিশিয়া না যায়। চূর্ণ করা হইলে ওজন করিয়া যত হইবে, তার ৩ তিন ভাগ এবং সৈন্ধব চূর্ণ ১ একভাগ মিশাইয়া লইবে। এই চূর্ণ পরিষ্কার এবং অগ্নির উত্তাপে যাহার চট না উঠে, এরূপ লৌহপাত্রে রাখিয়া গোঁড়ালেবুর বা জামীরলেবুর রস দিয়া তরল পঙ্কবৎ করিয়া লইবে। তদন্তর চুল্লীতে রাখিয়া তীব্র অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। পাক করিবার কালে একখান হাতার তল দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া সঞ্চালন করিতে থাকিবে। মাঝে মাঝে কাঁকিয়া লইয়া একত্র করতঃ আবার সঞ্চালন করিবে, এইরূপ করিতে করিতে যখন লৌহপাত্র এবং মাক্ষিক খুব লাল হইয়া উঠিবে, তখন নামাইয়া রাখিবে। জুড়াইয়া গেলে লৌহপাত্র হইতে মাক্ষিক তুলিয়া একখান পাথরে রাখিয়া জল দিয়া গুলিবে; স্থির হইয়া গেলে উপরের স্বচ্ছ জল আস্তে আস্তে ফেলিয়া দিবে। এরূপ করিতে করিতে যখন জলের লবণ আস্বাদ দূর হইবে, তখন ধোয়া শেষ হইল। তারপর রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া লইতে হয়।

মারণপ্রণালী ;—পূর্বোক্ত চূর্ণীভূত স্বর্ণমাক্ষিক কুলথি কলাইয়ের ক্কাথের সহ কি তিল তৈলের সঙ্গে বা তক্রের সহিত অথবা ছাগমূত্রের সহ মর্দ্দন করিয়া মূষাবদ্ধ করতঃ গজপুটে পাক করিয়া লইবে। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা স্বর্ণমাক্ষিক জারিয়া ঔষধার্থ ব্যবহার করিতে হয়।

হরিতাল ;—হরিতাল দ্বিবিধ। এক প্রকার হরিতাল বংশপত্র নামে পরিচিত; লোকে সচরাচর বাঁশপাতা হরিতাল বলে। অপর প্রকার হরিতাল পিণ্ড নামে খ্যাত। রং করিতে ঐ হরিতাল ব্যবহৃত হয়। ইহা বংশপত্র হরিতাল অপেক্ষা গুণে নিকৃষ্ট বলিয়া বৈদ্যেরা ঔষধের কাজে ব্যবহার করেন না। অভ্রের পাত যেমন স্তরে স্তরে সাজান থাকে। বাঁশপাতা হরিতালের পাতও সেইরূপ স্তরে স্তরে সাজান থাকে। ইহা দেখিতে স্নিগ্ধ স্বর্ণ বর্ণ। বাঁশপাতা হরিতাল শোধন করিয়া লইতে হয়। অবিশুদ্ধ হরিতাল কদাচ ঔষধার্থে ব্যবহার করিবে না। শোধনের প্রক্রিয়া এইরূপ ;—প্রথমতঃ হরিতাল চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে; বেশ নিক্ষেষ

গুঁড়া হইবে না, তণ্ডুল কণার ন্যায় টুকরা টুকরা হইবে। সেইগুলি এক খান বস্ত্র খণ্ডে শ্লথ (ঢিল) বাঁধিয়া রাখিবে। এদিকে কোন মেটেপাত্রে কি পাথরের পাত্রে খানিকটা কাঁজি রাখিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ গুঁড়া চুণ প্রক্ষেপ দিবে। কাঁজির পরিমাণ ৴৫ সের হইলে গুঁড়া চুণের পরিমাণ ৪ তোলা হওয়া উচিত। ২ দুই প্রহর কাল রাখিয়া উপরের স্বচ্ছ জল পৃথক করিয়া লইবে। এইরূপে প্রস্তুত করা কাঁজি একটা হাঁড়িতে পুরিবে। হাঁড়ির ১ দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ হওয়া চাই। তার পর একখান কাটী আড়ভাবে হাঁড়ির উপরে রাখিয়া তাতে সূতা বাঁধিয়া পূর্ব্বোক্ত হরিতালের পুটলী সেই সূতায় ঝুলাইয়া দিবে। পুট্‌লী যেন হাঁড়ির তলায় না লাগে, জলমগ্ন হইয়া ঝুলিতে থাকে। এখন স্থালী চুল্লীতে চড়াইয়া এক প্রহর কাল জ্বাল দিবে। কাঁজি ক্ষয় হইলে আবার নূতন কাঁজি দিয়া লইবে। এক প্রহরের পর নামাইয়া পরিষ্কার জলে ধুইয়া লওয়া উচিত। এই প্রণালীতে পাক করাকে দোলাযন্ত্রে পাক করা বলে।

সচূর্ণ কাঞ্জিকে দোলাযন্ত্রে পাক করা হইলে, ঠিক ঐরূপ নিয়মে কুমুড়ার জলে দোলাযন্ত্রে পাক করিবে। তার পর তিল তৈলে; তিল তৈলে জল মিশাইয়া লইতে হইবে, নতুবা জ্বলিয়া যাইবে। জল অল্পে অল্পে মিশান উচিত। পাক করিতে করিতে জল ক্ষয় হইবার উপক্রম হইলে আবার জল দিয়া লইবে। এইরূপে এক প্রহর কাল পাক করা হইলে নামাইয়া লইবে।

তিল তৈলের পর ত্রিফলার কাথে দোলাযন্ত্রে পাক করিবে। ত্রিফলা (আঠীবাদ) ৴২ দুই সের; জল ।৬ সের, শেষ ৴৪ চারি সের। এই কাথে মৃদু অগ্নিতে এক প্রহর কাল দোলাযন্ত্রে পাক করিবে। পাক করা হইলে শীতল জলে ধুইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ খুব চূর্ণ করিয়া ঔষধার্থ ব্যবহার করিবে।

ক্রমশঃ—

মাগুরা
খুলনা } শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন।

রোগীর পথ্য।

উদ্ধৃত।

রোগের চিকিৎসায় ঔষধ যেরূপ বিশেষ আবশ্যকীয়, পথ্যের সুব্যবস্থাও তদনুযায়িক প্রয়োজনীয়। সুপথ্য ব্যতীত কেবলমাত্র ঔষধে কোন ফল

পাইবার আশা করা যায় না। সুতরাং পথ্যবিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞাত থাকা নিতান্ত আবশ্যক। সুপথ্যের অভাবে যে উৎকৃষ্ট ঔষধেও কোন ফল পাওয়া যায় না, ইহা অনেকবার প্রমাণীকৃত হইয়াছে। যেরূপ রোগ সেই মত পথ্য হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ যে রোগে রোগী অতি সত্বরে ক্ষীণবল হইয়া পড়ে, তথায় প্রথম হইতেই পুষ্টিকর পথ্য দ্বারা রোগীর বল রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য; আর যে রোগের পরিণাম তত অমঙ্গলজনক নহে এবং যাহাতে বলক্ষয় হইবার পূর্ব্বে রোগী রোগমুক্ত হইবার আশা থাকে, তথায় পুষ্টিকর পথ্য না হইলেও চলিতে পারে। যে রোগী যেরূপ পথ্য পরিপাক করিতে সক্ষম, তাহাকে তদনুরূপ পথ্য দেওয়াই উচিত। অনেক সময়ে এইরূপ পথ্যের গোলযোগে ঔষধের সুব্যবস্থাসত্বেও রোগী রোগমুক্ত হইতে পারে না। যে সকল রোগীতে দুই তিনটী কঠিন রোগ একই সময়ে বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ প্রথমতঃ একটী রোগ উপস্থিত হইয়া পরে অপর দুই তিনটী কঠিন উপসর্গ উপস্থিত হওত দিন দিন রোগীর বলক্ষয় করে, তথায় পথ্যের ব্যবস্থাবিষয়ে বিশেষ সদ্বিবেচনার আবশ্যক করে। অধিকাংশ সময়ে পথ্যের ব্যবস্থা হইলেও তাহা প্রস্তুত করার দোষে কুপথ্য হইয়া উঠে। সুতরাং কি প্রণালীতে রোগীর পথ্য প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা প্রায় সকলেরই জ্ঞাত থাকা একান্ত কর্তব্য। পল্লীগ্রামে চিকিৎসকে ঔষধই দিয়া থাকেন, পথ্যের বিষয় সম্পূর্ণরূপেই গৃহস্থের উপর নির্ভর থাকে; সুতরাং পথ্য-প্রস্তুত করণ-প্রণালী সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত না থাকিলে চিকিৎসকের চিকিৎসায় সুফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। কি প্রণালীতে কোন্ পথ্য প্রস্তুত করিতে হয়, নিম্নে তদ্বিষয় সংক্ষেপে বিবরিত হইতেছে।

১। সাগু।

এক কাঁচ্চা ওজন বা বড় এক ঝিনুক পরিমাণ সাগুদানা এক পোয়া-পরিমিত শীতল জলে অনুমান ২ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিয়া, পরে অগ্নি-সন্তাপে সুসিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিয়া পাতলা কাপড়ে উত্তমরূপে ছাঁকিলে জলসাগু প্রস্তুত হয়। পরে এই সাগুর সহিত রোগীর ইচ্ছামত লবণ ও লেবুর রস অথবা মিছিরি বা পরিষ্কৃত চিনি মিশ্রিত করায় সেবনোপযোগী হইতে পারে। ইচ্ছা করিলে এই সাগুর সহিত অল্প পরিমাণে

লঘুপাক দুগ্ধ ও শর্করা মিশ্রিত করা যাইতে পারে। কিন্তু যথায় কেবল জল-সাগুর ব্যবস্থা হইবে, তথায় দুগ্ধ মিশ্রিত করা কর্ত্তব্য নহে।

লোহের কটাহ প্রভৃতি পাত্রে সাগু সিদ্ধ না করিয়া মৃত্তিকার পাত্রে সিদ্ধ করা উচিত। লৌহপাত্রে সিদ্ধ করায় আস্বাদনের ও গুণের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

২। সুজি।

এক কাঁচ্চা ওজন বা বড় এক ঝিনুক পরিমাণ সুজি, এক পোয়া পরিমাণ জলসহ সুসিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত অগ্নিতে সিদ্ধ করিবে। সুসিদ্ধ হইলে নামাইয়া পাতলা বস্ত্রে ছাঁকিয়া রোগীর ইচ্ছানুরূপ লবণ ও লেবুর রস বা মিছিরি অথবা শর্করা মিশ্রিত করা যাইতে পারে। অথবা ইহার সহিত লঘুপাক দুগ্ধ ও শর্করা মিশ্রিত করিলেও অপেক্ষাকৃত আস্বাদনবিশিষ্ট হইতে পারে।

চিকিৎসকের উপদেশ মতে দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

৩। যব ও বার্লি।

পরিষ্কৃত অথচ উৎকৃষ্ট যবের দানা এক কাঁচ্চা ওজন বা এক ঝিনুক পরিমাণ লইয়া অর্দ্ধ সের জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া, পুনরায় অর্দ্ধ সের জলসহ অগ্নিসন্তাপে অন্যূন ২০ মিনিটকাল সিদ্ধ করিয়া পরে ছাঁকিয়া লইবে। ইহার সহিত লবণ ও লেবুর রস মিশ্রিত করা যাইতে পারে। ইহা অতি স্নিগ্ধকারক ও উপাদেয় পানীয়।

অথবা বিলাতী প্রস্তুত পেটেণ্ট বার্লি এক ঝিনুক পরিমাণ লইয়া অনুমান এক পোয়া শীতল জলে গুলিয়া অগ্নিসন্তাপে অন্যূন ১০ মিনিট সময় পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত না ভাণ্ডের মধ্যে চতুষ্পার্শ্ব ফুটিয়া উঠে, সেই সময় পর্য্যন্ত ফুটাইয়া নামাইবে। শীতল হইলে তাহার সহিত অল্প পরিমাণ লবণ ও লেবুর রস মিশ্রিত করা যাইতে পারে। ব্যবস্থা হইলে ইহার সহিত অল্প পরিমাণ লঘুপাক দুগ্ধ ও মিছিরি মিশ্রিত করায় অধিকতর আস্বাদনবিশিষ্ট হয়।

৪। খই।

ভাল সদ্য খই ঈষদুষ্ণ জলে ভিজাইয়া, কোমল হইলে উত্তমরূপে

চট্‌কাইয়া পাতলা কাপড়ে ছাঁকিলে ইহা প্রস্তুত হয়। পরে লবণ, লেবুর রস বা শর্করা প্রভৃতি ইহার সহিত মিশ্রিত করা যাইতে পারে।

৫। পাণীফল।

পাণিফল হামামদিস্তায় পেষণান্তে জলসহ সিদ্ধ করিতে হয়। পরে তাহা ছাঁকিয়া তৎসহ দুগ্ধ ও শর্করা মিশ্রিত করিলে ব্যবহারোপযোগী হয়।

৬। এরারুট।

এক কাঁচ্চা বা ঝিনুক পরিমিত এরারুট কিঞ্চিৎ শীতল জলে গুলিয়া তদুপরি কিয়ৎ পরিমাণে ফুটিত জল মিশ্রিত করিবে। পরে এই তরল দ্রব্য ৫ মিনিট্‌কাল অগ্নিসন্তাপে সিদ্ধ করিয়া তাহার সহিত আবশ্যকমত লবণ ও লেবুর রস অথবা দুগ্ধ ও শর্করা মিশ্রিত করিলে ব্যবহাপযোগী হইতে পারে।

৭। তণ্ডুলের ক্বাথ।

পুরাতন ভাল মিহি চাউল এক ছটাক আন্দাজ লইয়া উত্তমরূপে জলে ধৌত করিবে। ধৌত করিয়া পরে এক সের অনুমান জলে ১৫ মিনিট্‌কাল সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইলে এক ক্বাথ প্রস্তুত হয়। পরে লবণ ও লেবুর রস মিশ্রিত করিলে ব্যবহারোপযোগী হয়।

৮। অন্নের মণ্ড।

পুরাতন ভাল মিহি চাউল এক ছটাক লইয়া উত্তমরূপে ধৌত করতঃ একটী ছোট হাঁড়ির মুখে সরা দিয়া, তাহাতে মৃদু জ্বালে গল গল না হওয়া পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিয়া পরে তাহা পাতলা কাপড়ে ছাঁকিলে ইহা প্রস্তুত হয়। পরে ইহার সহিত লেবুর রস ও লবণ অথবা ব্যবস্থা হইলে ইহা মৎস্যের ঝোলের সহিত অথবা দুগ্ধ ও মিছরির সহিত সেব্য।

৯। লঘুপাক মাংসের ক্বাথ।

অর্দ্ধ সের আন্দাজ ছাগমাংস উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ এক সের অনুমান শীতল জলে এক প্রহর অর্থাৎ ৩ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিয়া পরে সেই জল-সহ মৃদু সন্তাপে সিদ্ধ করিয়া অনুমান এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া, ছাঁকিয়া লইবে। পরে তৎসহযোগে লবণ ও আবশ্যক মতে একটী বা দুইটী গোল-মরিচের গুঁড়া মিশ্রিত করায় ব্যবহারোপযোগী হইবে।

অথবা ঐ ক্বাথ অনুমান ২। ৩ ফোঁটা ঘৃতে তেজপাত ভাজিয়া তাহাতে সাঁতলাইয়া লইতে পারা যায়।

অথবা রোগীর উদরাময় বা অরুচি থাকিলে উক্ত ক্বাথ সিদ্ধ হওয়ার কালে তৎসঙ্গে ২।৩ খণ্ড দারুচিনি দিয়া সিদ্ধ করত পরে ছাঁকিয়া লইয়া তৎসঙ্গে লবণ ও পোর্ট ওয়াইন্ বা ব্রাণ্ডী মিশ্রিত করিষা দেওয়া যাইতে পারে।

১০। কাঁচা মাংসের ক্বাথ।

অর্দ্ধ সের অনুমান ছাগমাংস উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া এক পোয়া পরিস্রুত জলে ৫।৬ ফোঁটা লবণ দ্রাবক ও কিঞ্চিৎ লবণ সহযোগে কেশনির্ম্মিত ছাঁক্‌নিতে ছাঁকিতে হইবে। ইহার সহিত আবশ্যক মতে সুগন্ধ মসলাদি মিশ্রিত করা যাইতে পারে।

১১। দুগ্ধ ও চূণের জল।

দুগ্ধ এক পোয়া ও চূণের পরিষ্কার জল এক ছটাক মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ ছটাক মাত্রায় সেব্য।

১২। ডিম্বের ক্বাথ ও ব্রাণ্ডী।

তিনটী ডিম্বের কুসুম ও শ্বেতাংশ আড়াই ছটাক জলসহ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া, ক্রমে ক্রমে তাহার সহিত চিনি ও জায়ফল এবং ৩ আউন্স পরিমাণ ব্রাণ্ডী মিশ্রিত করিবে। এক কাঁচ্চা পরিমাণে ৪ বা ৬ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

১৩ কৃত্রিম ছাগদুগ্ধ।

অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণ বসা উত্তমরূপে ফুটাইয়া একটী মস্‌লিনের ব্যাগে করিয়া অর্দ্ধ সের আন্দাজ দুগ্ধ করিবে। পরে তাহাতে পরিস্কৃত চিনি মিশ্রিত করা যাইতে পারে।

১৪। শিশুর সেবনোপযোগী গাভীদুগ্ধ।

অর্দ্ধ পোয়া গাভীদুগ্ধ অর্দ্ধ পোয়া জলসহ মৃদু অগ্নিসন্তাপে অল্পক্ষণ ফুটাইয়া কিঞ্চিৎ চিনি মিশ্রিত করিলে শিশুর সেবনোপযোগী হইবে।

১৫। কৃত্রিম গর্দ্দভদুগ্ধ

দশ ছটাক অনুমান স্ফুটিত বালির জলে, এক কাঁচ্চা পরিমাণ জিল্যাটিন্

দ্রব করিয়া, পরে তাহার সহিত পরিষ্কার চিনি ও দশ ছটাক গাভীদুগ্ধ মিশ্রিত করিলে ইহা প্রস্তুত হয়।

১৬। চার ক্বাথ।

এক কাঁচ্চা পরিমাণ ভাল চা, অনুমান তিন ছটাক স্ফুটিত জলসহ ৭।৮ মিনিট কাল ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লওত পরে আবশ্যকমত চিনি ও দুগ্ধ বা লবণ মিশ্রিত করিলে সেবনোপযোগী হইতে পারে। চিকিৎসা দর্শন।

জ্বর-চিকিৎসা। *

এলোপ্যাথি মতে।

আমরা এদেশে সচরাচার যে সমস্ত জ্বর দেখিতে পাই, তাহাদিগকে ইণ্টারমিটেণ্ট বা সবিরাম জ্বর এবং রেমিটেণ্ট বা স্বল্পবিরাম জ্বর বলে। এই দুই রকম জ্বরই ম্যালেরিয়া হইতে উৎপন্ন। ইহাদের আকার এবং প্রকৃতি একই রকম, তবে প্রভেদ এই যে, একটী অপরটী হইতে অপেক্ষাকৃত গুরুতর। প্রায় অনেক সময়েই দেখা যায় যে, ইণ্টারমিটেণ্ট বা সবিরাম জ্বর, রেমিটেণ্ট বা স্বল্পবিরাম জ্বরে পরিণত হয়। আবার কখন কখন বা জ্বর, প্রথমে রেমিটেণ্ট ফীবারে সুরু হইয়া ক্রমে ইণ্টারমিটেণ্ট ফীবারে শেষ হয়। এই উভয় প্রকারের জ্বরই যে আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমানভাবে থাকে, তাহা নহে; প্রত্যেক দিনেতেই ইহাদের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। একারণ এই উভয়বিধ জ্বরের প্রাত্যাহিক আক্রমণ বা অবস্থাকে

---

* এই প্রবন্ধ কোন গ্রন্থবিশেষ হইতে অনুবাদিত নহে। ডাক্তার জগদ্বন্ধু বাবু বহুকাল হইতে সহস্র সহস্র রোগীর চিকিৎসা করিয়া চিকিৎসা-সম্বন্ধে তাঁহার বহুদর্শন-জনিত যে জ্ঞান জন্মিয়াছে। লম্বা চৌড়া ও ভাষার আড়ম্বর না করিয়া অতি সংক্ষেপে কেবলমাত্র তাহাই লিখিলেন।

চি, স, কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ কম্প বা শীতাবস্থা, দ্বিতীয়তঃ উত্তাপ অবস্থা এবং তৃতীয়তঃ ঘর্ম্মনির্গমন বা বিরাম অবস্থা। এই তিনটী অবস্থা প্রকৃত আকারে সকল দিবস বা সকল সময়ে সমানভাবে দেখা যায় না। কখন শীত বা কম্পাবস্থা এবং ঘর্ম্ম নির্গমন বা বিরাম অবস্থা অতি অল্পরূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু প্রতিদিনের আক্রমণে এই তিন অবস্থার মধ্যে উত্তাপ অবস্থা প্রায়ই অন্য দুই অবস্থা হইতে অপেক্ষাকৃত প্রবলরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই দুই রকম জ্বরেতেই আভ্যন্তরিক যান্ত্রিক উগ্রতা বা ইরিটেসন্, যান্ত্রিক কন্‌জেস্‌সন্ বা রক্তাধিক্য এবং প্রদাহ বা ইনফ্লামেসন্ ঘটিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত অবস্থাটী প্রায়ই রেমিটেণ্ট ফীবারে বা স্বল্পবিরাম জ্বরে কিংবা সবিরাম জ্বর স্বল্পবিরাম জ্বরে পরিণত হইলে তাহাতে দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু মনে এইরূপ ধারণা রাখা উচিত যে, যখন এই দুই প্রকার জ্বরের মধ্যে সবিরাম জ্বরে প্রদাহ উপস্থিত হয়, তখন সবিরাম জ্বরও অচিরাৎ স্বল্পবিরাম জ্বরে পরিণত হয়। কিন্তু কেহ এ কথা মনে করিবেন না যে, প্রদাহ ব্যতীত স্বল্পবিরাম জ্বর হইতে পারে না।

সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বরের বৎসরের মধ্যে সকলসময়েই সমান প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না। এই উভয়বিধ জ্বরের সংখ্যা প্রায়ই বর্ষার প্রারম্ভ হইতে হেমন্তের শেষ পর্য্যন্ত অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে। শীতের সময় যে স্বল্পবিরাম জ্বর দেখা গিয়া থাকে, তাহার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম ও তাহাকে কন্‌জেস্‌টীভ্ রেমিটেণ্ট ফীবার বা রক্তাধিক্য স্বল্পবিরাম জ্বর কহে পরন্তু গ্রীষ্মকালে যে স্বপ্লবিরাম জ্বর দেখা যায়, তাহারও সংখ্যা কম এবং তাহাকে আর্ডেণ্ট রেমিটেণ্ট ফীবার বলে। সবিরাম জ্বর যে শীত বা গ্রীষ্মকালে দেখা না যায়, তাহা নহে, তবে তাহার সংখ্যা খুব্ কম। যাহা হউক, নিম্নে স্বল্পবিরাম ও সবিরাম জ্বরের লক্ষণ ও চিকিৎসার বিষয় ক্রমশঃ বর্ণনা করা যাইতেছে।

ইণ্টারমিটেণ্ট ফীবার বা সবিরাম জ্বর।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সবিরামজ্বরের বর্ষার প্রারম্ভ অর্থাৎ আষাঢ়মাস হইতে সুরু হইয়া শীতকালের প্রথম পর্য্যন্ত অর্থাৎ অগ্রহায়ণের অর্দ্ধেক মাস

পর্য্যন্ত আধিক্য দেখা যায়। পরন্তু বয়ঃক্রম বা লিঙ্গ অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ ভেদে যে ইহা আক্রমণ করে, তাহা নহে। সদ্যজাতশিশু হইতে অতি বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত ইহা দ্বারা আক্রান্ত হয়। তবে যাঁহারা নিরন্তর ম্যালেরিয়া স্থানে বাস করেন, ম্যালেরিয়ার অভ্যাস বশতঃ তাঁহাদিগকে ইহা অপেক্ষাকৃত কম আক্রমণ করিতে পারে। কিন্তু যদি কোন নূতনব্যক্তি সহসা ঐরূপ ম্যালেরিয়া স্থানে গমন করেন, তবে তাঁহাকে শীঘ্র ও অধিকরূপে আক্রমণ করিতে পারে।

ইণ্টারমিটেণ্ট বা সবিরাম জ্বরকে তিনটী অবস্থায় বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা শীত বা কম্পাবস্থা, উত্তাপ অবস্থা এবং ঘর্ম্ম নির্গমন বা বিরামাবস্থা। এই জ্বরে কম্প সকল সময়ে দেখা যায় না, অনেক সময়ে অল্প শীত অনুভব হইয়া তৎপরেই উত্তাপ প্রকাশ পায়। যখন কম্প হইয়া থাকে, তখন সেই কম্প এক ঘণ্টা হইতে তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকিতে পারে। সচরাচর ১ ঘণ্টা হইতে ১॥ ঘণ্টা পর্য্যন্তও স্থায়ী হয়। পরে ক্রমশঃ কম্পের হ্রাস ও উত্তাপের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কম্পের প্রথমে রোমাঞ্চ অর্থাৎ গাত্র শীড় শীড় করে, পরে বুকের ভিতর গুর্ গুর্ করিয়া ক্রমশঃ শীতের বৃদ্ধি হইয়া প্রবলরূপে কম্প আরম্ভ হয়। এমন কি সে সময়ে কম্প এতদূর প্রবল হয় যে, রোগীর খাট প্রভৃতি কম্পের ধমকে নড়িতে থাকে। প্রায়ই কম্পের সহিত রোগীর অতিশয় পিপাসার বৃদ্ধি ও মুখ শুষ্ক হয় এবং পুনঃ পুনঃ জল পান করে। আর সে সময়ে রোগীর গাত্রে তিন চারিটি লেপ প্রদান করিয়া তাহাকে খুব্ জোরে চাপিয়া ধরিয়া রাখিলে যদিও তাহাতে রোগী কিঞ্চিৎ সুস্থতা বোধ করে বটে, কিন্তু তাহাতে কম্পের কিছুমাত্র নিবারণ হয় না, পরন্তু রোগীর গা হাত পা কামড়াইতে থাকে। কোমরে এবং ঘাড়ে বেদনা বোধ হয়, পরে ক্রমে মস্তক ভার হয়। আবার কখন কখন বা কম্পের সহিত শিরঃপীড়া উপস্থিত থাকে। সমুদায় শরীরের চর্ম্ম কুঞ্চিত হইয়া যায়, হস্ত এবং পদের অঙ্গুলি সকল চুপ্‌সিয়া যায়, এবং হস্তপদ, ওষ্ঠ ও চক্ষুর রক্তাল্পতা অর্থাৎ ফ্যাকাশে বর্ণ দেখা যায় এবং সে সময়ে রোগীর বাহ্যিক চর্ম্মস্থিত সকল রক্ত আভ্যন্তরিক যন্ত্রে প্রবেশ করিয়া স্থায়ী হয়। আর এই কারণবশতঃ ক্রমে আভ্যন্তরিক যন্ত্র সমূহের কন্‌জেসন্ অর্থাৎ রক্তাধিক্য এবং

ইনফ্ল্যামেশন্ বা প্রদাহের প্রথম সূত্রপাত হয় এবং সেই সময়ে নিশ্বাসপ্রশ্বাস ঘন ঘন বহিতে থাকে। অপর কখন কখন বা রোগীর কোন কোন আভ্যন্তরিক যন্ত্রে বেদনা বোধ হয়। তাহার পর ক্রমে কম্পের হ্রাস হইতে আরম্ভ হইলে প্রায় বিবমিষা এবং বমন হইয়া থাকে। এই বিবমিষা এবং বমন যখন আরম্ভ হইবে, তখন কম্পেরও শেষ হইয়া আসিতেছে বলিয়া জানিবে। কম্প অধিক পরিমাণে হইলে হাত ও পায়ে খাইল ধরিতে এবং মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের অতিশয় কম্প হইলে তাঁহাদের প্রলাপ উপস্থিত হইয়া ক্রমে অচৈতন্যতা পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে। ছোট ছোট বালক বালিকার অর্থাৎ তিন বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুর এই জ্বরে শীত আরম্ভ হইয়া কম্প হওয়ার পূর্ব্বেই কখন কখন তড়কা উপস্থিত হয়। আমি শুনিয়াছি, হালি সহরে এবং বাঁশবেড়ে গ্রামে যখন ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তখন কম্পাবস্থায় অনেক লোকের মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিয়াছিল। কিন্তু আমি স্বচক্ষে কখন কাহারও কম্পাবস্থায় মৃত্যু ঘটিতে দেখি নাই।

ক্রমশঃ-

আষাঢ়
কলিকাতা। } শ্রীজগদ্বন্ধু বসু এম, ডি

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ইতিপূর্ব্বে ডাক্তার জগদ্বন্ধু বাবু সংক্ষেপে কুইনাইনের প্রবন্ধ লিখিয়া অতঃপর জ্বরচিকিৎসা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে কেহ এরূপ আশঙ্কা করিবেন না যে, কুইনাইন সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য শেষ হইয়াছে, কেননা পূর্ব্বোক্ত স্বল্পবিরাম ও সবিরাম জ্বরের চিকিৎসার সময়ে কুইনাইনের প্রয়োগ সম্বন্ধে এখনও তাঁহার অনেক বলিবার আছে।

চি, স, স,

হোমিওপ্যাথি মতে।

জ্বরচিকিৎসা-প্রণালী।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসা এই উভয়বিধ চিকিৎসার বিষয় আলোচনা করিলে এই বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় যে, প্রথমোক্ত চিকিৎসায় চিকিৎসক, রোগ আরোগ্য করিবার জন্য বিশেষযত্নবানহন ও তাহাতে সুফল লাভ করেন। কিন্তু শেষোক্ত চিকিৎসায় চিকিৎসক, যাহাতে রোগীর জীবনীশক্তির হ্রাস না হয় ও রোগীর বল বজায় থাকে, এরূপ কাল্পনিক চেষ্টায় ব্যস্ত থাকেন। তাঁহারা মনে করেন যে, কেবল উত্তেজক পানীয় ও ঔষধ এবং প্রচুর আহার যথা—দুগ্ধ ও মাংসের কাথ ইত্যাদি ব্যবস্থা করিলেই রোগীর রোগমুক্ত হওয়া সুনিশ্চিত। কিন্তু এই বিবেচনাটী যে সম্পূর্ণ ভ্রান্তি-মূলক, তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ করা যাইবে। যথাযোগ্য ঔষধের ব্যবস্থা না করিয়া কেবল উত্তেজক পানীয় বা ঔষধ অথবা খাদ্যের উপর নির্ভর করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। এবং পীড়িত অবস্থায় পাকস্থলীর অবস্থা যেরূপ ঘটে, তাহাতে মাংসের কাথ ইত্যাদি জীর্ণ হওয়া সুকঠিন। বিশেষতঃ রোগী প্রলাপযুক্ত হইলে তাহার পাকস্থলীর জীর্ণশক্তি যে একবারে লয় প্রাপ্ত হয়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই, এরূপ অবস্থায় পাকস্থলীর রস আদৌ নিঃসৃত হয় না, বা স্বল্প পরিমাণে হয়। বিশেষতঃ রোগীর শারীরিক যন্ত্রণাদি এতদূর অবসন্ন হইয়া পড়ে যে, তাহাদের স্বাভাবিক ক্রিয়া প্রায় বন্ধ হইয়া আসে। এমতাবস্থায় রোগীর বলাধানের জন্য এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা এরূপ সময়ে যে পরিমাণে পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাহাতে কোন উপকার না হইয়া বরং অপকারেরই সম্ভাবনা। রোগী প্রলাপযুক্ত হইলে এবং পথ্য গলাধঃকরণ করিতে না পারিলে ঐ পথ্য গুহ্য দ্বারে পিচ্‌কারী দ্বারা তাহার অন্ত্র মধ্যে প্রবেশ করান হয়।

উপরে যাহা বলা হইল, সেটী কতকগুলি প্রাচীন ও বিজ্ঞ এলোপ্যাথি-চিকিৎসকের মত। ডাং গ্রেভস্ একজন প্রসিদ্ধ এলোপ্যাথি চিকিৎ-সক। তিনি জ্বরচিকিৎসাবিষয়ে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া

গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, আমার মৃত্যুর পর আমার গোরের পাথরের উপর যেন ইহা লিখিয়া দেওয়া হয় যে, ইনি জ্বররোগীকে কেবল আহারদিয়াই চিকিৎসা করিতেন। সেই মতের ডাক্তার ষ্টোক্স্ এইরূপে অনুমোদন করেন যে, জ্বররোগীকে প্রচুর আহার প্রদান করিয়া বাঁচাইয়া রাখাই রোগীকে জ্বর হইতে মুক্ত করিবার প্রধান উপায়। ইহাতে স্পষ্টরূপে বোধ হয় যে, পথ্যদ্বারা রোগীর বল এবং জীবনীশক্তি রক্ষা করা এলোপ্যাথি চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু এই মতটী এখনকার চলিত মত। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরা যদিও এরূপ পথ্যের ব্যবস্থা না করেন, এবং এরূপ পথ্য আবশ্যক বোধ করেন, অর্থাৎ যে পথ্য রোগীর সহজে জীর্ণ হয়,, তাহার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তৎসঙ্গে রোগীর অবস্থানুসারে ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

ক্রমশঃ —

আষাঢ়	শ্রীহরনাথ রায় এল, এম, এস,
কলিকাতা	হোমিওপ্যাথিক প্রাকৃটীসনার।

নূতন আবিষ্কৃত ঔষধ গুণ সংগ্রহ।

হোমিওপ্যাথি মতে।

১। সিওনেথাস্-আমেরিকানাস্।

ইহার অন্য নাম "নিউ-জারসি চা" পূর্ব্বে চার পরিবর্ত্তে ইহা যথা নিয়মে পানীয় ব্যবহৃত হইত; এক্ষণে ইহা আমেরিকার বহুপরীক্ষিত প্লীহার মহৌষধ। বাস্তবিকই ইহা প্লীহা রোগের আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ। আমরা গত ৫ বৎসর কাল ইহার ব্যবহারে এইরূপ ফল পাইয়াছি, যে যে রোগীর জ্বর প্রাত্যাহিক

নহে, তবে ২।৪ দিন বা ২।৩ সপ্তাহ অন্তর কখন কখন ঘুষঘুষে জর হয়, খাদ্যে রুচি বা অরুচি থাকুক, কোষ্ঠশুদ্ধি, রক্তহীন, ও সামান্য যকৃত বিকৃত অবস্থায় ১ × ডাইলুষন সেবন ও মাদার টিংচার প্লীহার উপর মালিষ করিতে ব্যবস্থা দিয়াছি, তাহার অধিকাংশই সম্পুর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছে, ২।৩ সপ্তাহ উক্ত প্রকার ব্যবহারে প্লীহা নরম ও ছোট হইয়া আসে, ১ মাস আন্দাজ ব্যবহারে নির্দ্দোষ আরোগ্য লাভ করে, কিন্তু প্রথমতঃ যদ্যপি ইহার দ্বারা কোন উপকার না হয়, তবে অন্য অন্য লক্ষণোপযোগী ঔষধ প্রয়োগে জর ও অন্য অন্য উপসর্গাদির শান্তি করিয়া পরে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। অর্থাৎ যদ্যপি জর প্রত্যহ হয় ও উদরাময় থাকে, তাহা হইলে এ ঔষধে উপকার হয় না, উপসর্গাদি কমাইয়া তবে ঔষধ প্রয়োগে উপরোক্ত ফল পাওয়া যায়। আমাদের দেশে প্লীহার যেরূপ প্রাদুর্ভাব, তাহাতে ইহার ব্যবহার সকলেরই জ্ঞাত থাকা কর্ত্তব্য। এই সিওনেথাস্ ঔষধ শ্বেতপ্রদর রোগেরও অব্যর্থ মহৌষধ। কিন্তু যে স্ত্রীলোকের এই শ্বেতপ্রদর রোগজন্য জরায়ুজ দোষ ঘটিয়া সন্তানাদি হয় নাই, বা যদিও গর্ভধারণ হইয়া থাকে, তাহা অসময়ে স্রাব হইয়া যায়, ও পেটে সদাসর্ব্বদা এক প্রকার বেদনা অনুভব হয়, বিশেষতঃ ঋতু কালীন রক্ত অত্যল্প নির্গত হয় ও পেট কন্ কন্ করে, এবম্প্রকার লক্ষণানুযায়ী রোগীর পক্ষে ব্যবস্থারূপ সেবন করাইয়া বহুল উপকার সাধন হইতে দেখা ও শুনা গিয়াছে।

২। ইস্কিউলাস্-হিপ্রোকাষ্টিনম্।

ইহা আমেরিকা খণ্ডে পর্য্যাপ্তপরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা বিশেষরূপ পরীক্ষায় জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে,ইহা যকৃতের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া সরল অন্ত্র ও মলদ্বারের পীড়ায় বিশেষ উপকার হইয়া থাকে, যথা—অর্শরোগের ইহা চূড়ান্ত ঔষধ, রক্ত বাহির হউক না হউক। কিন্তু কোমরে বেদনা থাকা চাই ; কোষ্টবদ্ধ বা কঠিন মল নির্গমন, মলদ্বার জ্বালা করা অর্থাৎ প্রায় অর্শরোগ মাত্রেই এই ঔষধসেবনে আরোগ্য হয়. কারণ অর্শ, বহির্ব্বলি, বা অন্তর্ব্বলি রোগে, এই ঔষধের অধিকাংশ লক্ষণ থাকে, তজ্জন্য

এই ঔষধটী অব্যর্থ বলিলেও বলা যাইতে পারে; কিন্তু কোন কোন সময় ইহার সহিত আর ২।১টী ঔষধ লক্ষণাদিতে ব্যবহৃত হয়, ইহা পৃষ্ঠ বেদনার সহিত পীতবর্ণ শ্বেত প্রদরেরও মহৌষধ। এবং জননেন্দ্রিয় মধ্যে জ্বালা বোধ করা ইত্যাদি। যকৃতের রক্তাধিক্যাবস্থায় ও ব্যবহৃত হয়।

হরিসভা দাতব্য চিকিৎসালয় } শ্রীগগণচন্দ্র নন্দী হোঃ পেঃ
চন্দন নগর } ডাক্তার

কেবল কবিরাজই হাতুড়ে নহে।

ভাগ্যদোষে কাল প্রবাহে আমাদের দেশে আজ কাল চিকিৎসাপ্রণালী যে কি এক প্রকারের অদ্ভুত খিচুড়ি হইয়া উঠিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। হায়! বিদেশীয় শিক্ষার কি মোহিনী শক্তি! বিদেশীয় শিক্ষার কি আশ্চর্য্য ঐন্দ্রজালিক ভেল্কী! সেই অত্যাশ্চর্য্য বিশ্ব-বিমোহিনী ভেল্কীর প্রভাবে দেশ শুদ্ধ সকলেই একেবারে মাতিয়া উঠিয়াছেন। একজন বিলাতী ডাক্তার কোন সময় হয় ত অপরিমিত মদের ঝোঁকে বলিয়া ফেলিলেন—"আয়ুর্ব্বেদ নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ" অমনি চতুর্দ্দিক্ হইতে সমস্বরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—"আয়ুর্ব্বেদ নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ"—নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক—প্রকৃত পক্ষে উহাকে চিকিৎসা শাস্ত্রই বলা যায় না ইত্যাদি।" কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যাঁহারা এইরূপ বলেন তাঁহারা একবার মনে করেন না যে, না জানিয়া কোন বিষয়ের অযথানিন্দা করিলে তাহাতে নিজের অপরিণামদর্শীতা ও বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায় না। এই কথা শুনিয়া অনেক অদূরদর্শী ডাক্তার বোধ হয় আমার উপর অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিবেন। তা হউন তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই! আমি প্রতিনিয়ত জাজ্জ্বল্যমান যাহা দেখিতেছি তাহা অবশ্যই উল্লেখ করিব।

প্রায় এক মাস আমাদের দেশের এক জন সম্ভ্রান্ত ধনী লোকের পঞ্চম বর্ষীয় একটী বালকের প্রথমতঃ সামান্য জ্বর হয়। বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন, ধনী লোকের সামান্য পীড়াতেও ভূরি ভূরি অর্থব্যয় ও যথেষ্ট তদ্বির হইয়া থাকে। তাই জ্বর হইবামাত্রই এক জন হোমিওপ্যাথি ও আর এক জন এলোপ্যাথি নেটিভ ডাক্তারের হস্তে উক্ত বালকের চিকিৎসার ভার অর্পিত হয়। শেষোক্ত ডাক্তার মহাশয়েরও হোমিওপ্যাথিতে অধিকার আছে। তাই তাঁহারা দুই জনে একবাক্যে হইয়া টাইফয়েড্ ফিবার জ্ঞানে চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে এক দুই করিয়া সপ্তাহ অতীত হইল। জ্বর আরোগ্য হওয়া দূরে থাক, পরিশেষে জ্বর-বিকারে পরিণত হইল, নিকটে একটা জীবহত্যা হইতে চলিল দেখিয়া আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলামনা। তাঁহাদিগকে বলিলাম,মহাশয়! আমাদের নিদানশাস্ত্রে ক্রিমিরোগের যে সমস্ত লক্ষণ লিখিত আছে, সেই সমস্তই এই বালকের দেখিতেছি। আপনারা কি ক্রিমিরোগের কোন ঔষধ ব্যবহার করিয়াছিলেন? আরও অবিরত মস্তকে জলপটি ব্যবহার করিতেছেন, ইহাও আমার বিবেচনায় অন্যায়। কেননা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে——

"লৌহিত্যে নেত্রয়োর্বান্তৌ প্রলাপে মূর্দ্ধচলনে.

——————————তত্র শীতা ক্রিয়া হিতা।"

অর্থাৎ চক্ষু রক্তবর্ণ, বমি, প্রলাপ ও শিরশ্চালনাদি লক্ষণ লক্ষিত হইলে শীতক্রিয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু বর্ত্তমান রোগীর যখন জ্বরের অত্যন্ত বেগ হয়, কেবল সেই সময় বমি ও দুর্ব্বল অস্পষ্ট প্রলাপ হইয়া থাকে। এই বলিতে না বলিতেই বাবুদ্বয় উত্তর করিলেন, "এখন আর সেকালের মত দুই একটা বচন প্রয়োগে রোগ আরোগ্য হয় না। উহা পুরাণ হইয়া-গিয়াছে। এখনকার চিকিৎসা ব্যাপার বড়ই কঠিন, ইহাতে লেখাপড়া জানা চাই যথার্থ জ্ঞানোপার্জ্জন করা চাই ইত্যাদি।" যাহা হউক, দেখিতে দেখিতে ১৭।১৮ দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। রোগীও ক্রমে অন্তিম সীমায় উপস্থিত হইল। হস্ত, পদ, মস্তক প্রভৃতি শরীরের স্থানে স্থানে পাকিয়া উঠিল। কিছু দূরে এল, এম্, এস্, উপাধিধারী একজন নামজাদা ডাক্তার ছিলেন। পরে তাঁহাকে আনিয়া এলোপ্যাথি মতে চিকিৎসা আরম্ভ

হইল এবং ক্ষত স্থানে অস্ত্রপ্রয়োগ করা হইল। যে সময় অস্ত্র করা হয়, তখন রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান ছিল এবং জ্বরও ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু ডাক্তরগণ মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন যে, "আর কোন চিন্তা নাই, জ্বর লাঘব হইয়াছে, এখন নিশ্চয়ই আরাম হইবে।" তখন অভিভাবকের আদেশমত আমি আর একবার যাইয়া দেখিলাম—রোগীর শরীরে কিছুমাত্র তাপ নাই, সংজ্ঞাও নাই। আবার মূল স্থানে নাড়ী বিদ্যুজ্জ্যোতির ন্যায় অনুভূত হইতেছে। তদ্দৃষ্টে বলিলাম--মহাশয়! মহাত্মা আর্য্য ঋষিগণ বহুকাল পুর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন,——

স্থিত্বা নাড়ী মুখে যস্য বিদ্যুজ্জ্যোতিরিবেক্ষতে।
দিনৈকং জীবিতং তস্য দ্বিতীয়ে মরণং ভবেৎ॥

বর্ত্তমান রোগীর অবস্থাও তাহাই বোধ হইতেছে। ডাক্তারগণ নিশ্চয় আরাম হইবে বলিয়া আস্ফালন করিতেছেন, কালনেমীর লঙ্কাভাগের ন্যায় পারিতোষিক মীমাংসা করিতেছেন; কিন্তু আমি যতদূর বুঝিয়াছি তাহা বড় শোচনীয়। রোগীর জীবনীশক্তি একবারে হ্রাস হইয়াছে। কল্যই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইবেন। এইকথা শুনিয়া ডাক্তারগণ উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলেন এবং জ্যোতির্ব্বিদ্ গণক প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়া আমাকেউপহাস করিতে লাগিলেন। আমিও তখন "দশচক্রে ভগবান ভূত,, ভাবিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। কিন্তু দুঃখেরবিষয় এই যে,পরদিন রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই হতভাগা গৃহস্থের একমাত্র আশার প্রদীপ দপ্ করিয়া নিবিয়া গেল। ডাক্তারবাবুদের হাত হইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত আরাম-শয্যায় চিরকালের জন্য বিরামলাভ করিতে লাগিল। পরে জানিতে পারিলাম আমার নিকট ক্রিমি রোগের কথা শুনিয়া ডাক্তারগণ হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার মধ্যেও সুপারিমূল, ডালিমের খোসা ও জয়ন্তী পাতার রস প্রভৃতি গাছড়া ঔষধও প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তবেইএই প্রকার চিকিৎসাকে খিচুড়ি না বলিয়া আর কি বলিব? ছোট বড় সকল ডাক্তারেই সকল সময় হাতুড়ে বৈদ্যের যথোচিত নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন। তাহদিগকে "যমদুত" বলিয়া যথেষ্ট ঘৃণা করিয়া থাকেন। কিন্তু সূক্ষ্মরূপেবিবেচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে হাতুড়ে বৈদ্য অপেক্ষা আজকাল হাতুড়ে ডাক্তরের সংখ্যাই বেশী হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে পাড়ায়

পাড়ায় নিত্য নূতন কতশত অদ্ভুত জীব মেটিরিয়া মেডিকার দুই তিন পাতা উলটাইয়া অদ্ভুত ডাক্তাররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং নিত্য নূতন কতশত জীবের জীবনহরণ করিয়া ডাক্তার নামে কলঙ্ক করিতেছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বোধ হয় তাহাদিগকে যমের সহোদর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে প্রকার ডাক্তরের বৃদ্ধি হইয়াছে, আরও পাঁচ বৎসর যদি সেইরূপ হয় তবে সৃষ্টি বিনাশ করিতে বোধ হয় ভগবানকে আর কল্কীরূপ ধারণ করিতে হইবে না।

বিজ্ঞ চিকিৎসকমাত্রেই বেশ অবগত আছেন যে, বালকদিগের বাতাজীর্ণে প্রায়ই উদরস্ফীত হইয়া থাকে এবং সেই সঙ্গে কাহারো বা জ্বরও হইয়া থাকে। কিন্তু আধুনিক ডাক্তার মহাশয়গণ তদ্রূপাবস্থায় যকৃৎ প্লীহা প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়া চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন। যেখানে রোগ নির্ণয় করিতেই ভুল, সেখানে যে, তার কি পরিণাম হইয়া দাঁড়ায়, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। ফলতঃ অগাধ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মন্থন করিলে রোগ নিশ্চয় করিবার যে সমস্ত প্রশস্ত উপায় পাওয়া যায়, তত বোধ হয় আর কোন শাস্ত্রেও নাই। নব্য হাতুড়ে ডাক্তারগণ বৃথা আত্মাভিমান পরিত্যাগ করিয়া অযথা বিলাতি গৌরব রক্ষা করিবার চেষ্টা না করিয়া যদি একবার আয়ুর্ব্বেদ হইতে "রোগ বিনিশ্চয়তত্ত্ব" শিক্ষা করিতেন, তাহা হইলে দেশের মহান্ উপকার সাধিত হইত। নতুবা নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে, তাঁহারাই ভগবানের দশঅবতার পূর্ণ হইতে দিবেন না।

২ আষাঢ় ১২৯৪ সাল } শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়
উমারপুর, পোঃ নাকালীয়া, পাবনা।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

উপরোক্ত কথাগুলি যে আপনার হৃদয়ের কথা, এবং ইহা যে কোনরূপে অতিরঞ্জিত নহে, ইহা সত্য; কিন্তু কি করিবেন, আজ আপনি একটী ঘটনাতে এত অস্থির হইয়াছেন। কিন্তু আমরা সচরাচর এইরূপ শত শত ঘটনায় জ্বালাতন হইয়া পড়িয়াছি। দুঃখের বিষয় এই যে, স্বধর্ম্মদ্রোহী হিন্দুসমাজে এরোগের কোন ঔষধ আছে কি?

চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ।

আঁতুড়ে ছেলের পেঁচো পাওয়া বা ধনুষ্টংকার রোগ।

জনৈক ব্রাহ্মণের অষ্টমদিন বয়স্ক সন্তান, জ্বর, চোয়ালধরা, ৫।১০ মিনিট অন্তর ধনুকাকারে খেঁচুনি, নানাপ্রকার বর্ণান্তর প্রাপ্ত, মাতৃ স্তনপানে অক্ষম এবং কোষ্ঠ কাঠিন্য ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়। রোগীর অভি-ভাবকগণ, ভূত প্রেতের আক্রমণ মনে করিয়া, ক্রমে ২২।২৩ জন ওঝা ও দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণের দ্বারায় নানাপ্রকার ঝাড়াণকাড়াণ এবং শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি করান। তাহাতে উপকার হওয়া দূরে থাকুক, বরং উত্তরোত্তর রোগের বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া তাহার জীবনের আশায় একেবারে হতাশ হইয়া ২২ দিনের দিন আমার নিকট আইসেন।

তৎকালে রোগীর অবস্থা-শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত, নাড়ী অত্যন্ত দ্রুতগতি, চোয়ালধরা, সমস্ত অঙ্গ অনমনীয়, ও কিছুকাল পরে ধনুকাকারে খেঁচুনি হইতে দেখিয়া, এবং তাহার অভিভাবকের প্রমুখাৎ আনুপূর্ব্বিক পূর্ব্বোক্ত ঘটনাসমস্ত বিদিত হইয়া, হোমিয়োপেথিমতে একনাইট (৩) ও বেলাডনা (৬) যথোচিত মাত্রায় পর পর প্রয়োগ করিতে দিয়া বিদায় দিলাম। প্রায় ১দিন এইরূপ ব্যবহারে, শুনিলাম জ্বর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম পরিমাণে ও কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়াছে। কিন্তু আর আর অবস্থা অর্থাৎ চোয়ালধরাওতজ্জন্য মাতৃ-স্তনপানে অক্ষম এবং সমস্ত অঙ্গ অনমনীয় ইত্যাদি পূর্ব্ববৎইআছে। পুনরায় পূর্ব্বোক্ত ঔষধই ব্যবহার করিতে দিলাম। এইরূপ ৩।৪দিন ব্যবহারে ঐ সমস্ত উপদ্রবের কোন লাঘব হইতে না শুনিয়া, পুনরায় রোগীকে দেখিয়া, তৎ-লক্ষণোচিত হোমিয়োপেথি অন্যকোন ঔষধ আমার নিকট না থাকায়, এলো-পেথি টিংচরক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা ১ফোটামাত্রায়,অল্পপরিমাণে গাভিদুগ্ধের সহিত ২ ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করিতে দিলাম। এই ঔষধ প্রায় ২৪ ঘণ্টাব্যবহারে, পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় কোনরূপ পরিবর্ত্তন নাহওয়ায়, হাইড্রেটঅব ক্লোরাল ১গ্রেণ, ব্রোমাইড্ অবপটাস ১গ্রেণ অল্পপরিমাণে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেক

আক্রমণে এক এক বার ব্যবহার করিতে দিলাম। এবং বলিয়াদিলাম যতক্ষণ এই ঔষধে নিদ্রিত থাকিবেক,ততক্ষণ আর এই ঔষধযেন সেবন না করানহয়। এইরূপ ১দিন ব্যবহারে শুনিলাম, রোগীর পূর্ব্বাবস্থাপেক্ষা অনেক পরিমাণে উপশম হইয়াছে। অর্থাৎঅনেক সময় নিদ্রিত থাকায় খেঁচুনিও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সময়ান্তর হয় এবং চোয়ালও সমস্ত অঙ্গ অনেক নরমহইয়াছে। পুনরায় পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সহ স্পিরিটস্ ইথারসালফ্ ১ফোঁটামাত্রায় পূর্ব্ববৎ নিয়মে সেবন করিতে দিলাম। এই ঔষধ প্রায় ১দিন ব্যবহারে রোগীর চোয়ালছাড়িয়া মাতৃস্তন পানে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু জ্বর সময় সময় হওয়ায়, ঐ জ্বরের সময় খেঁচুনি হইয়াথাকে, শুনিয়া কুইনাইন অর্দ্ধগ্রেণ মাত্রায় বিরামবস্থায়,এবং পূর্ব্বোক্ত ঔষধ. প্রত্যেক আক্রমণে ব্যবহার করিতে দিলাম। এইনিয়মে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ প্রায় সপ্তাহ্ সেবনে ঈশ্বরের কৃপায় সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য হইয়াছে। এক্ষণ পর্য্যন্ত আরকোন উদ্বেগ হয় নাই।

পথ্যও আনুসঙ্গিক চিকিৎসা যথা—যেপর্য্যন্ত মাতৃস্তনপানে অসমর্থ ছিল সেপর্য্যন্ত গাভিদুগ্ধ জলমিশ্রিত করিয়া, তৎপরে মাতৃদুগ্ধপান করিতে দেওয়া হইয়াছিল।

ফিটের সময় চক্ষে, মুখে শীতল জলেরছিটা, এবং সময় সময় গরমজলের টবে গলাপর্য্যন্ত বসান গিয়াছিল।

উপসংহারে আমাদের শিক্ষক মহামান্য ও বহুদর্শী শ্রীযুতডাক্তার জগদ্বন্ধু-বসু এম, ডি মহাশয়কে শত সহস্র ধন্য বাদদিয়া এই প্রস্তাব শেষ করিলাম। যেহেতু তাহার লিখিত সম্মিলনীর উপদেশানুসারেই উপরোক্ত চিকিৎসায় যশঃ লাভ করিয়াছি, ভরসাকরি উক্তমহাত্মার বহুদর্শীতার পরিচয় ক্রমে,সম্মিলনীতে প্রকাশ হইয়া, অনেকের জ্ঞান চক্ষু উন্মিলীত হইবেক।

মহারাজগঞ্জ
ঝালকাঠি
বরিশাল
২০সা আষাঢ় ১২৯৪

একান্তবশম্বদ
শ্রীশ্যামাচরণ সেনগুপ্ত
লেট্ সিবিল হস্‌পিটাল এসিট্যাণ্ট।

স্ত্রীলোকের মাসিক রজঃস্রাব বা ঋতু।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মনুষ্যজাতির ঋতু ও ইতর জন্তুর সাময়িক উষ্ণতাসম্বন্ধে যে সাদৃশ্য আছে, তদ্বিরুদ্ধে অনেকে বলেন যে, ইতর জন্তুগণ কেবল মাত্র ঋতুর সময়ে স্ত্রীগমন করে, কিন্তু মনুষ্যের আচরণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, যেহেতু তাঁহারা ঋতু সময় বাদ দিয়া অন্য সময়েও গমন করেন। ইহার উত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, কেবল যে কয়দিন রক্তস্রাব হয়, সেই কয়দিন মাত্রকেই ঋতুর সময় বলা যায় না। রক্তস্রাবের পরও যতদিন জননেন্দ্রিয় উত্তেজিত ও স্ফীত অবস্থায় থাকে, ততদিনকেই ঋতুর সময় বলা যায়। কুকুর প্রভৃতি জন্তুর উষ্ণতা তিন সপ্তাহ কাল স্থায়ী হয়। উহাদিগের উষ্ণতা আরম্ভ হইবার সময় দিন কয়েক রক্ত স্রাব হয়। ঠিক রক্তস্রাবের সময়মাত্র সহবাস হইলে আবার তাহার পরও সহবাসের দরকার হয়, নচেৎ সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, একথা কতদুর সত্য তাহা বলা যায় না। সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, কুকুর ব্যাবসায়ীগণ এইরূপ সংস্কারের বশীভূত হইয়া ভাল কুকুর তৈয়ার জন্য যে কয়দিন কুক্কুরীর রক্তস্রাব হয়, সে কয়দিন তাহার নিকট কুকুর যাইতে দেয় না। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মত এই যে, আর্ত্তব শোণিতে শুক্র ধুইয়া যাইবার সম্ভাবনা। শোণিতের স্রোত ঠেলিয়া ঐ অবস্থায় শুক্র, জরায়ু মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। এজন্য ঋতুর সময়ে স্ত্রীগমন করিলে সহবাসে গর্ভোৎপত্তি হয় না। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও এতদ্বারা ইহাই বোধ হয়, যে ঋতুর সময়ে স্ত্রীলোকের পুরুষ সহবাসেচ্ছা প্রবল হইলেও শুদ্ধ এইসব কারণ বশতঃ বহুকাল হইতে মনুষ্য সমাজে ঋতুর সময়ে স্ত্রীগমন নিষিদ্ধ হইয়াছে। আবার মানবজাতির স্বভাবসিদ্ধ ঘৃণাবশতঃও এরূপ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার বিচিত্রতা নাই। ঋতুর সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যজাতি যেরূপ আচরণ করে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে ইহাই

সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হিন্দু রমণী তিন দিন "অশুদ্ধ" থাকে। তাহাকে এই সময়ে স্পর্শ করিলেও পাপ হয়। সে চণ্ডালের ন্যায় হয়। এই কয়দিন সে খাদ্য সমগ্রী পর্য্যন্তও স্পর্শ করিতে পায় না। তারপর চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়। ইহুদি রমণীদিগের ভিতর এ সম্বন্ধে আরও কঠোর প্রথা প্রচলিত আছে। তাহাদিগের ঋতু দেখা দিলেই প্রথমতঃ সেই তারিখ হইতে গণনা করিয়া পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত ঋতুকাল গণনা করে। যদি ঋতু একদিন কি একঘণ্টা মাত্রও থাকে অথবা বস্ত্রে সামান্য দাগ মাত্র লাগিয়া ক্ষান্ত হয়, তত্রাচ তাহারা পাঁচদিন ঋতু সময় পালন করে। তার পরও আর সাতদিন বাদ দিয়া তবে শুদ্ধ হয়। অর্থাৎ ঋতু দেখা দিবার দিন হইতে দ্বাদশ দিবসে শুদ্ধ হইয়া স্বামীগমন করে। দ্বাদশ দিবসের রাত্রে স্নান করার প্রথা চলিত আছে। যদি মাসের অন্য কোনও সময়ে ফের রক্ত দেখা দেয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার সাতদিন পর্য্যন্ত নিয়ম পালন করে। মুশলমানদিগের কোরান অনুসারে যে কয়দিন মাত্র রক্তস্রাব হয়, সেই কয় দিন স্ত্রী গমন নিষিদ্ধ। ইহার মধ্যে যাহাদিগের দশ দিনের অতিরিক্ত দিন পর্য্যন্তও রক্তস্রাব হয়, তাহাদিগের সম্বন্ধে রক্তস্রাবের প্রথম দিন হইতে দশ দিবস পর্য্যন্ত নিয়ম পালন করিবার ব্যবস্থা আছে। তারপর রক্তস্রাব হইলেও স্ত্রীগমন নিষিদ্ধ নাই। ইউরোপীয়দিগের ও হিন্দুদিগের প্রথা প্রায়ই একই ধরণের। ইউরোপীয়েরা যে কয়দিন মাত্র রক্তস্রাব হয়, সেই কয় দিন অর্থাৎ সাধারণতঃ তিন দিন পর্য্যন্ত নিয়ম পালন করে। এই সকল প্রথা পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হইবে, যে ঋতু সময়ে স্ত্রী গমনে মনে ঘৃণার উদ্রেক হয় বলিয়াই মনুষ্য সমাজে ঐ কালে স্ত্রীগমন নিষিদ্ধ হইয়াছে।

হিন্দু শাস্ত্রকারগণ ঋতুর পর স্ত্রীগমন অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এমন কি রমণীর ঋতু রক্ষা না করিলে মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয় এরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরাশর বলেন যদি কন্যা অবিবাহিতা অবস্থায় পিতৃগৃহে ঋতুমতী হয়, তবে যতবার রজস্বলা হয়, ততবার ঐ কন্যার পিতা মাতা ভ্রূণ হত্যার পাপে লিপ্ত হন। এই সকল বিধি দেখিলে বোধ হয়, যে যাহাতে গর্ভ সঞ্চারের সুযোগ নষ্ট না হইয়া

পৃথিবীতে ক্রমশঃ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, ইহাই শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রেত। ঋতু সময়ে স্ত্রীগমন করিলে সন্তানোৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ঋতুর পর কত দিন মধ্যে উক্ত সম্ভাবনা থাকে, এবং কত দিন পরেই বা স্ত্রীগমন করিলে সন্তানোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না, তাহা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ ষোল দিন পর্য্যন্ত ঋতুকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ ষোল দিনের মধ্যে করিলে সন্তানোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এরূপও দেখিতে পাওয়া যায়, যে অনেক ব্যক্তি গর্ভ হইবার সম্ভাবনা ত্যাগ করিবার নিমিত্ত ষোল দিন পরেও স্ত্রীগমন করিয়া সন্তানের মুখ দেখিয়াছেন। ইহুদিজাতি ঋতু হইবার দ্বাদশ দিবস পরে স্ত্রীগমন করে, অথচ ইহাদিগের বংশবৃদ্ধি অত্যন্ত অধিক। অতএব যে সকল স্ত্রীলোক মাস মাস ঋতুমতী হয়, তাহারা যে কোন সময়ে পুরুষ সহবাস করিলে গর্ভবতী হইতে পারে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, ঠিক ঋতুর অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে সহবাস হইলে সন্তানোৎপত্তির যত সম্ভাবনা থাকে, অন্য সময় তত থাকে না। ক্রমশঃ—

শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্যাল এম, বি,।

আয়ুর্ব্বেদ-তত্ত্ব।*

স্বাস্থ্যপালন-বিধি।

সুস্থলক্ষণ।

যাহার শরীরস্থ দোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ,) অগ্নি, ধাতু (রস, রক্ত,

* আয়ুর্ব্বেদতত্ত্ব প্রবন্ধের উপক্রমণিকা ভাগে লিখিত হইয়াছিল যে, প্রথমতঃ দেশব্যাপী স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণস্বরূপ জল, বায়ু, দেশ ও কালের বিবরণ বিবৃত করিয়া পরে অন্যান্য বিবরণ লিখিত হইবে। কিন্তু কোন

মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র), মল, মূত্র, কার্য্যোৎসাহ প্রভৃতি সাম্যাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে এবং আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনঃপ্রসন্ন থাকে, তাহাকেই সুস্থ বলা যায়। (১)

দিনচর্য্যা।

স্বাস্থ্যাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি নিজ শরীরের অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে (দুই দণ্ড রাত্রি থাকিতে) শয্যা হইতে উত্থিত হইবে এবং মল মূত্রের বেগ উপস্থিত হইলে বাসস্থানের কিঞ্চিৎদূরে নির্জ্জন স্থানে মল মূত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃত্তিকা ও জল দ্বারা হস্ত পদাদি ও মলমার্গ প্রক্ষালন করিবে। তৎপরে কষায়, মধুর, কটু ও তিক্ত রসযুক্ত বৃক্ষের শাখাগ্রদ্বারা দ্বাদশাঙ্গুল দীর্ঘ, কনিষ্ঠাঙ্গুলিবৎ স্থূল, সরল, গ্রন্থি শূন্য, ও অক্ষত দন্তকাষ্ঠ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা (দন্তমূলস্থ মাংস আহত না হয় এরূপ ভাবে) দন্ত মার্জ্জন করিবে।

নিজ শরীরস্থ বায়ু, পিত্ত, কফ, রস ও বীর্য্য প্রভৃতির ন্যূনাধিক্য ও শীত বসন্তাদি ঋতুকালের অবস্থা বিবেচনা করিয়া কটু কষায়াদি রসযুক্ত বৃক্ষশাখা দন্তমার্জ্জনার্থ নির্ব্বাচন করিবে। তন্মধ্যে তিক্তরসে

বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিলেন যে, প্রথমতঃ স্বাস্থ্য-পালন বিধি লিখিয়া তৎপরে স্বাস্থ্য-ভঙ্গের প্রধান কারণ জলাদির বিবরণ লেখাই সুসঙ্গত। আমরাও তাঁহার একথা সুযুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া এখন অবধি স্বাস্থ্য-পালন বিধিই লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু পূর্ব্ব প্রকাশিত চিকিৎসা-সম্মিলনীতে জলবিবরণ সম্পূর্ণ এবং বায়ু বিবরণের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে, তাহার আর প্রতিবিধান নাই। অতঃপর স্বাস্থ্য-পালন বিধি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইলে পরে বায়ু বিবরণের অবশিষ্টাংশ এবং দেশ ও কাল বিবরণের সম্পূর্ণাংশ প্রকাশিত হইবে। লেখক।

(১) সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতু মলক্রিয়ঃ।
প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ স্বস্থ ইত্যভি ধীয়তে। (সুশ্রুতঃ)

নিম্ব, কষায়রসে খদির, মধুর রসে যষ্টিমধু এবং কটুরসে করঞ্জ বৃক্ষই শ্রেষ্ঠ। (২)

গুবাক, তাল, হিন্তাল, কেতকী, বৃহৎ তৃণ, খর্জ্জুর ও নারিকেল এই সপ্ত বৃক্ষের শাখা দ্বারা কখনও দন্তমার্জ্জন করিবে না। (৩)

গল, তালু, ওষ্ঠ, জিহ্বা, ও দন্তরোগী, মুখক্ষত, কাস,শ্বাস, বমী, অজীর্ণ, মূর্চ্ছা, মত্ততা, শিরঃশূল, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, ক্লান্তি, অর্দ্দিত, কর্ণশূল, শোথ, নেত্ররোগ, হৃদ্রোগ, নবজ্বরযুক্ত ও দুর্ব্বল ব্যক্তির দন্ত মার্জ্জন অকর্ত্তব্য। (৪)

দন্ত মার্জ্জন দ্বারা মুখের দৌর্গন্ধ্য, লিপ্ততা ও কফ বিনষ্ট হয় এবং মুখ পরিষ্কৃত, অন্নে রুচি ও মনঃ প্রফুল্ল হয়। (৫)

---

(২) ব্রাহ্মেমুহূর্ত্তে উত্তিষ্ঠেৎ সুস্থো রক্ষার্থমায়ুষঃ। শারীরচিন্তাং নির্বর্ত্ত্য কৃতশৌচবিধিস্ততঃ। ভক্ষয়েদ্দন্তপবনং দন্তমাংসান্যবাধয়ন্। (বাভটঃ) তত্রাদৌদন্তপবনং দ্বাদশাঙ্গুলমায়তং। কনিষ্ঠিকাপরীনাহমৃজ্বগ্রন্থিতমব্রণং। অযুগ্মগ্রন্থি যচ্চাপি প্রত্যগ্রং শস্তভূমিজং। অবেক্ষ্যর্ত্তুঞ্চ দোষঞ্চ রসং বীর্য্যঞ্চ যোজয়েৎ। কষায়ং মধুরং তিক্তং কটুকং প্রাতরুত্থিতঃ। নিম্বশ্চ তিক্তকে শ্রেষ্ঠঃ কষায়ে খদিরস্তথা। মধুকো মধুরেশ্রেষ্ঠঃ করঞ্জকটুকেতথা। (সুশ্রুতঃ)

আয়ুষ্যমুষসিপ্রোক্তং মলাদীনাং বিসর্জ্জনং। নবেগিতোঽন্যকার্য্যঃস্যাৎ নবেগানীরয়েদ্বলাৎ। × গুদাদিমলমার্গাণাং শৌচংকান্তিবলপ্রদং। × প্রক্ষালনং মতং পাল্যাঃ পাদয়োঃ শুদ্ধিকারণং। × × আহারনির্হারবিহার-যোগাঃ সদৈবসদ্ভির্বিজনে বিধেয়াঃ॥ নির্হারোমলমূত্রোৎসর্গঃ। (ভাবপ্রকাশঃ)

(৩) গুবাকতালহিন্তালং কেতকশ্চ বৃহত্তৃণঃ। খর্জ্জুরং নারিকেলঞ্চ সপ্তৈতে তৃণরাজকাঃ। তৃণরাজসমুৎপন্নং যঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনং। নরশ্চণ্ডা-লযোনিঃ স্যাৎ যাবৎ গঙ্গাংন পশ্যতি। (ভাব প্রকাশঃ)

(৪) ন খাদেৎগলতাল্বোষ্ঠজিহ্বাদন্তগদেষুচ। মুখস্যপাকেশোথেচ কাসশ্বাসবমীষুচ। দুর্ব্বলোঽজীর্ণভুক্তশ্চ হিক্কামূর্চ্ছামদান্বিতঃ। শিরোরু-জার্ত্তস্তৃষিতঃ শ্রান্তঃ পানক্লমান্বিতঃ। অর্দ্দিতঃকর্ণশূলীচনেত্ররোগীনবজ্বরী। বর্জয়েদ্দন্তকাষ্ঠঞ্চ হৃদাময়যুতোঽপিচ। (ভাবপ্রকাশঃ)

(৫) তদ্দৌর্গন্ধ্যোপদেহৌচ শ্লেষ্মাণঞ্চাপকর্ষতি। বৈশদ্যমন্নাভিরুচিং সৌমনস্যং করোতিচ। (২ অ সুশ্রুতঃ)

দন্ত মার্জ্জনান্তে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতি নির্ম্মিত, অতীক্ষ্ণ (মৃদু ও মসৃণ ও বক্র জিহ্বানির্লেখন (জিভ্ ছোলা) দ্বারা জিহ্বা-মূলগত মলাদি অপহরণ করিবে। (৬)

জিহ্বা পরিষ্কৃত করিলে বিরসতা, দৌর্গন্ধ্য, শোথ ও জড়তা প্রভৃতি বিদূরিত হয়। (৭)

মুখে তৈল ঘৃত প্রভৃতি স্নেহ বস্তু দ্বারা অথবা ক্ষীরীবৃক্ষ (বট, অশ্বথ প্রভৃতি) প্রভৃতি কষায় দ্বারা গণ্ডূষধারণ করিলে দন্ত দৃঢ় হয় এবং রুচি জন্মে। (৮)

শীতল জলদ্বারা মুখ ও নেত্র সিঞ্চন করিলে মুখব্যঙ্গ, নীলিকা, পীড়কা মুখশোষ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ প্রশান্ত হয়। এবং দৃষ্টি শক্তির উৎকর্ষতা জন্মে। (৯)

প্রতিদিন নেত্রে সৌবীরাঞ্জন (সুরমা) ব্যবহার করিলে নেত্রের দাহ, কণ্ডূ, ক্লেদ, মল ও বেদনা নিবৃত্ত হয়। এবং চক্ষুঃ তেজস্বি ও বাতাতপ সহিষ্ণু হয় এবং নেত্ররোগের আশঙ্কা থাকে না। (১০)

পরিশ্রান্ত, রাত্রি জাগরিত, শিরঃ-স্নাত, জ্বরযুক্ত ও ভুক্ত ব্যক্তির নেত্রে

---

(৬) সুবর্ণরূপ্যতাম্রাণি ত্রপুরীতিময়ানিচ। জিহ্বানির্লেখনানিস্যুরতীক্ষ্ণান্যনৃজূনিচ। (চরকঃ)

(৭) মুখবৈরস্যদৌর্গন্ধ্যশোফজাড্যহরং পরং। (সুশ্রুতঃ)

(৮) দন্তদার্ঢ্যকরং রুচ্যং স্নেহগণ্ডূষধারণং। ক্ষীরিবৃক্ষকষায়ৈর্বা ক্ষীরেণচ বিমিশ্রিতৈঃ। (সুশ্রুতঃ)

(৯) প্রক্ষালয়েন্মুখং নেত্রে স্বস্থঃ শীতোদকেনবা। নীলিকাং মুখশোষঞ্চ পীড়কাং ব্যঙ্গমেবচ। রক্তপিত্তকৃতান্ রোগান্ সদ্য এব বিনাশয়েৎ। (সুশ্রুতঃ)

(১০) মতং স্রোতোঽঞ্জনং শ্রেষ্ঠং বিশুদ্ধং সিন্ধুসম্ভবং। দাহকণ্ডূমলঘ্নঞ্চ দৃষ্টিক্লেদরুজাপহং। অক্ষ্ণো রূপাবহঞ্চৈব সহতে মারুতাতপৌ। নচনেত্ররোগাজায়ন্তে তস্মাদঞ্জনমাচরেৎ। (সুশ্রুতঃ)

অঞ্জন ব্যবহার নিষিদ্ধ। (১১)

প্রতিদিন সর্ষপ তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে শিরঃশূল, বলি, পলিত ও মুখ ব্যঙ্গ প্রভৃতি বহু প্রকার রোগের আশঙ্কা বিদূরিত হয় (১২)

ব্যায়াম বিধি।

বলবান্ ও স্নিগ্ধ দ্রব্যভোজী ব্যক্তির প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ব্যায়াম (শরীরের শৌর্য্য ও বল বর্দ্ধনার্থ আয়াস জনক কর্ম্ম অর্থাৎ কুস্তি) অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। ইহাতে শরীরের উপচয়, পুষ্টি, কান্তি, নীরোগিতা, দৃঢ়মাংসতা, সৌন্দর্য্য, অনালস্য, স্থিরতা, লঘুতা, নির্ম্মলতা, ও অগ্নিদীপ্তি প্রভৃতি সংসাধিত হয়। এবং শরীর পরিশ্রম, পিপাসা ও শীতোষ্ণাদি ক্লেশসহিষ্ণু হয়। নিত্য ব্যায়ামশীল ব্যক্তির অতিস্থূলতা ও শত্রু কর্ত্তৃক আক্রমণের আশঙ্কা বিদূরিত হয়, এবং বিরুদ্ধ, গুরুপাক ও অহিত ভোজন করিলেও তাহা অনায়াসে জীর্ণ হইয়া যায়।

ব্যায়াম কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে যখন হৃদয়স্থ বায়ু মুখ দ্বারা ঘন ঘন নির্গত অথবা ললাট, নাসিকা, কক্ষা ও অঙ্গসন্ধি স্থানে ঘর্ম্ম নির্গম হয়, তখনই ব্যায়াম হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত।

কারণ ইহার অতিরিক্ত ব্যায়াম করিলে ক্ষয়, তৃষ্ণা, অরুচি, বমি, ভ্রম, ক্লম, কাস, শ্বাস ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ জন্মে।

শীত ও বসন্তকালে উক্তরূপ সম্পূর্ণ ব্যায়াম করিবে, তদ্ভিন্ন ঋতুকালে তদাপেক্ষায় অল্প ব্যায়াম করিবে। অন্যথা শরীর নিতান্ত অসুস্থ হইয়া পড়ে।

কাস, শ্বাস, রক্তপিত্ত, শোষ, ক্ষত, ও ভ্রান্তিরোগযুক্ত, এবং কৃশ, দুর্ব্বল ও ভুক্ত ব্যক্তির ব্যায়াম কার্য্য নিষিদ্ধ।

---

(১১) ভুক্তবান্ শিরসাস্নাতঃ শ্রান্তচ্ছর্দনবাহনৈঃ। রাত্রৌজাগরিতশ্চাপি নাঞ্জ্যাজ্জ্বরিত এবচ। (সুশ্রুতঃ)

(১২) কটুতৈলাদি নস্যার্থে নিত্যাভ্যাসেন যোজয়েৎ। প্রাতঃশ্লেষ্মাণমধ্যাহ্নে পিত্তেসায়ং সমীরণে। সুগন্ধবদনাঃস্নিগ্ধ নিস্বনাবিমলেন্দ্রিয়াঃ। নির্বলি পলিতব্যঙ্গা ভবেয়ুর্নস্যশীলিনঃ। (ভাবপ্রকাশ)

ব্যায়ামান্তে হস্তদ্বারা শরীর ঈষৎ মর্দ্দন পূর্ব্বক ঘর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া শ্রান্তি দূর হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিবে॥ (১৩)

তৈল মর্দ্দন বিধি।

প্রতিদিন নিয়মিতরূপে সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিবে। ইহাতে অকালজাত বলি, পলিত, বাতরোগ ও শ্রান্তি দূর করে। এবং নেত্রের সুদীপ্তি, পুষ্টি, আয়ুঃ, সুনিদ্রা, ত্বকের সৌকুমার্য্য ও দৃঢ়তা সম্পাদন করে।

---

(১৩) শরীরচেষ্টা যাচেষ্টা স্থৈর্য্যার্থা বলবর্দ্ধিনী।

দেহব্যায়মে সংখ্যাতা মাত্রয়া তং সমাচরেৎ। চরকঃ)

শরীরায়াসজননং কর্ম্ম ব্যায়াম উচ্যতে। তৎকৃত্বানুসুখং দেহং বিমৃদ্নীয়াৎ সমন্ততঃ। শরীরোপচয়ঃ কান্তি গাত্রাণাং সুবিভক্ততা। দীপ্তাগ্নিত্ত্বমনালস্যং স্থিরত্বং লাঘবং মৃজা। শ্রমক্লমপিপাসোষ্ণশীতাদীনাং সহিষ্ণুতা। আরোগ্যং চাপিপরমং ব্যায়ামাদুপজায়তে। নচাস্তি সদৃশং তেন কিঞ্চিৎ স্থৌল্যাপকর্ষণং। নচ ব্যায়ামিনং মর্ত্ত্যমর্দ্দয়ন্ত্যরয়োভয়াৎ। নচৈনং সহসাক্রম্য জরা সমধিগচ্ছতি। স্থিরী ভবতি মাংসঞ্চ ব্যায়ামাভিরতস্যচ। ব্যায়ামক্ষুন্নগাত্রস্য পদ্ভ্যামুদ্বর্ত্তিতস্যচ। ব্যাধয়ো নোপসর্পন্তি সিংহং ক্ষুদ্র মৃগাইব। বয়োরূপগুণৈর্হীনমপিকুর্য্যাৎ সুদর্শনং। ব্যায়ামং কুর্ব্বতোনিত্যং বিরুদ্ধমপি ভোজনং। বিদগ্ধমবিদগ্ধং বা নির্দ্দোষং পরিপচ্যতে। ব্যায়ামোহিসদাপথ্যো বলিনাং স্নিগ্ধভোজিনাং। সচশীতেবসন্তেচতেষাং পথ্যতমঃ স্মৃতঃ। সর্ব্বেষ্বৃতুষহরহঃ পুংভিরাত্মহিতৈষিভিঃ। বলস্যার্দ্ধেন কর্ত্তব্যো ব্যায়ামোহন্ত্যতোহন্যথা। হৃদিস্থানস্থিতোবায়ুর্যদাবক্ত্রং প্রপদ্যতে। ব্যায়ামং কুর্ব্বতোজন্তোস্তৎবলার্দ্ধস্যলক্ষণং। বয়োবলশরীরাণিদেশকালাশনানিচ। সমীক্ষ্যকুর্য্যাৎ ব্যায়ামমন্যথারোগমাপ্নুয়াৎ। ক্ষয়তৃষ্ণারুচিচ্ছর্দ্দিরক্তপিত্ত-ভ্রমক্লমাঃ। কাসশোষজ্বরশ্বাসা অতিব্যায়ামসম্ভবাঃ। রক্তপিত্তীকৃশঃশোষী-শ্বাসকাসক্ষতাতুরঃ। ভুক্তবান্ স্ত্রীষুচক্ষীণোভ্রমার্ত্তশ্চবিবর্জ্জয়েৎ। (সুশ্রুতঃ)

শীতকালেবসন্তে চ মন্দমেবততোহন্যদা। (বাভটঃ)

ললাটদেশে নাসায়াং গাত্রসন্ধিষুকক্ষয়োঃ। স্বেদঃ সংজায়তেতেন বলার্দ্ধং তং বিনির্দ্দিশেৎ। (ভাবপ্রকাশঃ)

মস্তক, কর্ণ ও পাদদেশে বিশিষ্টরূপে তৈলাভ্যঙ্গ করিবে। মস্তকে অধিক তৈলাভ্যঙ্গ করিলে কেশের সৌন্দর্য্য ও দৃঢ়তা জন্মে। এবং ঊর্দ্ধস্থিত ইন্দ্রিয় সমুহের শক্তি বৃদ্ধি পায়। তৈল দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে হনু, মন্যা, মস্তক ও কর্ণগত শূল বিনষ্ট হয়। পাদযুগলে অধিক তৈলাভ্যঙ্গ করিলে উহার দৃঢ়তা, সুনিদ্রা ও দর্শনশক্তির আধিক্য জন্মে। এবং পাদগত রোগসমূহ বিনষ্ট হয়। (১৪)

নবজ্বর ও অজীর্ণ রোগী এবং বমন, বিরেচন বা নিরূহণ (পিচ্‌কারি দ্বারা জোলাপ) ক্রিয়াকারী ব্যক্তির তৈলাভ্যঙ্গ নিষিদ্ধ। কারণ নবজ্বর ও অজীর্ণ অবস্থায় তৈলাভ্যঙ্গ করিলে উক্ত রোগ কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া পড়ে। বমিত, বিরিক্ত ও নিরূহিত ব্যক্তি তৈলাভ্যঙ্গ করিলে অগ্নিমান্দ্য হয়। (১৫)

স্নান বিধি।

পরিজ্ঞাত জলাশয়ে অবগাহন পূর্ব্বক প্রথমতঃ গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা সমস্ত শরীর উত্তমরূপে পরিমার্জ্জন করিবে। ইহাতে বায়ু, কফ ও মেদঃদোষ নিবৃত্তি করে, অঙ্গের দৃঢ়তা, নেত্রের নির্ম্মলতা, লোমকূপগত শিরাসমূহের মুখ পরিস্কৃতি ও চর্ম্মস্থ অগ্নির প্রদীপ্ততা সম্পাদন করে। (১৬)

(১৪) অভ্যঙ্গমাচরেন্নিত্যং স জরাশ্রমবাতহা। দৃষ্টিপ্রসাদপুষ্ট্যায়ুঃ স্বপ্ন-সুত্বকত্বদার্ট্যকৃৎ। শিরঃশ্রবণপাদেষু তংবিশেষেণ শীলয়েৎ। সুকেশ্যঃ শীর্ষস্বস্তমূর্দ্ধি কপালেন্দ্রিয়তর্পণঃ। হনুমন্যাশিরঃকর্ণশূলঘ্নং কর্ণপূরণং। পাদাভ্যঙ্গোহপিতৎস্থৈর্য্যনিদ্রাদৃষ্টিপ্রসাদকৃৎ। পাদসুপ্তিশ্রমস্তম্ভ সঙ্কোচ স্ফুটন-প্রণুৎ॥ (বাভটঃ)

(১৫) তরুণজ্বর্য্যজীর্ণীচ নাভ্যক্তব্যৌ কথঞ্চন। তথাবিরিক্তো বান্তশ্চ নিরূঢ়োযশ্চমানবঃ। পূর্ব্বয়োঃ কৃচ্ছ্রতা ব্যাধেরসাধ্যত্ব মথাপিবা। শেষাণাং তদহঃপ্রোক্তা অগ্নিমান্দ্যাদয়ো গদাঃ। (সুশ্রুতঃ)

(১৬) উদ্বর্ত্তনং বাতহরং কফমেদোবিলাপনং। স্থিরীকরণমঙ্গানাং ত্বক্‌ প্রসাদকরং পরং। শিরামুখবিবিক্তত্বং ত্বকৃস্থ স্যাগ্নেশ্চতেজনং। (সুশ্রুতঃ)

অনন্তর যথাভ্যস্ত মস্তক নিমজ্জন পূর্ব্বক স্নান করিবে। প্রতিদিন নিয়মিত রূপে স্নান করিলে অগ্নি, শুক্র, ওজঃ, আয়ুঃ, ও বল বৃদ্ধি হয়, এবং শরীরের কণ্ডূ (চুলকানী) মল, ঘর্ম্ম, শ্রান্তি, তন্দ্রা, তৃষ্ণা, দাহ ও পাপ বিদুরিত হয়। (১৭)

উষ্ণ জল দ্বারা অধঃকায়ে (গলদেশ হইতে অধোভাগে) পরিষেক করিলে শরীরের বল বৃদ্ধি হয়। কিন্তু মস্তকে উষ্ণজল ব্যবহার করিলে কেশ ও চক্ষুর বলহানি হয়। (১৮)

অর্দ্দিত, নেত্ররোগ, মুখরোগ, কর্ণশূল, অতীসার, আধ্মান (পেট্‌ফাপা), পীনস (সর্দ্দি), অজীর্ণরোগযুক্ত ও ভুক্তব্যক্তির পক্ষে স্নান নিষিদ্ধ। (১৯)

স্নানান্তে জল হইতে উত্থিত হইয়া শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা শরীর পরিমার্জ্জন করিবে, তদনন্তর আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্তম পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করিবে। নির্ম্মল বস্ত্র পরিধান করিলে শরীরের শোভা, স্বাস্থ্য ও আনন্দ জন্মে। কদাচও অপরিষ্কৃত মলিন বস্ত্র পরিধান করিবে না। কারণ তাহাতে কণ্ডূ, ক্রিমি (উকুন), গ্লানি ও অশোভা বৃদ্ধিপায়। (২০)

স্নানকালে ওষ্ঠ ও পদযুগল দুইবার পরিমার্জ্জন করিয়া প্রথমতঃ মস্তক, চক্ষুঃ ও নাসিকাতে কিঞ্চিৎ জল ছিটাইয়া দিয়া পশ্চাৎ জলে অবতরণ করিবে। (২১)

---

(১৭) দীপনং বৃষ্যমায়ুষ্যং স্নানমোজোবলপ্রদং। কণ্ডূমলশ্রমস্বেদতন্দ্রা-তৃট্‌দাহ পাপ্মনুৎ। (বাভটঃ)

(১৮) উষ্ণাম্বুনাধঃকায়স্য পরিষেকোবলাবহঃ। তেনৈবতূত্তমাঙ্গস্য বলহৃৎ কেশচক্ষুষোঃ। (বাভটঃ)

(১৯) স্নানমর্দ্দিতনেত্রাস্যকর্ণরোগাতীসারিষু। আধ্মানপীনসাজীর্ণ—ভুক্তবৎসুচ গর্হিতং। (বাভটঃ)

(২০) স্নানস্যানন্তরং সম্যগ্বস্ত্রেণাঙ্গস্যমার্জ্জনং। কান্তিপ্রদং শরীরস্য কণ্ডূত্বক্‌ দোষনাশনং। যশস্যং কাম্যমায়ুষ্যং শ্রীমদানন্দবর্দ্ধনং। ত্বচ্যং বশীকরং রুচ্যং নবনির্ম্মলমম্বরং। কদাপিন জনৈঃসদ্ভির্ধার্য্যং মলিনমম্বরং। তত্তু কণ্ডূক্রিমিকরং গ্লাস্ত্যলক্ষ্মী করং পরং। (ভাবপ্রকাশঃ)

(২১) দ্বিঃ পরিমৃজ্যোষ্ঠৌপাদৌচাভ্যুক্ষ্য মূর্দ্ধনি খানিচোপস্পৃশেৎ। (চরকঃ)

অপরিজ্ঞাত, গভীর ও হিংস্রপ্রাণিযুক্ত জলাশয়ে স্নান করিবে না। (২২)

পরিশ্রান্ত হইয়া, কিম্বা মুখ, নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতি হস্তদ্বারা আচ্ছাদন না করিয়া এবং উলঙ্গ অবস্থায় অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করিবে না। (২৩)

অস্নাত অবস্থায় শরীরোষ্মা বাহ্যতঃ সমস্ত শরীরে বিস্তৃত থাকে। স্নান করিবামাত্র বাহ্যশৈত্যাভিঘাতে ঐ শরীরোষ্মা অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া জঠরাগ্নিকে অধিকতর প্রদীপ্ত করে। সুতরাং এই সময় আহার করিলে তাহা উত্তমরূপে জীর্ণ হয়। (২৪).

(ক্রমশঃ)

বিক্রমপুর ঢাকা } কবিরাজ শ্রীহরিমোহন দাস গুপ্ত।

ড্রপ্‌সি বা শোথ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বে পুরাতন শোথের বিষয় বলিয়াছি। অদ্য তরুণ শোথের বিষয় বলিব। পূর্ব্ববারে ছাপার দোষে একটী বড় ভুল হইয়া গিয়াছে। এরিওলার টিস্থ আমাদের চর্ম্মের নীচে আছে। ছাপিবার দোষে "চর্ম্মের নীচে" না হইয়া "চক্ষের নীচে" হইয়াছে। পাঠকগণ জানিবেন এরিওলার টিস্থ আমাদের চর্ম্মের নিম্নে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি শোষণ ক্রিয়া কম পড়াতে যে ড্রপ্‌সি বা শোথ জন্মে, তাহাকে পুরাতন শোথ বা প্যাসিব্ ড্রপ্‌সি কহে। আবার এখন বলিতেছি ভেইন সকল অতিরিক্ত পূর্ণ হইলেই প্যাসিভ্ ড্রপ্‌সি হয়। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই প্রতীত হইবে, যে ভেইন সকল অতিরিক্ত পূর্ণ হইলে যেমন তাহাদের গা দিয়া রস

---

(২২) তথানাজ্ঞাত গাম্ভীর্য্যং নহিংস্রপ্রাণিসেবিতং। (ভাবপ্রকাশঃ)

(২৩) নাবিগতক্লমো নানাপ্লুতবদনো নানগ্ন উপস্পৃশেৎ। (চরকঃ)

(২৪) বাহ্যৈশ্চসেকৈঃ শীতাদ্যৈরুষ্মান্তর্যাতি পীড়িতঃ। নরস্য স্নাতমাত্রস্য দীপ্যতে তেন পাবকঃ॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

নিঃস্রবণ হয়, সেইরূপ তাহাদের শোষণ ক্রিয়ায় কম পড়ে। একটী নদীর জল যখন শুখাইতে আরম্ভ করে, তখন ঐ নদীর টানে নিকটবর্ত্তী জলাশয় ও কূপের জল পর্য্যন্ত শুখাইয়া যায়। কিন্তু নদী যখন অত্যন্ত জলপূর্ণ হয়, তখন উহার নিকটবর্ত্তী স্থানের জল আর শোষণ করিতে পারে না। বরঞ্চ নিকট-বর্ত্তী স্থান সকল জলপ্লাবিত হয়। শরীরের মধ্যে প্যাসিভ্‌ড্রপ্‌সি উৎপন্ন হইবার সময় ভেইন সকলে এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হয়। মোটের উপর এই দাঁড়াইল যে যদি ভেইনের রস নিঃস্রবণ বেশী হয়, সুতরাং শোষণ ক্রিয়া কম পড়ে, তবেই প্যাসিভ্ ড্রপ্‌সি উৎপন্ন হয় এবং ভেইন সকলে রক্ত আবদ্ধ হইলেই শোষণ ক্রিয়া কম পড়ে ও ভেইনের গা দিয়া রস নিঃসরণ হয়।

তার পর একূটিভ্ বা তরুণ শোথ কাহাকে বলে দেখ।

আমার বাটীর চাকর তত্ত্ব লইয়া দূরদেশস্থ কুটুম্ববাড়ী যাইতেছে, পথশ্রমে ও রৌদ্রে তাহার শরীরে আপাদ মস্তক হইতে ঘাম ছুটিতেছে। সেই সময় হঠাৎ মেঘ উপস্থিত হইয়া বৃষ্টি হইল। সে পথিমধ্যে বৃষ্টিতে ভিজিল। হঠাৎ গরমের পর ঠাণ্ডা হইল—তাহার ঘর্ম্ম রোধ হইল। রাত্রে শরীর কিছু অসুস্থ হইল—তার পরদিন দেখা গেল তাহার সব শরীর ফুলিয়া উঠিয়াছে। খুসিসেখ বৈশাখের খরতর রৌদ্রে মাঠে জমি কোপাইতেছে। রৌদ্রের জ্বালায় ও পিপাসায় সে বিশ্রাম না করিয়া নিকটস্থ নদীতে গিয়া ডুব দিল। একদিন দুদিন যেতে না যেতেই সে ফুলিয়া উঠিল। উপরোক্ত দুই স্থলেই হঠাৎ ঘর্ম্মরোধ হওয়াতে শোথ হইল তাহার আর সন্দেহ নাই। আবার তোমার ছেলের হাম হইয়াছিল, এখনও ভাল করিয়া সারে নাই। তুমি তাহাকে ভাল করিয়া গৃহবদ্ধ করিয়া রাখ নাই। সে ইচ্ছামতে বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাসে বেড়াইতে লাগিল। হঠাৎ একদিন দেখিলে তোমার ছেলের চোখ মুখ কিছু ফুলাফুলা বোধ হইতেছে, একদিন দুইদিন যাইতে না যাইতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া উঠিল। তাহার প্রস্রাব পরিমাণে অল্প ও কটু হইল। মূত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিলে যেন রক্তের মত প্রস্রাব করিতেছে।

এই সকল বিসদৃশ ঘটনার কারণ কি? এই লোকটা খাচ্ছে, দাচ্ছে, বেড়াচ্ছে—কোনও অসুখ নাই। হঠাৎ তাহাকে এমন ভয়ানক রোগ আসিয়া ধরিল কেন? ইহার যথাবিধি উত্তর নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমাদের শরীরের ভিতর যে সকল গহ্বর আছে, তাহার গা দিয়া অনবরতঃ রস নিঃসরণ হইতেছে। আবার আমাদের চর্ম্মের নিম্নে যেসকল এরিওলার টিসু আছে, তাহারও ছিদ্রের মধ্যে মধ্যে রস নিঃসৃত হইতেছে। এসকল গেল আভ্যন্তরিক নিঃস্রবণ। তারপর আমাদের শরীরের বাহির দিয়াও অনবরত জলীয় পদার্থ নির্গত হইতেছে। আমাদিগের চর্ম্ম, ফুস্ফুষ, মূত্রযন্ত্র (কিড্‌নি) অন্ত্র নাসিকা প্রভৃতির দ্বারা নিরন্তর শরীরের জল বাহির হইয়া যাইতেছে। চর্ম্মের ছিদ্র দিয়া ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে। ঘর্ম্মের অধিকাংশই জল বই আর কিছুই নহে। মূত্র যন্ত্র মূত্ররূপে দৈহিক জল নির্গত করিয়া দিতেছে। আমরা যে শ্বাস পরিত্যাগ করিতেছি তাহাতেও জল আছে। তারপর অন্ত্র সকল বা পেটের নাড়িভুঁড়ি মলের সহিত কতকটা জল বাহির করিয়া দিতেছে। এই সকল জল নিঃসরণকারী যন্ত্র সকল শরীরের ড্রেণ স্বরূপ হইল। অতএব ড্রেণ আবদ্ধ হইলে শরীরের মধ্যে জল আটকাইয়া শোথ হইবে বৈ কি? শরীরের যন্ত্র সকলের মধ্যে ভাই ভাই সম্বন্ধ। একজন কার্য্যে অক্ষম হইলে অপরে তাহার হইয়া কায করে। কোন এক যন্ত্রের ক্রিয়া কম পড়িলে অন্য যন্ত্রের ক্রিয়া সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি অন্ধ তাহার স্পর্শশক্তি অত্যন্ত বেশী। পক্ষান্তরে কোন যন্ত্রবিশেষের ক্রিয়া বৃদ্ধি হইলে অন্য যন্ত্রের ক্রিয়া কম পড়ে। শুধু যন্ত্র বলিয়া নয়, শরীরের সমস্ত কার্য্যসম্বন্ধে এইরূপ বন্দোবস্ত। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম করে, তাহার মানসিক শক্তি কিয়ৎ পরিমাণে কম হইয়া যায়। মোটের উপর ধরিতে গেলে শরীরের ক্রিয়াশক্তি সচরাচর একভাবেই থাকে। তাহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই। কেবল সময় সময় যন্ত্র বিশেষের শক্তি অপর যন্ত্রে প্রবর্ত্তিত হয় মাত্র।

যদি কোনও কারণ বশতঃ আমাদিগের চর্ম্মের ক্রিয়া কম পড়ে, অর্থাৎ কম ঘর্ম্ম নির্গত হয়, তবে আমাদিগের মূত্র যন্ত্রের ক্রিয়া সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া প্রস্রাবের পরিমাণ বেশী হয়। পক্ষান্তরে অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইলে প্রস্রাবের পরিমাণ কম হইয়া যায়। বর্ষা ও শীতকালের রাত্রে ঘর্ম্ম কম হয় এবং প্রস্রাব বেশী হয়। গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় অতিরিক্ত ঘর্ম্ম নির্গত হয়, সুতরাং প্রস্রাব পরিমাণে অল্প ও কটু হয়। যদি ভাল হইয়া

দাস্তপরিস্কার না হয়, তবে প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। বহুমূত্র পীড়াগ্রস্ত রোগীর চর্ম্ম অত্যন্ত শুষ্ক ও কর্কশ হয়—কারণ তাহার ঘাম হয় না। এখন মনেকর যদি কোন জল নিঃসরণকারী যন্ত্রের ক্রিয়া কমপড়ে অথচ অন্য জল নিঃসরণ কারীযন্ত্রের ক্রিয়া সেই পরিমাণে বৃদ্ধি না হয়, তবে প্রয়োজনাতিরিক্ত জল শরীরের ভিতর থাকিয়া শরীরের কোনও না কোনও অংশে শোথ উৎপন্ন করিবেই করিবে।

কখন কখন এমন দেখা যায় এক স্থানের শোথ ভাল হইয়া আর এক স্থানে শোথ হয়। এমন দেখা গিয়াছে যে, রোগীর হাত পায়ের শোথ হঠাৎ ভাল হইয়া গেল; তাহার বন্ধুগণ মনে করিল, সে ক্রমে ক্রমে আরাম হইবে—আর কোন ভয় নাই—কিন্তু তার পর দিন দেখা গেল সে হঠাৎ অজ্ঞান অচৈতন্য হইয়া মারা গেল। ইহার কারণ এই যে, ঐ ব্যক্তির হাত পায়ের জল মস্তকের গহ্বরে (ভেঁণ্টি্রকেল্ অব্দিব্রেন) উঠিয়া তাহার প্রাণ নাশ করিল।

কখন কখন অন্য দ্বার দিয়া শোথের জল নির্গত হইয়া রোগী শোথ রোগ হইতে মুক্তি লাভ করে। যথাঃ—শোথরোগীর উদরাময় হইয়া হঠাৎ শোথ ভাল হইয়া যায়। একজন হাইড্রোসিল গ্রস্ত রোগী (জলকোরণ্ডগ্রস্ত রোগী) কলেরার দ্বারা আক্রান্ত হওয়াতে তাহার হাইড্রোসিল ভাল হইয়া গিয়াছিল। পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন হাইড্রোসিল (জল কোরণ্ড) একরূপ স্থানীয় শোথ (মুষ্কের শোথ)। ঘাম ও প্রস্রাব কম পড়িয়া শোথ রোগ উৎপন্ন হয়। কিন্তু যদি সেই সময় রোগীর সর্দ্দি হয় কি উদরাময় হয়, তাহা হইলে শোথ জন্মাইতে পারে না। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, ঘর্ম্মরোধ হইলে হয় সর্দ্দি লাগিবে, নচেৎ উদরাময় বা শোথ উৎপন্ন হইবে।

যদি কোনও জন্তুর (যেমন কুকুর) সিরা চিরিয়া তাহার ভিতর কিয়ৎপরিমাণে জল পীচকারী করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ জন্তুর দেহের অভ্যন্তরে কোনও না কোন অংশে শোথ উৎপন্ন হইয়া মারা পড়ে। কিন্তু এই পরীক্ষার পূর্ব্বে যদি ঐ জন্তুর শরীর হইতে কিয়ৎপরিমাণে রক্ত বাহির করিয়া লওয়া যায় এবং তৎপরে সেই রক্তের ঠিক সমান পরিমাণ জল উক্ত জন্তুর শিরামধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার শোথ উপস্থিত হয় না।

উপরোক্ত পরীক্ষার দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, আমাদিগের রক্তবাহিনী নাড়ী সকলের জলীয় পদার্থ চুষিয়া লইবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু শরীরে যে পরিমাণে জল থাকা দরকার, তাহার অতিরিক্ত জল নাড়ী সকলে অবস্থিতি করিতে পারে না। রক্তবাহিনী নাড়ীতে জলীয় ভাগ বেশী হইলেই যে কোন প্রকারে হউক ঐ জল শরীর হইতে বাহির হইয়া যাইবে। অথবা তদভাবে শরীরের কোন না কোন স্থানে ঐ জল সঞ্চিত হইয়া শোথ রোগের উৎপত্তি হইবে। ঘর্ম্ম রোধ হইয়া যে শোথ হয়, তাহারও কারণ এই। তবে এইরূপ শোথ সচারাচর শরীরের সর্ব্বস্থলব্যাপী হইয়াও সময় সময় কোন একস্থানবিশেষে হয় কেন, তাহা ঠিক করা অত্যন্ত কঠিন। রক্ত-বাহিনী নাড়ী সকলের সাধারণ ধর্ম্ম এই যে, তাহারা খালি থাকিলেই শরীরস্থ জলীয় পদার্থ চুষিয়া লয়। এবং অতিরিক্ত পূর্ণ হইলেই ঐ জল উদগীরণ করিয়া সাম্যভাব অবলম্বন করে। শরীরের রক্তবাহিনী নাড়ী সকলে জলীয় ভাগ কম হইলেই আমাদিগের পিপাসা উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে জল পান করিতে প্রবৃত্ত করে। যদি আমরা পিপাসার অতিরিক্ত জলপানকরিয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত জল শরীরের ভিতর গ্রহণ করি, তাহা হইলে ঘাম প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত জল শীঘ্রই শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়।

মূত্রযন্ত্রের (কিড্‌নির) ক্রিয়ারোধ হইয়া যে শোথ হয়, তাহাকে রিনাল ড্রপ্‌সি কহে। ব্রাইট্‌স্ ডিজিজ্ বা কিড্‌নির তরুণ প্রদাহ হইয়া এইরূপ শোথ উৎপন্ন হয়। ইহা তরুণ শোথ। এইরূপ শোথরোগীর মূত্র পরিমাণে অল্প ও কটু হয় এবং মূত্র পরীক্ষা করিলে তাহাতে রক্ত এবং এল্‌বুমেন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সচারাচর হামের পর ঠাণ্ডা লাগিয়া যে শোথ হয় তাহা এই জাতীয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপুলিনচন্দ্র সাম্যাল এম্, বি।

আয়ুর্ব্বেদে শোথরোগ।

(কবিরাজী)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

অরুচি, শ্বাস, স্বরভেদ ও ছর্দ্দি প্রভৃতি রোগের উপসর্গরূপে প্রায়ই শোথ জন্মিতে দেখা যায় না। তবে ক্বচিৎ এমন দেখা যায় যে, অধিক ছর্দ্দি অর্থাৎ বমি করিতে করিতে রোগীর চক্ষু মুখ ফুলিয়া পড়ে, কিন্তু এই শোথ ক্ষণস্থায়ী অর্থাৎ বমনের বেগ শান্ত হইলে অত্যল্পকাল পরেই সেই শোথের আপনা হইতে শান্তি হয়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে শ্বাসরোগীর সম্বন্ধে এমন অনেক দেখা গিয়াছে যে, রোগী দুর্ব্বল ও কৃশ হইলে সেই অবস্থায় উপসর্গরূপে শোথ উৎপন্ন হইয়া রোগীর জীবন ধ্বংস করিয়াছে। তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা উন্মাদাদি রোগে প্রায়ই শোথ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তৃষ্ণারোগীর মধ্যে যাহারা সর্ব্বদা অধিক পরিমাণে জলপান করে, তাহাদের অবশ্য অধিক জলপানজন্য শোথ জন্মিতে পারে। প্রায় ৩।৪ বৎসর হইল, একবার আমি একটী ১২।১৩ বৎসর বয়স্ক বালকের তৃষ্ণারোগজন্য ভয়ানকরূপে শোথ জন্মিতে দেখিয়াছিলাম। বালকটীর ৫।৬ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় এইরোগের সৃষ্টি হয়। বলিতে কি, পীড়ার আরম্ভ হইতে প্রায় ৫।৬ বৎসর কালপর্য্যন্ত বালকটীর শোথ এত অধিক প্রবল ছিল যে, তাহাকে দেখিলে সহসা চল্লিশ বৎসর বয়স্ক একজন খর্ব্বকায় প্রভূত বলশালী যুবক বলিয়া ভ্রম হইত। বস্তুতঃ কিন্তু তাহার শরীরে কিছুমাত্রই বল ছিল না।

বাতব্যাধি অর্থাৎ বাতরোগে যে শরীরের নানাস্থানে নানারকমের শোথ জন্মে, ইহা বোধ হয় আর বলিতে হইবে না। তন্মধ্যে, অধিকাংশ সময়ে হাঁটুতে, কণুইতে, পায়ের গোঁড়ালীতে এবং অঙ্গুলীসন্ধি প্রভৃতি শরীরের সন্ধিস্থানেই সম্ভবতঃ বেদনার সহিত অল্প বা অধিক পরিমাণে শোথ জন্মিতে দেখা যায়, কিন্তু এই শোথের প্রাদুর্ভাব সচরাচর অধিক দেখা যায়না। তাহা ছাড়া বাতরোগের অন্যান্য অবস্থাতে আধ্মানাদি নামক শোথ জন্মিতে দেখা যায়। উরুস্তম্ভ রোগে উরুতে শোথ জন্মিয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ-প্রণালী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মনঃশিলা বা মনছাল ;—প্রস্তরাদিবর্জ্জিত সুলোহিত মনছালগ্রহণ করতঃ শোধন করিয়া লইবে। মনছালকে তণ্ডুল কণা সদৃশ কণকাঃ করিয়া লইবে। তারপর বকফুলের পাতার রসে মগ্ন করিয়া রাখিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। এইরূপ সাতবার করতঃ শেষে বেশ করিয়া জলে ধুইয়া লইবে। তদনন্তর শুকাইয়া চূর্ণ করতঃ ঔষধার্থে ব্যবহার করিবে।

এক্ষণে ভূধর যন্ত্রে যেরূপে মৃতোত্থাপন রস পাক করিতে হয়, তাহার কথা বলিব।

ঔষধ বজ্রমূষার মধ্যে রাখিয়া ভূধর যন্ত্রে পাক করিতে হয়, সুতরাং অগ্রে বজ্রমূষার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

তুঁষ পোড়াইয়া কৃষ্ণবর্ণ ছাই করিয়া লইবে। এইরূপ ভস্মীভূত তুষ দুইভাগ, বল্মীক মৃত্তিকা বা ঝিল প্রভৃতি বর্জ্জিত ভাল আটাল মাটি ১ এক ভাগ, লোহার ঝামা নিকেষ গুড়া করিয়া লইয়া তাহার ১ একভাগ এবং সাদা পাথর ঐরূপ চূর্ণ করতঃ তাহার একভাগ এই সকল দ্রব্যের সহিত চুল কুটি কুটী করিয়া কিছু মিশাইয়া লইবে। তারপর ছাগলের দুগ্ধ দিয়া দুই প্রহর দৃঢ়রূপে ছানিবে। এই প্রকারে প্রস্তুত কল্কের দ্বারা দুইটী মূষাপ্রস্তুত করিবে; মূষের প্রমাণ আবশ্যক মত করিতে হইবে। দুইটীর মুখ একত্র করিলে বেশ মিলিয়া যায় এবং গোস্তনের ন্যায় দেখায় এরূপ ভাবে তৈয়ার করিবে। যে কল্কের দ্বারা মূষাপ্রস্তুত করা যাইবে, তাহার কিছু ছায়ায় রাখিয়া দিবে। প্রস্তুত মূষা রৌদ্রে শুকাইয়া তাহার মধ্যে ঔষধ পুরিয়া দৃঢ়রূপে এলো সূতা বা পাট দিয়া বাঁধিবে। যে কল্কটুকু রাখিয়া দিয়াছ তাহা দিয়া সন্ধিস্থান বেশ করিয়া লেপিয়া দিবে। তারপর আবার রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এইরূপে মূষাবদ্ধ হইলে কাঁদা দিয়া মূষাটী লেপিয়া আবার শুষ্ক করিবে। বজ্রমূষা এবং তন্মধ্যে ঔষধ বদ্ধ করার নিয়ম বলা হইল। এক্ষণে ভূধর যন্ত্রে পাকের কথা বলিতেছি।

একটা হাঁড়ির অর্দ্ধাংশ শুষ্ক শ্লক্ষ্ণ বালি দিয়া পূরিয়া যন্ত্রটী তদুপরি রাখিবে। তারপর আবার বালি দিয়া হাঁড়িটী পূরিবে, যন্ত্রের প্রমাণ বুঝিয়া ছোট, বড় হাঁড়ি লইতে হয়। যন্ত্র ছোট হইলে হাঁড়ি ছোট হইলে চলে কিন্তু যন্ত্র বড় হইলে হাঁড়ি বড় হওয়া আবশ্যক। ফল কথা এই যে, যন্ত্রের চারিদিকে ৪।৬ অঙ্গুল বালি থাকা আবশ্যক। হাঁড়িটীর মুখ সরা দিয়া আচ্ছাদন করতঃ লেপিয়া দিবে। এখন ভূমিতলে একটী গর্ত্ত করিতে হইবে। হাঁড়ির আকার দেখিয়া গর্ত্তের প্রমাণ স্থির করিয়া লইতে হয়। গর্ত্তের অর্দ্ধেক ঘুটে দিয়া পূরিয়া তার উপর হাঁড়ি রাখিয়া ঘুঁটিয়া ঢালিয়া দিবে। হাঁড়ির নিম্নে, উর্দ্ধে, পার্শ্বে অর্থাৎ চারিদিকে যেন ১৬ অঙ্গুল প্রমাণ ঘুঁটিয়ার রাশি থাকে, এরূপ গর্ত্ত খনন করিতে হইবে। তারপর উপরে আগুণ দিয়া ৪ চারি প্রহরকাল পাক করিবে।

ক্রিয়া ও প্রয়োগ প্রণালী ;—মৃতোত্থাপন রস, সান্নিপাতিক বিকারে প্রয়োগ করা গিয়া থাকে। শোধিত হিং চূর্ণ ১ রতি, শুঁঠ, পেপুল ও মরিচ চূর্ণ প্রত্যেক ১ রতি, কর্পূর ১ রতি কিঞ্চিৎ আদার রস সহ মাড়িয়া কর্পূরের জলে গুলিয়া অনুপানার্থে ব্যবহার করিবে। যে স্থলে এরূপ অনুপান সহ্য না হয় তথায় বিবেচনা পূর্ব্বক অন্যবিধ অনুপান কল্পনা করা যাইতে পারে, কিন্তু উক্ত অনুপান সহ্য হইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। দিবসে ৩।৪ বার এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

মৃতোত্থাপন রস, সান্নিপাতিকবিকারের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার ব্যবহারে স্নায়ুমণ্ডলের বলবৃদ্ধি করিয়া প্রলাপ ও অচৈতন্যতা প্রভৃতি উপদ্রবের শান্তি হয়—পাকযন্ত্রের বলবৃদ্ধি করিয়া পরিপাক শক্তি বাড়াইয়া দেয়। রক্তের শোণিকার ভাগ বৃদ্ধি করে এবং ইহা খুব পচন নিবারক ও জ্বরঘ্ন; শ্বাস, কাশ এবং রক্ত নিষ্ঠীবন প্রভৃতি উপদ্রবেরও শান্তি করিতে দেখা যায়।

মৃতোত্থাপন রসে লৌহ, অভ্র প্রভৃতি ধাতু ও উপধাতু থাকে, পরিপাক করিতে পাকযন্ত্রের বল আবশ্যক। সুতরাং যেখানে পরিপাক শক্তি খুব কমিয়া গিয়াছে বুঝিবে, তথায় এই ঔষধ সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিবে।

ক্রমশঃ—

সাওনা (খুলনা) } শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
কবিরত্ন।

তৈল পাক ও প্রয়োগ প্রণালী।

বৈদ্যমতে।

সম্মিলনীর সুযোগ্য লেখক শ্রীযুক্ত শীতল বাবু কিছু দিন হইতে চিকিৎসা-সম্মিলনীতে "ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী" লিখিতে আরম্ভ করিয়া এপর্য্যন্ত যতটা লিখিয়াছেন, এবং ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন, তাহাতে ভরসা করা যাইতে পারে যে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ দ্বারা উত্তরোত্তর সকলে বিশেষ উপকৃত হইতে এবং শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন। বাস্তবিকও বৈদ্যশাস্ত্রমতে সুচারুরূপে ঔষধাদি প্রস্তুত ও প্রয়োগ করা বড় সহজ কথা নহে। অনেক স্থলে অনেকের দ্বারা তাহা সুন্দররূপে ঘটেনা বলিয়াই আজ বৈদ্যচিকিৎসার এত অধিক দুর্দ্দশা। নতুবা দেশের লোক যদি বৈদ্যশাস্ত্রে প্রকৃতজ্ঞান লাভ করিয়া ঔষধাদির অকৃত্রিমতা বজায় রাখিয়া চিকিৎসা কার্য্যে রত থাকিতেন, তাহা হইলে বৈদ্য চিকিৎসার আজ এত অগৌরব কেন, বরং এই শাস্ত্রের দিন দিন উন্নতিরই আশা করা যাইত।

ঔষধ প্রস্তুত সম্বন্ধে শীতলবাবু লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সুতরাং তিনিই সর্ব্বপ্রকার রোগের সমস্ত ঔষধের বিষয় লিখিয়া ক্রমে সাধারণকে সুখী করিবেন। তৈল বা ঘৃতাদি পাক স্বতন্ত্র কথা, বিশেষতঃ একজনের দ্বারা অধিক সময়-সাপেক্ষ বলিয়া আমরা এখন হইতে অল্পে অল্পে তৈল ও ঘৃতাদির পাক ও প্রয়োগ নিয়ম এবং গুণের বিষয় সাধারণকে জানাইতে ইচ্ছুক হইলাম। তন্মধ্যে অগ্রে তৈলের বিষয় বলিব।

ঔষধার্থে নানাবিধ তৈলের প্রয়োজন হইলেও সাধারণতঃ তিল তৈল, সার্ষপ তৈল এবং এরণ্ড তৈল এই ত্রিবিধ তৈলই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে আবার তিল তৈলেরই দরকার অধিক হয়। তৈল পাক করিবার পূর্ব্বে সকলেরই ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে, উক্ত তিন প্রকার তৈলের মধ্যে যে কোন তৈলই হউক, সর্ব্বাগ্রে তাহা সম্পূর্ণরূপে অকৃত্রিম অর্থাৎ খাঁটী হওয়া চাই। কেননা তৈল প্রস্তুতের অন্যান্য দ্রব্যাদির যতই সুবন্দবস্ত করা হউক না কেন, কিন্তু গোড়ায় দোষ জন্মিলে অর্থাৎ তৈলটী

খাঁটী না হইলে সমস্ত পরিশ্রমই বৃথা হইয়া থাকে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে তৈলের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখা বিশেষ আবশ্যক। তিল ও সর্ষপ প্রভৃতি দ্রব্য সেকালে যেমন সুলভ ছিল বলিয়া অনায়াসে ইহাদের অকৃত্রিমতা বজায় রাখা যাইত, এখন কিন্তু আর সে দিন নাই। অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে, কৃষ্ণ তিল ও সর্ষপ প্রায়ই একবারে খাঁটী পাওয়া ভার। দেশী সর্ষপের সহিত শ্বেত সর্ষপ, কৃষ্ণতিলের সহিত শ্বেততিল প্রায়ই প্রভূত পরিমাণে মিশ্রিত দেখা গিয়া থাকে। এই মিশ্রিত তিল বা সর্ষপ দ্বারা প্রস্তুত তৈল দ্বারা তৈল পাক করিলে যে সেই তৈলের প্রকৃত গুণ পাওয়া যায় না, ইহা বলা বাহুল্য। ফল কথা তিল বা সর্ষপের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কেবল কলুর প্রতি নির্ভর ও তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া ঔষধার্থে তৈল গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব যদি যথার্থ খাঁটী কৃষ্ণতিলের বা খাটী সার্ষপেরতৈলের দ্বারা তৈল পাক করিতে ইচ্ছা কর,তবে অগ্রে নিজেই খাটী কৃষ্ণতিল বা সর্ষপের সংগ্রহ করিয়া নিজের বিশ্বাসী লোক দ্বারা কলুর বাটীতে সেই লোককে বসাইয়া রাখিয়া তাহা দ্বারা তৈল প্রস্তুত করাইয়া লও। এরণ্ড তৈলের প্রয়োজন হইলেও অগ্রে এরণ্ডের দানা যোগাড় করিয়া পরে তাহা ভাঙ্গাইয়া তৈল প্রস্তুত করা আবশ্যক। ক্রমশঃ—

কলিকাতা। ভাদ্র

কবিরাজ।
শ্রীজগদ্বন্ধু সেন গুপ্ত।

জ্বর-চিকিৎসা। *

(এলোপ্যাথি মতে)

ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার বা সবিরাম জ্বর।

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে,ইণ্টারমিটেণ্টফীবার বা সবিরাম জ্বরে সাধারণতঃ তিনটী অবস্থা উপস্থিত হয়। যথা—কম্পাবস্থা, উত্তাপাবস্থা ও বিরামাবস্থা। তন্মধ্যে কম্পাবস্থার বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এখন উত্তাপাবস্থার বিষয় বলা যাইতেছে।

---

* এই প্রবন্ধ কোন গ্রন্থবিশেষ হইতে অনুবাদিত নহে। ডাক্তার জগদ্বন্ধু বাবু বহুকাল হইতে সহস্র সহস্র রোগীর চিকিৎসা করিয়া চিকিৎসা

এই জ্বরে কম্পাবস্থার শেষ হইতে ঘর্ম্মাবস্থা আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত উত্তাপাবস্থা বর্ত্তমান থাকে। এই উত্তাপাবস্থার প্রথমে শিরঃপীড়া, পিপাসা ও গাত্রদাহ প্রকাশ পায়। শিরঃপীড়া সকল সময় থাকে না। কিন্তু অপর দুইটী চিহ্ন অর্থাৎ পিপাসা ও গাত্রদাহ সকল সময় বর্ত্তমান থাকে। তবে উহারা কখন বেশী বা কখন কম হয়। পিপাসা এত অধিক হইতে পারে যে, কোন কোন রোগী মুহুর্মুহু জল পান করিতে ইচ্ছা করে। এবং জল পান করিলেও তাহাতে পিপাসার শান্তি হয় না। মুখে রস থাকে না, জিহ্বা ও গলা শুষ্ক হইয়া যায় এবং গাত্রদাহও সময় সময় নিতান্ত অসহ্য উঠে, এমন কি রোগী সর্ব্বদা শীতল মেজেতে শয়ন এবং ঠাণ্ডা ধাতুদ্রব্য যথা থালা বাটী ইত্যাদি স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করে। অধিক কি, রোগীর স্বাধীনতা থাকিলে সে ভিজা গামছা দ্বারা গা মুছিয়া ফেলিতে কিম্বা জলদ্বারা গাত্র ধৌত করিতেও কিছু মাত্র শঙ্কিত হয় না। পরন্তু এই উত্তাপাবস্থায় বিবমিষা এবং কখন কখন বমনও উপস্থিত থাকে। এবং সেই জন্য রোগী সে সময়ে যে জল পান করে, তাহা তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া উঠিয়া যায়। আর যদি এ অবস্থায় তাদৃশ পিপাসা না থাকে, কিম্বা পিপাসা সত্ত্বেও সে জল পান না করে, অথচ যদি তাহার বমনোদ্রেক খুব প্রবলরূপে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে বমনের সহিত কিছু না উঠিলেও ঘন ঘন কাঠ বমিদ্বারা রোগী বিশেষ ক্লান্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শীতাবস্থায় অধিকাংশ রক্ত শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্রে অবস্থিতি করে। কিন্তু উত্তাপাবস্থাতে সেই রক্তের চলাচলক্রিয়ার প্রবলতাপ্রযুক্ত তাহারা শরীরের বাহ্য প্রদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং সেই জন্যই কিছু পূর্ব্বে যে রোগীর চর্ম্ম কুঞ্চিত ও চক্ষু মুখ ফ্যাকাশে বা মলিন দেখা যাইত, এক্ষণে তাহার সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া চর্ম্ম বেশ নিটোল ও চক্ষু মুখ প্রভৃতি অঙ্গ বেশ রক্তাভ ও টল্‌টলে বোধ হয়। এবং তাহার সহিত ক্রমে সমুদায় শরীরেরও উত্তাপের বৃদ্ধি হইতে থাকে। যদি কোন

সম্বন্ধে তাঁহার বহুদর্শন-জনিত যে জ্ঞান জন্মিয়াছে লম্বা চৌড়া ও ভাষার আড়ম্বর না করিয়া অতি সংক্ষেপে কেবলমাত্র তাহাই লিখিলেন। চিঃ সঃ সঃ

আভ্যন্তরিক যন্ত্রে রক্তাধিক্যের বা কনজেস্‌সনের সূত্র থাকে; তাহা হইলে এই উত্তাপাবস্থাতেই তাহা বিলক্ষণরূপে প্রকাশ পায়। আর যদি মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যের উপক্রম হইয়া থাকে, তাহা হইলে মুখমণ্ডল অপেক্ষাকৃত আরক্তিম ও চক্ষু লাল হয়। অসহ্য শিরঃপীড়া প্রকাশ পায় এবং মস্তক অতিশয় ভার বোধ হয়। ফুস্‌ফুস্‌ এবং শ্বাসনালীতে রক্তাধিক্য বা কন্‌জেস্‌সন্‌ হইলে বক্ষঃগহ্বরের কোন না কোন অংশে বেদনা বোধ হয়। আর ঐ বেদনা দীর্ঘশ্বাস লইলে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। এবং অপেক্ষাকৃত ঘন নিশ্বাস বহিতে থাকে। সেইরূপ উদর-গহ্বরস্থিত যন্ত্রে রক্তাধিক্য বা কন্‌জেস্‌সন্‌ হইলে এই উত্তাপসময়ে সেই সকল যন্ত্রেতে অধিক পরিমাণে বেদনা অনুভূত হয়। এবং উদরের উপর হস্ত দিয়া চাপিলে ঐ সকল যন্ত্রে অধিক বেদনা বোধ হয়। ক্রমশঃ—

কলিকাতা। |
শ্রাবণ |
শ্রীজগদ্বন্ধু বসু, এম, ডি,

হোমিপ্যাথি মতে জ্বরচিকিৎসা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বে এসম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহা কেবল স্বল্পবিরাম জ্বর, মোহজ্বর এবং আন্ত্রিক জ্বরেই খাটে, কারণ সহজজ্বর সচরাচর বিরেচক ঔষধ দ্বারা অথবা ঘর্ম্মকারক ও মূত্রকারক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া থাকে। উপরিউক্ত জ্বরাদিতেএলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা উত্তেজক পানীয় অর্থাৎ ব্রাণ্ডি প্রভৃতি যে কেবল ঔষধাকারে ব্যবহার করেন তাহা নহে। পথ্যের সঙ্গেও উহা ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দেন।

উক্ত উত্তেজক পানীয় যে এলোপ্যাথিক চিকিৎসার একটী প্রধান ঔষধ তাহা বলা বাহুল্য। রোগীর জীবনীশক্তি বজায় রাখিবার জন্য অন্যান্য উত্তেজক ঔষধ তৎসঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু রোগীর অবস্থা যত ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে, এবং জীবনীশক্তি যে পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে, ব্রাণ্ডির পরিমাণও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়।

শরীরে উত্তাপ (টেম্পারেচার) অধিক হইলে সেই উত্তাপ কমাইবার জন্য ডাক্তারেরা এণ্টীপাইরীন্ এবং কখন কখন এণ্টাফীব্রীন্ ব্যবহার করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে এইরূপ অবস্থায় স্যালিসিলিক্ য্যাসিড্ ব্যবহৃত হইত। যতদূর আমরা জানি এবং দেখিয়াছি, উক্ত ঔষধদ্বয় উত্তাপ কমায় বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে রোগীর জীবনীশক্তি এতদূর কমাইয়া ফেলে যে, তাহার প্রাণ সংশয় হইয়া উঠে। ঐ সকল ঔষধ ব্যবহার করিবার পর রোগীর অবস্থা বিশেষতঃ নাড়ীর অবস্থা এত ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িতে দেখা গিয়াছে যে, ডাক্তারেরা পরে বাধ্য হইয়া মৃগনাভী প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধাদি ব্যবহার করিয়া রোগীর প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। আর এরূপও ঘটিয়াছে যে, রোগী আর সে অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করিতেও পারে নাই। আর কেনই বা পারিবে, যে ঔষধ গোখাদক ইয়ুরোপীয়জাতি বরদাস্ত করিতে অক্ষম, সেই ঔষধ ডাল ভাতখেগো রোগীর সহ্য হইবে কিরূপে? এবং সুচিকিৎসার উদ্দেশ্য কখন এরূপ হইতে পারে না যে, একটী সামান্য বিপদের শান্তি করিতে গিয়া অপর একটী সাংঘাতিক বিপদ উপস্থিত করিয়া রোগীর প্রাণ লইয়া টানাটানি করা।

ডিজিটেলিস্ এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা প্রায় সমস্ত জ্বররোগেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন তাহা আমরা আজ অবধি বুঝিতেপারি নাই,যদি হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বৃদ্ধি করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য হয়,তাহা হইলে সেটী ত সম্পূর্ণ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসারই মত। যদি সর্ব্বশরীরের উত্তেজক বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। সচরাচর দেখা যায়, যে ডিজিটেলিস্ ঔষধের এলোমেলো ব্যবহারনিবন্ধন, যে রোগীর কত অনিষ্ট হয়,তাহা বোধ হয় এলোপ্যাথিক চিকিৎসক মহাশয়েরা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। কিন্তু সকল এলোপ্যাথিক চিকিৎ-

সকেরা এটী স্বীকার করিবেন যে, সমস্ত ঔষধের কিউমিলেটিভ্ অর্থাৎ সঞ্চয়ী ক্রিয়া আছে এবং একটী ঔষধ অল্প পরিমাণেও ক্রমিক ব্যবহার করাতে উক্ত ঔষধের কার্য্যের ফল শরীরে ক্রমে সঞ্চয় হইতে থাকে, আর যখন সেই সঞ্চয়ের পূর্ণমাত্রা হয়, তখন রোগীর অনিষ্টের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ডিজিটেলিস্ যাহা পূর্ব্বে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা হৃদ্‌পিণ্ডের অবসাদক বলিয়া আদৌ ব্যবহার করিতেন না, এখন সেই ডিজিটেলিস্ যে কি উদ্দেশ্যে ক্রমান্বয়ে ব্যবহার করেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, স্বল্পবিরাম জ্বর, মোহজ্বর এবং আন্ত্রিক জ্বরে রোগীর পাকস্থলীর অবস্থা যেরূপ হয়, বিশেষতঃ রোগী প্রলাপযুক্ত হইলে ওরূপ পথ্য জীর্ণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা আপনাদের চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যবস্থারবশবর্ত্তী হইয়া ঐরূপ সাংঘাতিক ব্যবস্থা দিতে বাধ্য হন, কিন্তু সাধারণতঃ ঐ ব্যবস্থায় সুফল না ফলিয়া বিষময় ফল ফলিতে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, রোগীর মৃত্যুর পর রোগীকে সংকার করিতে লইয়া যাওয়ার সময় রোগীর গুহ্যদ্বার হইতে ঐ সমস্ত পথ্য নির্গত হইয়া গিয়াছে। এবং কখনও কখনও বা এরূপও দেখা গিয়াছে যে, রোগীর মৃত্যুদেহ উঠাইবার সময় ঐ পথ্যাদি তাহার গুহ্যদ্বার দিয়া এত বেগে ও অধিক পরিমাণে নির্গত হয় যে, সেই মৃত্যুদেহ বহন করিয়া লইয়া যাওয়া ভার। এরূপ দৃশ্য দেখিয়া শুনিয়াও যে, এলোপ্যাথি চিকিৎসক মহাশয়েরা বিশেষতঃ আমাদের দেশীয় মহোদয়গণ এ বিষয়ের উপর কটাক্ষপাত করেন না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। আমাদের দেশের লোকের সংস্কার এই যে, জ্বর চিকিৎসায় এলোপ্যাথিক চিকিৎসাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, আর হোমিওপ্যাথি অথবা আমাদের দেশীয় আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎসা কার্য্যকারক নহে। এই যে সংস্কারটী নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক তাহা বোধ হয়, আমাদের দেশের সুশিক্ষিত লোকেরা এবং নব্য সম্প্রদায়েরা কিঞ্চিৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছেন। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে জ্বরচিকিৎসা বিচক্ষণ কবিরাজের দ্বারা সম্পাদিত হইত, এবং রোগীও বেশ সুন্দররূপে আরোগ্য লাভ করিত, এক্ষণে এলোপ্যাথিক চিকিৎসক মহাশয়েরা যদিও ভাগ্যক্রমে ২।৪টী রোগীকে জ্বর হইতে মুক্ত করেন, কিন্তু যেরূপ কুইনাইনের ঠেলা দেন, তাহাতে রোগীর

সুন্দররূপে আরোগ্য হওযা দূরে থাকুক্, বরং তাহাকে চিররোগীর ন্যায কালাতিপাত করিতে হয়। কুইনাইন জ্বরবিচ্ছেদে প্রয়োগ করা উচিত; কিন্তু ইহা যেরূপ এলোমেলোরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাতে জ্বর আটকাইয়া যে রোগী পুনর্ব্বার ও বারম্বার জ্বরাক্রান্ত হয়, তাহা নহে, তাহার প্লীহা ও যকৃৎ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া সে চিররোগী হইয়া পড়ে; আমি যখন বর্দ্ধমানে এপিডেমিক্ মেডিক্যাল ইনিস্‌পেক্‌টার ছিলাম, তখন ঐ প্রদেশে জ্বরের মহামারী উপস্থিত হয়। এবং সমস্ত রোগী কুইনাইন্ মিক্‌শ্চার দ্বারা চিকিৎসিত হয়, কিন্তু উক্ত ঔষধ দ্বারা মহামারীর কোন উপশম না হইয়া বরং দিন দিন উহার বৃদ্ধি হয়, এবং যত লোক কুইনাইন সেবন দ্বারা প্রথমে আবোগ্য লাভ করিয়াছিল, সকলেই পরে প্লীহা এবং যকৃৎ পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। সাধারণের সংস্কার এইরূপ যে, কুইনাইন্ ম্যালেরিয়ার একটী মহৌষধ। কিন্তু মহামারীর প্রথমাবস্থায় এত সাংঘাতিক হইয়াছিল যে, কোন ঔষধই উহাতে কার্য্যকারী হয় নাই, প্রায় সকল রোগীই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। মহামারীর প্রবলতা কম হইলে পর কুইনাইন্ সেবনে প্রথমে কিঞ্চিৎ উপকার হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঐ সকল রোগী পরে প্লীহা ও যকৃৎগ্রস্ত হইয়া পড়িল। এবং ক্রমশঃ জীবনলীলা সংবরণ করিতে লাগিল। এই সব দেখিয়া শুনিয়া লোকের জ্ঞানচক্ষু ক্রমে খুলিতে লাগিল; এবং যাহারা এক সময়ে কুইনাইন সেবন করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিত, তাহারাই আবার কুইনাইনের ব্যবস্থা করিলে একবারে খড়্গা-হস্ত হইয়া উঠিত। এবং স্পষ্টাক্ষরে বলিত যে, কুইনাইন সেবনে আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে। এবং মরি আর বাঁচি, কিন্তু কুইনাইন আর কখন খাইব না। পুরাতন বৈদ্য চিকিৎসার উপর নির্ভর করিয়া থাকিব। ইহাতে আমাদের অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহাই হইবেক। ইহাতে আমা-দের দেশীয় লোকে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, জ্বররোগে এলো-প্যাথিক চিকিৎসা আমাদের দেশের লোকের পক্ষে কি পরিমাণে উপযোগী। এবং চিকিৎসায় লোকের উদ্দেশ্যই বা কি? সুন্দররূপে রোগ হইতে মুক্ত হওয়া ভাল, কি কিছুদিনের জন্য আরোগ্যলাভ করিয়া পরে চিররোগী হওয়া ভাল। এলোপ্যাথি চিকিৎসায় যেরূপ হয়, তাহা বোধ হয়, পাঠক, এই প্রবন্ধ পাঠে

করিলে বেশ বুঝিতে পারিবেন। এখন দেখা যাইবে যে, বৈদ্যচিকিৎসা অথবা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা জ্বররোগে কিরূপ কার্য্য কারক। ক্রমশঃ——

শ্রাবণ | শ্রীহরনাথ রায় এল, এম, এস,
কলিকাতা। | হোমিওপ্যাথিক প্রাক্‌টীসনার।

নূতন ঔষধ স্ট্রোফ্যান্থ্যাস্।

(এলোপ্যাথি মতে)

আজকাল এলোপ্যাথি মতে যে সমস্ত নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে বা হইতেছে, তাহাদের মধ্যে উপরোক্ত ঔষধটী দিন দিন সাধারণের নিকট বিশেষ আদরের পাত্র হইতে দেখা যাইতেছে। এই ঔষধটী হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার বিশেষ বৃদ্ধিকারক। বিশেষতঃ ইহার দ্বারা কিড্‌নি অর্থাৎ মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়া বৃদ্ধি হইয়া অতিরিক্ত প্রস্রাব করায়। এতদিন এলোপ্যাথি মতে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবৃদ্ধির জন্য ডিজিটেলিস্ নামক ঔষধটীই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু এই নূতন ঔষধটী আবিষ্কৃত হওয়াতে এখন অনেক স্থলেই ডিজিটেলিসের পরিবর্ত্তে এই নূতন ঔষধ ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এজন্য সাধারণের জানা আবশ্যক যে, উক্ত উভয় ঔষধের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবৃদ্ধির বিশেষতঃ শরীরের আর্টিরিয়ল্‌স্ অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তনালীর মধ্যে রক্তের চলাচল সম্বন্ধে উক্ত উভয় ঔষধের কার্য্যের প্রভেদ কি?

যদিও ডিজিটেলিস্ ও ষ্ট্রোফ্যান্থাস্ এই উভয় ঔষধের কার্য্য দ্বারা হৃৎপিণ্ড সবল ও প্রকৃতিস্থ হয়, কিন্তু ডিজিটেলিস দ্বারা হৃৎপিণ্ডের কার্য্য

সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলেও ইহাতে শরীরের আর্টিরিয়লসের কণ্ট্রাক্ট হইয়া অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তনালীর পথ সকল সঙ্কুচিত হইয়া আইসে। সুতরাং ইহা দ্বারা শরীরে সুচারুরূপে রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু শেষোক্ত ঔষধ অর্থাৎ ষ্ট্রোফ্যান্থাস্ দ্বারা যেমন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া উত্তমরূপে বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ সেই সঙ্গে আর্টিরিয়লসের কণ্ট্রাক্ট না হইয়া অর্থাৎ শরীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তনালীর পথ সকল সঙ্কুচিত না করিয়া পূর্ব্ববৎ প্রশস্ত রাখে।

এই নূতন ঔষধটী টীঞ্চার আকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা ২ ফেঁাটা হইতে ১০ ফেঁাটা পর্য্যন্ত। কিন্তু প্রথমে অল্প মাত্রায় অর্থাৎ ২ ফেঁাটা হইতে আরম্ভ করিয়া দিবসে তিন বার হওয়া উচিত। কিন্তু ইহাতে এক দিনে যদি বিশেষ উপকার পাওয়া না যায়, তবে ক্রমশঃ ইহার মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ব্যবহার করা উচিত। এই ঔষধ কোন্ কোন্ পীড়ার কোন্ কোন্ অবস্থায় প্রয়োগ করা উচিত, তাহা ক্রমশঃ বলা যাইবেক।

ক্রমশঃ——

চি, স, সম্পাদক।

হোমিওপ্যাথি মতে।

(ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের পুস্তক হইতে)

ওলাউঠার পরিণাম-জ্বরের চিকিৎসা।

শারীরিক যন্ত্রকৌশলের আজন্মজাত কোমলতাবশতঃ বা সংকোচাবস্থায় উত্তেজক ঔষধের অত্যধিক ব্যবহার নিবন্ধন যখন প্রতিক্রিয়ার এক প্রকার বৃদ্ধি হইয়া জ্বর হয়, তখন উহা আপনা হইতেই নিবারণ হইয়া থাকে। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে দুই এক মাত্রা আকোনাইট দিলে চুকিয়া যায়।

যাহা হউক, প্রতিক্রিয়ার পর যে জ্বর হয়, তাহা সর্ব্বদা এইরূপে আরোগ্য হয় না। উহা সচরাচর প্রকৃত মোহক অথবা মৃত্যু-মোহক হইতে ঈষৎ ভিন্ন এক প্রকার অত্যন্ত ছেঁচ্‌ড়া ঘিনঘিনে জ্বরের মত জ্বর হইতে থাকে।

এই জ্বর সচরাচর এক বা ততধিক প্রধান প্রধান অঙ্গের রক্তাধিক্য বা প্রদাহের সঙ্গে সঙ্গে পরিণামের অনুগামী হইয়া ঘটে, তন্নিমিত্ত এ পীড়ার চিকিৎসাতে কৃতকার্য্য হইতে হইলে, বিশুদ্ধরূপ রোগ নিরূপণ করা নিতান্ত আবশ্যক।

এই জ্বরে যদি মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে বেলেডোনা দিলে সচরাচর নিবারণ হয়। ফুস্‌ফুস্ আক্রান্ত হইলে, ব্রাইওনিয়া ও ফস্ফরাস্; পাকাশয় আক্রান্ত হইলে আর্সিনিক, নক্স-ভমিকা ও ব্রাইওনিয়া; ঘন অন্ত্র আক্রান্ত হইলে, মার্কুরিয়স্-সোলুব্লিস্ ও ব্রাইওনিয়া; যকৃৎ আক্রান্ত হইলে, মার্কুরিয়স, ব্রাইওনিয়া ও নক্স-ভমিকা; মলবাহী অন্ত্র আক্রান্ত হইলে অর্থাৎ গ্রহণী হইলে মার্কুরিয়াস্-করোসাইভস, নক্স-ভমিকা, ইপিকাকোয়ানা ও কার্ব্বো-ভেজিটাব্লিস্; মূত্র-যন্ত্র আক্রান্ত হইলে ক্যান্থারিস্; এইরূপ ব্যবস্থা করিলে নিবারণ হইয়া থাকে। যখন এই সকল স্থলে অধিক পরিমাণে জ্বর থাকে, তখন কেবল আকোনাইট ব্যবস্থার্হ।

এই জ্বর যখন সঙ্কর-ভাবাপন্ন না হয়, তখন ফস্ফরিকাসিড্ এবং রস্-টক্সে নিবারণ হয়। ফুস্ফুসীয় ও মস্তিষ্কীয় উপসর্গ থাকিলেও ফস্ফরিকাসিড ও রস্-টক্সে উপকার হইয়া থাকে।

মস্তক, উদর এবং বক্ষঃস্থল মধ্যে যে সমস্ত যন্ত্র আবদ্ধ থাকে; তাহাদের প্রদাহে ঐ সকল স্থানে শীতল জলসিক্ত নেকড়ার স্থানিক প্রয়োগে নিবারণ হয়। বহু দিন হইতে মাথায় এই শীতল জলের স্থানিক প্রয়োগ চলিয়া আসিতেছে, এবং সেই নিমিত্ত এতদ্দেশীয় লোক-সমাজে ইয়ুরোপীয় ভিষক মহাশয়দের চিকিৎসা সত্য সত্যই হাকিম ও কবিরাজ মহাশয়দের চিকিৎসা হইতে অপেক্ষাকৃত আদরণীয় হইয়াছে। কিন্তু উদর এবং বক্ষের অভ্যন্তরে যে সমস্ত যন্ত্র থাকে, তাহাদের প্রদাহে, উক্ত উদর ও বক্ষঃ শীতল জলের স্থানিক প্রয়োগ করিতে অদ্যাবধি কোন মহাত্মাই সাহস করেন নাই। তদ্বিপরীত মস্তিষ্ক প্রদাহ ও মাস্তিকোষে, মস্তকে

শীতল জল দিতে যেমন কবিরাজ মহাশয়েরা ভীত হন, তেমনি বুক্ক ্যাদির প্রদাহে বক্ষে শীতল জলের স্থানিক প্রয়োগ করিতে ঠিক ঐ কবিরাজদের মত ডাক্তার মহাশয়েরাও এখন পর্য্যন্ত ভীত হন। কিন্তু এইরূপ জল দেওয়াতে রোগের উপশম হইয়া অত্যন্ত উপকার হইতে দেখা গিয়াছে।

সম্পূর্ণ

চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ।

বিগত শ্রাবণ মাসে বশীরহাট গবর্ণমেণ্ট ডাক্তারের পরিবারের মূত্রকৃচ্ছ্রের পীড়া হয়, প্রথমে তিনি চিকিৎসা করেন, তাহাতে কোন উপশম হয় নাই, তৎপরে সিবিলসার্জ্জন হস্‌পিটেল পরিদর্শনার্থে তথায় যান, তাঁহার উপদেশানুসারে এলোপ্যাথি মতে ঔষধ দেওয়া হয় তাহাতে ক্রমশ রোগ বৃদ্ধি হয়। পরে সংগ্রামপুর নিবাসী বিচক্ষণ কবিরাজ কুড়নদাস দ্বারা চিকিৎসা করান,তাহাতে কোন উপকার না হওয়ায় বশীরহাটের শশীভূষণ বসু এলাপ্যাথি ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসায় কোন ফল না হওয়ায়, বাদুড়িয়ার গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার মোহিত বাবুর দ্বারা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা হয়,কিন্তু ক্রমশ রোগীণীর যন্ত্রণা বৃদ্ধি হওয়ায় ৭ই শ্রাবণ রাত্র ৮ ঘটিকার সময় আমি আহুত হইয়া, পূর্ব্ব বর্ণিত অবস্থা শুনিলাম, সিষ্টাইটিজ হইয়াছে বলিয়া ডাক্তার মহাশয়েরা স্থির করিয়াছিলেন।

রোগীণী অবস্থা অনবরত চীৎকার করিতেছে। ৫ মিনিট অন্তর প্রস্রাবের বেগ, প্রস্রাব ফোটা ফোটা অতিশয় জ্বালা। অনুসন্ধানে জানিলাম পূর্ব্ব হইতে অর্শ ছিল, মাসের মধ্যে ৩। ৪ বার অর্শের রক্তস্রাব হয়, পীড়ার ২ মাস পূর্ব্ব হইতে আর রক্ত পড়ে নাই, এইক্ষণ অর্শের নলী অতিশয় স্ফীত হইয়াছে,ডাক্তার বাবু কহিলেন অনবরত কোঁত দেওয়ায় ঐরূপ স্ফীত ও

অতিশয় বেদনা হইয়াছে, বস্তিদেশ সর্ব্বদা কন্ কন্ করিতেছে, কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। ৪ দিবস পর্য্যন্ত পল্ সেটীলা ও ক্যান্থারাইডিস সেবন করান হইতেছে। রাত্র ৯টার সময় নক্সভমিকা ৩০ ডাঃ একমাত্রা ১২টার সময় ও ৪টার সময় ৩ মাত্রা ব্যবস্থা করিলাম এবং বলিলাম যদি রুগিণী নিদ্রা যায় তবে আর ঔষধ দিবেন না, নিদ্রার কথা শুনিয়া ডাক্তার বাবু হাস্য করিয়া কহিলেন অদ্য ১০রাত্র নিদ্রা নাই,কিন্তুপরমেশ্বরের কৃপায় ২মাত্রা ঔষধ সেবনে রুগিণী নিদ্রিতা হইলেন। পর দিন প্রাতে কহিলেন অদ্য যেরূপ আছি এইরূপ থাকিলে কল্য নিরোগী হইব। প্রাতে ১মাত্রা সল্ ফর,সায়াহ্নে একমাত্রা নক্সভমিকা ওরাত্রে শয়ন কালে একমাত্রা দিয়াছিলাম, ঐ দিবস মধ্যাহ্নে আহারান্তে পরিস্কাররূপে দাস্তহয় ও রুগিণী প্রগাঢ় নিদ্রাযান তৎপরে আর কোন যন্ত্রণা হয়নাই। আমার বিবেচনা হয় প্রথমে যে একমাত্রা নক্স দি তাহাই রোগিণীর পক্ষে যথেষ্ট হইত, তবে আমাদিগের অধৈর্য্যনিবন্ধন ৫। ৬ মাত্রা ঔষধ দিতে হইয়াছিল। আর একটী আনন্দের বিষয় এই যে, উক্ত ডাক্তার বাবুর হোমিওপ্যাথিতে কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না, তিনি ঔষধের আশ্চর্য্য ক্ষমতা দৃষ্টে সেই দিবস হইতে হোমিওপ্যাথি শিখিতে অভিলাষী হইয়াছেন। এই রুগিনীর অর্শ সম্বন্ধে যদি অন্যান্য চিকিৎসকেরা মনোযোগী হইতেন তাহা হইলে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইতেন। আমার বিবেচনায় যাহাদের অর্শ আছে, তাঁহাদের পক্ষে অধিকাংশ পীড়ায় নক্সভমিকা ও সল্ ফর উপকারী বিশেষতঃ যদ্যপি কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে।

বসীরহাট। } শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র কুলভি
হোমিওপ্যাথি প্রাক্টিসনার।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

এই রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে চিকিৎসক মহাশয়ের ঔষধ প্রয়োগ অপেক্ষা রোগ পরীক্ষায় অবশ্য কিছু বাহাদুরী আছে। কেন না গোড়ায় রোগ নির্ব্বাচনের দোষেই এলোপ্যাথি মহাশয়েরা কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই

বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সুতরাং এলোপ্যাথি ডাক্তার মহাশয়ের ব্যগ্র হইয়া আবার হোমিওপ্যাথি শিখিতে ব্যস্ত হওয়ার অপেক্ষা বরং যাহাতে নিজের এলোপ্যাথিতে একটু পাকা রকমের জ্ঞান জন্মে, তৎপক্ষেই অধিক যত্নবান হওয়া আবশ্যক, কেমন নয় কি? চিঃ, সঃ, সঃ।

মুষ্টিযোগ।

প্লীহার ঔষধ।

(ক) দণ্ডকলসের পাতা লবণ দ্বারা রগড়াইয়া রোগী বিবেচনায় এক বা দেড় তোলা রস গ্রহণ করিয়া সেই রস তিন দিন প্রাতে এক একবার করিয়া সেবন করাইলে হয়, তৎপর দুই দিন ঔষধ সেবন বন্ধ করিয়া আরও তিন দিন প্রাতে ২ এক ২ বার করিয়া সেবন করাইতে হয়। ঈশ্বরেচ্ছায় এই কয় দিনেই প্লীহা সুন্দররূপে উপশমিত হয়। ঔষধ অতি প্রত্যুষেই সেবন করিতে হয়। ঔষধ সেবন করিয়াই ২ ১ মুষ্টি চিড়া বা মুড়ী সেবন করা কর্ত্তব্য, ইহাতে ঔষধ সেবন জনিত বিস্বাদ দূর হয়। আর ঔষধ সেবন মাত্রই বাম পার্শ্বে হেলিয়া অন্যূন দুই ঘণ্টা শয়ন করিয়া থাকা কর্ত্তব্য। এই ঔষধ সেবনে ঔষধের ঘ্রাণে কাহারও কাহারও বমন হইবার সম্ভব, ইহাতে কোন আশঙ্কার কারণ নাই। ঔষধ সেবনে বমন হইলে তৎপর দিন হইতে ঔষধের মাত্রা হ্রাস করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা হইলে আর বমন হইবে না। এমত স্থলে সেবন করার দিন ও বৃদ্ধি করিতে হইবে।

দণ্ডকলসের অপর নাম দ্রোণ, ইহা একটী সর্ব্বসাধারণের সুপরিচিত গুল্ম, ইহার পাতা গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, পুষ্প ও ক্ষুদ্র ২, পুষ্প গুলি শ্বেতবর্ণ।

(খ) লাটা গোটার বিচির মধ্যে যে শাঁস থাকে, সেই শাঁস কিয়ৎক্ষণ তুষানলে রাখিলে একটী বৃহৎ খৈবৎ হইবে, সেই খৈ চূর্ণ করিবা তাণ্ডীর

(ভাণ্ডী ভাঁট) বৃক্ষের তিনটী কুঁড়ির (মুকুল) সহিত বাটিয়া অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে হাঁত মুখ প্রক্ষালন না করিয়াই সেবন করিতে হইবে, ঔষধ সেবন করিয়াই বাম পার্শ্বে হেলিয়া অন্যূন দুই ঘণ্টা শয়ন করিয়া থাকা কর্ত্তব্য। এই ঔষধ প্লীহারোগের সকল অবস্থায় ব্যবহার করা যায় না, মাত্র আক্রমণাবস্থায়ই এই ঔষধ কার্য্যকারী। যে সময় পর্য্যন্ত রোগীর উদরে হাত দিলে প্লীহা সংস্পর্শিত না হয় অথচ প্লীহারোগের অন্যান্য লক্ষণ গুলি প্রতি লক্ষিত হইয়া থাকে, এমন সময় এই ঔষধ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে এক সপ্তাহ সেবন করিলে প্লীহা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

লাটাগোটা। কোন ২ স্থানে ইহাকে ফুইলা লাটা বলিয়া থাকে। ইহা এক প্রকার বুনোগাছ। এই গাছ কণ্টকময়, ইহার ডাল, পাতা, ফল ইত্যাদিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁটা আছে। ইহার পাতা তেঁতুল পাতার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প হরিদ্রাবর্ণ। ইহার ফল খোলার ন্যায়, এক একটী খোলাতে ৩। ৪ টি বিচি থাকে, এই বিচির মধ্যে শাঁস পাওয়া যায়।

ভাণ্ডীর গাছ। ইহা সকলেরই পরিচিত, এই গাছ সচরাচর দুই প্রকার দেখা যায়। এস্থলে যে ভাণ্ডীর গাছের আবশ্যক তাহা আকৃতিতে ক্ষুদ্র। ইহার পুষ্পের আকৃতি প্রায় কৃষ্ণচূড়া পুষ্পের ন্যায় হইয়া থাকে। পুষ্পের বর্ণ কৃষ্ণচূড়া পুষ্পের ন্যায় নহে, পুষ্প ও কেশরাদির বর্ণ শ্বেত ও গাঢ় লাল বর্ণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

"ক" ও "খ" সংজ্ঞার ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে রেচক ঔষধ দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য।

ক্রমশঃ—

কৃষ্ণনগর,
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়।
পোঃ কৃষ্ণনগর (ত্রিপুরা)
১২৯৩। ১৪ই চৈত্র।

শ্রীআদিনাথ ঘোষ।
হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার।

উদ্ধৃত মুষ্টিযোগ।

তৃষ্ণা বা পিপাসা রোগ।

১। মৌরীর পুটলী জলে ভিজাইয়া পুনঃ পুনঃ তাহা চুষিলে অথবা মৌরী ভিজান জল পুনঃ পুনঃ এক চামচ বা দুই চামচ করিয়া পান করিলে তৃষ্ণার শান্তি হয়।

২। কাবাব চিনি সিদ্ধ জল পুনঃ পুনঃ পূর্ব্বরূপ মাত্রায় সেবন করিলে তৃষ্ণা প্রশমিত হয়।

৩। ছোট এলাচির খোসা সিদ্ধ করিয়া সেই জল পূর্ব্বরূপ মাত্রায় পুনঃ পুনঃ পান করিলে পিপাসা দূর হয়।

৪। চা উষ্ণ জলে ফেলিয়া সেই জল মিছরি, চিনি কিম্বা কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অতি শীঘ্র পিপাসা নিবারিত হয়।

৫। শাশার আতির (বুকার) জল বাহির করিয়া পুনঃ পুনঃ পান কবিলে তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

৬। অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ কাঞ্জীক পান করিলেও তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়। মুষ্টিযোগ রত্ন। উপরোক্ত প্রায় সমস্তগুলিই আমাদের বিশেষরূপে পরীক্ষিত।

চি, স, সং,

সমালোচনা।

১। চিকিৎসা দর্শন। চিকিৎসা বিষয়ক প্রবন্ধ পূর্ণ মাসিক পত্রিকা। শ্রীরজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। আমরা এই পত্রিকার প্রথম হইতে পাঁচ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু সময়াভাবে বিশেষত আরও কয়েক সংখ্যা না দেখিয়া এবার ইহার সমালোচনা করিতে পারিলা

না। কেবল সাধারণের অবগতির জন্য গতবারে ইহা হইতে রোগীর পথ্য নামক প্রবন্ধটী উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি।

২। মুষ্টিযোগ রত্ন। মুষ্টিযোগ রত্ন আমাদেরই পুস্তক, কেননা চিকিৎসা-সম্মিলনীর ম্যানেজার প্যারী বাবুই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের সংগ্রহ কর্ত্তা। সুতরাং ইহার সম্বন্ধে আর অন্য কিছু না বলিয়া ইহার একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত মহারাজা	রাজেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর	সুসঙ্গদুর্গাপুর	...	৮
" রাজা	মুরারীলাল রায় চৌধুরী	অনারারী মাজিষ্ট্রেট কাঁথি	...	৩৷৴০
" রাজা	কৃষ্ণেন্দ্র রায় বাহাদুর	বলিহার রাজবাড়ী	...	৩৷৴০
শ্রীযুক্ত বাবু	হরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী	জমীদার বগড়ীবাড়ী	...	৩৷৴০
" "	নফরচন্দ্র ভট্ট	সবজজ বরিশাল	...	৩৷৴০
" "	রায় যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	প্লীডার হাজারীবাগ	...	৩৷৴০
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত	শৈলজাচরণ ওঝা	বৈদ্যনাথ	..	৩৷৴০
শ্রীযুক্ত বাবু	পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	উকীল হাইকোর্ট	...	৩৲
" "	যোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	পাথুরেঘাটা	...	২৲
" "	নীলমণি চক্রবর্ত্তী হেয়ার স্কুল	...	...	২
" "	ডাক্তার বিনোদ বিহারী মিত্র	পটলডাঙ্গা	...	৩৲
" "	ডাক্তার হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	বড়বাজার	...	৬৲
" "	নগরবাসী দাস	মাণিকগঞ্জ	...	২৷৴০
" "	বিনোদ বিহারী সাহা	গোমস্তাপুর	...	৩৷৴০
" "	ডাক্তার নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	আমলা সদরপুর		৩৷৴০
" "	রজনীকান্ত সেন	যোড়াসাঁকো	...	১৲
" "	যোগীন্দ্রচন্দ্র সেন	কণ্ট্রোলার আফিষ	...	১৲
" "	নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	...	১৲

"	"	ঠাকুরদাস রায় চৌধুরী রেলওয়ে পু, স, ইন্‌স্পেক্টার হাবড়া		১
"	"	ঈশানচন্দ্র সরকার	টোরীঘাট গাজীপুর ...	৩।৶০
"	"	ডাক্তার বলদেব দাস ক্ষেত্রী	বড়বাজার ...	২৲
"	"	ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ বসু	আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ...	১৲
"	"	কেদারনাথ সান্যাল	চাঁপাতলা	১৲
"	"	অক্ষয়কুমার ঘোষ	শ্যামবাজার	৩৲
"	"	কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী	বাগবাজার	২৲
"	"	রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ	শোভাবাজার রাজবাড়ী	১৲
"	"	আন্দুল পবলিক্‌ লাইব্রেরী		৪
"	"	কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস	দরমাহাটা	১
"	"	জে, এস, সাহা	বীডন ষ্ট্রীট	১
"	"	ভগবতীচরণ মিত্র	যোড়াসাঁকো	১
"	"	কালীদাস বটব্যাল ভাতাড়	বর্দ্ধমান	২।৶০
"	"	কেদারনাথ মণ্ডল	খেজুরী	১
"	"	পরমেশ্বর ঘোষ	কড়াইল, জামুর্কী	৩।৵০
"	"	যজ্ঞেশ্বর সাহা সাদীপুর	জলঙ্গী	৩।৶০
"	"	ভূপতিচরণ নন্দী	রাজবল্লভ, পিঙ্গলা	৭

স্থানাভাবে ক্রমশঃ—

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গত বর্ষের যে সমস্ত গ্রাহকের নিকট হইতে ভেলুপেয়েবল দ্বারা টাকা আদায় করিতে হইয়াছিল; তাঁহাদের নিকট আমাদের করযোড়ে নিবেদন এই যে, এবারে যেন আর আমাদিগকে পূর্ব্ববৎ অভদ্রাচরণ করিতে না হয়। আশা করি, তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই একটু বিবেচনা করিয়া কাজ করিলেই সকল দিক্‌ রক্ষা করিতে পারিবে।

ম্যানেজার।

এলোপ্যাথি মতে।

জ্বরচিকিৎসা।*

ইণ্টার মিটেণ্ট ফিবার বা সবিরাম জ্বর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১২২ পৃষ্ঠার পর)

কোন কোন সময়ে এই উত্তাপাবস্থায় রোগীর সবুজ রঙের কিংবা জলবৎ ভেদ হইতে থাকে। আর যতক্ষণ জ্বরের সম্পূর্ণ বিরাম না হয়, ততক্ষণ প্রায় ঐ ভেদ বর্ত্তমান থাকে। এইরূপ ভেদ, ঔষধদ্বারা হঠাৎ বন্ধকরা উচিত নহে। কারণ তাহাহইলে রোগীর যকৃতে বা অন্ত্রে প্রদাহ উৎপন্ন হইতে পারে। ছোট ছোট অর্থাৎ তিন বৎসরের ন্যূন বয়স্ক শিশুদিগের এই অবস্থায় যদি অতিশয় উত্তাপ প্রকাশ পায়, এমন কি ৫ ডিগ্রীর অধিক হইলে তড়্কা উপস্থিত হইতে দেখা যায়। আর পূর্ণ বয়স্কদিগের ঐরূপ উত্তাপের বৃদ্ধি হইলে রোগী বিহ্বল বকিতে থাকে। এবং কখন কখন বা অচৈতন্যতাও প্রাপ্ত হয়। এইশেষ চিহ্নটী প্রায় অতিবৃদ্ধ ব্যক্তিদিগেরই ঘটিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন উত্তাপাবস্থায় রোগীর প্রস্রাব ঘন ঘন হইলেও তাহা পরিমাণে কম ও রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। এবং কখন কখন বা প্রস্রাব করার সময় জ্বালা যন্ত্রনাও বর্ত্তমান থাকে। এই উত্তাপাবস্থা কোন কোন সময় অত্যন্ত অধিকরূপে প্রকাশ পায়। আবার কখন বা ইহা অতি যৎসামান্য-রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এমন কি উত্তাপাবস্থার অনুধাবনই হয় না।

সচরাচর উত্তাপাবস্থা ৩।৪ ঘণ্টা কাল স্থায়ী হইয়া পরে রোগীর উত্তাপ হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। এবং সেই উত্তাপহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে রোগীর

* এই প্রবন্ধ কোন গ্রন্থবিশেষ হইতে অনুবাদিত নহে। ডাক্তার জগবন্ধু বাবু বহুকাল হইতে সহস্র সহস্র রোগীর চিকিৎসা করিয়া চিকিৎসা-সম্বন্ধে তাঁহার বহুদর্শন জনিত যে জ্ঞান জন্মিয়াছে, লম্বা চৌড়া ও ভাষার আড়ম্বর না করিয়া অতিসংক্ষেপে কেবল মাত্র তাহাই লিখিলেন। চি,স,স,।

কপালে ও কণ্ঠদেশে অল্প অল্প ঘর্ম্ম হইতে সুরু হইয়া তাহার জ্বর বিরামাবস্থায় পরিণত হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং সাধারণের জানা আবশ্যক যে, এই কপাল ও কণ্ঠদেশে ঘর্ম্মের সূত্রপাত হইলেই রোগীর জ্বরবিচ্ছেদ হইতে আরম্ভ হইল। তারপর ক্রমে বক্ষঃস্থল ও হস্তপদাদি সর্ব্বশরীর হইতে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম নির্গত ও সম্পূর্ণরূপে জ্বরবিচ্ছেদ হইয়া তাহার শরীর স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পরন্তু জ্বরবিচ্ছেদের পর রোগীর শরীর স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সে সময় তাহার শরীরের কথঞ্চিৎ দুর্ব্বলতা ভিন্ন কিছু পূর্ব্বে যে সে পীড়িত হইয়াছিল, এমনও বোধ হয় না। যদিচ অধিকাংশ সময় সাধারণতঃ এইরূপ অবস্থা ঘটে, কিন্তু তাহা বলিয়া সাধারণে ইহা মনে করিবেন না যে, সকল সময়েই এই ঘর্ম্মাবস্থা রোগীর পক্ষে বিশেষ মঙ্গল-জনক হয়। যেহেতু যদি সবিরামজ্বরে রোগীর পক্ষে কোন অবস্থায় বিশেষ ভয়ের কারণ থাকে, তবে তাহা এই অবস্থাতেই ঘটে। উলো, বাঁশবেড়ে, হালিসহর এবং অপরাপর প্রসিদ্ধ ম্যালেরিয়া প্রধানদেশে সবিরামজ্বরে যত মৃত্যু ঘটিয়াছে, সে প্রায়ই এই ঘর্ম্মাবস্থায়। আমি প্রায় ৩৩ বৎসর পর্য্যন্ত এই সবিরাম জ্বরের চিকিৎসা করিয়া আমার মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, সবিরাম জ্বরের চিকিৎসাতে চিকিৎসকের এসময়ে বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যক। অতি ঘর্ম্ম ব্যতীত কোন কোন সময় এই অবস্থায় অতিভেদ বা অধিক প্রস্রাব হইলেও নাড়ী অতি ঘর্ম্মের ন্যায় দুর্ব্বল হইতে পারে। এবং তাহাতেও রোগীর জীবনের আশঙ্কা ঘটিতে পারে। বিরামাবস্থায় ঘর্ম্মের সহিত নাড়ীর উত্তাপাবস্থার বেগ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া থাকে। কিন্তু যদি অতি ঘর্ম্ম কিংবা উপরোক্ত অপর দুইটী লক্ষণের সহিত নাড়ীর বেগের হ্রাস না হইয়া ক্রমে বেগের বৃদ্ধি হইতে থাকে, তাহা হইলে এইরূপ স্থলেই চিকিৎসককে বিশেষ আশঙ্কার কারণ বুঝিতে হইবেক, এবং এই অবস্থায় ঘর্ম্মনিবারক এবং ধারক ও উত্তেজক ঔষধ ব্যবহার দ্বারাও যদি ঘর্ম্ম, ভেদ বা প্রস্রাবের নিবারণ এবং নাড়ীর বেগের হ্রাস না করিতে পারা যায়, তাহাহইলে নিশ্চয়ই জানিবে যে, সে রোগীর আর জীবনের আশা নাই।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার বা সবিরাম জ্বরে যে কম্প প্রভৃতি তিনটী অবস্থা ঘটে, তাহা সকল সময় সমানভাবে প্রকাশ পায়

না। যখন কম্প খুব্ প্রবলরূপে প্রকাশ পায়, তখন এই সবিরাম জ্বরকে এগিউ বা কম্পজ্বর বলে। আর যখন অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইয়া নাড়ীর বেগ না কমে, অর্থাৎ বিরাম অবস্থাতেও নাড়ীর গতি প্রত্যেক মিনিটে ১১০ একশত দশের নীচে না হয়, তখন তাহাকে লো ইণ্টারমিটেণ্ট-ফিবার বলে। যদি ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার বা সবিরামজ্বর রোগীকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করে, তাহাহইলে সেই রোগীর প্রথমতঃ রক্তের হীনতা বা এনিমিয়া জন্মে। এবং ক্রমে প্লীহা ও কথন কথন প্লীহা ও যকৃৎ এই উভয়ের বৃদ্ধি হইতে থাকে। কিন্তু সচরাচর যকৃতের বৃদ্ধি না হইয়া কেবল প্লীহারই বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। এই প্লীহা আকারে এতবড় হইতে পাবে যে, উদরগহ্বরের বাম অর্দ্ধাংশে সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কথন কথন বা উদরগহ্বরের মধ্যরেখা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণদিকের উদরগহ্বর পর্য্যন্ত আক্রমণ করে। নিম্নে বস্তিখাদ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়, এবং উর্দ্ধে ডায়াফ্রাম্ পেশীকে উপরে ঠেলিয়া বামদিকের বক্ষঃগহ্বরের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে, অনেক সময় এইরূপে প্লীহারই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া আবার কোন কোন সময় কোন কোন রোগীর এই প্লীহার বৃদ্ধির সঙ্গে প্লীহার ন্যায় যকৃতেরও ভয়ানকরূপে বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। যখন কেবল এইরূপ প্লীহারই বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়, তখন প্রায়ই রোগীর ঘোকালীন জ্বরের প্রকাশ পায়। আর প্লীহার সঙ্গে যকৃতেরও ঐরূপ অধিক বৃদ্ধি হইলে রোগীর জ্বর অবিচ্ছেদী বিষমজ্বরে পরিণত হইতে দেখা যায়। কিন্তু কখন কথন সুধু প্লীহার বৃদ্ধিতেই রোগীর অবিচ্ছেদী বিষমজ্বর হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর নাসিকা ও দন্তের মাড়ী হইতে পুনঃ পুনঃ রক্তস্রাব হয়। আর কথন কথন রোগীর ক্যান্‌ক্রম্ অরিস্ বা মুখরোগ ঘটিতে পারে। এই মুখরোগ কিপর্য্যন্ত ঘটে, তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি। প্রথমে দন্ত মাড়ীতে ঘা হইয়া উহা পচিতে আরম্ভ হয়, ও ক্রমে খসিয়া পড়িতে থাকে। দন্ত সকল শিথিল হয়, এবং চিবুকাস্থিপর্য্যন্ত পচিয়া খসিয়া যায়। কথন কথন গালের মধ্যে ঘা হইা কপোল ভেদ করিয়া ঘা বাহির হইয়া পড়ে, এমন কি, সেই ছিদ্রদিয়া মুখমধ্যস্থ দন্তাদি পর্য্যন্ত দেখা যায়।

এই জ্বরে যেমন প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে মুখরোগ জন্মিতে পারে, সেইরূপ প্লীহাযকৃতের বৃদ্ধি হইলে তৎসহিত শোথও প্রকাশ পাইতে পারে। কিন্তু এই শোথ রোগটী প্লীহা এবং যকৃতের বৃদ্ধি না সত্ত্বেও কথন কথন এই জ্বরে রক্তের হীনাবস্থা বা এনিমিয়া বশতঃ ঘটিতে দেখা যায়।

ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার বা সবিরামজ্বরে কথন কথন ন্যাবা হইতে দেখা যায়। ইহা যকৃতের যথন বৃদ্ধি হয়, তথন তাহার স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত তাহার ক্রিয়ারও পরিবর্ত্তন হইয়া ঘটিতে পারে, কিন্তু সচরাচর সবিরামজ্বরে ন্যাবা এরকমে ঘটেনা। কথন কথন যকৃতের বৃদ্ধি হইতে দেখা যায় না, অথচ যকৃতের টরপিড্ কণ্ডিসন্ অর্থাৎ পিত্তনিঃসরণ ক্রিয়ার অল্পতা বশতঃ রক্তস্থিত পিত্তের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া রক্তস্রোতের সহিত সমুদায় শরীরে প্রবাহিত হয়। সুতরাং ক্রমে সমস্ত শরীর হরিদ্রাবর্ণ হইয়া ন্যাবা উৎপন্ন করে।

ইণ্টার মিটেণ্টফিবার বা সবিরাম জ্বরের

চিকিৎসা।

ইতিপূর্ব্বে ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার বা সবিরাম জ্বর শীত বা কম্পাবস্থা, উত্তাপাবস্থা ও বিরামাবস্থা এই তিনভাগে বিভক্ত করিয়া ক্রমশঃ তাহাদের লক্ষণ বলা হইয়াছে, এখন তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসার বিষয় বলা যাইতেছে।

১ম, কম্পাবস্থা।

ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার বা সবিরাম জ্বরে যখন রোগীর প্রথম কম্প আরম্ভ হয়, তথন সাধারণতঃ ২।৩ থানি বা তদধিক লেপ দ্বারা তাহার কম্পদূর করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু যদি এইরূপ লেপ চাপা দিয়াও কম্পের কিছুমাত্র হ্রাস না হয়, অথচ কম্পজন্য রোগী ক্রমশঃ অধিক যাতনার অনুভব করিতে থাকে, তথন অবশ্য অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। এই উপায় দুই রকমে হইতে পারে। এক বাহ্যিক, অপর আভ্যন্তরিক। তন্মধ্যে বাহ্যিক উত্তাপ প্রয়োগের জন্য গরম জল বোতলে পূরিয়া সেই বোতল রোগীর হস্তপদাদিতে বুলাইতে থাকিবে। যদি বোতলের উত্তাপ অধিক

বোধ হয়, তবে ঐ বোতলে কাপড় বা ন্যাকড়া জড়াইয়া উত্তাপ সহ্য হয়, এমত ভাবে তাপ দিবে। গমের ভূষি কিম্বা বালুকা ভাজিয়া ন্যাকড়ার পুঁটলী বাঁধিয়া তদ্দ্বারা উত্তাপ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, এই সকল বস্তুর অভাব হইলে ইট্ গরম করিয়া কিম্বা ইট্ অভাবে কেবল শুষ্ক মৃত্তিকা ভাজিয়া ও পুঁটলী করিয়া তদ্দ্বারা তাপ দেওয়া যাইতে পারে।

আভ্যন্তরিক উত্তাপ প্রয়োগের জন্য তুল্যপরিমাণে দুগ্ধজল একত্রে সিদ্ধ করিয়া যতটা গরম সহ্য হয়, তদনুসারে পুনঃ পুনঃ পান করিতে দিবে। কিংবা উষ্ণজলে চা' ফেলিয়া সেই জল অথবা এই জল দুগ্ধের ও শর্করার সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ অবস্থায় পান করাইবে। এইরূপ নিয়মে কাপিও ব্যবহার করা যাইতে পারে। যদি এ সকল বস্তুরও অভাব হয়, তবে শুদ্ধ গরম জল পান করাইলেও কম্পের হ্রাস হইতে পারে। অনেক সময় কম্পাবস্থায় এক আউন্স ব্রাণ্ডী গরমজলের সহিত মিশাইয়া প্রয়োগ করিলে কম্পের হ্রাস হইতে পারে। কিন্তু আমি কম্প হ্রাসের জন্য ব্রাণ্ডী প্রয়োগের পক্ষপাতী নহি। কারণ যদি রোগীর আভ্যন্তরিক যান্ত্রিক কন্‌জেস্‌সন্ বা রক্তাধিক্য এবং ইন্‌ফ্লামেসন্ বা প্রদাহের সূচনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রাণ্ডীপ্রয়োগে উত্তাপাবস্থায় সেই সকল কন্‌জেস্‌সন্ বা রক্তাধিক্য ও ইন্‌ফ্লামেসন্ বা প্রদাহ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। কেহ কেহ বলেন যে, এই কম্প হ্রাসের জন্য অহিফেন এবং তাহার প্রয়োগরূপ সকল বিশেষ উপযোগী, কিন্তু আমি উহা ব্যবহার করিয়া কোনও উপকার পাই নাই, সুতরাং তাহা ব্যবহার করিতেও পরামর্শ দিই না। পূর্ব্বোক্ত উপায় সকল অবলম্বন ব্যতীত কম্পের সময় রোগীকে গরম জলের ডবে গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসাইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একবারে কম্পের নিবারণ হয়। কিন্তু এই উপায় অবলম্বন করিয়া কম্প নিবারণ করা উচিত নহে। কারণ এই উষ্ণজলে বসিয়া থাকিতে থাকিতে রোগীর সহসা মূর্চ্ছা ঘটিতে পারে। আর স্বভাবতঃ এই উপায়ে রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াও পড়ে।

২য় উত্তাপাবস্থা।

উত্তাপাবস্থায় শুদ্ধ স্নায়ূশূলবশতঃ শিরঃপীড়া অতিরিক্ত হইলে বেলে-ডোনা প্ল্যাষ্টার দুইরগে বসাইলে শীঘ্র শীঘ্র শিরঃপীড়ার উপশম হইতে পারে।

কিন্তু যদি মস্তিষ্কে অথবা মস্তিষ্কাবরকসমূহে রক্তাধিক্য বা প্রদাহজন্য শিরঃপীড়া থাকে, তাহা হইলে বেলেডোনা দ্বারা কোনও ফল পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। এই উত্তাপাবস্থায় পিপাসা জন্য পুনঃ পুনঃ শীতল জল পান কিম্বা বরফের কুচি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সোডাওয়াটার বরফের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিলেও অনেক সময় পিপাসার শান্তি হয়। কিন্তু যেখানে সোডাওয়াটার বা বরফের অভাব হয়, সেস্থলে শীতল জলে কাগচী বা পাতিলেবুর অল্প পরিমাণে রস দিয়া পান করিতে দিলেও খুব্ অল্প সময়ের মধ্যে পিপাসার শান্তি হয় এবং ইহা দ্বারা বমনোদ্রেকও নিবারণ হইতে পারে। সেইরূপ অল্প পরিমাণে পাকা তেঁতুল, জলের সহিত এমত ভাবে গুলিয়া লওয়া আবশ্যক, যেন তাহাতে অম্লরস অধিক না হয়। অনন্তর উহা অথবা ইহাতে অল্প চিনি বা মিশ্রী মিশাইয়া রোগীকে অল্পমাত্রায় পুনঃ পুনঃ পান করিতে দিলে পিপাসার শান্তি হয়। কিন্তু ইহার ঐকটী দোষ আছে। ইহা দ্বারা যদিও সে সময় পিপাসার শান্তি হয়। কিন্তু পরে উদর ভারবোধ হয়, এবং তজ্জন্য রোগী কতকটা অসুস্থতাও অনুভব করে। যদি সোডাওয়াটার এবং বরফ পাওয়া যায়, তবে উহাদের সহিত পাতলা দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিলে তদ্দ্বারা রোগীর পিপাসার শান্তি হইয়া তাহার পক্ষে আহার ও ঔষধ উভয়েরই কাজ করে। তদ্ভিন্ন পিপাসাশান্তির জন্য অল্প অল্প অম্লরসযুক্ত ফল যথা—সুপক্ক আনারস, বেদানা বা সুপক্ক দাড়িম, আঙুর, কমলালেবু, পাতি বা কাগচী লেবুর রসের সহিত মিশ্রী বা চিনিপানা, ডাঁশা পেয়ারা ও আমলকী প্রভৃতি উপস্থিত মত দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত আক, পাণিফল, কেশুর, খেজুরমাথী ও তালের আঠী ইত্যাদি প্রয়োগ করিলে কথঞ্চিৎ পরিমাণে পিপাসার শান্তি হইতে পারে। কিন্তু যদি বক্ষঃগহ্বরস্থিত কোন যন্ত্রে রক্তাধিক্য বা প্রদাহ উপস্থিত থাকে, তবে অম্লরস সংযুক্ত পানীয় বা পথ্য এবং অম্লরস ঔষধ নিষিদ্ধ। আমরা চলিত কথায় সচরাচর যাহাকে শ্লেষ্মাধিক্য অবস্থা বলি, সেইরূপ অবস্থাতেও ঐ সকল অম্লরস সংযুক্ত পানীয়, পথ্য ও ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে। অনেক দিন চিকিৎসা করিয়া আমার এইরূপ ধারণা হইয়াছে যে, শ্বাসনালী প্রদাহে, ফুস্ফুস্ প্রদাহে, এবং

ফুস্ফুস্ আবরক প্রদাহে, কিম্বা হৃৎপিণ্ড ও হৃৎপিণ্ড আবরক প্রদাহে কোন রকম দ্রাবক বা য়্যাসিড্ প্রয়োগে বিশেষ অপকার করে। একারণবশতঃ আমি ঐ সকল অবস্থাতে দ্রাবক বা য়্যাসিড্ অথবা অম্লরসসংযুক্ত আহার্য্যও পানীয় বস্তু প্রয়োগ করি না।

পিপাসা ও গাত্রদাহনিবারণ জন্য আমি নিম্ন লিখিত প্রয়োগরূপ সচরাচর ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকি।

য়্যাসিড্ সাইট্রিক্—	৮ গ্রেণ
টীঞ্চার ড়িজিটেলিস্—	৫ ফোঁটা
স্পিরিট্ ঈথার নাইট্রিক্—	২০ ফোঁটা
টীঞ্চার হায়েসায়েমস্—	২৫ ঐ
একোয়া অরেন্সিয়াই বা গোলাপ জল	১ আউন্স

এই সমুদায় ঔষধ একত্রে মিশ্রিত করিয়া একমাত্রা প্রস্তুত করিবে। আর ১২ গ্রেণ সোডাবাই কার্ব্বের একটী পুরিয়া প্রস্তুত করিয়া আলাহিদা রাখিবে। প্রয়োগের সময় ঐ একমাত্রা আরকের সহিত উপরোক্ত পুরিয়াটী ফেলিয়া দিয়া নাড়িয়া সেবন করিতে দিবে। এইরূপ প্রকার দুই দুই ঘণ্টান্তর যতক্ষণ না পিপাসা ও গাত্রদাহের শান্তি হয়, ততক্ষণ প্রয়োগ করিতে থাকিবে। যদ্যপি এই ঔষধের আস্বাদ রোগীর ভাল না লাগে, তবে ঐ পূর্ব্বোক্ত মিশ্র বা আরকের সহিত একড্রাম করিয়া সিরাপ্ অরেন্ সিয়াই বা কমলালেবুর ত্বকের পাক কিংবা একড্রাম সিরাপ্ রোজ বা গোলাপের পাক পূর্ব্বোক্ত একোয়া অরেন্সিয়াই বা একোয়া রোজের সহিত স্থান বিশেষে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবে। যদি পিপাসার সহিত বমনোদ্রেক থাকে, তাহাহইলে ঐ পূর্ব্বোক্ত সোডার পুরিয়ার সহিত ১০ গ্রেণ করিয়া ট্রিস্ বা সব্নাইট্রেট্ অব্ বিস্মথ মিলাইয়া পুরিয়া বাঁধিয়া লইবে। আর প্রয়োগের সময় এই পুরিয়া পূর্ব্বোক্ত আরকের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে পিপাসা ও বমনোদ্রেক এই দুয়েরই নিবারণ হইবেক। যদি বমন না থাকিয়া কেবল মস্তকে বেদনা বা গাত্রদাহ থাকে, তাহাহইলে নিম্ন লিখিত ঔষধ ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায়।

লাইকার্ য়্যামোনি য়্যাসিটেটিস্—	১।৷০ ড্রাম
স্পিরিট্ ঈথার্ নাইট্রিক্—	২০ ফোঁটা
পটাশ্ ব্রোমাইড্	১০ গ্রেণ হইতে ২০ গ্রেণ পর্য্যন্ত
স্পিরিট্ য়্যামোনিয়া য়্যারোম্যাটিক্	২০ ফোঁটা
টীঞ্চার বেলেডোনা	৬ কি ৭ ফোঁটা
জল বা একোয়া ক্যাম্ফর	১ আউন্স।

এই সকল একত্র করিয়া মিশ্রিত করতঃ একমাত্রা প্রস্তুত করিবে। ইহা দুই দুই ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করিলে গাত্রদাহ ও শিরঃপীড়ার নিবারণ হইবে এবং রোগী ঘুমাইবেক।

উত্তাপাবস্থায় সবিরামজ্বরে তাপমান যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, সচরাচর উত্তাপ ১০২ হইতে ১০৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত পারা উঠিতে পারে। ইহার অধিকও কথন কথন উঠিয়া থাকে। কিন্তু যখন ১০৮ ডিগ্রীর উপর পারা উঠিতে দেখা যায়, তখন সে রোগীর প্রায়ই জীবনে আশা থাকে না। এই জন্য অতিরিক্ত উত্তাপ দেখিলে যে সকল উপায়দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র উত্তাপ কমান যায়, সর্ব্বাগ্রে তাহা অবলম্বন করা চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

ক্রমশঃ—

কলিকাতা
কার্ত্তিক } শ্রীজগদ্বন্ধু বসু এম্, ডি,

হোমিওপ্যাথি মতে জ্বরচিকিৎসা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, চিকিৎসা-সম্মিলনীতে কবিরাজী এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার আলোচনা করিব। কিন্তু এলোপ্যাথি চিকিৎসা-বিষয়ে আরও দুইএকটী কথা না বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। আধুনিক এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা একোনাইট্ (অমৃতবিষ) এবং বেলেডোনা সর্ব্বপ্রকার জ্বরে ব্যবহার করেন ; কিন্তু কি উদ্দেশ্যে যে, এই দুই ঔষধ ব্যবহার করেন, তাহা স্থির করা সুকঠিন। বোধ হয় উক্ত দুই ঔষধ প্রদাহ-নিবারণ করে বলিয়া তাঁহারা ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু যেরূপ মাত্রায় তাঁহারা ব্যবহার করেন, তাহাতে তাঁহাদের অভিপ্রেত ফল না ফলিয়া বরং বিষময় ফল ফলিতে দেখা যায়। এরূপ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, একোনাইট্ প্রয়োগের পর রোগীর অবস্থা এরূপ বিকৃত হইয়া যায় যে, গৃহস্থ বাধ্য হইয়া অন্যান্য উপায় অবলম্বন করেন। পূর্ব্বে রক্তমোক্ষণ, জোঁকপ্রয়োগ এবং ব্লিষ্টার প্রভৃতি যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত, তৎপরিবর্ত্তে আধুনিক এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা একোনাইট্ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, একোনাইট্ হৃৎপিণ্ডের অবসাদক। ইহা রক্তের গতির প্রবলতা কমাইয়া জ্বরের হ্রাসতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করে। কিন্তু বিষাক্ত মাত্রায় প্রয়োগনিবন্ধন উহাতে বিপরীত ফল উৎপাদিত হয়। রোগীর শরীরের পেশী সকলের কম্পন এবং রোগীর সময় সময় চম্‌কে ওঠা ও অন্যান্য অসুস্থতা প্রকাশ পায়।

বেলেডোনাও একোনাইটের ন্যায় প্রদাহ নিবারক এবং হৃৎপিণ্ডের অবসাদক বলিয়া তাঁহারা ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ প্রয়োগ ন্যায়-সঙ্গত নহে। প্রলাপের সময় উহার ব্যবহার যুক্তিযুক্ত। কিন্তু উহার মাত্রার আধিক্যনিবন্ধন রোগীর পীড়ার কোনও উপশম না হইয়া বরং

রোগের বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। এমন কি ইহা ক্রমান্বয়ে প্রয়োগ করিবার পর রোগীর ঘোরতর প্রলাপ উপস্থিত হইতে দেখা গিয়াছে। রোগীর এরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা ঘটিলে এলোপ্যাথি চিকিৎসকেরা তখন ব্যাকুল হইয়া মস্তকে এবং ঘাড়ে ব্লিষ্টার লাগান এবং মনে করেন যে, রোগী প্রলাপ হইতে মুক্ত হইবেক এবং ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ করিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হিক্কা উপস্থিত হইয়া রোগীর প্রাণবিনাশ করে। একোনাইট্ এবং বেলেডোনার অপব্যবহারে যে এরূপ ফল সংঘটিত হয়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থানুসারে যদি উক্ত দুইটী ঔষধ জ্বর-রোগে ব্যবহার করা যায়, তাহাহইলে সুফল ফলিবার বিশেষ সম্ভাবনা। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ লইয়া এলোপ্যাথিক মতে ব্যবহার করিলে কেবল অনিষ্টেরই সম্ভাবনা। ডাং রিঙ্গার, ডাং লডার ব্রণ্টন্, ডাং মার্টিণ্ডেল্ ও ডাংওয়েষ্টকট্ প্রভৃতি সাহেবসমূহের নব্য ব্যবস্থামতে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের কার্য্যকরা কর্ত্তব্য। ক্রমশঃ—

কলিকাতা
কার্ত্তিক } শ্রীহরনাথ রায়। এল্, এম্, এস।
হোমিওপ্যাথিক প্রাক্টীসনার।

বৈদ্যমতে পুরাতন জ্বর।

প্রথমখণ্ডে প্রকাশিত ৩২৩ পৃষ্ঠার পর।

ইতিপূর্ব্বে চিকিৎসা-সম্মিলনীর প্রথমখণ্ডে বৈদ্যমতে নূতনজ্বরের লক্ষণ এবং বৈদিক ও তান্ত্রিক চিকিৎসা এই উভয়ের বিষয় বিশেষ রূপে বিবৃত করা গিয়াছে, কিন্তু পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে যে, নূতনজ্বর লক্ষ্য করিয়া তাহার যেমন লক্ষণ ও চিকিৎসা প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ লেখা গিয়াছিল, দুঃখের বিষয় এই যে, পুরাতন জ্বরসম্বন্ধে সে তুলনায় কিছুই বলা হয় নাই। লক্ষণসম্বন্ধে ত কিছুমাত্রই বলা হয় নাই, তবে

চিকিৎসাসম্বন্ধে কেবলমাত্র শিউলিপাতাদি কয়েকটী গাছড়া ঔষধ ও দাস্যাদি নামক ২।১ টী পাঁচনের বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছিল। যাহা হউক, অতঃপর বৈদ্যমতে পুরাতন জ্বরের লক্ষণ ও চিকিৎসার বিষয় ক্রমশঃ লিখিতে ইচ্ছা করিয়া অগ্রে লক্ষণের বিষয় বলিতে আরম্ভ করা গেল।

বিষমজ্বর কি ?

সেকালের বিষমজ্বরই একালের ম্যালিরিয়া জ্বর কি না ?

দুইটী প্রধান বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই প্রবন্ধটীর অবতারণা করা যাইতেছে, ১ম কথা—বিষমজ্বর ব্যাপারটা কি ? আর ২য় কথা—আধুনিক নব্যতন্ত্রের ইণ্টারমিটেণ্ট ফীবার বা ম্যালেরিয়া জ্বরই সে কালের আখ্যাত বিষম জ্বর কিনা ? তন্মধ্যে অগ্রে ১মটীই আলোচ্য।

বিষমজ্বরের শাস্ত্রগত অর্থ করিতে গেলে অনিয়মিত সময় ও বেগ-জাত সাধারণ পুরাতন জ্বর ভিন্ন ইহা আর অন্য কিছুই নহে। কিন্তু জানি না ঠিক্ কোন্ কারণ হইতে এই বিষম জ্বর শব্দটী বঙ্গদেশীয় আবাল, বৃদ্ধ বনিতা সাধারণের নিকট অতি ভয়াবহ বলিয়া আখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, কালে কালে এই মিথ্যা জনরব এতদূর বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে যে, সাধারণে বিষম জ্বরের নাম শুনিবামাত্রেই শিহরিয়া উঠেন। ২।৪ জন কবিরাজ ভিন্ন প্রায় সকল লোকেরই সংস্কার এই যে, পুরাতন জ্বরে ভুগিতে ভুগিতে রোগী যখন নিতান্ত জীর্ণ শীর্ণ হইয়া অন্তিমাবস্থায় উপস্থিত হয়, তখনই তাহাকে "বিষম জ্বর" বলে। আর বঙ্গীয় স্ত্রীলোকমহলে এই বিষমজ্বর শব্দটী এমনই ভয়ানক বলিয়া স্থিরীকৃত হয় যে, কোন ব্যক্তির ইহা হইলে তাঁহার আর বাঁচা সুকঠিন। ইত্যাদি প্রকার বিষমজ্বর লইয়া আমাদের দেশের প্রায় সকল লোকের মধ্যেই উক্তরূপ ভয়ানক কুসংস্কার প্রচলিত আছে। বাস্তবিক কিন্তু বিষমজ্বরমাত্রেতেই এতদূর ভয়ানকত্ব কিছুই নাই। তবে মজ্জা ও শুক্রগত বিষমজ্বরে অবশ্য কিছু আশঙ্কার কথা। যাহা হউক, এলোপ্যাথেরা যে সমুদায় জ্বরকে ম্যালেরিয়া বা ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আর কবিরাজী মতে যাহাকে পুরাতন জ্বর বলে, সেই সমস্তই বিষমজ্বর বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। কেন পারে তাহা বলিতেছি। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

দোষহল্পোহহিতসংভূতো জ্বরোৎসৃষ্টস্য বা পুনঃ।
ধাতুমন্যতমং প্রাপ্য করোতি বিষমজ্বরং ॥

সন্ততমিত্যাদি।

অর্থাৎ যাহার শরীরে অত্যল্পমাত্র প্রকুপিত দোষ (বাতাদি) বা জ্বরাংশ বর্ত্তমান আছে, অথবা যে ব্যক্তির নূতন জ্বরের শান্তি অতি অল্পদিন মাত্র হইয়াছে, এইরূপ ব্যক্তির সেই অবস্থায় আহারাদির বিশেষ কোন অত্যাচার ঘটিলে তাহার শরীরস্থ বাতাদিদোষ কুপিত এবং রক্তাদি ধাতুকে আশ্রয় করিয়া যে সন্ততাদি জ্বর জন্মায়, তাহার নাম বিষমজ্বর বা পুরাতন জ্বর।

যঃস্যাদনিয়তাৎ কালাৎ শীতোষ্ণাভ্যাং তথৈবচ।
বেগতশ্চাপি বিষমঃ জ্বরঃ স বিষমঃ স্মৃতঃ ॥

অর্থাৎ যে জ্বরের সময়ের ঠিক্ নাই (আজ্ সকালে, অন্যদিন বৈকালে কোন দিন বা রাত্রে ইত্যাদি) শীতোষ্ণসম্বন্ধেও সেইরূপ (কখন অত্যন্ত শীত এবং কখন বা অত্যন্ত গাত্রজ্বালার সহিত) এবং জ্বরবেগেরও স্থিরতা নাই (কখন খুব্ জোরের সহিত জ্বর আইসে, কখন বা খুব্ অল্পমাত্রায় জ্বর প্রকাশ পায়) তাহাকেই বিষমজ্বর বা পুরাতন জ্বর বলে। এই বিষমজ্বর আবার সন্ততঃ, সততক, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চাতুর্থক, চাতুর্থকবিপর্য্যয়, প্রলেপক, রসগত ও রক্তগত প্রভৃতি নানাবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অবশ্য এসমস্ত জ্বরের বিশেষ বিবরণ কিছু পরেই বলা যাইবেক। এখন কথা এই যে, সাধারণ বিষমজ্বর মাত্রকেই লোকে যতটা ভয়ানক বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ কিন্তু তাহা যে ঠিক্ নহে, ইহা বলা বাহুল্য। আর মজ্জা ও শুক্রগত ২।৩ টী বিষম জ্বর যে কিছু ভয়ানক, তাহাও বলা হইল।

এখন দেখা যাউক, সে কালের সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ণিত বিষমজ্বরই একালের বর্ণিত ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার বা ম্যালেরিয়া জ্বর বলিয়া অভিহিত হইতে পারে কি না? আবার একথা বলিবার পূর্ব্বে অগ্রে ইহা দেখা আবশ্যক যে, বহুকাল পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র ম্যালেরিয়া গোচের কোন বিষাক্ত জ্বরের নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন কি না? ক্রমে বড়

কঠিন প্রশ্নে আসিয়া পড়িলাম। জানিনা এরূপ গুরুতর প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া যাইতে পারিবে কি না?

সম্ভবতঃ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে আধুনিক আখ্যাত ম্যালেরিয়া গোচের জ্বর যে, সে কালেও জন্মিত ইহা প্রধানতঃ দুই রকমে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। কেবল ম্যালেরিয়া বলিয়া কেন, ম্যালিরিয়াজ্বর ও ওলাউঠা এই উভয়কেই সেকালের প্রাচীন রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যাঁহারা বেশ ধীরভাবে মনোযোগের সহিত আয়ুর্ব্বেদীয় চরক সংহিতার বিমান স্থানের জনপদোদ্ধংসনীয় নামক ৩য় অধ্যায়টী পড়িয়া দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর এ সম্বন্ধে কিছুই বলিবার নাই, তবে যাঁহারা চরকসংহিতা পাঠ করেন নাই, অবশ্য তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য এস্থলে কিছু বলা আবশ্যক। চরক বলেন—সাধারণতঃ রোগোৎপত্তির কারণ দুই প্রকার, সামান্য এবং প্রধান। তন্মধ্যে সাধারণ কারণ—বাতপিত্তাদির প্রকোপজনক আহার বিহারাদি, অপর অসাধারণ কারণ—জল, বায়ু, দেশ এবং কাল প্রভৃতি একদা দূষিত হইয়া বহুল ব্যাধির কারণে পরিণত হওয়া। ফলতঃ দূষিত জলবায়ুই যদি ম্যালেরিয়া বিষের কারণ হয়, তবে বৈদ্যশাস্ত্রও তাহাই প্রতিপন্ন করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ, কেন সমর্থ তাহা দেখুন—চরক বলেন—

> ইমানেবং যুক্তাংশ্চতুরোভাবান্ জনপদোদ্ধং-
> সকরান্ বদন্তি কুশলাঃ।

অর্থাৎ পণ্ডিতেরা নিম্নলিখিত জল, বায়ু, দেশ এবং কাল এই চারি প্রকার দূষিত হইলে তাহাদ্বারা জনপদধ্বংসের (মড়ক) সম্ভাবনা বলিয়া স্থির করেন, তন্মধ্যে—

> ১। তত্র বাতমেবং বিধমনারোগ্যকরং-
> বিদ্যাৎ। তদ্‌যথা—ঋতুবিষমমতিস্তিমিত—
> মতিচঞ্চল মিত্যাদি।
> ২। উদকন্তু খলু অত্যর্থবিকৃতগন্ধবর্ণরস-
> স্পর্শবৎক্লেদবহুল মিত্যাদি—

৩। দেশং পুনঃ প্রকৃতিবিকৃতি বর্ণগন্ধরস-স্পর্শংক্লেদবহুলমুপসৃষ্টমিত্যাদি—

৪। কালস্তুখলুযথর্ত্তুলিঙ্গাদ্বিপরীতলিঙ্গমতি-লিঙ্গং হীনলিঙ্গঞ্চাহিতং ব্যবস্যেৎ।

অর্থাৎ বায়ু যদি অস্বাভাবিক ঋতুগুণ বিশিষ্ট, সর্ব্বদা অতিশয় জল-সংসিক্ত, অতি চঞ্চল, অতি পরুশ, অতিশীতল, অতি উষ্ণ ইত্যাদি হয় (১)।

জল যদি অতিশয় বিকৃত গন্ধ, বর্ণ, রস এবং স্পর্শযুক্ত, অতিশয় ক্লেদ-বিশিষ্ট ইত্যাদি হয় (২)।

দেশ যদি অস্বাভাবিক বর্ণ, গন্ধ, রস, এবং স্পর্শযুক্ত ও অতিশয় ক্লেদ-বিশিষ্ট ইত্যাদি হয় (৩)।

কাল যদি ঋতুবিপর্য্যয় অর্থাৎ যে কালের যে সকল লক্ষণ, তাহার বিপরীত অথবা তত্তৎ লক্ষণের হীনতা কিংবা আতিশয্য দৃষ্ট হয় (৪)।

এক সময়ে এই চারিটী দূষিত হইলে তদ্দ্বারা নানাবিধ পীড়া হইয়া জন-পদ সমূহ একবারে ধ্বংস প্রাপ্ত অর্থাৎ মানবশূন্য হইয়া পড়ে। এখন পাঠকগণ, বুঝুন জলবায়ুর দোষে যে ম্যালেরিয়া বা ওলাউঠা বিষ উৎপন্ন হইয়া রাশি রাশি লোক মৃত্যুগ্রাসে পড়ে বলিয়া আধুনিক বিদেশীয়গণ স্থির করিতেছেন, বহুকাল পূর্ব্বেও যে দেশীয় শাস্ত্রকারগণ একথা তারস্বরে ঘোষণা করিয়াগিয়াছেন, ইহা সত্য কিনা। তবে অবশ্য ইহার মধ্যে একটী কথা আছে, তখনকার কেবল এই মাত্রই বলা হইয়াছে যে, জল বায়ুপ্রভৃতি অত্যন্ত দূষিত হইলে নানাবিধ পীড়া হইয়া তদ্দ্বারা জনপদকি জনপদ, নগর কি নগর ও গ্রামকি গ্রাম একবারে উৎসন্ন যাইতে পারে। আর এখনকার মহাত্মাগণের মত এই যে, দূষিত জল বায়ু হইতে একপ্রকার বিষ উৎপন্ন হইয়া সেই বিষ মনুষ্য দেহে বায়ুযোগে সঞ্চালিত হওতঃ ওলাউঠা ও ম্যালেরিয়া জন্মে। কিন্তু কেন বাপু, কেবল যে সেই বিষ হইতে ম্যালেরিয়া ও ওলাউ-ঠাই জন্মে, অন্যান্য নানাবিধ নূতন রকমের রোগ যে তদ্দ্বারা হইতে পারে না, সে কথা কে বলিল? এই যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ডেঙ্গুজ্বর নামক এক

প্রকার ব্যাধি বঙ্গদেশের প্রত্যেক ব্যক্তিকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাতন করিয়া গেল—এই যে দেশবিশেষে এক এক সময় এক এক নূতন রোগের সহসা গলাফুলিয়া মৃত্যু হওয়া প্রভৃতি অদ্ভুত গোচের রোগ উপস্থিত হইয়া শত সহস্র ব্যক্তিকে জমালয়ে প্রেরণ করে, ইহার কারণ কি বলিব? ইহাদের কারণও যে দূষিত জল বায়ু একথা কেন না স্বীকার করিতে পারি? তবে শাস্ত্রের অপরাধ এই যে, জনপদোধ্বংসনীয় অধ্যায়ের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ২।৪ টী রোগেরও উল্লেখ না করা। বাস্তবিক যদি সেই সময় তাঁহারা উক্ত অধ্যায়ের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ওলাউঠা ইত্যাদি ২।৪ টী রোগেরও বর্ণন করিয়া যাইতেন, তাঁহা হইলে বোধ হয় সকল পাপাই চুকিয়া যাইত। ফলতঃ যিনি যাহাই বলুন, কিন্তু দুষিত জল বায়ুই যদি বর্ত্তমান ম্যালেরিয়া বা ওলাউঠার প্রকৃত কারণ হয়, তবে প্রাচীন বৈদ্যশাস্ত্রও তাহা প্রতিপাদন করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ কি না, তাহা সুবিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীই বিবেচনা করিবেন। অতঃপর দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার (সবিরাম জ্বর) বা ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ অন্য কিছু হইতে পারে কি না?

ক্রমশঃ—

নূতনজ্বর।

বাতজ্বর।

(প্রাপ্ত)

পৌরাণিকী গণনানুসারে রথযাত্রার পূর্ব্ব শুক্লা একাদশী হইতে রাস পূর্ণিমার পূর্ব্ব শুক্লা একাদশী পর্য্যন্ত চারিমাসকাল শয়ন কাল। এইকাল ব্যাপিয়া আমাদের দেশে প্রায়ই বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে; নিম্নস্থান জলমগ্ন হইয়া যায়; নানাবিধ উদ্ভিদ পচিলে তাহা হইতে বিষবৎ বাষ্প উত্থিত হইতে থাকে। অধিকাংশ বাসগৃহের ভিত্তি সিক্ত হওয়াতে সর্ব্বদা সর্দ্দি উঠিতে থাকে; হীনাবস্থাপন্ন লোকদিগকে সর্ব্বদা জল ও কর্দ্দমময় পথে গমনাগমন, সিক্ত বায়ু প্রবাহ সেবন এবং জলাভূমিতে কার্য্য করিতে হয়; অনেক সময় অস্বাস্থ্যকর পূর্ব্ব বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে; বিশেষতঃ

বর্ষাকালে জলের অম্লপাক হয়, এবং স্বভাবতঃ বায়ুর প্রকোপ, শরৎকালে পিত্তের প্রাকৃত প্রদুষ্টতা ইত্যাদি কারণে এইকাল অতীব অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। শয়নকাল এইরূপ অস্বাস্থ্যকর বলিয়া আর্য্য ঋষিরা এইকালে চাতুর্মাস্য ব্রতাবলম্বন করিতে বিধি দিয়াছেন।

শয়নকালে সচরাচর যে সকল পীড়া হইতে দেখা যায়, তন্মধ্যে বাতজ্বর অন্যতম। অন্যকালে বাতজ্বর হয় না—কিম্বা শয়নকালে বাতজ্বর ভিন্ন অন্য জ্বর হয় না, এরূপ বুঝিতে হইবে না। তবে এ সময় বাতজ্বরে আক্রান্ত হইতে যত দেখা যায়, অন্য কোন সময়ে তত দেখা যায় না।

জ্বরারম্ভক দোষ—বায়ু এবং বায়ুর প্রাধান্য হেতু এই জ্বর বাতজ্বর নামে অভিহিত হয়। পিত্ত এবং কফ এই জ্বরে অনুবন্ধ থাকিতে পারে। বাতজ্বরারম্ভক বায়ুর প্রকোপ বিষয়ে নানাবিধ হেতুর মধ্যে বিবিধ প্রকার গলিত পদার্থোত্থিত বাষ্পকে প্রধান হেতু বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই বায়ু ভূবায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া নিশ্বাস সহ ফুস্‌ফুসে প্রবিষ্ট এবং ত্বক দ্বারা শোষিত হইলে শারীর বায়ুকে দূষিত করে। সেই প্রদুষ্ট বায়ু আমাশয় আশ্রয় করতঃ আমরসের অনুগ হইলে জ্বরোৎপাদন করিয়া থাকে।

বাতজ্বরের লক্ষণ যথা ;—

"বেপথু র্বিষমো বেগঃ কণ্ঠৌষ্ঠ পরিশোষণং।
নিদ্রানাশঃ ক্ষবস্তম্ভো গাত্রাণাং রৌক্ষ্যমেবচ ॥
শিরোহৃদ্‌গাত্ররুগ্বক্ত্রে বৈরস্যং গাঢ়বিট্‌কতা।
শূলাধ্মানে জৃম্ভনঞ্চ ভবত্যনিলজে জ্বরে ॥"

বেপথু ;—বেপ্‌ধাতুর অর্থ কম্পন। তার পর অথু প্রত্যয়। অথু ভাব বিহিত প্রত্যয়, সুতরাং বেপথু অর্থে কম্পন মাত্র বুঝিতে হইবে।

জ্বরারম্ভক প্রদুষ্ট বায়ুর শীতগুণের বাহুল্য হেতু বেপথু উপস্থিত হইয়া থাকে এবং সেই শীতগুণের নূন্যাধিক্য বশতঃ কম্পেরও তারতম্য হয়। জ্বরারম্ভকালে প্রকুপিত বায়ু স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ করিলে পৈশিক ক্ষোভ উপস্থিত হয় এবং মুহুর্মুহু পেশিমণ্ডল আক্ষিপ্ত করিয়া বেপথু উৎপাদন করে। এইরূপ বিক্ষোভের পূর্ব্ব হইতেই হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া মৃদু হয়, সুতরাং শরীরের

দূরতম প্রদেশে সম্যক্‌রূপে রক্ত চালিত হয় না। এজন্য কম্পের পূর্ব্বে হাত, পা, কর্ণপালি এবং নাসিকার অগ্রভাগ শীতল হয়।

বেপথু অবস্থায় পিপাসা উপস্থিত হইয়া থাকে। পৈশিক বিক্ষোভই এই পিপাসার কারণ। যে অঙ্গ যত সঞ্চালিত হয়, পরিপোষণার্থ সেই অঙ্গে তত রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। কম্পাবস্থায় সার্ব্বাঙ্গিক পেশিমণ্ডল বিক্ষোভিত হইতে থাকে, সুতরাং রক্তস্রোতঃ প্রবাহিত হইয়া তাহাদিগকে সজীব করিতে চেষ্টা করে। এদিকে ব্যয়িত রক্তের রাশি ঠিক রাখিবার জন্য জলের প্রয়োজন হয়, সুতরাং পিপাসা উপস্থিত হইতে থাকে। কিন্তু আমাশয়াদির বিক্ষোভবশতঃ পীতজল উদরস্থ থাকিতে পারে না, পুনঃ পুনঃ বমন হইয়া উঠিয়া যায়। বমনের সঙ্গে সঙ্গে পিত্ত, শ্লেষ্মা এবং উদরস্থ অন্নাদিও উঠিয়া থাকে। এই শীতলাবস্থা অধিককাল স্থায়ী হয় না; হৃৎপিণ্ডের প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইলেই জ্বরসন্তাপ উপস্থিত হয়।

বিষমবেগ ;—জ্বরের প্রবৃত্তি বা বৃদ্ধিকে বেগ বলে। বেগের অনিয়তত্ব ঘটিলে বিষমবেগ বলা যায়। বাতজ্বরে বেগবৈষম্য নিবন্ধন প্রত্যহ এক সময় জ্বর আসে না, সকল দিন জ্বরসন্তাপেরও তুল্যতা থাকে না। একদিন পূর্ব্বাহ্ণে তৎপর দিন অপরাহ্ণে জ্বর আসিতে সচরাচর দেখা যায়। যে দিন পূর্ব্বাহ্ণে জ্বর আইসে, সে দিন জ্বরের সন্তাপও বেশী হয়, যে দিন অপরাহ্ণে জ্বরবেগ উপস্থিত হয়, সে দিন জ্বরের তাপও কম থাকে। কিন্তু তাপ কম হইলেও সে দিনকার জ্বর কম পড়ে না; অল্প পরিমাণে সন্তাপের হ্রাস হইলেও অনেক স্থলে দেখা গিয়া থাকে; কিন্তু জ্বর এককালীন বিচ্ছেদ পায় না। পর দিন প্রবলবেগে জ্বর আসিয়া জ্বর সন্তাপ খুব্ কম পড়িয়া যায় বা এক কালীন বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ বৈষম্যভাবে অথচ পর্য্যায় বাঁধিয়া বাতজ্বর ভোগ করিতে সচরাচর দেখা যায়। বায়ুর অনিয়তকারিত্বপ্রযুক্ত এরূপ ক্রমেরও বৈষম্য ঘটিতে পারে।

কণ্ঠৌষ্ঠপরিশোষণ—গাত্ররৌক্ষ্য—গাঢ়বিট্‌কতা ;—এই ত্রিবিধ লক্ষণ বায়ুর রৌক্ষ্যগুণবশতঃ ঘটিয়া থাকে; কেবল দোষের স্থানসংশ্রয়ের ব্যতিক্রমে মাত্র।

(১) যখন বায়ু, মুখমণ্ডলাদিস্থ লালাস্রাব গ্রন্থি আশ্রয় করিয়া তাহাদিগের ক্রিয়ার ব্যাঘাত করে, তখন কণ্ঠ এবং ওষ্ঠ প্রভৃতির শোষ উপস্থিত হয়। (২) প্রদুষ্ট বায়ু ত্বঙ্মণ্ডল আশ্রয় করতঃ তথাকার ধমনী বিততার রক্ত-স্রোতঃ রোধ করিলে ত্বকের রৌক্ষ্য বা পরুষতা ঘটিয়া থাকে। (৩) রুক্ষগুণ বহুল কুপিত বায়ু, অন্ত্রস্থ শ্লেষ্মধরা কলা সমূহের স্রাবণ ক্রিয়া হ্রাস করিলে গাঢ়বিট্‌কতা বা মলের কঠিনতা জন্মায়।

নিদ্রানাশ;—"নিদ্রা শ্লেষ্মাতমোভবা" সুতরাং দোষত্রয়ের মধ্যে তমো-গুণ এই উভয় পদার্থ বিকৃত হইলে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। বাতজ্বরে প্রদুষ্ট বায়ুর রজঃ এবং রুক্ষগুণের আধিক্যবশতঃ তমোগুণ এবং শ্লেষ্মা অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠে, কাজেই নিদ্রানাশ উপস্থিত হয়। যখন মনঃক্লান্ত হইয়া উঠে, তখন ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলে জীবগণ নিদ্রিত হইয়া পড়ে। বাতজ্বরে শূল, আধ্মান, শিরঃরুক্‌ এবং গাত্রবেদনা প্রভৃতি যন্ত্রণা-দায়ক লক্ষণ সকল বিদ্যমান থাকাতে মনঃস্থির হয় না, সুতরাং নিদ্রারও বিঘ্ন হয়।

ক্ষবস্তম্ভ;—ক্ষবস্তম্ভ শব্দের অর্থ হাঁচির অবরোধ। ক্ষবস্তম্ভ, বাতজ্বরের লক্ষণ; কিন্তু ক্ষবপ্রবৃত্তি, সাধারণ জ্বরমুক্তির লক্ষণ। কথাটায় একটু গোল বাধে। যদি ক্ষব প্রবৃত্তি সাধারণ জ্বর মুক্তির লক্ষণ হয়, তাহা হইলে ক্ষবস্তম্ভ সাধারণ জ্বরের লক্ষণ মধ্যেই পঠিত হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হয় নাই। আবার ক্ষব, জৃম্ভা, উদ্গার প্রভৃতি শরীরের স্বাভাবিক কার্য্য অথবা পীড়া বিশেষ? সে বিষয়েও একটু প্রণিধান আবশ্যক। কথা দুইটীর মীমাংসার পূর্ব্বে ক্ষবথুউৎপত্তির কারণটী আলোচনা করা আবশ্যক। কথিত আছে;—

উদানপ্রাণয়োরূর্দ্ধযোগান্মৌলিকফস্রবাৎ।
শব্দঃ সংজায়তে তেন ক্ষুতং তৎকথ্যতে বুধৈঃ॥

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ;—মস্তক হইতে শ্লেষ্মা স্রুত হইয়া নাসিকা-ভ্যন্তরস্থ কলাভ্যন্তরে সংসর্পিত হইলে সেই শ্লেষ্মা বাহির করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হয়। প্রকৃতির ঈপ্সিত সেই কার্য্য সমাধার জন্য উদান এবং প্রাণ

বায়ুর ঊর্দ্ধযোগ বশতঃ নাসিকারন্ধ্রস্থ স্নায়ুজাল উত্তেজিত হইয়া উঠে। সেই স্নায়বীয় উত্তেজনাবশতঃ পৈশিক ক্ষোভ উপস্থিত হইয়া শব্দ উৎপাদন করে। ইহাকেই ক্ষব, ক্ষবথু বা হাঁচি বলে। সুতরাং হাঁচি সংশোধিনী ক্রিয়া-বিশেষ, এজন্য ব্যাধি শ্রেণীমধ্যে গণনা করা যায় না। তবে স্বেদ মূত্র প্রবর্ত্তনা প্রভৃতি সমুৎসর্গ ক্রিয়া অস্বাভাবিক হইলে যেমন রোগমধ্যে পরি-গণিত হয়, হাঁচির পক্ষে সে নিয়মের অন্যথা হইবে না। হাঁচির অবরোধ বাতজ্বরের প্রতিনিয়ত লক্ষণ, বিগুণ বায়ুই ইহার কারণ। অন্য অন্য জ্বরে ক্ষবস্তম্ভ হইতে পারে, বৈকারিক হাঁচি প্রবর্ত্তনারও সম্ভব আছে, এই জন্য ক্ষবস্তম্ভ তাহাদের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হয় নাই। স্বেদাবরোধ জ্বরের সাধারণ লক্ষণ; পরন্তু পিত্ত জ্বরে স্বেদ হয়। সেই স্থলে স্বেদ যেমন সংশোধিনী ক্রিয়া বলিয়া গণ্য না হইয়া বৈকারিক বলিয়া কথিত হয়, জ্বরে ক্ষব প্রবৃত্তি হইলে সেইরূপ বৈকারিক বলিয়া বুঝিতে হইবে। জ্বর মুক্তির লক্ষণে যে হাঁচির কথা বলা হইয়াছে, তাহা প্রাকৃতিক সংশোধিনী ক্রিয়াবিশেষ।

শিরোহৃদ্‌গাত্ররুক্‌ ;—শিরঃপীড়া, হৃদ্‌ব্যথা এবং গাত্র বেদনা। বাতজ্বরে বায়ু কর্ত্তৃক মস্তিষ্কের উত্তেজনা বশতঃ তথায় রক্ত স্রোতোধাবিত হইয়া মাথা বেদনা জন্মায়। এবং বায়ু, পেশীমণ্ডল আশ্রয় করিয়া হৃদ্‌ব্যথা এবং গাত্র-বেদনা উৎপাদন করে। কোন কোন স্থলে হৃদয় প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা হয় বলিয়া পৃথক করিয়া বলা হইয়াছে; নতুবা গাত্রবেদনা বলিলেই হৃদয় বেদনাও বুঝা যাইত।

বক্ত্র বৈরস্য ;—বক্ত্র বৈরস্য অর্থাৎ মুখের বিরসতা। ইহা বাত প্রকোপ জন্য মুখ গহ্বরস্থ স্নায়বীয় বিকৃতির ফল।

শূল ও আধ্মান ; এস্থলে শূল শব্দের অর্থ পেট বেদনা, আধ্মান বলিতে পেট ফাঁপা বুঝিতে হইবে। উভয়ই প্রদুষ্ট কোষ্টাশ্রিত বায়ুর কার্য্য।

জৃম্ভণ ;—জৃম্ভণ বা জৃম্ভা শব্দের অর্থ—হাঁই।

> "চৈতন্য শিথিলত্বাৎ যৎপীত্বৈকং শ্বাসমুদ্বমেৎ।
> বিদীর্ণবদনশ্বাসং জৃম্ভা সাকথ্যতে বুধৈঃ॥"

বাত দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন চৈতন্যের শিথিলতা ঘটিলে শারীরিক বিশ্রামের

প্রয়োজন হয়। তখন একটী শ্বাস পান করিয়া পুনর্ব্বার শ্বাস উদ্‌বমন করতঃ শরীর অবসন্ন হয়। এইরূপ বিদীর্ণ বদন শ্বাসকে জৃম্ভণ বলে। ক্রমশঃ—

মাগুরা,
(খুল্‌না)। } শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন।

ড্রপসি বা শোথ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শোথ রোগের বর্ণনা কালে, পুরাতন ও তরুণ দুইটী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যে শোথ হঠাৎ উৎপন্ন হয় তাহাই তরুণ শব্দে বাচ্য এবং যে শোগ ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হয় এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় তাহাই পুরাতন শব্দে বাচ্য। ভেইন সকলে রক্ত আবদ্ধ হইয়া যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহা প্রায়ই পুরাতন আকার ধারণ করে। হৃদয়ের পীড়াবশতঃ যে শোথ হয় তাহা প্রায়ই পুরাতন শোথ। যকৃৎ বৃদ্ধি রোগে যে শোথ হয় তাহাও পুরাতন। পুরাতন জ্বর, পুরাতন অতিসার প্রভৃতির সহিত যে শোথ জন্মে, তাহাও পুরাতন শোথ শব্দে বাচ্য। সে শোথ, ঘাম প্রস্রাব প্রভৃতি বন্ধ হইয়া হঠাৎ উৎপন্ন হয়, তাহাই তরুণ শব্দে বাচ্য। যেমন ভেইন সকল অতিরিক্ত পূর্ণ হইলে তাহার গা চোঁয়াইয়া জলীয় পদার্থ নির্গত হইয়া শোথ হয়। সেইরূপ কখন কখন ধমনীর গা চোঁয়াইয়া জলীয় ভাগ নির্গত হইয়াও শোথ জন্মে। এই শেষোক্ত প্রকার শোথ তরুণ শব্দে বাচ্য। পুরাতন শোথ শৈরিক। তরুণ শোথ ধামনিক। হৃদয়ের দক্ষিণ ধার পীড়িত হইলে প্রায়ই পুরাতন শোথ উপস্থিত হয়। হৃদয়ের বামভাগ পীড়িত হইলে যে শোথ উপস্থিত হয় তাহা তরুণ শব্দে বাচ্য হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি শরীরের একটী জল নিঃসরণকারী যন্ত্রের কার্য্য কম পড়িলে অপর যন্ত্র তাহার হইয়া কার্য্য করে। স্বাভাবিক শরীরে এইরূপ

কার্য্য সর্ব্বদা হইতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি সর্ব্বদা এক যন্ত্রের কার্য্য অপর যন্ত্রে করিয়া থাকে, তবে হঠাৎ ঘর্ম্মাবরোধ হইয়া শোথ জন্মায় কি প্রকারে ?

এরূপ স্থলে এই অনুমান করিতে হইবে যে যদি ঘর্ম্মাবরোধ হইবার সময় মূত্র যন্ত্রের ভাঁল করিয়া ক্রিয়া করিবার ক্ষমতা না থাকে তবেই শোথ হইবার সম্ভাবনা নচেৎ নহে। হঠাৎ ঘর্ম্মাক্ত ও উষ্ণ শরীরে ঠাণ্ডা লাগিলে সজোরে শরীরের উপরিস্থ রক্ত শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করাতে আভ্যন্তরিক যন্ত্র সমুদয়ে রক্ত জমিয়া তাহাদিগকে কিয়ৎপরিমাণে অসুস্থ করে। এইরূপ অবস্থায় মূত্র যন্ত্রও ভাল করিয়া কাজ করিতে পারে না। সুতরাং ঘর্ম্মের দ্বারা যে জল নির্গত হইতেছিল তাহা আর প্রস্রাবের দ্বারা নির্গত হইতে পারিল না। যে সকল স্থলে পূর্ব্বহইতেই মূত্রযন্ত্র (কিড্‌নি) পীড়াগ্রস্ত সুতরাং কার্য্যে অক্ষম থাকে, সে স্থলে ঘর্ম্ম কম হইলে শোথ জন্মাইবার সম্ভাবনা।

শোথের নিদান বর্ণিত হইল। এখন শোথের কারণ সকল একত্র সন্নিবেশিত করিয়া দেখান যাইতেছে।

শরীরের রস নিঃস্রবণ ও শোষণ এই দুই ক্রিয়ার পরস্পরের সামঞ্জস্যের ব্যাঘাত হইলে শোথ উৎপন্ন হয়। শরীরের রক্ত বাহিনী নাড়ী (ভেইন বা ধমনী) সকলের গা-দিয়া অতিরিক্ত রস নিঃসরণ হইলে অথবা উহাদের শোষণ শক্তি কম পড়িলে অথবা ঐ উভয় কারণ একত্র বর্ত্তমান থাকিলে শোথ জন্মাইতে পারে। এইরূপ ঘটনা নিম্নলিখিত কারণবশতঃ হইতে পারে।

(১)। ভেইন সকলে রক্ত আবদ্ধ হইলে।

(২)। শরীরের কোন স্থানে এক্‌টিভ্ কন্‌জেস্‌সন্ (ধমনীতে রক্ত আটকাইলে বা অধিক রক্ত জমিলে) হইলে।

(৩)। হৃদয়ের দক্ষিণভাগে রক্ত চলাচলের গতিরোধ হইলে প্যাসিভ্-ড্রপ্‌সি হয়। এইরূপ শোথ প্রথমতঃ পদযুগলে প্রকাশ হয়, তারপর ক্রমশঃ ঐ শোথ সর্ব্বশরীরব্যাপী হয়। হৃদয়ের বামভাগে রক্তের গতিরোধ হইলে ধামনিক শোথ হয়। ইহাতে সচরাচর ফুস্ফুসের তরুণ শোথ (ইডিমা অব্‌দিলংস) এবং পরিশেষে শৈরিক বা পুরাতন শোথও জন্মিতে পারে।

(৪)। যকৃৎ বড় হইয়া পোর্টাল ভেইনে চাপ পড়িয়া এসাইটিস বা জলোদরী রোগ হয়। হাত পায়ের অন্য কোন শিরাতে চাপ পড়িলে ও শোথ হয়। মস্তিষ্কের ভিতর অর্ব্বুদ রোগ জন্মাইয়া উহার শিরাতে চাপ পড়িয়া মাস্তিষ্ক শোথ (ড্রপ্‌সি অব্‌ ভেণ্ট্রিকেল্‌স্‌ অব্‌ব্রেণ) জন্মে।

(৫) দীর্ঘকাল পীড়া ভোগ করিয়া শরীর ক্ষীণ হইলে শোথ জন্মিতে পারে।

(৬) ঘাম বা প্রস্রাব রোধ হইলে তরুণ শোথ উপস্থিত হয়।

এক্ষণে কি কি পীড়া বশতঃ শোথ উপস্থিত হইতে পারে, দেখা যাউক:—

(১) হৃদ্‌কপাটের পীড়া হইলে যথা এণ্ডকার্ডাইটিস্‌ প্রভৃতি রোগ হইলে।

(২) যকৃৎবড় হইলে। কখন কখন যকৃত বড় হইয়া পাণ্ডুরোগ হয় সুতরাং কখন কখন পাণ্ডুরোগের সহিত শোথ হয়।

(৩) শরীরের কোন স্থানে অর্ব্বুদ রোগ হইলে ভেইনের উপর অর্ব্বুদের চাপ পড়িয়া শোথ হয়। ক্যান্‌সার রোগ হইলে শোথ হয়।

(৪)। মস্তিষ্কের ভিতর টুবার্কেল হইলে মস্তকের শোথ হয়।

(৪)। প্লীহা, জ্বর, পুরাতন অতিসার অথবা যে কোন পুরাতন পীড়ার দ্বারা শরীরের বল ক্ষয় ও রক্ত অল্প ও পাতলা হয়। পুরাতন যক্ষ্মা রোগের সহিত শোথ হয়।

(৫) ফুস্‌ফুসের পীড়া হইলে শোথ জন্মাইতে পারে।

(৬) শরীরে হিম লাগিলে বা বৃষ্টিতে ভিজিলে বিশেষতঃ হঠাৎ গরমের পর শরীরে ঠাণ্ডা লাগিলে।

(৭) মুত্র যন্ত্রের পীড়া হইলে। ডায়েবেটিস্‌ বা বহু মুত্র রোগ হইলে। হাম বসন্ত প্রভৃতি রোগ হইলে।

(৮) পুরাতন ক্ষত বা পুরাতন রক্তস্রাব (যেমন অর্শের রক্তস্রাব) হঠাৎ বন্ধ হইলে শোথ রোগ উপস্থিত হইতে পারে। কোন স্রাবযুক্ত চর্ম্মরোগ (যেমন একজিমা) হঠাৎ আরাম হইলে শোথ হয়।

(৯) রোগী বিশেষ কোন কোন ঔষধ অবিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগদ্বারা

শোথ জন্মাইতে পারে। যথা ঘাম ও প্রস্রাব বন্ধ করে এরূপ ঔষধে সময় ও অবস্থা বিশেষে শোথ জন্মাইতে পারে।

আমাদিগের দেশে অনেক লোকের, এমন কি অনেক ডাক্তার কবিরাজদিগেরও সংস্কার আছে যে সেঁকো বিষ (আর্সেনিক) প্রয়োগ দ্বারা শোথ জন্মাইতে পারে। অনেকে বলেন প্লীহা ও ম্যালেরিয়া জ্বরে আর্সেনিক দ্বারা উপকার হয় বটে, কিন্তু রোগী শোথ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। কিন্তু এরূপ সংস্কারের কোনই মূল নাই। আমরা অনেক স্থানে আর্সেনিক প্রয়োগ করিয়াছি কিন্তু শোথ হইতে দেখি নাই।

ক্রমশঃ—

শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্যাল, এম্, বি,

হোমিওপ্যাথি মতে

(শোথ)

শোথের কারণ (প্যাথলজী) ও ইহার উদ্দীপক বিবরণ পূর্ব্ব পত্রিকার এলোপ্যাথিক প্রবন্ধেই খ্যাতনামা ডাক্তার পুলিন বাবুই সুন্দর-রূপ বিবৃত করিয়াছেন। এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন শোথের যথা মস্তিষ্ক শোথ (হাইড্রসিফেলাস্), বক্ষশোথ (হাইড্রোথোরাকস্), জলোদর (য়্যাসাইটীস্), অণ্ডশোথ (হাইড্রোসিল), জরায়ু শোথ (হাইড্রোমিট্রা) সার্ব্বাঙ্গিক-শোথ (য়্যানাসারকা) এবং হাইড্রোপেরিকারডিয়াম্ প্রভৃতি স্থানীয় শোথের প্রত্যেকটীর কথঞ্চিৎ বিবরণ ও তাহার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রকরণ ক্রমশঃ বিবৃত হইবে।

হাইড্রোসিল (অণ্ডকোষ শোথ)

এই অণ্ডকোষ শোথ হইতেই কোরন্দ কখন কখন একশিরা প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাও ড্রপসির (শোথের) এক প্রকার আংশিক স্থানীয় রোগ; ইহার উৎপত্তির কারণ এই যে, অণ্ডকোষের শ্লৈষ্মিক রস নানাপ্রকার বিকৃত কারণে ও রক্ত দূষিত হইয়া একস্থানে একটী অর্ব্বুদাকার

হয়, প্রথমতঃ ইহার উগ্র অবস্থায় কথন কথন জ্বর ও বিজাতীয় বেদনা অনুভূত হয়, কিন্তু পুরাতন অবস্থায় আর কোন যন্ত্রণাই থাকে না। এই শোথ অধিকাংশস্থলেই দক্ষিণ পার্শ্ব অপেক্ষা বাম পার্শ্বের কোষেই বিবৃদ্ধি হইতে দেখা যায়।

এই রোগ নিম্ন বঙ্গ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এই রোগের উৎপত্তি কারণ; অনেকেরই অনেক প্রকার মতভেদ দেখা যায়; কেহ কেহ কহেন,যে আমাদের ধুতি পরিধানের প্রথানুসারে অণ্ডকোষ সর্ব্বদা দোদুল্যমান থাকায় দূষিত রক্তের ও রসের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু যখন দেখা যায় যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুস্থানি যাঁহারা সর্ব্বদাই মালকোঁচা প্রথায় ধুতি ও নেংটী আদি পরিধান করিয়াও তাহাদের মধ্যে এ রোগ অবিরল নহে, তখন আমাদের ধুতি পরিধান প্রথাই যে ইহার একটী কারণ, তাহা কেমন করিয়া যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে? সে যাহা হউক, ইহার ৩ তিনটী প্রধান কারণ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—কোন প্রকার রক্তের বিকৃত ও দূষিত আহার, কামরিপু-চরিতার্থ জন্য অনৈসর্গিক উপায়ে হস্তমৈথুন ও অতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গম, (গণো-রিয়া) মেহের অর্থাৎ ধাতচলা বেয়ারাম হইয়া প্রথমতঃ অরচাইটীস্ শিরফুলা অর্থাৎ একশিরার উৎপত্তি, এবং কোন কোন স্থলে সম্ভবতঃ বাহ্যিক আঘাত হইতে প্রদাহ পরে ঐ প্রদাহ হইলেই শ্লৈষ্মিক রসের সঞ্চারিত হইয়াও থাকে।

এই প্রকার জলসঞ্চয় আবার অমাবস্যা পূর্ণিমা তিথির কলা বৃদ্ধির সঙ্গেও শোথের বৃদ্ধি ও বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। এক্ষণে ইহার চিকিৎসা (এলো-প্যাথিক মতে) সর্ব্ববাদিসম্মত আইডিন ইন্‌জেকষনই প্রত্যুত হয়, কিন্তু তাহাতেও অনেক স্থলে রোগের আবার পুনরাগমন হইতে দেখা গিয়াছে, আর ঐ ইন্‌জেক্‌ষন্ প্রণালীও অত্যন্ত কঠিন ও ভয়জনক, তদ্‌জন্য অনেক রোগীই উক্ত প্রথায় স্বীকৃত না হওয়ায় রোগের সূত্রপাত অবস্থাতেই হোমি-ওপ্যাথির আশ্রয় লয়, আমাদের ২।১০টী রোগীর উক্ত রোগের চিকিৎসায় যে যে ঔষধ যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা হইয়াছিল ও সর্ব্বদা হইয়া থাকে, তাহার সমষ্টি নিম্নে দেওয়া গেল, যথা আর্ণিকা, একন, রসটক্স, সাইলিসা,

কোনায়মম্যার্ক, লাইকোপডিয়াম, ক্লেমেটীস্; ব্যারাইটা, পালসেটীলা, থুজা প্রভৃতি ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণানুযায়ী বিবরণ ও অন্য অন্য আবশ্যকীয় উপদেশ বিস্তারিতরূপে বিবৃত করিতেছি।

ক্রমশঃ—

শ্রীগগণচন্দ্র নন্দী H. P. ডাক্তার।
ইন্‌চার্য্য হরিসভা হোমিওপ্যাথিক,
দাতব্য চিকিৎসালয়, চন্দননগর।

আয়ুর্ব্বেদে শোথরোগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাতব্যাধিরোগে যেমন অঙ্গবিশেষে শোথ জন্মিতে পারে, সেইরূপ আমবাত রোগেও হস্ত, পদ, মস্তক, পাদগ্রন্থি, মেরুদণ্ডের নিম্ন প্রদেশ, জানু, উরু এবং শরীরের অন্যান্য সন্ধিস্থানে তদপেক্ষা অধিক শোথ জন্মিতে পারে। শূলরোগে সাধারণতঃ শোথ জন্মে না। তবে এমন দেখা গিয়াছে যে, শূলরোগাক্রান্ত ব্যক্তি যখন অস্থিচর্ম্মসার হইয়া পড়িয়াছে, কিছুমাত্র আহারাদি করিবার সামর্থ্য নাই, সেই সময় তাহার হস্তপদাদিতে অল্প অল্প শোথ জন্মিয়াছে। কিন্তু এ শোথও বড় ভয়ানক, ইহাতে রোগীর জীবন ধ্বংশ হইয়া থাকে। উদাবর্ত্ত রোগে মল মূত্রাদির রোধ হইয়া উদর ভয়ানক রূপে ফুলিয়া উঠে, কিন্তু ইহাকে শোথ বলে না। সাধারণতঃ ইহার নাম আধ্মান বা পেটফাঁপা। গুল্মরোগে উদরমধ্যস্থ গুল্ম আকারে অধিক বড় হইলে পেট অত্যন্ত উচু হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকেশোথ বলা যায় না। তবে অধিক দিনের গুল্মরোগী অরুচি প্রভৃতি উপসর্গ-গ্রস্ত হইলে সে অবস্থায় তাহার হস্তপদাদিতে কখন কখন শোথ জন্মিতে দেখা যায়।

প্রমেহ রোগে সচরাচর শোথ জন্মিবার কোন সম্ভাবনা নাই। তবে তরুণ প্রমেহে অর্থাৎ যে সময় জ্বালা যন্ত্রনার সহিত অত্যন্ত সপূয ধাতু নির্গত

হইতে থাকে, অজ্ঞতাবশতঃ সে অবস্থায় রোগী অত্যন্ত শীতক্রিয়া করিলে তাহাতে অচিরাৎ রোগীর গ্রন্থিসমূহে বেদনার সহিত শোথ জন্মিতে পারে। তাহা ছাড়া প্রস্রাবের অল্পতা বা রোধ ঘটিয়াও কোন কোন সময় রোগীকে ভয়ানক ফুলিয়া পড়িতে দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু এরূপ ঘটনা খুব্ বিরল। এই প্রস্রাবের অল্পতা বা রোধহেতু যখন রোগীর ভয়ানক শোথ জন্মে। তখন ইহা প্রস্রাব-জনিত শোথ কিনা তাহা স্থির করিতে অনেকানেক বিজ্ঞ ডাক্তার কবিরাজকেও অপদস্থ হইতে হয়। আমি জানি, একবার একটী দ্বাদশ বৎসর বালকের প্রস্রাবের ক্রমশঃ অল্পতা ঘটিয়া ৫।৬ দিনের মধে বাল-কটী ভয়ানক ফুলিয়া পড়ে। এবং সে অবস্থায় প্রথমে জনৈক প্রাচীন সুবিজ্ঞ কবিরাজকে সেই বালকের চিকিৎসার ভার দেওয়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কবিরাজ মহাশয়ের মনঃসংযোগের ত্রুটীতেই হউক, অথবা রোগ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে জ্ঞানের অল্পতা বশতঃই হউক, তিনি ঐ বাল-কের পেটের দোষ হইতে শোথ জন্মিয়াছে ভাবিয়া তাহাকে স্বর্ণপর্প টী ঔষধ সেবন করিতে দেন্। বলা বাহুল্য যে, লবণজল বন্ধ করিয়া এই ঔষধ দুই দিবস মাত্র সেবন করাতেই বালকের প্রস্রাব একবারে বন্ধ হইয়া তাহার প্রাণ যায় যায় হইয়া উঠে। কবিরাজ মহাশয়ের অসমর্থতা জন্য অবশ্য এক-জন সুবিজ্ঞ ডাক্তারের হস্তেই তৎক্ষণাৎ সেই বালকের চিকিৎসার ভার দেওয়া হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ডাক্তার মহাশয়ও সহসা রোগ নির্ব্বাচন সুতরাং সেই রোগের শান্তিও করিতে পারেন নাই। পরে অন্য একজন ডাক্তার আসিয়া প্রস্রাব পরীক্ষা ও তদনুরূপ নানাবিধ ঔষধ ও শীত-ক্রিয়া দ্বারা বালকটীকে সুস্থ করেন। যাহাহউক, এরূপ ঘটনা এই একটী বই আমি আর দেখি নাই। তদ্ভিন্ন বহুমূত্র রোগে অজ্ঞ চিকিৎসক কর্ত্তৃক সহসা আফিঙ প্রভৃতি ভয়ানক ধারক ঔষধ অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়াও কোন কোন সময় রোগীর শোথ জন্মিতে দেখা গিয়াছে।

ক্রমশঃ—

আয়ুর্ব্বেদ তত্ত্ব।

আহার বিধি

আহারের গুণ।

প্রাণিগণের আহারই জীবনধারণের মূল। উহাদ্বারা সদ্য প্রীতি ও বললাভ হয়, এবং আয়ুঃ, তেজঃ, উৎসাহ, ওজ, স্মৃতিশক্তি ও জঠরাগ্নি বৃদ্ধি লাভ করে। (২৫)

আহারের সামান্য বিধি।

এক দিবারাত্রিতে দুইবার মাত্র আহার করিবে। দিবা কিম্বা রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত হইলে দ্বিতীয় প্রহর মধ্যে আহার করা কর্ত্তব্য। কারণ প্রথম প্রহর মধ্যে আহার করিলে শরীরে রস সঞ্চয় হইয়া থাকে, দ্বিতীয় প্রহর অতীত করিলে বলক্ষয় হয়। (২৬)

আহারের বিশেষ বিধি।

যথোচিত রূপে মল মূত্র ও বায়ু নিঃসৃত হইলে, হৃদয়ের নির্ম্মলতা ও শরীরের লঘুতা বোধ হইলে, শরীরস্থ বায়ু, পিত্ত কফ ও ইন্দ্রিয় সকল স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে এবং বিশুদ্ধ উদ্গারোদয় ও সম্পূর্ণ ক্ষুধার উদ্রেক হইলে আহার করা কর্ত্তব্য। (২৭)

---

(২৫) আহারঃ প্রীণনঃ সদ্যোবলকৃদ্দেহধারকঃ। আয়ুস্তেজঃ সমুৎসাহ স্মৃত্যোজোঽগ্নিবিবর্দ্ধনঃ॥ (সুশ্রুতঃ)

(২৬) বিচার্য্য দোষকালাদীন্ কালয়োরুভয়োরপি॥ (সুশ্রুতঃ)

অপিচ—সায়ং প্রাতর্ম্মনুষ্যাণাং ভোজনং শ্রুতিবোধিতং। নান্তরা ভোজনং কুর্য্যাদগ্নিহোত্রসমোবিধিঃ॥ যামমধ্যে ন ভোক্তব্যং যামযুগ্মং ন লঙ্ঘয়েৎ। যামমধ্যে রসোৎপত্তির্যামযুগ্মাৎবলক্ষয়ঃ॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

(২৭) প্রসৃষ্টে বিন্মূত্রে হৃদি সুবিমলে দোষে স্বপথগে। বিশুদ্ধে চোদ্গারে ক্ষুদুপগমনে বাতেঽনুসরতি। তথাগ্নাবুদ্রিক্তে বিশদকরণে দেহেচ সুলঘৌ। প্রযুঞ্জীতাহারং বিধিনিয়মিতঃ কালঃসহিমতঃ॥ (বাগ্ভটঃ)

এই সমস্ত লক্ষণের অন্যথা ভাব হইলে কেবল পূর্ব্বোক্ত সময়ের অনুরোধে ঐ সময়ে (অর্থাৎ এক প্রহর অন্তে দ্বিতীয় প্রহর মধ্যে) কখনও আহার করিবে না। এবং যখনই ঐ সমস্ত লক্ষণের প্রকাশ হইবে তখনই আহার করিবে, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত কালের প্রতীক্ষা করিতে হইবে না। (২৮)

অকালে, অতীত কালে, হীন মাত্রায় বা অধিক মাত্রায় আহার করিবে না। কারণ অকালে (অর্থাৎ পূর্ব্বভুক্ত অন্নের অজীর্ণাবস্থায়) আহার করিলে বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা প্রভৃতি নানাবিধ উৎকট রোগ উৎপন্ন হইয়া মৃত্যু ঘটায়। (২৯)

অতীত কালে আহার করিলে বায়ু দ্বারা জঠরস্থ অগ্নি হীনতেজঃ হয়। সুতরাং ভুক্তবস্তু সম্যকরূপে পরিপাচিত হয় না, এবং পুনর্ব্বার সম্যক্ ক্ষুধারও উদ্রেক হয় না। (৩০)

হীনমাত্রায় আহার করিলে অতৃপ্তি ও বলক্ষয় হইয়া থাকে। অধিক মাত্রায় আহার করিলে আলস্য, শরীরের গুরুত্ব, উদরের আটোপ (গুড়্গুড় শব্দ) অগ্নিমান্দ্য এবং অগ্নিমান্দ্যজনিত নানাবিধ রোগ জন্মে। (৩১)

সম্যক্ রূপে ক্ষুধার উদ্রেক হইলেও যদি আহার করা না যায়, তবে অঙ্গমর্দ্দ (শরীর মোড়া), অরুচি, শ্রান্তিবোধ, তন্দ্রা, দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, ধাতুদাহ ও বলক্ষয় হইয়া থাকে। (৩২)

---

(২৮) ক্ষুৎসম্ভবতি পক্কেষু রসদোষমলেষু চ কালে বা যদিবাহকালে সোহন্নকাল উদাহৃতঃ॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

(২৯) নাপ্রাপ্তাতীতকালং বা হীনাধিকমথাপিবা। অপ্রাপ্তকালে ভুঞ্জানঃ শরীরে হ্যলঘোনরঃ। তাংস্তান্ ব্যাধীনবাপ্নোতি মরণং বা নিযচ্ছতি॥ (সুশ্রুতঃ)

(৩০) অতীতকালে ভুঞ্জানো বায়ুনোপহতেহনলে। কৃচ্ছ্রাদ্বিপচ্যতে ভুক্তং দ্বিতীয়ঞ্চ ন কাঙ্ক্ষতি॥ (সুশ্রুতঃ)

(৩১) হীনমাত্রমসন্তোষং করোতি চ বলক্ষয়ং। আলস্য গৌরবা-টোপসাদাংশ্চ কুরুতেহধিকং॥ (সুশ্রুতঃ)

(৩২) ভোজনেচ্ছাবিঘাতাৎস্যাদঙ্গমর্দ্দোহরুচিশ্রমঃ। তন্দ্রালোচনদৌর্ব্বল্য ধাতুদাহোবলক্ষয়ঃ॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

অতএব যথাকালে পবিত্র ও নির্জ্জন স্থানে উত্তম আসনে অবক্রভাবে উপবিষ্ট হইয়া অভ্যস্ত, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, অনতিউষ্ণ, দ্রবাধিক, পরিমিত, মনেরপ্রিয়, উত্তমরূপে পরিপাচিত, নির্দ্দোষ অন্ন আহার করিবে। (৩৩)

হস্তপদাদি প্রক্ষালন না করিয়া কিম্বা মল মূত্রাদির বেগযুক্ত হইয়া কিম্বা জলে অবস্থান করিয়া কিম্বা সন্ধ্যাকালে আহার করিবে না। (৩৪)

অতি উষ্ণ অন্ন বল নষ্ট করে, অতি শীতল ও শুষ্ক অন্ন অজীর্ণকারক হয়, অতি ক্লিন্ন (মাড়যুক্ত) অন্ন শরীরের গ্লানি উৎপাদন করে। অতএব হিতকারক যুক্তিযুক্ত অন্ন আহার করিবে। (৩৫)

অপবিত্র, দূষিত, উচ্ছিষ্ট, পাষাণ ও লোষ্ট্রাদি বিশিষ্ট, নিজের অপ্রিয়, ব্যুষিত (বাসি), দুর্গন্ধ ও অস্বাদু অন্ন ভোজন করিবে না। (৩৬)

সদ্যস্কৃত অন্ন জলদ্বারা ধৌত করিয়া ভক্ষণ করিলে শীঘ্র পরিপাক পায়, এবং উহা বলকারক, শীতল, মধুর, রুক্ষ, শ্রান্তিনাশক ও তৃপ্তিকারক।

ব্যুষিত পানীয়ভক্ত (পান্তাভাত) মেদ, ঘর্ম্ম ও কফকারক, ত্রিদোষবর্দ্ধক, রুক্ষ, এবং অতিশয় মলমূত্রকারক। (৩৭)

অতিশয় দ্রুত আহার করিলে অন্নের দোষগুণ অনুভূত হয় না।

---

(৩৩) ভোক্তারং বিজনে রম্যে নিঃসম্বাধে শুভেশুচৌ। * * * সুখমুষ্টেঃ সমাসীনঃ সমদেহোঽনতৎপরঃ। কালে সাত্ম্য লঘুস্নিগ্ধং ক্ষিপ্রমুষ্ণং দ্রবোত্তরং। বুভুক্ষিতোঽন্নমশ্নীয়ান্মাত্রাবদ্বিদিতাগমঃ॥ (সুশ্রুতঃ)

(৩৪) না প্রক্ষালিতপাণিপাদো ভুঞ্জীত ন মূত্রোচ্চারপীড়িতো ন সন্ধ্যয়োর্ণাপাশ্রিতইত্যাদি॥ (সুশ্রুতঃ)

(৩৫) অত্যুষ্ণান্নং বলংহন্তি শীতশুষ্কঞ্চ দুর্জরং। অতিক্লিন্নং গ্লানিকরং যুক্তিযুক্তং হি ভোজনং॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

(৩৬) অচৌক্ষ্যং দুষ্টমুচ্ছিষ্টং পাষাণতৃণলোষ্ট্রবৎ। দ্বিষ্টংব্যুষিতমস্বাদু পূতিচান্নং বিবর্জয়েৎ॥ (সুশ্রুতঃ)

(৩৭) সদ্যোঽন্নং বারিণা ধৌতং শীঘ্রপাকং বলপ্রদং। শীতলং মধুরংরুক্ষং শ্রমঘ্নং তর্পণং পরং॥ পানীয়ভক্তং ব্যুষিতং মেদঃ স্বেদকফপ্রদং। ত্রিদোষকোপনং রুক্ষং মলকৃৎমূত্রলং পরং॥ (চক্রপাণিকৃতদ্রব্যগুণঃ)

অতিশয় ধীরে ধীরে আহার করিলে অন্ন ক্রমশঃ অতিশীতল ও অপ্রিয় হইয়া থাকে। অতএব অনতিক্রুত অনতিবিলম্বিত ভাবে ভোজন করিবে। (৩৮)

আহারের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ আদা ও সৈন্ধবলবণ একত্রিত করিয়া ভক্ষণ করিবে। কারণ, উহাতে জিহ্বা ও কণ্ঠ পরিষ্কৃত এবং অগ্নিবৃদ্ধি হয় ও মুখরুচি জন্মে। (৩৯)

আহার কালে প্রথমতঃ মধুর দ্রব্য, মধ্যে অম্ল ও লবণ দ্রব্য, অবশেষে কটু, তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত দ্রব্য ভোজন করিবে। (৪০)

প্রথম ভুক্ত মধুরস প্রবৃদ্ধ বায়ু ও পিত্তের সমতা বিধান করে। মধ্যে ভুক্ত অম্ল ও লবণরস পিত্তাশয়ে অগ্নি বৃদ্ধি করে। অন্তে ভুক্ত কটু, তিক্ত ও কষায় রস বর্দ্ধিত কফের দমন করে।

কিন্তু দুগ্ধপান ভোজনাবসান কালেই কর্ত্তব্য। কারণ উহাতে পূর্ব্বভুক্ত কটু তিক্তাদি দ্রব্যের উৎকট বিদাহ নষ্ট করে। (৪১)

পূর্ব্বোক্ত মধুর দ্রব্য মধ্যে ঘৃতযুক্ত দ্রব্য এবং অপেক্ষাকৃত কঠিন দ্রব্য

---

(৩৮) অতিদ্রুতাশিতাহারে গুণান্ দোষাননিন্দতি। ভোজ্যং শীত-মত্যুদ্যঞ্চত্যাদ্বিলম্বিত মন্নতঃ॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

(৩৯) ভোজনাগ্রে সদাপথ্যং লবণার্দ্রক ভক্ষণং। অগ্নিসন্দীপনং রুচ্যং জিহ্বাকণ্ঠবিশোধনং॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

(৪০) পূর্ব্বং মধুরমশ্নীয়াৎ মধ্যেঽম্ললবণৌরসৌ। পশ্চাচ্ছেষান্‌রসান্ বৈদ্যো ভোজনেষ্ববচারয়েৎ॥ (সুশ্রুতঃ)

(৪১) ভোজনে পূর্ব্বভুক্তোমধুরোরসঃ বুভুক্ষিতস্য বাতপিত্তয়োঃ শমকোভবতি। ভোজনমধ্যে ভুক্তাবম্ললবণৌ পিত্তাশয়ে বহ্নিবৃদ্ধিং কুরুতঃ। ভোজনান্ত সময়ে ভুক্তাকটুতিক্ত কষায়রসা কফং শময়ন্তীতি॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

বিদাহীন্যন্নপানানি যানিভুঙ্‌ক্তেহি মানবঃ। তদ্বিদাহপ্রশান্ত্যর্থং ভোজনান্তে পয়ঃপিবেৎ। তথাচ—কুর্য্যাৎক্ষীরান্তমাহারং নদধ্যন্তং কদাচন। অপিচ—লবণাম্লকটূষ্ণানি বিদাহীন্যতিযানিচ। তদ্দোষং হর্ত্তুমাহারং মধুরেণ সমাপয়েৎ॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

অগ্রে আহার করিবে। তৎপরে মৃদুদ্রব্য এবং তদনন্তর দ্রবদ্রব্য আহার করিবে। (৪২)

স্বভাবতঃ গুরুপাক দ্রব্য অর্দ্ধ মাত্রায় এবং লঘুপাক দ্রব্য পূর্ণ মাত্রায় তৃপ্তিমত আহার করিবে।

ভোজ্যবস্তু মধ্যে যে যে দ্রব্য অধিকতর স্বাদু, সেই সেই দ্রব্য উত্তরোত্তর ভোজন করিবে।

যে দ্রব্য একবার খাইলে পুনর্ব্বার তাহা খাইতে স্পৃহা জন্মে, এস্থলে তাহারই নাম স্বাদুদ্রব্য।

স্বাদু অন্ন, মনের প্রফুল্লতাকারক এবং হর্ষ, সুখ, বল, পুষ্টি ও উৎসাহ-বর্দ্ধক। (৪৩)

ভোজনান্তে রুটি, পিষ্টক, ও চিপীটক প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য কখনও খাইবে না। ভোজনের পূর্ব্বে ক্ষুধিতাবস্থায় একান্ত উহা খাইতে হইলেও অতি স্বল্প মাত্রায় খাইবে। (৪৪)

উদরের চারিভাগের দুইভাগ অন্নদ্বারা এবং একভাগ জলদ্বারা পূর্ণ করিবে। অবশিষ্ট একভাগ বায়ুর গমনাগমনের নিমিত্ত শূন্য রাখিবে। (৪৫)

ভোজনকালে অন্নরসে প্রথমতঃ জিহ্বা সরস থাকে, কিন্তু কিছুকাল আহার করিলে জিহ্বা আর তত সরস থাকে না। সুতরাং ক্রমশঃ রসবোধের স্বল্পতা ও জিহ্বার জড়তা জন্মিয়া থাকে। অতএব ঐ দোষ নিবৃত্তি এবং জঠোরাগ্নির বৃদ্ধির নিমিত্ত আহার কালে মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প জলপান করা কর্ত্তব্য।

---

(৪২) ঘৃতপূর্ব্বং সমশ্নীয়াৎ কঠিনং প্রাকৃততোমৃদুঃ। অন্তে পুনর্দ্রবাশীতুবলাৎ রোগেণ মুচ্যতে॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

(৪৩) গুরুণামর্দ্ধসৌহিত্য লঘুনাং তৃপ্তিরিষ্যতে। যদ্যৎ স্বাদুতরং তত্র বিদধ্যাদুত্তরোত্তরং। ভুক্ত্বাচ যৎ প্রার্থয়তে ভূয়স্তৎ স্বাদুভোজনং। সৌমনস্যং বলং পুষ্টিং উৎসাহং হর্ষণং সুখং। স্বাদুসঞ্জনয়ত্যন্নমস্বাদুচ বিপর্য্যয়ং॥ (সুশ্রুতঃ)

(৪৪) গুরুপিষ্টময়ং তস্মাত্তণ্ডুলান পৃথুকানপি। ন জাতু ভুক্তবান্ খাদেৎ মাত্রাং খাদেদ্বুভুক্ষিতঃ॥ (চরকঃ)

(৪৫) অন্নেন কুক্ষের্দ্বাবংশৌপানেনৈকং প্রপূরয়েৎ। আশ্রয়ং পবনাদীনাং চতুর্থমবশেষয়েৎ॥ (বাভটঃ)

আহারের আদ্যে অধিক জলপান করিলে শরীরের কৃশতা ও মন্দাগ্নি জন্মে এবং আহারের অন্তে অধিক জলপান করিলে শরীরের স্থূলতা ও কফ বৃদ্ধি পায়। আহারের মধ্যে অল্প অল্প জলপান করিলে অগ্নিদীপ্তি হয়। আহার কালে একেবারে জলপান না করিলে অন্ন সম্যকরূপে পরিপাক পায় না এবং অধিক জলপান করিলেও ঐ দোষ ঘটিয়া থাকে। অতএব অন্নপরিপাকার্থ মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প জলপান কর্ত্তব্য।

যদি পিপাসার উদয় হইলেও জলপান না করা যায়, তবে কণ্ঠ ও মুখশোষ, শ্রুতি হ্রাস, রক্তশোষ ও হৃদয়ে ব্যথা জন্মিয়া থাকে।

ক্ষুধিত অবস্থায় অন্ন আহার না করিয়া জলপান করিলে, যথাক্রমে গুল্ম ও জলোদর রোগ জন্মিতে পারে। অতএব তৃষিত অবস্থায় অন্ন আহার এবং ক্ষুধিত অবস্থায় জলপান এই উভয়ই নিষিদ্ধ। (৪৬)

অন্নপাকের নিয়ম ও গুণ।

তণ্ডুল উত্তমরূপে ধৌত করিয়া পাঁচগুণ জলে সিদ্ধ করিবে। উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে উহার রস গালিত করিয়া ফেলিবে। উক্তপ্রকারে সুসিদ্ধ, নির্ম্মল ও ঈষদুষ্ণ অন্ন, অগ্নিবর্দ্ধক, তৃপ্তি ও রুচি কারক, লঘুপাক ও সুপথ্য।

অধৌত তণ্ডুলের অন্ন কিংবা অস্রাবিত অন্ন কিংবা অতি শীতল অন্ন, গুরুপাক, অরুচিকারক ও কফ বর্দ্ধক। (৪৭) ক্রমশঃ—

---

(৪৬) রসেনান্নস্য রসনা প্রথমেনাপতর্পিতা। নতথা স্বাদুমাপ্নোতি ততঃ শোধ্যাহম্বু নান্তরা। ভুক্তস্যাদৌ জলং পীতং কার্শ্যং মন্দাগ্নিদোষকৃৎ মধ্যেঽগ্নিদীপনং শ্রেষ্ঠং অন্তে স্থৌল্যকফপ্রদং। অত্যম্বুপানান্নবিপচ্যতেঽন্নং নিরম্বুপানাচ্চ সএবদোষঃ। তস্মান্নরো বহ্নিবিবর্দ্ধনায় মুহুর্মুহুর্বারি পিবেদভূরি। বিনাপ্তেন পিপাসায়াঃ শোষঃ কণ্ঠাস্যয়োর্ভবেৎ। শ্রবণাস্যাবরোধশ্চ রক্তশোষো হৃদিব্যথা। তৃষিতস্তু নচাশ্নীয়াৎ ক্ষুধিতোন পিবেজ্জলং। তৃষিতস্তু ভবেদ্গুল্মী ক্ষুধিতস্তু জলোদরী॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

(৪৭) সুধৌতাস্তণ্ডুলাঃ স্ফীতাস্তোয়ে পঞ্চগুণে পচেৎ। তদ্ভক্তং প্রস্রুতং চোষ্ণং বিশদং গুণবন্মতং। ভক্তং বহ্নিকরং পথ্যং তর্পণং রোচনং লঘু। অধৌতমস্রুতং শীতং গুর্ব্বরুচ্যং কফপ্রদং॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

(উদ্ধৃত)

প্রতিবাদ—পুরুষ বন্ধ্য, কি স্ত্রী বন্ধ্যা ?

মান্যবর শ্রীযুক্ত চিকিৎসাদর্শন সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয় !

মানবমাত্রেরই যে মতিভ্রম হইতে পারে, বোধ হয়, এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। অধুনা ইয়ুরোপ দেশে কোন একটী বিষয়ের যে ভাবে মীমাংসা হইয়া থাকে, আমাদের এই পর-পদানত দেশে সে ভাবে নির্ণয় হইবার উপায় নাই। সেই জন্য কোন বৈজ্ঞানিক বিষয়ের পোষকতা বা প্রতিবাদ করিতে হইলে তদ্বিষয়ক পাশ্চাত্য গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। কোন বৈজ্ঞানিক বিষয়কে সজীব করিতে প্রতিবাদরূপ সঞ্জীবনী-মন্ত্র প্রদান করিতে হইবে। প্রতিবাদ যাহাতে অভ্রান্ত হয়, তজ্জন্য প্রত্যক্ষীভূত প্রমাণ দেওয়া প্রয়োজন। এইরূপ প্রমাণাদির জন্য আমাদিগকে ইয়ুরোপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়। ভরসা করি, পাঠকগণ এ বিষয়ে ক্ষমা করিবেন।

আপনার ষষ্ঠ সংখ্যা চিকিৎসাদর্শনের ১৮৯ পৃষ্ঠায় "পুরুষ বন্ধ্য, কি স্ত্রী বন্ধ্যা ?" শীর্ষক যে প্রবন্ধ "চিকিৎসা-সম্মিলনী" হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা আমার বিবেচনায় প্রমাদশূন্য না হওয়ায় নিম্নলিখিত, কয়েক পংক্তি পাঠাই, আপনার পত্রিকায় স্থানদানে বাধিত করিবেন।

মানব-জীবনের ক্রিয়া সমূহকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যায় ;— ঔদ্ভিজ্জ ও নৈতিক। বিদ্যা-শিক্ষা, ধর্ম্মালোচনা, রাজ্যশাসন, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি নৈতিক ক্রিয়া (Moral functions), আর পানভোজন, বায়ুসেবন, রক্তসঞ্চালন, উৎপাদন প্রভৃতি ঔদ্ভিজ্জ ক্রিয়া (Vegetable functions) অর্থাৎ বৃক্ষলতাদি ঐ সকল ক্রিয়া যে প্রকারে সম্পাদন করিয়া থাকে, মনুষ্য

দেহে যন্ত্রের আকারগত পার্থক্য হেতু সেই সকল ক্রিয়া সামান্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া সম্পাদিত হয়। মনুষ্যের ন্যায় বৃক্ষাদির আহার্য্য বস্তু বিবিধ প্রক্রিয়ায় পরিবর্ত্তিত হইয়া তদ্দেহে ন্যস্ত হয়; মনুষ্যের রক্তসঞ্চালনের ন্যায় বৃক্ষলতাদির রস সঞ্চালিত হইয়া থাকে; মনুষ্যের শ্বাস প্রশ্বাসাদির ন্যায় উদ্ভিজ্জের শ্বাস প্রশ্বাসক্রিয়া দেখা যায় এবং মনুষ্যের ন্যায় স্ত্রীপুরুষে সংযোগ হইলে স্বজাতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। মহাশয়! বন্ধ্যা বৃক্ষ না দেখিয়াছেন এমত লোক সংসারে কয় জন আছেন? যে সকল বৃক্ষ মনুষ্য রোপণ করে, কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, অপক্ক বা দোষসংযুক্ত বীজে বন্ধ্য বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়া প্রকাণ্ড গুল্মকাণ্ডশাখাপত্রাদিতে পরিশোভিত হয়, তাহাতে যে উৎপাদিকা-শক্তি কেন থাকে না, ইহা কে বলিবে? তা না হয় মনুষ্য রোপিত বৃক্ষ ছাড়িয়া দিয়া বন্য বৃক্ষের প্রতি দৃষ্টি করিতে পারেন; উহা কি জন্য বন্ধ্য হয়, তাহার উত্তর কে দিবে; ফলতঃ বন্ধ্যত্ব অনিবার্য্য হইলেও তাহা স্ত্রীগণের পক্ষে যত প্রবল, পুরুষের পক্ষে তত নহে। অবশ্য আমি স্বীকার করি, অত্যাচার বশতঃ পুরুষগণও বন্ধ্য হইয়া থাকে; কিন্তু সৎস্বভাব ও সুগঠিত পুরুষ চিরবন্ধ্যত্বের কারণ এত বিরল, যে, তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিলেও ক্ষতি নাই। ফলতঃ সৎস্বভাব পুরুষের স্ত্রী কেন বন্ধ্যা হয়, তাহার কারণগুলি পরে প্রদত্ত হইতেছে। যে কেহ তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিবেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, স্ত্রীরই বন্ধ্যা হওয়া প্রকৃতিগত এবং পুরুষের প্রাকৃতিক বন্ধ্যত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা নিতান্ত বিরল। আমার এতগুলি কথা বলিবার ভাব এই যে, উদ্ধৃত প্রবন্ধ পাঠ করিলে, পাঠক মনে করিতে পারেন যে, স্ত্রী-পুরুষ সমভাবে বাঁজা হয়। ফলতঃ পুরুষের বন্ধ্যত্ব বৈজ্ঞানিক তর্ক বা সম্ভবত্ব ব্যতীত কিছুই নহে। এস্থলে যাহারা অত্যাচার করিয়া স্ববীর্য্যের দোষোৎপাদন করিয়াছে, তাহাদের কথা হইতেছে না।

এক্ষণে "সম্মিলনী" সম্পাদক* মহাশয়ের প্রদত্ত কারণগুলির অভ্যন্তর ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেখা যাউক। তৎপ্রদত্ত কারণ, যথা—

---

* চিকিৎসা-সম্মিলনীর যে খণ্ডে উক্ত প্রবন্ধ আছে, তাহা কাহার লেখা জানি না তজ্জন্য এস্থলে সম্পাদকের বলিয়া উল্লেখ করা হইল।

"(১) প্রকৃতিগত বন্ধ্যা হওয়া। (২) ঋতুর সময়ে স্বামীর সংসর্গের দ্বারা রজঃ বা ঋতু-শোণিতের দোষ জন্মান। (৩) স্বামীর সহিত অতি মৈথুনে রজঃ-আধিক্য, কষ্টরজঃ ও প্রদর প্রভৃতি রোগ হওয়া। (৪) উপদংশ বা গরমী এবং ধাতের পীড়াগ্রস্ত স্বামীর সহিত সহবাস দ্বারা আর্ত্তব শোণিত একবারে দূষিত হইয়া যাওয়া ও প্রদরাদি রোগোৎপন্ন হওয়া। (৫) নানাবিধ পুরাতন স্থায়ী পীড়াজন্য শরীরে রক্তাল্পতা, সুতরাং আর্ত্তব শোণিতের অভাব বা অল্পতা ঘটা। (৬) কেবল মাত্র অতিশয় কামপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া পুরুষের সহিত সংসর্গ করা। (৭) স্ত্রীর শয়নের দোষে পুরুষের শুক্র ঠিক গর্ভাশয়ে না পৌঁছান। (৮) সংসর্গকালে ক্রোধ, শোক বা ঈর্ষা, অথবা অন্য কোন দুশ্চিন্তার বশীভূত থাকা। (৯) সংসর্গকালে স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয়ের পরস্পর প্রগাঢ় প্রেম না থাকা, ইত্যাদি। (১০) তদ্ভিন্ন পুরুষের শুক্রাল্পতা, শুক্রের অবিশুদ্ধতা এবং পুরুষেরাঙ্গের ক্ষুদ্রতা প্রভৃতি দোষেও স্ত্রীজাতির সন্তান উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে।"

এই কারণগুলি অধ্যয়ন করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে স্ত্রীগণের বন্ধ্যত্বের হেতু পুরুষ যত, তাহারা নিজে তত নহে। নিজের কথা সমর্থন করিবার জন্য বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক বিষয় অতিরঞ্জিত করা উচিত নহে; যাহার প্রকৃতি যেরূপ, ঠিক তদ্রূপ বর্ণনা করা উচিত।

প্রবন্ধটী পড়িয়া এইরূপ বোধ হয় যে, "চিকিৎসা-সম্মিলনী"-সম্পাদকের মতে স্ত্রীর আর্ত্তব শোণিত ও পুরুষের বীর্য্যের সংযোগে সন্তান উৎপত্তি হয় (যথা—২, ৪, ৫সংখ্যা কারণ)। যদি কেবল মাত্র স্ত্রীর শোণিতের কথা উল্লেখ হইত, তা না হয় উহার অর্থ এক প্রকারে ধরিয়া লইতাম, কিন্তু শোণিতের বিশেষণ দেওয়াতেই বিষম গোলযোগ উপস্থিত। অতএব আর্ত্তব শোণিত কি, কিরূপে উহার উৎপত্তি, এবং কেন হয়, অগ্রে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া সম্পাদকের ভ্রম প্রদর্শন করিব।

এক যন্ত্রের পীড়ায় অন্য যন্ত্র আক্রান্ত হইলে তাহাকে সহানুভূতি কহে। যথা—চক্ষুর পীড়ায় শিরঃশূল, যকৃতের পীড়ায় স্কন্ধদেশে বেদনা, ইত্যাদি। যে যে যন্ত্রে নিকট সম্বন্ধ, এই সহানুভূতি দ্বারা একের পীড়ায় অন্যে

পীড়াগ্রস্ত হয়, একের উত্তেজনায় অন্যে উত্তেজিত হয়, এবং একের প্রবৃদ্ধিতে অপরবৃদ্ধি পায়। সেই জন্য অণ্ডজনি, জরায়ু ও স্তনদ্বয় একত্র বৃদ্ধি পায়। গর্ভাবস্থায় ও জরায়ুর পীড়াতে একই প্রকার লক্ষণের আবির্ভাব হয়।

বালিকাগণ যৌবন-প্রাপ্তির সময়ে ঋতুমতী হয়; সেই সময়ে তাহাদের অণ্ডজনি হইতে অণ্ড নির্গত হইতে থাকে ও স্তনদ্বয়ও বৃদ্ধি পায়।

বহু পরীক্ষায় ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, বিবিধ পদার্থে শোণিত গঠিত, কিন্তু ঐ বিভিন্নাংশ সকল যন্ত্রেরই পরিপোষণোপযোগী নহে; সেই জন্য একটী যন্ত্র আপন পরিপোষণোপযোগী অংশ আকর্ষণ করিলে অন্য যন্ত্রের পুষ্টি-সাধনের উপযুক্ত হয়, এবং এইরূপে তৃতীয়, চতুর্থাদি যন্ত্র আপন আপন অংশ আকর্ষণ করিয়া থাকে। মনে করুন, ক খ গ ঘ এই চারিটী পদার্থে শোণিত নির্ম্মিত। ক পদার্থ যকৃতের পুষ্টিসাধন করে, কিন্তু প্লীহার অনিষ্ট-কারী। যকৃত ক আকর্ষণ করিলে, প্লীহা খ আকর্ষণ করে ইত্যাদি। এই-রূপে শোণিতের কোন অংশ অব্যয়িত থাকিলে নানা প্রকার ব্যাধির উৎপত্তি হইতে পারে। পুরুষ, অসংখ্য লোমকূপে শোণিতের যে অংশ আকর্ষণ করে, তাহা স্ত্রীগণের শোণিতে রহিয়া যায়। করুণাময় পরমেশ্বর এই অভাব মোচনজন্য মাসিক স্রাবের নিয়ম করিয়াছেন; কিন্তু অকারণে অর্থাৎ উত্তে-জক কারণ ব্যতীত ঐ স্রাব হইতে পারে না; হইলে নানাবিধ বিশৃঙ্খলতা জন্মে। সেই জন্য যখন অণ্ডজনি অণ্ড নির্গত করিতে উত্তেজিত হয়, উক্ত উত্তেজনা সহানুভূতি দ্বারা গর্ভাশয়ে নীত হইয়া তথায় শোণিতাধিক্য হইয়া পড়ে; আবার এই শোণিত স্রাব হইয়া উক্ত শোণিতাধিক্য অপনীত হয়। রজঃসংঘটনকালে জরায়ুতে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন হয়, তাহা এ স্থলে বিবেচ্য নহে বলিয়া উল্লেখ করা হইল না। অতএব স্ত্রীগণের অণ্ডনির্গমন এবং ঋতুসংঘটন একই কার্য্য নহে, তবে সমকালীন ঘটনা এই মাত্র। অনেকের ঋতুকালে জরায়ু হইতে শোণিত নির্গত না হইয়া কর্ণ, নাসিকা, মলদ্বার, মুখ, ফুস্‌ফুস্ ও কণ্ঠস্থান হইতে রক্তস্রাব হয়; ইহাকে প্রাতিনিধিক আর্ত্তব বলা যায়। এ সকল স্ত্রীলোক নিয়মিত কালে গর্ভবতী হইয়াছে, অথচ আর্ত্তব শোণিতের সহিত পুংবীজের কিছুমাত্র সংস্রব হয় নাই। স্তন্যদায়ী

শিশুগণের সর্ব্বাঙ্গ লোমে আবৃত হওয়ায় রজঃস্বলা হয় না। একণে কারণগুলি একে একে পরীক্ষা করা যাউক।

(১) "প্রকৃতিগত বন্ধ্যা হওয়া" স্ত্রীর পক্ষে যত সম্ভব, পুরুষের পক্ষে তত নহে। এতৎসম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার নাই।

(২) "ঋতুর সময়ে স্বামীর সংসর্গের দ্বারা রজঃ বা ঋতুশোণিতের দোষ জন্মান।" যদি কিছু দোষ জন্মে, তাঁহাতে যে বন্ধ্যাত্ব ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা ক্ষণিক মাত্র; সুতরাং তাহাকে কারণ বলা যায় না। বিশেষতঃ আর্ত্তব শোণিতের সহিত সন্তানোৎপাদনের কোন সম্বন্ধ নাই; তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, ঐ সময়ে স্ত্রী-সংসর্গ করিলে আর্ত্তব শোণিতে রেতঃকণা বিধৌত হইয়া বহির্দ্দেশে নির্গত হয় এবং সেই সময়ে জননেন্দ্রিয় এক প্রকার পীড়াগ্রস্ত হওয়ায় তৎকালে উত্তেজনা হেতু বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া পড়ে, কিন্তু এই বিকৃতি ক্ষণস্থায়ী ও সহজে নিবার্য্য।

(৪) উপদংশ বা গরমীর পীড়ায় বন্ধ্যা হওয়া এক প্রকার নূতন কথা, বরং উপদংশগ্রস্ত জনক-জননীর সন্তান রক্ষা হয় না *, ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত। ধাতের পীড়ায় বন্ধ্যাত্ব জন্মে, কিন্তু গরমীতে জন্মে না। ধাতের পীড়ায় কেন জন্মে, তাহা এ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। এ স্থলে বলিতেছি, ঋতুর শোণিতের সহিত এই ঘটনার কোন সংস্রব নাই।

(৬) "কেবল মাত্র অতিশয় কামপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া পুরুষের সহিত সংসর্গ করা।" এবং (৯) "সংসর্গকালে স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয়ের পরস্পর প্রগাঢ় প্রেম না থাকা।" এই দুই কারণই এক, কেবল বাক্যের আবরণে দ্বিবিধ দেখাইতেছে। এই দুই কারণ যে ভ্রান্তিমূলক, তাহা বুঝিবার জন্য জন্ম-বৃত্তান্ত অবগত হওয়া উচিত।

স্ত্রীগণের অণ্ডজনি হইতে ভেক বা মৎস্যের অণ্ডবৎ পদার্থ প্রতি মাসে নির্গত হয়; এবং নির্গত হইবার সময় জরায়ুর ঊর্দ্ধ দুই কোণে (ইহা ত্রিকোণাকৃতি) যে কতকগুলি নলগুচ্ছ আছে, যাহাকে ফেলোপিয়াখ্য নলগুচ্ছ কহে, তাহার কোন না কোনটী দ্বারা উক্ত অণ্ডধৃত হয়। তৎপরে ঐ অণ্ড

---

* মৎকৃত বালচিকিৎসার প্রথম খণ্ড, ২২৮ হইতে ২৫২ পৃষ্ঠা।

নলের ভিতর দিয়া ক্রমে ক্রমে জরায়ুমধ্যে প্রবেশ করে। ঋতুর চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে, কখন কখন দুই সপ্তাহের যে কোন দিনে ঐ অণ্ড জরায়ুমধ্যে পতিত হয়। কদাচিৎ ঋতুকালে উহা গর্ভাশয়ে পতিত হইয়া থাকে। এ পক্ষে, পুরুষের অণ্ডে রেতঃকণা পরিবর্দ্ধিত হইয়া অণ্ডাধারে ক্রমাগত পতিত হইতেছে। রমণাবশেষে ঐ অণ্ডাধার আকুঞ্চিত হইয়া পিচকারীর ন্যায় তন্মধ্যস্থ পদার্থ পরিত্যক্ত করে; উহাকে রেতঃ কহা যায়। এই রেতঃ নানা উপাদানে বিনির্ম্মিত। অণুবীক্ষণের সাহায্যে অবলোকন করিলে পক্ষীর অণ্ডমধ্যে যে লালবৎ পদার্থ থাকে, তদ্বৎ পদার্থে ক্ষুদ্র বসা দানা এবং ক্ষুদ্রতম বেঙ্গাচির (ভেকের পোনার) ন্যায় পদার্থ দেখা যায়; উহাকেই রেতঃকণা কহে। উহার মস্তক গোল এবং তাহা হইতে একটী লাঙ্গুল নির্গত হয়। রেতঃ অত্যন্ত ঘন হইলে উহারা বড় সঞ্চরণ করিতে পারে না; কিন্তু ঈষদুষ্ণ জল বা অন্য তরল পদার্থ দ্বারা ঐ রেতঃ তরলীকৃত করিলে তাহারা যেন পরমাহ্লাদে সন্তরণ করিতে থাকে। যে সময়ে স্ত্রীর অণ্ডজনি হইতে অণ্ড নির্গত হইয়া ফেলোপিয়াখ্য নলে পতিত হয়, সেই সময়ে স্ত্রীগণের স্বামিসম্মিলন হইয়া যোনি হইতে উষ্ণ জলবৎ স্রাব নির্গত হইলে রেতঃ তরলীকৃত হয় এবং তাহার সজীব কণা সকল (ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে বলিয়া) ভেকের পোনার ন্যায় সন্তরণ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকে। যে কোন স্থানে অণ্ডজনি-বিনির্গত অণ্ডের সহিত মিলিত হয়; তথায় তাহারা উক্ত অণ্ডের চতুর্দ্দিকে জড়াইয়া পড়ে। কখন এক, কখন একাধিক রেতঃকণা এক অণ্ডে সম্মিলিত হয়। সচরাচর এক অণ্ডজনি হইতে এক অণ্ড প্রতি মাসে নির্গত হওয়ায় এক মাত্র সন্তানের উৎপত্তি হয়। কদাচিৎ উভয় অণ্ডজনি হইতে দুই অণ্ড সমকালে নির্গত হওয়ায় যমজ সন্তানের উৎপত্তি হয়। এইরূপে রেতঃকণা ও অণ্ড মিলিত হইলে উভয়ের পার্থক্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিনষ্ট হইয়া একীকৃত হইয়া থাকে। ইহাকেই কলল কহে; যথা—

"কললং ত্বেকরাত্রেণ, পঞ্চরাত্রেণ বুদ্বুদং।"

অতএব সন্তানোৎপত্তির জন্য (১) স্ত্রীর অণ্ডজনি হইতে অণ্ড নির্গত হইয়া ফেলোপিয়াখ্য নল দ্বারা জরায়ুতে পতিত হওয়া; (২) পুরুষের শুক্র,

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়-দ্বারে প্রবিষ্ট হওয়া; (৩) তথায় জলবৎ স্রাব দ্বারা তরলীভূত হওয়া; এবং (৪) রেতঃকণা সকল সন্তরণ করিয়া অণ্ডের সহিত সংযোগ হওয়া। এতগুলি ঘটনা এককালে সমুদ্ভূত হইলে সন্তানোৎপত্তি হয়। যোনি অতিশয় শুষ্ক থাকিলে, রেতঃকণা সন্তরণ করিতে পারে না; স্রাব অত্যধিক হইলে উহা বিধৌত হইয়া বহির্দেশে পতিত হয়; জরায়ুতে প্রবেশ করিবার দ্বার কোন প্রকারে বিকৃত হইলে রেতঃকণা-প্রবেশের অবরোধ জন্মে; এই সময়ে অণ্ড জরায়ুতে পতিত না হইলে রেতঃকণার সহিত সংযোগ হয় না। তবেই দেখুন, সন্তানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক স্ত্রীগণে অধিক।

যদি সম্মিলনী-সম্পাদক ঐ অণ্ডকে শোণিত বলিতে চাহেন, তাহাতেও আমার আপত্তি আছে। যকৃতের পিত্ত, স্তনের দুগ্ধ, বৃক্কের মূত্র, লালা গ্রন্থির লাল, অণ্ডজনির অণ্ড ইত্যাদিকে যদি শোণিত বলা যায়, তবে বিজ্ঞানের প্রয়োজন কি? ইলিস, রোহিত প্রভৃতি মৎস্যগণ বর্ষার প্রারম্ভে নদীর উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া, পুংমৎস্য রেতঃ, আর স্ত্রীমৎস্য অণ্ড ত্যাগ করে। জল-স্রোতে উভয় মিলিত হইলে মৎস্য-পোনার উৎপত্তি হয়। ইহাদের আদবেই সঙ্গম হয় না। ফলতঃ জন্মসম্বন্ধে উদ্ভিজ্জ ও ক্ষুদ্র প্রাণী হইতে আরম্ভ হইয়া মনুষ্য পর্য্যন্ত একই নিয়ম।

যদি এইরূপ হইল, তবে কেবল মাত্র কামপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়াই হউক, বা সংসর্গকালে উভয়ে প্রগাঢ় প্রেম না থাকুক, তাহাতে উৎপাদনের ব্যাঘাত জন্মিতে পারে না। ফৌজদারী আদালত অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, দুরাত্মা পুরুষ পাশব-প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া সবলে সতীত্ব নষ্ট করিলে, প্রগাঢ়-গৌর বা স্ত্রীরও সন্তানোৎপত্তি হইয়াছে। ডাং গাই বলেন, স্ত্রীগণ যখন অচৈতন্যাবস্থায় থাকে, তখন পুংসঙ্গম হইলেও তাহাদের সন্তান হয়। অনেক স্ত্রীলোকের নিদ্রা এত গাঢ় যে, এতদ্ঘটনাতেও তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হয় না। সেই হেতু অনেকে আপনার অন্তঃসত্ত্বাবস্থা অনেক দিন পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে না। বিগত ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ডাং গাই সাহেবের নিকট কোন এক মহিলা আসিয়া বলেন যে, তাঁহার নিদ্রা এত অধিক যে, তিনি তাঁহার স্বামীর নিকট সর্ব্বদা শুনিতে পান যে, নিদ্রাকালে তৎসহবাস হইলেও তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন না। মদিরা, অহিফেন, ধুঁতুরা প্রভৃতি খাওয়াইয়া অনেক দুরাত্মা

স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করিয়া গর্ভাধান করিয়াছে। যখন রেতঃ ও অণ্ডের সংযোগে সন্তানোৎপত্তি হয়, তখন প্রগাঢ় প্রেমের সহিত রমণ-কার্য্য ব্যতীতও উহা সংঘটিত হইতে পারে। ডাং কাপুরণ, বেক্, ফে'দার, দিগ্রান্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ এই মতে আস্থা দিয়া তাঁহাদের পুস্তকে শত শত বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

অষ্টম কারণও যে ভ্রান্তিমূলক. তাহা পৃথক্ করিয়া দেখাইতে হইবে না।

(১০) "তদ্ভিন্ন পুরুষের শুক্রাল্পতা" ইত্যাদি পূর্ব্বে যাহা ব্যক্ত হইল, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইবে বিশুদ্ধ শুক্র অত্যল্প হইলেও অর্থাৎ চক্ষুর অগোচর যে একটী মাত্র রেতঃকণা, তাহার সংযোগেও গর্ভাধান হইতে পারে; এবং পুরুষাঙ্গ যত কেন ক্ষুদ্র হউক, এমন কি, পীড়া হেতু তাহার একার্দ্ধের অধিক ভাগ কর্ত্তন করিলেও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত জন্মে না।

আর (৭) স্ত্রীর শয়নের দোষে পুরুষের শুক্র ঠিক গর্ভাশয়ে" না পৌঁছিলেও ক্ষতি কি? যখন রেতঃকণা সন্তরণ করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতে পারে, তখন জননেন্দ্রিয়ের যে কোন স্থানে উহা পতিত হউক, উপযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হইবে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, যদি রেতঃকণার সন্তরণ-শক্তি আছে, তবে উহা গর্ভাশয় ছাড়িয়া তদূর্দ্ধে উঠে না কেন? গর্ভ-চর্ম্মের ঊর্দ্ধ দুই কোণে দুইটী ছিদ্র আছে; এই ছিদ্রের সহিত ফেলোপিয়াখ্য নলের সংযোগ থাকে। কখন কখন রেতঃকণা গর্ভাশয় পরিত্যাগ করিয়া উক্ত নলে উত্থিত হয়, এবং তথায় অণ্ড থাকিলে তৎসহ মিলিত হয়। সুতরাং গর্ভাশয়ের বহির্দ্দেশ, উদরমধ্যস্থ অন্ত্রের উপরি ভ্রূণ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। অবশ্যই এ সকল ভ্রূণ প্রসূত হয় না, অস্ত্রোপচার দ্বারা বিনির্গত করিতে হয়।

বিষয়টী যেরূপে বর্ণিত হইল, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, (১) শুক্রের দোষ জন্মিলে, বিশেষতঃ তাহাতে রেতঃকণার অভাব বা অপক্ব হইয়া নির্গত হইলে পুরুষকে বন্ধ্যা কহা যায়। আর (২) যোনি অত্যন্ত শুষ্ক হইলে; (৩) তাহার স্রাব অত্যধিক হইলে; (৪) ঐ স্রাব বিকৃত-ভাবাপন্ন হইয়া শুক্র-সংযোগে রেতঃকণা ধ্বংস করিলে; (৫) রেতঃপ্রবেশের প্রতিবন্ধ থাকিলে এবং (৬) চিরব্যাধি হেতু অণ্ডজনিতে সুপক্ব ও সুস্থ অণ্ড উৎপত্তি না হইলে

স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব ঘটিয়া থাকে। রেতঃকণা-প্রবেশের প্রতিবন্ধ অল্প নহে; মৎকৃত "স্ত্রীরোগবিধায়ক" গ্রন্থে উক্ত প্রতিবন্ধ ১৭টী দেখান হইয়াছে। যাঁহারা এ বিষয়টী বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন, উক্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবেন। সুখের বিষয় এই, বন্ধ্যা হইবার যতগুলি কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে, চিকিৎসা করিলে তাহার অধিকাংশই অপনীত হইতে পারে।

শ্রীহরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এল্, এম্, এস্।

মোং সাইতা।

চতুর্থ খণ্ড ২য় ও ৩য় সংখ্যা চিকিৎসা-সম্মিলনীতে পুরুষবন্ধ্য কি স্ত্রী বন্ধ্যা? নামক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, ডাক্তার হরিনারায়ণ বাবু তাহারই প্রতিবাদ করিয়া চিকিৎসাদর্শন নামক পত্রিকায় মুদ্রিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিবাদ সঙ্গত কি অসঙ্গত হইয়াছে, স্থানাভাব বশতঃ যদিও এবারে সে সম্বন্ধে কিছুই বলা হইল না, তবে তাঁহার প্রতিবাদ কতদূর যুক্তিযুক্ত হইয়াছে, এবারে আমাদের সুবিজ্ঞ পাঠকগণই তাহার বিচার করুন। বারান্তরে এ সম্বন্ধে আমরাও কিছু বলিব।

গর্ভোৎপত্তিক্রম।

আয়ুর্ব্বেদ মতে।

(প্রাপ্ত)

যদি কোন কামাতুরব্যক্তি কাম-মদে উন্মত্ত হইয়া এবং ঘৃণার মাথায় একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া ঋতুস্রবণের দিন হইতেই রজঃস্বলা স্ত্রীতে উপগত হয়, তাহা হইলে ঐ দুষ্ট শোণিত পুংজননেন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার শুক্র

ধাতুকে একেবারে দূষিত করিয়া ফেলে এবং ক্রমে ক্রমে তাহার আয়ুঃ-সংখ্যাও হ্রাস হইয়া পড়ে। আবার ঐ স্ত্রীও ক্রমে ক্রমে রজঃসম্বন্ধীয় নানা-প্রকার পীড়ায় জড়িত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। দ্বিতীয় দিবসে সঙ্গম হইলে যদিও ভাগ্যক্রমে গর্ভ গৃহীত হয়, কিন্তু তাহা কখনও নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা পাইতে পারে না। তৃতীয় দিবসে গর্ভ হইলেও তৎসম্ভূত সন্তান অবশ্যই অল্পায়ু ও বিকলাঙ্গ হইয়া পড়ে। অতএব ঋতুস্নানের প্রথম তিন দিবস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। আবার আর্য্যগণ আরও বলিয়াছেন যে, ঋতুস্নানের পর ১৬ দিনের মধ্যে যত শীঘ্র গর্ভগৃহীত হয়, গর্ভস্থ সন্তান ততই কুৎসিত হইয়া থাকে; আর যত পরে গর্ভসঞ্চার হয়, সন্তান ততই সুন্দর হইবার সম্ভাবনা। সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বোধহয় সকলেই এই কথার যাথার্থ্য নিরূপণ করিতে পারিবেন। আমি যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে ইহা কখন মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। অপত্যার্থী পুরুষের স্ত্রীসম্ভোগ সম্বন্ধে 'ভাবপ্রকাশে' এইরূপ লিখিত আছে—

যুগ্মাসু পুত্রা জায়ন্তে স্ত্রিয়োঽযুগ্মাসু রাত্রিষু।

যুগ্ম রাত্রিতে স্ত্রী সম্ভোগ করিলে পুত্র এবং অযুগ্ম রাত্রিতে কন্যা জন্মে।

আধিক্যে রেতসঃ পুত্রঃ কন্যাস্যাদার্ত্তবেঽধিকে।
নপুংসকং তয়োঃ সাম্যে—

সম্ভোগের সময় শুক্র শোণিতের মধ্যে যদি শুক্রের পরিমাণ কিঞ্চিৎ অধিক হইলে পুত্র, আর শোণিতের পরিমাণ অধিক হইলে কন্যা জন্মে। কিন্তু শুক্র শোণিত উভয়ই সমান হইলে নপুংসক জন্মিয়া থাকে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যুগ্মাযুগ্ম রাত্রিতে শুক্র শোণিতের এই প্রকার তারতম্যই হইয়া থাকে।

আরও মহাত্মা সুশ্রুত বলিয়াছেন—

একং মাসেন রসঃ শুক্রো ভবতি স্ত্রীণাঞ্চার্ত্তবং।
স্ত্রীণাঞ্চেতি চকারাৎ স্ত্রীণামপিশুক্রং ভবতি॥

এই প্রকার একমাসের মধ্যে রসের স্থূল ভাগ হইতে পুরুষের শুক্রোৎপত্তি

হয়, সেই প্রকার স্ত্রীলোকদিগেরও আর্ত্তব ব্যতীত শুক্র উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যোষিতোঽপি স্রবত্যেব শুক্রং পুংসঃ সমাগমে।
তত্র গর্ভস্য কিঞ্চিত্তু করোতীতি ন চিন্ত্যতে॥

যখন রমণীগণ পুরুষের সহিত সঙ্গমে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহাদের ও শুক্র স্রাব হইয়া থাকে এবং উহাও গর্ভোৎপাদনের অন্যতম কারণ। তজ্জন্যই—

যদা নার্য্যাবুপেয়াতাং বৃষস্যন্ত্যৌ কথঞ্চন।
মুঞ্চন্ত্যৌ শুক্রমন্যোঽন্যমনস্থি স্তত্র জায়তে॥

যদি দুইটী স্ত্রীলোক কামোন্মত্তা হইয়া পরস্পরের যোনি ঘর্ষণের দ্বারা শুক্র ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাতেও গর্ভোৎপত্তি হইতে পারে। কিন্তু ঐ গর্ভে অস্থিশূন্য বা কোমল অস্থিবিশিষ্ট সন্তান জন্মে।

ঋতুস্নাতাতু যা নারী স্বপ্নে মৈথুনমাচরেৎ।
আর্ত্তবং বায়ুরাদায় কুক্ষৌ গর্ভং করোতি হি॥

যদি কোন রমণী ঋতুস্নান করিয়া স্বপ্নে মৈথুনাচরণ করে, তবে তাহার আর্ত্তব, বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া কুক্ষিতে স্থাপিত হয় এবং তাহাও গর্ভরূপে পরিণত হইতে পারে।

মাসি মাসি প্রবর্দ্ধেত স গর্ভো গর্ভলক্ষণঃ।
কললং জায়তে তস্য বর্জ্জিতং পৈতৃকৈর্গুণৈঃ॥

সেই গর্ভ সম্পূর্ণরূপ গর্ভলক্ষণাক্রান্ত হইয়া মাসে মাসে বৃদ্ধি প্রাপ্তও হইতে পারে। কিন্তু তন্মধ্যস্থিত সন্তান একবারে পৈতৃক গুণে অর্থাৎ কেশ, শ্মশ্রু, লোম, নখ, দন্ত, শিরা, স্নায়ু, ধমনী ও শুক্র প্রভৃতিতে বর্জ্জিত হইয়া থাকে। পরে একটী কলল অর্থাৎ চর্ম্মাবৃত এক প্রকার পদার্থ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

অদূরদর্শী ব্যক্তিগণ এই সমস্ত কথাগুলিকে একবারে বাতুলতা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন। তাঁহারা যাহাই বলুন না কেন, একটুক মনোনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহার একটী কথাও মিথ্যা বলিয়া প্রতীত

হইবে না। নানা বিধ পুরাণ ইতিহাস পাঠ করিলে সন্তান উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য অদ্ভূত ঘটনাবলীর বিষয় জানিতে পারা যায়, তাহাই না হয় ছাড়িয়া দিলাম; কিন্তু বর্ত্তমান সময়েও কোন কোন গর্ভ হইতে কখন কখন যে নিতান্ত বিকলাঙ্গ বা ডিম্বাকার সন্তানের প্রসব হইতে দেখা যায়, তাহাও কি বিশ্বাস করিব না? তদ্রূপ কোন সন্তান প্রসব হইলে, আমাদের দেশের ইতর লোকেরা ভূত, প্রেত প্রভৃতি জন্মিয়াছে বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে। আবার যাঁহারা পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত, তাঁহারা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াও তৎসম্বন্ধে কিছুই অনুসন্ধান করেন না। এই সমস্ত গুরুতর অথচ প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে হইলে পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। কিন্তু তাহাও এক জীবনে পার পাইয়া উঠে না, সুতরাং লোক পরম্পরায় শ্রুত হইয়া যথাসাধ্য আলোচনা করিলেও কিছু না কিছু মীমাংসা হইতে পারে। আমরা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া যাহা স্থির করিব তাহাতেও বরং ভুল থাকিতে পারে; কিন্তু তথাপি সেই প্রাচীন যোগী ঋষি দিগের বহুল চিন্তালব্ধ কথাতে কিছু মাত্রও ভুল থাকা অসম্ভব। তবে আজ কাল আমাদের দেশে সকলেই হুজুকে লোক হইয়াছে; যে পর্য্যন্ত কোন সাহেবের মুখ হইতে এই কথা নির্গত না হইবে, সে পর্য্যন্ত কেহই ইহা বিশ্বাস করিবেন না।

আবার যমজ সন্তান সম্বন্ধে ভাবপ্রকাশে উক্ত হইয়াছে—

বীজেঽন্তর্ব্বায়ুনা ভিন্নে দ্বৌ জীবৌ কুক্ষিমাগতৌ।
যমাবিত্যভিধীয়েতে ধর্ম্মেতর পুরঃসরৌ॥

বীজ অন্তর্ব্বায়ুদ্বারা বিভক্ত হইয়া কুক্ষিতে আগমনপূর্ব্বক দুই যমজ জীব উৎপন্ন করে। ঐ যমজ জীব ধর্ম্মাধর্ম্মসম্ভূত।

গর্ভো বাত প্রকোপেন দোহদে বাপমানিতে।
ভবেৎ কুব্জঃ কুণিঃ পঙ্গুর্মূকোমিম্মিন এবচ॥

(ভাবপ্রকাশ)

অভিলষিত দ্রব্যাদির অপ্রাপ্তি হইলে গর্ভিণীর বায়ু অত্যন্ত কোপিত

হইয়া থাকে এবং তজ্জন্যই গর্ভে কুব্জ, কুণি, বোবা, পঙ্গু ও বিকির্ণ প্রভৃতি জন্মে।

আহারাচার চেষ্টাভির্যাদৃশীভিঃ সমন্বিতৌ।
স্ত্রী পুংসৌ সমুপেয়াতাং তয়োঃ পুত্রোঽপি তাদৃশঃ॥
(ভাবপ্রকাশ)

অপত্যার্থী পুরুষের সঙ্গমকালে আহার ও আচারসম্বন্ধে সাধারণতঃ তাঁহাদের যে প্রকার মনের ভাব হইয়া থাকে, তাহাদের পুত্র ও ঠিক সেই প্রকার ভাব বিশিষ্ট হয়। অর্থাৎ সেই সময় উভয়ের মনোমধ্যে ধর্ম্মভাবের আবির্ভাব হইলে সন্তান ধার্ম্মিক এবং অধর্ম্মের চিন্তায় অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হইলে সন্তানও যার পর নাই অধার্ম্মিক হইয়া থাকে। যদিও কোন কোন ব্যক্তি এই কথা আপাততঃ নিতান্ত বিস্ময়কর বা উপহাসের যোগ্য বলিয়া স্থির করুন না কেন, কিন্তু অতি সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চয় জানা যাইবে যে ইহা বড় সারবান কথা—ইহা অতি সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অতি গভীরতম স্থান হইতেসম্ভূত হইয়াছে। এই কথার যাথার্থ্য নিরূপণ করিতে হইলে, জ্যোতিষাদি নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতে হয়, সুতরাং অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়ে। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে করুণাময় পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য সৃষ্টি কৌশল! সেই কৌশল-ভাবে জড়িত থাকায় গ্রহ, নক্ষত্রাদির লগ্ন অনুসারে সঙ্গম কালীন স্ত্রী পুরুষের চিত্তবৃত্তি যতদূর পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া দাঁড়ায়, তজ্জাত সন্তানগণেরও মানসিক অবস্থা ঠিক্ সেই পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ভাগ্যক্রমে কাহারও বা সুসন্তান হইয়া পিতৃবংশ উজ্জ্বল করিয়া তুলে, আবার কাহার ও বা নিতান্ত কুলাঙ্গার জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃকুল একবারে নির্ম্মূল করিতে থাকে। এবং তজ্জন্যই একই পিতা-মাতার ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

এস্থলে পুরুষের শুক্র এবং স্ত্রীদিগের মাসিক রজস্রাব সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। তাহা তত্তৎ রোগাধিকারে বক্তব্য। কেবল গর্ভোৎপত্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য এবং তাহাতেই প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

ঋতৌ স্ত্রীপুংসয়োর্যোগে মকরধ্বজবেগতঃ।
মেঢ্রযোন্যভিসংঘর্ষাচ্ছরীরোষ্মানিলাহতঃ॥
পুংসঃ সর্ব্বশরীরস্থঃ রেতো দ্রাবয়তেঽথতৎ॥
বায়ুর্মেহন মার্গেন পাতয়ত্যঙ্গনা ভগে॥
তৎসংক্রুত্যাবর্ত্তমুখং যাতি গর্ভাশ্রয়ং প্রতি।
তত্র শুক্রবদা [illegible]র্ত্তবেন যুতং ভবেৎ॥

(ভাবপ্রকাশ)

কামোন্মত্ততাপ্রযুক্ত ঋতুকালে যখন স্ত্রী পুরুষে পরস্পর সম্ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন মেঢ্র ও যোনির সংঘর্ষণে যে উষ্ণতা উদ্ভূত হইয়া থাকে, সেই উষ্ণতা দ্বারা পুরুষের সর্ব্ব শরীবস্থ শুক্র দ্রবীভূত হয় এবং বায়ু ভয়ে মেহন মার্গ দ্বারা নারীর ভগে পতিত হইয়া গর্ভাশয়ে প্রতিগমন করে। তথায় শুক্রবৎ আগত আর্ত্তবের সহিত যুক্ত হইয়া গর্ভরূপে পরিণত হয়।

শুক্রশোণিতয়ো[illegible]থ শ্রমোদ্ভবঃ।
সক্থিসাদঃ পিপাসা চ গ্লানিঃস্ফূর্ত্তির্ভগে ভবেৎ॥

(সুশ্রুত সংহিতা)

যদি শুক্র শোণিতে যোনির আর্দ্রতা বা স্ফূর্ত্তি হয়, যদি সঙ্গমকালে অত্যন্ত শ্রমোদ্ভব, সক্থিসাদ, পিপাসা ও গ্লানি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে নিশ্চয় গর্ভোৎপত্তি হইয়াছে জানিতে হইবে।

স্তনয়োর্মুখকার্ষ্ণ্যং [illegible] রাজ্যুদ্গম স্তথা।
অক্ষিপক্ষ্মাণি চাপ্যস্যাঃ সংমীল্যন্তে বিশেষতঃ॥
ছর্দ্দয়েৎ পথ্যভুগাপি গ[illegible]ত শুভাৎ।
প্রসেকঃ সদনশ্চৈব গর্ভিণ্যা লিঙ্গ উচ্চতে॥

(সুশ্রুত সংহিতা)

গর্ভবতী স্ত্রীর সাধারণতঃ স্তনদ্বয়ের মুখ কৃষ্ণবর্ণ, রোমসমূহের উদগম, চক্ষুর পক্ষ সংমীলন, ভোজনে ছর্দ্দি, শুভগন্ধে উদ্বেগ, প্রসেক ও সদন, এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

পুত্রগর্ভবৃতায়াস্তু নার্য্যা মাসি দ্বিতীয়কে।
গর্ভো গর্ভাশয়ে লক্ষ্যঃ পিণ্ডাকারোঽপরং শৃণু॥
দক্ষিণাক্ষি মহত্বং স্যাৎ প্রাক্ক্ষীরং দক্ষিণে স্তনে।
দক্ষিণোরুঃ সুপুষ্টঃ স্যাৎ প্রসন্নমুখবর্ণতা॥
পুন্নামধেয় দ্রব্যেষু স্বপ্নেষ্বপি মনোরথঃ।
আম্রাদি ফলমাপ্নোতি স্বপ্নেষু কমলানি চ॥

সুশ্রুত-সংহিতা।

পুত্রবতী গর্ভিণীর দ্বিতীয় মাসে গর্ভাশয়ে এক পিণ্ডাকার পদার্থ লক্ষিত হয়। দক্ষিণাক্ষি বৃহৎ হয়, অগ্রে দক্ষিণ স্তনে দুগ্ধ জন্মে, দক্ষিণ উরু সুপুষ্ট ও মুখের বর্ণ সুপ্রসন্ন হয়। স্বপ্নেতেও পুত্রাভিলাষ জন্মে এবং আম্র ও পদ্মাদি দেখিতে পায়।

কন্যাগর্ভবতী গর্ভে পেশী মাসি দ্বিতীয়কে।
পুত্রাগর্ভস্য লিঙ্গানি বিপরীতানি চেক্ষতে॥

সুশ্রুত-সংহিতা।

গর্ভে কন্যা হইলে দ্বিতীয় মাসে পেশী দীর্ঘাকৃতি হয় এবং পুত্রবতী গর্ভিণীর বিপরীত লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয়।

নপুংসকং যদা গর্ভে ভবেৎ গর্ভোঽর্ব্বুদাকৃতিঃ।
উন্নতে ভবতঃ পার্শ্বে পুরস্তাদুদরং মহৎ॥

সুশ্রুত-সংহিতা।

যে গর্ভে নপুংসক জন্মে তাহা অর্ব্বুদাকৃতি (গোলাকার ফলের অর্দ্ধাংশ) হয় এবং উদরের পার্শ্বদ্বয় উন্নত ও সম্মুখ প্রদেশ বৃহৎ হইয়া পড়ে।

নপুংসক সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অনেক বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। বাহুল্যভয়ে তৎসমুদয়ে ক্ষান্ত থাকিলাম। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মাসে গর্ভের যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হইয়া থাকে তাহাই দেখা যাইবে।

ক্রমশঃ—

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়—
উমার পুর, পাবনা।

ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ প্রণালী।

(কবিরাজী মতে।)

জ্বরাধিকার।

স্বল্পকস্তুরীভৈরব।

* হিঙ্গুল, * অমৃত, * সোহাগা, জৈত্রী, জায়ফল, * মরিচ, * পিপুল, মৃগনাভি।

প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিতে হইবে। যে পরিমাণে ঔষধ প্রস্তুত করা আবশ্যক হয়, তদনুসারে একটা ভাগ স্থির করিয়া সেই পরিমাণে শোধিত ও শুষ্ক অমৃত ওজন করিয়া লও। সেই অমৃত গুলি কুটি কুটি করিয়া কাটিয়া বেশ পরিষ্কার জলে পাথরের পাত্রে বা কাচ পাত্রে অথবা তথাবিধ অধাতব পাত্রে ভিজাইয়া রাখ। যে পরিমাণ জল দিলে অমৃত গুলি মগ্ন হয়, সেই পরিমাণ জল দিলে চলিবে। ১ প্রহর ১॥ প্রহর পরে আগে অমৃত মাড়িয়া হইলে, তৎপরে শোধিত, সিন্দূরের ন্যায় চূর্ণীকৃত, তুল্য পরিমাণ হিঙ্গুলের সহিত, ভিজান অমৃত বেশ করিয়া মাড়িয়া লইতে হইবে। অমৃত ভিজান জল যাহা থাকে তাহা ফেলিয়াদিতে হইবে না, মাড়িবার সময় জলের আবশ্যক হইলে সেটুকু কাজে লাগাইয়া লইবে। হিঙ্গুল ও অমৃত ভাল করিয়া মাড়া হইলে, সোহাগার খৈ, তারপর জৈত্রী প্রভৃতির সূক্ষ্ম চূর্ণ গুলি একে একে তুল্য পরিমাণে পর পর মিশাইবে। আবশ্যক মত পরিষ্কার জল দিয়া

লইবে। তার পর দুই প্রহরকাল নাড়িবে। বটিকা বাঁধিবার উপযোগী হইলে ২ দুই রতি প্রমাণ বটী বাঁধিয়া শুষ্ক করতঃ শিশির ভিতর মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে। যে পাত্রে ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা যেন খুব পরিষ্কার করিয়া ধুওয়া হয় একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কথাটা যেন বেশ স্মরণ থাকে।

জৈত্রী—জায়ফল;—এই দ্রব্য দুইটী বেশ প্রসিদ্ধ, সকলেই চিনে, সুতরাং বিশেষ পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নাই। যে জায়ফল ও জৈত্রীতে পোকা ধরে নাই, বেশ তাজা আছে, থেঁতো করিলে থলে তৈল দেখা যায় তাহাই গ্রহণ করিবে। গ্রন্থ বিশেষে এই জায়ফল প্রভৃতি শোধন করিবার উপদেশ আছে, কিন্তু সচরাচর অশোধিত অবস্থাতে ঔষধে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তজ্জন্য তাহার কথা এস্থলে বলিলাম না; স্থলান্তরে উল্লেখ করিব। কস্তুরী বা মৃগনাভি;—কস্তুরিকা মৃগনামে শৃঙ্গবিহীন এক প্রকার হরিণ আছে। এসিয়া খণ্ডের নেপাল, তিব্বত, ভুটান এবং চীন প্রভৃতি দেশে ইহাদের বাসস্থান। এই জাতীয় হরিণের নাভির পশ্চাতে লিঙ্গ আবরক চর্ম্মের পুরোভাগে লম্বিত কোষাভ্যন্তরে এই পদার্থসঞ্চিত হয়। কোষ বা শিম্বি চক্রাকারে রোমরাজী বেষ্টিত। পরিণত শিম্বির অভ্যন্তরে অসম-খণ্ড কস্তুরী পাওয়া যায়। মৃগনাভি দেখিতে পিঙ্গল বর্ণ, তিক্ত ও উগ্র আস্বাদ বিশিষ্ট, হাল্কা, মর্দ্দন করিলে চিক্কণাভা প্রকাশ পায়, আগুনে দিলে ভস্ম হয় না, পুড়িবার কালে মিশ্‌মিশ্ শব্দ করে এবং অগ্রে সুগন্ধ বাহির হয় পশ্চাৎ চর্ম্মগন্ধ পাওয়া যায়। মৃগনাভির গন্ধ অতি মনোরম, ভাঙ্গিলে কেতকীফুলের ন্যায় গন্ধ বিস্তারিত হয়।

ক্রিয়া ও প্রয়োগ প্রণালী।

স্বল্পকস্তুরী ভৈরব সান্নিপাত জ্বরের ভাল ঔষধ। অন্যবিধ নবজ্বরে এবং স্থল বিশেষে পুরাতন জ্বরে ও প্রয়োগ করা গিয়া থাকে। অনেকদিন হইতে বিশেষ সতর্কতার সহিত আমি এই ঔষধের ফলাফল পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি; পরীক্ষায় ইহার গুণাগুণ যাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি তাহা বলা যাইতেছে।

নব জ্বরে।

যখন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মৃদু হয়, তজ্জন্য শাখা প্রশাখায় রক্ত সঞ্চালনের অল্পতা ঘটে, সুতরাং হাত, পা শীতস্পর্শ হয় এবং রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন উপযুক্ত মাত্রায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল দর্শে। উপদ্রবাদির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অনুপান কল্পনা করিতে হয়। এই ঔষধের অন্যতম উপাদান মৃগনাভির গুণে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বৃদ্ধি হয়; হিঙ্গুল ও তথাবিধ ক্রিয়ার সহায় হইয়া থাকে।

প্রবল জ্বরাবস্থায় ও ইহার প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়া থাকে। এই ঔষধের একটী আশ্চর্য্য প্রভাব এই যে, মৃদুতাপন্ন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া, ইহার প্রয়োগে যেমন বর্দ্ধিত হয়, হৃৎপিণ্ডের গতি, দ্রুত হইলেও ইহার বলে সংযমিত হয়। এই জন্য প্রবল জ্বরাবস্থায় ইহা দ্বারা সুফল পাওয়া গিয়া থাকে। জ্বর কালীন প্রলাপ থাকিলেও ইহার প্রয়োগে বেশ উপকার পাওয়া যায় এবং রোগী অবসন্ন ও হতজ্ঞানের ন্যায় হইয়া পড়িলে সত্বর চাঙ্গা করিয়া তুলে।

জ্বরের শীতলাবস্থায় প্রয়োগ করিলে শীত বা কম্পের লাঘব হইতে পারে। এবং শীঘ্র শীঘ্র উষ্ণাবস্থা ঘটাইয়া জ্বরের ভোগ লাঘব করিয়া থাকে। ইহার জ্বরঘ্ন শক্তি ও প্রশংসনীয়।

পুরাতন জ্বরে।

যে জ্বরে রক্তের শোণিকার ভাগ বড় অল্প হইয়া যায়, চখের নীচের পাতা টানিয়া ধরিলে রক্তের চিহ্ন দেখা যায় না; শরীরের বর্ণ পাণ্ডু হইয়া উঠে এবং মুখমণ্ডলে ও পদদ্বয়ে শোথ দেখা দেয়, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মৃদু হয় সুতরাং নাড়ী অতি ক্ষীণ হইয়া পড়ে, দৃষ্টিশক্তির অল্পতা ঘটে, অথবা মস্তকাচ্ছন্নতা উপস্থিত হয়, আহারে রুচি থাকে না—সেই জ্বরে মৃগকস্তুরী ভৈরব সবিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। এরূপ অবস্থায় দিবসে ৩।৪ বার এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে, রোগীর হৃৎপিণ্ডের অবস্থা ভাল হইয়া উঠে; পিত্তনিঃসরণ ক্রিয়া

প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠে এবং পরিপাক শক্তির বৃদ্ধি হয়। এই ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে অরম্ন লৌহঘটিত ঔষধ ২।৩ ভাগ প্রয়োগ করা গিয়া থাকে।

অন্যান্য রোগে।

প্রসবের পর আক্ষেপক বায়ুরোগে স্বয়ম্ভু কস্তুরীভৈরব প্রয়োগ করিলে বেশ ফল পাওয়া যায়। দিবসে ৪।৫ বার ব্যবহার করাইলে আক্ষেপ কমিয়া যায় এবং স্নায়ুমণ্ডল সজীব করিয়া তুলে সুতরাং অচৈতন্য অবস্থা থাকিলে চৈতন্যের সঞ্চার হয়।

হিক্কারোগে কস্তুরী ভৈরব প্রয়োগে বেশ ফল পাওয়া যায়। কর্পূর ও লাউয়ের আঁকড়ার রস সহযোগে প্রয়োগ করিলে সুফল ফলিয়া থাকে।

পঞ্চানন রস।

* অমৃত ২, * মরিচ ৪, * গন্ধক ৩, * হিঙ্গুল ১, তাম্র ২।

আকন্দের মূল তুলিয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া লইতে হইবে। এরূপভাবে পরিষ্কার করিতে হইবে, যেন উপরের মরা বল্কল না থাকে অথচ তরুণ ত্বক্ ক্ষয়িত না হয়। তার পর অস্ত্র দ্বারা মূলের ত্বক্ ছাড়াইয়া লইয়া, সেই ছাল গুলি ছেঁচিয়া রস লইবে। সেই রস দিয়া আগে অমৃত মাড়িয়া লইয়া যথাক্রমে পরিষ্কৃত, শোধিত, চূর্ণীকৃত এবং জারিত, মরিচাদির চূর্ণ তাহার সঙ্গে মিশ্রিত করিবে। আবশ্যকমত আকন্দের মূলের ছালের রস দিয়া মাড়িতে হইবে। বটী প্রস্তুতের উপযোগী হইলে ১রতি প্রমাণ বটীকা বাঁধিতে হইবে।

ক্রিয়া ও প্রয়োগ-প্রণালী।

পঞ্চানন রস নবজ্বরে প্রয়োগ হয় না, প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফললাভ হয় কি না? এরূপ প্রয়োগ প্রচলিত আছে কি না? তাহা আমি অবগত নহি। মধ্য ও পুরাতন জ্বরে প্রয়োগ করা গিয়া থাকে। কিন্তু তরুণ জ্বরে এই ঔষধ বিশেষ সুফল প্রদান করে এরূপ বোধ হয় না। তবে

কোন কোন স্থলে ইহার ফল অতীব প্রশংসনীয়। যেরূপ পীড়ায় যে অবস্থায় পঞ্চানন রস অত্যন্ত সুফল প্রদান করে তাহার বিশেষ বিবরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

আজি কালি জরাবস্থায় যকৃতের বিকার ঘটিতে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। ১২।১৪ দিন জর ভোগ করিলেই অনেক স্থলে যকৃৎ ব্যাধিত হইয়া পড়ে। কোন স্থলে যকৃতের দক্ষিণ শকল (খণ্ড) বিকৃত হয়, পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, যকৃৎ অস্বাভাবিক ভাবে বর্দ্ধিত হইয়া সবেদন শোথগ্রস্ত হইয়াছে; কুত্রাপি বাম শকল বৃদ্ধি পাইয়া নামিয়া পড়িয়াছে, হাত দিয়া দেখিলে একখণ্ড পাতলা কোমলস্পর্শ পাতের ন্যায় বোধ হয়; কোথায় ও যকৃত কঠিন হইয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে; স্থল বিশেষে যকৃৎ বিকার-জন্য পিত্তের বিকৃতি হেতু নেত্র, মূত্র, ত্বক্ প্রভৃতি হরিদ্রাবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। জরজন্য যকৃৎ বিকার, বালক-বালিকারই কিছু বাড়াবাড়ী; মধ্যম বয়স্কদিগের তদপেক্ষা অল্প, প্রবীণ ব্যক্তিদিগের তার চেয়েও কম। বিশ ত্রিশ বর্ষ পূর্ব্বে এরূপ যকৃদ্বিকারের কথা শুনা যাইত না, এখনও কোন্ কোন্ দেশে এরূপ বিকারের কীদৃশ প্রভাব তাহাও জানিনা। আমাদের এ অঞ্চলে জর নিমিত্তক যকৃদ্বিকারের বড়ই প্রাচুর্ভাব।

এরূপ যকৃৎ সংযুক্ত জরে পঞ্চানন রস অব্যর্থ ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি অনেক দিন হইতে বহুতর রোগীর উক্ত বিধ পীড়ায় একমাত্র পঞ্চানন রস প্রয়োগ করিয়া বেশ সুফল পাইয়া আসিতেছি। দিবসে ২।৩ বটী প্রয়োগ করা গিয়া থাকে। দারুহরিদ্রা ঘসিয়া ঘৃষ্ট চন্দনের ন্যায় করিয়া তাহার কিয়দংশ দিয়া আগে বটিকা মাড়িয়া লইবে, তার পর ২ দুই তোলা পরিমাণ উক্ত দ্রব্য যোগে মাড়িয়া কিঞ্চিৎ মধু সহ পান করিতে দিবে।

যথায় জর মূল পীড়া নয়, ত্বক্, মূত্র, নয়ন, আনন, হরিদ্রাবর্ণ হইয়াছে, সঙ্গে জর আছে বা না থাকে, এক কথায় কামলা রোগে পঞ্চানন রস প্রয়োগে প্রায়ই সুফল পাওয়া যায়। উক্ত বিধ অনুপান যোগেই প্রয়োগ করিবে।

এস্থলে একটী কথা বক্তব্য আছে। ভৈষজ্য রত্নাবলী নামক প্রসিদ্ধ

বাঙ্গালা ডাক্তারী গ্রন্থে যকৃৎ প্রদাহে দারুহরিদ্রা প্রয়োগ নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু তথাবিধ স্থলে দারুহরিদ্রা অনুপানে পঞ্চানন রস প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছি সুফল ভিন্ন কুফল ফলে নাই।

ক্রমশঃ—

মাগুরা (খুলনা) } শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন।

তৈলপাক ও প্রয়োগ প্রণালী।

বৈদ্যমতে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিশুদ্ধরূপে তৈলপাক করিতে হইলে কিরূপ অকৃত্রিম অর্থাৎ খাঁটী তৈলের দরকার এবং কিরূপেই বা সেই তৈলের সংগ্রহ করিতে হয়, গতবারে তাহা বলা হইয়াছে। অতঃপর অকৃত্রিম তৈলের পাক-প্রণালী ক্রমশঃ বলা যাইতেছে। কিন্তু তৈলের পাক সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে প্রথমে দেখা যাউক কিরূপ পাত্রে কতটুকু মাত্রায় কোন্ কোন্ কাষ্ঠদ্বারা জ্বালদিয়া তৈলপাক করা আবশ্যক।

সাধারণতঃ মৃত্তিকা, লৌহ ও তাম্র এই ত্রিবিধ পাত্রের অন্যতম পাত্রে তৈল ও ঘৃতাদি পাককরা আবশ্যক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাদের মধ্যে তৈল ঔষধ পাক সম্বন্ধে মৃত্তিকাপাত্রই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু ইহা একদিকে যেমন অন্যান্য পাত্রের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, অপরদিকে তেমনি ইহা নিরাপদ নহে বলিয়া ভয়জনক। বিশেষতঃ তৈল বা ঘৃতের মাত্রা অধিক হইলে অথবা যে সমস্ত তৈল ঘৃতে এমত সমস্ত ক্বাথ পড়ে, যাহাতে বলপূর্ব্বক অনবরত তাড়ু বা খুন্তীদ্বারা নাড়িতে হয়, সে সমস্ত তৈল ঘৃত মৃত্তিকাপাত্রে কোন মতেই পাককরা যায় না। পাককরিতে গেলে প্রায়ই বিপদের সম্ভাবনা।

সুতরাং চিকিৎসককে বাধ্য হইয়া লৌহ বা তাম্রপাত্রের আশ্রয় লইতে হয়। ফলতঃ ঘৃত বা তৈলের মাত্রা যদি অধিক না হয় তাহাহইলে মৃৎপাত্রই শ্রেষ্ঠ, অন্যথা অধিক মাত্রা হইলে লৌহ বা তাম্রপাত্রে হওয়া আবশ্যক। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, ঘৃতের মাত্রা যতইকেন অধিক না হউক, কিন্তু তাম্রপাত্রে পাক করা কোন মতেই উচিত নহে। কেবল ঘৃত বলিয়া নহে ভক্ষণীয় যে কোন ঔষধই তাম্রপাত্রে পাক করা অকর্ত্তব্য। যে হেতু তাম্রধাতু স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণবীর্য্য বলিয়া তাহাতে কোন ঔষধ বা ঘৃত পাক করিলে সেই ঔষধ বা ঘৃতের গুণও অবশ্য উগ্র বা তীক্ষ্ণ হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে তাম্র পাত্র কলাই করিয়া তাহাতে ঔষধ বা ঘৃত পাক করিলে কোন দোষ হইতে পারে না, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, কলাই করা হইলেও তাহাতে ঘৃত পাককরা কোন মতেই প্রশস্ত নহে। তবে তাম্র পাত্রে তৈল পাক করিলে যে বিশেষ কোন দোষ ঘটে এমত বোধ হয় না। আর কিঞ্চিৎ দোষ ঘটিলেও তাহা বাধ্য হইয়া অধিকাংশ কবিরাজকে স্বীকার করিতে হয়। যে হেতু তৈলের মাত্রা অধিক হইলে কোনরূপ মৃত্তিকা পাত্রে পাক করিতে সাহস হয় না। দ্বিতীয়তঃ লৌহপাত্রে পাক করিলে তৈলের রঙ্ অত্যন্ত ময়লা হয়, সুতরাং এরূপ স্থলে তাম্রপাত্র ভিন্ন আর উপায় নাই। ফলতঃ পাত্র সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যদি ঘৃত বা তৈলের মাত্রা খুব্ কম অর্থাৎ ২।৷০ সের হয়, তবে মৃত্তিকা পাত্রে নচেৎ তদতিরিক্ত হইলে ঘৃত সম্বন্ধে লৌহপাত্র এবং তৈল সম্বন্ধে তাম্রপাত্র অবলম্বন করাই যুক্তি সঙ্গত।

ঘৃত বা তৈলের মাত্রা সম্বন্ধে আমাদের দেশে কবিরাজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন মত শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন পূর্ণ অর্থাৎ ⁄১৬ সের মাত্রায় কোন তৈল বা ঘৃত পাক না করিলে তাহা প্রকৃত গুণশালী হইতে পারে না। আবার কেহ বলেন যে, আবশ্যক অনুসারে অর্দ্ধ, শিকি বা দুই আনা মাত্রায় অর্থাৎ ৮.৪ বা ২ সের মাত্রায় তৈল ঘৃত পাক করিলে গুণের কোনও তারতম্য হয় না। আমরা কিন্তু এই উভয় মতের মধ্যে প্রথমটারই অধিক পক্ষপাতী। কেন না পূর্ণ মাত্রায় তৈলটী প্রস্তুত করিলে তাহাতে যেমন ক্বাথ বা কল্কাদিও পূর্ণমাত্রায় পড়িয়া তৈলটী প্রকৃত গুণকারক হয়,

অসম্পূর্ণ মাত্রায় বাস্তবিকই তদপেক্ষা কিছু কম হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু এই পূর্ণমাত্রা সর্ব্বতোভাবে প্রশস্ত হইলেও ইহার সম্বন্ধে একটী গুরুতর কথা আছে। গৃহস্থদিগের বিশেষতঃ আবার কবিরাজবিশেষের অবস্থা এমনই অসচ্ছল যে পূর্ণমাত্রায় দূরে থাকুক, অর্দ্ধ বা সিকি মাত্রার সংস্থানও তাঁহাদের দ্বারা হওয়া ভার, সুতরাং এরূপস্থলে বাধ্য হইয়া কোন কোন কবিরাজকে অর্দ্ধ বা সিকি মাত্রায় তৈল প্রস্তুত করিতে হয়। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, এরূপ অসম্পূর্ণ মাত্রায় তৈল বা ঘৃত প্রস্তুত করিলে তাহাতে গুণের কিছু হ্রাস হইয়া থাকে।

কোন্ কোন্ কাষ্ঠদ্বারা তৈল বা ঘৃত পাক করা উচিত, এসম্বন্ধেও মতভেদ শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন নিম্বকাষ্ঠ দ্বারা তৈল পাক করিলে বড়ই গুণকারক হয়। আবার কাহারও মত যে, তৈলঘৃত পাক সম্বন্ধে কাষ্ঠের বিচার অনাবশ্যক। বলাবাহুল্য যে, শেষোক্ত কবিরাজ মহাশয়গণ পাথুরিয়া কয়লাদ্বারা তৈলঘৃত পাক করিতেও সঙ্কুচিত হন্ না। কিন্তু আমি এই উভয় মতেরই বিরোধী। কেন না তৈল মাত্রেই যে নিমকাষ্ঠদ্বারা পাক না করিলে তাহা গুণকারক হইবে না, একথা কোন মতেই সঙ্গত নহে। তবে একথাও কতকটা সঙ্গত যে, গুড়ূচী প্রভৃতি কয়েকটী তৈল নিম্বকাষ্ঠদ্বারা পাক করিতে পারিলে বড়ই ভাল হয়। কিন্তু নিম্বকাষ্ঠ না হইলেও যে, বিশেষ কিছু গুণের হ্রাস হয় সে বিশ্বাস আমার নাই। ফলতঃ তৈল ঘৃত পাকসম্বন্ধে কাষ্ঠের ইতর বিশেষ কথঞ্চিৎ থাকিলেও যাঁহারা সদা সর্ব্বদা অধিক মাত্রায় তৈলাদি পাক করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আর অত অধিক বাছাই করা কোন মতেই ঘটে না। কিন্তু তাহা বলিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ বাঁচাইতে পাথুরিয়া কয়লা দ্বারাও তৈল পাক কোন মতেই সঙ্গত নহে। শাকান্নভোজী বাঙ্গালী সন্তানের যদি সাধারণতঃ পাথুরিয়া কয়লারদ্বারা রন্ধন করিয়া সেই অন্ন ভোজনে গরমবোধ বা অম্লরোগ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব বলিয়া বোধ হয়, তবে যে পাথুরিয়া কয়লাদ্বারা তৈল পাক করিলে সেই তৈল কতকটা তীক্ষ্ণবীর্য্য হইবেক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং পাথুরিয়া কয়লাদ্বারা ঘৃত বা তৈল অথবা কোন প্রকার ঔষধই পাক করা কর্ত্তব্য নহে। তবে

যাহারা কিঞ্চিৎ অর্থ বাঁচাইতে গিয়া এরূপ কার্য্য করেন, তাঁহারা অবশ্যই মন্দ কার্য্য করিয়া থাকেন।

ক্রমশঃ—

কলিকাতা } কবিরাজ শ্রীজগদ্বন্ধু সেন গুপ্ত।

চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ।

দ্বিতীয় বর্ষের সম্মিলনী হইতে ডাক্তার জগদ্বন্ধু বাবুকে কলম ধরিতে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। চিকিৎসা সম্বন্ধে ইঁহার বহুদর্শিতা অধিক এবং সুখ্যাতিও যে অপরিসীম তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করি-বেন। দ্বিতীয় বর্ষের সম্মিলনীতে অর্শ ও ক্রিমি রোগের বর্ণনা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

সম্প্রতি কবিরাজী ও ডাক্তারী মতে একটী অর্শ রোগীনীর চিকিৎসা করিয়াছি, নিম্নে তাহার সঙ্ক্ষেপ বিবরণ লিখিলাম, যদি সম্মিলনীতে স্থান পাইবার উপযুক্ত হয় অনুগ্রহপূর্ব্বক তুলিয়া দিবেন। অর্শের চিকিৎসা কবি-রাজি ও ডাক্তারী উভয় মতেই নিষ্পন্ন করিয়াছি।

রোগীনীর বয়স ৩৪।৩৫ বৎসর। প্রায় দুই বৎসর যাবৎ বাহ্যবলিতে ভুগিতেছিল। বলিটি আয়তনে প্রায় একটী শুপারির মতন, শৌচ ত্যাগ কালে তাহাতে অত্যন্ত জ্বালা হইত এবং রক্ত পড়িত রোগীনীর চিরদিন কোষ্ঠ কঠিন ছিল। আমি প্রথমেই তাহার বলি সুত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া দি; বাহ্যের সহিত যে রক্তপাৎ হইত তন্নিবারণ জন্য নাগকেশর ফুলের রেণু মাখন মিশ্রি সকালে একবার খাইতে দি। প্রথম দিবস খাইতেই তাহার রক্ত বন্ধ হইয়া যায়। পরে আর ৩।৪ দিন উহা ব্যবহার করাই। মলদ্বারে যে বেদনা হইত, তাহা নিবারণ জন্য রসুনের সেক এবং ইন্দুর মাংসের সেক ব্যবস্থা করি,তাহাতে সে বেদনা নিবৃত্ত হয়। মল সর্ব্বদা কঠিন থাকিত তাহার প্রতী-কার জন্য রাত্রে পৃসিপিটেট্ সালফার বা অধঃপাতিত গন্ধক ৵৹আনা ওজনে

লইয়া আদ ছটাক উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিতে দি এবং নাইট্রোমিউরিয়াটিক য়্যাসিড, মিউরেট অব য়্যামনিয়া, টিংজেনসেন মিশ্র ঔষধটি ৩ বার করিয়া রোজ সেবন করিতে বলি। ইহাতে দাস্ত কিন্তু সরল হইল না, পরে কবিরাজী মতে হরিতকি চূর্ণ ঘোলের সহিত খাইতে দি তাহাতেও উপকার হয় না অবশেষ জোয়ানচূর্ণ ৵০ আদ পোয়া ঘোলের সহিত সেবন করাই। এই ঔষধ দিবসে দুইবার ব্যবস্থা করাতে উত্তম দাস্ত পরিষ্কার হইতে থাকে। রোগীর মলদ্বারের যাতনা কমিয়া যায়, প্রায় সপ্তাহ পরে বলিটি খসিয়া পড়ে। এই বলি খসিলে তাহার নিকটে একটী ক্ষুদ্র বলি দেখাযায়। আমি তাহাতে টিংফেরি মিউরিয়েট এবং বলির ক্ষতে কষ্টিক লোশন্ লাগাইতে থাকি। প্রায় এক মাসের মধ্যে রোগীনি আরোগ্য লাভ করিয়াছে। রোগীনির আহার শুধু মাছের ঝোল ভাত, পেপের তরকারি ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। আর সময়ে পাকা পেপে খাইতে বলিয়াছিলাম।

কেলমাম
মেদিনীপুর।

বশম্বদ—
শ্রীশশিভূষণ সরকার,
সিভিল হস্পিটেল এসিষ্টেণ্ট।

দ্বিতীয় রোগীর বিবরণ।

(কবিরাজী মতে)

আন্দাজ ২৩।২৪ বৎসর বয়স্কা একটী স্ত্রীলোকের প্রথমতঃ সর্দ্দি ও অল্প অল্প কাশি হয়। কিছুদিন পরে কাশি ভাল হইয়া যায়, কিন্তু সর্দ্দি আর কোন মতেই সারে না। তার পর ক্রমে তাহার সেই সর্দ্দি হইতে শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল। এই শিরঃপীড়ার যাতনা এত অধিক হইয়াছিল যে রোগী তাহার জন্য অনেক সময় অত্যন্ত কষ্টভোগ করিত। মাথায় বিশেষতঃ দুই রগে এমত কট্ কট্ ঝন্ ঝন্ করিত যে, সে, এই জন্য কোন কোন সময় চীৎকার না করিয়া পারিত না। ক্রমে ৭।৮ মাস পর্যন্ত এই অবস্থাতেই গত হয়। তবে অবশ্য নানাবিধ টোট্‌কা ঔষধাদি ব্যবহারে হয়ত কখন বা কিছু ভাল থাকিত। এই অবস্থাতে ক্রমে তাহার চক্ষুদ্বয় অল্প অল্প লালবর্ণ হইতে

হুক এবং সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রনারও সৃষ্টি হয়। অবশেষে মাথার যন্ত্রনা অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইয়া তাহার চক্ষের যন্ত্রনা এত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে, রোগী আহার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক চক্ষের জ্বালায় অনবরত ক্রন্দন করিতে থাকে। এই সময় হইতে এলোপ্যাথি মতে দস্তুরমত চিকিৎসা আরম্ভ হইল। প্রথমে কলিকাতাস্থ ২।৩ জন বাঙ্গালী উপযুক্ত এলোপ্যাথিক ডাক্তারের অধীনে ৫।৬ মাস কাল নিয়মিত চিকিৎসা করান হয়, ডাক্তারেরা ৫।৬ বার তাহার কপালের দুই পার্শ্বে অর্থাৎ রগে ব্লিষ্টার দেন্ এবং পোস্তের ঢেঁড়ীর স্বেদ দিতে বলেন, তদ্ভিন্ন নানাবিধ ঔষধ দিতেও ক্রটী করেন নাই। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এত ব্যাপারেও তাহার বিশেষ কিছু উপকার দর্শে নাই। তবে অবশ্য যন্ত্রনার কিছু কম হইয়াছিল এইমাত্র। কিন্তু একদিকে যন্ত্রনার কতকটা হ্রাস হইল বটে, পক্ষান্তরে তাহার চক্ষুদ্বয় ক্রমশঃ মুদ্রিত হইয়া (বুঁঝিয়া) আসিতে লাগিল। এমন কি তাহার চক্ষুদ্বয় এত অধিক মুদ্রিত হইয়া পড়িল যে, সে অতি কষ্টে মিট্ মিট্ করিয়া সামান্যমাত্র দেখিতে পাইত। অনন্তর এই অবস্থায় তাহার চিকিৎসার ভার কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ সাহেব চক্ষু চিকিৎসকের হাতে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য যে, তাঁহাদ্বারাও ৫।৬ মাসের অধিককাল চিকিৎসা করান হয়। কিন্তু তাহাতে ও পীড়ার বিশেষ কিছু হ্রাস বৃদ্ধি না হওয়াতে অগত্যা তাহার অভিভাবক চিকিৎসা করাইতে একবারে ক্ষান্ত হন্ এবং এইরূপ বিনা চিকিৎসায়ও পথ্যাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ যথেচ্ছাচারে প্রায় ৪।৫ মাস কাল রোগীকে রাখা হয়। কিন্তু ইহাতেও রোগের হ্রাস বৃদ্ধি কিছুই বোঝা যায় নাই।

যাহা হউক, ঠিক এই অবস্থাতেই আমি রোগীকে দেখি। বেশ মনোযোগের সহিত রোগীর চক্ষুদ্বয়ের অবস্থা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম এবং এপর্য্যন্ত যে সমস্ত ডাক্তারদ্বারা যতদিন চিকিৎসা করান হইয়াছে তাহাও বিশেষ মনোযোগের সহিত আদ্যোপান্ত শুনিলাম। প্রথমতঃ চক্ষের অবস্থা এবং আগাগোড়া চিকিৎসার বন্দোবস্তের কথা শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলাম যে, যখন এতদূর কাণ্ড কারখানা হইয়াছে, তখন আর কেন অনর্থক আমাকে দেখাইতেছে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পুনর্ব্বার রোগীর চক্ষুর পাতা টানিয়া ধরিয়া চক্ষের ভিতরটী ভালরূপে

দেখিলাম। এবং বুঝিলাম যে, চক্ষুর মণির কোনই দোষ জন্মে নাই, অর্থাৎ চক্ষের ভিতরকার অবস্থা যেরূপ স্বাভাবিক, তাহা সেইরূপই আছে, কেবল শাদা অংশটী লাল টক্ টক্ করিতেছে ও চক্ষুদ্বয় বুঁঝিয়া আছে। ইত্যবসরে রোগীর অভিভাবক বলিলেন যে, এই রোগীর চিকিৎসার জন্য প্রায় ২।৩ শত টাকা ব্যয় হইয়াছে, সুতরাং আর্থিক এমন ক্ষমতা নাই যে, আর দস্তুরমত টাকা দিয়া চিকিৎসা করাই, বিশেষতঃ রোগ আরোগ্যসম্বন্ধেও আমার কিছুমাত্র ভরসা নাই। তবে যদি আপনাদের কোন তৈলদ্বারা রোগীর শিরঃপীড়ার এবং চক্ষের যন্ত্রনার কিছু নিবারণ হয়, তাহাহইলে নিতান্তপক্ষে না হয় ২।১টী টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছি।

বেশ ধীরভাবে এই রোগীর বিষয় আদ্যোপান্ত আলোচনাপূর্ব্বক আমি সেই দিনে তৎক্ষণাৎ রোগীকে আয়ুর্ব্বেদীয় মতে একটী সুতীক্ষ্ণ নস্য প্রদান করিলাম। এস্থলে এই নস্যটীর সম্বন্ধে বলা আবশ্যক যে, ইহার বিন্দু মাত্র নস্য নাকে টানিলেই তদ্দ্বারা অন্ততঃ ৫০।৬০ বার হাঁচি না হইয়া যায় না। যাহা হউক, এই নস্য খুব্ অধিক মাত্রায় অনেক ক্ষণ ধরিয়া রোগীকে টানিতে বলিলাম। আন্দাজ ৫।৭ মিনিট পর্য্যন্ত নস্য টানিতেই তাহার হাঁচি হইতে সুরু হইল। তখন নস্য টানা বন্ধ করিয়া দিয়া রোগীকে বাটী যাইতে বলিলাম। এই সময় বেলা ৯॥ হইবেক, এদিকে রোগী ক্রমাগত হাঁচিতে হাঁচিতে গৃহে গমন করিল, এবং বাটী গিয়াও অনবরত হাঁচিতে লাগিল। পর দিন সকালে শুনিলাম যে, সমস্ত দিবা রাত্রে রোগী অন্ততঃ ২।৩ শত বার হাঁচিয়াছে, এবং তাঁহার সর্ব্ব শরীরে এত বেদনা হইয়াছে যে, শয্যা হইতে উত্থান শক্তি নাই। অপরন্তু প্রথম ৫০।৬০ বার হাঁচি হইতেই রোগীর নাক দিয়া জটুর আঠার ন্যায় এক পুয়া আন্দাজ ক্রূর ও শুষ্ক শ্লেষ্মা নির্গত হইয়াছিল। এবং শেষে হাঁচিতে হাঁচিতে সেই সঙ্গে রক্তপর্য্যন্ত ও নির্গত হইয়াছিল। এই সমস্ত অবস্থা শুনিয়া আমি সে দিন আর কোন ঔষধাদি ব্যবহার করিতে দিই নাই এবং পর দিন রোগীকে পুনর্ব্বার দেখিবার জন্য আনিতে বলিয়া দিলাম। পর দিন সকালে রোগী ও তাহার অভিভাবক আসিয়া অতি আনন্দের সহিত জানাইল যে, রোগীর অনেক উপকার দর্শিয়াছে। কিন্তু আমি একথায় কিছুমাত্র বিশ্বাস না করিয়া তৎক্ষণাৎ আগ্রহের সহিত তাহার

চ[illegible]কাল অনুসারে বলিতে লজ্জা ও ভয় হয় যে, দে[illegible]য়ের রক্তিমা যেন অনেকটা কমিয়াছে একং চক্ষুদ্বয় যেরূপ ভাবে [illegible] হইয়াছিল, বোধ হইল যেন, তাহার অর্দ্ধেক কম হইয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন রোগীর মুখে শুনিলাম যে, তাহার চক্ষের এবং মস্তকের কট্‌কটানি প্রভৃতি যন্ত্রনার অর্দ্ধেকের ও কম হইয়াছে। সেদিন পুনরায় রোগীকে নস্য লইতে বলিলাম, কিন্তু অধিক কষ্ট হওয়াতে রোগী কোন মতেই নস্য লইতে সম্মত হইল না। সুতরাং নস্যের পরিবর্ত্তে ষড়বিন্দু তৈলের নস্য ও কপালে ষড়বিন্দু তৈল মাখিতে বলিয়া দিলাম। তদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে উক্ত নস্য ও লইতে বলিয়া দিলাম। বড় আহ্লাদের বিষয় এই যে, এইরূপ ভাবে প্রায় দুই মাস কাল চিকিৎসা করাতেই রোগী সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছে এখন তাহার চক্ষুতে আর কিছুমাত্র দোষ বা যন্ত্রনাদি নাই।

মন্তব্য।

সামান্য হউক, আর বৃহৎই হউক, অনেক গুলি রোগের চিকিৎসা আজ কাল বৈদ্যমতে আর হয় না বলিলেই চলে। তন্মধ্যে চক্ষুরোগ একটী। চক্ষুরোগের সূত্রপাত হইতেই লোক, ডাক্তারী চিকিৎসার শরণ লইয়া অবশেষে যদি অন্ধ দশায় পর্য্যন্ত উপনীত হয়, তাহাও ভাল, সেও সৌভাগ্যের কথা; তথাপি কিন্তু একবার ভ্রমক্রমেও পোড়া দেশীয় চিকিৎসার আশ্রয় লইবে না। দেশী চিকিৎসাই চক্ষুরোগের অব্যর্থ চিকিৎসা, একথা কিন্তু বলি না, কেন না অস্ত্রসাধ্য চক্ষুরোগের চিকিৎসা ডাক্তারদ্বারা ধন্বন্তরীর আরোগ্য হইতে অনেককে দেখিয়াছি। তবে অস্ত্রসাধ্য ভিন্ন কোন কোন চক্ষুরোগের চিকিৎসা যে বৈদ্যশাস্ত্র মতে ভালরূপেই হইতে পারে, তাহা দেখানই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বিবাহ-বিচার।

এলোপ্যাথি মতে।

বিবাহের সহিত স্বাস্থ্যের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। অতএব চিকিৎসা-সম্মিলনীর ন্যায় চিকিৎসা-বিষয়ক পত্রিকায় যে এ বিষয়ের আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত তাহার সন্দেহ নাই।

আজ কাল বাল্যবিবাহ লইয়া হিন্দুসমাজে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত। এ বিষয়ে দুইটী দল হইয়াছে। এক দল বলিতেছেন—বাল্যবিবাহে দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে; কুৎসিত বাল্যবিবাহ বশতঃ বাঙ্গালী জাতি দিন দিন স্বাস্থ্যহারা শ্রীভ্রষ্ট ও দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে। আর এক দল বলিতেছেন বাল্যবিবাহ চিরদিন চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে বিশেষ কোন অনিষ্ট হইতে দেখা যায় নাই, অতএব প্রাচীন প্রথা যেমন আছে তেমনিই থাকুক।

বাল্যবিবাহ অর্থে অপরিণত অবস্থায় বিবাহ। এইরূপ বিবাহ আমাদিগের মধ্যে দুই শ্রেণীর আছে (১) শিশু বিবাহ (২) অপরিণত যৌবন বিবাহ। আমি এই দুই শ্রেণীর বিবাহকেই বাল্যবিবাহ বলিব। বাল্যবিবাহে সমাজের অন্যান্য কি ক্ষতি করিতেছে না করিতেছে, আমি তাহার বিষয়ে এখন কিছু বলিব না। স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে বাল্যবিবাহ আমাদিগের দেশে কতদূর অনিষ্ট করিতেছে তাহাই অগ্রে বলিব।

বিবাহের মৌলিক অর্থ কি, বিবাহের সহিত হিন্দু ধর্ম্ম কর্ম্মের কি সংস্রব আছে না আছে, তাহা লইয়া আমার বাক্য ব্যয়ের প্রয়োজন নাই। তবে বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য যে সন্তানোৎপাদনার্থ স্ত্রীপুরুষের পরস্পরসংযোগ, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না এবং শুধু এই সাংসারিক অর্থেই আমি পবিত্র বিবাহ শব্দ ব্যবহার করিলাম। এইরূপ অর্থ ধরিলে স্ত্রী ও পুরুষের বিবাহোচিত বয়স (সন্তানোৎপাদনের বয়স) না হইলে যে বিবাহ হয়, তাহাকে প্রকৃত বিবাহ বলা যায় না। জীবগণ একটী নির্দ্দিষ্ট বয়সের সীমায় পদার্পণ না করিলে সন্তানোৎপাদনোপযোগী প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা লাভ করিতে

পারে না। অতএব কোনও দেশে কোনও কালে বাল্যবিবাহ সম্ভবপর নহে। আমাদিগের দেশে বর ও কন্যার সচরাচর যেরূপ বয়সে বিবাহ হয়, সে বয়সে তাঁহাদের কেহই পরস্পর সহবাস করিতে সক্ষম হয় না। সক্ষম হইলেও তাহাকে সম্পূর্ণ সহবাস বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। অতএব আমাদিগের বাল্যবিবাহ নামমাত্র বিবাহ। প্রকৃত বিবাহ যৌবন বয়স ভিন্ন ঘটেনা। আমাদিগের বিবাহে ভাবী দম্পতি নির্ব্বাচন ও তদ্বিষয়ে একটা বাঁধাবাধি নিয়ম করিয়া রাখা হয় মাত্র। কিন্তু এইরূপ বিবাহেও প্রথম যৌবনের সূত্রপাত হইতেই সহবাস হওয়ার সম্ভাবনা এবং সচরাচর তাহাই ঘটিয়া থাকে। অনেকের আপত্তি এই যে যৌবনের সূত্রপাত হইতেই স্ত্রীপুরুষসহবাসে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা হয় জন্মাইবামাত্রই মরিয়া যায়, নচেৎ জীবিত থাকিলে ও সে সন্তান নিতান্ত দুর্ব্বলকায় হইয়া থাকে। আপত্তিটী খুব সত্য। যৌবনকাল একবারে উপস্থিত হয় না। যৌবনের ক্রমে ক্রমে বিকাশ হইয়া থাকে। পুরুষের সন্তানোৎপাদনোপযোগী বীজ (শুক্র) প্রথম বালকদিগের ১৪।১৫ বৎসর বয়সে অতি অল্প অল্প ক্ষরণ আরম্ভ হয়। তাহা পরিমাণে নিতান্ত অল্প এবং পাতলা থাকে। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে ঐ শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বেশী হয়। স্ত্রীলোকের ঋতু ও হঠাৎ পূর্ণ মাত্রায় একবারে আরম্ভ হয় না। প্রথম ঋতু অতি সামান্যাকারের হইয়া থাকে। সে সময়ে গর্ভধারণোপযোগী যন্ত্রণাদিও সম্যক পুষ্টিলাভ করেনা। স্ত্রীডিম্ব ও অপরিপক্ক থাকিয়া যায়। প্রথম ঋতুতে যে ডিম্ব নির্গত হয়, তাহা নিতান্ত অপুষ্ট। তার পর দুই একবার এইরূপ অপরিপক্ক ডিম্ব নির্গত হইয়া তখন প্রতি মাসে পরিপক্ক ডিম্ব নির্গত হইতে থাকে এবং জননেন্দ্রিয় ও পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অতএব যৌবনের সূত্রপাত হইতেই সহবাস ঘটিলে সে সহবাস হয় নিষ্ফল হয় নচেৎ সন্তান হইলেও তাহা হয় জন্মাইবামাত্রই মরিয়া যায়, নচেৎ জীবিত থাকিলেও চিরকাল দুর্ব্বল থাকিয়া যায়, ইহা বিধাতার অকাট্য নিয়ম।

প্রায় সকলেই কহিয়া থাকেন এইরূপ যৌবনের সূত্রপাত হইতেই সহবাস ও সন্তানোৎপাদন করা প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধ। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাকে প্রকৃতির বিরুদ্ধ বলা যায় না। যাবতীয়

জীব ও উদ্ভিদ্ রাজ্য পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে প্রথম যৌবনসঞ্চারে যে স্ত্রীপুরুষের মিলন সংঘটন হয় তাহাতে হয়, আদৌ ফল প্রসূত হয় না অথবা যদিও হয় তাহা হইলেও হয় জন্মাইবামাত্রই মরিয়া যায়, নচেৎ বাঁচিয়া থাকিলেও সম্যকপুষ্টিতা লাভ করে না। অপরিপক্ক বার্ত্তাকু-বীজ রোপন করিলে যে গাছ হয়, সে গাছ বড় হইলে কোঁকড়াইয়া যায় এবং তাহাতে ফল ধরে না। নারিকেল, তাল, খৈজুর, কুল প্রভৃতি বৃক্ষের প্রথম বছরের ফুলে ফল ধরে না, তার পিরে বৎসর হইতে ফল ধরিয়া থাকে। গো, অশ্ব, কুক্কুর প্রভৃতির প্রথম বিয়ানের ছানা গুলি হয় মরিয়া যায়, নচেৎ চির-রুগ্ন অবস্থায় বাঁচিয়া থাকে। এইরূপ ঘটনা বোধ করি সকলেই সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আমি দেখিয়াছি একটী এক বৎসর মাত্র বয়সের কুক্কুরীর গর্ভ সঞ্চার হইয়াছিল। তাঁহার ছানা গুলি সকলেই নিতান্ত ক্ষুদ্র-কায় হইয়া জন্মাইয়া ছিল। এবং কয়েক দিন পরেই ছানা গুলি দুধ ছাড়িয়া মরিয়া গেল। উহাদের মাতা সতেজ ও হৃষ্টপুষ্ট ছিল, উহাদের পিতা ও বলবান এবং পূর্ণবয়স্ক ছিল। এইরূপ প্রথম সহবাসে সন্তান না হওয়া অথবা হইয়া মরিয়া যাওয়া বিধাতার নিয়ম। কারণ বুদ্ধিজীবী মনুষ্য জাতি স্ব স্ব সামাজিক ও সাংসারিক নিয়ম দ্বারা যদিও এবম্বিধ অনিষ্টের কথঞ্চিৎ প্রতি-বিধান করিতে সক্ষম হইতে পারেন, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর জীবগণের পক্ষে এবং উদ্ভিদরাজ্যে সেরূপ প্রতিবিধান সম্ভবেনা। জীব ও উদ্ভিদ রাজ্য এইরূপ নিয়ম আবহমান যুগে যুগে চলিয়া আসিতেছে। কোনও ইতর জন্তু তাহার প্রথম বয়সের সন্তান বিনষ্ট হইবে বলিয়া সহবাসে ক্ষান্ত থাকে না এবং কোনও উদ্ভিদ তাহার প্রথম বৎসরের ফুলে ফল ধরিবে না বলিয়া ফুল প্রসব করিতে ছাড়ে না এবং অপক্ক ঘাসের বীজ যদৃচ্ছাক্রমে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া চারা উৎপন্ন করিতেও ক্ষান্ত থাকে না। জীব ও উদ্ভিদগণের বংশরক্ষাজন্য প্রকৃতি যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছেন। পাছে জীবগণ সন্তানোৎপাদনে বিমুখ হয় বলিয়া প্রকৃতি তাহাদিগকে অতীব বলবতী প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। সে দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তিকে উল্লঙ্ঘনকরা জীবগণের সাধ্যনহে। এই ভয়ঙ্কর রিপুর দ্বারা চালিত হইয়া কত জীবের জীবনস্রোতঃ অনন্ত সাগরে ভাসিয়া যাই-তেছে। এই রিপু চরিতার্থ করিবার জন্য প্রাণিগণ দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য

হইয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে; এবং অভিলষিত বস্তু পাইবার জন্য প্রাণের মায়া ছাড়িয়া পরস্পর বিষম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছে। এই আশ্চর্য্য প্রবৃত্তি-প্রণোদিত কার্য্যসাধন জন্য অতি তেজস্বী ভীষণাকৃতি পশুরাজ সিংহ সিংহীর নিকট দীনবেশে লাঙ্গুল নাড়িতেছে। ময়ূর পক্ষ বিস্তার করিয়া ময়ূরীর সম্মুখে নানা ভঙ্গিতে নৃত্য করিতেছে, এবং বসন্তাগমনে সুকণ্ঠ কোকিল মধুর কুহুরব সপ্তমে চড়াইয়া তাহার প্রেয়সীর কর্ণে ঢালিয়া দিতেছে। এই ভয়ঙ্কর রিপুর প্রাবল্যবশতঃ ট্রয় ও চিতোর নগর উৎসন্ন গিয়াছে এবং দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ লঙ্কেশ্বর সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই প্রবৃত্তি-প্রণোদিত হইয়া প্রিয় সন্দর্শনাভিলাষী যুবক নিরন্তর প্রতি রজনীযোগে হেলেস্পণ্ট নামক সমুদ্র সন্তরণ যোগে পার হইতেন; ইহারই তাড়নায় মুগ্ধ হইয়া মহাত্মা বিল্বমঙ্গল ঠাকুর রজ্জুভ্রমে সর্প ধারণ করিয়াছিলেন এবং যদুপতি যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ, মানময়ী গোপকন্যার চরণপ্রান্তে নিপতিত হইয়া প্রেম ভিক্ষা করিতেন। পরন্তু এই বিশ্ববিমোহিনী মহীয়সী শক্তির বিষয় ভাবিতে গেলে মন বাস্তবিকই বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হয়। প্রকৃতি, সৃষ্টিরক্ষার জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত আয়োজন করিয়াছেন। একটী সামান্য রেসমকীটের লক্ষ লক্ষ ডিম্ব হয়। মনুষ্যের একবার মাত্র সহবাসে যে পরিমাণে শুক্র পতিত হয়, তাহাতে সহস্রাধিক নূতন মনুষ্য উৎপন্ন হইতে পারে। প্রকৃতির এই ভয় পাছে সৃষ্টিলোপ হয়, এই সৃষ্টিলোপ আশঙ্কায় প্রকৃতি দিশা হারা হইয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত বীজ প্রদান করিয়াছেন, এই অভিপ্রায় যে নষ্ট হইলেও সমুদয় বীজ একবারে বিনষ্ট হইবে না। যে জন্তুর বংশধরগণের বাঁচিবার জন্য অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়, যে জীবের শুক্র অধিক তাহার ডিম্বও অসংখ্য, মৎস্যের যত ডিম্ব হয় তাহার অধিকাংশই নষ্ট হয়, নষ্ট হইবার কারণও বিস্তর—উহা অন্য জীবকে আহার প্রদান করে, অতএব মাছের মায়ের এত ডিম্ব না জন্মাইলে এতদিন মৎস্য কুল ধ্বংশ হইয়া যাইত এবংসমস্ত ডিম্ব বাঁচিয়া থাকিলে নদ নদীতে নামিয়া স্নান করা ভার হইত। প্রকৃতি বীজের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং জীবগণকেও সেই বীজ হইতে সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতা দিয়াছেন, প্রকৃতি এই পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। সৃষ্টি কার্য্যের অবশিষ্ট অংশ দৈব ঘটনার উপর

নির্ভর রহিয়াছে। প্রকৃতি ইহা দেখেন না যে উপযুক্ত আধারে উপযুক্ত বীজ নিক্ষিপ্ত হইতেছে কি না। এগুলি সমস্তই ঘটনাধীন। সুগন্ধ ফুলের বীজ বায়ু সহকারে মরুভূমিতে গিয়া নিক্ষিপ্ত হইতেছে এবং তথায় জলাভাবে মরিয়া যাইতেছে। বটবীজ পক্ষীর উদরস্থ হইয়া ইষ্টকালয়ের উপরে অঙ্কুরিত হইতেছে। প্রকৃতি ইহা দেখিতেছেন না যে, গৃহস্থ দেখিলেই বৃক্ষটী উৎপাটন করিয়া ফেলিবে। রোহিত মৎস্য বর্ষার সময়ে ময়দানে আসিয়া ডিম্ব প্রসব করিল। বর্ষাশেষে জলাভাবে তাহার ছানাগুলি মরিয়া গেল। একটী আম্র বৃক্ষের অনেকগুলি ফল ধরিল, কতকগুলি আম্রের বোঁটা দুর্ব্বল থাকিয়া গেল। দুর্ব্বল বৃন্ত যুক্ত আম্র গুলি জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবল বাত্যায়ের বেগ সামলাইতে না পারিয়া ভূতলশায়ী হইল। প্রকৃতি ইহা জানিয়াও কেন যে আম্রগুলির বোঁটা দুর্ব্বল হইতে দিলেন কে বলিতে পারে! অতএব প্রকৃতির ইহা অকাট্য নিয়ম যে কতকগুলি জীব ও উদ্ভিদ অকালে ধ্বংস হইবেই হইবে। অতি বুদ্ধিজীবী মনুষ্য কোনও বিজ্ঞানের সাহায্য বলে এইরূপ অকালে ধ্বংস নিবারণ করিতে সক্ষম নহেন। (ক্রমশঃ)

কার্ত্তিক }
১২৯৪ } শ্রী পুলিনচন্দ্র সান্যাল এম, বি।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ডাক্তার পুলিন বাবু প্রথমেই একটি বড় পাকা কথা বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, "বিবাহের সহিত স্বাস্থ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতএব চিকিৎসা সম্মিলনীর ন্যায় চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকায় এ বিষয়ের আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত"। বলা বাহুল্য যে আমরাও লেখক মহাশয়ের একথায় প্রাণের সহিত অনুমোদন করি। কেননা যে বিবাহ-বিচার লইয়া আজকাল হিন্দু সমাজে মহা হুলস্থূল পড়িয়াছে—যাহার জন্য প্রায়ই বড় বড় সভা সমিতির আহ্বান করা হইতেছে—বিশেষ আলোচনার বিষয় জানিয়া চিকিৎসা-শাস্ত্র (অবশ্য কবিরাজী ও ডাক্তারী উভয়েই) বহুকাল পূর্ব্বেই তাঁহার চূড়ান্ত

মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, তাঁহাদের সেই মীমাংসার উপর আর কোনও নূতন কথা বলিবার আছে কি না তাহাতে সন্দেহ হয়। যাহা হউক, প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে এ মীমাংসার তাঁহারই সম্পূর্ণ অধিকারী। যেহেতু দেহীগণের যাহা কিছু সুখ দুঃখ, যাহা কিছু হিতাহিত, তৎসমস্তই শরীর ও মন লইয়া। আবার চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোচনাই এই শরীর ও মন ঘটিত। সুতরাং শারীরিক বা মানসিক হিতাহিত সম্বন্ধীয় ভালমন্দ বিচারে এই শাস্ত্র বা শাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্যক্তি যতদূর সমর্থ, অন্য কোনও শাস্ত্র বা অন্য কোন ব্যবসায়ী ততদূর নহেন। কিন্তু কথা এই যে, চিকিৎসা-শাস্ত্রই যে, এ বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসক, একথা সমাজ শুনেন কৈ? শোনেন না বলিয়াই এত হুলস্থূল সত্ত্বেও আমরা এতদিন নীরবে নিস্তব্ধে চুপ্ করিয়া বোকার ন্যায় নিশ্চিন্ত বসিয়া আছি। অথবা চুপ্ করিয়া না থাকিয়াই বা করি কি? "গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল" হওয়ার অপেক্ষা এরূপ স্থলে চুপ্ করিয়া থাকা সঙ্গত নয় কি? যাহা হউক, সম্মিলনীর প্রধান লেখক পুলিন বাবু যখন এ সম্বন্ধে লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তখন আর সঙ্গত অসঙ্গত বিচার না করিয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র-সম্মত আমরাও এ সম্বন্ধে যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ লিখিব।

চি, স, স,

আয়ুর্ব্বেদতত্ত্ব।

ভোজনান্তবিধি।

আহারান্তে দন্তলগ্ন অন্নকণাদি সম্যক্ রূপে নিঃসৃত করিয়া জলদ্বারা উত্তমরূপে মুখ প্রক্ষালন করিবে। অন্যথা মুখে নিতান্ত দুর্গন্ধ জন্মিয়া থাকে।

সাধারণতঃ অন্নের জীর্ণাবস্থায় বায়ু, পচ্যমানাবস্থায় পিত্ত, এবং ভুক্তমাত্রে কফ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব ভোজনান্তে কফদোষ শান্তির নিমিত্ত এবং মুখের সৌগন্ধিসম্পাদনার্থ অগুরু প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যের ধূমপান

করিবে। এবং গুবাক, লবঙ্গ, জাতীফল, খদির ও কর্পূরাদির সহিত তাম্বুল কিম্বা কটু, তিক্ত, কষায় রস যুক্ত দ্রব্য (হরীতকী প্রভৃতি) ভক্ষণ করিবে। (৪৮)

অধিক পরিমাণে তাম্বুল ভক্ষণ করাও অবিহিত। কারণ তাহাতে দেহ, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, কেশ, দন্ত, বল, বর্ণ ও জঠরাগ্নি প্রভৃতি ক্ষীণ হইয়া যায়। এবং বায়ু পিত্ত ও রক্ত জন্য রোগ ও শোষ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা হয়।

বিরিক্ত (যে ব্যক্তি জোলাপ লইয়াছে), ক্ষুধিত, বিষার্ত্ত, ও দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে এবং রক্তপিত্ত, ক্ষয়, মত্ততা, মূর্চ্ছা, চক্ষু ও দন্তরোগযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে তাম্বুল ভক্ষণ করা দূষণীয়। কারণ উহাতে অগ্নিমান্দ্য হয়, ও রক্ত পিত্তাদি রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। (৪৯)

আহারান্তে যাবৎ অন্নভোজন ক্লান্তি বিদূরিত না হয়, তাবৎ কোন পরিশ্রমজনক কার্য্য না করিয়া রাজবৎ সুখোপবিষ্ট থাকিবে। তৎপরে একশত পদ গমন করতঃ বামপার্শ্বে ভর দিয়া পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ কাল উপবিষ্ট থাকিবে। (৫০)

ভোজনান্তে উপবেশন করিলে তন্দ্রার আবির্ভাব হয়, শয়ন করিলে

---

(৪৮) দন্তান্তরগতং চান্নং শোধনেনাহরেচ্ছনৈঃ। কুর্য্যাদনাহৃতং তদ্ধি মুখস্যানিষ্টগন্ধতাং। জীর্ণেঽন্নে বর্দ্ধতে বায়ুর্বিদগ্ধে পিত্তমেবতু। ভুক্তমাত্রে কফশ্চাপি তস্মাৎ ভুক্তেঽহরেৎ কফং॥ ধূমেনাপোহ্য হৃদ্যৈর্ব্বা কষায় কটু-তিক্তকৈঃ। পূগকক্কোল কর্পূর লবঙ্গ সুমনঃ ফলৈঃ॥ কটুতিক্তকষায়ৈর্ব্বা মুখবৈশদ্যকারকৈঃ। তাম্বুল পত্রসহিতৈঃ সুগন্ধৈর্ব্বা বিচক্ষণঃ॥ (সুশ্রুতঃ)

(৪৯) তাম্বূলং নাতিসেবেত নবিরিক্তো বুভুক্ষিতঃ। দেহদৃক্ কেশদন্তাগ্নিশ্রোত্রবর্ণবলক্ষয়ঃ। শোষঃ পিত্তানিলাস্রংস্যাৎ অতিতাম্বুলচর্ব্বণাৎ। তাম্বূলং ন হিতং দন্ত দুর্ব্বলেক্ষণ রোগীণাং। বিষমূর্চ্ছা মদার্ত্তানাং ক্ষয়িণাং রক্তপিত্তিনাং। (ভাবপ্রকাশঃ)

(৫০) ভুক্ত্বা রাজবদাসীত যাবদন্নক্লমোগতঃ। ততঃ পাদশতং গত্বা বামপার্শ্বেতু সংবিশেৎ॥ (সুশ্রুতঃ)

শরীরের স্থূলতা জন্মে, চংক্রমণ (অর্থাৎ ধীরে ধীরে পাদচারণ) করিলে আয়ুঃবর্দ্ধিত হয়। অধিক বেগে ধাববান হইলে মৃত্যু ঘটে। (৫১)

আহারান্তে আর্দ্র শয্যায় উপবেশন, অগ্নি ও রৌদ্রসেবা, নদী সন্তরণ, পদব্রজে বা অশ্বাদি যানে বাহনে দূরপথগমন, এবং যুদ্ধ, গান, ব্যায়াম, অধ্যয়ন, স্ত্রীসেবন, ও বেগে ধাবন প্রভৃতি কার্য্য করিবে না। কারণ উহাতে নানাবিধ কঠিন রোগ উৎপন্ন হইয়া শারীরিক অনিষ্ট ঘটায়। (৫২)

আহারান্তে মনের অপ্রিয় রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ সেবিত হইলে কিম্বা অধিক হাস্য করিলে কিম্বা অশুচি অন্নভুক্ত হইয়া থাকিলে তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া শরীরের গ্লানি উৎপাদন করে, অতএব সর্ব্বথা উক্ত বিষয়ে সাবধান থাকিবে। (৫৩)

গ্রীষ্মকাল ব্যতীত অন্য কোনও কালে দিবানিদ্রা বিধেয় নহে। কারণ উহাতে শ্লেষ্মাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া কাস, সর্দ্দি, শিরঃশূল, অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ জন্মায়। এবং অবৈধরূপে রাত্রিজাগরণ করিলেও ঐ সমস্ত দোষ ঘটিয়া থাকে। (৫৪)

কিন্তু যাহাদিগের দিবানিদ্রা কিম্বা রাত্রিজাগরণ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে,

---

(৫১) ভুক্ত্বোপবিশতস্তন্দ্রা শয়ানস্যাতু পুষ্টতা। আয়ুশ্চংক্রমমাণস্য মৃত্যুর্ধাবতঃ ॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

(৫২) শয়নং চাসনংবাপি নেচ্ছেদ্বাপিদ্রবোত্তরং। নাগ্ন্যাতপৌ ন প্লবনং নযানং নাপিবাহনং ॥ (সুশ্রুতঃ)

ব্যায়ামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ ধাবনং যানমেবচ। যুদ্ধং গীতঞ্চ পাঠঞ্চ মুহূর্ত্তং ভুক্তবাংস্ত্যজেৎ ॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

(৫৩) শব্দরূপরসস্পর্শগন্ধাশ্চাপি জুগুপ্সিতাঃ। অশুচ্যন্নং তথা ভুক্তমতিহাস্যঞ্চ বাময়েৎ ॥ (সুশ্রুতঃ)

(৫৪) সর্ব্বর্ত্তুষু দিবাস্বাপো প্রতিষিদ্ধোঽন্যত্রগ্রীষ্মাৎ। * * * তত্রস্বপতামধর্ম্মঃ সর্ব্বদোষপ্রকোপশ্চ। তৎপ্রকোপাচ্চ কাসশ্বাসপ্রতিশ্যায় শিরোগৌরবাঙ্গমর্দ্দারুচিজ্বরাগ্নিদৌর্ব্বল্যানি ভবন্তি। রাত্রাবপি জাগরিতবতাং বাতপিত্তনিমিত্তাস্তত্রবোপদ্রবা ভবন্তি ॥ (সুশ্রুতঃ)

তাহাদিগের উহাতে (অর্থাৎ দিবানিদ্রা কিংবা রাত্রিজাগরণে) বিশেষ কোন অনিষ্ট ঘটেনা। (৫৫)

বরং অভ্যস্থ দিবানিদ্রার ব্যাঘাত করিলে বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া শারীরিক অসুখ উৎপাদন করে। (৫৬)

বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, কৃশ, ক্ষত, ক্ষীণ, মদ্যপায়ী, সর্ব্বদা যান বাহনে রত (অর্থাৎ সর্ব্বদা গাড়ী, পাল্কী কিম্বা অশ্ব হস্তী দ্বারা গমনশীল), পরিশ্রান্ত, অভুক্ত, ক্ষীণমেদ, ক্ষীণস্বেদ, ক্ষীণকফ, ক্ষীণরস ও ক্ষীণরক্ত ব্যক্তির পক্ষে এবং অজীর্ণযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে মুহূর্ত্তকাল (দুই দণ্ড) দিবানিদ্রা বিধেয়।

রাত্রিজাগরিত ব্যক্তির পক্ষে জাগরণ কালের অর্দ্ধ পরিমিত সময় দিবা-নিদ্রা বিহিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (৫৭)

গ্রীষ্মকালে রাত্রি পরিমাণের স্বল্পতাহেতু দিবানিদ্রা বিহিত হইয়াছে। (৫৮)

পাদচারণ বিধি।

নখ, শ্মশ্রু প্রভৃতি কর্ত্তন করিয়া, পবিত্র ও পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করিয়া মস্তকে লঘু উষ্ণীষ (পাগুড়ি) হস্তে দণ্ড ও ছত্র, পদে পাদুকা ধারণ করতঃ উত্তম সহচর সঙ্গে লইয়া জ্ঞানবৃদ্ধ গুরুজনের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক, অনন্য-চিত্তে সমতল ও পবিত্র স্থানে পাদচারণ করিবে।

রাত্রিকালে কিম্বা কেশ, অস্থি, কণ্টক, প্রস্তর, তুষ ভস্ম ও অঙ্গার প্রভৃতি

---

(৫৫) নিদ্রাসাত্ম্যীকৃতা যৈস্তু রাত্রৌ বা যদিবা দিবা। ন তেষাং স্বপতাং দোষো জাগ্রতাং বা বিধীয়তে॥ (সুশ্রুতঃ)

(৫৬) উচিতোহি দিবাস্বপ্নো নিত্যং যেষাং শরীরিণাং। বাতাদয়ঃ প্রকুপ্যন্তি তেষামস্বপতাং দিবা॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

(৫৭) প্রতিষিদ্ধেষ্বপিতু বালবৃদ্ধ স্ত্রীকর্ষিত ক্ষত ক্ষীণ মদ্যনিত্যযানবাহনা-ধ্বকর্ম্মপরিশ্রান্তানামভুক্তবতাং মেদঃস্বেদকফরসরক্তক্ষীণানামজীর্ণিনাঞ্চ মুহূর্ত্তং দিবাস্বপনমপ্রতিষিদ্ধং। রাত্রাবপি জাগরিতবতাং জাগরিতকালাদর্দ্ধ মিষ্যতেদিবাস্বপ্নঃ॥ (সুশ্রুতঃ)

(৫৮) রাত্রীণাঞ্চাতিসংক্ষেপাদ্দিবাস্বপ্নঃ প্রশস্যতে। (চরকঃ)

অপবিত্র দ্রব্যযুক্ত স্থানে, পূজা স্থানে, চতুষ্পথে এবং গর্ত্তাদি যুক্তস্থানে পাদ-চারণ করিবে না। (৫৯)

প্রতিদিন নিয়মিত রূপে (যাহাতে শরীরের ক্লেশ না হয় এরূপ ভাবে) পাদচারণ করিলে আয়ুঃ, বল, মেধা, অগ্নিবৃদ্ধি, এবং ইন্দ্রিয় সকল অধিক শক্তিশালী হয়।

অধিক পথ পর্য্যটন করিলে শরীরস্থ কফ ও মেদঃ ক্ষীণ হইয়া যায়, বর্ণ ও সৌকুমার্য্য নষ্ট হয়। সুতরাং বায়ু অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া নানাবিধ উৎকট রোগ জন্মায়। এবং অকালজরা ও দুর্ব্বলতা জন্মে।

একেবারে না হাটিলে প্রথমতঃ সুখ ও সৌকুমার্য্য জন্মে বটে, কিন্তু পরে শরীরে কফ ও মেদঃ বৃদ্ধি হইয়া নানাবিধ রোগ উৎপাদন করে। সুতরাং শরীর নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। (৬০)

রাত্রিচর্য্যা।

রাত্রিতেও দিবসের ন্যায় এক প্রহর অন্তে দ্বিতীয় প্রহর মধ্যে আহার-যোগ্য অবস্থার উদয় হইলে আহার করিবে।

কোন কোন আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতের মতে রাত্রিতে এক প্রহর মধ্যেই আহার করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাঁহাও দিবসভোজনের পরিমাণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন হওয়া উচিত। অত্যন্ত দুর্জ্জর বস্তু রাত্রিতে খাওয়া নিষিদ্ধ। (১)

---

(৫৯) তত্রাদিত এব নীচনখরোম্না শুচিনা শুক্লবাসসা লঘূষ্ণীষ ছত্রো-পানৎকেন দণ্ডপাণিনা কালে হিতমিতমধুরপূর্ব্বাভিভাষিণা বন্ধুভূতেনভূতা-নাম্তগুরুবৃদ্ধানুমতেন সুসহায়েনাপ্তমনসা খলূপচরিতব্যং। তদপিন রাত্রৌ ন কেশাস্থিকণ্টকাশ্মতুষভস্মোৎকরকপালাঙ্গারামেধ্যস্থানবলিভূমিষু ন বিষ-মেন্দ্রকীলচতুষ্পথশ্বভ্রাণামুপরিষ্টাৎ।

(৬০) যত্তু চংক্রমণং নাতিদেহ পীড়াকরং ভবেৎ। তদায়ুর্ব্বলমেধাগ্নিপ্রদ-মিন্দ্রিয়বোধনং॥ অধ্বাবর্ণ কফস্থৌল্য সৌকুমার্য্য বিনাশনঃ। জরাদৌর্ব্বল্য কৃচ্ছসঃ। আস্থাবর্ণ কফস্থৌল্য সৌকুমার্য্যকরী সুখা॥ (সুশ্রুতঃ)

(১) রাত্রৌচ ভোজনং কুর্য্যাৎ প্রথম প্রহরান্তরে। কিঞ্চিদূন সমশ্নীয়াৎ দুর্জ্জরংতত্রবর্জ্জয়েৎ॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

আহারান্তে পূর্ব্বোল্লিখিত একশত পদ গমন, বামপার্শ্বে সংবেশন, ধূমপান, তাম্বূলভক্ষণ প্রভৃতি কার্য্য করিয়া উত্তম শয্যায় প্রথমতঃ উত্তানভাবে (চিত হইয়া) শয়ন করিয়া আটবার নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিয়া ষোলবার নিশ্বাসত্যাগ করিবে। তৎপরে বামপার্শ্বে শয়ন করিয়া বত্রিশবার নিশ্বাস ত্যাগ করিবে। পশ্চাৎ যাহার যেভাবে সুখবোধ হয় সেই ভাবেই শয়ন করিবে। (২)

ভোজনান্তে যথাবিহিত পরিমিত নিদ্রা সেবা করিলে শরীরের পুষ্টি, বল, বর্ণ, উৎসাহ এবং অগ্নি-দীপ্তি হয় এবং শারীরিক ধাতু সমূহ সাম্যাবস্থায় থাকে। (৩)

যথাকালে নিদ্রাসেবা না করিলে মস্তক ও নেত্রের গুরুত্ব, জৃম্ভা (হাই), শরীর বেদনা, তন্দ্রা ও অন্নের অপাক জন্মে। (৪)

একেবারে অনিদ্রা, অকালনিদ্রা ও অধিক নিদ্রা সেবা করিলে কাল রাত্রির ন্যায় মনুষ্যকে সুখ ও আয়ুঃহীন করে। অতএব যথাকালে (রাত্রিতে) পরিমিত নিদ্রা সেবন করিবে।

যেমন নিত্যজ্ঞান উদিত হইলে যোগিপুরুষকে সিদ্ধিযুক্ত করে, তদ্রূপ যথাকালে সেবিত নিদ্রা মনুষ্যকে সুখ ও আয়ুঃযুক্ত করে। (৫)

---

(২) শ্বাসানষ্টৌ সমুত্তান স্তনে দ্বিঃ পার্শ্বেতু দক্ষিণে। ততস্তদ্দ্বিগুণং বামে ততঃ স্বপ্যাৎ যথা সুখং॥ বামদিশায়ামনলো নাভেরূর্দ্ধেহস্তি জন্তুনাং তস্মাত্তু বামপার্শ্বে শয়ীতভুক্তপ্রপাকার্থং॥ (ভাবপ্রকাশং)

(৩) পুষ্টিবর্ণ বলোৎসাহমগ্নিদীপ্তি মতন্দ্রিতাং। করোতি ধাতুসাম্যঞ্চ নিদ্রাকালে নিষেবিতা॥ (সুশ্রুতঃ)

(৪) নিদ্রাবিঘাততো জৃম্ভা শিরোলোচনগৌরবং। অঙ্গমর্দ্দস্তথাতন্দ্রা স্যাদন্নাপাক এবচ। (ভাবপ্রকাশঃ)

(৫) অকালেহতিপ্রসঙ্গাচ্চ নচনিদ্রানিষেবিতা। সুখায়ুষীপরাকুর্য্যাৎ কালরাত্রিরিবাপরা। সৈবযুক্তা পুনর্যুক্তে নিদ্রাদেহং সুখায়ুষা। পুরুষং যোগিনং সিদ্ধ্যা সত্যা বুদ্ধিরিবাগতা॥ (চরকঃ)

ভগ্নশয্যায়, অনেক বিবরযুক্ত গৃহে, দেবালয়ে, তরুতলে, কিম্বা একাকী শয়ন করা অনুচিত। (৬)

রতিক্রিয়াবিধি।

সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে পঞ্চদশদিবস পরে এবং অন্যান্য ঋতুকালে তিন তিন দিবস পরে একবার মাত্র রতিক্রিয়া অনিষিদ্ধ। (১)

অতিশয় রতিক্রিয়া দ্বারা শূল, কাস, শ্বাস, জ্বর, কৃশতা, আক্ষেপক (খেচুনী রোগ) পাণ্ডু ও ক্ষয়রোগ জন্মিয়া থাকে। অতএব অতিসংসর্গ হইতে বিরত থাকা সমুচিত।

কামবেগার্ত্ত হইলে যথোক্ত বিধানমতে উত্তমরূপ, গুণ, বয়স ও শীল-সংযুক্তা, অলঙ্কৃতা, হৃষ্টচিত্তা, ও অভিলাষিণী স্ত্রীর সহিত তত্তুল্য গুণবিশিষ্ট পুরুষের সংসর্গ বিহিত। ইহাতে আয়ুঃ আরোগ্য বল ও বর্ণ বৃদ্ধিপায়, এবং মাংসের দৃঢ়তা ও উপচয় জন্মে॥ (২)

একেবারে রতিক্রিয়া না করিলে মেহরোগ, মেদঃরোগ, ও শরীরের শিথিলতা জন্মিতে পারে। (৩)

রজঃস্বলা, অনভিলাষিণী, মলিনা, অপ্রিয়া, বর্ণবৃদ্ধা, বয়োবৃদ্ধা, রুগ্না, হীনাঙ্গী, গর্ভিণী, দ্বেষ্যা, যোনিরোগপীড়িতা, সগোত্রা, গুরুপত্নী, ও ব্রহ্ম-চারিণী স্ত্রীর সহিত সংসর্গ নিতান্ত অবৈধ।

---

(৬) নভিন্নশয়নে স্বপ্যান্নানেকবিবরেপিচ। নৈকোদেবালয়েনৈব রাত্রৌ তরুতলে পিচ॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

(১) ত্রিভিস্ত্রিভিরহোভিশ্চ সমীয়াৎ প্রমদাং নরঃ। সর্ব্বেষ্বৃতুষু ঘর্ম্মেষু পক্ষাৎ পক্ষাৎ ব্রজেৎ বুধঃ॥ (সুশ্রুতঃ)

(২) অতিস্ত্রীসংপ্রয়োগাচ্চ রক্ষেদাত্মানমাত্মবান্। শূলকাসজ্বরশ্বাস-কার্শ্যপাণ্ড্বাময়ক্ষয়াঃ। অতিব্যবায়াজ্জায়ন্তে রোগাশ্চাক্ষেপকাদয়ঃ॥ বয়ো-রূপগুণোপেতাং তুল্যশীলাং গুণান্বিতাং। অভিকামোঽভিকামাস্তু হৃষ্টোহৃষ্টা-মলঙ্কৃতাং। সেবেত প্রমদাং যুক্ত্যা বাজীকরণবৃংহিতঃ॥ আয়ুষ্মন্তো মন্দ-জরা বপুর্বর্ণবলান্বিতাঃ। স্থিরোপচিতমাংসাশ্চ ভবন্তি স্ত্রীষুসংযতাঃ। (সুশ্রুতঃ)

(৩) অব্যবায়ান্মেহমেদোবৃদ্ধিঃ শিথিলতাতনোঃ॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

সন্ধ্যাকালে, প্রত্যূষে, পর্ব্বদিনে (চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি দিনে) অর্দ্ধরাত্রে, মধ্যাহ্নে, লজ্জাকর স্থানে, প্রকাশ্যস্থানে, অপবিত্র স্থানে, পুরুষের পক্ষে উত্তানভাবে (চিৎ হইয়া) এবং ক্ষুধিত, ব্যাধিত, ক্ষুব্ধচিত্ত, মলমূত্রাদি বেগযুক্ত, পিপাসিত, ও দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে রতিক্রিয়া একান্ত নিষিদ্ধ। (৪)

অপিচ তির্য্যগ্ যোনিতে (পশ্বাদি যোনিতে) ও অযোনিতে (যোনি ভিন্ন পায়ু প্রভৃতি স্থানে) এবং দুষ্ট যোনিতে অভিগমনও নিতান্ত নিষিদ্ধ।

পূর্ব্বোক্ত নিষিদ্ধ অবস্থায় উহা ব্যবহার করিলে উপদংশ, বায়ুরোগ, অশ্মরী (পাথুরি) ও ধাতুক্ষয় প্রভৃতি নানাবিধ উৎকট রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। (৫)

রতিক্রিয়ান্তে চিনির সহিত দুগ্ধপান ও মাংসযূষ প্রভৃতি বলকারক বস্তু ভোজন, স্নান, ব্যজন বায়ু, ও নিদ্রা সেবন কর্ত্তব্য। (৬)

---

(৪) রজস্বলামকামাঞ্চ মলিনামপ্রিয়াং তথা। বর্ণবৃদ্ধাংবয়োবৃদ্ধাং তথা ব্যাধি প্রপীড়িতাং। হীনাঙ্গীং গর্ভিণীং দ্বেষ্যাং যোনিদোষসমন্বিতাং। সগোত্রাং গুরুপত্নীঞ্চ তথা প্রব্রজিতামপি। সন্ধ্যাগর্ব্বস্বগম্যাঞ্চ নোপেয়াৎ প্রমদাং নরঃ। গোসর্গেচার্দ্ধরাত্রেচ তথা মধ্যন্দিনেষুচ। লজ্জাসমাবহে দেশে বিবৃতেঽশুদ্ধ এবচ। ক্ষুধিতো ব্যাধিতশ্চৈব ক্ষুব্ধচিত্তশ্চ মানবঃ। বাতবিন্মূত্রবেগীচ পিপাসুরতিদুর্ব্বলঃ। তির্য্যগ্ যোনোবযোনৌচ প্রাপ্ত শুক্র বিধারণং দুষ্ট যোনৌ বিসর্গন্তু বলবানপিবর্জ্জয়েৎ। স্থিতাবুত্তানশয়নে বিশেষেণৈব গর্হিতং॥ (সুশ্রুতঃ) চি, ২৪ অঃ।

(৫) উপদংশস্তথাবায়োঃকোপঃ শুক্রস্যচক্ষয়ঃ। উত্তানেচ ভবেচ্ছীঘ্রং শুক্রাশ্মর্য্যাস্ত সম্ভবঃ॥ (সুশ্রুতঃ)

(৬) ভক্ষ্যাঃ সশর্করাঃ ক্ষীরং সসিতং রসএবচ। স্নানং সব্যজনং স্বপ্নো ব্যবায়ান্তে হিতানিচ॥ (সুশ্রুতঃ)

ঢাকা বিক্রমপুর } কবিরাজ শ্রীহরিমোহন দাস গুপ্ত।

ড্রপ্‌সি বা শোথ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে শোথের কারণ সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। এবারে ইহার লক্ষণ ও চিকিৎসাসম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

পাঠকগণ জানিবেন সর্ব্বাঙ্গব্যাপী শোথ প্রধানতঃ দুই কারণে উৎপন্ন হয়। প্রথম হৃদ্‌যন্ত্রের কোনরূপ পীড়া হইলে ; দ্বিতীয় ; মুত্রযন্ত্র (কিড্‌নির) কোনরূপ পীড়া হইলে।

সর্ব্বাঙ্গব্যাপী শোথকে ইংরেজিভাষায় এনাছার্‌কা কহে। এনাছার্‌কা হইলে সর্ব্বশরীরের চর্ম্মের নিম্নে জল জন্মে এবং শরীরের ভিতর যত বড় বড় গহ্বর আছে তাহাও জলপূর্ণ হয়। এই সর্ব্বাঙ্গব্যাপী শোথ সামান্য রকমের হইলে হাত পা মুখ ও সর্ব্বশরীর ঈষৎ স্ফীত হয়। তাহা বোঝা যায় কি না যায় কিন্তু রোগী কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া থাকিলে কি পা ঝোলাইয়া বসিয়া থাকিলে রোগীর পা দুখানি বেশ ফুলিয়া উঠিয়াছে, বুঝিতে পারা যায়। গুরুতর রকমের এনাছার্‌কা হইলে, সমস্ত চর্ম্মের নিম্নে অতিরিক্ত জলসঞ্চয় হইয়া চর্ম্ম যেন ফাটিয়া যাইতেছে বোধ হয়। উরুদ্বয় ও পা ভয়ানক ফুলিয়া কলা গাছের ন্যায় গোল হয়। তাহার বুকের ও পেটের চর্ম্মের নিম্নেও জল জমে। আঙ্গুল দিয়া টিপিলে টোস খাইয়া যায়। একতাল ময়দা হাত দিয়া ছানিলে যেরূপ স্পর্শানুভব হয় উহার শরীর টিপিলেও সেইরূ বোধ হয়। পুরুষাঙ্গের চর্ম্ম ফুলিয়া উঠিয়া মুত্রনালিকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলে সুতরাং রোগীর প্রস্রাব করিতে কষ্ট হয়। মুষ্কদ্বয় অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে এবং বৃহৎ একটী বেল ফলের ন্যায় বড় হয় এবং চর্ম্ম দেখিতে চিক্ চিক্ করে। মুষ্ক বৃহৎ হওয়াতে রোগী উরুদ্বয় এক করিতে পারেনা, এবং পাশ ফিরিয়া শুইতে পারেনা। শরীরের স্থানে স্থানে ফোস্কা উঠে ঐ ফোস্কা গলিয়া গিয়া জল চোঁয়াইতে থাকে। এইরূপ জল নির্গত হইয়া অনেক রোগী আপনা আপনি মরিয়া যায়। তার পর পেরিটোনিয়ম গহ্বরে জল সঞ্চয় হইয়া

গর্ভবতী স্ত্রীলোকের উদরের ন্যায় উদর বড় হয়। বক্ষগহ্বরের খোলেও জল সঞ্চয় হয় অবশেষে মস্তিষ্কের খোলের ভিতর জল সঞ্চয় হইয়া রোগী হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে।

এইরূপ সর্ব্বাঙ্গব্যাপী শোথ হইলে রোগী নানারূপ যাতনা ভোগ করে। রোগী উঠিতে বসিতে হাঁস ফাঁশ করে। এবং সর্ব্বদাই অল্প অল্প শ্বাসকষ্ট লাগিয়া থাকে। আহারের পর শ্বাসকষ্ট বেশী বোধ হয়, পেট কসিয়া ধরে শরীরের ভার বশতঃ রোগী নড়িতে চড়িতে কষ্ট বোধ করে। অল্প চলা ফেরা করিলেই বুক দুড়্ দুড়্ করে এবং রোগী সর্ব্বদাই যেন নিদ্রালু বোধ করে।

শোথ হইলে শ্বাসকষ্ট কেন হয় বল দেখি? শ্বাসকষ্ট প্রধানতঃ দুই কারণে উপস্থিত হয়। (১) বক্ষগহ্বরে জল জমিলে ফুস্ফুষদ্বয়ে অত্যন্ত চাপ পড়ে সুতরাং শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। (২) নিজ ফুস্ফুষে জল জমিয়া ফুস্ফুষের বায়ু কোষ সকল রুদ্ধ হয় সুতরাং ফুস্ফুষে ভাল করিয়া বাতাস গমনাগমন করিতে পারে না।

এইরূপ সর্ব্বাঙ্গব্যাপী শোথের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে প্রথমতঃ দেখা উচিত যে শোথ একবারে সমস্ত শরীর আক্রমণ করিয়াছে কি ক্রমে ক্রমে হইয়াছে। শোথ হইবার পূর্ব্বে রোগীর জ্বর হইয়াছিল কি না। শোথ হঠাৎ হইয়াছে, না ক্রমে ক্রমে হইয়াছে? এই গুলির অনুসন্ধান লইলেই পুরাতন ও তরুণ শোথের বিভেদ বুঝিতে পারা যাইবে। কণ্ঠ রোধ হইয়া, শরীরে হিম লাগিয়া বা তরুণ জ্বর হইয়া যে হঠাৎ শোথ উপস্থিত হয় তাহা তরুণ শোথ শব্দে বাচ্য এবং রোগী ও চিকিৎসকের অজ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে যে শোথ উপস্থিত হয় তাহা পুরাতন শব্দ বাচ্য।

তরুণ শোথ যে যে কারণে উৎপন্ন হইতে পারে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সর্ব্বব্যাপী পুরাতন শোথ প্রাধানতঃ দুই শ্রেণীর হইয়া থাকে। (১) হৃদ্‌পীড়ার শোথ (২) মুত্রযন্ত্রের পীড়ার শোথ। এই দুই শ্রেণীর শোথের ইতরবিশেষ বুঝিতে পারিলেই চিকিৎসার পক্ষে সুবিধা হইবে।

যদি আমরা এমন বুঝিতে পারি যে শোথ জন্মাইবার পূর্ব্বে রোগীর কাশের ব্যারাম এবং শ্বাসকষ্ট ছিল অথবা সামান্য পরিশ্রম করিলেই রোগীর

বুক ধড়্ ফড়্ করিত, অথবা তাহার বক্ষের বাম দিকে কোন সময় বেদনা হইয়াছিল, কিম্বা রোগীর শোথ হইবার কিছু দিন বা অনেক দিন পূর্ব্বে তাহার তরুণ বাত (একুাট রিউম্যাটিজ্‌ম) হইয়াছিল * অথবা হৃদয়ের পরীক্ষার যদি কোনরূপ শব্দ বৈলক্ষণ্য জানিতে পারি, তবে হৃদয় যন্ত্রের পীড়ার দ্বারাই শোথ হইয়াছে এমন অনুমান করা যাইতে পারে। রোগীর বয়ঃক্রম যদি অত্যন্ত প্রাচীন হয়, আর অন্য কোন পীড়া না থাকে তবে সম্ভবতঃ হৃদয়ের পীড়ার জন্যই শোথ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। কারণ অত্যন্ত প্রাচীন বয়সে প্রায়ই হৃদয় পীড়াগ্রস্ত হইয়া থাকে।

কিন্তু অনেক স্থলে এমন দেখা গিয়াছে যে হৃদয়ের পীড়া আছে অথচ রোগীর শোথ হয় নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে কোন্ শ্রেণীর হৃদ্‌পীড়ায় শোথ উপস্থিত হয়? ইহার উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া গিয়াছে। যে সকল হৃদ্‌পীড়ায় ভেইনের ভিতর রক্তের গতির রোধ হইতে পারে তাহাতেই শোথ জন্মায় অন্যরূপ হৃদ্‌রোগে শোথ জন্মায় না। ফুস্ফুষের সহিত হৃদয়ের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ অতএব ফুস্ফুষ পীড়িত হইলেও শোথ উপস্থিত হয়, কারণ ফুস্ফুষের পীড়া হইলে হৃদয় পীড়িত এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে ভেইনের ভিতর রক্তের গতি রোধ হয় বা রক্তের উজান গতি হয়। এই জন্য হাঁপ্ রোগীর শোথ জন্মাইয়া থাকে।

তার পর মুত্রযন্ত্রের পীড়াবশতঃ যে শোথ জন্মায় তাহা কিরূপে ঠিক করিব? এইরূপ শোথ তরুণ ও পুরাতন দুই রকমেরই হইতে পারে। যদি হঠাৎ হিম লাগিয়া বা ঘর্ম্ম রোধ হইয়া তরুণ শোথ হয় তবে ঐ শোথ সম্ভবতঃ মুত্রযন্ত্রের প্রদাহ বশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে অনুমান করা যাইতে পারে। তার পর হাম হইয়া যে শোথ হয় তাহাও এই শ্রেণীর। এইরূপ শোথ হইলে সাধারণতঃ শরীরের ভিতরের গহ্বরে প্রায়ই শোথ জন্মে না। আর শরীরের উপর আঙ্গুলের ঠাস দিলে ততটা টোস্ খাইয়া যায় না। এইরূপ রোগীকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যদি আমরা এমন জানিতে পারি যে তাহার

---

* তরুণ বাতরোগ (একুাট রিউম্যাটিজ্‌ম) হইলে প্রায়ই হৃদয়ের পীড়া হইয়া থাকে।

হৃদয়ের বা ফুস্ফুসের কোনরূপ ব্যারাম নাই, রোগীরপূর্ব্বে তরুণ বাত কখনও হয় নাই অথবা কস্মিন্‌কালে রোগীর শ্বাসকাসের পীড়া ছিল না তাহা হইলে মূত্রযন্ত্রের পীড়াদ্বারাই শোথ হইয়াছে এমন কথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে।

রোগীর চেহারা দেখিলেও অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। হৃদ্‌রোগ-বশতঃ শোথ হইলে রোগীর গুলি ও ওষ্ঠদ্বয় কিছু যেন লালছে বা বেগুনে রং ধারণ করিয়াছে বোধ হয়। কিন্তু মূত্রযন্ত্রের পীড়ার জন্য শোথ হইলে মুখ একবারে পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে অথবা যেন কালীমা পড়িয়াছে বোধ হয়। মুখের বর্ণ যেন মৃত্তিকার ন্যায় হইয়াছে বোধ হয়। অনেক পুরাতন রক্ত-হীন রোগীর শোথ হইলে মুখ পাণ্ডুবর্ণ হয় বটে কিন্তু এত হয় না এবং এরূপ মৃত্তিকার ন্যায় বর্ণ হয় না। তার পর রোগীর মূত্র পরীক্ষা করিলে রোগ ধরিবার পক্ষে আর কোনই সন্দেহ থাকেনা। রোগীর মূত্রের রাসায়নিক পরীক্ষা সবিস্তারে বর্ণনা করা এস্থলে সম্ভব নহে। এই মাত্র জানিয়া রাখা যাক, যে মূত্রযন্ত্রের (কিড্‌নির) পীড়া হইলে মূত্রপরীক্ষায় এল্‌বুমেন নামক পদার্থ পাওয়া যায়। রোগীর খানিকটা প্রস্রাব ধর। ঐ প্রস্রাব একটা ছোট শিশিতে দুইড্রাম পরিমাণে লও এবং প্রদীপের শিশায় বা স্পীরিট্‌ ল্যাম্পে তাতাও। প্রদীপের শিশায় তাতাইলে শিশি কাল হইয়া যায়, স্পীরিট্‌ ল্যাম্পে তাতাইলে সেরূপ হয় না। এইরূপ প্রস্রাব গরম করিলে যদি এল্‌বুমেন্‌ থাকে, তবে শিশির নিচে সাদা সাদা ছ্যাকড়া পড়িবে। রোগীর মূত্রে ফোঁটা কতক ষ্ট্রং নাইট্রিক এসিড্‌ দিলেও ঐরূপ সাদা ছ্যাকড়া পতিত হয়। অথবা নাইট্রিক যোগ করিয়া তার পরে শিশি আগুণের তাতে গরম করিলে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হয়।

ডাক্তার ক্রিষ্টিসন এইরূপ মূত্রযন্ত্রের পীড়ার শোথ ধরিবার জন্য আর গুটি কতক সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন। চিকিৎসক বর্গের সুবিধার জন্য এস্থানে বর্ণিত হইল।

(১) হাম হইয়া শোথ হইলে সে শোথ মূত্রযন্ত্রের পীড়ার জন্যই হইয়াছে।

(২) যদি শোথযুক্ত অঙ্গে অঙ্গুলের টিপ্‌ দিলে টোস্‌ খাইয়া না যায়,

তাহাও এই শ্রেণীর শোথ। এই নিয়মটী কতটা ঠিক বটে কিন্তু স্থান বিশেষে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে যদি শোথ শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত হয়, তবে অঙ্গুলি দিয়া টিপিলে শোথ স্থানে টোস্ খায় না। যে শোথ ক্রমে ক্রমে হইয়াছে বা যে শোথ বহুদিন স্থায়ী হইয়াছে, তাহাতেই টোস্ খাইয়া যায়।

(৩) যে সকল শোথে রোগীর প্রস্রাবাধিক্য হয় অথচ প্রস্রাব পরীক্ষা করিলে রোগীর শর্করামেহ রোগ হয় নাই বুঝিতে পারা যায়। শর্করা মেহ থাকিলে প্রস্রাব বেশী হয় এবং প্রস্রাবে শর্করা পাওয়া যায়। এই সকল স্থানে অনুসন্ধান করা উচিত যে রোগী কোনরূপ প্রস্রাব বৃদ্ধিকারী ঔষধ সেবন করে নাই অথবা জল ও সরবত বেশী পরিমাণে খায় না।

(৪) যে সমস্ত শোথে প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০১০ র নীম্নে অথচ পরিমাণে স্বাভাবিক, সে প্রস্রাবে এল্‌বিউমেন্ থাক বা না থাক্, সেরূপ প্রস্রাবযুক্ত রোগীর শোথ নিশ্চয়ই মূত্রযন্ত্রের পীড়া দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে।

শোথের জল রাসায়নিক পরীক্ষা করিলে এই গুলি জানিতে পারা যায়; শোথের জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০০৮ অথবা ১০১২। শোথের জল জলের ন্যায় পাতলা; ইহা বর্ণহীন স্বচ্ছ অথবা সামান্য হরিদ্রাবর্ণ। কখন কখন পিত্ত ও রক্ত সামান্য পরিমাণে ইহার সহিত মিশ্রিত হইয়া অল্প লাল্‌ছে অথবা ঈষৎ সবুজ বর্ণ হইতে পারে। এই রস লবণাক্ত কচিৎ ঈষৎ অম্ল হয়। রাসায়নিক পরীক্ষায় এইরসে এল্‌বিউমেন, এবং নানারূপ লবণ পাওয়া যায়। মূত্রযন্ত্রের পীড়ার শোথের জলে ইউরিয়া নামক পদার্থ পাওয়া যায়।

ক্রমশঃ—

শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্যাল এম, বি।

আয়ুর্ব্বেদে শোথরোগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মেদরোগ জন্য যখন মনুষ্যের দেহ অত্যন্ত স্থূল হইয়া পড়ে, তখন ঐ ব্যক্তিকে বিশেষতঃ তাঁহার উদরস্থান ঠিক শোথগ্রস্তের ন্যায় অনুভব হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাকে শোথরোগ না বলিয়া মেদরোগ বলা হইয়া থাকে।

সর্ব্বপ্রকার উদররোগেই পেটে ভয়ানক শোথ জন্মিয়া থাকে। তন্মধ্যে বায়ুজনিত উদররোগে হাত, পা, নাভি ও পেটে অধিকরূপে শোথ জন্মিতে দেখা গিয়া থাকে। উদররোগীর এইরূপ হস্ত পদাদিতে শোথ জন্মান বড় শুভ লক্ষণ নহে। রোগীর অবস্থাবিশেষে এইরূপ শোথ দেখিয়া তাহার মৃত্যুর পর্য্যন্ত আশঙ্কা করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ উদর রোগীর চক্ষুতে শোথ উৎপন্ন হইলে তাহাও বড় আশঙ্কার কথা। তদ্ভিন্ন যে উদররোগীর তীক্ষ্ণ বিরেচক ঔষধ দ্বারা বিরেচন করাইলে (জোলাপ দ্বারা অধিক দাস্ত করান) উদরের ফুলার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইয়া আবার পূর্ব্ববৎ উদর ফুলিয়া পড়ে, সে রোগীর জীবনের আশা আর নাই বলিলেই চলে। পরন্তু উদররোগের শোথাবস্থায় রোগীর অতীসার (পুনঃ পুনঃ পাতলা দাস্ত হওয়া) থাকিলেও তাহর জীবন দুর্লভ বলিয়া জানা আবশ্যক।

বৃদ্ধি অর্থাৎ কোরণ্ড বা একশিরা এবং অন্ত্রবৃদ্ধি রোগে অণ্ডকোষের একটী বা উভয়টীতে মাংসবৃদ্ধি হইয়া অথবা জল জমিয়া শোথের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কিন্তু বৈদ্যশাস্ত্রমতে ইহাকে শোথরোগ না কহিয়া কোরণ্ড, একশিরা ও অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ বলা হইয়া থাকে।

গলদেশে গলগণ্ড, গণ্ডমালা ও অর্ব্বুদ প্রভৃতি কতকগুলি মাংসবৃদ্ধি-জনিত রোগেও পীড়িত স্থান শোথের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ইহারাও সাধারণতঃ শোথ নামে অভিহিত না হইয়া গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী ও অর্ব্বুদ রোগে অভিহিত হইয়া থাকে। শ্লীপদ রোগে একপায়ে অথবা উভয় পায়ে যে ভয়ানক শোথ জন্মে, তাহাকে শোথ রোগ না কহিয়া শ্লীপদ বা "গোদ"

রোগ বলা হইয়া থাকে। এই গলগণ্ড ও শ্লীপদপ্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত রোগগুলি প্রায়ই কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য। বিদ্রধিরোগে বাতাদি দোষ, অস্থিকে আশ্রয় করিয়া যে উন্নত ও বেদনাযুক্ত শোথ উৎপন্ন করে, তাহাকে শোথ না বলিয়া বিদ্রধি বলা যায়। ব্রণ অর্থাৎ ফোঁড়া উৎপন্ন হওয়ার পূর্ব্বে যে অঙ্গবিশেষে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে ব্রণশোথ বলে।

কোনরূপ দণ্ড বা অস্ত্রদ্বারা আঘাত, বৃক্ষ বা উচ্চস্থান হইতে পতন অথবা অসম স্থানে গমনাগমন হেতু শরীরের অঙ্গবিশেষে আঘাত অর্থাৎ চোট লাগিয়াও শরীরের স্থানবিশেষে অল্প বিস্তরভাবে শোথ জন্মিতে পারে, কিন্তু এরূপ শোথের পরিমাণ অত্যধিক হইলেও তাহাকে সাধারণতঃ শোথ-রোগ না বলিয়া ভগ্নরোগ বলা গিয়া থাকে।

ভগন্দর রোগে রোগীর মলদ্বারের নিকটবর্ত্তী স্থানে যে ক্ষুদ্র পীড়কা (ফুস্কুড়ি) জন্মে, তাহাকে শোথ বলা যায় না। তবে ক্বচিৎ এমনও হইতে পারে পারে যে, এই রোগে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ভুগিতে ভুগিতে যখন রোগী নিতান্ত অস্থিচর্ম্মসার হইয়া পড়ে, তখন তাহার হস্ত পদাদিতে উপসর্গ রূপে শোথ জন্মিতে পারে। কিন্তু ইহা নিতান্ত বিরল। আর এরূপ অবস্থা ঘটিলে তাহার জীবনও নিতান্ত দুর্ল্লভ। উপদংশ অর্থাৎ গরমীরোগে অনেক সময়ে পুরুষাঙ্গ ভয়ানক ফুলিয়া পড়ে। তাহা ছাড়া অস্বাভাবিক উপায়ে পুরুষাঙ্গ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করিলেও এইসঙ্গে শোথ জন্মিতে পারে।

কুষ্ঠরোগে সকল অবস্থায় শোথ জন্মে না, তবে পুণ্ডরীকাদি কতকগুলি কুষ্ঠ সর্ব্বাঙ্গব্যাপী হইলে রোগীকে শোথগ্রস্তের ন্যায় বোধ হয় এবং চর্ম্মাখ্য কুষ্ঠে যখন রোগীর চর্ম্ম হস্তিচর্ম্মের ন্যায় স্থূল অর্থাৎ মোটা হয়, তখনও ঐরূপ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন রসরক্তাদি ধাতুগত কুষ্ঠে যখন রোগীর নাসিকা বসিয়া যায়, চক্ষু রক্তবর্ণ ও স্বরভঙ্গ হয় এবং অঙ্গুলীতে ক্ষত হইয়া খসিয়া যাইতে আরম্ভ হয়, তখনও রোগীকে বিকটাকার শোথগ্রস্ত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইহাদিগের এসমস্ত অবস্থাকে শোথ না বলিয়া কুষ্ঠেরই উপসর্গ বলা উচিত।

অম্লপিত্তরোগের সচরাচর প্রায় কোন অবস্থাতেই শোথ জন্মে না। তবে এমন দেখা গিয়াছে যে, যে সমস্ত বহুকালব্যাপী অম্লপিত্তগ্রস্ত রোগী

চিরদিনই ভয়ানক কুপথ্যের দাস, তাহাদেরই পরিণামে দূষিত রস হইতে ক্রমেই হস্তপদ ও উদরে শোথ জন্মিতে পারে। কিন্তু অম্লপিত্তের পরিণামে এ শোথও বড় ভয়ানক। এরূপ শোথ উপস্থিত হইলে রোগীর মূলরোগের আরোগ্যের আশা দূরে থাক, প্রায়ই তাহার জীবন লইয়া টান পড়ে।

ক্রমশঃ—

এলোপ্যাথি মতে।

জ্বর-চিকিৎসা।*

ইণ্টারমিটেণ্টফিবার বা সবিরাম জ্বর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৪০ পৃষ্ঠার পর)

উত্তাপ অবস্থা।

যদি তাপমান যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে উত্তাপ ৫ ডিগ্রীর নীচে থাকে, তাহা হইলে নিম্ন লিখিত আরক ব্যবহার করিলে উত্তাপের ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া জ্বরের বিরাম হইতে পারে। যথা—

লাইকার য়্যামোনি য়্যাসিটেটিস্ ১।।০ ড্রাম।
স্পিরিটস্ ঈথারনাইট্রীক ২০ ফোঁটা হইতে অর্দ্ধ ড্রাম।
পটাস্ ব্রোমাইড্ ১০ গ্রেণ হইতে ১৫ গ্রেণ।
টীঞ্চার ডিজিটেলিস্ ৫ ফোঁটা।
ক্যাম্ফর মিক্শ্চার ১ আউন্স।

---

* এই প্রবন্ধে কোন গ্রন্থবিশেষ হইতে অনুবাদিত নহে। ডাক্তার জগদ্বন্ধু বাবু বহুকাল হইতে সহস্র সহস্র রোগীর চিকিৎসা করিয়া চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহার বহু দর্শন-জনিত যে জ্ঞান জন্মিয়াছে, লম্বা চৌড়া ও ভাষার আড়ম্বর না করিয়া অতি সংক্ষেপে কেবল মাত্র তাহাই লিখিলেন।

ম্যানেজার— চি, র, স,

একত্রে মিশ্রিত এক মাত্রা প্রস্তুত করিয়া দুই দুই ঘণ্টান্তর যতক্ষণ উত্তাপ ১০০ শত ডিগ্রী পর্য্যন্ত না কমে, ততক্ষণ প্রয়োগ করিবে। এই রকম জ্বরের প্রত্যেক আক্রমণের পর উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে উক্ত ঔষধ অন্ততঃ দুই দিন উত্তাপের সময় ব্যবহার করিলে জ্বরের সম্পূর্ণ বিরাম পাইবার সম্ভাবনা। আর যদি উত্তাপ ৫ ডিগ্রীরও অধিক হয়, তাহা হইলে সমুদায় শরীরে শীতল জল বা বরফ জলে গামছা ভিজাইয়া তদ্দ্বারা বারম্বার রোগীর গা মুছাইয়া দিলে শীঘ্র শীঘ্র উত্তাপের হ্রাস হইতে পারে। যদিস্যাৎ উপরোক্ত প্রকরণেও উত্তাপের তাদৃশ হ্রাস না হয়, তাহা হইলে রোগীকে বড় গামলাতে খুব ঠাণ্ডা জল বা বরফ জলে গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া অন্ততঃ ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত বসাইলে শীঘ্র উত্তাপের হ্রাস হইতে পারে। কিন্তু যদ্যপি রোগীর বক্ষঃগহ্বরের কোন যন্ত্রে রক্তাধিক্য বা কন্‌জেস্‌সন্ এবং প্রদাহ বা ইন্‌ফ্লামেসন্ থাকে, তাহা হইলে উপরোক্ত উপায় দ্বারা উত্তাপ কমান যুক্তিসিদ্ধ নহে। কারণ ইহাতে উপরোক্ত রক্তাধিক্য বা প্রদাহের বৃদ্ধি হইতে পারে।

(১) স্যালিসিলেড্ অব্ সোডা, (২) এণ্টিপাইরীন্ এবং (৩) এণ্টি ফীবরীন্।

এই তিনটী ঔষধ প্রসিদ্ধ উত্তাপহারক। কিন্তু ইহাদের উত্তাপহারক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে অতি ঘর্ম্মবশতঃ হৃৎপিণ্ডের অতিশয় দুর্ব্বলতা শীঘ্র প্রকাশ পায়। এজন্য এই তিনটী ঔষধের ব্যবহার খুব সাবধানের সহিত করা উচিত। কিন্তু যদি রোগীর দুর্ব্বলতা অধিক থাকে, কিংবা জ্বর যদি অধিক দিন স্থায়ী ভাবে থাকিয়া রোগীকে দুর্ব্বল করে। তাহা হইলে ইহাদিগের ব্যবহার করা একবারেই উচিত নহে। এই দুর্ব্বলতার চিহ্ন প্রায় নাড়ী পরীক্ষা দ্বারা জানা যাইতে পারে। যদ্যপি নাড়ীর বেগের অতি বৃদ্ধি থাকে, এমন কি প্রত্যেক মিনিটে ১৪০ বা তদধিক বার স্পন্দিত হয়, অথবা নাড়ী যদি পুষ্টি ও বলরহিত থাকে। তাহা হইলে উপরোক্ত ঔষধ তিনটীর ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে।

এই তিনটীর মধ্যে স্যালিসিলেড্ অব্ সোডা সর্ব্বাপেক্ষা হৃৎপিণ্ড অবসাদক। এজন্য যদি ইহার ব্যবহার কর্ত্তব্য বিবেচনা হয়, তাহা হইলে

নিম্নলিখিত প্রিস্ক্রিপ্‌সন্‌ মতে মিশ্র ব্যবহার করিলে হৃৎপিণ্ডের অবসাদন ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প হয়।—

স্যালিসিলেড্‌ অব্‌ সোডা ১০ গ্রেণ হইতে ১৫ গ্রেণ।
টীঞ্চার ডিজিটেলিস্‌ ৫ ফোঁটা।
স্পিরিটস য়্যামোনি য়্যারোমেটিক্‌ ২০ ফোঁটা।
ক্লোরিক্‌ ঈথার ২০ ফোঁটা।
টীঞ্চার বেলেডোনা ৬ ফোঁটা হইতে ৮ ফোঁটা।
এবং জল বা ক্যাম্ফর মিকশ্চার ১ আউন্স।

একত্রে মিশ্রিত করিয়া দুই দুই ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করিবে। এবং প্রত্যেক বার এই ঔষধ ব্যবহারের পরক্ষণেই তাপমান যন্ত্র দ্বারা রোগীর শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। যদি ১০২ ডিক্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ কমিয়া থাকে, তাহা হইলে এ ঔষধ আর ব্যবহার করা উচিত নহে।

যদি এই ঔষধ বন্ধ করার পর এক বা অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে উত্তাপ আরও এক বা দুই ডিগ্রী কমিয়া যাইতে দেখা যায়। অর্থাৎ ১০১ বা ১০০ ডিগ্রী হইয়া পড়ে, অথবা যদি ঘর্ম্মেরও নিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে নিম্ন লিখিত ঘর্ম্মনিবারক ও উত্তেজক ঔষধ ব্যবহার করা উচিত। যথা—

য়্যাসিড্‌ সল্‌ফিউরিক ডাইলিউট্‌ ১৫ ফোঁটা।
ঈথার সলফিউরিক ২০ ফোঁটা।
স্পিরিট ভাইনাই গ্যালিসাই ১ ড্রাম হইতে ১॥০ড্রাম।
টীঞ্চার মাস্ক অর্থাৎ মৃগ নাভীর অরিষ্ট ২০ ফোঁটা হইতে ৩০ ফোঁটা।
টীঞ্চার বেলেডোনা ৬ ফোঁটা হইতে ৮ ফোঁটা।
কিংবা লাইকার য়্যাট্রোপিন্‌ সিকি ফোঁটা।
ইন্‌ ফিউসম্‌রোজি য়্যাসিডম্‌ ১ আউন্স।

একত্রে মিশ্রিত করিয়া দুই দুই ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করিলে রোগীর ঘর্ম্ম

নিবারণ হয়, এবং নাড়ীর বেগ কমিয়া সবল হইতে থাকে। এ স্থলে ইহাও বলা উচিত যে, উপরোক্ত আরকের মধ্যে মৃগ নাভীর অরিষ্ট অধিক মূল্যবান্ বলিয়া সংগৃহীত না হইলে উহা বাদে অন্যান্য ঔষধ গুলির মিশ্র করিয়া ব্যবহার হইতে পারে।

২য়। এণ্টীপাইরিন্ নামক ঔষধটী অতিঘর্ম্মকারকসত্ত্বেও স্যালিসিলেড্ অব্ সোডার ন্যায় তাদৃশ হৃৎপিণ্ড অবসাদক নহে। এজন্য যদি রোগী একবারে দুর্ব্বল না হয়, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইলেও সে স্থলে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার ব্যবহারের পর যদি উত্তাপের অতিশয় হ্রাস হয় এমন কি একশত ডিগ্রীর নীচে আইসে, তাহা হইলে স্যালিসিলেড্ অব্ সোডার পরে যে ঘর্ম্ম নিবারক ও উত্তেজক ঔষধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহা সেই নিয়মে ব্যবহার করিবে। এণ্টীপাইরীন্ ব্যবহার করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রিস্ক্রিপ্সন্ অনুসারে ব্যবহার করা উচিত। যথা—

এণ্টীপাইরীন্ ১৬ গ্রেণ হইতে ২০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।
সিরাপ্ অরেন্সিয়াই ১ ড্রাম।
একোয়া অরেন্সিয়াই ১ আউন্স।

এই সমুদায় একত্রে মিশ্রিত করিয়া একমাত্রা প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। যদি একঘণ্টার পরেই উত্তাপ ১০৩ ডিগ্রীর নীম্নে না হ্রাস হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত ঔষধ আর একমাত্রা রোগীকে সেবন করাইবে। এবং পুনর্ব্বার একঘণ্টার পর তাপমান যন্ত্রদ্বারা রোগীর উত্তাপ পরীক্ষা করিবে। যদি রোগীর উত্তাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা কম না হইয়া থাকে, এবং নাড়ীর বেগ বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে সে সময়ে আর কোন ঔষধ প্রয়োগের আবশ্যক হয় না। কিন্তু যদি তখনও ঘর্ম্ম এবং সেই সঙ্গে নাড়ীর বেগের বৃদ্ধি হইতে থাকে। অথবা বেগের হ্রাস না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ঘর্ম্ম নিবারক এবং উত্তেজক মিশ্র ব্যবহার করিতে হইবেক। ক্রমশঃ—

কলিকাতা
অগ্রহায়ণ } শ্রীজগবন্ধু বসু, এম্ ডি।

হোমিওপ্যাথিমতে জ্বর-চিকিৎসা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

কবিরাজী চিকিৎসা যে আমাদের দেশোপযোগী চিকিৎসা এবং জ্বর-রোগে বিশেষ ফলপ্রদ, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এলোপ্যাথিক চিকিৎসার প্রাদুর্ভাবে আমাদের দেশীয় পুরাতন চিকিৎসা-শাস্ত্র ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। কবিরাজী চিকিৎসা সকল প্রকার জ্বর রোগে যে এক সময়ে আমাদের দেশে বিশেষ কার্য্যকারী ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্বকার কবিরাজ মহাত্মারা চিকিৎসা বিষয়ে যে বিশেষ নিপুণ্যতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় এই যে, নব্যসম্প্রদায়ের কবিরাজ মহাশয়েরা বোধ হয় সেরূপ যত্নসহকারে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন না। সুতরাং চিকিৎসাকার্য্যেও তাঁহারা ততদূর নিপুণ হন্ না। জ্বররোগ প্রায় সকল রোগেরই অন্তর্গত এবং ইহার চিকিৎসাকার্য্যে কাজে-কাজেই বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতার আবশ্যক। নবজ্বরে এখন আমাদের দেশে প্রায়ই কবিরাজী চিকিৎসা কেহ করান না। এবং নবজ্বর চিকিৎসায় কবিরাজ মহাশয়েরাও বোধ হয় তত পটু নহেন। এই চিকিৎসা সম্বন্ধে কবিরাজীমতে যে সকল গ্রন্থ আছে, তাঁহারা আদৌ সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করেন না, অথবা এরূপ ভাবে পাঠ করেন যে, তাহাতে নবজ্বর চিকিৎসা করিতে সাহস পান না। কিন্তু যে কবিরাজ মহাশয়েরা এবিষয়ে সম্পূর্ণ দোষী তাহাও নহে। আমাদের দেশীয়গণ নবজ্বর হইলে এলোপ্যাথিক চিকিৎসার উপর সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করেন এবং মনে করেন যে এলোপ্যাথিক চিকিৎসাই নবজ্বরের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং একমাত্র চিকিৎসা। এবং কবিরাজী অথবা অন্যান্য চিকিৎসা নিস্ফল। তাঁহাদের এই বিবেচনা কবিরাজী চিকিৎসার বর্ত্তমান অবস্থায় যে সম্পূর্ণ ভ্রান্তি মুলক, তাহাও আমরা

বলিতে পারিনা। কেন না যে সকল পরিবার নবজ্বরে এলোপ্যাথি চিকিৎসার অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা কবিরাজী অথবা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার আশ্রয় লইয়া থাকেন। কিন্তু নবজ্বরের চিকিৎসা কবিরাজী মতে যত দিন না সর্ব্ববাদী-সম্মত হইবে, ততদিন বোধহয়, কবিরাজ মহাশয়েরা নবজ্বরের চিকিৎসা-গ্রন্থ বিশেষরূপ পাঠ করিবেন না এবং নবজ্বরের ঔষধাদিও প্রস্তত রাখিবেন না।. আমার বিবেচনায় এবং যত দূর আমি দেখিয়াছি ও বুঝিয়াছি, এলোপ্যাথিক চিকিৎসা জ্বররোগে বিশেষতঃ নবজ্বরে যে শরীরের উপর বিশেষ অনিষ্ট করে, এবং রোগীর সুন্দররূপ আরোগ্য হওয়া দুরূহ হইয়া পড়ে, তাহা বলা বাহুল্য। সচরাচর আমাদের দেশে এলোপ্যাথিক মতে নবজ্বরের চিকিৎসা হয়, এবং যদিও রোগী তদ্দ্বারা কয়েক দিনের জন্য আরোগ্যলাভ করেন, কিন্তু পরে, কুইনাইনের ঠেলা নিবন্ধন অসুস্থ ও জীর্ণ এবং জরাগ্রস্ত হইয়া পড়েন। অথবা পেটে প্লীহা ও যকৃত হওয়াতে অতিশয় কষ্ট পান। এমত সময়ে যে সকল লোকের কবিরাজী চিকিৎসা কিংবা অন্য প্রকার চিকিৎসার উপর সম্পূর্ণ বিদ্বেষ আছে, তাঁহারা এলোপ্যাথিক চিকিৎসার উপর নির্ভর করিয়া থাকেন, এবং ক্রমশঃ অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। কিন্তু যাঁহারা বৈদ্য চিকিৎসার আশ্রয় লন, তাঁহাদের আরোগ্যলাভ করিবার বিশেষ আশা থাকে, এবং সুচিকিৎসকের চিকিৎসার অধীনে থাকিলে প্রায়ই আরোগ্যলাভ করেন।

আমি ইহা কখনও স্বীকার করিতে পারি না যে কবিরাজী মতে নবজ্বরের চিকিৎসা নাই। অথবা যাহা কিছু আছে, তাহা কার্য্যকারক নহে। যেহেতু আমি নিজে মৃত মহাত্মা কমল কণ্ঠাভরণ ও গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় দ্বয়ের নবজ্বরের চিকিৎসা-প্রণালী দেখিয়া এরূপ বুঝিয়াছি যে, নবজ্বর চিকিৎসা কবিরাজী মতে বিশেষ ফলপ্রদ এবং রোগীর শারীরিক অনিষ্টের শঙ্কা আদৌ নাই। এই রাজধানীতে কবিরাজের সংখ্যা কম নহে, কিন্তু উক্ত দুই মহাত্মার বিষয় স্মরণ করিয়া এই সকল কবিরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই ভাবটী মনে উদয় হয় যে আধুনিক কবিরাজ মহাশয়েরা আপনাদের ব্যবসায়ে সেরূপ পটু নহেন। বিশেষতঃ নবজ্বর চিকিৎসা করিতে সেরূপ সক্ষম নহেন।

আধুনিক কবিরাজী মতে চিকিৎসা, ব্যবসায়রক্ষা করিবার অন্যতম উপায়স্বরূপ হইয়াছে, ইহাতে জনসাধারণের উপকার হওয়া দূরে থাকুক। অনেকস্থলে প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়ে, কারণ, আমরা প্রায়ই শুনিয়া থাকি যে সামান্য নবজ্বরচিকিৎসায় অনেক কবিরাজ মহাশয়েরা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া রোগীকে কষ্ট দিয়া থাকেন। এবং, শতকরা ৫টী মাত্র উক্তরোগ আরোগ্য করিতে কৃতকার্য্য হন্ কি না সন্দেহ। এমন কি, অনেক আধুনিক বৈদ্য জ্বর তাড়াইবার জন্য কুইনাইন্ পর্য্যন্ত রূপান্তরে ব্যবহার করিতে ক্রুটি করেন না। অতএব বর্ত্তমান কালের বৈদ্য মহাশয়গণ যে কঠিন রোগ সকল আরোগ্য করিতে অপারগ হইবেন ইহাতে বিচিত্র কি আছে? ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, অধুনা কবিরাজ মহাশয়গণকে নবজ্বরে কেহ আহ্বান করে না বলিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া স্থানে স্থানে অভিযোগ করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা সমস্ত বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন না, এবং জানিয়াও জানিতে পারেন না।

সকলেই বিলক্ষণ অবগত আছেন যে, কবিরাজ মহাশয়েরা দেহতত্ত্ব, শরীর ব্যবচ্ছেদবিদ্যা ও মানবদেহ সম্বন্ধীয় বিবিধ জ্ঞানে কতদূর পারদর্শী ও বিজ্ঞ! এই সকল শাস্ত্রে বিশেষ উপলব্ধি না জন্মিলে চিকিৎসা করা দূরে থাকুক, রোগনির্ণয়ই অসম্ভব। রোগ নির্ণয় করা দূরে থাকুক, রোগী দেখিতে রোগীর গৃহাভিমুখে গমনোদ্যমই অসম্ভব। রোগীর গৃহে গমন করা দূরে থাকুক, চিকিৎসা ব্রতাবলম্বী হইতে কৃতসংকল্প হওয়াই অসম্ভব। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র একটী বৃহত্তম গ্রন্থ। অন্ততঃ ১০।১৫ বৎসর কাল নিয়ত শিক্ষা ও চর্চ্চা না করিলে ইহার কিছুই আয়ত্তাধীন হয় না। কিন্তু আধুনিক কবিরাজ মহাশয়েরা ২।১ বৎসর কাল এই বৃহত্তম গ্রন্থের কয়েক পৃষ্ঠা মাত্র উল্‌টাইয়া চিকিৎসক বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। এবং মানব জীবনকে শিমূল তুলার ন্যায় ফুৎকার দিয়া উড়াইয়া দিয়া থাকেন। কয়েকটী সংস্কৃত শ্লোক কিম্বা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের কিয়দংশ মাত্র অভ্যাস করিয়া এবং সাহসে ভর করিয়া কঠিন কঠিন রোগ সকলেও হস্তক্ষেপ করেন। এই সকল দুঃসাহসিক কার্য্যের ভাবীফল কখনই মঙ্গলদায়ক হওয়া সম্ভবপর নহে। যেমন অন্ধকার আলোকদ্বারা তিরোহিত হইয়া থাকে। সেইরূপ দেহতত্ত্ববিদ্যাও

শরীর ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার আলোকদ্বারা শারীরিক পীড়ারূপ অন্ধকার দূরীকৃত হয়। যেমন দীপশিখা অনবরত পরিবর্ত্তন শীল হইলেও সূক্ষ্মতাবশতঃ সে পরিবর্ত্তন রাসায়নিক জ্ঞান ব্যতীত চিনিতে পারা যায় না। সেইপ্রকার রোগের গতি অনুসারে রোগীর শরীরের বাহ্যিক অবস্থার পরিবর্ত্তন দ্বারা যে সকল সূক্ষ্ম লক্ষণ সমূহ উপলক্ষিত হয়, তাহা দেহতত্ত্ব জ্ঞান ব্যতীত রোগ নির্ণয়ের চিহ্ন স্বরূপ বলিয়া কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না। উদরের অভ্যন্তরে বেদনা হইয়াছে বলিয়া যাহা হউক একটা বেদনানাশক ঔষধ প্রয়োগ করিলেই যদি আরাম হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, সংসারে চিকিৎসকের প্রয়োজন হইত না। কি জন্য বেদনা হইয়াছে, উহার উৎপত্তি স্থান কোথায়, ইত্যাদি নির্ণয় করিয়া পশ্চাৎ ঔষধ ব্যবস্থা কর্ত্তব্য, কিন্তু ইহাদের সে জ্ঞান কোথায়, কেবল মিশ্র কুইনাইন্, জ্বরকেশরী, জ্বরান্তক লৌহ ইত্যাদি একমাত্র তাঁহাদের শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত ব্যবস্থা ও ভরসা।

আমরা পূর্ব্বকালীন কবিরাজ দিগের চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির অনেক পরিচয় পাইয়া থাকি। তাঁহাদের দেহতত্ত্ববিষয়ে জ্ঞান ছিল বলিয়া এরূপ পারিদর্শিতার পরিচয় দিতে পারিতেন। এরূপও জনশ্রুতি আছে যে, অতি পুরাকালে অস্ত্রচিকিৎসা প্রণালীও প্রচলিত ছিল। সুতরাং তৎকালের বৈদ্য দিগের দ্বারা সাধারণের উপকার হইত। তাঁহাদের দোহাই দিয়া এবং হিম্মৎখাঁর সাকরেদ বলিয়া (সাহসে ভর করিয়া) বর্ত্তমান কবিরাজেরা অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহাঁদের চিকিৎসা শাস্ত্রে কোন বিশেষ অভিজ্ঞতা দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল পেটের দায়ে চিকিৎসা ব্যবসায়ে ব্রতী হন্। যাঁহাদের হস্তে মহামূল্য মানব জীবন সমর্পণ করিতে হইবেক, তাঁহাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে এবং মানবদেহতত্ত্বে বিশেষ অভিজ্ঞতা ও বিশেষ পারদর্শিতার আবশ্যক। কোন কোনও ভদ্র পরিবারের মধ্যে এমন একটী বদ্ধমূল বিশ্বাস আছে যে, বৃদ্ধ রোগীকে কবিরাজী ঔষধ সেবন করান শ্রেয়ঃ। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, কবিরাজী ঔষধ সকল অতি মৃদু এবং বৃদ্ধ শরীরের পক্ষে উপযোগী, এই বিশ্বাস কিন্তু আমাদের মতে ভ্রান্তিমূলক বলিয়া বোধ হয়, কারণ যাঁহারা শিশু ও স্ত্রীলোক দিগের চিকিৎসার একবারে অনভিজ্ঞ, এবং যাহাদের চিকিৎসা-শাস্ত্রে

অধিকার এত কম, তাঁহারা বৃদ্ধ রোগীকে আরোগ্য করিতে কিরূপে কৃতকার্য্য হইবেন? বৃদ্ধকালে মানবের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি শিথিল হইয়া পড়ে, পরিপোষণী শক্তি বিলুপ্ত প্রায় হইয়া যায়। অধিকন্তু মানব অকর্ম্মণ্য এবং নিস্তেজ হইয়া পড়ে, সেই নিমিত্ত সেই সময়ে চিকিৎসায় সম্যক্ বিচক্ষণতার ও অভিজ্ঞতার আবশ্যক। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, চিকিৎসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে মানবদেহের সমস্ত আভ্যন্তরিক ক্রিয়াগুলি সম্যক্‌রূপে জানা আবশ্যক, কিন্তু আধুনিক কবিরাজদিগের মধ্যে অনেকেরই এই সকলবিষয়ে এতদূর জ্ঞানাভাব যে, আমরা তাহাদের হস্তে রোগী সমর্পণ করিয়া কদাচ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। তবে যদি এমন দৃঢ় সংস্কার থাকে যে, কবিরাজের বটিকা গলাধঃকরণ না করাইলে রোগীর পারমার্থিক হানি হইবে, তাহাহইলে যখন জীবনাশা দুরাশা বলিয়া বোধ হইবেক, এরূপ সময়ে রোগীর জীবন এই সকল কবিরাজ মহাশয়ের হস্তে সমর্পিত হওয়া উচিত। আমরা অনেক স্থলে দেখিয়াছি যে, নব্যসম্প্রদায়ের কতকগুলি কবিরাজ মহাশয়েরা এলোপ্যাথি চিকিৎসকদিগের ন্যায় ৩।৪ ঘণ্টান্তর ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং কেহ কেহ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, এরূপ ব্যবস্থা না করিলে রোগী হাত ছাড়া হইয়া যাইবেক। ইহাতে স্পষ্ট এইটী প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, এইসকল প্রণালীর কবিরাজ মহাশয়দের চিকিৎসা কেবল পেটের দায়ে চিকিৎসা। এবং ইহাঁদের দ্বারা সমাজের মঙ্গল সাধনের কোন আশা নাই। আমাদের দেশীয় কতকগুলি লোকের এরূপ বিশ্বাস যে কবিরাজী চিকিৎসা আমাদের দেশোপযোগী চিকিৎসা এবং এই বিশ্বাসে তাঁহারা কবিরাজী চিকিৎসার আশ্রয় লইতে সদত যত্নবান্ হন। আমাদেরও সেইরূপ বিশ্বাস যে, পুরাতন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মতে চিকিৎসা সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং আমাদের দেশোপযোগী, কিন্তু যখন সেই চিকিৎসা আধুনিক অনভিজ্ঞ চিকিৎসকের হস্তে পতিত হইয়াছে, তখন আমরা কিরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহাদের হস্তে আমাদের প্রিয় পুত্রগণ, প্রিয়তমা পত্নী ও আত্মীয় স্বজনগণকে সমর্পণ করিতে পারি? ২।৪টী সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যানে যদি আমরা বিমুগ্ধ হই এবং দেশীয় জিনিষ বলিয়াই কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া তাহাই অবলম্বন করি, তাহা হইলে

আমাদের ন্যায় নরাধম আর কে আছে? যদি সংস্কৃত কলেজের একটী উপাধি এবং একটী প্রসিদ্ধ কবিরাজের (যাহা বর্ত্তমান কালে অতি বিরল) নাম লইয়া চিকিৎসা-ব্যবসায়ে ব্রতী হওয়া চলে, এবং সেই চিকিৎসা জনসমাজে আদরণীয় হয়, তাহা হইলে আমাদের ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে? যে দেশে এইরূপ চিকিৎসকের ছড়া ছড়ি সে দেশের উন্নতি কিরূপে হইতে পারে? এবং যে দেশের লোক এরূপ চিকিৎসার পরাকাষ্ঠা বদ্ধমূল করিতে আস্থা ও ব্যগ্রতা প্রকাশ করে, তাহারা নিশ্চয়ই কুহকজালে জড়িত এবং অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। এক্ষণে জগতের চতুর্দ্দিকে যেরূপ বিজ্ঞানের উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়, তখন কেবল পুরাতন প্রথার উপর নির্ভর করিয়া থাকা যুক্তি যুক্ত নহে। সকল শাস্ত্রের উন্নতি সকল সময়েই আবশ্যক। যে শাস্ত্রের কখনও উন্নতি নাই, বরং অধোগতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকা, নিতান্ত ভ্রান্তি মূলক বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম্মশাস্ত্র সকল ঈশ্বরবাক্য, তাহাতে উন্নতির আবশ্যকতা না হইতে পারে। কিন্তু মনুষ্যকৃত চিকিৎসা শাস্ত্রে ক্রমশঃ উন্নতি না হইলে আমাদের অভাব দূরীকরণ হইবার অন্য উপায় নাই। সুশ্রুত, চরক, বাগ্‌ভট, ধন্বন্তরি ও অন্যান্য মহাত্মারা যে প্রণালীতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সেই প্রণালী সকল সময়ে এবং সকল অবস্থায় সমাজের পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও যে সেইরূপ কার্য্যকারী হইবে, ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। ম্লেচ্ছরাজার অধীনে থাকিয়া আমাদের সামাজিক নিয়মের এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং সেই পরিবর্ত্তন নিবন্ধন এত নূতন নূতন রোগের আবির্ভাব হইয়াছে যে, সেই সকল রোগের প্রতীকারের জন্য নূতন নূতন ব্যবস্থার আবশ্যক। স্বভাবক্ষেত্রে প্রাগ্রসারিতার (Progress) প্রবাহ এমতি প্রবল যে, তাহাকে কোনমতে অবরোধ করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। অতএব প্রাচীন নিয়মানুসারে যে অর্ব্বাচীন ঘটনাদির প্রতীকার চেষ্টা গগণ-পুষ্পের ন্যায় বিফল আশা বুঝিতে হইবেক। এবং ক্রমপর্য্যায় (Law of Succession) বিধান অনুসারে যখন তাবদীয় বস্তু ক্রমিক পরিবর্ত্তন হইতেছে, তখন এক অবিকল অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম যে পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত সমুপযুক্ত হইবেক, ইহা সম্ভবপর নহে।

ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না, যে স্বভাবক্ষেত্রে সকল বিষয়েই পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং পৃথিবীর যাবদীয় পদার্থ ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। কোন বস্তুই অনন্তকাল একরূপ ও অবিকৃত অবস্থায় থাকিতে পারে না। যে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা এক সময়ে এত আদরণীয় ছিল যে ইহাকে চিকিৎসাক্ষেত্রে সূর্য্যোদয় বলিলেও অত্যুক্তি হইত না, তাহার প্রতি লোকের আস্থা ক্রমশঃ এত হ্রাস হইতেছে কেন? বিজ্ঞানের প্রভাব যত প্রবল হইয়া উঠিবে, তৎসঙ্গেই লোকের অন্ধকারাচ্ছন্ন ভ্রান্তি সমূহ একবারে অন্তর্ধান হইবে ও সকলে স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য বুঝিয়া সেইরূপ অনুষ্ঠান করিতে পারিবে। বর্ত্তমান কালে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার উন্নতি কেবল বিজ্ঞানের উন্নতিজনিত, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র দেশে এক সময়ে সজীব ও হিতকর ছিল, তাহা এক্ষণে উন্নতি-বিহীন হইয়া নির্জ্জীব ও নিদ্রাবস্থায় রহিয়াছে এবং আধুনিক কবিরাজ মহাশয়দিগের মধ্যে এরূপ সংস্কারক কেহ নাই যে তাঁহার উন্নতিসাধন করিয়া তাহাকে আবার পুনর্জ্জীবিত করিতে পারেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যেমন হিন্দুধর্ম্ম পুনর্জ্জীবিত হইতেছে—তৎসঙ্গে আয়ুর্ব্বেদের জয়পতাকা ভারতে পুনরুড্ডিন হইবে। ভারতে হিন্দুধর্ম্ম ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র পুনর্জ্জীবিত! শুনিয়া শরীর পুলকিত হইল, আনন্দরসে ইন্দ্রিয় পরিপ্লুত হইল। যদি শত সহস্র জীবন দান করিলেও সেই পুণ্যধর্ম্ম ও সেই শাস্ত্র এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত পুনর্জ্জীবিত হয় তাহাও শ্রেয়ঃ। কিন্তু হায়! এ সকল চিন্তা এখন আকাশকুসুমের মত নিষ্ফল। আয়ুর্ব্বেদের পুনর্জীবনের কথা উপকথা মাত্র। আর্য্যগৌরব চিরকালের মত বোধ হয় অস্তমিত হইয়াছে।

কলিকাতা অগ্রহায়ণ { শ্রীহরনাথ রায় এল, এম, এস্
হোমিওপ্যাথিক প্রাকটিসনার।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে যে, ইতি-পূর্ব্বে ডাক্তার হরনাথ বাবু জ্বর রোগে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার হেডিং দিয়া সর্ব্বাগ্রে এলোপ্যাথি চিকিৎসার উল্লেখ করতঃ জ্বররোগে এই চিকিৎসা যে একান্তই কুফল-প্রদ, তাহা তিনি প্রাণপণ যত্নে প্রতিপাদন করিয়া এবারে কবিরাজীর মাথায় হাত দিয়াছেন। এবং বিধিমতে দেখা-ইয়াছেন যে, কবিরাজী শাস্ত্রে সেকালে যাহাই থাকুক্, কিন্তু আধুনিক কবিরাজ সম্প্রদায় যেরূপ মূর্খ, তাহাতে এ সকল কবিরাজের হস্তে যাঁহারা চিকিৎসার ভার দিতে সাহস করেন, লেখক মহাশয়ের মতে তাঁহারা নরাধম। ফলতঃ অন্যের আভ্যন্তরিক তথ্য না জানিয়া তৎসম্বন্ধে কোনরূপ মতামত প্রকাশ করিলে তাহা যতদূর অসঙ্গত হইতে পারে, লেখক মহাশয়ের এই মীমাংসাও যে ঠিক সেই শ্রেণীর হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন কথা এই যে, মৃতপ্রায় আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের দুর্দ্দশার একশেষ হইলেও বাস্তবিক্ই কি দেশ একবারে কবিরাজ-শূন্য হই-য়াছে? যথার্থই কি কবিরাজীচিকিৎসার শরণাপন্ন ব্যক্তি-গণ নরাধম বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন? উঃ বড় ভয়া-নক কথা! জানিনা ঠিক্ কোন্ ভাষায় কিরূপ অক্ষরে কিরূপ কাগজে এ সমস্ত ভয়ানক কথার প্রতিবাদ করিলে তবে প্রকৃত উত্তর দেওয়া হয়। যাহা হউক, স্থানাভাব বশতঃ এবারে এ সম্বন্ধে আমরা কিছু লিখিতে পারিলাম না। সুতরাং আগামীতে এ সম্বন্ধে অবশ্যই আমরা যথা-সাধ্য প্রতিবাদ করিব। চি, স, স,

বৈদ্যমতে পুরাতন জ্বর।
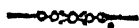
পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪৭ পৃষ্ঠার পর।

বিষমজ্বর ব্যাপারটা কি? সে কালের আয়ুর্ব্বেদমতের বিষমজ্বর ও ওলাউঠা প্রভৃতি রোগ, আধুনিক নব্যতন্ত্রের বিষাক্ত ম্যালেরিয়া ও ওলাউঠা প্রভৃতি রোগের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে কি না? ইত্যাদি সম্বন্ধে আমরা গতবারে যথামত প্রতিপন্ন করিয়াছি। কেবল সমর্থন নহে, সেই সুবহুকালের রচিত চরকসংহিতা হইতে এসম্বন্ধে কতকগুলি জীবন্ত বচন পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া দেখান গিয়াছে যে, যদি দূষিত জল বায়ু প্রভৃতিই এই উভয় রোগের প্রকৃত কারণ হয়, তবে বৈদ্যশাস্ত্রও তাহা প্রতিপন্ন করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। সে যাহা হউক, এখন দেখা যাউক যে, বর্ত্তমান ম্যালেরিয়া জ্বর অথবা বিষম অর্থাৎ সাধারণ পুরাতন জ্বরের কারণ অন্য কিছু বলিয়া আমাদের বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীর নিকট প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে কি না?

সকলেই জানেন যে, অযথা আহার-বিহার হইতেই সম্ভবতঃ সর্ব্বপ্রকার ব্যাধির বিশেষতঃ জ্বরেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। অধিক বা অল্প আহার, এক দেশ হইতে অন্য দেশে গমন, অতিরিক্ত মানসিক অথবা শারীরিক পরিশ্রম, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, অধিক স্ত্রী-সংসর্গ, রৌদ্র, বৃষ্টি, শিশির ও ঠাণ্ডা বাতাস প্রভৃতির অতি সেবা ইত্যাদি আহার-বিহার-জনিত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক অসংখ্য অসংখ্য কারণ হইতে দেহিগণের প্রতিনিয়ত নানা শ্রেণীর রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং জ্বরেরও উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কোন কারণ স্বীকার করিবে, তৎসমস্তই এই অযথা আহার-বিহার ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখন কথা এই যে, এই অযথা আহার-বিহারের অতিযোগ প্রায়ই নূতন জ্বরের উৎপত্তির পক্ষেই কারণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কেননা

নূতন জ্বরের পরিণাম—পুরাতন জ্বরের কারণসম্বন্ধে আহার বিহারাদির পক্ষে আর অত অভিযোগাদির প্রয়োজন হয় না। কেন হয় না, তাহা বলিতেছি—মনে কর সম্পূর্ণ সুস্থকায় ব্যক্তি যদি কদাচিৎ আহার বিহারাদি-জনিত সামান্য কোনরূপ অত্যাচার করে, তবে সে জন্য কি সে ব্যক্তির জ্বরাদি রোগ উৎপন্ন হইতে পারে? কখনই নহে। তবে অবশ্য অধিক অত্যাচার ঘটিলে জ্বর হওয়ার খুব সম্ভাবনা। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি সহসা নূতন জ্বরের পর পথ্য করিয়াই উক্ত আহার-বিহারাদি-জনিত কোনরূপ সামান্য অত্যাচারও করে, তাহা হইলে বোধ হয় সেই দিনেই সে আবার জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়ে। তবেই এই হইল যে, জ্বরাদি রোগ উৎপত্তির পক্ষে সুস্থ শরীরে আহার-বিহারাদির অত্যাচারের মাত্রা অধিক হওয়া চাই, আর অসুস্থ দেহে সামান্যমাত্র অত্যাচারেই দেহ পুনর্ব্বার অধিকতর অসুস্থ হইয়া থাকে। বাস্তবিকও অসুস্থ দেহ, সামান্যরূপ অত্যাচার সহ্য করিতে অসমর্থ বলিয়াই সাধারণতঃ লোকে কোনরূপ পীড়া হইতে আরোগ্য লাভের পর বিশেষতঃ নূতনজ্বরসারার পর কিছু দিন অর্থাৎ যত দিন তাহার শরীরে স্বাভাবিক শক্তি না জন্মে, ততদিন পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত আহার বিহারাদিসম্বন্ধে খুব সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকে। এবং প্রতিনিয়ত ইহাও স্বচক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধৈর্য্যের অভাব অথবা কার্য্যাদির অধিক ঝঞ্ঝাট বশতঃ যে সমস্ত লোক, নূতনজ্বরে রসের সম্যক্ পরিপাক হইতে না হইতেই কতকটা কুইনাইন সেবন করিয়া জ্বরের গতিরোধ করেন, অথবা যাঁহারা অন্য কোন ঔষধ দ্বারা তাড়াতাড়ি জ্বর তাড়াইয়া শরীরে স্বাভাবিক বলাধান না হইতেই পুনর্ব্বার স্ব স্ব কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা অচিরাৎই আবার জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নূতনজ্বরশান্তির পর রোগীর যত দিন পর্য্যন্ত যে পরিমাণে সাবধান থাকা নিতান্ত আবশ্যক, ভিন্ন দেশীয় কায়দাকরণ ঢুকিয়া বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ সাবধানতার সমূলে বিনাশ করিয়া ফেলিয়াছে। বিশেষতঃ সহরবাসী অধিকাংশ লোকের দুরবস্থা এত দূর ঘটিয়াছে যে, দাসত্ব বজায় রাখিতে গিয়া সেরূপ সাবধানতা আর তাঁহাদের পক্ষে কোন মতেই সম্ভবে না। আর কেমন করিয়াই বা ঘটিবে? পিতৃমাতৃ-দায়েও যাঁহাদের দুদিন কাটিতে

না যাইলে চাকুরী থাকা ভার হইয়া পড়ে, অন্যে শয্যাশায়ী থাকিয়া উপযুক্ত ডাক্তারের সার্টিফিকেট দাখিলসত্ত্বেও যাঁহাদের মণিবের মনমালিন্য দূর না হয়, সে সব লোক আর যে নূতন জ্বর সারার পর ২।৪ দিন স্ব স্ব গৃহে বসিয়া একটু আরাম লাভ করতঃ পুনর্ব্বার আফিসে যাইবে, সেরূপ প্রত্যাশা করাই বৃথা। পক্ষান্তরে দাসত্বোপজীবী ভিন্ন সাধারণ গৃহস্থ লোকের আর্থিক অবস্থাও দিন দিন এত দূর শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে যে, তাঁহাদের খাটুনীও দাসত্বের অপেক্ষা বড় কম নহে। ফলতঃ ভিতর ভিতর অশান্তির এতই অধিক বৃদ্ধি পাইতেছে যে, কি শ্রমোপজীবী, কি গৃহস্থ, কি ধনী অথবা কি পণ্ডিত, কাহারই আর মজা করিয়া রাজার হালে দু দিন নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকার যোটী নাই। সুতরাং সেই জন্যই এক দিকে যেমন ক্রমে ক্রমে সাধারণের মধ্য হইতে এই নিশ্চিন্ততা টুকু দূরীভূত হইতেছে, অপর দিকে তেমনই আবার তদধিক পরিমাণে অসুস্থতা-অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া সুস্থতাকে একবারে ছারে খারে দিতেছে। অন্য অধিক কথায় প্রয়োজন নাই, ইতিপূর্ব্ব বর্ণিত সেই কথা লইয়াই আবার বলিতেছি যে, নূতন জ্বরশান্তির পর শরীর কতকটা স্বাভাবিক না হইলে সে শরীরে আর যে কোন মতেই কিছুমাত্র অত্যাচার সহ্য হয় না ইহা বড় পাকা কথা। আর যদিও বল পূর্ব্বক সহ্য করাইতে চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে আবার প্রায়ই পুনর্মূষিক না হইয়া যায় না। বস্তুতঃ নবজ্বরশান্তির পর সামান্য অত্যাচারও সহ্য হয় না। আবার বল পূর্ব্বক সহ্য করাইতে গেলেও বিষম বিভ্রাট ঘটে, তাই সে কালের সেই বুড়ো বাহাত্তুরে বিজ্ঞান-বিহীন ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন নেটিব গুলা অনেক দেখিয়া শুনিয়া বড় বিবেচনার সহিত মাথার দিব্যি দিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে,—

ব্যায়ামঞ্চ ব্যবায়াঞ্চ স্নানং চংক্রমণানিচ।
জ্বরমুক্তো ন সেবেত যাবন্নো বলবান্ ভবেৎ॥

অর্থাৎ জ্বরমুক্ত ব্যক্তি যত দিন স্বাভাবিক বললাভ না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত শারীরিক বা মানসিক কোন

রূপ পরিশ্রম, স্ত্রীসংসর্গ, স্নান ও পথপর্য্যটন প্রভৃতির সেবা করিবে না।

যদি করে?

তবেই—দোষোঽল্পোঽহিতসংভূত জ্বরোৎসৃষ্টস্য বা পুনঃ।
ধাতুমন্যতমং প্রাপ্য করোতি বিষমজ্বরং॥

অর্থাৎ—যাহার শরীরে অত্যল্প মাত্র প্রকুপিত দোষ (বাতাদি) বা জ্বরাংশ বর্ত্তমান আছে, অথবা যে ব্যক্তির নূতন জ্বরের শান্তি অতি অল্পদিন মাত্র হইয়াছে, এইরূপ ব্যক্তির সেই অবস্থায় আহার-বিহারাদির বিশেষ কোন অত্যাচার ঘটিলে তাহার শরীরস্থ বাতাদি দোষ কুপিত এবং রক্তাদি ধাতুকে আশ্রয় করিয়া যে সন্ততাদি জ্বর জন্মায়, তাহারই নাম বিষমজ্বর বা পুরাতন জ্বর।

কিন্তু হায়, সে রামও নাই! সে অযোধ্যাও আর নাই! সে হিন্দু রাজাও আর নাই! সুতরাং সে হিন্দুয়ানী ধরণের সারগর্ভ উপদেশ বাক্যও আর শুনিতে পাওয়া যায় না। আবার যদিও হিন্দু ধর্ম্মের মায়ায় আবদ্ধ হইয়া কোন হিন্দু-ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি দুই একটী কথা শুনাইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে স্বধর্ম্ম-দ্রোহী, স্বজাতি-প্রতিকূল, পরপদ-লেলেহী বর্ত্তমান অনার্য্য সম্প্রদায়ের নিকট তাহা একবারে উপহাসাস্পদ হইয়া পড়ে!

অতএব দেখা গেল যে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মতে নবজ্বর শান্তির অব্যবহিত পরেই অর্থাৎ যতদিন শরীরে স্বাভাবিক বল না জন্মে, তত দিন পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত পরিশ্রমাদি করিবে না। আর যদি করা যায়, তবে আবার জ্বরাক্রান্ত হইতে হয়। এখন পাঠকগণ বেশ প্রণিধান পূর্ব্বক বুঝুন যে, আধুনিক কুইনাইন প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা রসের অপরিপক্কাবস্থায় তাড়াতাড়ি জ্বর বন্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বেচ্ছামত আহার বিহারাদি চালাইলে আবার জ্বরাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কি না? ধর্ম্মতঃ বলুন দেখি কয়জন লোক নবজ্বরাক্রান্ত হইয়া একটু ধৈর্য্যের সহিত ২।৩ দিন উপবাস দ্বারা রসের পরিপাক করিতে

ইচ্ছা করেন? অথবা কষ্টে সৃষ্টে কোন মতে যো সো করিয়া জ্বর হইতে মুক্তিলাভ করিয়াও অন্ততঃ ২।৪ দিন একটু সেবা সুশ্রূষায় থাকিতে প্রস্তুত হন্? বলা বাহুল্য যে, ধৈর্য্য দূরে থাকুক, সেবাসুশ্রূষা পড়ে মরুক, তিন দিনের দিনও যদি জ্বরের বেগ কিছু না কমিল, তবেই আর রক্ষা নাই, অমনই রেমিটেণ্টফীবার জ্ঞানে ডাক্তারের উপর ডাক্তার আসিতে আরম্ভ হইল, মহাহুলস্থূল পড়িয়া গেল। আর ভাগ্যক্রমে যদি একটু জ্বর বিচ্ছেদ হইল, তবেই আর যাবি কোথা? অমনি প্রথমে আকণ্ঠ কুইনাইন এবং একটু পরেই চর্ব্ব্য, চোষ্যাদি প্রচুর আহার দ্বারা রসনার চূড়ান্ত তৃপ্তি সাধন দ্বারা প্রিয়সুহৃৎ দ্বয় প্লীহা ও যকৃতকে মহাসমাদরে আহ্বান করিতে থাকিলেন!! উঃ দুঃখের কথা আর কত বলিব। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র! তুমি নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক, তুমি যথার্থই অপরিণামদর্শী। তোমার লেশমাত্র জ্ঞানও নাই! কেননা তাহা হইলে তুমি কি মূর্খের মত নূতন জ্বরে কি এক রসের পরিপাক্ জন্য এই হৃদয়-বিদারক উপবাস শব্দের উপদেশ দিতে পারিতে। তাও যাহা হউক, আবার কি না জ্বর সারার পরেও সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য এত দূর ব্যগ্র হইতে পারিতে! সুতরাং তোমাপেক্ষা মূর্খ ও অপরিণামদর্শী এজগতে আর কি আছে? আবার আমরাও তোমার উপাসক হইয়া তোমারই কলঙ্ক দ্বারা পদে পদে কলঙ্কিত হইতে বসিয়াছি!

ক্রমশঃ—

প্রকৃত সূতিকা জ্বর বা পচা জ্বর।

হোমিওপ্যাথি মতে।

ইহাকে ইংরাজিতে পিয়র পাংরল সেপটিসিমিসিয়া কহে। ইহা অপেক্ষা সাংঘাতিক পীড়া সূতিকাবস্থায় আর দৃষ্ট হয় না। ইহার কারণ ও বর্দ্ধন সম্বন্ধে অনেক মত ভেদ আছে, যে মত আজ কাল চলিত ও সকলে যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহাই নিম্নে দেওয়া হইল।

সন্তান প্রসবান্তে প্লাসেণ্টা বা ফুল প্রসব হয়; কোন কারণবশতঃ ঐ

ফুল ছিন্ন হওয়ার কতক অংশ জরায়ুর গাত্রে সংলগ্ন হইয়া থাকে, ক্রমে উহা অপকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া পচিতে আরম্ভ হয় এবং রক্তশিরার দ্বারা উহার গলিত দুর্গন্ধযুক্ত রস আচুষিত হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় এবং শরীরের দূষিত হইয়া জ্বর উৎপাদন ও সূতিকাজ্বরের অন্যান্য লক্ষণাদি প্রকাশ করে। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা একটী সংক্রামক পীড়া; বস্তুতঃ সে বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে, কিন্তু ইহা যে স্পর্শাক্রামক তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গলিত দৈহিক পদার্থই ইহার বিষ; এই বিষ অন্যান্য স্পর্শাক্রামক ব্যাধির বিষের ন্যায় পীড়িত ব্যক্তির সংস্রবে যে অন্য ব্যক্তির শরীরে সহজে প্রবেশ করিতে পারে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৭৬৮, ১৭৭০ ও ৭০৮০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের সূতিকা-হাঁস-পাতালে ইহার এত প্রাদুর্ভাব হয় যে প্রায় সমস্ত স্ত্রীলোকেরই প্রসবান্তে এই রোগজনিত অকালমৃত্যু ঘটে। এডিনবরার স্ত্রীলোকের প্রসবের দাতব্য চিকিৎসালয়ে অসংখ্য স্ত্রীলোক, প্রসবের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঐ পীড়াক্রান্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হয়। পারিস ও অন্যান্য স্থানের চিকিৎসালয়ে শতকরা অন্যান্য পঁচিশ জনের এই রোগে মৃত্যু হইতে দেখা গিয়াছে। কি প্রকারে ঐ বিষ এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করে তাহা নির্ণয় করা সুকুঠিন, কেহ কেহ বলেন যে প্রসবান্তে জরায়ুর যে অংশে ফুল সংলগ্ন থাকে, সেই স্থানের রক্তশিরা সকল অনাবৃত ও নিয়মিতরূপে সঙ্কুচিত না হওয়ায় সহজে ঐ বিষ আচুষিত হয়; কিন্তু কি প্রকারে উহা জরায়ুমধ্যে নীত হয়, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অনেকেই বিশ্বাস করেন, যে জরায়ুর মুখে বা জননেন্দ্রিয়ের কোন কোন স্থানে প্রায়ই প্রসবজনিত ক্ষত হয় এবং ঐ ক্ষত দ্বারা বিষ শরীরে প্রবেশ করে। সম্ভবতঃ সূতিকাজ্বরে পীড়িত স্ত্রীলোকদিগের সংস্রবে চিকিৎসক বা ধাত্রী দ্বারা ঐ বিষ আনীত হইয়া অন্য নারীর শরীরে প্রবেশ করে।

সচরাচর এই পীড়া দুই প্রকারে জন্মিয়া থাকে।

১। আপনা হইতে।

২। পীড়িতের সংস্রবে।

আপনা হইতে উৎপন্ন,—প্রসবকালে জননেন্দ্রিয় নিরন্তর চাপ লাগায় উহার কোন অংশের অপকর্ষ; অথবা প্রসবান্তে রক্তখণ্ড কিম্বা ঝিল্লির বা ফুলের অংশ জরায়ুর মধ্যে অবশিষ্ট থাকিলে বহির্স্রোতাসের সহিত উহার সংযোগে হওয়ায় ঘটিতে পারে; কিংবা প্রসবান্তে সম্যক্ রূপ রক্তস্রাব না হওয়ায় জরায়ু মধ্যে স্খলিত রক্ত দূষিত হয় এবং উহা অনাবৃত রক্তশিরা দ্বারা আচুষিত হইলে বিষাক্ত হইতে পারে।

পীড়িত ব্যক্তির সংস্রবে উদ্ভূত—কোন প্রকার চেতন পদার্থ বা তাহার কোন অংশ পাচলে উহাতে স্পর্শাক্রামক দোষ ঘটে। বিসর্পের যে কোন অবস্থায় উহা সংক্রামক। যে সকল সংক্রামক পীড়ার উদ্দীপক কারণ এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট বিষ, তাহারা প্রায় প্রত্যেকে সদ্য প্রসূতিকে আক্রমণ করিতে পারে, সূতিকা জ্বরগ্রস্ত প্রসূতি হইতে অন্য প্রসূতি সংস্পর্শ দোষে সচরাচর আক্রান্ত হয়।

সম্ভবতঃ নিম্নলিখিত প্রকারে ঐ বিষ বহুব্যাপক রূপে প্রকাশ পায়। ১। চিকিৎসকের দ্বারা। ২। ধাত্রী দ্বারা। ৩। সূতিকা জ্বরগ্রস্ত স্ত্রীলোকের বস্ত্রাদি দ্বারা। ৪। ঐ বিষের পরমাণু মিশ্রিত বায়ু দ্বারা। ইহাদিগের দ্বারা এই বিষ চালিত হইয়া অন্য শরীরে প্রবেশ করে। চিকিৎসক, ধাত্রী বা অন্য যে কোন লোক, যাঁহারা সূতিকা জ্বরগ্রস্ত ব্যক্তির শুশ্রূষা করেন, তাঁহাদিগের প্রতিবার হস্তপদাদি কার্বলিকএসিডের জল দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত ও পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন না করিয়া অন্য কোন প্রসূতিকে স্পর্শ করা বা তাহার গৃহে যাওয়া উচিত নহে। এ বিষের প্রকৃত আকার ও অবস্থা অদ্যাবধি সুন্দররূপে নির্ণয় হয় নাই, কিন্তু অনেকের বিশ্বাস যে ইহা ব্যাক্‌টেরিয়া নামক একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র কীটবিশেষ। শরীর বিষাক্ত হইলে কতকগুলি লক্ষণ সচরাচর দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রখর বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে মৃত্যু অন্তে শরীরস্থ কোন যন্ত্রের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন না হয়। কারণ ঐ সকল যন্ত্র আক্রান্ত হওয়ার অগ্রেই রোগীর মৃত্যু হয়। জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত থাকিলে উহা বিষাক্ত হইয়া উঠে; ক্ষত স্থানের ধার সকল অধিক স্ফীত এবং উহার মধ্য স্থান হরিদ্রা বর্ণের পদার্থ দ্বারা আবৃত জরায়ুর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আক্রান্ত হইয়া উহার প্রদাহ, কৃত্রিম ঝিল্লি নির্ম্মাণ ও ক্ষত

স্থানে বিসর্পের লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। বিষ অল্প পরিমাণে শরীরে প্রবেশ করিলে রক্তের পরিবর্ত্তন ও কোন কোন যন্ত্রের যথা—ফুসফুস, প্লীহা, মূত্রগ্রন্থি স্থানে রক্তসঞ্চার ও অল্প প্রদাহ (মৃত দেহ পরীক্ষা দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে) এবং রক্তাম্বু ঝিল্লি মধ্যে রক্তাম্বু ক্ষরণ, অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির মধ্যে অতিরিক্ত রক্তসঞ্চার, স্থানে স্থানে ক্ষত, পেশির মধ্যে রক্তক্ষরণ, ফুসফুস-প্রদাহ, রক্তশিরায় জমারক্তের খণ্ড ইত্যাদি চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

লক্ষণ—এই পীড়ায় আচুষিত বিষের পরিমাণ ও প্রখরতা অনুসারে উপসর্গের তারতম্য হয়। সচরাচর প্রসবের ২।৩ দিবস পরে পীড়ার লক্ষণ প্রথম প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হয়। অর্থাৎ প্রসবান্তে যে পর্য্যন্ত জরায়ু প্রকৃতিস্থ না হয়, সে পর্য্যন্ত উহা যেকোন স্পর্শাক্রামক বিষের দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু একবার জরায়ু সম্পূর্ণ সংকুচিত বা উহার স্বাভাবিক ক্ষত আরোগ্য হইতে আরম্ভ হইলে, আক্রমণ অসম্ভব। এই কারণে প্রসবের ৪।৫ দিবস পরে উহার আক্রমণ প্রায় দৃষ্ট হয় না। অনেক সময় পীড়া মৃদুভাবে প্রকাশ পায়; সচরাচর শীতবোধ ও কম্প হইয়া নাড়ী সর্ব্বাগ্রে পীড়ার আক্রমণ ঘোষণা করে, উহা রোগের প্রখরতা অনুসারে মিনিটে ১০০ হইতে ১৪০ বার স্পন্দিত হয়। শরীরের তাপ ১০২° ডিগ্রি হইতে ১০৪° বা ১০৬° পর্য্যন্ত উঠিতে পারে, কিন্তু ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, সন্তাপ ও নাড়ীর এই প্রকার ব্যতিক্রম হইলেই সুতিকাজ্বর হইবে এমত নহে। কারণ প্রসবান্তে কোন কোন সময়ে সামান্য কারণে নাড়ী ও সন্তাপের পরিবর্ত্তন হইতে পারে। বিষ প্রখর হইলে পীড়ার গতি অতিশয় দ্রুত হয়; যথাঃ—নাড়ী দ্রুত, ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল মিনিটে ১২০ হইতে ১৪০ বার স্পন্দিত হয়, তাপ ১০৩° হইতে ১০৪° ডিগ্রী, গাত্রে বেদনা কখন থাকে কখন থাকে না, চাপিলে তলপেটে সামান্য বেদনা অনুভব হয়, ক্রমে অন্ত্রে বায়ুসঞ্চার হেতু উদর স্ফীত, মুখশ্রীর হঠাৎ পরিবর্ত্তন, অতিশয় উদ্বেগ, মৃদু প্রলাপ (রাত্রে), ক্ষণে ক্ষণে সম্পূর্ণ জ্ঞান, উদরাময় ও বমন, অদম্য প্রচুর দাস্ত, জিহ্বা আর্দ্র ও অপরিষ্কার, উহা কখন কখন শুষ্ক ও কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয়, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব প্রায়ই বন্ধ থাকে, এবং রক্ত নিস্রাব হইলে উহা

জলবৎ ও অতিশয় দুর্গন্ধ, শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত ও কষ্টদায়ক, প্রশ্বাসিত বায়ু মিষ্টগন্ধ, স্তনে দুগ্ধ প্রায়ই থাকে না; পীড়া বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইলে সচরাচর এক সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যু হয়। মৃত্যুর অগ্রে নাড়ী অতিশয় দ্রুত বিষম ও সূত্রাকার হইয়া উঠে, প্রলাপ, উদরাধ্মান, অতিশয় দুর্ব্বলতা, এবং কখন কখন সন্তাপের হঠাৎ হ্রাস হয়। স্থানিক লক্ষণের মধ্যে অন্ত্রাবরণ ঝিল্লির প্রদাহই সর্ব্বপ্রধান; এস্থলে উদরে প্রচণ্ড বেদনা, ইহা নিম্ন উদর হইতে আরম্ভ হইয়া উর্দ্ধে ব্যাপ্ত হয়, জরায়ুর স্থান উচ্চ ও উহাতে বেদনা, উদরে বেদনা ও স্পর্শানুভব শক্তির আতিশয্য অনুসারে রোগীর যন্ত্রণার বৃদ্ধি। অন্তে বায়ুসঞ্চার-জনিত উদরস্ফীতি, রোগী চিৎ হইয়া স্থিরভাবে থাকে, জানুদ্বয় গুটাইয়া রাখে, উদরোপরি বস্ত্রের ভার বহনে অক্ষমতা, পুনঃ পুনঃ বমন ও তরল দুর্গন্ধযুক্ত দাস্ত, শরীরের তাপ ১০২° হইতে ১০৪° বা ১০৬° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। অন্যান্য যন্ত্র আক্রান্ত হইলে নানাপ্রকার স্থানিক উপসর্গ প্রকাশ হয়। যথা—ফুসফুস প্রদাহে কাশি, শ্বাস-কৃচ্ছ্র, সগর্ভ প্রতিঘাত শব্দ; ফুসফুসাবরক ঝিল্লির প্রদাহে প্রতিঘাত সগর্ভ; মূত্রগ্রন্থির পীড়ায় প্রস্রাবে এলবিউমেন থাকা; যকৃৎ আক্রান্ত হইলে কামল ইত্যাদি।

ক্রমশঃ—

পৌষ কলিকাতা	ডাক্তার শ্রীশিখরকুমার বসু, এল্, এম্ এস্, হোমিওপ্যাথিক প্রাক্‌টিসনার।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সুবিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শিখর বাবু সম্মিলনীতে লিখিতে আরম্ভ করায় আমরা পরম আহ্লাদিত হইলাম। কেননা ঈশ্বরের কৃপায় সম্মিলনীর লেখক সংখ্যা অনেক হইলেও ইহাতে হোমিওপ্যাথিক লেখকের সংখ্যা যে খুব কম, তাহা সত্য; বলাবাহুল্য যে এজন্য গ্রাহক-

সর্ব্বস্ব হোমিওপ্যাথির নিতান্ত ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ আমাদিগকে অনুযোগ করিতেও ক্রটী করেন না। যাহাহউক, এখন আশা করি, যে ডাক্তার শিখর বাবুর ন্যায় উপযুক্ত লোককে সম্মিলনীর নিয়মিত লেখক দেখিয়া তাঁহাদের সে দুঃখ আর থাকিবেনা। চি, স, স,

হোমিওপ্যাথি মতে শোথ রোগ।

ইতিপূর্ব্বে অণ্ডকোষ-জাত শোথের বিষয়ই লেখা হইয়াছে, তজ্জন্য অগ্রে তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী পরীক্ষিত ঔষধের গুণ ও ধর্ম্ম এই যে—

সাইলিসিয়া ও সালফার ৩০।—যেখানে অমাবশ্যা ও পুর্ণিমা তিথির কলাবৃদ্ধির সঙ্গে জ্বর ও অণ্ডকোষ টাটান, ব্যথা ও আকারে বড় হয়, সেই সেই স্থলে সপ্তমী বা অষ্টমী তিথি হইতে প্রাতে ও সন্ধ্যায় উপরোক্ত দুটী ঔষধ দুই বার প্রতিপদ তিথি পর্য্যন্ত সেবন করিতে দিয়া অনেক সময় উক্ত ব্যাধির নানাপ্রকার উপদ্রব হইতে নিষ্কৃত হইয়া থাকে।

রসটক্স ৩০।—অণ্ডকোষের বামদিকে জলসঞ্চয় ও ফুলা টাটানী প্রভৃতি উপদ্রবে বিশেষ উপকারী।

কোনায়াম ও রসটক্স।—রোগ অধিক দিনের পুরাতন হইয়া গেলে উক্ত ২টী ঔষধ ব্যবস্থামত কিছুদিন ব্যবহারে উপশম হইয়া অনেক স্থলে সম্পূর্ণ আরোগ্যও হইয়া থাকে।

আর্ণিকা ৬।—কোন চোট বা আঘাত প্রাপ্তে অণ্ডকোষ ফুলিয়া ব্যথাদি হইলে বিশেষ উপকারী। তদ্ভিন্ন আর্ণিকালোসন দ্বারা কোষ প্রতিদিন ভিজাইয়া রাখিতে হয়।

এপেসিহেনাম ১।—বিবিধ প্রকার শোথে ইহার ব্যবহার বিশেষ ফলদায়ক, মুত্রনিঃসরণক্রিয়াবর্দ্ধন হওয়ার গুণ দর্শাইয়া থাকে, এই ঔষধটী প্রায় সকল প্রকার শোথ রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সিরসিস্ বা টিউবার্কের সংযুক্ত বা অন্য কোন যান্ত্রিক—যান্ত্রিক পীড়া সংযুক্ত শোথে এই ঔষধ ব্যবহারে প্রচুর ফল পাওয়াযায়।

মার্কুরিয়াস প্রোটো আওডাইড।—রোগ খুব দুরারোগ্য হইলে, প্রতিরাত্রে ১ মাত্রা। এই ঔষধ ও প্রাতে ১ মাত্রা। ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব ৩০ ব্যবস্থা করা হয়।

রডোডেনড্রন।—পেশী ও সৈত্রিক এবং শ্লেষ্মা ঝিল্লির উপর এই ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। বাত ও বাতসংযুক্ত প্রায় সকল অসুস্থাদির মহৌষধ। মলদ্বার হইতে অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত টানিয়া ধরার ন্যায় বেদনা, অণ্ডকোষ স্ফীত ও শক্ত গুটলী গুটলী, বিশেষতঃ পেট পর্য্যন্ত বামদিকে টানিয়া-ধরা। ও যে সকল অণ্ডকোষে সদা সর্ব্বদা চুলকায় এবং সময় সময় অতিরিক্ত রস আপনা হইতে বহির্গত হয়। অনেক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক বলেন যে এই ঔষধটী রসটক্সের সহিত ব্যবস্থায় জলদোষের পীড়া মাত্রেই উপকার হয়।

অরম মেট্।—অস্থি ও গ্রন্থি সমুহের পীড়ায় ব্যবহার হয়। উপদংশ, পারদ, ও অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ বা অনৈসর্গিক রেতঃ পতনের পর, অণ্ডকোষ বৃদ্ধি হইয়া যন্ত্রণাদি হইলে বিশেষ ফলপ্রদায়ী।

গ্রাফাইটীস।—চর্ম্ম, নাসিকা, গ্রন্থি, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ও জননেন্দ্রিয়ের উপর এইঔষধের বিশেষ ক্ষমতা আছে। বিশেষ পরীক্ষায় দেখাযায় যে খুব থস্থসে মোটা শ্লেষ্মা প্রকৃতির লোকের পক্ষে এই ঔষধটী তাঁহাদের উক্ত অণ্ডকোষ শোথের বিশেষ নির্দ্দিষ্ট, তবে ঐ অণ্ডকোষ শোথের সঙ্গে অণ্ডে নানা প্রকার চুলকানি ও দাদ প্রভৃতি চর্ম্মরোগ থাকিলে এই ঔষধটী আরও বিশেষরূপ প্রয়োজনীয়।

পলসেটীলা।—শরীরস্থ সমস্ত শ্লেষ্মা নিঃসারক ঝিল্লি, স্বেদনিঃসারক ঝিল্লি. শিরা, প্রশিরা ও জননেন্দ্রিয় প্রভৃতি অনেক (এস্থানে অনাবশ্যকীয়)

যন্ত্রাদির উপর এই ঔষধের ক্ষমতা আছে। অতিরিক্ত স্বপ্নদোষ ও হস্তমৈথুনের পর, বা মেহ পীড়ার পর বা সময় সময়, অণ্ডকোষ শোথ হইয়া দক্ষিণ বা বাম কোষের ভয়ানক যন্ত্রনা উপস্থিত হইলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার হয়।

লাইকো পোডিয়াম্।—বৃদ্ধ বয়সে যখন অণ্ডকোষ ফোলা রোগ উৎপন্ন হয়, ও বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ঐ শোথের যন্ত্রনার উদ্রেক হয়, আর লিঙ্গ ক্ষুদ্র, শীতল ও নরম হইয়া যায়। তখন এই ঔষধের ব্যবহারে উপকার হইয়া থাকে; তদ্ভিন্ন এই ঔষধ উক্ত বৃদ্ধ বয়সের অনেক প্রকার পুরাতন পীড়ার বিশেষ উপযোগী।

ক্লেমেটিস।—(Clematis) চর্ম্ম, লসিকা গ্রন্থি এবং মূত্র ও জননেন্দ্রিয়ের উপর ইহার কার্য্যকারিতা আছে।
মূত্রনালির পুরাতন কোন প্রকার পীড়া যথা প্রমেহ, ক্যাণসার মধুমেহ, প্রভৃতি পর এই অণ্ডকোষ শোথ হইয়াছে বুঝিতে পারিলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

ব্যারাইটা।—গণ্ডমালা, বাতযুক্ত বালকের বামদিকে গুঠলি গুঠলি ভাবের শক্ত ও ঐ কোষের ফুলার বিশেষ হিতকারী। তদ্ভিন্ন বৃদ্ধদিগেরও উপর ব্যবহার হয়, যখন তাহাদিগের পায়ের পাতা ক্রমশঃ ঘামিয়া ঘামিয়া এক প্রকার পচা গন্ধ বহির্গত হয়, তাহার পরই বা কিছু পূর্ব্বে উক্ত অণ্ডকোষ শোথ উৎপন্ন হইলে, তখন এই ঔষধ ব্যবহার করিতে দিলে প্রায়ই সুফল ঘটিয়া থাকে।

থুজা।—মুদা ও বৃহন্মুদা বা গর্ম্মির ব্যমহের কিছু দিন পরে অণ্ডকোষ শোথের আরম্ভ হইয়া জ্বালা যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে এই ঔষধের দ্বারা প্রধানতম রূপে কার্য্যকারিতা প্রকাশ হইয়া থাকে;

জিঙ্কোমরমেট।—যে সকল ব্যক্তির প্রথমতঃ অণ্ডকোষ সামান্য ফুলিয়া ক্রমশঃ (হারনিয়ার) অন্ত্রবৃদ্ধির ন্যায় উপস্থিত করে অর্থাৎ অণ্ডকোষ শোথ

সত্ত্বেও বা হার্নিয়া অন্ত্রবৃদ্ধি থাকা সত্ত্বেও কোষবৃদ্ধি রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধটী বিশেষ প্রয়োজনীয়।

(অন্যবিধ ক্রমশঃ)

ডাক্তার শ্রীগগণচন্দ্র নন্দী
হরিসভা দাতব্য চিকিৎসালয়। } চন্দননগর

বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে স্যালিসিলিক এসিড্।

উদ্ধৃত।

রোগীর বয়ঃক্রমে ৩০। ৩১ বৎসর, পুরুষ। গত ৮ই ভাদ্র তারিখে প্রথম সামান্য জ্বর হয়; সামান্য জ্বর বোধে সে দিবসে রোগী আহারাদি করে। তৃতীয় দিবসে অন্ত্র পরিষ্কার করিবার অভিপ্রায়ে জোলাপ দেওয়া হয়। তথাপি সে জ্বর ৫ দিবস পর্য্যন্ত একজ্বরী অবস্থায় থাকিয়া পঞ্চম দিবস রাত্রে অল্প বিরামপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু এককালে নাড়ী হইতে জ্বরবিচ্ছেদ হয় নাই। সেই বিরাম সময়ে ষষ্ঠ দিবসের প্রাতে ৫ গ্রেণ মাত্রায় ৩ বার কুইনাইন দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ দিবস বৈকালে পুনরায় জ্বর হইয়া ১০৪ ডিগ্রী পরিমাণ উত্তাপ হয়। সপ্তম দিবসের প্রাতে ১০২ ডিগ্রী উত্তাপ থাকে। পুনরায় ৫ গ্রেণ মাত্রায় ২ বার কুইনাইন দেওয়া হয়। কিন্তু বেলা ১ টার সময় পুনরায় পূর্ব্বোল্লিখিত পরিমাণে জ্বর হয় ও সেই সঙ্গে কাসির আবেগ হইতে থাকে। ৫ বৎসর পূর্ব্বে রোগীর একবার উভয়-ফুসফুসপ্রদাহযুক্ত বাতশ্লেষ্মা জ্বর হয়; ও সে জ্বর

আরোগ্য হওয়ার পর হইতেও বরাবর অল্প অল্প কাসি ছিল এবং সময়ে সময়ে সর্দ্দি লাগিয়া ঐ কাসি প্রবল হইত। ৮ম দিবস হইতে নিম্নলিখিত ঔষধ দুই ঘণ্টা অন্তর ব্যবহৃত হইতে লাগিল।

R কার্ব্বনেট্ অব্ এমোনিয়া	১ ড্রাম্
সিরপ্ অব টলু	১ আং
ভাইনম্ ইপিকাক্	১ ড্রাম্
টীং ডিজিট্যালিস্	২ ড্রাম্
টীং সিঙ্কোনা কম্প্ঃ	৬ ড্রাম্
স্পিঃ ইথর্ নাইট্রিক্	৪ ড্রাম্
ডিকক্ঃ সিঙ্কোনি	ad ৮ আং

মিশ্রিত করিয়া ১২ দাগ।

৮ম দিবসের প্রাতেও পূর্ব্বের ন্যায় ১০ গ্রেণ কুইনাইন দেওয়া হইল। দুগ্ধ ও সাগু পথ্য দেওয়া হইতে লাগিল।

৯ম দিবসের প্রাতে জ্বর ১০১॥০ ডিগ্রী দেখা গেল ও কুইনাইন পুনরায় ৩ বারে ১৫ গ্রেণ দেওয়া হইল এবং উল্লিখিত মিক্শ্চার পূর্ব্ব নিয়মে সেবন করিতে দেওয়া হইল। ঐ দিবসের বেলা ১১॥০ টার সময়ে পুনরায় জ্বর হইল। বৈকালে ৪ টা, ৬ টা, ৮ টা, ১০ টা ও ১২টার সময় তাপমান যন্ত্র দ্বারা জ্বরপরীক্ষায় উত্তাপ ১০৩ ডিগ্রী দেখা গেল। রাত্রি ২ টার সময় পুনরায় তাপমান যন্ত্র প্রয়োগে ১০২ ডিগ্রী ও প্রাতে ৬ টার সময় ১০০॥০ ডিগ্রী উত্তাপ দেখা গেল। এই সময়ে কুইনাইন ২ বারে ১০ গ্রেণ দেওয়া হইল; ও প্রত্যহ উল্লিখিত মিক্শ্চারের সহিত ১ নং ব্রাণ্ডী প্রতি বারে ২ ড্রাম পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইতে লাগিল। পথ্য পূর্ব্ববৎ।

১০ম দিবসেও বেলা ১১॥০ টার সময় জ্বর হইয়া রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত ১০৩ ডিগ্রী উত্তাপ রহিল। এই দিবসে দিবাভাগে ২ বার ও রাত্রে ২ বার অনতিকঠিন মল ত্যাগ হইল। ৪ বার দাস্ত হওয়ায় দাস্ত পুনরায় আর

না হয় এই চেষ্টা করিবার উদ্যোগে রোগী নিষেধ করিয়া কহিল, দাস্ত হওয়ায় তাহার শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইতেছে। গাত্রদাহ প্রবল।

১১শ দিবসের প্রাতে জ্বর ১০২ ডিগ্রী দেখিয়া সে দিবসে আর কুইনাইন দেওয়া হইল না। বেলা ১ টার সময় জ্বর হইল। ৩টার সময় ১০৩॥০ ও ৫টা, ৭টা, ৯টা, ১১টা ও ১টা পর্য্যন্ত ১০৪॥০ ডিগ্রী উত্তাপ থাকিয়া, রাত্রি ২ টার সময় ১০৪ ও পরদিবস প্রাতে ৬টার সময় ১০৩ ডিগ্রী দেখা গেল। রাত্রে ২-বার সহজ মল ত্যাগ হয়। দিবারাত্রি সমান অসহ্যকর গাত্রদাহ। এক মুহূর্ত্ত বাতাস না দিলে রোগী অস্থির হয়।

১২শ দিবসের প্রাতে ১০৩ ডিগ্রী উত্তাপ দেখিয়া, কেন জ্বরের লাঘব হইতেছে না ও কেনই বা কুইনাইন প্রয়োগে কোন ফল হইতেছে না এই বিবেচনায় বেলা ৮টার সময় ১০৩ ডিগ্রী উত্তাপ দেখিয়া, প্রথমে ৫গ্রেণ ৯ টার সময় ৫ গ্রেণ ও ১০ টার সময় ৩ গ্রেণ মাত্রায় স্যালাসিলিক্ এসিড্ সেবন করিতে দেওয়া হইল। প্রথম মাত্রা সেবনের ১৫ মিনিট পরে অল্প অল্প ঘর্ম্ম-নিঃসরণ আরম্ভ হইল। এই সময় হইতে গাত্রদাহের উপশম হয়। দ্বিতীয় মাত্রা সেবনের পর শারীরিক উত্তাপ ১০২ ডিগ্রী হইল ও সর্ব্বাঙ্গেই ঘর্ম্ম হইতেছে দেখা গেল, এবং ৯॥০ টার সময় এক মাত্রায় ৫ গ্রেণ কুইনাইন দেওয়া হইল। পুনরায় ১০॥০ টায় ৫ গ্রেণ কুইনাইন ব্যবস্থা করা হইল। প্রতি বার কুইনাইনের সহিত ২ ড্রাম মাত্রায় ১ নং ব্রাণ্ডী দেওয়া হইয়াছিল। বেলা ১২টার সময় পুনরায় জ্বর হইল। শ্লেষ্মা প্রচুর উঠিতেছে। বৈকালে ৪ টা ও ৬ টার সময় ১০৩॥০ ডিগ্রী উত্তাপ দেখা গেল। রাত্রি ১ টার সময় ১০২ ডিগ্রী ও পরদিবস প্রাতে ১০১॥০ ডিগ্রী দেখা গেল। এই রাত্রে ইহার সহজ মলত্যাগ হয়।

১৩শ দিবস প্রাতে ঐ ১০১॥০ ডিগ্রি উত্তাপ দেখিয়া বেলা ৬টায় এক মাত্রায় ৫ গ্রেণ্ স্যালাসিলিক্ এসিড্ দেওয়া যায় প্রায় ১৫ মিনেটের মধ্যে প্রচুর ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইতে আরম্ভ হইল। ৭ টার সময় ৫ গ্রেণ কুইনাইন্ দেওয়া হইল। তখন উত্তাপ ১০১ ডিগ্রি। ৭॥০টার সময়

পুনরায় ৫ গ্রেণ্ স্যালাসিলিক্ এসিড্ দেওয়া হইল। ৮টার সময় উত্তাপ ১০০ ডিগ্রি হইল; তখন পুনরায় ৫ গ্রেণ্ কুইনাইন্ দেওয়া হইল। ৮৷৷০ সময় পুনরায় ৫ গ্রেণ স্যালিসিলিক য়্যাসিড্ দেওয়া হইল ৯টার সময় উত্তাপ ৯৯ ডিগ্রি হওয়ায়, ঐ সময়ে পুনরায় ৫ গ্রেণ্ কুই নাইন্ দেওয়া হইল। প্রতিবার কুইনাইন ও স্যালাসিলিক্ এসিডের সহিত ২ ড্রাম মাত্রায় ১ নং ব্রাণ্ডী দেওয়া হইয়াছিল। বেলা ১১ টা ও ১টার সময় পুনরায় ৩ গ্রেণ মাত্রায় কুইনাইন ও পূর্ব্বোল্লিখিত কার্ব্বনেট্ অব্ এমোনিয়া মিক্শ্চার ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবনের ব্যবস্থা করা হয়। পথ্যজন্য দুগ্ধ ও মৎস্যের যুষ এবং জলসাগু দেওয়া হয়। এই দিবস বৈকালে ৬টার সময় পুনরায় জ্বর হয় ও শারীরিক উত্তাপ ১০১৷৷০ ডিগ্রী হইয়া রাত্রি ৮টার সময় প্রচুর ঘর্ম্মের সহিত জ্বর সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ হয়।

১৪ দিবসের প্রাতে শারীরিক উত্তাপ ৯৯৷৷০ ডিগ্রী শ্লেষ্মার আবেগ অল্প ও অতি সামান্য শ্লেষ্মা উঠিতেছে। ক্ষুধা প্রবল। নিম্ন-লিখিত ঔষধ তিন তিন ঘণ্টা বাদ ব্যবস্থা করা হইল।

R কুইনাইনি সলফ	৩ গ্রেণ্
এসিড্ নাইট্রিক্ ডাইঃ	১০ মিনিম্
টীং সিঙ্কোনা	৷৷০ ড্রাম
ডিকক্ঃ সিঙ্কোনা	১ আং

এক মাত্রা। প্রতি মাত্রা ঔষধের সহিত ২ ড্রাম ১ নং ব্রাণ্ডী ব্যবস্থা করা হয়। ৪ মাত্রা ঔষধ সেবন করান হইলে পুনরায় কার্ব্বনেট্ অব্ এমোনিয়া মিক্শ্চার ৬ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দেওয়া হইল। পথ্য পূর্ব্ববৎ। সন্ধ্যাকালে জ্বর হইল না। অদ্য রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ আছে; কিন্তু নিতান্ত কৃশ।

এই রোগীতে স্যালাসিলিক্ এসিড্ অতি সুন্দর ক্রিয়া করিয়াছে। কারণ, কুইনাইন্ আদি ঔষধ সেবন করা সত্ত্বেও জ্বরের লাঘব না হইয়া যখন বৃদ্ধি হইতেছিল (যেমত ১২শ দিবসে) তখন পরিণামে

কি হইত, কে বলিতে পারে? বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর বা রেমিটেণ্ট ফিবারে স্যালিসিলিক্ এসিড্ অতি সত্বরে জ্বরবেগ লাঘব করিয়া থাকে।

ক্রমশঃ রোগী সুস্থ ও সবল হইতেছে। বলকারক ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(চিকিৎসা-দর্শন ৭ম সংখ্যা)

প্রতিবাদ।

রেমিটেণ্ট ফিবারে কুইনাইন।

উদ্ধৃত।

সম্পাদক মহাশয়!

আপনার ৭ম সংখ্যা চিকিৎসা-দর্শনে রেমিটেণ্ট ফিবারে স্যালিসিলিক্ এসিডে অতি সুন্দর ক্রিয়া করে লিখিয়াছেন এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ একটী দৃষ্টান্তও দিয়াছেন। কিন্তু আমার মতে উক্ত রোগীর স্বাভাবিক জ্বর ত্যাগ হইয়াছে বলিয়াই বোধ হইতেছে। আমার নিতান্ত বিশ্বাস, যেখানে কুইনাইন্ দ্বারা কিছু মাত্র উপকার হয় না, সেখানে স্যালিসিলিক্ এসিড্ দ্বারাও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। তবে এ কথা স্বীকার্য্য যে স্যালিসিলিক্ এসিড্ অথবা স্যালিসিলেট অব্ সোডা প্রয়োগে আপাততঃ উত্তাপ কমাইয়া জ্বরের লাঘব করে।

আমাদিগের দেশে দুই রকমের রেমিটেণ্ট্ ফিবার আছে। এই দুই জ্বরের বাহ্যিক প্রকৃতি এক হইলেও ইহারা স্বতন্ত্র জিনিষ। একরূপ জ্বরে বিরামকালে কুইনাইন প্রয়োগ দ্বারা উপকার হয় এবং অতি সত্বর জ্বর ত্যাগ হয়। আর এক ধরণের রেমিটেণ্ট জ্বর আছে, তাহাতে

হাজার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কুইনাইন দেও না কেন, কোনও উপকার বুঝিতে পারা যায় না; বরঞ্চ স্থানবিশেষে জ্বরের বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। এই শেষোক্ত জ্বরকেই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ যথার্থ বাতশ্লেষ্মা জ্বর বলেন। পূর্ব্বে আপনারই পত্রিকার অন্যতর লেখক ও আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ডাক্তার যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এই ধরণের একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন যে, বঙ্গদেশে এক জাতীয় বাতশ্লেষ্মা জ্বর আছে, যাহাতে কুইনাইনে কিছুমাত্র উপকার করে না। ধাত্রীশিক্ষাকার ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় যে, সমস্ত স্বল্পবিরাম জ্বরই কুইনাইন প্রয়োগ দ্বারা ছাড়ান যায় বলেন, এবং অনেক ডাক্তার মহাশয়েরা যে অকারণে তিন সপ্তাহ কাল রোগীকে ভোগাইয়া রোগীর জ্বরকে কথায় কথায় টাইফয়েড্ ফিবারে পরিণত কারণ বলেন, সে কথা সকল স্থানে ঠিক্ নহে। যদু বাবুর বহু পূর্ব্বে ডাক্তার ম্যাক্লিয়ান্ সাহেব জ্বরের স্বল্পবিরামাবস্থায় অধিক পরিমাণে কুইনাইন খাওয়াইতে বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সকল স্থানে যে এ ফিকির খাটাইয়া জ্বর ছাড়ান যায় না, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

নানা স্থানে চিকিৎসা করিয়া আমারও এই ধারণা হইয়াছে, যে স্থানে ম্যালেরিয়া জ্বরের অত্যন্ত প্রকোপ হয় অর্থাৎ এপিডেমিক্ হয়, সেই সকল স্থানে যে সকল রেমিটেণ্ট ফিবার হয়, তাহার প্রায় সকলগুলিতেই কুইনাইন দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত যে সকল স্থানে ম্যালেরিয়ার বড় প্রকোপ নাই, অথবা যে বৎসরে তত ম্যালেরিয়া প্রবল হয় না, সে সকল স্থানে বা সেই বৎসরে যে সকল বাতশ্লেষ্মা জ্বর হয়, তাহার প্রায় সকল গুলিই অত্যন্ত কঠিন আকারের হইয়া থাকে, এবং কুইনাইন ঢালিয়া কিছু মাত্র ফল পাওয়া যায় না। বর্ষার শেষে জ্বর হইলে প্রায় কুইনাইনে সুফল ফলে; কিন্তু চৈত্র বৈশাখ মাসে বিজাতীয় রেমিটেণ্ট ফিবারই বেশী হয়।

নদীয়া ও যশোহর জেলার অন্তর্গত ম্যালেরিয়া পীড়িত স্থান সকলে যত রোগী পাইয়াছি, তাহার প্রায় সকল গুলিতেই সকালে ও বিকালে নিয়ম পূর্ব্বক কুইনাইন দেওয়াতে বিশেষ উপকার হইয়াছে এবং পাঁচ

সাত দিবসেই বা সময়ে সময়ে দুই তিন দিবসেই জ্বর ত্যাগ হইতে দেখা গিয়াছে। সম্প্রতি যে অঞ্চলে থাকিয়া চিকিৎসা-ব্যবসা করি, সে অঞ্চলে অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ জেলার স্থানে স্থানে যে সকল জ্বর হইতে দেখা যায়, তাহা প্রায়ই তিন সপ্তাহের কম আরোগ্য হয় না। এই সকল স্থানে বড় একটা ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নাই। এতদঞ্চলেও যে সকল স্থানে ম্যালেরিয়ার কিছু বেশী বাড়াবাড়ি, সেখানে এমন অনেক জ্বর পাওয়া যায়, যাহাতে কুইনাইন দেওয়ামাত্র উপকার হয়। যে গুলিতে কুইনাইন খাওয়াইলে উপকার পাওয়া যায় না, সেগুলি ম্যালেরিয়া-জনিত জ্বর বলিয়াই আমার ধারণা হয় না। তবে ঠিক্ বলিতে পারি না। এই জ্বরগুলিতে প্রায়ই কম্প হয় না। অনেক অনেক বড় বড় চিকিৎসক যে বলিয়া থাকেন, জ্বর আরাম করিবার চেষ্টা করা বৃথা, ভোগ টুটিলে জ্বর আপনিই ত্যাগ হইবে, এ কথা অনেক স্থানেই খুব সত্য। আমি দুই একটী রোগীকে আদৌ কুইনাইন না দিয়া দেখিয়াছি যে ১৫ দিন কি ২১ দিনের দিন আপনিই জ্বর ত্যাগ হইয়াছে। যে জ্বর এক সপ্তাহে ত্যাগ হইল না, তাহা হয় পনর দিন, না হয় ২১ দিন ভোগ করিবেই করিবে। ছয় সাত দিবসের পর কুইনাইন দিলে যে গুলি কুইনাইন দ্বারা উপকৃত হয়, সে গুলি একাদশ কি দ্বাদশ দিবসে ছাড়িয়া যায়; নচেৎ ১৫কি ২১ দিন ভোগ করে। কলিকাতা সহরে অনেক জ্বর এই ধরণের হইয়া থাকে। এই সকল স্থলে যে ডাক্তারের ভাগ্যে শেষ ডাক হয়, সেই জ্বর ছাড়াইয়া কুইনাইনের ফল দেখাইয়া বাহাদুরী লাভ করে। প্রথমে যার হাতে পড়ে, তার নিতান্ত কপাল মন্দ। আমি অতি অল্প দিবস হইল, এইরূপ একটী জ্বর-রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি। কেমন নূতন ধরণের রোগী দেখুন। একটী ভদ্র লোকের সুস্থ ও সবল সাত বৎসর বয়স্ক বালকের হঠাৎ জ্বর হয়। জ্বর প্রথমে ছাড়িয়া ছাড়িয়া হইত। জ্বর ছাড়িবার সময় ঘাম হইত, কিন্তু আসিবার সময় কম্প হইত না; ক্রমে গা গরম হইয়া উঠিত। প্রাতঃকাল হইতে দুই প্রহর বেলা পর্য্যন্ত প্রায়ই ভাল থাকিত। বালকের পিতা একটী নেটিব্ ডাক্তার বাবু প্রত্যহ ১০ গ্রেণ, ১৫ গ্রেণ, ২০ গ্রেণ মাত্রায়

কুইনাইন দিয়াও জ্বর ছাড়াইতে পারিলেন না; বরঞ্চ জ্বরের বিরাম-কাল ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হইয়া একজ্বরে পরিণত হইল। তখন আমি আহূত হইলাম। দেখিলাম রোগীর জিহ্বা পরিষ্কার ও সরস, দাস্ত পরিষ্কার হইতেছে. যকৃতের বা ফুসফুসের কোন গোলোযোগ নাই, কেবল মাত্র জ্বর। আমি নিজে বিরামকালে কুইনাইন দিলাম। আর্সেনিক্ ও কুইনাইন একত্রে দিলাম, তাহাতেও উপকার হইল না। তার পর রোগীর জ্বর সম্পূর্ণ একজ্বরে পরিণত হইল এবং প্রত্যহ সকাল বেলায় অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইয়া রোগীর ধাত (নাড়ী) ছাড়িয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু কিয়ৎ কাল পরেই আবার জ্বর-আসিয়া ১০৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে একবার জ্বর কম পড়িত, কিন্তু ধাত ছাড়িয়া যাইত না। শরীরের উত্তাপের কোন একটা ঠিক ছিল না। কখনও ১০২ ডিগ্রি, কখনও ১০৩ ডিগ্রী কখনও ১০৪ ডিগ্রী আবার ধাঁ করিয়া ১০১ ডিগ্রী হইত। বিরাম অবস্থার পূর্ব্ব হইতেই উত্তেজক ঔষধ ব্যবহার দ্বারা কথঞ্চিৎ ধাত রক্ষা করা যাইত। কিন্তু বিগত৺শ্যামাপূজার রাত্রে প্রত্যূষে জ্বর ছাড়িতে আরম্ভ হইয়া একবারে ধাত বসিয়া গেল; কত উত্তেজক ঔষধ ও নানারূপ তদ্বিরেও কিছু হইল না। রোগীকে আসন্ন মৃত্যুমুখে পতিত দেখিয়া তাহাকে উঠানে নামান হইল, তখন রোগী স্পন্দহীন ও অসাড়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কিছুক্ষণ পরেই রোগী কাঁদিয়া উঠিল এবং তাহার মাতা স্নেহভরে তাহাকে কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে লইয়া গেল। আমি এসকল সংবাদ কিছুই জানি না। পরে প্রাতে গিয়া দেখিলাম, রোগীর ধাত অতিশয় দুর্ব্বল, পাওয়া যায় কি না যায়। এতদ্রুত যে, ঘড়ি ধরিয়া গণিতে পারা গেল না। থারমোমিটার দিয়া দেখিলাম, জ্বর ১০২ ডিগ্রির উপর। বিবেচনা করিলাম, এই জ্বরত্যাগেই রোগী মারা যাইবে। এই দিবস রোগীর পিতামাতা হতাশ হইয়া ৺কালীর প্রসাদ আনিয়া রোগীকে খাওয়ান। আমি বিনা ঔষধে ফেলিয়া রাখা অযুক্তি বিবেচনায় একটা ঔষধ লিখিয়া দিয়া আসিলাম। তাহা বার কতক খাওয়ান হইয়াছিল।

পরে শুনিলাম, সন্ধ্যার সময় আর একবার ধাত বসিয়াছিল; এবং সে সময়ে পূর্ব্বোক্ত নেটিব্ ডাক্তার মহাশয় উত্তেজক ঔষধ ও পথ্য কিছু কিছু দিয়াছিলেন। ইহারই পর হইতে আর জ্বর ছাড়িবার সময় ধাত বসিল না; প্রাতে যেমন স্বাভাবিক জ্বর ছাড়ে, সেই রূপ ছাড়িয়া গেল। এ উনবিংশ দিবসের কথা। তার পর দুই একটা জ্বর হইয়া ঠিক্ তিন সপ্তাহ গতে রোগীর সম্পূর্ণরূপে জ্বরত্যাগ হইল। এই রোগী প্রায় অর্দ্ধ ফাইল হাউয়ার্ডের কুইনাইন, ১ বোতল ব্রাণ্ডী এবং আন্দাজ ২ আউন্স টীংচার মস্ক খাইয়াছিল। এ সওয়ায় অন্যান্য ঔষধের ত কথাই নাই। কিন্তু কোন ঔষধে জ্বর তাড়াইতে পারে নাই। তবে ঔষধ ও পথ্য দ্বারা রোগীকে সবল রাখা গিয়াছিল মাত্র। নচেৎ এই ২১ দিন কাটান ভার হইত। রোগী আগাগোড়া কথাবার্ত্তা কহিয়াছে; বিকারের কোন লক্ষণ কোন দিন হয় নাই; জিহ্বা আগাগোড়া স্বাভাবিক ছিল। কেবল যে দিবস অত্যন্ত মৃতপ্রায় হয়, সেই দিবস কিছু ময়লাযুক্ত দেখা গিয়াছিল।

এ স্থলে আর একটী কথা বলি। যে কোন রেমিটেণ্ট ফিবার হউক, তাহার সহিত কোন যন্ত্রের প্রদাহ কালে সে প্রদাহ দূর না হওয়া পর্য্যন্ত কুইনাইন প্রয়োগে সুফল হয় না। যথা—সর্দ্দি ও কাসি থাকিলে বা নিউমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিস থাকিলে ঐ সকল রোগের চিকিৎসা অগ্রে না করিয়া কুইনাইন প্রয়োগে কোন ফল হইতে দেখা যায় না। আপনার বর্ণিত রোগীটীরও এই অবস্থা ছিল;—এবং আমার বোধ হয়, স্যালিসিলিক এসিড অপেক্ষা আপনার শ্লেষ্মানাশক মিকশ্চারেই বেশী ফল ফলিয়াছিল।

(চিকিৎসা-দর্শন।)

শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম্, বি।

সম্পাদকীয়মন্তব্য।

চিকিৎসা-দর্শন নামক চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় মাসিকপত্রিকার ৭ম সংখ্যায় যে "রেমিটেণ্ট ফিবারে স্যালিসিলিক্ এসিড" নামক প্রবন্ধ

বাহির হয়, লেখকশ্রেষ্ঠ ডাক্তার পুলিন বাবু তাহারই প্রতিবাদ করিয়া উক্ত পত্রিকাতেই আর এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। যাহাহউক, উপর্য্যুপরি দুইটী প্রবন্ধ অন্য পত্রিকা হইতে এস্থলে উঠাইয়া দেওয়ার তাৎপর্য্য বোধ হয় আমাদের সুবিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী বেশ সহজেই বুঝিতে পারিবেন। আমরা কিন্তু শেষোক্ত লেখকমহাশয়ের এই সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠকরিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এবং আশা করি যে, তাঁহার এই যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পাঠকগণও সুখী হইতে পারিবেন।· চি, স, স,

---

ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ-প্রণালী।

(কবিরাজী মতে।)

জ্বরাধিকার।

জয়াবটী।

অমৃত	১	শুঁঠচূর্ণ	১	পেপুলচূর্ণ	১
মরিচ চূর্ণ	১	মুতাচূর্ণ	১	হরিদ্রাচূর্ণ	১
নিম্পাতাচূর্ণ	১	বিড়ঙ্গচূর্ণ	১।		

যথাবিধানে শোধিত, পরিস্কৃত আপিচ শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃত উপরোক্ত দ্রব্যগুলি সমভাগে তৌল করিয়া লইবে। তারপর ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। পরিপুষ্ট চণক অর্থাৎ ছোলার আকারে যত বড় হয়, তত বড় আকারে বটী বাঁধিবে। ঔষধ মিশাইবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে অমৃত কুটি কুটি করিয়া কাটিয়া ছাগলের ছোনায় কিয়ংক্ষণ ভিজাইয়া রাখিয়া আগে সেই গুলি বেশ করিয়া মাড়িয়া লইতে হইবে।

ছাগমূত্র জান্তব পদার্থ, অধিকক্ষণ থাকিলে পচিয়া উঠিবে এজন্য এই ঔষধের কার্য্য সদ্যঃই সমাধা করিয়া লইতে হয়।

মুতা;—এই দ্রব্য সচরাচর "ভাদ্‌লার মুতা" এইনামে অভিহিত হইয়া থাকে। যে মুতা, উর্ব্বরা অথচ চাষ করা ভূমিতে জন্মে তাহাই ঔষধার্থে গ্রহণ করিবে। অকর্ষিত অনুর্ব্বরা ভূমিজাত মুতা পরিপুষ্ট হয়না সুতরাং তাহা হীনবীর্য্য। ক্ষেত্র হইতে মুতা উঠাইয়া তাহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড় গুলি ছাটিয়া ফেলিয়া বেশ করিয়া ধুইয়া লইবে। তারপর শুষ্ককরতঃ চূর্ণ করিয়া ছাকিয়া লইবে।

হরিদ্রা;——ঔষধার্থে পরিণত হরিদ্রাকন্দ গ্রহণ করিতে হইবে। যখন হরিদ্রার গাছ স্বভাবতঃ মরিতে আরম্ভ করে, তখন বুঝিতে হইবে যে ইহার কন্দ বেশ পুষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে শীত ঋতুতেই হরিদ্রা পরিপুষ্ট এবং বীর্য্যবান্ হইয়া থাকে। এই সময় ভূমি হইতে উঠাইয়া পরিষ্কার করতঃ চাক্ চাক্ করিয়া কাটিয়া শুষ্ক করিবে। বেশ শুকাইয়া গেলে যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া দিবে। আবশ্যক মতচূর্ণ করতঃ ছাকিয়া লইয়া ঔষধার্থে ব্যবহার করিবে।

নিম্‌পাতা;—যখন নিম্ব বৃক্ষে ফল ফুল না থাকে, সেই সময় পরিণত পাতা গুলি সংগ্রহ করতঃ শুষ্ক করিয়া রাখিয়া দিবে। শুষ্ক করিবার সময়ে যেন শিশিরাদিতে সিক্ত না হয়।

বিড়ঙ্গ;—এই দ্রব্য বেণের দোকানে বিক্রয় হয়। ঔষধার্থে পুরাতন বিড়ঙ্গ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। বিড়ঙ্গ পেষণ করতঃ খোসা ঝাড়িয়া ফেলিলে যে গোলাকার দানা পাওয়া যায়, তাহাই চূর্ণ করতঃ ঝাড়িয়া ঔষধার্থে ব্যবহার করিতে হয়।

ছাগমূত্র;—যে ছাগী গর্ভিনী বা অচিরপ্রসবা নহে অথবা ঋতুমতী না হইয়া থাকে অথচ বেশ হৃষ্ট পুষ্ট তাহারই চোনা ঔষধার্থে গ্রহণ করা গিয়া থাকে। এবং আহার জীর্ণ সময়ে মূত্র গ্রহণকরিতে হয়। বিশেষতঃ যে ছাগী বনের পাতা লতা ও মাঠের ঘাস খাইয়া বেড়ায় তাহার মূত্র বিশেষ গুণপ্রদ।

ক্রিয়া ও প্রয়োগ-প্রণালী।

প্রাচীনকাল হইতে দেশীয় চিকিৎসকেরা জয়াবটি আদরের সহিত ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। জ্বরে ইহার উপযোগিতার কথা অনেকের কাছেই শুনিতে পাওয়া যায়। আমরাও জ্বরে এবং অন্য কতিপয় স্থলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বেশ সুফল পাইয়া থাকি।

নূতন পুরাতন উভয়বিধ জ্বরের অবস্থাবিশেষে জয়াবটী প্রয়োগ করা গিয়া থাকে।

পিত্তজ্বরে কি অন্য কোন প্রকার জ্বরে পিত্ত যদি আমরস সংপৃক্ত থাকিয়া উৎক্লেশ বমন এবং গাত্রদাহ প্রভৃতি উপদ্রব জন্মায় তাহা হইলে উপযুক্ত মাত্রায় জয়াবটীপ্রয়োগে বিশেষ ফলদর্শে। ইহারবলে সামপিত্ত নিরাম অবস্থায় নীত হয়, পিত্ত নিঃসরণ ক্রিয়া প্রকৃতিস্থ হয় এবং হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক ক্রিয়া সংযমিত হইয়া থাকে। সুতরাং জ্বরেরও লাঘব হয়। এরূপ স্থলে ঈষদুষ্ণ বস্তাদুগ্ধের সহিত ঔষধ মাড়িয়া দিবসে ৪.৫ বটী প্রয়োগ করিবে।

রক্তপিত্ত রোগে যদি সঙ্গে সঙ্গে জ্বর থাকে, তাহা হইলে জয়াবটী প্রয়োগে বেশ ফল পাওয়া যায়। কুট্টিত রক্তচন্দন ২ তোলা জল ৩২ তোলা মৃদু জ্বাল দিয়া ৮ তোলা শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। এই ক্বাথের কিয়দংশ দিয়া বটী বেশ করিয়া মাড়িয়া পান করতঃ অবশিষ্ট ক্বাথ টুকু পান করিতে দিবে। যদি দিবসে একাধিকবার বটী প্রয়োগ করা বিহিত হয় (জ্বর প্রবল থাকিলে জ্বরের বেগ বুঝিয়া দিবসে ৩। ৪ বটী প্রয়োগ করা যাইতে পারে) তাহা হইলে ঐ ক্বাথ রাখিয়া তাহার সহিত বটী ব্যবহার করা যাইতে পারে। ফল কথা এই যে দিবসে রক্ত চন্দনের ক্বাথ ৮ তোলার বেশী প্রয়োগ না হয়।

ক্রিমিজন্য-জ্বরে কিম্বা জ্বরে ক্রিমির উপদ্রব থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বিবেচনা পূর্ব্বক ক্রিমিঘ্ন অনুপান সহ ব্যবহার করিবে।

কাস-সংস্পৃষ্ট জ্বরে এবং শুষ্ক সামান্য কাসরোগে মধুর সহিত মাড়িয়া জয়াবটী প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে।

পাণ্ডুশোথে এই ঔষধ ব্যবহার করাইলে সুফল পাওয়া যায়। সঙ্গে জ্বর থাকিলেও তাহা আরোগ্য হয়। দারুহরিদ্রার কাথ সহ ঔষধ ব্যবহার করাইবে। এই কাথ ও রক্তচন্দনের কাথের ন্যায় প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। কফাশ্রিত বায়ু কি অন্য কোন বায়ুরোগে গাত্রদাহ থাকিলে ঘৃষ্ট রক্তচন্দনের সহ মাড়িয়া জয়াবটী ব্যবহারে উপকার পাওয়া-গিয়া থাকে।

এদেশের চিকিৎসকেরা পুরাতন অবিচ্ছেদী জ্বরে জয়াবটী, মৃত্যুঞ্জয় রস সহ মিশাইয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেহ কেহ হিঙ্গুলেশ্বর সহও ব্যবহার করেন। এই জোড়া বটী পারুলির ছাল এবং মুর্দি বা মেদির পাতা একত্র ঘুঘুড়া করিয়া তাহার রসের সহিত মাড়িয়া মধু যোগে ব্যবহার করান। তাঁহারা বলেন এইরূপে ব্যবহার করাইলে সর্ব্বপ্রকার অবিচ্ছেদী জ্বর সবিচ্ছেদ হইয়া আইসে। আমিও এইরূপ ভাবে উক্ত ঔষধদ্বয় যুগপৎ প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছি। কোন কোন স্থলে বেশ ফলও পাওয়া গিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক রোগে জয়াবটী প্রয়োগের উপদেশ আছে। কিন্তু তত্তৎস্থলে আমি নিজে এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া দেখিনাই; অন্য কোন চিকিৎসককেও প্রয়োগ করিতে দেখি নাই। সুতরাং এস্থলে তাহার উল্লেখ করা গেল না। পাঠক বর্গ গ্রন্থোপদিষ্ট স্থলে বিহিত বিবেচনা পুরঃসর প্রয়োগ করিয়া দেখিতে পারেন।

ক্রমশঃ—

মাগুরা। } শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,
কবিরত্ন।

ঘৃত-পাক-বিধি।

ঘৃত তৈলাদি সাধারণতঃ স্নেহ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদীয় আচার্য্যগণ স্নেহসমূহকে যোনিভেদে (উৎপত্তি স্থানভেদে) দ্বিবিধরূপে বিভাগ করিয়াছেন। স্থাবর ও জঙ্গম এই দ্বিবিধ স্নেহাদির উৎপত্তি স্থান। (১) তিল, শর্ষপ, দন্তি, নিম্বাদি ফল ও সরলকাষ্ঠ, অগুরু, দেবদারু, শিংশপাকাঠ সারজাত স্নেহকে স্থাবরস্নেহ এবং মৎস্য, পক্ষী, মৃগ (চতুস্পদ জন্তু) প্রভৃতি হইতে জাত বসা মজ্জাক্ষীর ঘৃতাদি স্নেহকে জঙ্গমস্নেহ কহে। স্থাবর ও জঙ্গমজাত বহুবিধ স্নেহ দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও স্নেহদ্রব্য সমূহের মধ্যে ঘৃত, মজ্জা, বসা ও তৈলই শ্রেষ্ঠ। (২) আবার এই স্নেহচতুষ্টয়ের মধ্যে ঘৃতই শ্রেষ্ঠ। ইহা অবশ্যই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, জরায়ুজ প্রাণীমাত্রেরই অমৃততুল্য, জীবনী শক্তি বর্দ্ধকও শরীর-পোষক দুগ্ধ, দুগ্ধের সার পদার্থই ঘৃত। (৩) ঘৃত যেমন সুস্বাদু খাদ্য, তেমনিই বল পুষ্ট্যাদিসাধক, অতএত অবশ্য ইহাকে স্নেহশ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে? সত্যবটে—ঘৃতের গুণ প্রাচীণ গ্রন্থকারগণ যেরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ঘৃতের ন্যায় মানব শরীরের অশেষ হিতকর খাদ্য অতি বিরল দৃষ্ট হইয়া থাকে। অশেষ গুণকারক বলিয়া ঘৃতকে স্নেহ মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলাও সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্ববিধ স্নেহদ্রব্য মধ্যে ঘৃত শ্রেষ্ঠতম বলিয়া কীর্ত্তিত হইবার মুখ্য কারণ বা গুণ এই,—

---

(১) স্নেহানাং দ্বিবিধা সৌম্য! যোনিস্থাবরজঙ্গমা।

চরক।

(২) সর্পির্মজ্জা বসা তৈলং স্নেহেষু প্রবরং মতম্।

অষ্টাঙ্গহৃদয়।

(৩) ক্ষীরাদ্দধি ভবতি দধ্নোনবণীতম্ নবণীতাৎ ঘৃতং।

ভানুমতী।

সূক্ষ্মদর্শী আয়ুর্ব্বেদবেত্তা আচার্য্যগণ বলেন, তৈলাদি স্নেহ যেমন দ্রব্যান্তরের সহিত সংস্কৃত হইলে স্বগুণত্যাগ করিয়া সংস্কারক দ্রব্যগুণ বহন করিয়া থাকে। কিন্তু ঘৃত দ্রব্যান্তর দ্বারা সংস্কৃত হইলে স্বগুণ এবং সংস্কারক গুণ বহন করিয়া থাকে। অতএব ঘৃতে সংস্কারক দ্রব্যগুণ সহ স্বগুণ বর্ত্তমান থাকে, এই জন্যই ঘৃত সমুদয় স্নেহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যেমন ঘৃত সংস্কারক দ্রব্যগুণ আকর্ষণ করিয়া লইয়া স্বগুণ সহ বর্ত্তমান থাকে। তদ্রূপ অন্য কোন স্নেহ দ্রব্যে স্বগুণ, সংস্কারক গুণ বর্ত্তমান থাকে না। (৪) সংস্কারক দ্রব্য মরিচ চিত্রকাদির গুণপ্রাপ্ত হইলে ঘৃত, স্বগুণ স্নেহ শৈত্যাদি ত্যাগ করে না। এস্থলে অবশ্যই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, উষ্ণ রুক্ষাদি গুণ বিশিষ্ট মরিচ চিত্রকাদি দ্রব্য সহ সংস্কারহেতু ঘৃতও রুক্ষোষ্ণ গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে; তাহাহইলে উক্ত গুণের বিরোধী হইয়া সেই ঘৃতে স্নেহ শৈত্যাদি গুণ কিরূপেই থাকিতে পারে এবং কার্য্যকারী হইয়া থাকে? অর্থাৎ উভয়ই বিরুদ্ধগুণ কেনই বা পরস্পরকে হনন না করিয়া গুণকারী হইয়া থাকে?

ঘৃতের এমনই একটী অচিন্ত্য প্রভাব বা শক্তি আছে যে, ইহা কোন পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইলে তাহার গুণ অনায়াসে গ্রহণে সমর্থ হয়, অথচ স্বগুণ পরিত্যাগ করে না। সংস্কারক দ্রব্যের গুণ নিজগুণের বিরুদ্ধ হইলেও গুণ অনুপঘাত দ্বারা ধারণ করিয়া থাকে। (৫) এবং উভয়গুণ অর্থাৎ ঘৃতের স্বগুণ ও সংস্কারক গুণ অবিরুদ্ধ ভাবে কার্য্যকারী হইয়া থাকে। সংস্কারবশতঃ তৈলাদিস্নেহ দ্রব্যই নিজগুণ পরিত্যাগ

---

(৪) নান্যঃ স্নেহস্তথা কশ্চিৎ সস্কারমনুবর্ত্ততে।
যথা সর্পিরিতঃ সর্পিসর্ব্বস্নেহোত্তমং মতম্॥
চরক।

---

(৫) ইদমেব চ সর্পিষঃ সংস্কারানুবর্ত্তনং যৎ গুণবিরুদ্ধস্যাপি গুণানুপঘাতেন ধারণম্।
শিবদাস।

করিয়া থাকে, ইহার দৃষ্টান্ত চন্দনাদি তৈল। (৬) চন্দনাদি তৈল দাহজ্বরে প্রয়োগের বিধি আদিষ্ট হইয়াছে। চন্দনাদি শীতবীর্য্য পদার্থের সংযোগ বশতঃ তৈলের উষ্ণত্ব নিবৃত্ত হইয়া শীতবীর্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এবং এই জন্যই দাহ জ্বরের শান্তি হইয়া থাকে। ঘৃতে এরূপ স্নেহ শৈত্য গুণের নিবৃত্ত হয় না। ঔষধ পক্কঘৃতের এরূপ শক্তি যে, স্নেহগুণের দ্বারা বাতের, শৈত্য গুণ দ্বারা পিত্তের শমতা সাধন করিয়া থাকে এবং সংস্কারক দ্রব্য (মরিচ চিত্রকাদির) গুণ দ্বারা কফের প্রশমন হইয়া থাকে। (৭) বাত, পিত্ত, কফ এই তিনটী দোষই মানব শরীরের সমুদয় ব্যাধির মূল-স্বরূপ বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে বর্ণিত হইয়াছে (৮) ঔষধ-সাধিত ঘৃত এই তিনটী দোষকে প্রশমন করিতে সমর্থ। প্রধানতঃ এই কারণবশতঃ বুদ্ধিমান বহুদর্শী চিকিৎসকগণ প্রায় সর্ব্ববিধ ব্যাধিতে রোগীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, ঔষধপক্কঘৃত প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

এখন দেখা যাউক, কিরূপ ঘৃত ঔষধ পাকে ব্যবহার করা যাইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদে যে কয় প্রকার ঘৃতের গুণ উল্লেখ হইয়াছে তন্মধ্যে গব্য ঘৃতই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (৯) বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সর্ব্ববিধ কার্য্যে প্রায় গব্য ঘৃতই ব্যবহার করিয়া থাকেন। যেমন রাজযক্ষ্মাধিকারে অজা

---

(৬) তৈলবয়ানুজ্ঞানাহি সংস্কারবশাৎ স্বগুণাংস্ত্যজন্তি।
অত্র চোদাহরণং চন্দনাদ্যং তৈলম্।
অরুণদত্ত।

(৭) স্নেহাদ্বাতং শময়তি শৈত্যাৎপিত্তং নিযচ্ছতি।
ঘৃতংতুল্যগুণং দোষং সংস্কারাত্তু জয়েৎ কফম্॥
চরকসংহিতা।

(৮) সর্ব্বেষামেব রোগাণাং বাতপিত্তশ্লেষ্মাণ এব মূলম্।
সুশ্রুতসংহিতা

পঞ্চক ঘৃতে ছাগঘৃত ব্যবহারের উপদেশ আছে। কিন্তু এরূপ স্থল অতিবিরল, উল্লেখ না করিলেও চলিতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদে অভিনব ঘৃতাপেক্ষা পুরাতন ঘৃতের গুণাধিক্য স্বীকৃত হইয়াছে। গুণোৎকর্ষ বলিয়া প্রায়শঃ ব্যাধির জন্যঘৃত পাক করিতে চিকিৎসকগণ পুরাতন ঘৃতগ্রহণের পক্ষ পাতী। মহামনা ভাবমিশ্র বলেন, ভোজন কালে, তর্পণ ক্রিয়ায়, অতিরিক্ত পরিশ্রমে, বলক্ষয়ে, পাণ্ডুরোগে, কামলা এবং চক্ষুরোগে নূতন ঘৃত ব্যবহার করিবে। (১০) পুরাতন ঘৃত সম্বন্ধে অনেক মতবাদ আছে। তত্তৎ মত গুলি উল্লেখ করিয়া মীমাংসা করিয়া লিখিলে, প্রবন্ধ বাহুল্য হইয়া পড়ে। অতএব বিরত হইলাম। আমাদের বিবেচনায় সংক্ষেপতঃ যাহা লিখিত হইতেছে তাহাই যথেষ্ট।

মহামতি চক্র পাণি দত্ত বলেন, দশ বৎসর স্থিত ঘৃত উগ্রগন্ধ হইলে পুরাতন হয় (১১) সুচতুর ভাবমিশ্র বলেন, এক বৎসরপরই ঘৃত পুরাতন হয়। (১২) কিন্তু পুরাতন ঘৃতের গুণাধিক্য সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট কোন কাল অবধারিত নাই। ঘৃত যতই অধিক পুরাতন হইবে, ততই তাহার স্বীয় গুণের আধিক্য হইবে। (১৩) কেবল যে এক ভাবমিশ্রই পুরাতন ঘৃতের গুণাধিক্য সম্বন্ধে উল্লিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নহে। অতি প্রাচীন মহর্ষি হারীতও পুরাতন ঘৃতের গুণাধিক্য সম্বন্ধে

---

(৯) গব্যেক্ষীরঘৃতেশ্রেষ্ঠে। —

অষ্টাঙ্গহৃদয়।

গব্য সর্পির্গুণোত্তমং।

হারিতসংহিতা।

---

(১০) যোজয়েন্নবমেবাজ্যং ভোজনে তর্পণে শ্রমে।

বলক্ষয়ে পাণ্ডুরোগে কামলানেত্ররোগয়োঃ॥

ভাবপ্রকাশ।

কোন নির্দ্দিষ্ট কাল স্বীকার করেন নাই। ভাবমিশ্রের বহুকাল পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন, ঘৃত যতই অধিক পুরাতন হয়, ততই তাহার গুণাধিক্য হইয়া থাকে। (১৪)

এক্ষণে দেখা যাউক প্রাচীন চিকিৎসকগণ কিরূপ পুরাতন ঘৃত গ্রহণ করিতেন। মহাত্মা শিবদাস বলেন, দশ বর্ষ স্থিত ঘৃত পুরাতন, কিন্তু তাহার অভাব হইলে, সম্বৎসরাতীত ঘৃতই গ্রহণ করিবে। কথিত আছে যে, এক বৎসরোষিত ঘৃতই পুরাতন হয়? (১৫) এস্থলে একটী কথা সুসঙ্গত বিবেচনায় বলা যাইতেছে যে, প্রাচীন কালে প্রায়শ ব্যাধির ঘৃত পাকে পুরাতন ঘৃত গ্রহণ করিবার রীতি প্রচলিত ছিল কিনা, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়না; সম্ভবতঃ প্রাচীন চিকিৎসক-গণ সকল ব্যাধির ঘৃত পাক করিতে পুরাতন ঘৃত প্রদান করিতেন না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে পুরাতন ঘৃতে গুণাধিক্য হয় বলিয়া চিকিৎসকগণ ঘৃতপাকে পুরাতন ঘৃতের পক্ষপাতী; অতএব এস্থলে আর বলিবার কোনই কারণ নাই। এখন ঘৃত পাকের পাত্রের বিষয় বলা যাউক।

---

(১১) উগ্রগন্ধং পুরাণং স্যাদ্দশবর্ষস্থিতং ঘৃতম্

চক্রদত্ত।

এই সংস্কৃত শ্লোক চরকসংহিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, চরকের মতেও দশবৎসরস্থিত ঘৃতই পুরাতন হইয়া থাকে।

(১২) বর্ষাদূর্দ্ধং ভবেদাজ্যং পুরাণং তত্রিদোষনুৎ।

(১৩) যথা যথাঽখিলং সর্পিঃ পুরাণমধিকং ভবেৎ।
তথা তথা গুণৈ স্বৈঃ স্বৈরধিকং তদুদাহৃতম্।

ভাব প্রকাশ।

(১৪) যথা যথা জরাং যাতি গুণবৎ স্যাত্তথাতথা।

হারীতসংহীতা।

---

(১৫) পুরাণ সর্পি দশবর্ষস্থিতং তদভাবে সম্বৎসরাতীতেঽপি পুরানং গ্রাহ্যমিত্যাহুঃ। উক্তং হি অগ্নাভিষ্যন্দি মধুরং বচ্চ সম্বৎ-সরোষিতং। অনুক্লেদকং দোষাণাং পুরাণং তৎপ্রকীর্ত্তিতম্।

শিবদাস।

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ মৃণ্ময় প্রভৃতিপাত্রে ঘৃত তৈলাদি পাক করিবার বিধি আছে। ইহার মধ্যে ঘৃত পাকে যে কোন পাত্র শ্রেষ্ঠ, সহসা তাহা বলা যায় না, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখ যায় য এতন্মধ্যে কোন কোন পাত্র বিশেষে কোনদ্রব্য অন্যবিধ গুণোৎপন্ন হইতে পারে; যেমন তাম্র পাত্রে ঘৃত রক্ষিত হইলে বিবর্ণ ও বিরস হইয়া যায়। আর হরীতকী প্রভৃতি কষায় রস বিশিষ্ট দ্রব্য লৌহপাত্রে পাক করিলে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে. সংযোগপূর্ব্ব (রাসায়নিক) বলেই উক্ত বিবিধরূপ হইয়া থাকে। সংযোগ ক্রিয়ায় এক পদার্থের গুণ অপর পদার্থের গুণের সহিত সংমিশ্রিত হইলেই বিভিন্ন গুণোৎপাদন করিয়া থাকে। তজ্জন্য সুবিজ্ঞ চিকিৎসক-গণ উল্লিখিত পাত্রনিচয়ের মধ্যে মৃৎ পাত্রকেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন এবং মৃৎপাত্রে ঘৃতাদি পাক করিবার উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

ঘৃতাদি পাকের জ্বালানি কাষ্ঠ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন নিম্ব কাষ্ঠই শ্রেষ্ঠ। আর কেহ বা অন্যবিধ কাষ্ঠের বিষয় বলিয়া থাবেন। অপর কেহ কেহ বলেন এমন কোন এক বিশেষ কাষ্ঠ দ্বারা পাক না করিলেই যে হইবে না, ইহা ততদূর সঙ্গত বলিয়া বোধ করি না; তবে যে ভেষজ ব্যাধি নিবারক ঘৃতাদি পাক করিতে হইলে তত্তৎদোষ নাশক শুষ্ক দৃঢ় কাষ্ঠের মৃদু অগ্নি সন্তাপে পাককার্য্য সম্পন্ন করিবে।

তৈল ভিন্ন ঘৃতের মূর্চ্ছা পাক বা গন্ধ পাক করিবার রীতি এই ক্ষণ দৃষ্ট হয় না। তৈলের ন্যায় ঘৃতে মূর্চ্ছা পাকের দ্রব্য সমূহ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নির্দ্দিষ্ট আছে; (১৬) কিন্তু এখন আর কেহ ব্যবহার করে না। তজ্জন্যই কিরূপে মূর্চ্ছা পাক করিতে হয়, তদ্বিবরণ এস্থলে লিখিত হইল না।

ঘৃত পাকে কল্ক দ্রব্য ও ক্বাথ ইত্যাদি দ্রব্য কি রূপে গ্রহণ করিবে, তাহার পরিভাষা সংক্ষেপে বলিতে গেলেও ক্ষুদ্র একখানি পুস্তক হইয়া

(১৬) পথ্যা ধাত্রী বিভীতকৈ র্জলধরমাতুলুঙ্গ দ্রব্যৈশ্চ দ্রব্যৈরেতৈঃ সমস্তৈঃ পলকপরিমিতৈ র্মন্দমন্দানলেন। আজ্যপ্রস্থং বিফেণং পরিচপলগতং মূর্চ্ছয়েদ্বৈদ্যরাজঃ।

দাঁড়ায়। অতএব যে ঘৃতে যেরূপে দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া পাক করিতে হয়; আমরা যথা স্থানে পরিভাষ্যানুসারে দ্রব্য সমূহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লিখিব। সর্ব্ববিধ ঘৃত পাকের অবশ্যজ্ঞাতব্য কয়েকটী বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে। আমরা বার বার প্রত্যেক ঘৃত পাকের সময় প্রোক্ত কথা গুলি আর উল্লেখ করিব না।

পাত্র সহ ঘৃত চুল্লিতে উঠাইয়া, মৃদু অগ্নি সন্তাপে ঘৃত উষ্ণ করিয়া কল্ক দ্রব্যাদি প্রদান করিবে। এবং মৃদু অগ্নি তাপে অতি মনোযোগের সহিত পাক কার্য্য সম্পন্ন করিবে; কেননা পাকের সমুদয় দ্রব্যই ব্যাধিনাশক সুতরাং ঘৃতের গুণোৎকর্ষ সম্পূর্ণ কল্কপাকের উপরই নির্ভর করে। মহামতি চক্রপাণি দত্ত বলেন, ঘৃতাদি এক দিবসে পাক শেষ করিয়া নামাইবে না; কেননা পর্য্যুষিত হইলেই বিশেষ গুণকারক হইয়া থাকে। (১৭) মহর্ষি হারিত ঘৃত পাক শেষকরিবার সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট কালের উল্লেখ করিয়াছেন, এক সপ্তাহে ঘৃত পাক সম্পন্ন করিবে। (১৮) অন্যো সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ একদিনে পাক শেষ করেন না, এবং কোন নির্দ্দিষ্ট কালের উপরও নির্ভর করেন না।

স্নেহপাক ত্রিবিধ প্রকারে সম্পন্ন হইতে পারে। যথা মৃদুপাক, মধ্যপাক, ও খরপাক। তন্মধ্যে যে পাকে কল্ক কিঞ্চিত রস সংযুক্ত থাকে এবং কল্ক অঙ্গুলী দ্বারা চাপিয়া ধরিলে অঙ্গুলীতে সংপৃক্ত হয়, তাহাকে মৃদুপাক বলে। যাহার কল্ক নীরস অথচ কোমল এবং পাকশেষ সময়ে যে সমুদয় লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তত্তৎ লক্ষণ গুলি উদিত হইলে তাহাকে মধ্যপাক বলা যায়। কল্ক নীরস হইয়া ঈষৎ

---

(১৭) ঘৃত তৈল গুড়াদিংশ্চ নৈকাহাদবতারয়েৎ।
ব্যুষিতাস্ত প্রকুর্ব্বন্তি বিশেষেণ গুণান্ যতঃ।
চক্রদত্ত।

(১৮) পক্বে ঘিয়তি তৈলঞ্চ সপ্তাহে ঘৃতমেবচ।
হারীতসংহিতা।

কঠিন হইলে তাহাকে খরপাক এবং ইহা হইতে অতিরিক্ত খরপাক লইলে তাহাকে দগ্ধপাক কহে। এস্থলে খরপাকেরই দ্বিবিধ কল্পনা হইল, খর ও দগ্ধপাক।

স্নেহ, মৃদু পক্ক হইলে হীনবীর্য্য,অগ্নি মান্দ্যকারক ও গুরু হইয়াথাকে। মধ্যপাক স্নেহ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গুণজনক এবং খরপাক স্নেহ হীনবীর্য্য। মৃদুপক্ক ও খরপক্ক স্নেহ,স্থলবিশেষে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু দগ্ধ পক্কস্নেহে গুণ মাত্রই থাকে না এইজন্য সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। মৃদু ও খর পাকের মধ্যে মৃদু পাকই কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে, কেননা খরপাকে ঔষধের বীর্য্য ধ্বংস হইয়া থাকে। ঘৃত পাকে কিরূপ লক্ষণ লক্ষিত হইলে পাক সিদ্ধ হইবে, তাহাই বলা যাইতেছে।

যে সময় স্নেহ স্থিত কল্ক অঙ্গুলি দ্বারা আবর্ত্তন করিলে বর্ত্তি সদৃশ হইবে, কল্ক দ্রব্য অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিলে যখন নিঃশব্দে দগ্ধ হইয়া যায়; ফেণ ও শব্দের নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইলে এবং যথানুরূপ গন্ধ রসাদির উৎপত্তি হইলে ঘৃত পাক সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে।

পাক শেষ হইলে চুল্লি হইতে নামাইবে এবং শীতল হইলে সিদ্ধ (ঘৃতাদি ভাবিত) ভাণ্ডে যত্নের সহিত রাখিয়া দিবে। উপযুক্ত সময়ে যথামাত্রায় প্রয়োগকরিবে। পক্ক ঘৃতের গুণের স্থায়িত্ব সীমা ভাবমিশ্র এই রূপ নিরূপণ করিয়াছেন, পক্ক ঘৃত তৈলাদি এক বৎসর চারি মাসের পর গুণের লাঘব হয়। (১৯) অতঃপর জ্বরের কোন্ অবস্থায় কিরূপ ঘৃত পান করান উচিত তাহাই বলিব। ক্রমশঃ

১২৯৪। ১৬ ই পৌষ
কাকিনীয়া রঙ্গপুর।

শ্রীপ্রাণগোবিন্দ রায় কবিরাজ।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

লেখকের এই প্রবন্ধ লিখিতে যে বিশেষ পরিশ্রম করিয়া অনেক পুস্তকাদিতে অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে. ইহা যথার্থ। চি, সি, স,

---

(১৯) হীনাঃ স্যুর্ঘৃততৈলাদ্যাশ্চতুর্মাসাধিকাস্তথা।

ভাব প্রকাশ।

আর্য্য-চিকিৎসা-গ্রন্থের মাহাত্ম্য।

"There are more things Horatio——————
Than is dreamt of in your proud philosofhy."
SHAKESPEARE.

সম্পাদক মহাশয়!

অনুগ্রহ করিয়া আমার এই ক্ষুদ্রপত্রখানিকে আপনার পত্রিকায় স্থান দিবেন। আমি একজন আর্য্য-চিকিৎসা-বিদ্বেষী মেডিকাল কালেজের ডাক্তার। আমি এজন্যই ঐ কালেজের কৃতবিদ্যগণের পাঠার্থে ইহা পাঠাইতেছি। যাহাতে তাঁহাদের মনে এই চিকিৎসা-প্রণালীর উপর কিঞ্চিৎ যত্ন ও শ্রদ্ধা জন্মে।

এক দিবস আমি এবং আমার প্রিয় সুহৃৎ মৃত ডাক্তার গুরুগোবিন্দ সেন মহাশয় (যাঁহার যত্নে ও চেষ্টায় আমার আর্য্য-চিকিৎসা-প্রণালীর উপর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়) আমরা উভয়ে কলিকাতা মেও হাস্‌পাতালে থাকিবার সময় আয়ুর্ব্বেদীয় সুশ্রুত পুস্তক পাঠ করিতে করিতে উক্ত গ্রন্থের অরিষ্ট লক্ষণের মধ্যে মর্ম্মস্থানে অভিঘাত হইলে "আক্ষেপাৎ মরণং" এই সূত্রটী দেখিলাম। সূত্রটী দেখিয়া মর্ম্মস্থান কাহাকে বলে, তাহার নির্দ্দেশ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম সুশ্রুত হস্তের কিম্বা পদের বৃদ্ধা অঙ্গুলীর পর দ্বিতীয় অঙ্গুলীর মধ্যস্থানকে মর্ম্মস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এমন সময়ে একটী বেশ্যা স্ত্রীলোক বারাণ্ডা হইতে পতিতান্তর হস্তে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া উক্ত মেও হাঁসপাতালে আনীতা হইল। তাহার হস্তে আঘাতের গুরুত্ব বিশেষ কিছুই ছিল না। স্ত্রীলোকটী বয়সে ২০।২২ বৎসর এবং বিলক্ষণ হৃষ্টা পুষ্টা ও বলিষ্ঠা ছিল। তাহার তর্জ্জনীর অস্থিখানি ভাঙ্গিয়া গিয়া মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিয়া বহির্গত হইয়াছিল। আঘাত পরীক্ষা করণান্তর অঙ্গুলীচ্ছেদনের অযোগ্য বিবেচনায় উহা কাষ্ঠাদিদ্বারা বাঁধিয়া সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার লিষ্টার সাহেবের মতে ঔষধাদির ব্যবস্থা করা হইল। মেওহাঁসপাতালের ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার মান্যবর কেলি সাহেব তৎপর দিবা হাঁসপাতালে আসিয়া এবং আঘাত পরীক্ষা

করিয়া এই সকল ব্যবস্থায় অনুমোদন করিলেন। তখন তাঁহাকে রোগীর ভাবী শুভাশুভ ফলের কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি আমাদের এলোপ্যাথিক ব্যবস্থামতে শুভ ফল অনুমান করেন এরূপ মত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তখন আমার সহ কর্ম্মচারী ডাক্তার গুরুগোবিন্দ বাবু, ডাক্তার সাহেবের কথায় প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন যে, আমাদের প্রাচীন চিকিৎসক মহামুনি সুশ্রুত এই মর্ম্মস্থানে অভিঘাত লাগায় এরোগীর ধনুষ্টঙ্কার রোগে মৃত্যু নিশ্চয় করিয়াছেন। একথা শুনিয়া ডাক্তার সাহেব কহিলেন বোধ হয় দূরদর্শী প্রাচীন চিকিৎসকগণ হস্তপদাদির অভিঘাত অধিক পরিমাণে দেখিয়া এবং তাহা হইতে আভিঘাতিক ধনুষ্টঙ্কার বহুসংখ্যক হয়, ইহাও লক্ষ্যকরিয়া এরূপ বচনের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুষ্যের দূরদৃষ্টিতে যতদূর অনুমান করা যায়, তাহাতে এরোগীর সম্বন্ধে ধনুষ্টঙ্কারের নিশ্চয়তা কিছুই নাই। তবে অভিঘাতে এই ব্যাধির প্রকাশ সম্ভব। তখন গুরুগোবিন্দ বাবু কহিলেন দেবঋষি সুশ্রুত এসম্বন্ধে নিশ্চয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি হস্তপদাদির সকল অভিঘাতের কথা কহেন নাই। তিনি কেবল মর্ম্মস্থানের অভিঘাত সম্বন্ধে এই বচন লিখিয়াছেন। যাহা হউক, তাহার পর তিন দিবস সেই রোগী প্রতিদিন ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ করিয়া তৃতীয় দিবস সন্ধ্যার সময় ধনুষ্টঙ্কারে আক্রান্ত হইয়া চতুর্থ দিবসে কালগ্রাসে পতিত হইল। সুবিজ্ঞ ডাক্তার সাহেবও তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য মহোদয়গণের মনে আর্য্যসন্তানগণের উৎকর্ষতা কখনই ধারণা হইবার নহে। তাই তিনি তাহা দৈবাৎ (এক্সিডেণ্টাল) বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু কিছু দিন পরে আবার একটী ঘটনায় তাঁহাকে কতকটা প্রতিপন্ন করাগেল। এই হাঁসপাতালে একটী রোগীর পদের অঙ্গুষ্ঠ ও দ্বিতীয় অঙ্গুলীর মধ্যস্থলী একটী কমলানেবুর আকার অর্ব্বুদ কাটাইতে আইসে। ডাক্তার সাহেব এই অর্ব্বুদ কাটিয়া দেন, এবং তাহাতে তিনি এই দুই অঙ্গুলির ভিতর একটা অস্ত্রের আঘাত করেন। ইহাতে গুরুবাবু তৎক্ষণাৎ বলেন, যে ইহা মর্ম্মস্থান, সুতরাং এই অভিঘাতে "আক্ষেপাৎমরণং" বচনের কথা এদেশীয় শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া ডাক্তার সাহেব

চুপ করিয়া রহিলেন এবং বলিলেন দেখা যাউক কি হয়। ক্রমে একদিন দুইদিন করিয়া ১৯ দিন গত হইল এবং রোগীও প্রায় আরোগ্য হইয়া আসিল। তখন রোগীর অবস্থা অতি উত্তম, ঘা যৎসামান্য আছে, তখন সাহেব (অবশ্য কিছু কটাক্ষের সহিত) বলিলেন কৈ ধনুষ্টঙ্কারের কোন লক্ষণত প্রকাশ পাইল না? আমি পূর্ব্বেই জানি যে, আর্য্যজাতির বচনের অনেক বাদ দিতে হইবেক। এইরূপে ২৫ দিন গত হইলে রোগীর ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। এবং ক্রমে দিন দিন উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া রোগী মৃতপ্রায় হইয়া উঠিল। সেই ব্যাধিতে ১।১৫ দেড় মাস কাল ভুগিয়া অনেক কষ্টে ও বহুতর আয়াসে সে আরোগ্যলাভ করিল। তখন ডাক্তার সাহেবও একটু চমৎকৃত হইলেন। কিন্তু কহিলেন মৃত্যুত নিশ্চয় নহে, রোগী জীবনদান পাইয়াছে। অতএব বচনের সত্যতা ততদূর নহে। ইহাতে গুরু বাবু উত্তর করিলেন যে, চিকিৎসার্থ অস্ত্রপ্রয়োগ ও আভিঘাতিক আঘাত, এই উভয়ে অনেক তফাৎ। আভিঘাতিক আঘাত সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই, উহা যথাসম্ভব। কিন্তু চিকিৎসার অস্ত্র প্রয়োগ বিবেচনা, বিদ্যা ও পটুতার উপর নির্ভর করে। অতএব অভিঘাত সম্বন্ধে সুশ্রুতের বচন সম্পূর্ণ সত্য। কারণটী কিঞ্চিৎ যুক্তিযুক্ত বিবেচনায় তখন সাহেব নিরস্ত হইলেন।

মহাশয়, আমি ডাক্তারদিগের পাঠার্থে এবং কবিরাজগণের মনে বচনটীর সাফল্য দেখাইবার জন্য এই পত্রখানি আপনাদের বহুজন-সমাদৃত পত্রিকায় মুদ্রিত করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলাম।

বাগবাগান গবর্ণমেণ্ট হাঁসপাতাল
কলিকাতা, } শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত এম, বি,

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সুবিজ্ঞ ডাক্তার ক্ষীরোদ বাবুর লিখিত প্রবন্ধটী ক্ষুদ্র হইলেও আর্য্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রতি তাচ্ছিল্যকারী এবং বিদেশীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের নিতান্ত ভক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে পড়িবার জিনিষ বটে। বস্তুতঃ যাঁহারা কূপস্থ ভেকের ন্যায় কেবল ঐকদেশিক (পক্ষান্তরে কেবল বৈদেশিক) জ্ঞানে উন্মত্ত হইয়া দেশীয় শাস্ত্রকে ফুৎকারে উড়াইতে চাহেন, আমরা আশা করি যে, ক্ষীরোদ বাবুর লিখিত প্রবন্ধদ্বারা তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হওয়া উচিত। চি, স, স,

বিবাহ-বিচার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমার লিখিত বিবাহ-বিচার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সুবিজ্ঞ সহচরসম্পাদক মহাশয় তাঁহার ১১ই ফাল্গুনের পত্রিকায় আমাকে বন্ধুভাবে একটু সৎ-পরামর্শ দিয়াছেন। বন্ধুভাবে যিনি যাহা বলেন তাহা আমার সম্পূর্ণ গ্রহণ-যোগ্য। ভ্রমে পতিত হওয়া মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম, অতএব যিনি [illegible] ভ্রম দেখাইয়া দেন. তিনি প্রকৃতই বন্ধুর কার্য্য করেন। তবে সম্পাদক মহাশয় নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—সবে প্রবন্ধের পত্তন, শেষ না দেখিলে কিছু বুঝা যাইবে না। জীবস্রোত প্রবল রাখিবার জন্য প্রকৃতি যে নিতান্তই আত্মহারা, সেইটীই বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল। তবে বর্ণনাটী যে স্থানবিশেষে কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত হইয়াছে একথা স্বীকার্য্য। সহচর সম্পাদক মহাশয় চিকিৎসা-সম্মিলনী পত্রিকায় শ্রীযুত কবিরাজ হরিমোহন দাস গুপ্তকে রতিক্রিয়ার অবতারণা করিতে দেখিয়া বেশ একটু বিদ্রূপ করিয়াছেন। তবে এ দোষটুকু কবিরাজ মহাশয়ের ঘাড়ে না চাপাইয়া দেবঋষি সুশ্রুতের উপর চাপানই উচিত ছিল। কেননা কবিরাজমহাশয় নিজের কোন কথাই বলেন নাই। দেবর্ষি সুশ্রুতে, রতিক্রিয়া সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন, কবিরাজ মহাশয় কেবল তাহারই পুনরুল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। সম্পাদক মহাশয় হয়ত বলিবেন যাহার জ্বালায় সমস্ত জগত উন্মত্ত, তাহা লইয়া আবার আন্দোলনের প্রয়োজন কি? আমরা বলি প্রয়োজন আছে। এজগতে সকলই নশ্বর, সকলকেই একদিন মরিতে হইবে, ইহা সকলেই জানে, তত্রাচ সংসারের মায়ায় লোক এমনিই বিমুগ্ধ, যে [illegible] [illegible] মন-

[illegible] সেই [illegible] শেষ দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হয়। নচেৎ [illegible] আসক্তি কমে না। যখন ইন্দ্রিয়-লালসা একবারে নিবারণ করা অসাধ্য. তখন উহার অপব্যবহারে কতদূর অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া কখনও অশ্লীল নহে। আদিরস স্বতন্ত্র জিনিষ। এবং [illegible]লোচনা কুভাবে গ্রহণ করিলেই কু এবং সুভাবে গ্রহণ করিলেই সু বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পদ্মবনে ভ্রমরের ঝঙ্কার শুনিয়া তরলমতি যুবকের মন বিচলিত হইতে পারে বটে, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী বিজ্ঞানবেত্তা কমল বনে ভ্রমরের সমাগমকে সৃষ্টি রক্ষার একটী অপূর্ব্ব কৌশল বলিয়া মনে করিতে পারেন। মহাত্মা সুশ্রুতের ইন্দ্রিয়পরিচালন সংক্রান্ত সদুপদেশ গুলি দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের মন বিচলিত করিতে পারে বটে, কিন্তু প্রবীণ সহচর সম্পাদক মহাশয়ের মন বিচলিত হওয়া উচিত নহে।

এখন বক্তব্য বিষয়ের অবতারণা করা যাউক। যেমন প্রথম যৌবন সঞ্চারে সহবাস ঘটিলে সে সহবাসে হয় আদৌ সন্তান হয় না, অথবা হইয়া মরিয়া যায় বা বাঁচিয়া থাকিলেও দুর্ব্বল হয়. সেইরূপ বৃদ্ধাবস্থায় যখন শরীর নিস্তেজ হইতে আরম্ভ হয়, তখন সহবাস ঘটিলেও সেইরূপ সহবাস নিষ্ফল বা তাহাতে রুগ্ন সন্তান উৎপন্ন হয়। সমস্ত উদ্ভিদ ও জীব-রাজ্যে এই নিয়ম প্রচলিত দেখা যায়। যেমন যৌবনের ক্রমবিকাশ হয়, একবারে যৌবন পূর্ণ মাত্রায় আরম্ভ হয় না, সেইরূপ জীবও উদ্ভিদগণের বল ও শক্তির হ্রাসও ক্রমে ক্রমে হইয়া থাকে। আম্র, কুল, পেয়ারা প্রভৃতির পূর্ণ বয়সের ফল সকল সুপুষ্ট ও বৃহদাকার হইয়া থাকে। কিন্তু শেষাবস্থার ফল সকল ক্রমেই সংখ্যায় অল্প ও আকারে ছোট হইয়া যায়। তার পর একবারেই ফল ধরা বন্ধ হয়। পশুদিগের শেষ বয়সের সন্তান গুলি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হয়। তার পর মনুষ্যের সম্বন্ধে দেখা যায়, স্ত্রীলোকের মাসিক রজঃস্রাব. যেমন ক্রমে ক্রমে আরম্ভ হয়, সেইরূপ বন্ধ হইবার সময়ে একবারে বন্ধ না হইয়া উহা ক্রমে ক্রমে বন্ধ হয়। মনুষ্যের বৃদ্ধাবস্থার সন্তান গুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণজীবী হয়। কোন কোন জীব ও উদ্ভিদ সম্বন্ধে কচিৎ প্রথমোক্ত নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায়। যথাঃ—

কলা ও ধন্য প্রভৃতি ওষধি যাহারা একবার মাত্র ফল প্রসব করিয়া মরিয়া যায়, তাহাদের প্রথম ফুলের ফল গুলিই সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্ট হয় এবং শেষে ফল গুলি ক্ষুদ্রাকার হয় এবং তৎপরে অবশিষ্ট ফুল গুলি ফল প্রসব না করিয়া ঝরিয়া পড়ে। এই সকল স্থলে জীবন নিতান্ত সংক্ষেপ বলিয়াই যেন প্রকৃতি সর্ব্বাগ্রে ভাল ফল গুলি বাছিয়া বাহির করিয়া লন। যাহা হউক, মোটের উপর ইহা স্থির, যে জীব ও উদ্ভিদমধ্যে প্রথম ও শেষ বয়সের সহবাস হয় নিষ্ফল হয়, নচেৎ তাহাতে দুর্ব্বল সন্তান উৎপন্ন হয়। জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্যও এই নৈসর্গিক নিয়মের অধীন।

এক্ষণে দেখা যাউক, কেবল মাত্র বাল্য বিবাহের জন্য কোন জাতি সমষ্টি একবারে পুরুষানুক্রমে বলবীর্য্যহীন, নিস্তেজ ও বংশহীন হইয়া যাইতে পারে কি না? পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে সমগ্র প্রাণিজগৎ স্ব স্ব প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া অযথা বংশবৃদ্ধি করিতেছে। সহবাসে সুসন্তান কি কুসন্তান হইবে কি আদৌ সন্তান হইবে না, এ সকল চিন্তা সহবাস প্রবৃত্তির নিয়ামক নহে। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিই জীবগণের লক্ষ্য এবং তাহার ভাবীফল বংশবৃদ্ধি। এইরূপ অনিয়মিত বংশবৃদ্ধি সমস্ত প্রাণীও উদ্ভিদ জগতে বিদ্যমান রহিয়াছে। মহানুভব (ম্যাল্‌থস্‌) বলেন জীবগণের সন্তান সন্ততি "চিঁড়ের বাইশ ফেরার" ন্যায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদবেত্তা লিনিয়স্‌ গণনা করিয়া বলেন যে যদি একটী একবৎসর কাল স্থায়ী উদ্ভিদ দুইটীমাত্র ফল প্রসব করে এবং ঐ দুইটী ফল পর বৎসর প্রত্যেকে দুই দুইটী করিয়া বীজ প্রদান করে, তবে এইরূপ নিয়মে বিশ বৎসর পরে দশ লক্ষ চারা উৎপন্ন হইতে পারে। কোন কোন উদ্ভিদ কিছুদিন মধ্যেই সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলে। পেঁপিয়া গাছ আমাদের দেশস্থ নহে। উহা পাপুয়া নামক দ্বীপ হইতে আনীত। এই গাছ অল্পকাল মধ্যে সমস্ত ভারত ভূমিতে বিস্তৃত হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে পূর্ব্বে ঘোড়া ছিল না, ইউরোপবাসীরা অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করার পর কতকগুলি ঘোটক লইয়া গিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই ওয়েলার ঘোড়া দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমেরিকার জঙ্গল প্রদেশে

স্পেন দেশের লোকেরা কতকগুলি ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এক্ষণে সেই জঙ্গলে লক্ষ লক্ষ ঘোটক বিচরণ করিতেছে। সকল জীব অপেক্ষা হস্তী কম সন্তান উৎপন্ন করে, তত্রাচ প্রত্যেক হস্তী গড়ে ছয়টী করিয়া সন্তান উৎপন্ন করিলে একজোড়া হস্তীর সন্তানসন্ততি একহাজার বৎসরের মধ্যে প্রায় দুই কোটী হইতে পারে। মনুষ্য খুব কম সন্তান উৎপন্ন করে তত্রাচ পঁচিশবৎসরের মধ্যে মনুষ্য সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে। আমেরিকার একটী বৃহৎ অংশ অল্পকাল মধ্যে কয়েকটী ইংরেজ সন্তানের বংশাবলীতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। প্রাণিগণের বংশবৃদ্ধিত এইরূপ, ইহার মধ্যে দুর্ব্বল, সবল, নিস্তেজ, বিকলাঙ্গ প্রভৃতি নানারূপ সন্তান হইতেছে। তবেই এক মাত্র বাল্য বিবাহের জন্য কোন জাতিবিশেষের বংশ ক্রমে নিস্তেজ হইতে থাকিলে এতদিন সমগ্র জগৎ জীব ও উদ্ভিদ শূন্য হইয়া মরুভূমিতে পরিণত হইত। কারণ জীব ও উদ্ভিদ রাজ্যে বাল্য বিবাহ এবং রুগ্ন সন্তানোৎপাদন পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিতেছে। যে আশ্চর্য্য নৈসর্গিক নিয়মের বলে প্রাণি জগৎ ধ্বংশ হইতে পারেনা প্রত্যুত দিন দিন উন্নত ও সংখ্যায় বেশী হয়, তাহাকে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন কহা যাইতে পারে। ইহা একটী প্রাকৃতিক নিয়ম যে যিনি বেশী উপযুক্ত ও বলবান তিনিই এসংসারে দীর্ঘজীবী হইয়া বেশী সন্তান সন্ততি রাখিয়া যাইতে পারেন। এবং যিনি দুর্ব্বল তিনি ক্রমশঃ উৎপাদিকা শক্তিবিহীন হইয়া বংশহীন হইয়া যান। অথবা উৎপাদিকা শক্তি থাকিলেও তৎশক্তি পরিচালনার সুযোগাভাবে বংশবৃদ্ধি করিতে সক্ষম হন না। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন কিরূপ ভাবে কাজ করে, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে।

কোনও জলাশয়ে কতকগুলি কুম্ভীর বাস করে। কুম্ভীরদিগকে মাছ খাইয়া বাঁচিতে হয়। মাছ ধরিবার নিমিত্ত অনেক কৌশল ও সন্তরণের প্রয়োজন হয়। এখানে যে কুম্ভীর গুলি অপেক্ষাকৃত বলবান ও সন্তরণপটু, তাহারাই বেশী মাছ ধরিতে পারিবে। নিতান্ত দুর্ব্বল ও অক্ষম গুলি আহারাভাবে ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া যাইবে, সুতরাং সবল গুলিরই বংশবৃদ্ধি হইবে একটী বৃক্ষে অনেক গুলি ফল একত্র জন্মিলে

যে ছানা গুলি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, তাহারা সবল ছানার চাপায় মৃতপ্রায় হইয়া যায়। একটী কুকুরের অনেক গুলি ছানা হইলে সবল গুলিই বেশী পরিমাণে দুধ খাইতে পায়। নিতান্ত দুর্ব্বল গুলি আহারাভাবে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া যায়। এইরূপ আপন আপন জীবন রক্ষার জন্য জীবগণ পরস্পর অহরহ বিষম যুদ্ধে ব্যাপৃত রহিয়াছে। মনুষ্যও এত বুদ্ধিবলে এইরূপ প্রতিযোগীতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। বরঞ্চ তাঁহার চেষ্টায় একদিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিবারণ হইয়া অন্যদিকে দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হইয়াছে। অর্থ ব্যবহার শাস্ত্রের এত উন্নতি হইয়াও ইংলণ্ডে দরিদ্রের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। কোনও স্থানে দুর্ভিক্ষ হইলে যে সর্ব্বাপেক্ষা নির্ধন ও অক্ষম, সেই অগ্রে বিনষ্ট হয়। কোনস্থানে রোগবিশেষ প্রবল হইলে যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল, সেই অগ্রে আক্রান্ত হয়। যদিও মনুষ্য নানারূপ উপায়দ্বারা প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে চেষ্টাপান, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা পূর্ণ মাত্রায় সফল হয় না। যে হেতু প্রকৃতি সর্ব্ব শক্তিময়ী। মনুষ্য তাঁহার অন্ধ খঞ্জ ও দুর্ব্বল ভ্রাতাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা পান বটে কিন্তু এমন কোন ঔষধ ও উপায় নাই যদ্দ্বারা জন্মাবধি দুর্ব্বল ব্যক্তিকে সবল করা যাইতে পারে। যদিও এরূপ কোন ব্যক্তি বিশেষকে বাঁচাইয়া রাখা যায়, কিন্তু তাহার বংশ ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া শীঘ্রই সমূলে ধ্বংশ হয়। এ জগতে যিনি অধিক বুদ্ধিমান্ ও বলবান্ তিনিই অন্ন করিয়া খাইতে পারেন। কে কবে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, যে ছাগ মস্তক বিকলাঙ্গ পুরুষ ধনপুত্রে লক্ষ্মীশ্বর হইয়াছে। বিকলাঙ্গ অন্ধ খঞ্জ চিরদুর্ব্বল লোক ও পশুর সংখ্যা এজগতে কয়টী? মনুষ্য সকলকে সমান করিতে গিয়া প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের সহায়তা করেন, একরূপ অনিষ্টের প্রতিবিধান করিতেগিয়া আর এক অনিষ্ট আনিয়া ফেলেন। যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া অন্যের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া নিজের উদর পূরণ করাই জীবের ধর্ম্ম, সভ্য মনুষ্যও এই জীবধর্ম্মের অধীন। আমরা আমাদিগের প্রতিবেশীকে বঞ্চিত করিয়া অন্ন আহার করি। মনুষ্যের যত আইন কানুন ব্যবস্থা সমস্তই নির্ব্বাচন প্রণালীর সহায়। ইউ-

নিভারসেটি তাহার দৃষ্টান্ত। দরিদ্র আপন রক্ত শোষণ করিয়া ধনীর উদর পোষণ করিতেছে। ধনীর শিশু সন্তানকে বাঁচাইবার জন্য দরিদ্র রমণী, ধাত্রী নাম ধারণ করিয়া তাহার নিজের সন্তানের পেয় অপরকে দান করিতেছে। তাহার নিজের সন্তানটী দুগ্ধাভাবে ক্ষীণ হইতেছে। জীব ও উদ্ভিদ মধ্যে বংশ বৃদ্ধি এত অধিক যে সকলে একস্থানে থাকিতে গেলে যে গুলি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান ও উপযুক্ত তাহারাই যুদ্ধে জয়ী হইয়া বাঁচিয়া থাকে এবং তাহাদের দুর্ব্বল প্রতিদ্বন্দ্বীরা বিনষ্ট হয়। এইরূপ যুদ্ধ কখনও স্বজাতিতে স্বজাতিতে সংঘটিত হইতেছে। কখনও বা একজাতিকে অপর জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে হইতেছে, কখনও বা কোন জাতিকে অপর জাতির সহিত যুদ্ধ না করিয়া স্থানীয় জলবায়ু ও অন্যান্য সাংসারিক অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিতে হইতেছে। বিবাহের দিকে দেখিতে গেলেও এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্ব্বল ও অনুপযুক্ত ব্যক্তির বংশলোপ হয় দুই কারণে, (১) দুর্ব্বল ব্যক্তি স্ত্রীলাভে বঞ্চিত থাকে সুতরাং বংশবৃদ্ধি করিবার সুযোগ পায় না। (২) স্ত্রীলাভ করিতে পাইলেও তাহার সন্তান সন্ততি সংখ্যায় বেশী হয় না, এবং পুরুষানুক্রমে দুর্ব্বল হইয়া তাহার বংশ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়।

ইতর জন্তুর মধ্যে বিবাহ বিষয়ে এইরূপ প্রতিযোগিতা সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়াযায়। যে জন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বলবান সেই যুদ্ধে অপর প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারাইয়া দিয়া সমস্ত স্ত্রীগুলি অগ্রে দখল করিয়া লয়। ইতর জন্তুর মধ্যে বিবাহ বিষয়ে স্ত্রীপুরুষের গুণ বিচার ও রূপ বিচার পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান। কোকিলের কূজন, ময়ূরের নৃত্য এ গুলি কেবল স্ত্রীলাভের জন্য। পারাবত ও ঘুঘু তাহাদের স্ত্রীর কাছে কেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করে! স্ত্রী পারাবত সেই নৃত্য দেখিয়া যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা পছন্দ হয় তাহাকেই গ্রহণ করে। অনেক পতঙ্গের মধ্যে দেখা যায় দুইটী পুং পতঙ্গ পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। স্ত্রী পতঙ্গটী চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। পরে যে পুং পতঙ্গটী যুদ্ধে জয়ী হয় সেই তাহারই সহিত স্ত্রী পতঙ্গটী বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়। পক্ষীর সঙ্গীত ও তাহার মনোহররূপ এ গুলির সৃষ্টি হইয়াছে কিজন্য?

কেবল স্ত্রী পাইবার ও বংশ বৃদ্ধি করিবার জন্য। উদ্ভিদ মধ্যেও এই নিয়ম দেখা যায়। আমরা মনে করি নানাবিধ সুন্দর ও সুগন্ধ পুষ্প কেবল আমাদের নয়ন ও মন প্রসন্ন করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক দেখিতে গেলে কোনও জীবের কোনও অঙ্গ বা অংশ তাহার নিজের উপকার ভিন্ন পরের উপকারের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। ফুল গুলি এত সুশ্রী হইয়াছে কেবল মক্ষিকা ও ভ্রমরের প্রীতির জন্য। কারণ মক্ষিকা ভিন্ন অনেক উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি হয় না। সুতরাং কোনও উদ্ভিদ বিশেষের যে ফুল গুলি বেশী সুশ্রী সুগন্ধ এবং মধু পূর্ণ, তাহাদেরই অগ্রে বিবাহ হয়। নিতান্ত কুশ্রী পুষ্প গুলি স্বামী প্রাপ্ত হয় না। এখন দেখা গেল ইতর জন্তুর মধ্যে যে স্ত্রী বা পুরুষ সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী ও যোগ্য, তাহারাই বিবাহ করিতে পায় সুতরাং তাহাদেরই বংশ থাকে। অনুপযুক্ত গুলি স্ত্রী বা স্বামী পাইলেও তাহাদের গর্ব্ভে দুর্ব্বল সন্তান হয়; কারণ দৌর্ব্বল্য পুরুষানুগত। এইরূপ কয়েক পুরুষের মধ্যেই অনুপযুক্ত গুলির বংশ লোপ হইয়া যায়। মনুষ্য নানাবিধ সামাজিক নিয়ম প্রণয়ন করিয়া এই প্রাকৃতিক বিবাহের অনেক অন্যথা করিয়াও সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পূর্ব্বে রাক্ষস বিবাহ প্রচলিত ছিল। তখন স্ত্রীলাভার্থে বরকে যুদ্ধ করিতে হইত। অনেক অসভ্য সমাজে এখনও এমন দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ সেই বেশী স্ত্রীলাভ করিতে পায়। স্ত্রীরাও ঐ সকল সমাজে বলবান্ গুলিকেই পছন্দ করে। রাজপুত রমণীরা বীর স্বামীই প্রার্থনা করিত। এখন বিবাহ বিষয়ে সমান ভাগ হইলেও সুশ্রী, কুশ্রী, বলবান্, দুর্ব্বল ইত্যাদি বিভেদ সভ্যসমাজে প্রচলিত রহিয়াছে। বিবাহ ব্যবস্থা প্রণয়নকারীরা বরের ও কন্যার যেরূপ উপযোগিতা ও অনুপযোগিতা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, সেই গুলিই পাঠ করিলেই এবিষয় উত্তমরূপে বুঝা যাইবে। যথা কপিলকেশা ও হীনাঙ্গী কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে না ইত্যাদি। মনুষ্যও ইতর জন্তুর ন্যায় রূপ ও গুণের পক্ষপাতী। এবং পশুদিগের ন্যায় যুদ্ধ না করিলেও বিলক্ষণ বাছাই করিয়া বিবাহ করে। যাহারা বিকলাঙ্গ ও কুরূপ বা অনুপযুক্ত

তাহাদের বিবাহ হয় না। হইলেও তত্তুল্য কুৎসিত ও অনুপযুক্ত বর বা কন্যার সহিত বিবাহ হয়। সুতরাং অনুপযুক্ত ব্যক্তিরা স্ত্রী বা স্বামী অভাবে বংশ বৃদ্ধি করিতে পারে না, আর সুযোগ ঘটিলেও প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সে বংশ বেশী দিনস্থায়ী হয় না। সংসারে এমন ঘটে যে দুর্ব্বল ও বিকলাঙ্গ ধনীর সন্তান, ধন মাহাত্ম্যে সুরূপা কন্যালাভ করিয়াছে এবং আজন্ম ব্যাধিগ্রস্তা ধনীর কন্যা কেবল টাকার জোরে ইন্দ্রতুল্য স্বামী লাভ করিয়াছে কিন্তু এরূপ স্থলেও ইহাদের বংশ বেশীদিন স্থায়ী হয় না। এখন বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে বাল্য বিবাহে কোন ব্যক্তিবিশেষের আংশিক অনিষ্ট হইলেও ইহা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির অবনতির কারণ কখনও হইতে পারে না। মনে কর নবীন বাল্য বিবাহ করিল। তাহার প্রথম সন্তান দুর্ব্বল হইল, যেহেতু সে অপরিণত বয়সের সন্তান। কিন্তু তারপর যে তিন চারিটী সন্তান হইল তাহারা পূর্ণ যৌবনের সন্তান সুতরাং তাহারা সবল হইয়া জন্মিল। সবল সন্তানের সংখ্যাই বেশী হইবে কারণ প্রথমত বয়সের ও বৃদ্ধ বয়সের মধ্যবর্ত্তী স্থান অনেক দীর্ঘ। একটী দুর্ব্বল সন্তানের স্থলে ৪টী ৫টী সবল সন্তান হইবে। এখন নবীনের চারিটী সবল সন্তান পুনর্ব্বার তাহাদের পিতার ন্যায় বাল্যবিবাহ করিল। এই চারিজনের প্রথমকার চারিটী সন্তান দুর্ব্বল হইয়া জন্মিল কিন্তু তার পর উহার প্রত্যেকের চারিটী পাঁচটী করিয়া সবল সন্তান জন্মগ্রহণ করিল, এইরূপে পুরুষানুক্রমে সবল লোকের সংখ্যাই বাড়িয়া চলিল। সুতরাং নবীনের বংশ অবনত হইল না। যে দু একটী দুর্ব্বল সন্তান হইয়াছিল তাহারা হয়ত জন্মাইয়াই মরিয়া গেল অথবা তাহাদের বংশস্থায়ী হইল না। আমি যেরূপ ধারা-বাহিক নিয়ম দেখাইলাম এইরূপ ধারাবাহিক নিয়মানুসারে ঠিক যে সংসারে কার্য্য হয় তাহা নহে তত্রাচ ইহাতেই অনেকটা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই কারণবশতঃই দুর্দ্ধর্ষ শিখ জাতি পুরুষানুক্রমে বাল্যবিবাহ করিয়াও সবল রহিয়াছে। আমাদের দেশস্থ অনেকেই তর্ক করিয়া থাকেন যে শিখেরা বাল্যবিবাহ করে না, যেহেতু তাহাদের

বালিকাদের সচরাচর ১৪। ১৫ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। কিন্তু শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মত ধরিতে গেলে চৌদ্দ পনর বৎসর বয়সেও শরীরের গঠন সম্পূর্ণ হয় না। পঁচিশ বৎসর বয়সের কম মনুষ্যের শরীর পূর্ণ হয় না। উহার পূর্ব্বে অনেক অস্থি কোমল থাকিয়া যায়। ১২ বৎসরের কম মনুষ্যের দন্তোদ্গমই সমাপ্ত হয় না। আবার এদিকে ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রম অতীত হইলেই আবার বল ও শক্তির হ্রাস হইতে থাকে। সুতরাং দেহতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মত ধরিতে গেলে মনুষ্যের কেবল মাত্র দশবৎসর কাল বিবাহিত থাকা উচিত; কিন্তু এইরূপ বৈজ্ঞানিক বিবাহ কোনও মনুষ্য সমাজে প্রচলিত নাই, হওয়াও সম্ভব নহে। শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, নিম্ন শ্রেণীর জীবগণেরও দেহ পূর্ণ হইতে অন্ততঃ তাহাদের জীবিত কালের এক পঞ্চমাংশ সময় অতিবাহিত হয়. কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর জীবগণ যে এইরূপ বৈজ্ঞানিক বয়স প্রাপ্ত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই সন্তানোৎপাদন করিতে থাকে, তাহা সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রাম্য জন্তুদিগের স্বভাব দেখিলেই এ বিষয় প্রত্যক্ষীভূত হইবে। যথা কুকুর ১৪। ১৫ বৎসর বাঁচিয়া থাকে, কিন্তু দুই বৎসর মধ্যেই কুকুরের সন্তান হইতে আরম্ভ হয়। গো জাতি ২০। ২২ বৎসর জীবিত থাকে, উহাদের তিন বৎসর পরেই সন্তান হইতে আরম্ভ হয়। ছাগল ভেড়া দশ বৎসর বাঁচে, উহাদের এক বৎসর পরই সন্তান হইতে আরম্ভ হয়। স্বাধীন ভাবে বিচরণকারী বন্য জন্তুর মধ্যেও দেহের পূর্ণতা প্রাপ্তির বহু পূর্ব্ব হইতেই জননশক্তির পরিচালনা আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষস্থ সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতির মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত দেখা যায়। সাঁওতালেরা ১৩ হইতে ১৬ বৎসরের মধ্যে পুত্রকন্যার বিবাহ দেয়।' ১৪ বৎসরের কন্যা স্বয়ম্বরা হইয়া থাকে, যাঁহারা বাল্যবিবাহের নাম শুনিয়া চমকিত হন, তাঁহারা বৃদ্ধবিবাহ নিবারণ করিবেন কিরূপে? যে ইংরেজসংসর্গ দোষে আমাদিগের চক্ষে বাল্যবিবাহ মহাপাপ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, সেই ইংরেজ সমাজে বৃদ্ধবিবাহ সচরাচর সংঘটিত হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বেই দেখান গিয়াছে বৃদ্ধ বিবাহের ও বালিকা

বিবাহের পরিণাম ফল একই; বরঞ্চ কিঞ্চিৎ বেশী। কারণ যৌবনের প্রারম্ভের কাল অপেক্ষা বৃদ্ধাবস্থাই বেশী দিন স্থায়ী। সুতরাং অপরিণত যৌবনে যদি একটী সন্তান হয়, তবে বৃদ্ধাবস্থায় দুইটী তিনটী সন্তান জন্মাইতে পারে এবং সচরাচর জন্মাইয়া থাকে। অতএব বৃদ্ধ বয়সে দুর্ব্বল সন্তান উৎপন্ন কারী ইউরোপীয় জাতি, কেন অবনত না হইয়া দিন দিন উন্নত হইতেছে? আইনের দ্বারা বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দিলেও বৃদ্ধ বয়সে ও রুগ্ন অবস্থায় সন্তানোৎপাদন কেহ বন্ধ করিতে পারেন না।

ক্রমশঃ—

শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্যাল এম, বি।

আয়ুর্ব্বেদ তত্ত্ব।

সাধারণ বিধি।

স্বাস্থ্যাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির পক্ষে মল, মূত্র, বমি, শুক্র, অধোবায়ু, ক্ষবথু, (হাঁচি), উদ্গার, জৃম্ভা, (হাই), ক্ষুধা, পিপাসা, বাষ্প, (নেত্রজল) নিদ্রা এবং পরিশ্রম-জন্য শ্বাস প্রভৃতির উপস্থিত বেগধারণ করা নিতান্তই অনুচিত। কারণ, ঐসমস্ত বেগধারণ করিলে নিম্ন লিখিতরূপ নানাবিধ শারীরিক পীড়া জন্মিতে পারে। (১)

---

(১) ন বেগান্ধারয়েদ্ধীমান্ জাতান্ মূত্রপুরীষয়োঃ। ন রেতসো ন বাতস্য নবম্যাঃ ক্ষবথোর্ন চ॥ নোদ্গারস্য ন জৃম্ভায়া ন বেগান্ ক্ষুৎ-পিপাসয়োঃ। ন বাষ্পস্য ন নিদ্রায়া নশ্বাসস্য শ্রমেণচ॥ এতান্ ধারয়তো জাতান্ বেগান্ রোগা ভবন্তি যে। পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসার্থং তম্মেনিগদতঃ শৃণু॥ (চরকঃ)

১। বিষ্ঠার বেগধারণ করিলে উদরে আটোপ, (গুড়্ গুড়্ শব্দ) ও শূল হয়। এবং মলদ্বারে ছেদনবৎ বেদনা, মলের বদ্ধতা, অধোগত বায়ুর উর্দ্ধ প্রবর্ত্তন হয়। এবং অধিককাল মলবদ্ধ থাকিলে বমন বেগে মুখদ্বারাও উক্ত মল নির্গত হইতে পারে।

৩। মূত্রের বেগধারণ করিলে বস্তিস্থানে (মূত্রাশয়ে) ও শিশ্নে, (পুরুষাঙ্গে) শূল, মস্তকবেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, বঙ্ক্ষণস্থানে বন্ধনবৎ বেদনা, এবং শরীরের নততা (বেদনার ক্লেশে সোজা ভাবে দাঁড়াইতে নাপারিয়া সম্মুখের দিকে ঢুলিয়া পড়া) জন্মে।

৩। স্খলিত শুক্রের বেগধারণ করিলে বস্তিস্থানে, মলদ্বারে, ও মুষ্কদ্বয়ে (অণ্ডকোষ) শোথ ও বেদনা হয়। এবং মূত্রেরোধ, শুক্রস্রাব, শুক্রজন্য-অশ্মরী (পাথুরী), মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত প্রভৃতি নানাবিধ কঠিন রোগ জন্মে।

৪। বমির বেগধারণ করিলে শরীরে কণ্ডু (চুলকানী) কোঠ, (অল্প-কাল স্থায়ী রক্তবর্ণ, চক্রাকার চিহ্ন বিশেষ) অরুচি, ব্যঙ্গ, (মুখের উপরি-ভাগস্থ চর্ম্মজাত কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন বিশেষ) শোথ, পাণ্ডুরোগ, জ্বর, কুষ্ঠ, বিসর্প, ও হৃল্লাস (বমনবেগ) জন্মে।

৫। অধঃপ্রবৃত্ত বায়ুর বেগধারণ করিলে মল, মূত্র ও বায়ুর বদ্ধতা জন্মে। উদরস্ফীত ও বেদনাযুক্ত এবং শরীর নিতান্ত ক্লান্ত হয় এবং বায়ু-জন্য অন্যান্য বিবিধ পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে।

---

(২) আটোপশূলৌ পরিকর্ত্তিকাচ সংঙ্গঃ পুরীষস্য তথোর্দ্ধবাতঃ। পুরীষমাস্যাদথবানিরেতি পুরীষবেগেঽভিহতে নরস্য॥ (সুশ্রুতঃ)

(৩) বস্তিমেহনয়োঃশূলং মূত্রকৃচ্ছ্রং শিরোরুজা। বিনামোবংক্ষণা-নাহঃ স্যাল্লিঙ্গং মূত্রনিগ্রহে॥ (চরকঃ)

(৪) মূত্রাশয়ে বৈগুদমুষ্কয়োশ্চ। শোথোরুজামূত্রবিনিগ্রহশ্চ। শুক্রাশ্মরীতৎশ্রবণনং ভবেচ্চ রাতে বিকারা বিহতে চ শুক্রে॥ (সুশ্রুতঃ)

(৫) কণ্ডুকোঠারুচিব্যাঙ্গ শোথপাণ্ড্বাময়জ্বরাঃ। কুষ্ঠবিসর্পহৃল্লাস-চ্ছর্দ্দিনিগ্রহজা গদাঃ॥ (চরকঃ)

৬। হাঁচির বেগধারণ করিলে গ্রীবাগত মস্তকধরা—শিরাদ্বয়ের স্তব্ধতা, শিরঃশূল, আর্দ্দিত ও অর্দ্ধাবভেদক রোগ, এবং ইন্দ্রিয় সমূহের দুর্ব্বলতা জন্মে।

৭। উদ্গারের বেগধারণ করিলে কণ্ঠদেশ ও মুখ, বায়ুদ্বারা পরিপূর্ণ ও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় এবং উচ্ছ্বাস, বায়ুর বদ্ধতা, কণ্ঠদেশে অব্যক্তশব্দ ও বায়ুজন্য হিক্কা শ্বাস প্রভৃতি ভয়ানক রোগ জন্মে।

৮। জৃম্ভার বেগধারণ করিলে গলদেশও তৎপশ্চাদ্ ভাগস্থ শিরাদ্বয়ের স্তব্ধতা, এবং বায়ু জন্য তীব্রতর শিরোরোগ, নেত্ররোগ, কর্ণরোগ, মুখরোগ ও নাসারোগ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ জন্মে।

৯। ক্ষুধার সময়ে অন্ন আহার না করিলে তন্দ্রা, শরীর বেদনা, অরুচি, শ্রান্তি ও দৃষ্টি শক্তির ক্ষীণতা জন্মে।

১০। পিপাসাকালে জলপান না করিলে কণ্ঠ ও মুখশোষ, শ্রবণশক্তির ন্যূনতা এবং বক্ষঃস্থলে বেদনা বোধ হয়।

---

(৬) বাতমূত্রপুরীষাণাং সঙ্গাধ্মানং ক্লমোরুজা। জঠরে বাতজা- শ্চান্যে রোগাঃ স্যুর্বাতনিগ্রহাৎ ॥ (চরকঃ)

(৭) মন্যাস্তম্ভঃ শিরঃশূলমর্দিতার্দ্ধাবভেদকৌ। ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ দৌর্ব্বল্যং ক্ষবথোঃ স্যাদ্বিনিগ্রহাৎ ॥ (চরকঃ)

(৮) কণ্ঠাস্যপূর্ণত্বমতীব তোদঃ। কূজশ্চবায়োরথবাপ্রবৃত্তিঃ। উদ্গারবেগেঽভিহতে ভবন্তি ঘোরা বিকারাঃ পবনপ্রসূতাঃ ॥

(সুশ্রুতঃ)

(৯) মন্যাগলস্তম্ভঃ শিরোবিকারাঃ। জৃম্ভোপঘাতাৎ পবনা- ত্মকাঃস্যুঃ। তথাক্ষিনাসা বদনাময়াশ্চ ভবন্তি তীব্রাঃ সহ কর্ণরোগৈঃ ॥

(সুশ্রুতঃ)

(১০) তন্দ্রাঙ্গমর্দ্দাবরুচিঃ শ্রমশ্চ। ক্ষুধাভিঘাতাৎকৃশতাচ দৃষ্টেঃ ॥

(সুশ্রুতঃ)

(১১) কণ্ঠাস্যশোষঃ শ্রবণাবরোধঃ। তৃষ্ণাভিঘাতাৎ হৃদয়ে ব্যথাচ ॥

(সুশ্রুতঃ)

১১। আনন্দ-জন্য অথবা শোকজন্য প্রবর্ত্তমান নেত্রজলের বেগধারণ করিলে মস্তকের গুরুত্ব, পীনস (সর্দ্দি) এবং বিবিধ প্রকার নেত্ররোগ জন্মে।

১২। উপস্থিত নিদ্রার বেগধারণ করিলে জৃম্ভা, (হাই) শরীর-বেদনা, চক্ষুঃ ও মস্তকের গুরুত্ব ও তন্দ্রা জন্মে। (১৩)

১৩। অতি পরিশ্রম জনিত নিশ্বাসের বেগধারণ করিলে মেহ, গুল্ম ও হৃদ্রোগ জন্মিতে পারে।

সকল প্রাণীই সুখাভিলাষী, যে কোন ব্যক্তি যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহার মূল সুখলিপ্সা। কিন্তু ধর্ম্মানুগত কার্য্যভিন্ন স্থায়ী সুখ লাভ হইতে পারে না। অতএব প্রত্যেক মনুষ্যেরই ধর্ম্ম পরায়ণ হওয়া উচিত।

হিংসা, চৌর্য্য, অবৈধকামসেবা, পরস্পরের বিবাদজনকবাক্য, কর্কশবাক্য, মিথ্যাবাক্য, অসম্বদ্ধ বাক্য, প্রাণিঘাতনচিন্তা, পরগুণাসহিষ্ণুতা এবং এতদ্ভিন্ন শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ব্যবহার পাপকার্য্য বলিয়া পরিগণিত। সুখাভিলাষী ব্যক্তির সর্ব্বথা উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করা বিধেয়।

পূর্ব্বভুক্ত বস্তু সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হইয়াছে বোধ করিলে হিতজনক পরিমিত আহার করিবে। মলমূত্রাদির বেগ উপস্থিত না হইলে বলপূর্ব্বক তাহা স্বাভাবিক অবস্থায় নির্গত করিবার চেষ্টা করিবে না। এবং মলমূত্রের

---

(১২) আনন্দজং বাপ্যথ শোকজং বা নেত্রোদকং প্রাপ্ত মমুঞ্চতো হি। শিরোগুরুত্বং নয়নাময়াশ্চ ভবন্তি তীব্রাঃ সহ পীনসেন॥

(সুশ্রুতঃ)

(১৩) জৃম্ভাঙ্গমর্দ্দোহঙ্গ শিরোঽক্ষিজাড্যং নিদ্রাভিঘাতাদথবাপি তন্দ্রা॥ (সুশ্রুতঃ)

(১৪) শ্রান্তস্য নিশ্বাসবিনিগ্রহেন হৃদ্রোগমোহাবথবাপি গুল্মঃ॥

(সুশ্রুতঃ)

বেগ উপস্থিত হইলে তাহা নিঃসারণ না করিয়া এবং সাধ্যরোগের শান্তি না করিয়া অন্য কোন কার্য্য করিবে না। (১৫)

পাদ যুগল ও মলায়তন (চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, মলদ্বার ও শিশ্ন) সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখা, এবং এক পক্ষ মধ্যে তিনবার কেশ, শ্মশ্রু, নখ ও লোম কর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

সন্ধ্যাকালে ভোজন. অধ্যয়ন, নিদ্রা ও রতিক্রিয়া একান্ত অকর্ত্তব্য।

পরস্ত্রীতে অভিলাষী ও পরশ্রীতে বিদ্বেষী হওয়া অনুচিত্।

কাহারও দোষ কিংবা গুপ্ত কথা অন্য কাহারও নিকটে প্রকাশ করা অনুচিত। এবং কাহারও সহিত শক্রতা করা অনুচিত।

লোভী, মূর্খ, বালক, বৃদ্ধ, ক্লিষ্ট ও ক্লীব ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব করা নিষিদ্ধ। এবং মদ্যপান, দ্যূতক্রীড়া ও বেশ্যাশক্তি সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। (১৬)

ভগ্নগৃহ, শ্মশান, শূন্যগৃহ ও বিজন অরণ্যে বাস করা, কিংবা অগ্নি, যুদ্ধ, কলহ, সর্প, কীট ও হিংস্র জন্তুর সন্নিকটে গমন করা অনুচিত।

অগ্নি, গো, গুরু, ব্রাহ্মণ ও দম্পতির মধ্যদিয়া গমন করা নিষিদ্ধ।

---

(১৫) সুখার্থাঃ সর্ব্বভূতানাং মতাঃ সর্ব্বা প্রবৃত্তয়ঃ। সুখং চ ন বিনাধর্ম্মাত্তস্মাদ্ধর্ম্মপরোভবেৎ। হিংসাস্তেয়ান্যথা কামং পৈশুন্যং পরুষানৃতে। সম্ভিন্নালাপ ব্যাপাদমভিধ্যাদৃগ্বিপর্য্যয়ং। পাপংকর্ম্মেতিদশধা কায়বাঙমানসৈস্ত্যজেৎ। জীর্ণেহিতং মিতংচাদ্যান্নবেগন্নীরয়েদ্বলাৎ। নবেগিতোহন্য কার্য্যঃ স্যান্নাজিত্বা সাধ্যমাময়ং। (বাভটঃ)

(১৬) মলায়তনেষভিক্ষ্ণং পাদয়োশ্চ বৈমল্যমাদধ্যাৎ। ত্রিঃপক্ষমস্য কেশ শ্মশ্রুলোমনখান্ সংহারয়েৎ। ন সন্ধ্যাস্বভ্যবহারাধ্যয়নস্ত্রী স্বপ্ন-সেবীস্যাৎ। ন বালবৃদ্ধলুদ্ধমূর্খক্লিষ্ট ক্লীবৈঃ সহ সখ্যং কুর্য্যাৎ। ন মদ্যদ্যূত বেশ্যাপ্রসঙ্গরুচিঃস্যাৎ, ন গুহ্যং বিবৃণুয়াৎ। নান্যস্ত্রিয়মভিলষেৎ। নান্যশ্রিয়ং ন বৈরং রোচয়েৎ। নান্যদোষান্ ব্রুয়াৎ॥ (চরকঃ)

অন্য কর্ত্তৃক ব্যবহৃত মাল্য, ছত্র, পাদুকা, অলঙ্কার ও বস্ত্র ব্যবহার এবং অপবিত্র শরীরে গো, ব্রাহ্মণ ও অগ্নি স্পর্শ নিষিদ্ধ।

চতুষ্পথ, গ্রাম, নগর, দেবালয়, শ্মশান ও জলাশয়ের পথে এবং প্রকাশ্যস্থানে মল মূত্রপরিত্যাগ করা অনুচিত।

মুখদ্বারা অগ্নিফুৎকার, প্রতীকূল বায়ুসেবা, ভুক্তমাত্রে অগ্নিসেবা, ভগ্ন-পাত্রে, কিংবা অঞ্জলিপুটে জলপান, অধোমস্তকে শয়ন, অবর্ত্তব্য। (১৭)

শত্রু বা গণিকা কর্ত্তৃক প্রদত্ত অন্ন খাওয়া, কাহারও প্রতিভূ (জামিন্) হওয়া, বৃথা সাক্ষ্য প্রদান করা, পণ রাখিয়া কোন কার্য্য করা, স্ত্রীলোক-দিগকে অত্যন্ত বিশ্বাস করা বা অত্যন্ত স্বাধীনতা প্রদান করা অনু চিত। (১৮)

রাহুগ্রস্ত কিংবা প্রথম উদয়োন্মুখ বা অস্তগমনোন্মুখ, অথবা জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের দিকে অধিকক্ষণ নিরীক্ষণ করা অবৈধ।

নিরন্তর অতিসূক্ষ্ম, অথবা অতিপ্রদীপ্ত, বা অপবিত্র বা অপ্রিয় বস্তু দর্শন, বলবান ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ, মস্তকে ভারবহন, গাত্রবাদন, কেশ বিকী-

(১৭) ভিন্ন শূন্যাগার শ্মশান বিজনারণ্য বাসাগ্নি সংভ্রম ব্যালভুজঙ্গ-কীট সেবাশৃঙ্গিসন্নিকর্ষাংশ্চ পরিহরেৎ। (সুশ্রুতঃ)

নাগ্নি গো-গুরু ব্রাহ্মণ দম্পত্যন্তরেণাভিযায়াৎ। (সুশ্রুতঃ)

স্রজশ্ছত্রোপানহৌ কণকমতীতবাসাংসী ন চান্যৈর্ধৃতানি ধরেয়েৎ। ব্রাহ্মণমগ্নিং গাঞ্চ নোচ্ছিষ্টঃ স্পৃশেৎ (ঐ)

ন বহির্বেগান্ গ্রামনগরদেবায়তন শ্মশান্ চতুষ্পথ সলিলাশয়পথি-সন্নিকৃষ্টানুৎসৃজেৎ ন প্রকাশং। নাগ্নিং মুখেনোপধমেৎ। নপ্রতিবাতা-তপং সেবেত। ন ভুক্তমাত্রোমগ্নিমুপাসীতি নাবাকৃশিরাঃ শয়ীত। ন ভিন্ন পাত্রে নাঞ্জলিপুটে নাপঃ পিবেৎ। (সুশ্রুতঃ)

(১৮) রিপোরন্নং ন ভুঞ্জীত গণিকান্নমপি ক্বচিৎ। প্রতিভূর্নভবেৎ ক্বাপি ন চ সাক্ষী বৃথা ভবেৎ। স্থাগীন্ন ধারয়েজ্জাতু দূরাৎদ্যূতং পরিত্য-জেৎ। বিশ্বাসং নাচরেৎ স্ত্রীণাং তাঃ স্বতন্ত্রাশ্চ না চরেৎ।

(ভাবপ্রকাশঃ)

রণ, নাসিকা বিঘট্টন, বক্রভাবে বা ঊর্দ্ধজানু হইয়া অবস্থিতি, নখদ্বারা মৃত্তিকা বিলেখন বা তৃণচ্ছেদন, বাহুদ্বারা নদী সন্তরণ, সন্দেহযুক্ত নৌকা বা বৃক্ষে আরোহণ, কিংবা দুষ্ট অশ্ব, হস্তিপ্রভৃতি বাহনে আরোহণ, কাহারও নিকটে আপনাকে কাহারও শত্রু কিংবা অন্য কাহাকেও আপনার শত্রু বলিয়া প্রকাশ করা অকর্ত্তব্য। আত্ম-অপমান বা প্রভুর স্নেহশূন্যতা কাহাকেও জ্ঞাত করা অনুচিত। অপকারক ব্যক্তিরও উপকার করা কর্ত্তব্য এবং সর্ব্বভূতে আত্মবৎ দৃষ্টি, শত্রুর নিকট হইতে দূরে অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য। যাচকদিগকে বিমুখ বা অপমানিত করা অনুচিত।

সাধুব্যক্তির সহিত মিত্রতা ও সংসর্গ এবং সাধু ব্যক্তির প্রতি স্নেহ প্রদর্শন কর্ত্তব্য। অসৎসংসর্গ একেবারেই পরিত্যাগ করা বিধেয়।

যথাকালে পরিমিত, হিতকারক, পরস্পর অবিরোধী, সত্য ও মধুর বাক্য বলা সমুচিত। (১৯)

নিদ্রা, জাগরণ, শয়ন, উপবেশন, চংক্রমণ, কিংবা নৌকা, অশ্ব, হস্তি প্রভৃতি যানে বাহনে গমনাগমন, ধাবন, লঙ্ঘন, সন্তরণ, হাসা, বাক্যকথন

---

(১৯) নোপরক্তং নচোদ্যন্তং নাস্তং যান্তং দিবাকরং। সর্ব্বথা ন সমীক্ষেত ন জলে প্রতিবিম্বিতং। নেক্ষেত সততং সূক্ষ্মং দীপ্তা মেধ্যাপ্রিয়াণিচ। নেচ্ছেৎ বলবতা যুদ্ধং ন ভারং শিরসা বহেৎ। গাত্রং ন বাদয়েৎ কেশান্‌হস্তেন ধূনুয়ান্নচ। নোর্দ্ধজানুশ্চিরং তিষ্ঠেৎ ননখেন লিখেদ্ভুবং। ননখেন তৃণং ছিন্দ্যাৎ নদীতরেন্নবাহুভ্যাং, সন্দিগ্ধনাবং বৃক্ষঞ্চ নারোহেৎ দুষ্টযানকং। ন কিঞ্চিদাত্মনঃ শত্রুং নাত্মানং কস চিদ্‌রিপুং। প্রকাশয়েন্নাপমানং নচ নিঃস্নেহতাং প্রভোঃ। অপকার পরেহপিস্যাদুপকারপরঃ পুমান্‌। আত্মবৎ সকলান্‌ পশ্যেৎ বৈরিণো দূরতো বসেৎ। বিমুখান্নার্থিনঃ কুর্য্যান্নাবমন্যেতকানপি। মৈত্রীং সদ্ভিঃ সমং কুর্য্যাৎ স্নেহং সংস্তুতু সর্ব্বথা। সংসর্গং সাধুভিঃ কুর্য্যাদসংসঙ্গং পরিত্যজেৎ। কালে হিতং মিতং সত্যং সম্বাদি মধুরং বদেৎ।

(ভাবপ্রকাশঃ)

ব্যায়াম (কুস্তি) ও রতিক্রিয়াপ্রভৃতি উচিত কার্য্যও অতিশয় সেবন করা অনুচিত। কাহারও যদি কোন অনুচিত ব্যবহার অভ্যস্ত হইয়া থাকে, তবে তাহা হইতে ক্রমশঃ বিরত হওয়া কর্ত্তব্য। এবং অনভ্যস্ত হিতকারক ব্যবহার ক্রমশঃ অভ্যস্ত করা কর্ত্তব্য॥ (২০)

ঋতুচর্য্যা।

আর্য্য পণ্ডিতগণ সংবৎসরকে ছয় ঋতুতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা— হেমন্ত, শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎ। তন্মধ্যে অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত। মাঘ ও ফাল্গুন শিশির। চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম। শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষা এবং আশ্বিন ও কার্ত্তিক শরৎ নামে অভিহিত হইয়াছে। (১)

শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্ম এই ঋতুত্রয় ব্যাপক কালকে উত্তরায়ণ বা আদান বলা যায়। এই সময়ে সূর্য্য উত্তরদিকে সরিয়া অয়ন (গমন) করেন এবং অত্যন্ত তীব্র কিরণদ্বারা পৃথিবীর জলীয়াংশ আদান (গ্রহণ) করিয়া থাকেন। এই কাল স্বভাবতঃ আগ্নেয়।

বর্ষা শরৎ ও হেমন্ত এই ঋতুত্রয় ব্যাপক কালকে দক্ষিণায়ণ বা বিসর্গ বলা যায়। এই কালে সূর্য্য দক্ষিণদিকে সরিয়া অয়ন (গমন)। এবং

---

(২০) ন স্বপ্নজাগরণ শয়নাসন চংক্রমণ যানবাহন প্রধাবনলঙ্ঘন-প্লবনপ্রতরণহাস্যভাষ্যব্যবায়ব্যায়ামাদীনুচিতানপ্যতি সেবেত। উচিতাদপ্যহিতাং ক্রমশো বিরমেৎ। হিতমনুচিতমপ্যাসেবেত ক্রমশো নচৈকান্ততঃ পাদহীনাৎ। (সুশ্রুতঃ)

(১) তত্র মাঘাদয়ঃ দ্বাদশমাসাঃ দ্বিমাসিকমৃতুং কৃত্বা ষড়্‌তবো ভবন্তি। তেশিশির বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা শরদ্ধেমন্তাঃ। তেষাং তপস্তপস্যৌ শিশিরঃ। মধুমাধবৌ বসন্তঃ। শুচিশুক্রৌ গ্রীষ্মঃ। নভোনভস্যৌ বর্ষা। ইষোর্জ্জৌ শরৎ। সহঃ সহস্যৌ হেমন্তঃ॥ (সুশ্রুতঃ)

বৃষ্টি ও শিশিরাদি বিসর্গ (বর্ষণ) দ্বারা পৃথিবী সমধিক শীতলা ও রসযুক্তা হয়। এই কাল স্বভাবতঃ সৌম্য (শীতল)। (২)

বিসর্গকালের আদি বর্ষা এবং আদান কালের অন্ত গ্রীষ্ম। এই ঋতুকালে মনুষ্যগণ স্বভাবতঃ হীনবল হইয়া থাকে। এবং বিসর্গকালের মধ্যবর্ত্তী শরৎ এবং আদান কালের মধ্যবর্ত্তী বসন্ত, এই দুই ঋতুকালে মনুষ্যগণ স্বভাবতঃ মধ্যবলযুক্ত হইয়া থাকে। এবং বিসর্গকালের অন্ত হেমন্ত ও আদান কালের প্রথম শিশির, এই দুই ঋতুকালে মনুষ্যগণ স্বভাবতঃ উত্তমবলশালী হইয়া থাকে। (৩)

হেমন্তচর্য্যা।

হেমন্তকালে শীতল বায়ু সংস্পর্শে অভ্যন্তর সংরুদ্ধ জঠরাগ্নি অত্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং গুরুপাক দ্রব্য কিংবা অধিক মাত্রায় আহার করিলেও তাহা অনায়াসে জীর্ণ হইয়া থাকে। উক্ত প্রদীপ্ত জঠরাগ্নি উপযুক্ত পচনীয় দ্রব্য না পাইলে শরীরস্থ জলীয় ধাতুকে শোষণ করিয়া থাকে, জলীয় ধাতুর শোষণ হেতু বায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হইয়া নানাবিধ অসুখ উৎপাদন করে। অতএব হেমন্তকালে অধিকপরিমাণে স্নিগ্ধ, অম্ল ও লবণ রসবিশিষ্ট দ্রব্য এবং ঔদক (কচ্ছপাদি) মাংস, অভ্যাসানুসারে আনূপ (বরাহাদি) মাংস. বিলেশয় (শজারু প্রভৃতি) মাংস প্রসহ (শ্যেন, কোরাল প্রভৃতি পক্ষী) মাংস এবং নূতন অন্ন ভক্ষণ ও

---

(২) ইহ খলু ষড়ঙ্গমৃতুবিভাগেন বিদ্যাৎ। তদাদিত্যস্যোদগয়নঃ আদানঞ্চ ত্রীনৃতূন্ শিশিরাদীন্ গ্রীষ্মান্তান্ ব্যবস্যেৎ। বর্ষাদীন্ পুনর্হেমন্তান দক্ষিণায়নং বিসর্গঞ্চ। বিসর্গঃ সৌম্যঃ আদানং পুনরাগ্নেয়ং তত্র রবির্ভাভিরাদদানো জগতঃ স্নেহং বর্ষাশরদ্ধেমন্তেষু তু দক্ষিণাভিমুখেঽর্কে কালমার্গে . মেঘবাতবর্ষাভিহতপ্রতাপে শশিনি চাব্যাহতবলে মাহেন্দ্রসলিলপ্রশান্ততাপে জগতীত্যাদি॥ (চরকঃ)

মদ্য, দুগ্ধ, ইক্ষুরস, বসা তৈল ও উষ্ণ জল পান করা কর্ত্তব্য।

এই কালে গাত্রে তৈলমর্দ্দন ও ঔষধ চূর্ণ দ্বারা গাত্র মার্জ্জন,রৌদ্রসেবা সুসংবৃত ও উষ্ণগৃহে বাস এবং শাল, বনাত, কম্বল প্রভৃতি রোমজাত গুরু ও উষ্ণ বস্ত্র এবং তসর, গরদ প্রভৃতি কৌষেয় বস্ত্র যথাযোগ্য পরিমাণে, অঙ্গাবরণে, শয়নে ও আসনে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

এই কালে লঘু ও বায়ুবর্দ্ধক অন্ন ও পান, অল্প আহার, উদমন্থ (দ্রব দ্রব্য দ্বারা আলোড়িত থৈ প্রভৃতির চূর্ণ) ভক্ষণ ও পূর্ব্বদিকের বায়ু সেবন অত্যন্ত নিষিদ্ধ। (৪)

শিশিরচর্য্যা।

হেমন্ত ও শিশির কাল প্রায় তুল্যরূপ। অতএব শিশির কালে ও হেমন্ত কালের ন্যায় আহার ব্যবহার করিবে। বিশেষ এই যে শিশির

---

(৩) আদাবন্তে চ দৌর্ব্বল্যং বিসর্গাদানয়োর্ন্ণাং। মধ্যে মধ্যবলং ত্বন্তে শ্রেষ্ঠমগ্রে চ নির্দ্দিশেৎ॥ (চরকঃ)

(৪) শীতে শীতানিলস্পর্শ সংরুদ্ধো বলীনাং বলী। পক্তা ভবতি হেমন্তে মাত্রাদ্রব্যগুরুক্ষমঃ। স যদা নেন্ধনং যুক্তং লভতে দেহজং তদা। রসং হিনস্ত্যতো বায়ুঃ শীতঃ শীতে প্রকুপ্যতি। তস্মাত্তুষার সময়ে স্নিগ্ধাম্ললবণান্ রসান্। ঔদকানূপমাংসানাং মেধ্যানামুপযোজয়েৎ। বিলেশয়ানাং মাংসানি প্রসহানাং ভৃতানি চ। ভক্ষয়েন্মদিরাং সীধুং মধু চানুপিবেন্নরঃ। গোরসানিক্ষুবিকৃতীর্বসাং তৈলং নবোদনং। হেমন্তেহভ্যস্যতস্তোয়মুষ্ণং চায়ুর্নহীয়তে। অভ্যঙ্গোৎসাদনং মূর্দ্ধ্নি তৈলং জৈন্তকেমাতপং। ভজেৎ ভূমিগৃহং চোষ্ণমুষ্ণং গর্ভগৃহং তথা। শীতে সুসংবৃতং সেব্যং যানং শয়নমাসনং। প্রাবারাজিন কৌষেয় প্রবেণী কুথকাস্তৃতং। গুরূষ্ণবাসা দিগ্ধাঙ্গো গুরুণাগুরুণা সদা। বর্জ্জয়েদন্নপানানি লঘূনি বাতলানি চ। প্রবাতং প্রমিতাহারমুদমন্থং হিমাগমে॥

(চরকঃ)

ঋতু আদান কালের অন্তর্গত বলিয়া হেমন্ত ঋতু অপেক্ষায় কিঞ্চিৎ রুক্ষ এবং বায়ু বৃষ্টি বর্ষণহেতু অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়া থাকে বলিয়া হৈমন্তিক বাসগৃহ অপেক্ষায় অধিক উষ্ণ ও নির্ব্বাত বাস গৃহে অবস্থিতি করিবে। এবং কটু, তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত, বায়ুবর্দ্ধক, লঘু ও শীতল অন্নপান একেবারেই পরিত্যাগ করিবে। (৫)

বসন্তচর্য্যা।

হেমন্ত কালে মনুষ্য শরীরে স্বভাবতঃই অধিক কফ সঞ্চিত হইয়া থাকে, ঐ সঞ্চিত কফ বসন্তকালে সূর্য্যের প্রখর কিরণ দ্বারা প্রকুপিত হইয়া জঠরাগ্নিকে মন্দীভূত করে। সুতরাং এই সময়ে মন্দাগ্নিজনিত নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব বসন্তকালে বমন প্রভৃতি সংশোধন কার্য্য দ্বারা কফ দোষের শান্তি করা কর্ত্তব্য। এবং এই কালে ব্যায়াম, উদ্বর্ত্তন (ঔষধ চূর্ণ দ্বারা গাত্র মার্জ্জন), ধূমপান, কবলধারণ, নেত্রে অঞ্জন ব্যবহার, ঈষদুষ্ণ জলে শৌচাদি কার্য্য, অগুরুচন্দন দ্বারা গাত্র লেপন, যব ও গোধূমের অন্ন, শশক ও হরিণ প্রভৃতির মাংস, সীধু বা মাধ্বীক নামক মদ্য পরিমিত রূপে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। বসন্তকালে গুরুপাক, স্নিগ্ধ, মধুর ও অম্লপাক দ্রব্য ভোজন ও দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ। (৬)

---

(৫) হেমন্তে শিশিরে তুল্যে শিশিরেঽল্পং বিশেষণং। রৌক্ষ্যমাদানজং শীতং মেঘমারুতবর্ষজং। তস্মাদ্ধৈমন্তিকঃ সর্ব্বঃ শিশিরে বিধিরিষ্যতে। নিবাতমুষ্ণমধিকং শিশিরে গৃহমাশ্রয়েৎ। কটুতিক্তকষায়াণি বাতলানি লঘূনি চ। বর্জ্জয়েদন্নপানানি শিশিরে শীতলানি চ॥ (চরকঃ)

(৬) হেমন্তে নিচিতঃ শ্লেষ্মাদিনকৃদ্ভিরীরিতঃ। কায়াগ্নিং বাধতে রোগাংস্ততঃ প্রকুরুতে বহূন্। তস্মাদ্বসন্তে কর্ম্মাণি বমনাদীনি কারয়েৎ। ব্যায়ামোদ্বর্ত্তনং ধূমং কবলগ্রহমঞ্জনং। সুখাম্বুনা শৌচবিধিং শীলয়েৎকুসুমাগমে। চন্দনাগুরুদিগ্ধাঙ্গো যবগোধূমভোজনঃ। শারভং শশমৈণেয়ং মাংসং লাবকপিঞ্জলং। ভক্ষয়েন্নির্গদং সীধু পিবেন্মাধ্বীকমেব বা। গুর্ব্বম্লস্নিগ্ধমধুরং দিবাস্বপ্নঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥ (চরকঃ)

গ্রীষ্মচর্য্যা।

গ্রীষ্মকালে দিবাকর প্রখর কিরণ দ্বারা পৃথিবীর স্নেহ ভাগকে শোষণ করেন, এই হেতু এই কালে মধুর, শীতল, দ্রব ও স্নিগ্ধ অন্নপান, জাঙ্গল পশু ও পক্ষীর মাংস, ঘৃত, দুগ্ধ, হৈমন্তিক আমন ধান্যের অন্ন, চিনি মিশ্রিত সুশীতলমন্থ (দ্রব দ্রব্য দ্বারা আলোড়িত খৈর চূর্ণ), সেবন করিবে।

গ্রীষ্মকালে মদ্যপান, লবণ, অম্ল, কটু ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজন ও ব্যায়াম কার্য্য একেবারেই নিষিদ্ধ। (৭)

বর্ষাচর্য্যা।

বর্ষাকালে মৃত্তিকা হইতে একপ্রকার দূষিত বাষ্প, উত্থিত হইয়া থাকে। ঐ বাষ্পোদ্গম ও নূতন বৃষ্টি বর্ষণ হেতু এবং পীতজলের অম্ল-পাক হেতু বর্ষাকালে স্বভাবতঃই অগ্নিমান্দ্য হইয়া বায়ু পিত্ত ও কফের প্রকোপ জন্মায়। অতএব এই কালে অগ্নিবর্দ্ধক ও বাতাদি দোষ নিবারক আহার ব্যবহার করিবে। এবং পুরাতন যব, গোধূম ও হৈমন্তিক আমন ধান্যের অন্ন, হরিণ প্রভৃতি জাঙ্গল জন্তুর মাংস, এবং স্নিগ্ধ, অম্ল ও লবণরসযুক্ত দ্রব্য ভোজন করিবে। গাঙ্গ নামক নির্দ্দোষ বৃষ্টির জল উষ্ণ করিয়া শীতল হইলে ঐ জল কিম্বা কূপ বা সরোবরের জল স্নান ও পানে ব্যবহার করিবে।

চন্দনাদি সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা গাত্রলেপন, উদ্বর্ত্তন, পরিষ্কৃত লঘু বস্ত্র পরিধান, এবং শুষ্ক স্থানে বাস করিবে। এবং প্রায়শঃ পানীয় ও ভোজ্য বস্তু মধ্যে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া খাওয়া কর্ত্তব্য।

---

(৭) ময়ূখৈর্জগতঃ সারং গ্রীষ্মে পেপীয়তে রবিঃ। স্বাদুশীতং দ্রবং স্নিগ্ধমন্নপানং তদাহিতং। শীতং সশর্করং মন্থং জাঙ্গলান্ মৃগপক্ষিণঃ। ঘৃতং পয়ঃ সশাল্যন্নং ভজন্ গ্রীষ্মে ন সীদতি। মদ্যমল্পং নবাপেয়মথবা সুবহূদকং। লবণাম্লকটূষ্ণানি ব্যায়ামঞ্চাত্র বর্জ্জয়েৎ॥

বর্ষাকালে দিবানিদ্রা, উদমন্থ ও শিশির বা নদীর জলে স্নান, মৈথুন, ব্যায়াম ও রৌদ্রসেবা নিষিদ্ধ। (৮)

শরৎচর্য্যা।

বর্ষাকালে অত্যন্ত শীতল বায়ু ও বৃষ্টি সেবনের দ্বারা মনুষ্যগণের শরীর নিতান্ত শীতল হইয়া থাকে। শরৎকালে সূর্য্যের প্রখর কিরণদ্বারা ঐ শীতল শরীর সহসা উত্তপ্ত হইয়া উঠে। এই কারণে প্রায়ই বর্ষাকালের সঞ্চিত পিত্ত, শরৎকালে প্রকুপিত হয় অতএব এই কালে মধুর লঘুপাক, শীতল ও তিক্ত রসযুক্ত পিত্ত নিবারক অন্ন ও পান হিতকারক এবং যব, গোধূম, হৈমন্তিক আমন ধান্য, মেষ, শশক, হরিণ প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করা বিধেয় এবং ঔষধ সিদ্ধ পঞ্চতিক্তাদি ঘৃত সেবন, বিরেচন ও রক্ত-মোক্ষণ কর্ত্তব্য। শরৎকালে রৌদ্র ও পূর্ব্বদিগের বায়ু সেবা বসা, তৈল,

---

(৮) আদান দুর্ব্বলে দেহে পক্তা ভবতি দুর্ব্বলঃ। সবর্ষাস্বনিলা-দীনাং দূষনৈর্ব্বাধ্যতে পুনঃ। ভূবাষ্পান্মেঘনিষ্যন্দাৎ পাকাদম্লাজ্জলস্য চ। বর্ষাস্বগ্নিবলে ক্ষীণে কুপ্যন্তি পবনাদয়ঃ। তস্মাৎ সাধারণঃ সর্ব্বঃ বিধির্বর্ষাসু বক্ষ্যতে। পানভোজনসংস্কারান্ প্রায়ঃ ক্ষৌদ্রান্বিতং ভজেৎ। ব্যক্তাম্ললবণস্নেহং বাতবর্ষাকুলেঽহনি। বিশেষ শীতে ভোক্তব্যং বর্ষাস্বনিল-শান্তয়ে। অগ্নিং সংরক্ষণবতা যবগোধূমশালয়ঃ। পুরাণা জাঙ্গলৈর্মাংসৈ-র্ভোজ্যাযূষৈশ্চ সংস্কৃতাঃ। মাহেন্দ্রং তপ্তশীতংবা কৌপংসারসসেববা। প্রঘর্ষোদ্বর্তন স্নান গন্ধমাল্য পরভবেৎ। লঘুশুদ্ধাম্বোরঃ স্থানং ভজেদ-ক্লেদিবার্ষিকং॥ উদমন্থং দিবাস্বপ্নং অবশ্যায়ং নদীজলং ব্যায়ামমাতপ-ঞ্চৈব ব্যবায়ঞ্চাত্রবর্জয়েৎ॥

(চরকঃ)

শিশির জল, ঔদক ও আনূপ মাংস, ক্ষারদ্রব্য ও দধি ভক্ষণ একান্ত নিষিদ্ধ। (৯)

ঋতুসন্ধিচর্য্যা ।

এক ঋতুর অবশিষ্ট সাতদিন এবং তাহার পরবর্ত্তী ঋতুর প্রথম সাত-দিন এই চতুর্দ্দশ দিন ব্যাপক কালে উভয় ঋতুর সন্ধিকাল বলা যায়। এই ঋতুসন্ধি সময়ে পূর্ব্ব ঋতুর অভ্যস্ত আহার ব্যবহারাদির ক্রমশঃ ন্যূন করিয়া পরবর্ত্তী ঋতুর উপযোগি আহার ব্যবহারাদি ক্রমশঃ অভ্যাস করিবে। কারণ সহসা পূর্ব্ব অভ্যস্ত আহার ব্যবহার ত্যাগ করিয়া অন-ভ্যস্ত আহার ব্যবহার করিলে বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া নানাবিধ রোগ উৎপাদন করিতে পারে। (১০)

ক্রমশঃ—

শ্রীহরিমোহন দাস গুপ্ত কবিরাজ।

---

(৯) বর্ষাশীতোচিতাঙ্গানাং সহসৈবার্করশ্মিভিঃ। তপ্তানামাচিতং পিত্তং প্রায়ঃ শরদি কুপ্যতি। তত্রান্নপানং মধুরং লঘুশীতং সতিক্তকং। পিত্তপ্রশমনং সেব্যং মাত্রা সুপ্রকাঙ্ক্ষিতৈঃ। লাবান্ কপিঞ্জলানেণানুরভ্রান্ শরভান শশান্। শালীন্ সযবগোধূমান্ সেব্যানাহুর্ঘনাত্যয়ে। তিক্তস্য সর্পিষঃ পানং বিরেকো রক্তমোক্ষণং। ধারাধরাত্যয়ে কার্য্য-মাতপসা চ বর্জনং। বসাং তৈলমবশ্যায়মৌদকানূপমামিষং। ক্ষারং দধি দিবাস্বপ্নং প্রাগ্বাতঞ্চাত্র বর্জয়েৎ ॥ (চরকঃ)

(১০) ঋত্বোরাদ্যন্তসপ্তাহাবৃতুসন্ধিরিতি স্মৃতঃ। তত্র পূর্ব্বো বিধিস্ত্যাজ্যঃ সেবনীয়োঽপরঃ ক্রমাৎ। অসাত্ম্যজাহিরোগাঃস্যুঃ সহসা ত্যাগশীলনাৎ ॥ (বাভটঃ)

আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রী-বিদ্যা।

উপক্রমণিকা।

যিনি বীর্য্যরূপে একবার পুংজননেন্দ্রিয় হইতে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেন, আবার আর্ত্তবরূপে তাহারই সহিত সংমিলিত হইয়া কি প্রকার অত্যাশ্চর্য্য বিশ্ব-বিমুগ্ধকর সৃষ্টি কৌশল প্রদর্শন করেন; যাঁহার করুণা-কটাক্ষে জরায়ু মধ্যে জীবগণ প্রতিনিয়ত নিরাপদে রক্ষিত, তিল তিল বর্দ্ধিত এবং যথা সময়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া এই বিশাল সংসারকে বহুজনাকীর্ণ সুখের ভাণ্ডার করিয়া তুলিয়াছে; যিনি মানব-বুদ্ধির অগম্য, অপার্থিব পদার্থে আশ্চর্য্য কৌশলে অপূর্ব্ব মায়া-জাল বিস্তার করিয়া জীবগণকে পরস্পর আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন; সেই পরম পিতা পরমেশ্বরকে একান্ত ভক্তি-সহকারে নমস্কার করিয়া এই আয়ুর্ব্বেদোক্ত ধাত্রী-বিদ্যা আজ জন-সমাজে প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। জানি না, ইহাতে সাধা-রণের কতদূর উপকার হইবে। তবে উপকার হউক আর না হউক, পবিত্র আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র যে কোন অংশে হীন নহে, যাহা কিছু মনুষ্য জীবনের আবশ্যকীয়—অবশ্য জ্ঞাতব্য, তৎসমস্তই ইহাতে বিশদরূপে বর্ণিত আছে, ইহার একটী কথাও অমূল্য বা নিষ্প্রয়োজনীয় নহে, তাহাই যথাসাধ্য প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য। হায়! আজ ভারতের কি দুর্দ্দিন—হতভাগ্য ভারতবাসীর কি মহা বিপ্লব উপস্থিত। যে ভারতে একদিন সন্তান ভূমিষ্ঠ না হইলে প্রসূতীর প্রসব-বেদনার কথা স্ত্রীলোক ভিন্ন বাটীস্থ পুরুষেরাও জানিতে পারিত না, অথচ সন্তান বা প্রসূতীর ও কিছুমাত্র অনিষ্ট হইত না। হায়! বলিতে লজ্জা করে, আবার ঘৃণাও হয়, সেই ভারতের রমণীকুল, আজ কিনা, মেডিকেল্ কলেজের ডিপ্লোমা প্রাপ্ত ধাত্রী না হইলে সন্তান প্রসব করেন না! প্রসব সম্বন্ধে

একটু ব্যাঘাত জন্মিলেই সিভিলসার্জ্জনের সাহায্য না হইলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না। আবার অবস্থাভেদে অস্ত্র প্রয়োগ না করিলে ও কথন প্রসূতীর জীবন রক্ষা পায় না। তাই বলি, হায়! ভারতের কি দুর্দ্দিন! হৃত-সর্ব্বস্ব ভারতভূমে এখনও এমন দুই একটী কার্য্য-কুশলা জনয়িত্রী বিরাজ করিতেছে যে, তাহাদের অসাধারণ কার্য্যকারিতার কথা শ্রবণ করিলে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। যেরূপ অবস্থায় ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ধাত্রীগণ একবারে হতাশ হইয়া পড়েন, সুশিক্ষিত ডাক্তারগণ অস্ত্রদ্বারা গর্ব্ভস্থ সন্তানকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বাহির না করিলে পদে পদে বিপদের আশঙ্কা করেন। সেরূপ অবস্থায়ও দেশীয় নিরক্ষর জনয়িত্রীগণ কেবল মাত্র দুই একটী গাছড়া ঔষধের সাহায্যে সজীব সন্তান প্রসব করাইয়াছেন, তাহা স্পষ্ট দেখা গিয়াছে। সেই সকল ধাত্রীদিগের নিকট কি পাশ্চাত্য-শিক্ষাভিমানিনী ধাত্রীগণ স্থান পাইতে পারে?—না তাহাদের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে? এমন কি, প্রাচীন হিন্দু পরিবারের মধ্যে যাঁহারা গৃহণী ছিলেন, তাঁহারাও এ বিষয় অনেক জানিতেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, পবিত্রচেতা হিন্দু রমণীদিগের ঘরের কথা বাহির হইবার নিয়ম নাই, বাহির করিতেও তাঁহারা লজ্জা বোধ করিতেন, তাই হিন্দুদিগের আজ দুর্দ্দশা,—তাই হিন্দুদিগের ধাত্রী-বিদ্যা আজ লুপ্ত প্রায়। সেই লুপ্তধন—হিন্দু-পরিবারের অমূল্য রত্ন, নানা তন্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া আজ সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করিতেছি। ইতিপূর্ব্বে যে ভাবে গর্ব্ভোৎপত্তিক্রম লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, ঐ ভাবে লিখিতে হইলে বিষয়টী বড়ই ব্যাপক হইয়া পড়ে, সুতরাং আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতেও ক্রমেই বিলম্ব হইয়া যায়। এইক্ষণ "আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রী-বিদ্যা" নাম দ্বারা গৃহীতগর্ব্ভ ও সন্তানের মাসিক বিবরণ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাতে পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানী সভ্য মহোদয়গণের মতবিরোধী অনেক কথা দেখিতে পাওয়া যাইবে, অনেক স্থলে শান্তি স্বস্ত্যয়নাদির কথাও উল্লেখ থাকিবে এবং অবস্থানুসারে ঔষধ প্রয়োগের বিষয় বিবৃত হইবে।

এস্থলে আরও একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ধর্ম্মাত্মা আর্য্যগণ যখন যে বিষয় লিখিয়াছেন বা আলোচনা করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক বিষয়েই সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক বা পরোক্ষ ভাবেই হউক, কিছু না কিছু ধর্ম্মভাবের আভাস দিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ এই অনিত্য সংসারে যে একমাত্র মঙ্গলময়ের অমৃতময় নামই নিত্য, তাহা তাঁহাদের প্রত্যেক কথাতে জাজ্জ্বল্যমান প্রকাশ পাইয়াছে। যাহা হউক, কোন প্রকারে বিশ্ব নিয়ন্তার অমৃতময় নামটী দুইবার বেশী করিয়া কীর্ত্তন করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। তাই তাঁহাদের ধাত্রীবিদ্যাও হরপার্ব্বতীর গল্পচ্ছলে লিখিত হইয়াছে।

আয়ুর্বেদীয় ধাত্রী-বিদ্যা।

প্রথম অধ্যায়।

একদা ভূত-ভাবন-ভগবান্ ভবানী-পতি, প্রিয়তমা পার্ব্বতীর সহিত সুরম্য কৈলাস-কাননে ভ্রমণ করিতেছিলেন, ক্ষণকালের জন্য যোগ-তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া প্রণয়িনীর সহিত পবিত্র প্রণয়ের অমৃতরস পান করিতেছিলেন। উভয়ের মধ্যে কতই রহস্যালাপ হইতে লাগিল। পরে পতি-সোহাগিনী পার্ব্বতী বিনয়নম্র বচনে কহিলেন. হৃদয়বল্লভ! আজ একটী বিষয় জানিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে। রমণীগণ গর্ভধারণ অবধি নিত্য নূতন কত প্রকারের যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে, আবার প্রসবের সময় কখনই নিরাপদে পুত্রমুখ দেখিতে পারে না। কেহবা সেই সময়েই সমুদয় লীলাখেলা সাঙ্গ করিয়া কালগ্রাসে পতিত হয়, কেহ বা বহু কষ্টে নিজের জীবন রক্ষা করিয়াও অমূল্য রত্ন পুত্রধনে

বঞ্চিত হয়। তবে কি এই সমস্ত বিপদ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার কোন প্রশস্ত উপায় নাই? যোগনাথ! সংসারে তোমার অজ্ঞাত কিছুই নাই—তুমি সর্ব্বজ্ঞ—সর্ব্বময়, অতএব দয়া করিয়া শরীরিদিগের হিতের জন্য এই বিষয় গুলি সরল ভাষায় আমাকে বুঝাইয়া দাও।

এই কথা শুনিয়া মঙ্গলময় মহাদেব কহিলেন, প্রিয়ে! আজ্ তুমি এরূপ বলিতেছ কেন? যাহা আমি জানি, তাহা কি তোমার জানিতে বাঁকি আছে? আমাতে আর তোমাতে কি কিছুমাত্র ভিন্ন-ভেদ আছে? আমিইত তুমি হ'য়ে সংসারে পবিত্র প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছি, সংসারী হইয়াও যে অনায়াসে ব্রহ্মপদ লাভ করা যায়—ভগবানে চিত্তসংযমন করা যায়, তাহা দেখাইতেছি। আমিইত তুমি হয়ে এই বিশাল জগৎপ্রসব করিয়াছি। অতএব হে জগৎপ্রসবিনি! তুমি কি সুখপ্রসবের উপায় অবগত নহ? অনন্ত সন্তানের জননী হয়েও কি তুমি সন্তান পালনের বিষয় জান না?

পার্ব্ব। জানি, কিন্তু আমি রমণী—স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ-চঞ্চলতায় পরিপূর্ণ। আমার জানা না জানা সকলইত তোমাতে অর্পিত। তোমা অপেক্ষা আমিই যদি আজ্ বিজ্ঞাভিমানিনী বলিয়া পরিচিতা হইতে ইচ্ছা করি, তবে আর তোমার শ্রেষ্ঠত্ব থাকিল কোথায়? অতএব তোমার মুখ হইতে প্রকাশ হওয়াই উচিত।

মহা। প্রিয়ে! বুঝিয়াছি, পতিব্রত্যই তোমার এরূপ বলিবার কারণ। আজ তোমার অনুরোধে শরীরীদিগের হিতের জন্য ধাত্রীবিদ্যা প্রকাশ করিব। শ্রবণ কর—

গর্ভের প্রথমমাসে শুক্র ও আর্ত্তব যেরূপ তরল অবস্থায় গর্ভাশয়ে পতিত হয় ঠিক্ সেইরূপই থাকে। গর্ভের কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না। সুতরাং সেই সময় গর্ভিণীর কোন ব্যারাম হইলে বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিতে হইবে। যদি গর্ভ হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয় জানা যায়, এবং সেই গর্ভের বেদনা হয়, তাহা হইলে———

শ্বেতচন্দন, শুলফা, চিনি ও ময়না ফল, চাউলধোওয়া জলের সহিত বাঁটিয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধের সহিত গুলিয়া গর্ভিণীকে পান করাইবে।

অথবা তিল, পদ্মকাষ্ঠ, শালুক, শালী তণ্ডুল এই সমুদয় দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া চিনি, মধু ও দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। ইহা জীর্ণ হইলে দুগ্ধান্ন ভোজন করাইবে।

যদি প্রথম মাসে রক্ত ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে যষ্টিমধু, মাকড় চাউলী শাকের বীজ, ক্ষীর কাঁকলা ও দেবদারু সমভাগে দুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে।

দ্বিতীয় মাসে জরায়ুস্থ মহাভূত, বায়ু, পিত্ত ও কফের সহিত পচ্যমান হইয়া ঘন হয়। এই সময় হইতে কিছু কিছু করিয়া গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পায় এবং গর্ভিণীর মাসিক রজঃস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। অনুপযুক্ত আহার বিহারাদি দ্বারা গর্ভে বেদনা হইলে——.

পদ্ম, পানিফল ও কেশুর, চাউলধোওয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া তাহারই সহিত সেবন করাইবে। তাহাতে গর্ভ, দোষ-রহিত হইয়া স্থির-ভাব প্রাপ্ত হয়। আবার রক্ত ভাঙ্গিতে থাকিলে কুলথ কলাই; কৃষ্ণ তিল, মঞ্জিষ্ঠা ও শতমূলী পূর্ব্ববৎ দুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে।

তৃতীয় মাসে, হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মস্তক এই পাঁচটী অবয়বের স্থলে পাঁচটী মাংসপিণ্ড জন্মে এবং সূক্ষ্মরূপে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল দৃষ্ট হয়। এই সময় হইতে গর্ভের বাহ্যিক লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়ে, গর্ভিণী সর্ব্বদাই অসুখে থাকে, সর্ব্বদা আলস্য ও তন্দ্রা হয়। তাহার কিছুই খাইতে ইচ্ছা হয় না, কেবল সময় সময় বমন বা বমনোদ্রেক হয়। অধিকন্তু পোড়া মৃত্তিকা ও অম্লরসে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে।

যদি তৃতীয় মাসের শেষে বা চতুর্থ মাসের প্রথমে গর্ভিণীর রক্তস্রাব আরম্ভ হয়, তবে সেই গর্ভরক্ষা করা একটু কঠিন হইয়া পড়ে। অতএব রক্তস্রাব নিবারণার্থ তৃতীয় মাসে, গুলঞ্চ, ক্ষীর কাঁকলা, নীলোৎপল ও অনন্তমূল, কিঞ্চিৎ দুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে।

আবার এই সময় যদি গর্ভে বেদনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, পদ্ম কুড় ও শালুক এই কয়েকটী বস্তু চিনির জলের সহিত পেষণ করিয়া গর্ভিণীকে পান করাইবে। তাহা হইলে তখনই গর্ভ প্রকৃতিস্থ হইবে।

চতুর্থ মাসে গর্ভস্থ সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়

এবং তাহার হৃদয় জন্মে ও চেতনার আবির্ভাব হয়। এই মাসে হৃদয় জন্মে বলিয়া গর্ব্বিণীর নানা বস্তুতে অভিলাষ হয়। সেই সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ না করিলে, গর্ব্ভস্থ সন্তান কুব্জ, কুণি, খঞ্জ, বামন, বিকৃতাক্ষ বা অন্ধ হয়, অথবা বীর্য্য-হীন ও অল্পায়ু হইয়া থাকে। সুতরাং গর্ব্বিণীর ইচ্ছানুরূপ বস্তু সকল তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রদান করা কর্ত্তব্য। নতুবা গর্ব্বিণীর যে যে অভিলাষ পূর্ণ না হয়, সন্তানেরও সেই সেই ইন্দ্রিয়ের পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা।

অনন্তর পার্ব্বতী কহিলেন, প্রভো! গর্ব্বিণীর যে যে অভিলাষ জন্মিলে, গর্ব্ভস্থ সন্তানের প্রকৃতিগত যে যে বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে, তাহাও বিশেষ করিয়া শুনিতে ইচ্ছা করি।

তখন মহাদেব কহিলেন, প্রিয়ে! গর্ব্বিণীর রাজ-দর্শনে অভিলাষ জন্মিলে সন্তান সৌভাগ্যশালী ও ধনবান্ হয়, পট্টবস্ত্র ও অলঙ্কারে ইচ্ছা হইলে সন্তান সুকুমার ও অলঙ্কারপ্রিয় হয়, আশ্রম গমনে অভিলাষ জন্মিলে সন্তান ধর্ম্মশীল ও সংযতাত্মা হয়, দেব প্রতিমাদর্শনে অভিলাষ জন্মিলে সন্তান প্রমথতুল্য এবং সর্পাদি হিংস্র জন্তু দর্শনে ইচ্ছা হইলে সন্তান হিংস্রক হয়। আবার গর্ব্বিণীর মহিষমাংস ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা হইলে, রক্তাক্ষ, লোমশ ও বীরপুত্র প্রসব করে; বরাহ মাংস ভোজন করিতে অভিলাষ জন্মিলে নিদ্রালু ও বীরপুত্র জন্মে; এবং মৃগমাংস ভোজনে ইচ্ছা হইলে পুত্র দ্রুতগামী, বিক্রমশালী ও বনচারী হয়। পূর্ব্বোক্ত জন্তু ভিন্ন গর্ব্বিণীর অন্য যে যে জন্তুর মাংস ভোজনে অভিলাষ জন্মে, সেই সেই জন্তুর আকার ও স্বভাব অনুসারে প্রসূত সন্তানের আকার ও স্বভাব হইয়া থাকে।

এই সময় হইতে গর্ব্বিণীকে অত্যন্ত সাবধানে থাকিতে হইবে। অতি-রিক্ত শৈত্য বা উষ্ণতা সেবন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে। যে সমস্ত দ্রব্য আহার করিলে অনায়াসে পরিপাক হয়, তাহাই আহার করিবে। পচা দুর্গন্ধ বস্তু কদাচ খাইবে না। যাহাতে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করিবে, আবার কোন মতে উদরের পীড়া না

জন্মে, তজ্জন্যও বিশেষ সাবধান থাকিবে। এই সময় গর্ব্ভে বেদনা হইলে——

উৎপল, শালুক, কণ্টকারী, গোক্ষুর ; অথবা গোক্ষুর কণ্টকারী, বালা ও নীলোৎপল, দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করাইবে। তাহাতে গর্ব্ভ-দোষ রহিত হইয়া স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়।

রক্তস্রাব নিবারণের জন্য অনন্তমূল, শ্যামালতা, রাস্না, বামুন হাটী ও যষ্টিমধু, দুগ্ধের সহিত বাটীয়া পান্ করাইবে, ইহা আশু ফল প্রদ।

পঞ্চম মাসে গর্ব্ভস্থ সন্তান কেবল বর্দ্ধিত হয় এবং তাহার মন জন্মে। সুতরাং গর্ব্ভমধ্যে সন্তানকে সময় সময় নড়া চড়া করিতে দেখা যায়। এই সময় গর্ব্ভিণী অতিরিক্ত পরিশ্রম পরিত্যাগ করিবে না এবং একবারে নিশ্চেষ্ট হইয়াও বসিয়া থাকিবে না। এই সময় গর্ব্ভিণীকে কুলপ্রথানুসারে যথাশাস্ত্র পঞ্চ গব্যাদি পান করাইবে। তাহাতে গর্ব্ভের দোষ রহিত হয় এবং সর্ব্বগুণান্বিত সুকুমার সন্তান প্রসব হয়।

পঞ্চম মাসে বেদনা নিবারণার্থ গর্ব্ভিণীকে নীলোৎপল ও ক্ষীর কাঁকলা একত্র পেষণ করিয়া দুগ্ধ, ঘৃত ও মধুর সহিত পান করাইবে। অথবা নীলোৎপল ও কাঁকলা সম ভাগে শীতল জল দ্বারা পেষণ করিয়া পান করাইবে। রক্তস্রাব হইলে বৃহতী. কণ্টকারী, গাম্ভারী ফল, বটের ঝুরি ও দারুচিনি সমভাগে বাঁটিয়া ঘৃতের সহিত পান করাইবে।

ষষ্ঠ মাসে গর্ব্ভস্থ সন্তানের বুদ্ধি জন্মে এবং শরীর ও অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই সময় হইতে প্রসব কাল পর্য্যন্ত গর্ব্ভিণীকে অত্যন্ত সাবধানে গমনাগমন করিতে হইবে। উদরে কোন প্রকার চাপ না লাগে এবং হঠাৎ কোন কারণে গর্ব্ভিণী ভয়-যুক্তা না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। নতুবা গর্ভ বিকৃত অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া উদরে শূল জন্মায়। তদ্রূপ অবস্থায় শূল হইলে, গর্ভস্থ সন্তান কি প্রকার অবস্থায় গর্ভ মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, তাহা বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া সেই ভাবে একটু সরিষার তৈল গরম করিয়া তলপেটে মর্দ্দন করিবে। অথবা কোন কার্য্যকুশলা জনয়িত্রী দ্বারা গর্ভিণীর কটীদেশে একটু ঝাঁকি দিয়া গর্ভকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিবে। কিন্তু এই সমুদয়

কার্য্য অতি সাবধানে করিতে হইবে। আহারাদি দ্বারা আভ্যন্তরীন কার্য্যের বৈপরিত্যবশতঃ যদি গর্ভে বেদনা হয় তাহা হইলে—

টাবালেবুর বীজ, প্রিয়ঙ্গু, চন্দন ও উৎপল, গব্য দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া সেবন করাইবে।

পিয়াল বীজ, দ্রাক্ষা ও খই চুর্ণ, শীতল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করাইলেও ব্যথা নিবারণ হয়।

এই সময় রক্তভাঙ্গা আরম্ভ হইলে; চাকুলে, বেড়েলা, সজিনা বীজ, গোক্ষুর ও যষ্টিমধু কিঞ্চিৎ দুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে।

ক্রমশঃ—

২৯ অগ্রাহায়ণ ১২৯৪ সাল। } শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়
নাকালীয়া, পাবনা।

প্রকৃত সূতিকাজ্বর বা পচা জ্বর।

হোমিওপ্যাথি মতে

চিকিৎসা—ইহার প্রধান ঔষধ একোন, ব্যাপটী, বেল, ব্রাই, ক্যাম. সিমিসিফিউগা, কফি, ব্রমো, জেল্‌সি, নক্স ও রাস।

একোন—প্রথরজ্বর, ত্বক্‌ শুষ্ক ও গাত্রে অতিশয় জ্বালাবোধ, প্রবল তৃষ্ণা, মুখশ্রী রক্তবর্ণ, শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ও কষ্টদায়ক; জরায়ু হইতে রক্তস্রাব একেবারে বন্ধ, স্তনে দুগ্ধের অভাব, উদর স্ফীত ও উহা স্পর্শ করিলে বেদনা বোধ, প্রত্যহ এক সময়ে উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

এপিস মেলিফিকা—তলপেটে বিশেষ জরায়ুস্থানে অতিশয় বেদনা, প্রসবের ন্যায় বেগ, রক্তস্রাব ও দুগ্ধ উভয়ই বন্ধ।

আর্সিনিক—নিম্ন উদরে জ্বালা. দপ্‌দপানি ও কর্ত্তনবৎ বেদনা, অতিশয় অস্থিরতা ও উদ্বেগ, মৃত্যু আশঙ্কা, মুখাবয়ব হতশ্রী, বসা ও রক্ত-শূন্য. দেহ নীলবর্ণ, বিবমিষা ও বমন; শিরঃপীড়া, ভ্রম, প্রলাপ, নাড়ী দুর্ব্বল, বিষম ও ক্ষুদ্র. গাত্র আবরণে ইচ্ছা।

ব্যাপটিসিয়া—জ্বরের সহিত সান্নিপাতিক লক্ষণ দুর্গন্ধযুক্ত রক্তস্রাব. অতিশয় দুর্ব্বলতা, উদরে বায়ু সঞ্চারজনিত উদরাধ্মান, ভারবোধ ও গড়্ গড়্ শব্দ, বমনে ঐসকল উপসর্গের শান্তি হওয়া বিশ্বাস, অন্ত্রে তীব্র বিদ্ধবৎ বেদনা, প্রস্রাব অল্প ও রক্তবর্ণ, শয়নাবস্থায় শ্বাস-কৃচ্ছ্র, অস্থিরতা ও অব্যক্ত অসুস্থতা অনুভব।

বেলাডোনা—উদরে বায়ুসঞ্চার ও খনন করা এবং খিল ধরার ন্যায় বেদনা, উহার হঠাৎ আক্রমণ এবং অধিক বা অল্পকাল ভোগান্তে সহসা নিবৃত্তি. অন্ত্রে খাম্‌চে ধরার ন্যায় প্রবল আক্ষেপযুক্ত শূলবেদনা. অথবা জননেন্দ্রিয়ে প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা, উদর স্পর্শ করিলে যন্ত্রণাবোধ; শরীরের কোন অংশে শীত কোন অংশে উত্তাপ অনুভব অথবা সর্ব্বশরীর বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে ও মস্তকে অধিক উত্তাপ, চক্ষু রক্তবর্ণ, কণ্ঠে আক্ষেপ ও গলাধঃকরণে কষ্ট, অনিদ্রা, শয্যাকণ্টক, নিদ্রালুতা, মৃদু প্রলাপ এবং অন্যান্য মস্তিষ্কলক্ষণ থাকিলে ব্যবস্থা; জলবৎ, বিবর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত অত্যল্প রক্তস্রাব অথবা উহার একেবারে লোপ, অতিশয় রক্তস্রাবের সহিত দুর্গন্ধ-যুক্ত রক্তখণ্ড পতন, অজ্ঞাতসারে মূত্রত্যাগ, স্তনদ্বয় স্ফীত, প্রদাহযুক্ত অথবা কোমল এবং দুগ্ধশূন্য; কোষ্ঠবদ্ধ কিম্বা আমযুক্ত উদরাময়ে বিশেষ উপকার দর্শে।

ব্রাইওনিয়া—বায়ুসঞ্চার-জনিত উদর স্ফীতি, স্পর্শ করিলে বেদনা বোধ, অঙ্গ নড়িলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি, মস্তকে ছিন্ন বিছিন্ন ভাব, উঠিয়া বসিলে বিবমিষা এবং মোহ, কোষ্ঠবদ্ধ, মল কঠিন, শুষ্ক ও কৃষ্ণবর্ণ, প্রখর জ্বর, সমস্ত উদরে জ্বালাবোধ, অতিশয় পিপাসা ও শীতল জলপানে ইচ্ছা, স্বভাব উগ্র ও প্রচণ্ড; মৃত্যুর আশঙ্কা থাকিলে ব্যবস্থা।

ক্যালকেরিয়া কার্ব—পদদ্বয় শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত, মস্তক ও শরীরের ঊর্দ্ধাংশে প্রচুর ঘর্ম্ম, জননেন্দ্রিয়ে সতত বেদনা অনুভব, জরায়ুর গ্রীবা-দেশে খিল ধরার ন্যায় বেদনা, অনিয়মিত পুনঃ পুনঃ প্রচুর পরিমাণে রজঃ-স্রাব।

ক্যান্থারাইডিস—উদরে অতিশয় উত্তাপ ও জ্বালা অনুভব, দুর্ব্বলতা, অস্থিরতা ও হস্তপদাদির কম্পন, উদরের ঊর্দ্ধাংশে বায়ুসঞ্চারজনিত উদরাধ্মান, মূত্রত্যাগের সতত বেগ, প্রতিবার অল্প পরিমাণে কষ্টের সহিত ফোটা ফোটা মূত্র-নির্গম, কখন বা উহা রক্তমিশ্রিত; এবং জরায়ু স্থানে জ্বালা ইত্যাদিতে ব্যবস্থা।

ক্যামমিলা—রাগ ও মানসিক উত্তেজনা বশতঃ পীড়ার উৎপত্তি, স্তন-দ্বয়ের শিথিলতা ও দুগ্ধহীনতা; উদরাময়, শ্বেতবর্ণের দাস্ত, অল্প রজঃ-স্রাব, উদর স্ফীতি ও স্পর্শ করিলে উহাতে বেদনা বোধ, অন্ত্রে শূল ও প্রসব বেদনার ন্যায় যন্ত্রণা, সর্ব্বাঙ্গে উত্তাপ, অতিশয় পিপাসা, প্রচুর সাদা প্রস্রাব, রোগীর অসহিষ্ণুতা ও অবাধ্যভাব।

কার্বলিক এসিড—ক্ষণস্থায়ী পুনঃ পুনঃ কম্পের সহিত প্রবল জ্বর, জ্বরান্তে প্রচুর ঘর্ম্ম ও অস্থিরতা, জরায়ুস্থানে এবং উহার দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা, নাড়ী সূত্রাকার, উদরাময়, অজ্ঞাতসারে দুর্গন্ধ যুক্ত দাস্ত, রজো-লোপ, আহারে ও পানীয় দ্রব্যে অতিশয় ইচ্ছা।

সিমিসিফিউগা—অতিশয় হিম লাগা বা মনস্তাপ হেতু রজোলোপ, উদরে আক্ষেপিক বেদনা, প্রলাপ ও শিরঃপীড়া, কর্ণে ভোঁ ভোঁ শব্দ, মুখ নীলাভ, হঠাৎ মোহ, এত অধিক দুর্ব্বলতা যে রোগী সর্ব্বদাই মৃত্যু আশঙ্কা করে, অতিশয় পিপাসা, একেবারে রজোলোপ অথবা রক্তখণ্ড মিশ্রিত জলের ন্যায় অল্প পরিমাণে রজঃস্রাব, স্তনে তীরবিদ্ধবৎ বেদনা অনুভব।

ককিউলস—পৃষ্ঠে পক্ষাঘাতের সূচনা, পদদ্বয়ে পক্ষাঘাত, নড়িলে উদর মধ্যে প্রস্তর সংস্থানবৎ ভার অনুভব, মুখ ও মস্তক উষ্ণ, পদদ্বয় শীতল, ও মুখ বিস্বাদ।

কফিয়া—মানসিক উত্তেজনা জনিত সূতিকা জ্বর, পুনঃ পুনঃ কম্পের

সহিত অল্প উত্তাপ, জিহ্বা আর্দ্র, তৃষ্ণাশূন্য, প্রলাপ, চক্ষু উজ্জ্বল ও উন্মীলিত, উদরে প্রখর বেদনা, অনিদ্রা ও মৃত্যু আশঙ্কা।

কলোসিন্থ—বিরক্তি বা অসন্তোষ জনিত রোগোৎপত্তি, উদরে প্রচণ্ড শূলবৎ বেদনা হেতু রোগী জানুদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া শয়ন করে, অতিশয় অস্থিরতা, প্রস্তর দ্বারা উদরে পেষণবৎ বেদনা, প্রলাপান্তে নিদ্রালুতা, মস্তক উষ্ণ, মুখ রক্তবর্ণ, চক্ষু উজ্জ্বল, নাড়ী কঠিন, পূর্ণ ও দ্রুত।

হায়সামাস্—অতিশয় মনস্তাপ-জনিত পীড়ার উদ্ভব, আক্ষেপিক উপসর্গ; মুখ, চক্ষুর পাতা এবং হাত পার খেচন, সান্নিপতিক অবস্থা, প্রলাপ ও অনাবৃত বা উলঙ্গ হইবার ইচ্ছা।

ক্রিয়জুট—জননেন্দ্রিয়ে খিল ধরার ন্যায় পুনঃ পুনঃ আক্ষেপ ও প্রতি আক্রমণে চমকিয়া উঠা, পচা দুর্গন্ধযুক্ত রজঃস্রাব, অল্পকাল মাত্র বন্ধ থাকিয়া পুনরায় অধিক পরিমাণে রজঃস্রাব, ধূসর বর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত প্রস্রাব, পচা গন্ধ বিশিষ্ট দাস্ত, উদর স্ফীত ও কঠিন, প্রসবের ন্যায় অন্ত্রে বেগকালে উদরের ঊর্দ্ধাংশ মেরু দণ্ডের সহিত সংলগ্ন হওয়া, মুখে উত্তাপ, হৃৎপিণ্ডের কম্পন, উদরের কষ্টদায়ক শীতলতা অনুভব ইত্যাদি।

ল্যাকেসিস—দুর্গন্ধযুক্ত রজঃ, মূত্র লোপ অথবা অজ্ঞাতসারে ত্যাগ, উদর স্ফীতি, জরায়ুতে সামান্য চাপে যন্ত্রণা বোধ, এমন কি বস্ত্রাভারও অসহনীয় হয়। অন্ত্রস্থ মল ঊর্দ্ধে উঠার ন্যায় অনুভব, রক্তস্রাবে জরায়ুর বেদনার কিঞ্চিৎ হ্রাস ও পরক্ষণে পুনরায় বৃদ্ধি, নিদ্রান্তে উপসর্গের বৃদ্ধি।

মারকিউরিয়স্—অন্ত্র বৃদ্ধি, ছিদ্র করা বা চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা, উদরে ও পাকাশয়ে স্পর্শানুভব শক্তির আধিক্য। জিহ্বা সিক্তসত্ত্বেও অপরিহার্য্য তৃষ্ণা, প্রচুর ঘর্ম্ম, রাত্রে উপসর্গের বৃদ্ধি।

নক্স ভমিকা—জরায়ুর গ্রীবাদেশে মুচড়িয়া ধরার ন্যায় বেদনা, প্রস্রাবত্যাগে পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা, মূত্র ত্যাগকালে বেদনা ও জ্বালা বোধ, রজোলোপ বা প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত রজঃস্রাব, পৃষ্ঠে প্রচণ্ড বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ বিবমিষা, বমন, উরুদেশে ও পদদ্বয়ে আক্ষেপিক বেদনা, মুখ রক্তবর্ণ, শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, দৃষ্টিহানি, কর্ণে শব্দশ্রবণ ও মোহ।

ওপিয়ম্—ভয় জনিত পীড়ার উদ্ভব, মুখে রক্তাধিক্য, প্রলাপ, নিদ্রা-

লুতা জ্ঞানকালে শয্যা অতিশয় উষ্ণ অনুভব, নিদ্রার আবশ্যকতাসত্ত্বে অনিদ্রা, হস্ত পদাদির শীতলতা, জরায়ু হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ নিঃস্রাব।

প্লাটিনম্—প্রসবান্তে জননেন্দ্রিয়ে নিয়ত কষ্টদায়ক বেদনা ও চৈতন্যাধিক্য এবং প্রচুর পরিমাণে কৃষ্ণবর্ণের গাঢ় রক্তনিঃস্রাব হইতে থাকিলে ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শে।

রসটক্স—অধিক দিন স্থায়ী পুনঃ পুনঃ দুর্গন্ধযুক্ত রজঃস্রাব, দুগ্ধলোপ, দেহের উষ্ণতা, অস্থিরতা, শয্যাকণ্টক, অল্প জ্বর, জিহ্বার শুষ্কতা, অধঃশাখার বলহানি।

সিকেল-কর—জলবৎ বিবর্ণ রক্তস্রাব, অতিশয় দুর্ব্বলতা, মূত্রস্তম্ভ, দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময়, স্বরের বিকৃতি, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, মৃদু এবং অশ্রবণীয় শ্বাস, জ্বরের সহিত প্রচণ্ড দাহ, ক্ষণে ক্ষণে কম্প, হস্তপদাদি শীতল, সর্ব্বাঙ্গ শীতল ও ঘর্ম্মযুক্ত।

টেরিবিন্থ—জরায়ু ও অন্ত্রাবরক ঝিল্লির প্রদাহ ও উহার অপকর্ষ প্রাপ্তির আশঙ্কা, রজঃস্তম্ভ, জরায়ুতে প্রচণ্ড জ্বালা, ঈষৎ উদরস্ফীতি, শিরঃপীড়া, পিপাসা, জিহ্বার শুষ্কতা ও ধূসর বর্ণ, বিবমিষা এবং বমন, উদরে স্ফীতি ও স্পর্শ করিলে কষ্টানুভব, নাড়ী ক্ষুদ্র ও দ্রুত, এবং অতিশয় দুর্ব্বলতা।

ভেরাট্রম ভেরাইড—সূতিকা জ্বরের প্রথমাবস্থা, দুগ্ধ ও রজঃ উভয়ের হঠাৎ লোপ, প্রখর জ্বর, অস্থিরতা, সর্ব্বাঙ্গে অতিশয় বেদনা, অন্ত্রে বেগ, উদরে বায়ুসঞ্চার, গাত্র শীতল ও ঘর্ম্ম বিশিষ্ট এবং নাড়ী দ্রুত ও দুর্ব্বল।

মাঘ, } ডাক্তার শ্রীশিখরকুমার বসু, এল, এম্, এস্
কলিকাতা। } হোমিওপ্যাথিক্ প্রাক্‌টীসনার।

ড্রপ্‌সি বা শোথ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে শোথের সম্বন্ধে যত কথা বলা হইয়াছে, তাহা বিশেষ করিয়া পাঠ করিলেই শোথের ভাবী ফলসম্বন্ধে মতামত স্থির করা যাইতে পারে। অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোকের রক্তহীনতা (ক্লোরসিস্) রোগ হইয়া যে শোথ উৎপন্ন হয় তাহা অতি সহজেই আরাম হয়। তার পর প্যাসিব ড্রপ্‌সি অপেক্ষা একুটিভ্ বা তরুণ শোথ শীঘ্র এবং সম্পূর্ণরূপে আরাম হয়। শরীরের কোন অঙ্গ বিশেষে অল্প স্থান ব্যাপিয়া শোথ হইলে আরাম হইতেও পারে, না হইতেও পারে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রক্তের গতি আবদ্ধ হইয়া এই সকল স্থানীয় শোথ হয়, অতএব যদি রক্ত আবার পূর্ব্বের ন্যায় চলিতে পারে [এরূপ উপায় করিয়া দেওয়া সাধ্য হয়, তাহা হইলে ঐ সকল শোথ আরাম হইয়া যায়। কোন অঙ্গ বিশেষে অর্ব্বুদ জন্মাইয়া শোথ হইলে, অস্ত্র চিকিৎসার দ্বারা অর্ব্বুদটী উৎপাটন করিয়া দিলে শোথও আরাম হইয়া যায়। মস্তিষ্কের মধ্যে অর্ব্বুদ জন্মাইয়া মস্তিষ্ক শোথ উৎপন্ন হইলে রোগীর মৃত্যু নিশ্চয়, যে হেতু উক্ত অর্ব্বুদ আরাম করা অসাধ্য। হৃদয়ের পীড়া দ্বারা পুরাতন সর্ব্বশরীরব্যাপী শোথ হইলে, শোথ যেমন শীঘ্র আরাম হয় তেমনিই আবার পুনঃ পুনঃ হইতে পারে। শোথ যে স্থান আক্রমণ করে, সেই স্থানের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া শোথের ভাবিফল সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করিবে। যথাঃ— মুষ্কের শোথ জন্মাইলে রোগীর কোনও বিপদ নাই। কিন্তু হৃদয়ের আবরণের (পেরিকর্ডিয়ম্) ভিতর শোথ হইলে বিপজ্জনক। হাতের কি পায়ের চর্ম্মের নিম্নে শোথ হইলে রোগীর কোনও বিপদের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু বায়ুনলী স্ফীত হইলে রোগীর সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। যে হেতু শ্বাস বন্ধ হইয়া রোগী হঠাৎ মারা পড়িতে পারে।

শোথের চিকিৎসা করিতে হইলে দুইটী বিষয়ে মনোযোগ করিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে। (১) শোথের জল যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র দূরীভূত হয়, সেইরূপ চেষ্টা করিতে হইবে। (২) যাহাতে আবার পুনরায় জল না যায় তাহার উপায় করিতে হইবে, অর্থাৎ যে মূল কারণবশতঃ শোথ উৎপন্ন হইয়াছে সেই কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিকার করিতে হইবে।

পূর্ব্বকালে শোথের চিকিৎসায় রক্তমোক্ষণ করিবার প্রথাছিল, এক্ষণে আর সেরূপ চিকিৎসা প্রচলিত নাই।

যিনি শোথের নিদান উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন, তাঁহার পক্ষে শোথের চিকিৎসা অতি সহজ। শরীরে জল আট্‌কাইয়া শোথ হয়এবংঘাম,প্রস্রাব ও দাস্ত প্রভৃতি বন্ধ হইয়া শরীরে জল আট্‌কায়, এইটী বুঝিলেই শোথের চিকিৎসা জানিতে আর বাঁকী থাকে না। অনেক স্থলেই ঘাম, প্রস্রাব ও দাস্ত করাইতে পারিলেই শোথ আরাম করিতে পারা যায়। কিন্তু এই তিন চিকিৎসার মধ্যে কোন্ চিকিৎসা কোন্ অবস্থায় প্রয়োগ করিতে হইবে, সেটী সম্পূর্ণ চিকিৎসকের বিশেষ বিবেচনার উপর নির্ভর করে। দুর্ব্বল ও রক্তহীন রোগীকে পুনঃ পুনঃ দাস্ত করাইয়া কখনই আরও দুর্ব্বল ও রক্তহীন করা উচিত নহে। জ্বর হইয়া তরুণ শোথ হইলে ঘর্ম্মকারক, মূত্রকারক ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং দাস্তও আনান যাইতে পারে। হঠাৎ ঘর্ম্মরোধ হইয়া শোথ হইলে, রোগীর ঘর্ম্ম উৎপাদনের জন্য বিশেষ চেষ্টিত হওয়া উচিত। মূত্রকারক ঔষধে শোথ অতি সত্বর আরাম হয়। নানারকম মূত্রকারক ঔষধ একত্রে ব্যবহার করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে সাইট্রেট্ অব্ পটাস্ ও নাইট্রি্ক্ ঈথর অতি উৎকৃষ্ট। নিম্নলিখিত ব্যবস্থামত ঔষধটীতে বেশ কাজ করে যথাঃ—

টিং ডিজিটেলিস্	½ ড্রাম—১ ড্রাম
পট্ সাইট্রাস্	১ ড্রাম
টীং ফেরি পারক্লোরাইড্	১ ড্রাম
সাক্রাই স্কোপেরাই	৬ ড্রাম
জল	৬ আউন্স

একত্র মিশ্রিত করিয়া এক ষষ্ঠাংশ মাত্রায় প্রতিদিন তিন বা চারিবার সেবন বিধেয়। বিরেচক ঔষধের মধ্যে শোথ রোগে সল্ ফেট্ অব্ ম্যাগ্নেসিয়া, ক্রীম অব্ টার্টার, কম্পাউণ্ড জোলাপ পাউডার এবং ইলেটিরিয়ম (⅙ বা ⅛ গ্রেণ) রোগীর বয়স ও বল বিবেচনায় উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহার করা যাইতে পারে। পুরাতন প্লীহা রোগবশতঃ রোগী রক্তহীন হইয়া শোথ-গ্রস্থ হইলে উপযুক্ত মাত্রায় লৌহ-ঘটিত ঔষধ খাওয়াইলেই শোথ অতি সত্বর আরাম হয়। যকৃত বড় হইয়া উদরী হইলে সর্ব্বাগ্রে যকৃতের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। এরূপস্থলে দাস্তকারক ঔষধে বেশ ফল পাওয়া যায়। শরীর অভ্যন্তরস্থ কোন এক বৃহৎ শিরা আবদ্ধ হইয়া সর্ব্বাঙ্গব্যাপী শোথ হইলে তাহা বড় সহজে আরাম হয় না। এইরূপ শোথ সময়ের গতিতে আপনা আপনি আরাম হইতে পারে। এই সকলস্থলে রোগীর যাহাতে কষ্ট নিবারণ হয়, সেইরূপ চেষ্টাই বিহিত।

জলোদরী হইয়া রোগী অত্যন্ত কষ্ট পাইলে এবং খাইবার ঔষধে সত্বর উপকার না হইলে, অস্ত্র কার্য্যদ্বারা উদর হইতে জল নির্গত করান যাইতে পারে। ইহাতে রোগী বিশেষ সুস্থতা অনুভব করে। যে অস্ত্র কার্য্যদ্বারা উদর হইতে জল নির্গত করা যায়, তাহাকে চলিত বাঙ্গালা ডাক্তারী কথায় উদর ট্যাপ্ করিয়া দেওয়া বলে। এইরূপ ট্যাপ্ করিতে হইলে যাহাতে পেরিটোনিয়ম নামক অন্ত্রাবরক ঝিল্লিতে আঘাত না লাগে এরূপ সতর্ক হইয়া অস্ত্রকার্য্য করিতে হইবে। করিতে জানিলে এ অস্ত্রকার্য্য অতি সহজ-সাধ্য এবং ইহাতে কোনও বিপদ হইবার সম্ভাবনা নাই। নাভির কিঞ্চিত নিম্নে তলপেটের ঠিক মাঝখানে (লিনিয়া এল্ বা নামক ফেশিয়ার সমরেখা ক্রমে) ট্রোকার ও ক্যানুলা সাহায্যে ছিদ্র করিয়া হাইড্রোসিল্ ট্যাপ্ করার ন্যায় জল নির্গত করিবে। প্লুরের খোলের ভিতর জল জমিয়া রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইলে ঐরূপ ট্রোকার ও ক্যানুলা সাহায্যে জল বাহির করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই অস্ত্রকার্য্যটী উদর ট্যাপ করা অপেক্ষা কিছু কঠিন এবং কিছু বেশী সতর্কতা অবলম্বনের আবশ্যক। সচরাচর চতুর্থ ও পঞ্চম পঞ্জরাস্থির মাঝখানে রোগীর এক পাঁজরে এই অপারেশন করা যাইতে পারে। খুব্ পরিষ্কার

ধারাল ট্রোকার অতি অল্প প্রবিষ্ট করাইয়া জল নির্গত করাইবে এবং তৎক্ষণাৎ তুলাদ্বারা মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে, নচেৎ বায়ু প্রবেশ করিয়া অনর্থ উৎপন্ন করিতে পারে। এইরূপ অপারেশন সময় সময় নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এমন কি, সময় সময় রোগীকে আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইতে পারা যায়। কিন্তু এই অস্ত্র কার্য্য করিবার অগ্রে উত্তমরূপে রোগ নির্ণয় করা চাই। এই প্লুরার খোলের ভিতর জল জমাকে হাইড্রোথোরাকস্ কহে। ইহা শোথ হইলেও একটী স্বতন্ত্র রোগ এবং ইহার সবিশেষ বিবরণ না জানিলে ইহার চিকিৎসা করা সম্ভবে না। আমি সাধারণ শোথের ও তাহার সাধারণ চিকিৎসামাত্র এ প্রবন্ধে লিখিলাম। নানাপ্রকার স্থানীয় শোথ ও তাহার বিশেষ বিশেষ চিকিৎসা এস্থলে বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে। যেহেতু তাহাদের স্বতন্ত্র বিবরণ আবশ্যক।

শোথের নিদানকালে বলা গিয়াছে যে, সময় সময় রোগীর গায়ে ফোস্কা হইয়া আপনা আপনি জল নির্গত হইয়া শোথ ভাল হইয়া যায়। এই ব্যাপারটী অবলোকন করিয়া ডাক্তার মহাশয়েরা কৃত্রিম উপায়ে শোথ রোগের অঙ্গে ছিদ্র করিয়া শোথের জল বাহির করিয়া দিয়া থাকেন। রোগীর পায়ে কিম্বা উরুদেশে অথবা মুষ্কের চর্ম্মে ছোট ছোট ছুঁচের ন্যায় অস্ত্রদ্বারা ফুটা করিয়া দিলে আপনা আপনি জল চোঁয়াইয়া রোগী অনেকটা সুস্থ হয়।

শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্যাল এম, বি।

আয়ুর্ব্বেদে শোথরোগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এতদ্ভিন্ন বিসর্প, বিস্ফোটক, ক্ষুদ্র ও প্রদর প্রভৃতি নানাবিধ রোগে অল্প-বিস্তর ভাবে শরীরের অঙ্গ বিশেষে শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃ-তপক্ষে তাহাদিগকে শোথ রোগ না বলিয়া তত্তৎরোগের উপসর্গ মাত্র বলা যাইতে পারে। তবে এমন দেখা গিয়াছে যে, প্রদর রোগে স্ত্রীজাতির মাসিক রক্তস্রাব সহসা বন্ধ হওয়াতে তাহার সর্ব্বাঙ্গে ভয়ানক শোথ উৎপন্ন হই-হইয়াছে। তাহাছাড়া মাসিক আর্ত্তবশোণিতের অল্পস্রাবজন্য ও শোথ জন্মিতে পারে। এই আর্ত্তবশোণিতের অনির্গমনজন্য সাধারণতঃ দুই প্রকার শোথ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এক—যে সমস্ত স্ত্রীলোক বেশ হৃষ্টপুষ্টা অথচ বলিষ্ঠা, তাহাদেরও এমন কোন কারণ উপস্থিত হইতে পারে, যদ্বারা আর্ত্তবশোণিত সহসা বন্ধ হইয়া শরীরে শোথ জন্মিতে পারে আর ২য়—যে সমস্ত স্ত্রীলোক বহুকাল হইতে নানাবিধ পুরাতন পীড়ায় পীড়িত থাকা বশতঃ শরীরে নিতান্তই রক্তাল্পতা ঘটিয়াছে, অথচ আর্ত্তব-শোণিতও নির্গত না হয়, তাহাদেরও শোথ জন্মিতে পারে। কিন্তু এই শেষোক্ত শোথের উৎপত্তিসম্বন্ধে প্রকৃত কারণ স্থির করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। কেননা নিতান্ত দুর্ব্বলা অথচ বহুকাল হইতে রুগ্না স্ত্রীর শোথরোগ এরূপস্থলে রক্তাল্পতা জন্যই ঘটে, অথবা আর্ত্তবশোণিতের অনির্গমন জন্যই ঘটে, তাহা প্রকৃতপক্ষে অনেক সময়ে বোঝাই যায় না। কিন্তু প্রথমোক্ত অর্থাৎ বলিষ্ঠা স্ত্রীজাতির যে আর্ত্তবশোণিত বন্ধ হইয়া অনেক সময়েই শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহার প্রমাণ আমরা অনেক-স্থলেই পাইয়া থাকি। যাহা হউক, এই উভয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত শোথের কারণ যেমন বুঝিবার পক্ষে সহজ, তেমনি ইহার চিকিৎসাও অনেকাংশে সহজ বলিয়া আমার বিশ্বাস।

স্ত্রী-জাতির প্রসবান্তে সূতিকাক্ষেত্রে যে অনেক সময় ভয়ানক শোথ জন্মে, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। প্রায়ই দেখা যায়, প্রসবের পর কোনরূপ আহারাদি-জনিত সামান্য অত্যাচার ঘটিলেই প্রসূতির হয় মুখ, না হয় হস্তপদাদিতে শোথ জন্মিবেই জন্মিবে। আর অধিক অত্যাচারজন্য যে নিদারুণ শোথগ্রস্ত হইয়া অনেক সময় প্রসূতির জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়, তাহাও বোধ হয় অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। ফলতঃ একথা ঠিক্ যে, প্রসবের পর কোনরূপ অত্যাচার ভিন্ন প্রসূতির এরূপ শোথ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নাই। আমি এমন ২।৩টী স্ত্রী-লোককে দেখিয়াছি যে, তাহাদের প্রথম সন্তান প্রসবের পর অত্যাচার জন্য শোথগ্রস্তা হইয়া সেই শোথাবস্থাতেই আবার গর্ভ্ভধারণ করিয়াছে এবং প্রসবান্তেও সে শোথের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয় নাই, এইরূপ ২।৩ বার প্রসবের পর ক্রমশঃ দুর্ব্বলতার বৃদ্ধি হইয়া প্রসূতির জীবনপর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এইরূপ মৃত্যুতে বেশ জানা গিয়াছে যে, সে স্থলে প্রসূতির শোথই তাহাদের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ। তাহা ছাড়া যে সমস্ত স্ত্রী-লোকের অসময়ে গর্ভ্ভস্রাব হয়, এই গর্ভ্ভস্রাব জন্য তাহাদের শরীরেও শোথ জন্মিতে পারে। এতদ্ভিন্ন স্থাবর ও জঙ্গম প্রভৃতি নানাবিধ বিষদ্বারা মনুষ্যদেহ (বাহ্যিক বা আভ্যন্তরিক) আক্রান্ত হইলে তাহাতেও ভয়ানক শোথ জন্মিতে পারে।

শোথ-রোগের বিষয় লিখিতে আরম্ভ করিয়া যে যে রোগের উপসর্গরূপে যেরূপভাবে শোথ জন্মিতে পারে এবং নিজ অর্থাৎ দোষজ শোথই বা কি, তাহা পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞামত ক্রমশঃ খুব্ সংক্ষেপে বলা হইল। অতঃপর উক্ত উভয়বিধ শোথরোগের চিকিৎসার বিষয় ক্রমশঃ বিবৃত হইবেক। তন্মধ্যে অগ্রে নিজ অর্থাৎ দোষজ (বাতপিত্তাদিদোষজনিত) শোথের চিকিৎসার বিষয়ই অগ্রে বলিব। এস্থলে পাঠকবর্গের স্মরণার্থ একথা বলা আবশ্যক যে, এই দোষজ শোথের বিষয় অর্থাৎ কারণ ও লক্ষণাদি ৩য় খণ্ড সম্মিলনীর ১১শ ও ১২শ সংখ্যায় (৩৭৭ পৃষ্ঠা হইতে ৩৮১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত) বিশেষ রূপে বিবৃত হইয়াছে।

শোথ—চিকিৎসা।

নিজ অর্থাৎ বাতাদি দোষজ শোথই হউক, অথবা ঔপসর্গিক (জ্বরাদি রোগে উপসর্গরূপে উৎপন্ন) শোথই হউক, এই উভয়বিধ শোথের চিকিৎসার পূর্ব্বে অগ্রে সর্ব্বতোভাবে ইহা দেখা আবশ্যক যে, রোগীর দাস্ত হয় কেমন, যেহেতু যে কোন শোথ রোগীই কেন না হউক, যদি তাহার বিশেষরূপ কোষ্ঠবদ্ধ বর্ত্তমান থাকে, তবে সে স্থলে বিবেচনা-পূর্ব্বক দাস্তকারক ঔষধ প্রদান করিয়া রীতিমত বিরেচন করাইলেই অতি অল্পেতেই তাহার সেই শোথের নিবৃত্তি হইতে পারে। কিন্তু শোথরোগীর পেটের অসুখ অর্থাৎ অত্যন্ত পাতলা দাস্ত হইতে থাকিলে সে খানে আর এনিয়ম খাটিবে না। যাহা হউক, সচরাচর দাস্ত কঠিন অবস্থায় শোথ-রোগীর সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা লিখিতেছি।

১। শোথরোগে বাতাদিদোষ বিবেচনা করিয়া লঙ্ঘন, পাচন, নস্য এবং বিরেচকাদি ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ যদি বোঝা যায় যে, প্রভূত অপক্করস-জন্য শরীরে শোথ জন্মিয়াছে, তবে সেইরূপ স্থলে রোগীকে উপবাস করাইলেই শোথের শান্তি হইতে পারে। সেইরূপ অধোভাগ গত দোষে বিরেচকাদি ঔষধেও শোথের শান্তি হয়।

শোথে—পুনর্নবাষ্টক।

যে শ্রেণীরই শোথ হউক না কেন, প্রায় অধিকাংশ স্থলেই পুনর্নবাষ্টক ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় কাজ করে। এমন শত শত রোগীর উপর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যাহারা বহুকাল পর্য্যন্ত পুরাতন জ্বর, অরুচি ও ভয়ানক শোথগ্রস্ত হইয়া রাশি রাশি এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি ঔষধ সেবন করিয়া বিন্দুমাত্রও উপকার পায়নাই, পুনর্নবাষ্টক একাই সেই সমস্ত রোগীকে ১০।১৫ দিনের মধ্যেই নীরোগ করিয়া তুলিয়াছে। এখন পুনর্নবাষ্টক ব্যাপারটা কি, তাহা বলিতেছি। শাস্ত্র বলেন—

"পুনর্নবানিম্বপটোলশুণ্ঠীতিক্তামৃতাদার্ব্বভয়াকষায়ঃ।
সর্ব্বাঙ্গশোথোদরপার্শ্বশূলশ্বাসান্বিতং পাণ্ডুগদং নিহন্তি।"

অর্থাৎ শ্বেতপুনর্নবা (কলিকাতা অঞ্চলে ইহাকে শ্বেত শেঁপুণ্যে বা শ্বেতগাধো শাক বলে। ইহা সাধারণতঃ দুই প্রকার হয়, এক শাদা ডাঁটা এবং অপর প্রকার ডাঁটা ও পাতায় লাল্‌চে আভা থাকে, তন্মধ্যে শ্বেতটীই প্রশস্ত এবং এস্থলেও বিশেষরূপে অভিপ্রেত), নিমছাল (নিম্ববৃক্ষের মূলের ছাল হইলে আরও ভাল হয়), পল্‌তা, শুঁঠ, কট্‌কী, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা এবং হরীতকী। এই আটখানি দ্রব্যের নামই পুনর্নবাষ্টক। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিকে এই পাঁচন দিতে হইলে এই আট খানি দ্রব্য মোট দুইতোলা অর্থাৎ প্রত্যেক দ্রব্য ।০ চারি আনা ওজনে লইয়া (পুনর্নবা, নিমছাল, গুলঞ্চ ও পল্‌তা কাঁচা লইলে প্রত্যেকটী দ্বিগুণ মাত্রায় লওয়া আবশ্যক) একত্রে উত্তমরূপে থেঁতো করিয়া ৵৷০ সের জলে জ্বাল দিয়া ৵৹ অর্দ্ধ পোয়া শেষ থাকিতে নামাইয়া প্রাতে শোথরোগীকে পান করিতে দিবে।

ইহাদ্বারা প্রত্যহ শোথরোগীর ২। ৩ বার বা তদধিক বার দাস্ত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ শোথ, উদররোগ, পার্শ্ববেদনা, শ্বাস এবং পাণ্ডু প্রভৃতি রোগের শান্তি হইতে পারে।

এত গেল কেবল শাস্ত্রের কথা, কিন্তু কেবল শাস্ত্রের প্রতি একান্ত নির্ভর করিয়া ত আর চিকিৎসা চলিতে পারে না,* কেন পারে না তাহা বলি, মনে কর শাস্ত্র কেবল উক্ত পুনর্নবাষ্টক পাঁচনের দ্রব্যের নাম এবং সর্ব্বাঙ্গ শোথনাশক প্রভৃতি কতকগুলি গুণকীর্ত্তন করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন, কিন্তু তাই বলিয়া কি এই ধরণের পুনর্নবাষ্টক যথার্থই সর্ব্বপ্রকার শোথের শান্তি করিতে সমর্থ হইবে? কখনই নহে, কেন পারে না, তাহাও শোন; [illegible] যেখানে শোথরোগীর প্রত্যহ ২।৪ বার করিয়া পাতলা দাস্ত হয়,

---

[illegible] বলেন—

* "নচৈকান্তেন নির্দ্দিষ্টেঽপ্যর্থেঽভিনিবেশের্বুধঃ॥"

অর্থাৎ—পণ্ডিত ব্যক্তি একান্তনির্দ্দিষ্ট কোন বিষয়তেই অভিনিবেশ করিবেন না।

সে খানে উক্ত পুনর্ন্নাষ্টক দ্বারা আরও অপকার অর্থাৎ দাস্তের মাত্রা বৃদ্ধি হইয়া অনিষ্ট ঘটিতে পারে, সেইরূপ যে শোথরোগীর অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, তাহারও পক্ষে ঠিক্ এই ধরণের পুনর্নবাষ্টকে হয় ত বিশেষ কিছু উপকারই হইবে না। কারণ উপরোক্ত মাত্রানুযায়ী ঔষধদিলে রোগীর তদ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়া সুতরাং শোথেরও শান্তির সম্ভাবনা কম। সুতরাং—কেবল পুনর্নবাষ্টক বলিয়া নহে, প্রয়োগ কর্ত্তার বিবেচনার উপর সকল ঔষধেরই গুণাগুণ নির্ভর করে। যাহা হউক, পুনর্নবাষ্টক পাঁচনের প্রয়োগ সম্বন্ধে এই বুঝিতে হইবেক যে, যদি রোগীর অধিক কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, তবে উপরোক্ত আটখানি দ্রব্যের মধ্যে কট্‌কী ও হরীতকী এই দুইটী বিশেষ বিরেচক দ্রব্যের পরিমাণ আবশ্যকানুসারে খুব্ বেশী অর্থাৎ।০ আনা, ॥০ আনা ৸০ বার আনা অথবা তদধিক পর্য্যন্ত মাত্রায়ও ব্যবহার করিতে হইবেক। পক্ষান্তরে শোথ রোগীর পেটের দোষ অর্থাৎ পাতলা দাস্ত থাকিলে এই দুইখানি দ্রব্য একবারেই প্রয়োগ করিবে না। এবং আবশ্যক মত উহার পরিবর্ত্তে শুষ্ক মুলা এবং পুনর্নবার মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াও দেওয়া যাইতে পারে। ক্রমশঃ—

ইনি আবার কি বলেন?

চিকিৎসা-শাস্ত্র নাওয়ারিস মাল, যেন ব্রহ্মডেঙ্গার কুল গাছ, যে পায় সেই একটা কুল পাড়িয়া খায়। এইরূপ নাওয়ারিস মাল হইবার কারণ চিকিৎসা-শাস্ত্রের অনিশ্চয়তা। একটা সহজ কথায় লোকে বলে কিসে কি হয় কিছুই বলা যায় না। এই জন্যই বড় বড় ডাক্তার কবিরাজেরা তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার বলে যে সকল রোগ আরাম করিতে পারেন না, সময় সময় তাহাদেরও দুই একটী কি জানি কি করিয়া কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য অকাল কুষ্মাণ্ডের হাতেও আরাম হইয়া যায়। আসল কথা অনেক রোগ আপনাআপনিই সারিতে পারে। সচরাচর দেখিতে পাই, বৃক্ষের ছাল তুলিয়া লইলে কিছু কাল পরে আপনাআপনিই নূতন

ছাল জন্মাইয়া বৃক্ষের ক্ষতটি ভরিয়া যায়। এই কারণবশতই হোমিও-প্যাথি মহাশয়েরা বিন্দুমাত্র এলকোহল মদিরার সাহায্যে দুই চারিটী রোগীকে আরাম করিয়া তোলেন। যে কলেরা রোগ আরাম করিবার জন্য হোমিওপ্যাথির এত প্রতিপত্তি, আমরা পল্লিগ্রামে ইতর লোকের মধ্যে দেখিতে পাই, সেই কলেরা রোগও শতকরা ৫০।৬০ জন আপনা আপনিই সারিয়া যায়। আর কলেরা সাংঘাতিক রূপধারণ করিলে হোমিওপ্যাথি তার কাছেও অগ্রসর হইতে পারেন না, ইহা সচরাচর দেখা যায়। বিগত বৎসরের কলিকাতার কলেরাই তাহার প্রমাণ। হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসক মহাশয়েরা কলেরা রোগীর মূত্র আনয়ন করিবার জন্য ক্যানথেরিস ও টেরিবিন্থ প্রয়োগ করেন। বলা হয় যখন রিএক্‌সন্ (প্রতিক্রিয়া) আরম্ভ হইবে, বাহ্যে বমি থামিয়া যাইবে, তখনই উক্ত ঔষধদ্বয় প্রয়োগ করিবে, নচেৎ কাজ হইবে না। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, বাহ্যে বমি থামিয়া গেলে ঔষধ দেও বা না দেও, যে রোগী বাঁচিবার হয়, তাহার আপনা হইতেই প্রস্রাব হয়। রিএক্‌সন্‌ হইবার অগ্রে হোমিও-প্যাথির ক্যানথারিসে কোন কাজ করে না, তবে আর ঔষধের জোরে রোগীর প্রস্রাব হইল কেমন করিয়া বলিব? যদি সব রোগ আরাম করিতে পারিতে, তবে বুঝিতাম হোমিওপ্যাথি, বিজ্ঞানের উন্নতিজনিত এবং এল-প্যাথি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তবে লোকের বিশ্বাস স্বতন্ত্র জিনিষ, লোকে যাহা নূতন দেখে, রোগের যাতনায় তাহাই একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে, কি জানি যদি কিছু ফল পাই। যেমন পবিত্র সনাতন ধর্ম্মের মধ্যে কর্ত্তা-ভজা প্রভৃতি নানা সম্প্রদায় আছে, চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যে হোমিও-প্যাথিও সেইরূপ একটী। চিকিৎসা-শাস্ত্র অনিশ্চিত, সকল প্রণালী-মতেই রোগ আরাম হইতে পারে, তবে বেশী আর কমি, এই গূঢ় রহস্যটী অব-গত হইয়াই সম্মিলনী সম্পাদক মহাশয়দ্বয় ব্রাহ্মধর্ম্মের নববিধানের ন্যায় এই চিকিৎসাসম্মিলনী পত্রিকার সৃষ্টি করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কতকগুলি স্বার্থপর লেখকের জন্য সম্মিলনী আজ অসম্মিলনে পরিণত হইতে চলিল। সম্প্রতি ডাক্তার হরনাথ বাবু যে ধরণে চিকিৎসা-সম্মি-লনীতে প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস, হোমিওপ্যাথিই

জ্বর চিকিৎসা এবং জ্বররোগে এলোপ্যাথি কিছুই নহে। তিনি কবিরাজী চিকিৎসাকেও অব্যাহতি দেন নাই, তবে সে সব কথার প্রতিবাদ করা আমার সাজেনা, যেহেতু আমি কবিরাজ নহি। তবে ভরসা করি, চিকিৎসা-সম্মিলনীর অন্যতর সম্পাদক মহাশয়ই আপন সম্মান রক্ষা করিবেন।

বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠে জানা যায়, কোন এক ব্রাহ্মণসন্তান হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ কালাপাহাড় নাম ধারণ করিয়া জগন্নাথদেবকে ভস্মীভূত করিয়াছিল। হরনাথ বাবু এলোপ্যাথিক স্কুলে দীক্ষিত হইয়া চিরকাল এলোপ্যাথিতে জীবন কাটাইয়া শেষটায় বৃদ্ধ বয়সে বলিয়া ফেলিলেন, জ্বরচিকিৎসায় এলোপ্যাথি নিস্ফল। হরনাথ বাবুর প্রবন্ধটী পড়িতে আরম্ভ করিয়া মনে করিলাম ইনি বুঝি ভাল কথাই বল্‌ছেন, ও মা! শেষে দেখি ক্রমেই গুণ জাহির করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখানে একটা বেশ মজার কথা মনে পড়িল। আমাদের দেশে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারকেরা এক পয়সা আধ পয়সা দামের ছোট ছোট বই বিক্রয় করে। সে বই গুলিতে প্রথমে রামমণি সুশিলা প্রভৃতিকে লইয়া একটা গল্প আরম্ভ হয়। প্রথমে পড়িতে বেশ লাগে। ওমা! শেষে দেখি পাদ্রি মহাশয় বল্‌ছেন তোমার সমস্ত ধর্ম্ম মিথ্যা, যদি উদ্ধার হইতে চাও তবে প্রভু যীশুখৃষ্টের শরণাপন্ন হও!

হরনাথ বাবু বলেন, এক্ষণে এলোপ্যাথি চিকিৎসক মহাশয়েরা যদিও ভাগ্যক্রমে ২। ৪ টী রোগীকে জ্বর হইতে মুক্ত করেন ইত্যাদি। হরনাথ বাবু কি করিয়া এমন কথা মুখ দিয়া বাহির করিলেন আমরা বুঝিতে পারি না। হোমিওপ্যাথির আমদানি ত সে দিন হইয়াছে। এখনও প্রায় সকলেই স্বীকার করিবেন যে বাঙ্গালা দেশের প্রায় ৮৵০ আনা জ্বররোগী শুধু এক এলোপ্যাথি চিকিৎসায় আরাম হইতেছে। এমন স্থান অতি বিরল, যে খানে ডাক্তার ও কুইনাইন না আছে। যেখানে জ্বরের মহামারী উপস্থিত হয়, সেখানে হোমিওপ্যাথির বড় একটা ডাল গলে না। ভালই হউক আর মন্দই হউক, সেখানে কুইনাইন ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। হাউয়ার্ডের কুইনান প্রতি বৎসর এ বাঙ্গালাদেশে কত কাইল

বিক্রয় হয়, হরনাথ বাবু কি তার খবর রাখেন না? যদি কুইনাইনে কুফলই ফলিবে, তবে লোকে এত কুইনাইন ক্রয় করিবে কেন? কুইনাইন আছে বলিয়াই এই ম্যালেরিয়াসঙ্কট দেশে লোকে এক মুঠা অন্ন করিয়া খাইতেছে। তবে কুইনাইনের অপব্যবহারে সময় সময় কুফল ফলে বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া কি করা যায়? কারণ কম্পজ্বরের কাছে হোমিওপ্যাথির তত জারি জুরি খাটে না ইহা ধরা কথা। বড় বড় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারগণ বলেন, জ্বরে হোমিওপ্যাথি অতি অনিশ্চিত, কারণ ঔষধ নির্ব্বাচন করা অতীব দুরূহ, তবে কোন কোন একজ্বরে রোগী যেমন কোন কোন রেমিটেণ্ট ফিবার, ভোগটুটিলে দিন গত হইলে আপনা আপনিই সারিয়া যায়। এই সকল জ্বরে হোমিওপ্যাথি কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা। হরনাথ বাবু বলেন "আমি যখন বর্দ্ধমানে এপিডেমিক ইনস্‌পেক্টার ছিলাম, তখন ঐ প্রদেশে জ্বরের মহামারী উপস্থিত হয় এবং সমস্ত রোগী কুইনাইন মিকশ্চার দ্বারা চিকিৎসিত হয়, কিন্তু উক্ত ঔষধদ্বারা মহামারীর কোন উপশম না হইয়া বরং দিন দিন বৃদ্ধি হয় এবং যত লোক কুইনাইন সেবন দ্বারা প্রথমে আরোগ্য হইয়াছিল, সকলেই পরে প্লীহা ও যকৃত পীড়াদ্বারা আক্রান্ত হয়"। আমরা বিশেষরূপ অবগত আছি, যখন নদীয়া জেলার মেহেরপুর অঞ্চলে ম্যালেরিয়া হয় তখন ঐ প্রদেশে কুইনাইনের তত প্রচলন ছিল না, লোকে কবিরাজী চিকিৎসাই করাইত, তত্রাচ প্রায় দশ আনালোক মারা পড়িয়া ছিল। এবং যাহারা বাঁচিয়াছিল তাহারাও প্লীহা যকৃতে আক্রান্ত হইয়াছিল। হরনাথ বাবু একথার কি উত্তর দিবেন? কুইনাইনে ব্যক্তিবিশেষের জ্বর আরাম করিতে পারে, কিন্তু দেশের জলহাওয়ার গতিফিরাইতে পারে না। ১৮৮১।৮২ সালে রাণাঘাট উলা প্রভৃতি স্থানে ভয়ানক ম্যালেরিয়া হয়, সেখানে সেবার অনেক গুলি কুইনাইন আওলা ডাক্তার থাকাতে শতকরা প্রায় ৯৮ জন লোক বাঁচিয়া ছিল এবং ভদ্রলোকের মধ্যে প্রায় কেহই প্লীহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল না। রোগী যে কুইনাইন খাইয়া পুনঃ পুনঃ জ্বরাক্রান্ত হয়, সেটা অনেকস্থানেই স্থানীয় জল বায়ুর দোষ। সেখানে পুনঃ পুনঃ কুইনাইন নাখাইলে এবং বিশেষ তদ্বিরে না থাকিলে

নিশ্চয় মৃত্যু। ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানে কুইনাইন সাহায্যে বরঞ্চ গড়াইয়া গড়াইয়া জীবনটা রক্ষা হয়, কিন্তু বিনা কুইনাইনে প্রথম ধাক্কাতেই কাজ করশা, সুতরাং তখন আর যকৃত প্লীহার হাতে পড়িতে হয় না। সেই রাণাঘাটের ধাত ছাড়া কম্পজ্বর মনে করিলে আমার এখনও শরীর শিহরিয়া উঠে। ভাগ্যে কুইনাইন ও ব্রাণ্ডি ছিল, সেই রক্ষা। সেই সকল স্থলে হোমিওপ্যাথির "কাল্পনিক ঔষধে' কিছু মাত্র ফল ফলিবার সম্ভাবনা নাই। রাণাঘাটের নিকট হালালপুর বলিয়া একখান মুসলমানের গ্রাম আছে, তাহারা ডাক্তার দেখাইত না, তাহাদের প্রায় চৌদ্দ আনা লোক সেবার প্লীহাক্রান্ত হইয়াছিল। যাহারা সময়ে কুইনাইন খায় এবং বিশেষ তদ্বিরে থাকে, কেবল তাহারাই ম্যালেরিয়া প্রদেশে প্লীহার হাত হইতে নিস্তার পায়। তবে ছোটলোক ও গরিব লোকেরা সেরূপ তাদ্বরে থাকিতে পারে না। এবং এক দিন জ্বর না আসিলেই ঔষধ খাওয়া বন্ধ করে। আমার নিজের জ্বর হইলে আমি আকণ্ঠ কুইনাইন খাইয়া থাকি, কই আমার ত পুনঃ পুনঃ জ্বর ফিরে না! এবং কোনও ধনাঢ্য লোককেত কুইনাইন খাওয়ার পর পুনঃ পুনঃ জ্বরভোগ করিতে দেখিনাই! তবে মুদি মুসলমান যাহারা দাতব্য চিকিৎসালয়ে গিয়া ঔষধ খায় এবং অত্যাচার করে, তাদের স্বতন্ত্র কথা। সময় সময় কাঁচা জ্বরে অতিরিক্ত কুইনাইন খাওয়াতে পরিণামে প্লীহা যকৃত হইতে পারে একথা স্বীকার করি, কিন্তু সেটী এলোপ্যাথি চিকিৎসার দোষ বলা যায় না, আর দোষ হইলেও নির্দ্দোষ নিখুত সকল গুণে, গুণবতী চিকিৎসা-প্রণালী পাই কোথা? সে মৃতসঞ্জিবনী পরম বস্তুলাভ করিতে পারিলে আর এসংসারে কাহাকেও অকালে মরিতে হইত না। কোথায় একটু অপকার আনয়ন করিবার আশঙ্কায় "অহিংসা পরম ধর্ম্ম বলিয়া চুপকরিয়া হোমিওপ্যাথির বিন্দুর উপর জীবন নির্ভর করিয়া সকল সময়ে নিশ্চিন্ত থাকা বিশেষ তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি ভিন্ন অপর সাধারণের পোষায় না, সাহসও হয় না। যে বর্দ্ধমানের লোকের কুইনাইনের উপর অভক্তি হইয়াছিল, তাহারাই আবার "পুনর্মুষিক' হইয়াছে। হরনাথ বাবু তদারক করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবেন। ক্রমশঃ—

শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্যাল এম, বি।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ইতিপূর্ব্বে ডাক্তার হরনাথ বাবু, এলোপ্যাথি ও কবিরাজী চিকিৎসার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়া যে, প্রবন্ধ লেখেন, ডাক্তার পুলিন্ বাবু তাহারই প্রতিবাদ করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এইরূপ প্রতিবাদ-সম্বন্ধে আমাদেরও কিছু লিখিবার আছে,তবে লেখক মহাশয়ের "ক্রমশঃ" দেখিয়া এবারে বিরত থাকিলাম। আশা করি, পুলিন বাবু, আগামী বারেই এই প্রবন্ধ শেষ করিয়া আমাদিগের লিখিবার পথ কিঞ্চিৎ প্রশস্ত করিয়া দিবেন।

চি, স, স,

ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ-প্রণালী।

(কবিরাজীমতে।)

সুধাশীকর বটী

বা

লালবটী।

রসসিন্দুর ১০, * হিঙ্গুল ৭, রসমাণিক ৩,* গন্ধক ১

প্রথমতঃ রসসিন্দুর প্রভৃতি দ্রব্যগুলি পৃথক পৃথক করিয়া সুদৃঢ় পাথরে বা খল্লে চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। দুটী আঙুলের মাঝে গুঁড়া রাখিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া দেখিবে, যখন কেতকী পুষ্পের ধূলির ন্যায় কোমল বোধ

হইবে, কিঞ্চিৎমাত্রও খরস্পর্শ বোধ হইবে না, তখন চূর্ণ সুসিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। একটী দ্রব্য গুঁড়া করা হইলে সেটী তুলিয়া রাখিয়া পাত্রটী পরিষ্কার করিয়া লইয়া আর একটী চূর্ণ করিয়া লইবে। এইরূপে উক্ত দ্রব্য চতুষ্টয় চূর্ণ করা হইলে, একে একে ওজন করিয়া পরপর মিশাইবে। ঔষধের উপাদান কয়েকটীর ভাগ পর পর ১০, ৭, ৩ এবং ১ সংখ্যা দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রয়োজনানুসারে;—দশ, সাত, তিনএবং এক কর্ষ-ভাগে কিম্বা ১০, ৭, ৩ এবং ১ তোলক-ভাগে অথবা তদর্দ্ধ বা তৎপাদ ভাগেও লওয়া যাইতে পারে। ঔষধ মিশান হইলে কিছুক্ষণ ধরিয়া মাড়িবে, তার পর ঘৃতকুমারীর রসে দুই প্রহর কাল মর্দ্দন করিবে। বটী বাঁধিবার উপযুক্ত হইলে ২ দুইরতি প্রমাণ বটী বাঁধিবে।

রসসিন্দুর;—পারদ এবং গন্ধক, এই উভয় পদার্থকে সমভাগে একত্র মাড়িয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়াবিশেষে রসসিন্দুর প্রস্তুত হয়। রসসিন্দুর সুস্তাকার উজ্জ্বল লোহিত দানাবিশিষ্ট, ভঙ্গুর অল্প পরিমাণে চাপ বা আঘাত লাগিলে দানাগুলি বিযুক্ত হইয়া পড়ে। মাড়িলে সিন্দুরের ন্যায় হয়। অচূর্ণ অবস্থায় চটী আকারে থাকে। বাজারে যে সকল রসসিন্দুর সচরাচর বিক্রয় হয়, তাহার চটী গুলি অত্যন্ত পুরু। মৃদু এবং মধ্যপাকের রসসিন্দুর ক্ষণভঙ্গুর এবং স্নিগ্ধ লোহিতচ্ছবি; খরপাকের রসসিন্দুর, অভঙ্গুর যাদিলে সহজে ভাঙ্গে না এবং রুক্ষ, লোহিত, কদাচিৎ বা ঈষৎ কৃষ্ণচ্ছবি। রস-শাস্ত্রে রসসিন্দুর প্রস্তুতের যেরূপ উপদেশ আছে, বাজারের রসসিন্দুর সে নিয়মানুসারে প্রস্তুত নহে, এজন্য উহা অপ্রশস্ত। অপ্রশস্থ হইলেও একান্ত গুণহীন নহে। বক্ষ্যমাণ ঔষধে আমরা বাজারের রসসিন্দুর ব্যবহার করিয়া থাকি, কিন্তু উহা মৃদু ও মধ্য পাকের হওয়া আবশ্যক। ঐপ্রকার রসসিন্দুর ব্যবহারে একান্ত নিষ্ফলতা ঘটে না। তবে যথা বিহিত প্রস্তুতীকৃত রসসিন্দুর যোগে প্রস্তুত করিলে যেরূপ ফলপ্রদ হয়, ইহাতে তদ্রূপ হয় না। রস শাস্ত্রে রসসিন্দুর প্রস্তুত করণের প্রণালী এইরূপ;—

শোধিত পারা ৮ তোলা—শোধিত গন্ধক ৮ তোলা একত্র কজ্জলী

করিবে। কজ্জলী সুপর্দ্দ হইলে কোমল বটের ঝুরির রস দিয়া বা নিসিন্দাপত্রের স্ব-রস দিয়া মাড়িবে। তার পর শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিবে। এইরূপে সিদ্ধ কজ্জলী কবটী যন্ত্রে স্থাপিত করিয়া বালুকা যন্ত্রমধ্যে রাখিয়া পাক করিলে রসসিন্দুর প্রস্তুত হয়। যন্ত্র রচনা ও পাকপ্রণালী এই-রূপ ;—

বোতল সকলেরই পরিচিত দ্রব্য। বর্ণনার সুবিধার জন্য বোতলের সাকল্য অবয়বটী চারি অংশে বিভাগ করিয়া বলা আবশ্যক। প্রথম অংশ তলপ্রদেশ, দ্বিতীয় দেহভাগ, তৃতীয় গলদেশ, চতুর্থ মুখনল। যে বোতলের গলদেশ তির্য্যক্‌ভাবে উঠিয়া মুখনলের সহিত মিলিত হয়, তাদৃশ বোতল যন্ত্রনির্ম্মাণের উপযোগী নহে। যাহার গলদেশ সমস্তাৎ প্রায়শঃ সরলরেখাক্রমে চলিয়া গিয়া মুখনলের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, এইরূপ বোতল যন্ত্রপ্রস্তুত করণের—উপযোগী। কারণ এই অংশে ঔষধ সঞ্চয় হইয়া দাঁড়াইবে। প্রথমোক্ত প্রকারের হইলে দ্রব্য সঞ্চয়ের স্থান হয় না।

উক্ত বোতলের তলভাগ সমতল হওয়া আবশ্যক। অনেক বোতলের তলদেশ সমান নহে, কুব্জ ভাবে উত্থিত। সেরূপ হইলে কাজ চলিবে না। বোতলটী বেশ দৃঢ় এবং অস্বচ্ছ হওয়া আবশ্যক। উক্ত প্রকারের বোতলকে সচরাচর লোকে গেঁটে বোতল বলে।

একটী সুদৃঢ় গেঁটে বোতল বাছিয়া লইয়া অভ্যন্তর ভাগ বেশ পরিষ্কার করিয়া লইবে। ভাল ছানা আটাল মাটী অল্প পরিমাণ তুষ এবং পাটের কুচির সহিত মিশাইয়া মর্দ্দন করতঃ সেই বোতলটীর তলদেশ ভিন্ন সর্ব্বা-বয়বে পাতলা লেপ দিবে। তদুপরি একখণ্ড সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ডে কাদা মাখা-ইয়া বেষ্টন করতঃ অল্প শুকাইয়া লইবে। তৎপরে আবার লেপ দিবে। বোতলের গল এবং নলদেশের সন্ধিস্থলে লেপটী পুরু করিয়া দিতে হইবে। তদুপরি আর একখান বস্ত্র খণ্ডে ঘন কাদা মাখাইয়া জড়াইয়া দিবে। তার পর বেশ করিয়া শুকাইয়া লইবে।

এইরূপ বোতলের ভিতর পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কজ্জলী বেশ সাবধানে পূরিবে। পূরিবার সময় যেন কজ্জলী বোতলের গায়ে না লাগে। তার

পর একখান খড়ি চাঁচিয়া কি কাগজ জড়াইয়া ছিপি প্রস্তুত করতঃ বোতলের মুখে আল্‌গাভাবে লাগাইয়া দিয়া রাখিবে।

কথিত প্রকারে প্রস্তুত করা যন্ত্রের নাম কবচী যন্ত্র। কবচী যন্ত্রে ঔষধ বদ্ধ করা হইলে বালুকা যন্ত্রে উক্ত যন্ত্র বদ্ধ করিতে হয়। তাহার নিয়ম বলা যাইতেছে।

একটী বেশ সুদৃঢ় হাড়ী লইয়া তাহার তলদেশে ঠিক মধ্যস্থলে কনিষ্ঠ অঙ্গুলের অগ্রভাগ যায় আসে, এরূপ একটী ছিদ্র করিবে। যে হাড়ীতে যন্ত্রটী বসাইলে বোতলের মুখনলের ২ অঙ্গুল স্থান হাঁড়ীর কানা হইতে উচু থাকে এরূপ আকারের হাঁড়ী গ্রহণ করিতে হয়। কবচী যন্ত্রটী হাঁড়ীতে এরূপভাবে বসাইবে যেন হাঁড়ীর তলার ছিদ্রটী বোতলের তলার ঠিক্ মধ্যস্থলে থাকে। তার পর নিম্ন হইতে চারি অঙ্গুল প্রমাণ দেহভাগ আচ্ছাদিত হয় এরূপভাবে শুষ্ক শ্লক্ষ্ম বালুকা দিয়া পূর্ণ করিবে। তার পর বোতলের গা বাহিয়া গলদেশ হইতে চারিদিকে লবণ ছাড়িয়া দিবে। বোতলের গল ও নলের সন্ধিস্থল পর্য্যন্ত লবণ যেন চূড়া আকারে দাঁড়ায়। তদনন্তর স্থালীর অবশিষ্ট ভাগ বালি দিয়া পুরাইয়া চাপিয়া দিবে। এইরূপে বোতলের সর্ব্বাবয়ব আচ্ছাদিত হইবে, কেবল মুখনলের দুই অঙ্গুল ভাগ জাগিয়া রহিবে।

এখন স্থালীটী চুল্লীতে চাপাইয়া সমভাবে নাতিতীব্র জ্বাল দিবে। জ্বাল অবশ্য কাষ্ঠের দ্বারা দিতে হইবে। এদিকে দুইটী লৌহশলাকা প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। শলাকা কনিষ্ঠাঙ্গুলির পরিণাহতুল্য এবং চারি প'লে হওয়া আবশ্যক। শলাকার অগ্রভাগ সরু হইবে। পশ্চাৎ ভাগে কাঠের আছাড় লাগাইয়া লইবে।

জ্বাল দিতে দিতে যখন দেখিবে বোতলের ছিপির পাশ দিয়া ধুঁয়া দেখা গিয়াছে, তখন দুটী শলাকা আগুনে দিয়া রক্তবর্ণ করিয়া লইবে। বেশ ধুঁয়া দেখা দিলে হয় ছিপিটী আপনি উঠিয়া যাইবে নয় ছিপিটী তুলিয়া ফেলিয়া দিয়া একটী অগ্নিবর্ণ শলাকার অগ্রভাগ দ্বারা বোতলের গলদেশের অভ্যন্তর ভাগ ঘুঁটিয়া দিবে। কিছুক্ষণ পরে সেটী আগুনে দিয়া অপরটী লইয়া ঐরূপ করিবে। এইরূপে মধ্যে মধ্যে বোতলের

মুখমলের এবং গলদেশের গাদ পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে। কেহ কেহ উক্ত বিধ শলাকাদ্বারা বোতলের তলস্থিত ঔষধ মাঝে মাঝে ঘুঁটিয়া দিয়া থাকেন। তথাবিধ প্রক্রিয়ার সময় বিশেষতঃ প্রথমবার প্রচণ্ড অগ্নিশিখা উত্থিত হয়, সুতরাং খুব সাবধানের সহিত কাজ করিতে হয়। প্রতপ্ত শলাকাদ্বারা তলদেশ ঘুঁটিয়া দিলে পাক কার্য্য খুব সত্বর হয়। কাজটী ভাল কিনা বলিতে পারি না। ঐরূপ না করাই ভাল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বোতল মুখ সর্ব্বদাই উক্ত প্রণালীতে পরিষ্কার রাখিবে। জ্বাল দিতে দিতে বোতলের তলদেশে দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। উহা প্রথম প্রথম ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেখা যাইবে; পর পর পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। শেষে অগ্নিবর্ণের মধ্যে তরল কৃষ্ণরেখা দেখা যাইবে। সর্ব্বশেষে তাহাও থাকিবে না, কেবল অগ্নিবর্ণমাত্র দৃষ্টিগোচর হইবে। যে মুহূর্ত্তে তরল কৃষ্ণ-রেখা ঘুচিয়া অগ্নিবর্ণ ধারণ করিবে, সেই মুহূর্ত্তে যন্ত্রটী সাবধানতার সহিত নামাইয়া ফেলিবে। চারি প্রহরে পাক কার্য্য সমাধা হয়। কাঁটা পোড়াইয়া তলদেশ পর্য্যন্ত দিলে ২ প্রহর বা তন্ন্যূন কালেও পাকসিদ্ধ হয়। কিছুক্ষণ পরে হাঁড়ীটা আস্তে আস্তে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বোতল বাহির করিয়া লইবে। বোতলের তল হইতে অর্দ্ধ দেহভাগ বিযুক্ত করিলে গলদেশে তরুণ অরুণ সন্নিভ রসসিন্দুর সঞ্চয় হইয়াছে দেখা যাইবে। ভাঙ্গিবামাত্র ঔষধটী যদি সমল দেখায়, তাহা হইলে উত্তপ্ত বালুকার মধ্যে বোতল খণ্ড কিছুক্ষণ বসাইয়া রাখিবে। তাহা হইলে পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। তৎপর বেশ জুড়াইয়া গেলে ছুরিকাদ্বারা চটি তুলিয়া লইবে।

মৃদু ও মধ্যপাকের রসসিন্দুর ঔষধার্থ ব্যবহার্য্য, খরপাক হইয়া গেলে ত্যাগ করিবে।

ক্রমশঃ—

শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন।
মাগুরা, (খুলনা)।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

অনেক দিন হইতে অনেক গ্রাহকেই কবিরাজী-মতের রসসিন্দূর প্রস্তুত-প্রণালী সুচারুরূপে জানিবার জন্য আমাদিগকে পত্রাদি লিখিয়া আসিতেছেন। অবসর মত আমরা কাহাকে লিখিয়াও পাঠাইয়াছি। বাঁকী যাঁহাদিগকে লিখিতে পারিনাই, আশা করি, তাঁহারা শীতল বাবুর প্রবন্ধ পাঠে পরমসুখী হইতে পারিবেন। বস্তুতঃ কেবল রসসিন্দুর বলিয়া নহে, লেখক মহাশয়ের এই প্রবন্ধ যে সাধারণেরই বিশেষ আদরের হইতেছে, বোধ হয় ইহাতে আর কাহারও সন্দেহ নাই।

চি, স, স,

তৈলপাক ও প্রয়োগ-প্রণালী।

কটাহ বা কটা-পাক।

কেমন করিয়া সচরাচর ঔষধের জন্য অকৃত্রিম তৈলের সংগ্রহ করিতে হয় এবং সেই তৈল কিরূপ পাত্রে কতটুকু মাত্রায় কোন্ কোন্ কাষ্ঠ-দ্বারা জ্বাল দেওয়া আবশ্যক, তাহা গত ৪র্থ ও ৫ম ৬ষ্ঠ সংখ্যক সম্মিলনীতে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। অতঃপর আমরা তৈলের প্রথমপাকে অর্থাৎ কটা বা কটাহ পাকের বিষয় বলিতেছি।

তিল তৈল, সার্ষপতৈল অথবা রেড়ীর তৈলের যে কোন তৈল প্রয়োজন হইবেক, প্রথমতঃ তৈলের অকৃত্রিমতা পরীক্ষা করিয়া ইতিপূর্ব্ব লিখিত পাত্রের অন্যতম পাত্রে তৈল চাপাইয়া মৃদু মৃদু অগ্নিতে জ্বালদিতে আরম্ভ করিবে। * জ্বাল দিতে দিতে যখন দেখিবে যে, তৈল নিষ্ফেণ

---

* "কৃত্বা তৈলং কটাহে দৃঢ়তরবিমলে মন্দমন্দানলৈস্তৎ।
তৈলং নিষ্ফেণভাবং গতমিহযদা শৈত্যযুক্তং * * *॥"

(ফেণারাহিত) হইয়াছে, এবং তৈল হইতে খুব ধূম উত্থিত হইতেছে, তখন আম্র ও পেয়ারা প্রভৃতি পত্রের যে কোন প্রকার হউক কাঁচা পাতা লইয়া ঐ কটাহস্থ তৈলে মুহূর্ত্তকাল ডুবাইয়া ধরিবে, যদি তৈলমধ্যে উক্ত পাতা ক্ষণকাল দেওয়াতে পাতাটী সম্পূর্ণরূপে ভাজা হয় অর্থাৎ উহার রংটী শাদা রকমের ও মচ্ মচে হয় এবং হাতে লইয়া রগ্ড়াইলেই উহা গুঁড়া হইয়া যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ চুল্লী হইতে তৈল নামাইয়া রাখিবেক। ইহাকেই সর্ব্বপ্রকার তৈলের কটাহ বা কটাপাক অথবা প্রথমপাক বলে। অনন্তর যখন তৈল শীতল হইবেক, তখনই উহাতে মঞ্জিষ্ঠাদি মূর্চ্ছা দ্রব্য প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। (মূর্চ্ছাপাক কি, তাহা পরে বলিব)

যদিও তৈলের এইরূপ পাককেই সাধারণতঃ কটাপাক বলে, এবং কটাপাক করিতে হইলে উপরোক্ত নিয়মেই করিতে হয়, কিন্তু এসম্বন্ধে আরও জানা আবশ্যক যে, এই কটাপাককেই তৈলের একপ্রকার প্রধান পাক বলিতে হইবেক। কেননা এই প্রথম পাক সুচারুরূপে সম্পন্ন না হইলে মূর্চ্ছা বা ক্বাথাদিদ্বারা পাকের সময় বিষম গোলযোগ ঘটে। অর্থাৎ তৈল, কটাহে চাপাইয়া জ্বাল দিতে দিতে উহা নিষ্ফেণ হইলে যদি উপযুক্ত সময়ে চুল্লী হইতে তৎক্ষণাৎ নামাইয়া ফেলা না হয়, তবে অচিরাৎ ঐ তৈল ধূ ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে পারে। যদিও এইরূপ ভয়ানক ব্যাপার আমি কখনও স্বচক্ষে দেখিনাই, তবে আমি শুনিয়াছে যে, তৈলপাক কালে কোন কোন স্থানে এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। তদ্ভিন্ন এই কটাপাক কালে যদি তৈলের খরপাক জন্মে, তাহা হইলেও সেই তৈল তাদৃশ গুণদায়ক হয় না। পক্ষান্তরে কটাপাকে যদি তৈল কাঁচা থাকিয়া যায়, তবে তাহাতেও বিষম বিপদ ঘটিতে পারে, অর্থাৎ এই অপক্ব তৈলে পুনর্ব্বার মূর্চ্ছা ও কল্কাদি পাক করিবার সময় উহাতে ভয়ানক ফেণা অর্থাৎ উৎলাইয়া উঠিয়া অধিকাংশ তৈল চুল্লীতে পতিত সুতরাং প্রজ্জ্বলিত হইয়াও উঠিতে পারে। তদ্ভিন্ন তৈলের অতিশৈত্য প্রভৃতি দোষও ঘটিতে পারে। অতএব কটাপাক কালে যাহাতে তৈল অতিশয় খরপাক না হয়, অথচ কাঁচা ও নাথাকে. তজ্জন্য চিকিৎসকের

বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যক। এস্থলে তৈলের কটাপাক সুচারুরূপে বুঝিবার জন্য আরও বলা আবশ্যক যে, যেমন তৈলে পাতা ডুবাইয়া পরীক্ষা করা যায়, তেমন সেই সময় উক্ত তৈলে কয়েকটী ধান্য নিঃক্ষেপ করিবামাত্রেই যদি তৎক্ষণাৎ ধান্য হইতে খৈ উৎপন্ন হইয়া তৈলের উপর ভাসিয়া উঠে, তবে জানিতে হইবেক যে, কটাপাক নিস্পন্ন হইয়াছে। ফলতঃ আমার বিশ্বাস যে পত্রাদির ন্যায় ধান্য নিঃক্ষেপ করিয়াও অতি উত্তমরূপে তৈলের কটাপাক নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

ক্রমশঃ—

কলিকাতা, মাঘ। } শ্রীজগদ্বন্ধু সেন গুপ্ত।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

এসম্বন্ধে আমাদেরও বক্তব্য এই যে, কটাপাকই বল আর মূর্চ্ছাপাকই বল, পাকমাত্রেই কিন্তু কেবল বচনে অর্থাৎ বই পড়িয়া হওয়া দুষ্কর। বস্তুতঃ এই সব্ ব্যাপার সাধারণকে ভালরূপে বুঝাইবার জন্য যতই কেন উপায় অবলম্বন করা না হউক, কিন্তু যিনি এসব্ কাজ কখনও হাতে কলমে না করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে যে এসব্ কার্য্য কতদূর দূরূহ ও ভয়াবহ, তাহা তাঁহারাই জানেন, শাস্ত্রকার সেই জন্যই বলিয়াছেন—

"রত্নাদিসদসজ্জ্ঞানং ন শাস্ত্রাদেব জায়তে।"

এলোপ্যাথি মতে

জ্বর-চিকিৎসা।*

ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার বা সবিরাম জ্বর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২১৬ পৃষ্ঠার পর)

উত্তাপ অবস্থা।

৩য়। এণ্টিফেব্রীন্ আমাদিগের দেশীয় লোকদিগের জন্য ৬ গ্রেণ হইতে ৮ গ্রেণ মাত্রাব অধিক ব্যবহার করা উচিত নহে। ইহাও উত্তাপ হারক এবং অতিঘর্ম্ম কারক। ইহা অতি ঘর্ম্মদ্বারাতেই উত্তাপ হ্রাস করে। কিন্তু এই উত্তাপহ্রাসের সহিত হৃৎপিণ্ডের অবসাদন ক্রিয়া অনেক সময় প্রকাশ করে। এজন্য এই ঔষধের প্রয়োগকালে চিকিৎসকের বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। এবং ইহাদ্বারা অতিঘর্ম্ম ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের অবসাদন ক্রিয়া প্রকাশ পাইলে পূর্ব্বোক্ত ঘর্ম্মনিবারক এবং হৃৎপিণ্ডের বলকারক ও উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করিবেক।

এখন যেমন উত্তাপনাশের জন্য স্যালিসিলেড্ অব্ সোডা, এণ্টি-পাইরীন্ ও এণ্টিফীব্রীন্ সচরাচর ব্যবহৃত হয়; পূর্ব্বে জ্বরের উত্তাপে ঠিক্ ঐরূপ অবস্থাতে উত্তাপনাশের জন্য টার্টারএমেটিক্ এক গ্রেণের ৮ ভাগ হইতে ৬ ছয় ভাগ পর্য্যন্ত মাত্রায় ২। ৩ ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করা যইত। কিন্তু এই ঔষধটী বিবমিষাজনক, অতি ঘর্ম্মকারক এবং হৃৎপিণ্ডের অতিশয় অবসাদক। আর কখন কখন অতি বিরেচন ক্রিয়াও প্রকাশ করে। এজন্য ইহার ব্যবহার ক্রমে ক্রমে লোপ হইয়া গিয়াছে।

---

* এই প্রবন্ধ কোন গ্রন্থবিশেষ হইতে অনুবাদিত নহে। ডাক্তার জগদ্বন্ধু বাবু বহুকাল হইতে সহস্র সহস্র রোগীর চিকিসা করিয়া চিকিৎসা-সম্বন্ধে তাঁহার বহুদর্শনজনিত যে জ্ঞান জন্মিয়াছে, লম্বা চৌড়া ও তাবার আড়ম্বর না করিয়া অতিসংক্ষেপে কেবলমাত্র তাহাই লিখিলেন।

ম্যানেজার—চি, স, স,

আর যদি এখনও কেহ এই ঔষধ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে টার্‌টার্‌ এমিটিকের পরিবর্ত্তে জেম্‌সেজ্‌ পাউডার বা এণ্টিমনিয়াল পাউডার ব্যবহার করিতে পারেন। কারণ এণ্টিমনির এই প্রয়োগ রূপগী, টার্‌টার্‌ এমেটিক্‌ হইতে আপেক্ষাকৃত অল্প হৃৎপিণ্ড অবসাদক।

৩। বিরামাবস্থা।

উত্তাপ অবস্থার পরে যখন ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর বিরাম অবস্থায় পরিণত হয়, অর্থাৎ তাপমান যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলে যদি উত্তাপ ৯৯ডিগ্রীর অধিক না হয়। অথচ রোগীর শিরঃপীড়া, বমন, ভেদ কিংবা অপর কোন শারীরিক বিশেষ গ্লানি উপস্থিত না থাকে, কিংবা অতিঘর্ম্ম অথবা নাড়ীর অতিশয় দুর্ব্বলতা অর্থাৎ প্রতি মিনিটে ১২০ এর অধিক স্পন্দন না হয়, তাহা হইলে কুইনাইন ১০ গ্রেণ হইতে ২০ গ্রেণ পর্য্যন্ত ঐ বিরাম অবস্থার মধ্যে প্রয়োগ করিতে পারিলে রোগীর জ্বরবন্ধ হইবার সম্ভাবনা। অনেক সময় কেবল মাত্র একটী বিরামে কুইনাইনের ব্যবহারে জ্বর নিবারণ না হইতে পারে। সেস্থলে ২।৩ বিরাম অবস্থায় কুইনাইন পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা উচিত। তিন দিন পুনঃ পুনঃ প্রত্যহ ২০ গ্রেণ কুইনাইন ব্যবহার করিয়াও যদি পুনর্ব্বার জ্বর প্রকাশ পায়, তাহা হইলে জানা উচিত যে, সে জ্বর আর কুইনাইন দ্বারা বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এস্থলে কুইনাইনের ব্যবহার নিবারণ রাখিয়া কি কারণে জ্বর পুনঃ পুনঃ প্রত্যাগমন করে, তাহার অনুসন্ধান করা চিকিৎসকের আবশ্যক। অনেক সময়েতে নানারকম যান্ত্রিক উত্তেজনা থাকিতে পারে। অথচ বিশেষ কোনও যন্ত্রে প্রদাহ বর্ত্তমান থাকেন না। আর যে পর্য্যন্ত ঐ যান্ত্রিক উত্তেজনা না উপশম করা যায়, সে পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই জ্বর প্রত্যহই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেক। অথচ সে জ্বরে বিরাম অবস্থা ৫।৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিতে দেখা যায়। প্রায় ১০ মাস অতীত হইল, আমি একটী ১৭ বৎসর বয়স্ক বালকের চিকিৎসা করি। ইহার জ্বর প্রত্যহ ৭।৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বিরাম অবস্থায় থাকিত। কিন্তু জ্বর কালীন ইহার ৬ বার হইতে ১০।১২ বার সবুজ রঙের তরল ভেদ হইত। কিন্তু বিরাম অবস্থায় এই ভেদ বন্ধ

থাকিত। এই রোগীকে তিন চারি দিন পর্য্যন্ত একজন প্রধান চিকিৎসকের পরামর্শে ৩০ গ্রেণ হইতে ৪০ গ্রেণ পর্য্যন্ত কুইনাইন প্রত্যহ দেওয়া হইয়াছিল. কিন্তু কিছুতেই জ্বরের পুনরাগমন নিবারণ করা যায় নাই। এই অবস্থায় কুইনাইন দিতে আমার মত ছিল না। ৪ দিন কুইনাইন ব্যবহারের পরে যাঁহার পরামর্শমত কুইনাইন ব্যবহার করা হইয়াছিল, তিনি তখন কুইনাইন দ্বারা কোনরূপ ফলপ্রাপ্ত না হইয়া কুইনাইনের ব্যবহার নিবারণ করিতে বলিলেন। তাহার পরে রোগীর অন্ত্রের উত্তেজনা নিবারণ ও ভেদ বন্ধ করিয়া ১২ দিবস পরে বিরাম অবস্থায় ১৬ গ্রেণ কুইনাইন পুনর্ব্বার প্রয়োগ করাতেই তাহার জ্বর বন্ধ হইয়াছিল। জ্বর বন্ধ হওয়ার পর আরও দুই দিবস ১৫ গ্রেণ মাত্রায় কুইনাইন ব্যবহার করা হইয়াছিল।

গত মে মাসে একটী ১৫ বৎসর বয়স্কা ইয়ুদী জাতীয় স্ত্রীর প্রথম সন্তান প্রসবের পর জ্বর হইয়া আমার চিকিৎসাধীনে থাকে। প্রথম ৭। ৮ দিন ইহার জ্বর স্বল্পবিরাম জ্বরের ন্যায় বোধ হইল, কিন্তু অষ্টাহের পরে এই জ্বরের সম্পূর্ণ বিরাম হইতে আরম্ভ হইল, বিরাম অবস্থা ভোর ৫টা হইতে সায়ং ৩। ৪ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিত। কিন্তু জ্বরের এইরূপ বিরাম হওয়া সত্ত্বেও রোগীর বামদিকের কুচকির উপরিভাগ চাপনে অল্পবেদনা অনুভব করিত। এজন্য এ অবস্থায় আমি কুইনাইন দেওয়া উচিত বোধ করি নাই। কিন্তু আমার সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য আর যে দুইজন প্রধান ডাক্তার আনীত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পরামর্শে কুইনাইন দেওয়া শ্রেয়ঃ বোধ হওয়াতে রোগীকে প্রতি বিরাম অবস্থায় ২০ গ্রেণ মাত্রায় কুইনাইন ৪ চারি দিবস পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে জ্বরের কিছুমাত্র লাঘব না হইয়া পুনর্ব্বার সেই জ্বর একজ্বরী অবস্থায় দাঁড়াইল। তাহার পরে রোগীর সেই বেদনাস্থানের উপরে ব্লিষ্টার দিয়া বেদনা নিবারণ করিবার পর কুইনাইন প্রয়োগমাত্রেই জ্বর বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু জ্বর বন্ধ হওয়ার পরেও ৩। ৪ দিন কুইনাইন ব্যবহার করা হইয়াছিল।

ক্রমশঃ—

কলিকাতা } শ্রীজগদ্বন্ধু বসু এম, ডি।
মাঘ। }

(উদ্ধৃত)

রেমিটেণ্ট ফিবার বা বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে এণ্টিপাইরীন।

রেমিটেণ্ট ফিবার বা বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে এণ্টিপাইরীন্ ব্যবহার হইতেছে। কিন্তু রোগীর শারীরিক বল অনুসারে অতি সতর্কতার সহিত ইহা ব্যবহৃত হওয়া একান্ত আবশ্যক। যে হেতু দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে ইহা অবসাদক ক্রিয়া দর্শাইয়া রোগীর জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলে। বলবান্ রোগীর পক্ষেও বিশেষ সতর্কতা ও সদ্বিবেচনার সহিত প্রয়োগ করা বিধেয়; কারণ, ঘর্ম্মাদি হইয়া রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে। এণ্টিপাইরীন্ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টিকারক পথ্য ও অপরবিধ উত্তেজক ঔষধ ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক বলিয়া আমার বোধ হয়। নিম্নলিখিত চিকিৎসিত রোগীর পরিচয়ে দেখা যাইবে, ইহার ব্যবহারে কত দূর সতর্কতার প্রয়োজন হইতে পারে।

৬ বৎসর বয়স্ক একটী বালকের রেমিটেণ্ট ফিবার আমি চিকিৎসা করি। প্রথম ১৫শ দিবস পর্য্যন্ত জ্বরবেগ বৃদ্ধিকালে শারীরিক উত্তাপ ১০৫ ডিগ্রী এবং বিরামসময়ে ১০২ ডিগ্রী হইত। নানাপ্রকার ঔষধ ব্যবহারে ঐরূপ উত্তাপ হ্রাস না হওয়ায় শেষে ২ গ্রেণ মাত্রায় এণ্টিপাইরীন্ প্রয়োগ করিতে থাকি। প্রথম মাত্রা প্রয়োগকালে শারীরিক উত্তাপ ১০৫ ডিগ্রী ছিল, ২ ঘণ্টা পরে উত্তাপ ১০২ ডিগ্রী হয়; তখন পুনরায় আর এক মাত্রা সেবন করান হয়; ইহার ২ ঘণ্টা পরে শারীরিক উত্তাপ ৯৯ ডিগ্রী হয়। তখন প্রতি ২ ঘণ্টায় ৩ গ্রেণ পরিমাণে কুইনাইন দেওয়া হয়। ৩ মাত্রা কুইনাইন সেবনের পর উত্তাপ পুনরায় বৃদ্ধি হইতে থাকে। সে দিবস আর এণ্টিপাইরীন্ দিলাম না। পরদিবস জ্বর বৃদ্ধিকালে পুনরায় ২ গ্রেণ মাত্রায় ২ বার এণ্টিপাইরীন্ সেবন করিতে দেওয়ায় শারীরিক উত্তাপ ১০৪ ডিগ্রী হইতে ৯৮ ডিগ্রী হয়। তখন পুনর্ব্বার পূর্ব্বনিয়মমত ৩ গ্রেণ পরিমাণে কুইনাইন ৩ বার সেবন করান হয়। পরদিবস রোগী কিছু ভাল থাকে, জ্বরকালে উত্তাপ ১০১ ডিগ্রী হয়।

কিন্তু তৎপরদিবসে জ্বর বৃদ্ধিকালে পুনরায় শারীরিক উত্তাপ ১০৪ ডিগ্রী হওয়ায় এণ্টিপাইরীন্ ২ গ্রেণ মাত্রায় ২ বার সেবন করিতে দেওয়া হয়। প্রথম মাত্রা সেবনের ২ ঘণ্টা পরে উত্তাপ ১০২ ডিগ্রী হয়; তখন দ্বিতীয় মাত্রা সেবন করান হয়। দ্বিতীয় মাত্রা সেবনের ২ ঘণ্টা পরে উত্তাপ ১০০ ডিগ্রী হয় ও সেই সময় হইতে অল্প অল্প ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকে। ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইতে দেখিয়া এণ্টিপাইরীন্ প্রয়োগ বন্ধ করি। এই সামান্য ঘর্ম্ম ক্রমে প্রচুর ঘর্ম্মে পরিণত ও সান্নিপাতিক (কোল্যাপ্‌স্) অবস্থা উপস্থিত হয়; সমস্ত রাত্রি উষ্ণ জলপূর্ণ বোতল গাত্রে সংলগ্ন, শুঁঠের গুঁড়া মালিশ এবং নানা প্রকার উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করায় প্রাতে মণিবন্ধে নাড়ীর স্পন্দন অতি অল্প অনুভূত হয় এবং ঘর্ম্ম প্রায় বন্ধ হয়; কিন্তু শরীর নিতান্ত শীতল থাকে। পরে বেলা ১১ টার সময় সময় পুনরায় জ্বর-বেগ বৃদ্ধি হয়। এই দিবস হইতে এণ্টিপাইরীন্ সেবন বন্ধ করা হয়। তৎপরে কয়েক দিবস অন্যান্য ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করায় রোগী আরোগ্যলাভ করে।

পূর্ব্বোল্লিখিত রোগীর বিবরণ পাঠে জানা যাইবে যে, অবস্থা ও বয়স অনুসারে এণ্টিপাইরীন্ প্রয়োগের কত দূর বিপদ উপস্থিত হইতে পারে।

চিকিৎসা-দর্পণ।

শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এম্, বি,

দিঘাপতিয়া।

আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসার্থীগণই কেবল নরাধম নহে।

প্রকৃতপক্ষে সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে নব্য ডাক্তারীমতে চিকিৎসার্থী ব্যক্তিগণই নরাধম—নরাধম অপেক্ষাও যদি আরও কিছু থাকে, তবে তাহাই। কেন না তাহারা বাহ্য চাকচিক্যে দিন দিন বিমুগ্ধ হইয়া পড়িতেছে, কাঞ্চন ভ্রমে কাচের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদের চক্ষে ধাঁদা লাগিয়াছে, ধুতি চাদরের পরিবর্ত্তে সহসা হ্যাট্, কোট্,

প্যাণ্টুলান দেখিয়া বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়া তাহাদের যেন বাঘভূলী লাগিয়াছে! পীড়া হইলে সামান্য দুই চারি দিন যে একটু লঘুপথ্য খাইয়া থাকিতে হয়, এখন আর বাবুদের সে কষ্ট সহ্য হয় না! যেই একটু পীড়া হইল অমনি ডাক্তার বাবুর শরণাপন্ন হইলেন, তিনি আসিয়াই দুধ সাগু ব্যবস্থা করিয়া বসিলেন; দুই এক দিনের মধ্যেই রোগীকে খাড়া করিয়া ডাক্তার বাবু বিদায় হইলেন। হতভাগ্য বাবুগণ! তোমরা যে শীঘ্র শীঘ্র আরাম হইবে বলিয়া সুদীর্ঘ জীবন-কালকে একবারে সংকীর্ণ করিয়া ফেলিতেছ তাহা কি একবার ভ্রমেও ভাবিয়া দেখিবে না? ঐ দেখ, সদাচারী হিন্দুসন্তানগণ অশীতি পর বৎসরে বেশ সবলভাবে জীবনধারণ করিয়া রহিয়াছেন; ঐ দেখ, ব্রাহ্মণের বিধবাগণ প্রাণান্তেও কখন ডাক্তারী ঔষধ স্পর্শ করেন না, তাঁহারা কেবল দেশীয় গাছড়া ঔষধ খাইয়াই দীর্ঘকাল বাঁচিয়া রহিয়াছেন। কবিরাজ শ্রেষ্ঠ ও ৮গঙ্গাধর কবিরত্ন যে কত বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি কেহ মনে করিয়া থাকেন? কৈ, ডাক্তারী পক্ষ সমর্থনকারীদিগের মধ্যে এইরূপ দীর্ঘজীবি কয়জন লোক দেখিতে পাওয়া যায়? দুঃখে কষ্টে পঞ্চাশ অতিক্রম করিতে পারিলেও ষাইট পার হইতে আর কাহাকেও দেখা যায় না। তবে ইংরেজদিগের কথা স্বতন্ত্র, তাহারা আমাদের দেশীয় লোকের মধ্যে গণ্য নয়।

শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বিজ্ঞ, সকল সম্প্রদায়েই দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তারদিগের মধ্যে যাঁহারা বিচক্ষণ লোক তাঁহাদের সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতেছি না; আমরা পাড়া-গাঁয়ে বাস করি, তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াও আমাদের দুর্লভ। নিত্য নূতন যাঁহাদের ক্রিয়া কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছি, তাঁহাদের কথাই বলিতেছি। ডাক্তারই হউক আর কবিরাজই হউক, চিকিৎসা ব্যাপার বড়ই দুরূহ। শাস্ত্রের নির্দ্ধারিত উপায় অবলম্বন করিয়া চলিলে সকল সময় কৃতকার্য্য হওয়া যায় না; আবার গোঁড়ামী করিয়া থাকিলেও কখনো সুফল ফলে না। শাস্ত্রে সা হয় কারণ,লক্ষণ ও প্রশমনের বিষয়ই বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে,কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সেই সকল লক্ষণ রোগীর শরীরে বাছিয়া লওয়া

বড়ই বিবেচনা সাপেক্ষ। তাহা যেমন তেমন লোকে পারে না। তদ্রূপ বিবেচনার লোক ডাক্তারদের মধ্যে অতি কম। ভাই ডাক্তারগণ! তোমরা সর্ব্বদা সকলে একবাক্যে বলিয়া থাক যে, কবিরাজী শাস্ত্রের দিন দিন যৎপরোনাস্তি অবনতি হইতেছে, এখন আর সেই অবনত কবিরাজী শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া চলা উচিত নয়। যাহারা তাহা করে, তাহারা নিতান্ত নরাধম। কিন্তু ভাই! একবার বিবেচনা করিয়া দেখ এমন বিপদেও কার অবনতি না হয়? প্রায় সহস্রাধিক বৎসর হইল নানাবিধ ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়াছে, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু সেই জন্য সর্ব্বস্ব আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এখনও যাহা আছে, তাহাও তোমাদের নাই। দেখ, এসিয়া ইউরোপ ও আমেরিকা, ই তিনটী বিস্তির্ণ ভূখণ্ড ভরিয়া বহুকাল হইতে সকলে প্রাণপণে ডাক্তারী-বিদ্যার উন্নতি সাধনে যত্নপর হইয়াছে; কিন্তু তথাপি লুপ্ত প্রায় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সমকক্ষ হইতে পারিতেছে না। এবং শত বর্ষেও পারিবে কি না তাহাও সন্দেহ। বলিলে পাগল ভাবিবে, (আর পাগলে পাগল ভাবিলেই বা তাহাতে ক্ষতি কি?) একবার দক্ষিণ পূর্ব্ব বঙ্গে অনুসন্ধান করিয়া দেখ। বার্ত্তি নামক একটী সামান্য পল্লী আছে, তথায় ভৈরব কবিরাজ নামক একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পারদর্শী বিচক্ষণ চিকিৎসক বাস করেন। তিনি একমাত্র নাড়ী পরীক্ষা করিয়াই রোগীর ভাবী শুভাশুভ ফল বলিয়া দিতে পারেন। যদি রোগীর মৃত্যুই নিশ্চয় হয়, তবে তাহাও কোন্ দিনে সম্ভবত কোন্ সময় হইবে তাহাও স্থির করিয়া বলিয়া দিতে পারেন। কৈ, ডাক্তারী শাস্ত্রে কি ইহা আছে? যদি ইচ্ছা কর তবে দুর্দ্দশাগ্রস্থ আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র হইতে ইহার বচন প্রমাণ দেখাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুধু দেখাইয়া দিলে কি হইবে? বচনানুযায়ী স্থির করিয়া বলা বড়ই সূক্ষ্ম বিবেচনার কার্য্য।

আবার ডাক্তারগণ সর্ব্বদা অহঙ্কার করিয়া বলিয়া থাকেন যে "আমরা শবচ্ছেদ করিয়া জীবদেহের কোথায় কি অবস্থিতি করিতেছে, কোন যন্ত্র কোন সময় কিপ্রকার কার্য্য করিতেছে, তাহা বিলক্ষণ অবগত আছি; সুতরাং চিকিৎসা কার্য্যে আমাদের যতদূর অধিকার আছে, কবিরাজ-

দিগের ততোদূর নাই।" ইহাও তাঁহাদের একপ্রকার ভ্রম, কেন না তাঁহারা মরা মানুষ কাটিয়া দেখিয়াছেন বৈত নয়? কিন্তু মরা মানুষ আর তাজা মানুষের অভ্যন্তরে কোন পার্থক্য আছে কি না এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত তাঁহারা অবাক্ হইয়া পড়িবেন। প্রাচীন যোগী ঋষিগণ একদিকে শত শত শবচ্ছেদ করিয়া স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, আবার অন্যদিকে যোগবলে সজীব মনুষ্যের আভ্যন্তরীণ কার্য্যাদির বিষয় ও সম্যক্ রূপ পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। এমন কি তাঁহারা যোগবলে আমাশয়, গ্রহণী প্রভৃতি নাড়ী গুলী ও বাহির্ভাগে নিক্ষেপ করিয়া আবার যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতে পারিতেন। তাহাতে জীবনের কোনও অনিষ্ট হইত না। এই প্রকারে বহুকাল হইতে আলোচনা করিতে করিতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রখানি এমন ভাবে রচনা করিয়া গিয়াছেন যে, একমাত্র তাহাতেই সমুদায় কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ইহার পর কবিরাজদিগের শবচ্ছেদ করিয়া দেখিবার যদি কোন উপায় থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় ভারতবর্ষে আর ডাক্তারগণ এত চাউল ফুটাইতেপারিতেন না এবং এদেশে ডাক্তারী বিদ্যার এত বহুল প্রচারও হইত না। এস্থলে আর একটী ঘটনার কথা উল্লেখ না করিয়া কোন মতেই থাকিতে পারিলাম না। উন্নতির উচ্চতম শিখর-স্থিত অভিনব ডাক্তারী বিদ্যার মোহকারিণী শক্তির প্রভাবে ইতিমধ্যে আমাদের দেশে একটী জীবহত্যা হইয়াছে। তাহার আদ্যন্ত পাঠ করিয়া পাঠকগণ একবার বুঝিয়া লইবেন যে দুর্দ্দশাগ্রস্থ কবিরাজী-বিদ্যার এখনও কতদূর তেজ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

আমাদের নিকটবর্ত্তী কোন পল্লীতে একটী নিঃস্ব পরিবারের দশম বর্ষীয় একটী সন্তান ছিল। ঐ হতভাগ্য পরিবারের সাংসারিক অবস্থা এতদূর খারাপ যে, বর্ত্তমান অর্থ-পিশাচ ডাক্তার দিগের সাহায্য প্রার্থনা তাহার পক্ষে বড়ই দুরাশা মাত্র। কিন্তু বলিলে কি হয়, রোগেত আর তাহা বুঝে না? তাহাদের সেই বালকটীর প্রথমতঃ সন্ততক জ্বর হয়, কবিরাজীমতে সন্ততক জ্বর স্বভাবতঃ একটু কৃচ্ছ্রসাধ্য। কিন্তু হতভাগ্য পরিবার মনে করিয়াছিল যে, আপনা হইতেই জ্বর যাইবে সুতরাং কোন চিকিৎসকেরই সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল না; কেবল যাহার সঙ্গে

দেখা হইত,তাহার নিকটেই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিত। পরামর্শ দাতাগণও মুক্তকণ্ঠে বলিতেন যে, বর্ত্তমান সময়ে কবিরাজী অপেক্ষা ডাক্তারীমতেই তরুণজ্বরে শীঘ্র ফল হইতে দেখা যায়; অতএব ডাক্তারীমতে চিকিৎসা করাই যুক্তিসঙ্গত। এইরূপ পরামর্শ করিতে করিতে ১০। ১২ দিন অতীত হইল, এদিকে রোগীও ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। অবশেষে একজন বহুদর্শী বিচক্ষণ ডাক্তারের হস্তে উক্ত বালকের চিকিৎসার ভার প্রদত্ত হইল। ডাক্তার বাবু কিপ্রকার ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা জানি না এবং তৎসম্বন্ধে কিছু বুঝিতেও পারি নাই। তবে দুইদিন ঔষধ ব্যবহার করিলে রোগীর যেপ্রকার অবস্থা হইয়াছিল তাহা পরে বলিতেছি।

একদিন সন্ধ্যার পর চারিদণ্ড রাত্রির সময় আমরা কতিপয় বন্ধু একত্রে গল্প করিতেছি, এমন সময় ঐ বালকের অভিভাবিকা একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আসিয়া সহসা কাঁদিয়া পড়িল। তখন আমরা সকলেই উক্ত বালকটীকে দেখিতে চলিলাম। সেই সময় বালকের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ঘোরতর বিকার উপস্থিত—শিরশ্চালন, অক্ষিস্রাব, জিহ্বার জড়তা এবং রক্ত নিষ্ঠীবন প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হইল; নিঃশ্বাস প্রশ্বাস করিবার সময় পার্শ্বদ্বয় মুহুর্মুহু টানিতেছে, দেখিলাম নাড়ীও অত্যন্ত সূক্ষ্ম চুলের ন্যায় বিষম ভাবে চলিতেছে। তখন আর কিছু বিবেচনা না করিয়া সকলের আদেশমত আমিই ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। প্রথমতঃ একটী কস্তুরীভৈরব প্রয়োগ করিয়া তাহার ৪ দণ্ড পরে কিঞ্চিৎ মকরধ্বজ চটী ব্যবহার করাইলাম। আবার শেষরাত্রে রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হইলে কস্তুরীর দানার সহিত আর একটী কস্তুরীভৈরব সেবন করাইলাম। ইহাতেই রোগীর অবস্থা ক্রমে ভাল হইতে লাগিল। পরদিন প্রাতে কিঞ্চিৎ স্বর্ণসিন্দুর সেবন করাইয়া জ্বরনাশার্থ সৌভাগ্যবটীর ব্যবস্থা করিলাম এবং বাতশ্লেষ্মার অত্যন্ত প্রকোপ দেখিয়া গোলমরিচ চূর্ণের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া মুহুর্মুহু অবলেহন করিতে বলিলাম। এইরূপ ৫। ৭ দিন চিকিৎসার পর জ্বর উপশমিত হইয়া রোগী বেশ সবল হইয়া উঠিল। এমন কি অন্নমণ্ড পর্য্যন্তও পথ্য দেওয়া হইল। তাহাও অনায়াসে পরিপাক হইয়া গেল। কিন্তু যখন ডাক্তার বাবু ঔষধ প্রয়োগ

করেন, সেই সময় মুখের বেদনা বলিয়া রোগী সময় সময় চীৎকার করিত, অথচ দৌর্ব্বল্যবশতঃ কি ভাবে কোথায় বেদনা করে তাহার কিছুই বলিতে পারিত না। পরে রোগী কিঞ্চিৎ সবল হইলে তাহার দাঁতের গোড়ায় ঈষৎ ক্ষত হইয়াছে এরূপ দেখা গেল। আমিও ঐ ক্ষত নিবারণের জন্য নানাবিধ কুলীর ব্যবস্থা করিলাম, তাহাতে কিঞ্চিৎ সুফলও দেখিতে পাওয়া গেল। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, যাহার ভাগ্যে যাহা আছে তাহা ত হওয়া যাই! আবার হতভাগ্য পরিবারের ভাগ্যকুপিত হইল—আবার দুর্ম্মতি ডাক্তারীপক্ষ সমর্থনকারিদের মতিচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তাঁহারা একবাক্যে পরামর্শ দিতে লাগিলেন যে "ক্ষত প্রভৃতির চিকিৎসাবিষয়ে ডাক্তারদিগেরই অধিক বিজ্ঞতা আছে; এই রোগী দীর্ঘকাল সাংঘাতিক রূপে পীড়িত থাকিয়া এইক্ষণ আরোগ্যলাভ করিয়াছে, ইহার পরে ও যদি দাঁতের গোড়ে ক্ষত ও মুখের দৌর্গন্ধবশতঃ কিছু আহার করিতে না পারে, তবে ইহার জীবনাশা কোথায়?" বাস্তবিক আমিও সেই ভয়ে নিতান্ত ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু আমার ব্যস্ততা কোন কাজে আসিল না। হতভাগ্য গৃহস্থ আবার ডাক্তার বাবুকে লইয়া আসিল। তিনি আসিয়াই কষ্টিক দ্বারা ক্ষত স্থান দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন এবং সময় সময় কষ্টিক্ লোসনের প্রলেপ দিতে আদেশ করিলেন। আমিও সেই সময় উপস্থিত ছিলাম। তখন আমি তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম, মহাশয়! আপনাদের মতে অথবা বৈদেশিক ডাক্তারী শাস্ত্রমতে ক্ষতাদি বিষয়ে দোষাদোষ সম্বন্ধে কোন বিবেচনা আছে কি না তাহা আমি জানি না। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, প্রথমে বাতপিত্তাদি ধাতুত্রয়ের কোন একটী দূষিত হইয়াও পরে শরীরের স্থান বিশেষে ক্ষত হইতে পারে অথবা অন্যকোন কারণে ক্ষত হইয়াও পরে তাহা বাতপিত্তাদি দোষের অনুবন্ধ হইতে পারে। যে ভাবেই ক্ষত হউক, পিত্তদূষিত ক্ষতে কখনও ক্ষার প্রয়োগ করিবে না। যেহেতু তাহা বিষের ন্যায় অনিষ্টকারী হইয়া থাকে। বর্ত্তমান রোগী যেপ্রকার জ্বালা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছে এবং ক্ষতস্থানের যে প্রকার বর্ণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইহা পিত্তদূষিত ক্ষত, তদ্বিষয়ে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে যে ক্ষার প্রয়োগ বা অগ্নি কর্ম্মাদির বিষয় বর্ণিত আছে, আপনাদের কষ্টিকও যদি

সেই প্রকার গুণকারী হইয়া থাকে, তবে আমার বিবেচনায় ইহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেবল পিত্ত-দোষ কেন, আরও দেখুন—আর্য্য-ঋষিগণ এবিষয় কি বলিয়াছেন—

বিষাগ্নিশস্ত্রাশনিমৃত্যুকল্পঃ ক্ষারো ভবত্যল্পমতিপ্রযুক্তঃ।
স ধীমতা সম্যগনুপ্রযুক্তো রোগান্ নিহন্যাদচিরেণ ঘোরান

অল্পবুদ্ধি মানবের হস্তে ক্ষার প্রয়োগের ভার অর্পিত হইলে তাহা বিষ, অগ্নি, শস্ত্র এবং বজ্রের ন্যায় মৃত্যুদায়ক হইয়া থাকে। কিন্তু বিবেচক লোকে প্রয়োগ করিলে নানাপ্রকার কঠিন রোগও উপশমিত হয়।

অহিতস্তু রক্তপিত্তজ্বরিতপিত্তপ্রকৃতিবালবৃদ্ধ দুর্ব্বল—
ভ্রমমূর্চ্ছাতিমিরপরীতেভ্যোঽন্যেভ্যশ্চৈবম্বিধেভ্যঃ।

অর্থাৎ যাহারা পিত্তপ্রধান লোক তাহাদের পক্ষে, বালক, দুর্ব্বল এবং বৃদ্ধের পক্ষে অথবা রক্তপিত্ত, জ্বর, ভ্রম, মদ, মূর্চ্ছা ও অতিসার রোগগ্রস্থ রোগীদের পক্ষে ক্ষার প্রয়োগ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

তবেই দেখুন পিত্তপ্রধান লোকের কথা দূরে থাক্, যে রোগের চিকিৎসা করিতেছেন তাহাই প্রধানতঃ পিত্ত-দোষে দূষিত, আবার রোগী বালক এবং দীর্ঘকাল হইতে সাংঘাতিক জ্বরে ভুগিতেছিল সুতরাং দুর্ব্বল, এরূপ অবস্থায় বিবেচনা করিয়া ক্ষার প্রয়োগ করিবেন। তখন ডাক্তার বাবু ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, আমরা ৫।৬ বৎসর কাল মেডিকাল কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছি এবং একাল পর্য্যন্ত এই কার্য্যই করিয়া আসিতেছি। সুতরাং ইহাতে আমরা একপ্রকার সিদ্ধজ্ঞান লাভ করিয়াছি। সেকালের মুনিদিগের আনুমানিক কথার উপর নির্ভর করিয়া চলিলে কি আর এখন কার্য্যোদ্ধার হয়? তখন আর আমি দ্বিরুক্তি করিলাম না এবং ডাক্তার বাবু ও কষ্টিকদ্বারা ক্ষত স্থান দগ্ধ করিয়া দিলেন। দগ্ধ কার্য্য অবশ্য কিছু অধিক পরিমাণে সম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এইকার্য্য সমাধা হইতে না হইতেই যে প্রকার প্রজ্জলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলে তাহা ভয়ঙ্করনাদে গর্জ্জন করিয়া উঠে এবং সম্মুখে যাহা পায় তাহাই একবারে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, তেমনই হতভাগ্য গৃহস্থের একমাত্র আশা-লতাটীকে চিরকালের জন্য ছার খার করিয়া

ফেলিল; দেখিতে দেখিতে এক রাত্রির মধ্যেই ক্ষত সমস্ত চতুর্গুণ বেগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দন্ত-নালী অতিক্রম করিল, এবং ওষ্ঠদ্বয় পর্য্যন্ত ধাবিত হইল; তখন ওষ্ঠদ্বয় এমনই ফুলিয়া উঠিল—তাহার অপরিসীম জ্বালা যন্ত্রনায় রোগী এতদূর অধীর হইয়া পড়িল, যে ভাত খাওয়া দূরের কথা আর জল টুকও গ্রহণ করিতে পারিল না। কিন্তু তখন ডাক্তার বাবু কষ্টিক্ লোসনের ব্যবস্থাই করিতে লাগিলেন। তাহাতে আরও কুফল ফলিতে লাগিল। চতুর্থ দিনে নিতান্ত বেগতিক দেখিয়া ডাক্তার বাবু নূতন একটী মলমের ব্যবস্থা করিলেন কিন্তু তাঁহার নাম আর প্রকাশ করিয়া বলিলেন না। পঞ্চম দিনে রোগীর ওষ্ঠদ্বয় খসিয়া পড়িল, ষষ্ঠ দিনে আবার একটু জ্বর প্রকাশ পাইল এবং সপ্তম দিনে সেই নরাধম গৃহস্তের আঁধার কুটীর আরও আঁধার করিয়া—উন্নত ডাক্তারী বিদ্যার উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া হতভাগ্য বালক ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গেল। মৃত্যু সময়ে সে যে ভীতিব্যঞ্জক তীব্র কটাক্ষ করিয়াছিল, তাহাতে বোধ হইল সে যেন স্পষ্টাক্ষরে বলিল যে "দুরাচার হিন্দুগণ! যদি এখনও মঙ্গল-কামনা কর, যদি এখনও আপন আপন ধনপ্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তবে সাবধান হও,—আর বৈদেশীক কুহক জালে জড়িত হইও না—সকলেই প্রাণপণে জাতীয় বিদ্যার অনুশীলনে যত্নপর হও; যে বিদেশীয়গণ একটীমাত্র কোহিনুর আশায় নিতান্ত বিমুগ্ধ হইয়া বিস্তৃত পাঞ্জাব রাজ্যকে ছার খার করিয়া ফেলিল—প্রাণতুল্য বন্ধুবরের বিনাশ পাপে ও ভয় করিল না, দেখিবে সেইরূপ শত শত কোহিনুর ভারতীয় প্রত্যেক শাস্ত্রে—আর্য্য ঋষিগণের প্রত্যেক বাক্যে ওত প্রোতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।"

ভাল নব্য শিক্ষিত বাবুগণ! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি যে, ইহাই কি আপনাদের উন্নতিশীল ডাক্তারী বিদ্যা? যদি তাহাই হয়, তবে এমন বিদ্যার সাহায্য আমরা চাই না। তবে আপনাদের মধ্যেও অনেকে কৃতবিদ্য আছেন তাহা স্বীকার করি. কিন্তু সে কেবল আর্য্য-গৌরবে—বিলাতি গৌরবে নয়। যাঁহারা বিলাতি গৌরবের পক্ষ সমর্থনকারী, তাঁহারাই ভ্রান্তি-মদে বিভ্রান্ত হইয়া অনেক সময় অনেক অত্যাহিত

করিয়া থাকেন। আপনারা চিকিৎসা ব্যবসায়ী—জনসমাজে চিকিৎসক বলিয়া পরিচিত, তাই তরুণ জ্বরের অনেক রোগী অনেক সময় দেখিতে পান, বিশেষতঃ আজ কাল বাবুরূপী নব্যসম্প্রদায়ীগণ অধিক কষ্ট সহ্য করিতে পারেন না, সুতরাং শীঘ্র শীঘ্র আরাম হইবার আশায়—দুই চারি দিনের মধ্যেই দুধভাত খাইতে পারিবেন এই জন্য তরুণ জ্বর হইলেই তখনি ডাক্তারের শরণাপন্ন হন। তাই বলিয়া কবিরাজগণ যে তরুণজ্বরের চিকিৎসাই জানেন না ;· তাঁহারা যে তরুণ জ্বরের ঔষধই প্রস্তুৎ করেন না অথবা নবজ্বরিত রোগী তাঁহাদের নিকট একবারেই যায় না, ইহা বলিল কে? ভাল বাবুগণ! আপনারা না বিজ্ঞান বিজ্ঞান করিয়া দিন দিন হতজ্ঞান হইয়া পড়িতেছেন! এই সামান্য বিজ্ঞানের সামান্য কথা টুকুও আপনাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না! দেখুন, আপনি যেস্থানে দাঁড়াইয়া আছেন সেইস্থান হইতে ৫০ হস্ত দূরে যদি আরও একটী লম্বা পুরুষ দণ্ডায়মান থাকে, তবে তাহার অপেক্ষা আপনাকেই আপনি লম্বা বলিয়া দেখিবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। আপনি যদি কোন বৃক্ষের নীচে বসিয়া থাকেন, আর সেই বৃক্ষ হইতে চতুর্গুণ বড় দূরবর্ত্তী অন্য গ্রামস্থিত অন্য একটী বৃক্ষের প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করেন, তথাপি আপনার নিকটবর্ত্তী বৃক্ষকেই আপাততঃ বড় বলিয়া বোধ হইবে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা ভ্রম। আর অধিক কি বলিব, সূর্য্যমণ্ডল যে পৃথিবী অপেক্ষা কত বড়, তাহা একজন বালককে জিজ্ঞাসা করিলেও বলিয়া দিতে পারে। কিন্তু সেই সূর্য্যকে আমরা একখানা থালার ন্যায় দেখিয়া থাকি; তাই বলিয়া কি সূর্য্য প্রকৃতই থালার ন্যায়? যে পর্য্যন্ত আমরা সূর্য্যের নিকট যাইতে না পারিব—যে পর্য্যন্ত তাহার আভ্যন্তরিক বিষয় সম্যক্ অবগত হইতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত তাহার দোষ গুণের সমালোচনা করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই। এবং তদ্রূপ অনধিকার চর্চ্চা করিলে মূর্খতা ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায় না। কবিরাজী-শাস্ত্র যে বহুবিস্তৃত, তাহা স্বীকার করি, দুই তিন বৎসর অথবা ঊর্দ্ধ সংখ্যা সাত বৎসর অধ্যয়ন করিলে তাহাতে জ্ঞানলাভ যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহাও স্বীকার করি, কিন্তু কবিরাজগণ তদ্রূপ করেন না। যাঁহাদের ব্যবসায় করিবার ইচ্ছা তাঁহারা

রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াই তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন। প্রকৃত কবিরাজেরা কখনও পেটের দায়ে কবিরাজী করিতে প্রবৃত্ত হন না, তাঁহারা একমাত্র পরোপকার ব্রতেই দীক্ষিত হইয়া চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হন। তবে হাতুড়ে গো-বৈদ্যের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যথার্থ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ডাক্তারগণই সেই দোষে দোষী। যাঁহাদের ক অক্ষর গোমাংস, সংসারে যাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের কোনই উপায় নাই, তাঁহারাই অন্ততঃ দুই চারি খানি হোমিওপ্যাথি পুস্তক খরিদ করিয়া একজন অদ্ভুত ডাক্তার সাজিয়া বসেন।

কলিকাতা নগর ভারতবর্ষের রাজধানী, তথায় অনেক অনেক কৃতবিদ্য ডাক্তার কবিরাজ আছেন। নব্য বাবুগণ তরুণ জ্বরে আক্রান্ত হইলেই শীঘ্র শীঘ্র দুধভাতের আশায়—হিন্দুসমাজের অকথ্য নানাপ্রকার বিলাতি খাদ্যের আশায় অধিকাংশ রোগীই ডাক্তারী চিকিৎসার অধীনে যাইতে পারেন, তএত্য কবিরাজগণ তরুণ জ্বরের চিকিৎসা কম করিলেও করিতে পারেন; কিন্তু পাড়াগাঁয়ে তদ্রূপ নহে, পাড়া গাঁয়ের কবিরাজেরা ও নবজ্বরের চিকিৎসা করিয়া থাকে,তাহারাও জ্বরিত ব্যক্তিকে জ্বর মুক্ত করিয়া থাকে। অধিকন্ত কবিরাজেরা যাহাকে একবার জ্বর মুক্ত করিয়া দেয়, সংবৎসরের মধ্যে তাহাকে প্রায়ই জ্বরাক্রান্ত হইতে দেখা যায় না। ডাক্তারদিগের নিকটও জ্বর রোগী অধিক পরিমাণে যাইয়া থাকে তাহা স্বীকার করি। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে অনেককেই ৩। ৪ মাস পরে যকৃৎ প্লীহা প্রভৃতিতে নিতান্ত জীর্ণ শীর্ণ হইয়া আবার কবিরাজের নিকট আসিতে হয়। তখন কবিরাজ দিগের কিঞ্চিৎ লাভ হইয়া থাকে। তবে কবিরাজী মতে চিকিৎসার্থীগণ নরাধম কিসে? আগামীতে সুপ্রসিদ্ধ লণ্ডন নগরীস্থ কতিপয় বিজ্ঞ বহুদর্শী ডাক্তারগণের মতামত উদ্ধৃত করিয়া এদেশীয় ডাক্তার ও কবিরাজদিগের পরস্পর যথাসাধ্য তুলনা করিব এরূপ ইচ্ছা থাকিল। ক্রমশঃ

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ;

সাং উমারপুর পোঃ নাকালীয়া। পাবনা।

প্রতিবাদ।

আমি অসঙ্গত বলি না।

প্রবন্ধের প্রতিবাদ করা যদি ফুক্কুড়ি করিলে চলিত, তাহা হইলে প্রতিবাদের আবশ্যক আদৌ হইত না। ডাক্তার পুলিন বাবু আপনার গত পৌষ ও মাঘ মাসের সম্মিলনীতে এলোপ্যাথিক চিকিৎসার স্বাপক্ষে যেরূপে এবং যে ভাবে প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহা প্রতিবাদ না হইয়া ভাঁড়াম হইয়াছে। তামাসা বিদ্রূপ যদি প্রতিবাদের মধ্যে পরিগণিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিবাদ, প্রতিবাদের মধ্যে পরিগণিত হইবে। তাঁহার মতে এক ডাবা ঔষধ সেবন না করাইলে রোগীর রোগ হইতে মুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই; আর স্বল্প মাত্রায় ঔষধ সেবন করাইয়া যদি রোগী, রোগ হইতে মুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার মতে রোগ আপনা আপনি আরাম হওয়া; যাহাহউক, নিম্ন লিখিত শ্লোকটী তাঁহার হৃদয়ঙ্গম করা উচিত।

"পরিণামসুখে গরীয়সি
ব্যথকেঽস্মিন্ বচসি ক্ষতৌজসাম্।
অতিবীর্য্যবতীব ভেষজে
বহুরল্পীয়সি দৃশ্যতে গুণঃ॥"

বোধ হয় পুলিন বাবু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কারণ যেরূপে ক্যান্থেরিস্ ও টেরিবিন্থ দুইটী ঔষধ প্রয়োগসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রে আদৌ নয়নক্ষেপ করেন নাই এবং কেনই বা করিবেন? যদি কাষ্ঠের বিড়ালে ইন্দুর ধরিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে জীবন্ত বিড়ালের আবশ্যকতা কি? ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষতঃ চিকিৎসা শাস্ত্রে গোঁড়ামী যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। ধর্ম্মশাস্ত্রে গোঁড়ামী ঘটিলে সমাজের তত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিপর্য্যয় হইলে বিপুল অনিষ্টের সম্ভাবনা। এলোপ্যাথিক স্কুলে দীক্ষিত হইয়াছি বলিয়া কিং-কর্ত্তব্যে বিমূঢ় হইব, ইহা আমার বিবেচনায় কোনমতে সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

এক সময়ে রাশি রাশি কুইনাইন খাওয়াইয়াছি বলিয়া চিরকাল সেই কুই-নাইন আমাদের নিকট পূজনীয় হইবে, ইহা সম্ভব পর নহে। যখন দেখিতে পাই এবং পুলিন বাবু আপনার প্রতিবাদে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতেছেন যে, কুইনাইনের দ্বারায় আমাদের দেশে অনিষ্টসাধন হইয়াছে এবং হই-তেছে, (যদিও পুলিন বাবুর কুইনাইন ব্যবহারে নিজের কোন অনিষ্ট ঘটে নাই এবং ঘটিবে কি না তাহারও কোন স্থিরতা নাই) তখন পুলিন বাবুর দোহাই দিয়া কিরূপে ওরূপ অনিষ্টকারী বিষকে জনসমাজে প্রয়োগ করি-বার ব্যবস্থা দিতে পারি এবং কালাপাহাড় নাম ধারণ করিয়া আপনার দেশীয় স্বজনকে কিরূপেই বা একবারে উৎসন্ন ও ভষ্মীভূত করিতে পারি? শীতপ্রধান দেশের প্রযোজ্য মাংসাশী বলবান্ লোকের সেব্য ভীষণ কুই-নাইন এ উষ্ণপ্রধান দেশে নিরামিষাশী লোকদিগের যে নিতান্ত অহিত-কর, তাহা এদেশের আবাল-বৃদ্ধ বিলক্ষণরূপে বুঝিয়াছেন। পুলিন বাবু আপনার কথায় আপনি অনেকবার কুইনাইন হিতকর বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন নাই। বোধ হয় এই জন্য যে কুইনাইনের দর এককালে ১২ টাকা ছিল, তাহার দাম এক্ষণে ১৸৵০ দাঁড়াইয়াছে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও অহিংসা পরম ধর্ম্ম উভয় সমান জিনিস। যে অহিংসা পরম ধর্ম্মের বলে শাক্যসিংহকর্ত্তৃক এককালে হিন্দুধর্ম্ম প্রভৃতি লোপোন্মুখ হই-য়াছিল এবং ধর্ম্মকর্ত্তা দিগকে উক্ত ধর্ম্ম বজায় রাখিবার জন্য নানাস্থানে নানাপ্রকার শ্লোক সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছিল, সেই অহিংসা পরম ধর্ম্মের সদৃশ হোমিওপ্যাথিক আজ্ যে সর্ব্বত্র বিজয়ী হইবে, পুলিন বাবু নিজেই তাহা সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। পুলিন বাবু আর একটী কথা বলিয়াছেন যে, যে প্রদেশে আদৌ কুইনাইন ব্যবহার হয় নাই, সে দেশের লোককে প্লীহা ও যকৃতে আক্রান্ত হইতে হইয়াছে, কিন্তু একথাটী তাঁহার শোণা কথা। তিনি এরূপ অবস্থা নিজের চক্ষে দেখেন নাই, তবে একথা তাঁহার প্রতিবাদের স্বাপক্ষ হইবে বলিয়া তিনি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। একথায় আমার উত্তর এই যে, ম্যালেরিয়া-জনিত লোকের যেরূপ শারীরিক দুরবস্থা ঘটে, তৎসঙ্গে কুইনাইন সেবন করাইলে অধিকতর হয় এবং জীবন আশা দুরাশা হইয়া পড়ে। আর এরূপ সর্ব্বদা ঘটিতে দেখা গিয়াছে যে, ম্যালেরিয়ার হাতে কতকটা পরিত্রাণ আছে, কিন্তু কুইনাইনের হাতে

আদৌ পরিত্রাণ নাই। পুলিন বাবু যেরূপ ভাবে এবং যেরূপ ছন্দে প্রতিবাদটী আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহার গোচরার্থে নিম্নে একটী শ্লোক গ্রথিত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। তিনি যদি আমার প্রবন্ধের প্রকৃত প্রতিবাদ করিতেন, তাহা হইলে আমি পরম আহ্লাদিত হইতাম।

"অশ্রুতশ্চ সমুন্নদ্ধঃ দরিদ্রশ্চ মহামনাঃ।
অর্থাংশ্চাকর্ম্মণা প্রেপ্সু মূঢ় ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥"

কলিকাতা | ডাক্তার হরনাথ রায় এল্, এম্, এস্,
চৈত্র | হোমিওপ্যাথিক প্রাক্টীসনার।

ইনি আবার কি বলেন?

প্রতিবাদের শেষ অঙ্ক।

হরনাথ বাবু এলপ্যাথ চিকিৎসকদিগের কতকগুলি ঔষধের দোষ উল্লেখ করিয়াছেন, যথাঃ—তিনি বলেন ডাক্তারেরা এণ্টিপাইরিন্, স্যালিসিলেট্ অব্ সোডা প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করিয়া কখন কখন কুফল আনয়ন করেন। একথা গুলি নিতান্ত মিথ্যা নহে। এণ্টিপাইরিন্ প্রভৃতি ঔষধের অযথাপ্রয়োগ নিবন্ধন কখন কখন রোগীর বিপদ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এগুলি ঔষধের দোষ নহে, প্রয়োগকর্ত্তাদিগের দোষ। অনেক ঔষধ বিষাক্ত, কবিরাজ মহাশয়েরাও রোগীর অবস্থা বিবেচনায় বিষপ্রয়োগ করিয়া থাকেন। এমন যে বিষাক্ত সেঁকোবিষ, তাহাও কম্পজ্বরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। পূর্ব্বে যখন কুইনাইনের আমদানী ছিল না, তখন বিচক্ষণ কবিরাজ মহাশয়েরা ঐ সেঁকোবিষদ্বারা জ্বর আরাম করিতেন। এই সেঁকোর কাছে স্যালিসিলেট্ অব্‌সোডা কোথায় লাগে? অতএব সেঁকোবিষহজমকারী ডালভাতখেগো বাঙ্গালী কেননা গোখাদক ইউরোপীয় জাতির এণ্টিপাইরিন্ সহ্য করিতে পারিবে? এই সকল বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতে জানিলে সুফল ফলে এবং অযথাপ্রয়োগে অনিষ্ট করে। কিন্তু ছুরিকায় কখন কখন হাত কাটে

বলিয়া ছুরির ব্যবহার পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না। যেমন ছেলের হাতে ছুরি শোভা পায় না, সেইরূপ গোবৈদ্যের হাতে বিষপ্রয়োগ সাজে না। চিকিৎসা করা যদি এতই সহজ হইবে, তবে আর চিকিৎসাশাস্ত্রের গুমর থাকে কই? তবে আর সুচিকিৎসক ও গোবৈদ্যে প্রভেদ থাকে কই? আনাড়ি ডাক্তারের হাতে অস্ত্রচিকিৎসায় কখন কখন সর্ব্বনাশ ঘটে, কিন্তু তাহা বলিয়া সংসার হইতে এমন সুফলপ্রদ অস্ত্রচিকিৎসা উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। এলপ্যাথী ও কবিরাজী-চিকিৎসায় বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন, আর হোমিওপ্যাথির বিন্দুপ্রয়োগে কোনও উৎপাত নাই। এইজন্যই বৈষ্ণবতন্ত্রের ডাক্তার মহাশয়েরা হোমিওপ্যাথি ধরিয়া থাকেন। যে ডাক্তারগণ রক্ত দেখিলে মূর্চ্ছা যান, জোলাপ দিয়া দাস্ত আনাইয়া রোগীর একবারের অধিক দুইবার দাস্ত দেখিলে হতভম্ব হন, প্রায় তাঁহারাই শেষটায় হোমিওপ্যাথি ধরিয়া বসেন। হরনাথ বাবু বলেন, এখনকার কবিরাজ মহাশয়েরা কেবল পেটেরদায়ে ব্যবসা রক্ষার জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্রতী হন্। কিন্তু হোমিওপ্যাথীও আজ্‌কাল ব্যবসারক্ষার একটি প্রকৃষ্ট উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হোমিওপ্যাথিতে কোন বিপদ নাই, আরাম হউক্ বা না হউক্ রোগীকে ঔষধ প্রয়োগে কোন আশঙ্কা নাই; এইজন্যই হোমিওপ্যাথিতে এত অশিক্ষিত লোক প্রবেশ করিয়াছে।

পূর্ব্বে যে ভদ্রসন্তান সামান্য কড়িকসা পর্য্যন্ত জানিতেন না, যাঁহার জীবনে সামান্য পাটোয়ারিগিরি পর্য্যন্ত কর্ম্ম জুটিত না, তিনিই গুরুমহাশয় নাম ধারণ করিয়া পাঠশালা খুলিয়া বসিতেন। আর এখন যাঁহার সংসারে অন্ন জুটে না, তিনিই শেষটায় হোমিওপ্যাথিক হইয়া বসেন। একটি বালক লেখাপড়া করিত না বলিয়া তাহার পিতা প্রহার করিতে ছিল। তখন গিন্নি বারণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, আহা! তুমি আর মারিও না, না হয় উহার কিছু না হবে, শেষটায় না হয় বাছা আমার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিয়া খাইবে এখন।

এলোপ্যাথি চিকিৎসকেরা কি উদ্দেশ্যে ডিজিটেলিস্ ব্যবহারকরেন, তাহা হরনাথ বাবু বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। ডিজিটেলিস্ পূর্ব্বে হৃদপিণ্ডের অবসাদক বলিয়াই এলপ্যাথদিগের ধারণা ছিল; কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্র ক্রমোন্নতি সাপেক্ষ, এই কারণবশতঃই ডাক্তার ফদারগিল (Eothergill)

অবশেষে দেখাইতে সমর্থ হন যে, ডিজিটেলিস্ হৃদ্‌পিণ্ডের বলবৃদ্ধি করে। হইতে পারে পূর্ব্বে এলপ্যাথদিগেরডিজিটেলিস্ সম্বন্ধে ভ্রম ছিল, এখন না হয় সে ভ্রম তাঁহারা সংশোধন করিলেন, তাহাতে আর দোষ কি? ডিজি-টেলিসের একটি প্রধান গুণ এই যে, অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিলে উহাতে দুর্ব্বল নাড়ী সবল করে এবং দ্রুত নাড়ী সমতা করে। ডিজিটেলিস্ যে অল্পমাত্রায় হৃদ্‌পিণ্ডের উত্তেজকরূপে ব্যবহৃত হয়, সেটি হোমিওপ্যাথির মত নহে। আমরা যদি ঔষধ সকলের ক্রিয়া উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় এবং ভিন্নরূপ প্রয়োগে ঔষধের ভিন্ন ভিন্ন গুণপ্রকাশ পায়। আবার এমন অনেক দ্রব্য আছে, যাহা সেই একইমাত্রায় থাইলে (মাত্রার ইতরবিশেষ না করিয়া) শরীরস্থ হইয়া অবস্থাবিশেষে বিভিন্ন ক্রিয়া প্রকাশ করে। যথা বেলফল খাইলে দাস্ত-পরিষ্কার হয়, আবার সেই বেলফলেই উদরাময় থাকিলে ধারকগুণবিশিষ্ট হয়। এখানে অবশ্যই মাত্রা লইয়া কোন গোলযোগ নাই। আবার মাত্রা-সম্বন্ধে দেখিতে গেলেও আমরা ঔষধ সকল দুইশ্রেণীর দেখিতে পাই; যথা কতকগুলি ঔষধ এমন আছে, যাহারা অল্পমাত্রায় একরূপ ক্রিয়া করে এবং বেশীমাত্রায় আর একরূপ ক্রিয়া করে। আবার আর একশ্রেণীর ঔষধ আছে, যাহারা অল্প ও বেশীমাত্রায় একই ক্রিয়া করে, কিন্তু মাত্রার তারতম্য অনুসারে ক্রিয়ারবৃদ্ধি বা কম হয়। অহিফেন অল্পমাত্রায় উত্তে-জক, কিন্তু বেশীমাত্রায় অবসাদক। মদ্য অল্প করিয়া খাইলে উত্তেজক, বেশীমাত্রায় অবসাদক। আবার নক্সভমিকা বেশীমাত্রায় পেশীসমুদয়ের এতদূর বলবৃদ্ধি করে যে, তাহাতে পেশীর খেঁচুনি (টঙ্কার) উপস্থিত হয় এবং অল্পমাত্রাতে পেশীর বলবৃদ্ধি করে বটে, কিন্তু আক্ষেপ উপস্থিত করে না। এখানে অল্প ও বেশীমাত্রায় ক্রিয়ার তারতম্য নাই। কেবল মাত্রানু-সারে ক্রিয়া বেশী বা কম হয়। এই জন্যই পাকস্থলীর মাংসপেশী দুর্ব্বল হইয়া পাকস্থলীর খেঁচুনি (Cramp) উপস্থিত হইলে খুব অল্পমাত্রায় নক্স প্রয়োগ করিলে পাকস্থলীর অল্প বলবৃদ্ধি হইয়া খেঁচুনি আরাম হইয়া যায়। ডিজিটেলিসের ক্রিয়াও কতকটা নক্সভমিকার ন্যায়। হোমিওপ্যাথির নিয়ম হইতেছে সমান সমান (Similis Similifus)। অহিফেন বিষাক্তমাত্রায় প্রয়োগ করিলে রোগীর অচৈতন্যাবস্থা (কোমা) উপস্থিত হয়। একজন্য

হোমিওপ্যাথ মহাশয়েরা কোমারোগে অল্পমাত্রায় অহিফেন দিয়া থাকেন। কিন্তু সূক্ষ্ম ভাবিয়া দেখিতে গেলে এটি এলপ্যাথিরই মত। কারণ অহিফেন অল্পমাত্রায় উত্তেজক। যদি সমানে সমান ধরা যায়, তাহাহইলে কোমা-রোগে অহিফেন বেশীমাত্রায় প্রয়োগ করা উচিত, কারণ কি রোগে কি সহজ শরীরে বিন্দুমাত্রায় অহিফেন খাইলে কখনও নিদ্রা হয় না। আবার বেলফলের বেলায় এ সব নিয়ম ত কিছুই খাটান যায় না। তবে অক্সেন্ রিএক্সেন হয় কই? বেশীমাত্রায় ইপিকাক্ খাইলে বোমি হয়, অল্পমাত্রায় বোমি হয় না, অতএব বমনরোগে বেশীমাত্রায় ইপিকাক্ খাওয়ান উচিত, নচেৎ হোমিওপ্যাথি হয় কই? হোমিওপ্যাথির থিওরি অনুসারে যে ঔষধে যে লক্ষণ উপস্থিত করে, সেই লক্ষণ দেখিয়া সেই ঔষধ প্রয়োগ করিলে, শরীরের পীড়িতস্থানে গিয়া তদনুরূপ আর একটি রোগ বেশীমাত্রায় উপ-স্থিত করিয়া ভাইটাল্‌রিএক্সেন্ উপস্থিত করিয়া রোগ আরাম করে। কিন্তু বেশীমাত্রায় না খাইলে যখন অহিফেনে নিদ্রা হয় না তখন বিন্দুমাত্র অহিফেনে কি করিয়া শরীরের ভিতর নিদ্রা আসার ন্যায় রোগ উপস্থিত করে? যেহেতু অল্প মাত্রায় অহিফেন উত্তেজক। আগুণে পুড়িয়া গেলে প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিয়া রোগীর শীতবোধ হয়। এজন্য দগ্ধস্থানে শীতল প্রয়োগ না করিয়া অল্প অল্প উত্তাপ দিলে রোগী সুস্থতা অনুভব করে। কিন্তু যে কোন প্রদাহান্বিত স্থানে অল্প অল্প উত্তাপ প্রয়োগে উপকার হয়। হোমিওপ্যাথ গুরু হানিমান বলেন যে, দাহকের ঔষধ দাহকই বটে, কিন্তু এমন বিবেচনা করিয়া দাহক প্রয়োগ করিতে হইবে যে, একবারে সেই স্থান ধ্বংস না হইয়া যায়। অর্থাৎ আগুণে পুড়িয়া গেলে সেই স্থান একবারে পোড়াইয়া ফেলিলে কায হইবে না। অতএব অল্প উত্তাপ প্রয়োগ করিবে। এ নিয়ম সত্য বলিয়া মানিলাম, কিন্তু কোন স্থান অস্ত্রদ্বারা কাটিয়া গিয়া যদি বেদনা উপস্থিত হয়, তবে সেই স্থলে অল্প অল্প দা দিয়া কাটিলে রোগীর অবশ্যই রোগ উপশম হওয়া উচিত। যেহেতু অল্প দায়ের আঘাতে কখনও একবারে জীবনীশক্তি (Vital power) নষ্ট হয় না। আবার হোমিওপ্যাথ মহাশয়েরা বলেন, যে ঔষধ যত সূক্ষ্মমাত্রায় বিভাগ করা যায়, ততই তাহার ক্ষমতা (potency) বাড়ে। ইহাকে তাঁহারা ডাই-নামিক্ এক্সেন্ (dynamicaction) বলেন। তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহারা

বলেন যে, জলকে বাষ্পাকারে পরিণত করিলে জলের এত ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়, যে সেই বাষ্পীকৃত জলে রেলগাড়ী পর্য্যন্ত চলে। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে হোমিওপ্যাথি ঔষধে এ নিয়ম খাটে না। এঁকমন জলকে বাষ্প করিলে সেই বাষ্পের ওজন এঁকমনই থাকে। তবে উহার স্থান ব্যাপকতা গুণ (Volume) বৃদ্ধি হয়। এই জন্যই উহার গুণ বৃদ্ধি হয়। এই জন্যই ভাতের হাঁড়িতে সরা চাপা দিলে বাষ্পীকৃত জলের জোরে সরা উঠিয়া পড়ে। কারণ বাষ্পের আকার এত বড় হয় যে, সে হাঁড়িতে আর উহা ধরে না। এই নিয়মবশতই বন্দুকের বারুদ বাষ্প হইয়া গুলিকে সজোরে দূরে নিক্ষেপ করে। কিন্তু বন্দুকে অগ্রে বারুদ না পুরিয়া যদি সেই পরিমাণ বারুদকে বাষ্প. করা যায় এবং ঐ বাষ্পের বিন্দুমাত্র বন্দুকের ভিতর পুরা যায়, তবে তাঁহাতে গুলি চলিতে পারে না। হোমিওপ্যাথ মহাশয়েরা তাঁহাদের ঔষধ অগ্রে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণুতে বিভাগ করিয়া লন এবং ঐরূপ বিভাগ করিবার পর তাহার কিঞ্চিৎ পরমাণু রোগীকে প্রয়োগ করেন। যদি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাষ্পের ন্যায় ক্রিয়া হয় তাহা হইলে অগ্রে বেশীমাত্রায় ঔষধ রোগীর উদরস্থ হওয়া উচিত, পরে উদরে গিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণুতে ঐ ঔষধ বিভক্ত করিলে, তাহার আকার বৃদ্ধি হইয়া রোগীর উদর ফুলিয়া ঢাকের ন্যায় হইতে পারে।

হরনাথ বাবু একনাইট্ ও বেলেডোনার ব্যবহার সম্বন্ধে বলেন যে, "হোমিওপ্যাথিক ঔষধ লইয়া এলপ্যাথিক মতে ব্যাবহার করিলে কেবল অনিষ্টেরই সম্ভাবনা।" এস্থলে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে হোমিওপ্যাথি সৃষ্টি হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই উক্ত ঔষধদ্বয় ব্যবহৃত হইতেছে।

হোমিওপ্যাথিক্ মহাশয়েরা দুই শত ডাইলুসনের (cinna) সিনাপ্রয়োগ করিয়া ক্রিমিরোগ আরাম করিতে চান। সিনানামক ঔষধে কখন ক্রিমিনামক জন্তু সৃষ্ট হয় না। অতএব ক্রিমিরোগে ক্রিমি খাওয়াইলে উপকার হইবার সম্ভাবনা। নচেৎ হোমিওপ্যাথি হয় কই? ক্রিমিরোগে ক্রিমি উদরস্থ করিলে উভয় ক্রিমিতে পরস্পর কামড়া কামড়ি করিয়া মারা পড়িবার সম্ভাবনা।

ক্রিমি একটী জন্তু, পেটের ভিতর নড়িতে থাকে এজন্য পেট কামড়ায়, মলদ্বারে আসিয়া নড়িতে থাকে এজন্য মলদ্বার চুলকায়। অতএব ক্রিমি মরিয়া

না গেলে কেমন করিয়া চুলকানি আরাম হইবে? ২০০ নম্বরের সিনাতে কখন ক্রিমি মরিতে পারে না। চক্ষে কুটা পড়িয়া চোখ কর কর করিতে থাকে, যতক্ষণ সেই কুটা বাহির না করা যায় ততক্ষণ যাতনা আরোগ্য হইতে পারে না। কোন কোন হোমিওপ্যাথিক মহাশয় আস্ত সাণ্টনিন্ প্রয়োগ করেন? এটী কাহার আবিষ্কৃত ঔষধ? হোমিওপ্যাথী না এলপ্যাথী? এখানে আবার বলা হয়। না, না, বেশীমাত্রায় সাণ্টনিন্ না উর্দ্ধ সংখ্যা তিন গ্রেণ!! মাত্রা বেশী করিলে এলপ্যাথী হইয়া যাইবে। আমি যখন মেডিকেলকলেজে পড়িতাম, তখন আমার পেটে একবার ছোট ছোট ক্রিমি হইয়া মলদ্বার চুলকাইত। আমি জোলাপ লইতে ভয় করিয়া থাকি, এজন্য কলিকাতার কোন এক হোমিওপ্যাথ বন্ধুর নিকট যাইলে তিনি ৭।৮ দিন সিনা খাওয়াইলেন, তাহাতে কোনই ফল হইল না দেখিয়া মেডিকেলকলেজের আউট্ডোরে রেসিডেণ্টডাক্তারকে বলিলাম, তিনি টর্পেণ্টাইন মিশ্রিত ক্যাষ্টারঅয়েল খাওয়াইলেন এবং বারকতক দাস্ত হইয়া একদিনেই আমার শরীর সুস্থ হইল। তারপর আমি কতকগুলি তাজাক্রিমি একত্র করিয়া তাহাদের গাত্রে ২০০ নম্বরের সিনা ঢালিয়া দিলাম। ক্রিমিগুলি সমানতালে নড়িতে লাগিল। আবার রক্তহীনতা রোগে হোমিওপ্যাথ মহাশয়েরা "ফেরম" (Ferrum) ব্যবহার করেন। ইটি এলপ্যাথী না হোমিওপ্যাথী? ইটি কি Inductive method of cure? আবার কম্পজ্বরে হোমিওপ্যাথেরা দুই এক গ্রেণমাত্রায় কুইনাইন ব্যবস্থা দেন, ইটি কাহার ব্যবস্থা? প্রকারান্তরে এলপ্যাথি নয় কি?

হরনাথ বাবু বলেন, মোহজ্বর এবং আন্ত্রিকজ্বরে রোগীর পাকস্থলীর অবস্থা যেরূপ হয়, বিশেষতঃ রোগী প্রলাপযুক্ত হইলে ওরূপ পথ্য জীর্ণকরা অসম্ভব। প্রলাপযুক্ত হইলে যে রোগীর আদৌ লঘুপথ্য জীর্ণকরার ক্ষমতা থাকে না, এটী হরনাথ বাবুর নূতন আবিষ্কৃত কথা। সচরাচর দেখা যায় অনেক জ্বররোগী প্রায় আরোগ্য হইয়া অন্নপথ্য করিয়াও দুএকদিন প্রলাপ বকিতে থাকে। যখন রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া মৃদুপ্রলাপদ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন মাংসের যূষপ্রভৃতি পথ্যদ্বারা সত্বর উপকার হয়। তবে যে রোগীর আদৌ পথ্য জীর্ণ করিবার ক্ষমতা থাকে না, সে রোগীকে বাঁচায় কাহার সাধ্য? মৃত্যুকালে রোগীর গুহ্দ্বার দিয়া পথ্য নির্গত সম্বন্ধে এই বলা যায়

যে, আসন্নমৃত্যু রোগীকে মৃত্যুর ২।১ দিন পূর্ব্বে যে ঔষধ ও পথ্য দেওয়া যায়, অবশ্যই তাহা জীর্ণ করিবার ক্ষমতা থাকে না, কিন্তু তাহা বলিয়া ঔষধও পথ্য বন্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে না। কি জানি যদি ফল হয়, কি জানি একটু পথ্য জীর্ণ হইয়াও যদি উপকার হয়। এই বলিয়াই এল-প্যাথেরা রোগীকে বাঁচাইবার চেষ্টায় আসন্নকাল পর্য্যন্ত পথ্যপ্রদান করেন। রোগীকে উঠানে নামাইয়াও লোকে রোগীর মুখে গঙ্গাজল দেয়। অবশ্যই সে সময় প্রায় রোগীরই গঙ্গাজল জীর্ণ করিবার ক্ষমতা থাকে না। রোগীকে চিকিৎসকেরা ছাড়িয়া দিলেও রোগীর অভিভাবকেরা কালীর প্রসাদ আনিয়া খাওয়ায়। এটী লোকের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ও প্রকৃতি। ইহা চির-কাল চলিয়া আসিতেছে। হরনাথ বাবু মহা চীৎকার করিলেও লোকে তাঁহার কথা বুঝিবে না। হরনাথ বাবু এলপ্যাথ ডাক্তারদিগের এই কুপ্রথা নিবারণের জন্য দেশীয় লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চান। তিনি বলেন "গুহ্যদ্বার দিয়া এত জোরে ঐ সকল পথ্য নির্গত হয় যে, সে মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাওয়া ভার"। এস্থলে বিজ্ঞজনের পরামর্শ এই যে, যদি কোন লোক আহার করিবার অব্যবহিতপরেই মরে এবং তাহার সৎকারের জন্য তাঁহাকে যদি কেহ আহ্বান করে, তাহাহইলে তিনি যেন সেই মৃত-ব্যক্তির পায়ের দিকে না ধরিয়া মস্তকের দিকে ধরেন। অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্যাল এম, বি।

আবার একটী পুরাণ কথা।

অচিন্ত্যশক্তি মঙ্গলময়ের মঙ্গল-রাজ্যে অনন্তকাল হইতে অনন্ত জীব-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সেই জীবদেহের উৎপত্তি, অবস্থিতি এবং বিনাশ-প্রাপ্তি সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব হিন্দু ভিন্ন আর কেহই এ সংসারে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। আত্মগরিমায় উন্মত্ত কপটাচারী অহিন্দুগণ, সরলভাবে এই কথা স্বীকার করুন, আর নাই করুন, সমস্ত ভূমণ্ডলের ইতিবৃত্ত সুচারু-রূপে পর্য্যালোচনা করিলে নিশ্চয় জানা যায় যে, ভারতই আদিম সভ্যস্থান,

যাহা কিছু মনুষ্যজীবনের আবশ্যকীয়—অবশ্যজ্ঞাতব্য, তৎসমস্তই আর্য্য মস্তিষ্ক হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। সৃষ্টির অব্যবহিত পর হইতেই ধীশক্তিসম্পন্ন আর্য্যগণ প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রাণপণে দিবারাত্রি যুদ্ধ করিতে করিতে অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় চিকিৎসাশাস্ত্রেরও যথোচিত উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। লোকে বিপদে না পড়িলে অথবা দায় না ঠেকিলে কিছুই শিখে না। প্রাচীন হিন্দুগণ অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় চিকিৎসাবিষয়েও যখন যে প্রকার দায়গ্রস্ত হইতেন, তখনই স্থানে স্থনে সভাসমিতি সংস্থাপন পূর্ব্বক সেই বিষয়ের ঘোর আন্দোলন করিয়া একটা না একটা স্থিরতর মীমাংসা করিয়া ফেলিতেন। যে দেশে যুদ্ধবিগ্রহের কায যত অধিক, সেই দেশেই অস্ত্র চিকিৎসার তত প্রয়োজন। এই ভারতভূমিই এক সময় বীরপ্রসবিনী ছিল, এই ভারতবাসী-রাই এক সময় স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল পদভরে কম্পান্বিত করিয়া আপনাদিগের বিজয়-পতাকা সর্ব্বোপরি উড্ডীন করিয়াছিলেন; সুতরাং ইঁহাদিগের অস্ত্র চিকিৎসারও অধিক প্রয়োজন ছিল। যে ভাবে শল্যতন্ত্র, শালাক্যতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থগুলি রচিত হইয়াছে, তাহা আদ্যন্ত সুচারুরূপে অধ্যয়ন করিলেই ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ হইতে সামান্য দুই একটী বচন অপহরণ করিয়াই আজ বৈদেশিকগণ এতদূর আস্ফালন করিতেছেন। এই কথা একবার মুখ দিয়া বলিতেও তাঁহাদের লজ্জাবোধ হয়। কলিযুগে এইরূপেই এক উপকারীর প্রত্যুপকার করিতে হয়?

আমরা ইতিহাস পাঠে অবগত হইতেছি যে, আর্য্যঋষিগণই সর্ব্বপ্রথমে সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আধিরোহণ করিয়াছিলেন। পরে কালসহকারে সেই বীজ মিশর, চীন ও রোমপ্রভৃতি দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং দিন কয়েকের জন্য আরবীয়গণও একটু একটু করিয়া চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু কস্মিন্ কালেও কোন দেশে চিকিৎসাবিষয়ে ততোধিক আন্দোলন করা হয় নাই। প্রথমে আরবীয়গণই আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের কিয়দংশ আরব্যভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন; সেই হইতে ইহা রূপান্তরিত হইয়া ইউরোপে নীত হইয়াছে। আবার সুপ্রসিদ্ধ আলেকজণ্ডারের জনৈক সভাসদ যখন মগধেশ্বর চন্দ্রগুপ্তের সভায় অবস্থিতি করেন, তখন হইতেই এই সম্বন্ধে ইউরোপে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং ক্রমে ইউরোপে চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি হইতে থাকে। প্রফেঃ উইলসন সাহেব কহিয়াছেন—

"The charaka, the sushruta and the treatise called Nidana &c. were translated and studied by the Arabians in the days of Harens and Mansur (A. D 773.)

কিন্তু ইংরাজদিগের মধ্যে মেঃ হণ্টার ব্যতীত আর কেহই একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন না। তিনি তাঁহার ভারতের ইতিহাসে লিখিয়াছেন ;—

The Hindu systen of medicines and surgery is the best of all ; and it is the only source of all the method of different countries.

আবার ডাক্তার ওয়াইজ্ কহিয়াছেন ;—

The Ayur Veda, which is the most ancient treatise on medicine, commands universal respect. It treats of matters relating to what is benificial or otherwise to life, of the origin of diseases and of the best methcd of curing them.

তবেই দেখা যাইতেছে যে, যে দেশে যে প্রকারেই কেন চিকিৎসাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত না হউক, ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রই তাহার একমাত্র ভিত্তিস্বরূপ। সুতরাং অন্যান্য দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র অপেক্ষা ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রই যে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। তবে কালপ্রবাহে নানাবিধ ভাগ্যপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইদানীন্তন ইহার যৎপরোনাস্তি অবনতি হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া এখনও যে কবিরাজীমতে চিকিৎসার্থীগণ বৈদেশিক চিকিৎসা অপেক্ষা কম ফল পায়, তাহা কখনও বলা যাইতে পারে না। এই শাস্ত্রের উপর যদি রাজার একটু দৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে ইহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইত।

খৃষ্টীয় ১৮৭১ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ লণ্ডননগরে যে একটী চিকিৎসাবিষয়িনী সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে তত্রত্য জনৈক বিচক্ষণ ডাক্তর বলিয়াছিলেন, "ভূমণ্ডলে চিকিৎসা ব্যাপারের ন্যায় দুরূহ বিষয় আর কিছুই নাই। দিন দিন যতই চিকিৎসাদির বহুল প্রচার হইতেছে, সংসারে ততই মৃত্যুসংখ্যা অধিক হইতেছে। যদি পৃথিবীতে চিকিৎসা প্রণালী এত অধিকরূপে প্রচারিত না হইত, তাহা হইলে বোধ হয় জীবহত্যাও এত অধিক হইত না। আমি বহুকাল হইতে এই লণ্ডননগরে চিকিৎসাদি করিয়া আসিতেছি,

অনেক স্থলে অকৃতকার্য্যও হইয়াছি; কিন্তু অবস্থাভেদে কোন কোন রোগীর দেহাভ্যন্তরীণ যে সকল যন্ত্রাদির যে প্রকার বৈলক্ষণ্য অনুমান করিয়া তাহার ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছি, তাহাতে তাহার কিছুমাত্র উপকার না হইয়া যখন তাহার মৃত্যু হইয়াছে, তখন তাহার মৃতদেহ বিদীর্ণ করিয়া আমার অনুমানের বিপরীত ভাব লক্ষিত হওয়ায় সময় সময় বড়ই অপ্রতিভ হইয়াছি। ফলতঃ যিনি যাহাই বলুন না কেন, চিকিৎসাসম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা যাইতে পারে না ইত্যাদি।” এই প্রকার কথা ডাক্তরদিগের মুখেই শোভা পায়, আর্য্য ঋষিদিগের মুখ হইতে কখনও এবম্বিধ বাক্য নিঃসৃত হয় নাই। যাহারা অসভ্য, তাহারা বিনা চিকিৎসাতেই দীর্ঘজীবী হইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু যাহারা প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া সভ্য বলিয়া পরিচিত হইতে চেষ্টা করে, অথচ দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সুখস্বচ্ছন্দেও থাকিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে অবশ্যই চিকিৎসার আশ্রয় লইতে হইবে। যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিবিশিষ্ট, তাঁহারা কখনও চিকিৎসা বিষয়ে ভগ্নমনোরথ হন না। প্রাচীন হিন্দুচিকিৎসকগণ যে কখনও নিষ্ফল হইয়াছেন তাহা শুনা যায় না। যাহাদের কিছুই নাই তাহারাই কেবল চিকিৎসাকে নিতান্ত কঠিন বিষয় বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আর্য্য ঋষিদিগের চিকিৎসাশাস্ত্রের ন্যায় আরও কঠিন কঠিন অনেক শাস্ত্র ছিল। তাঁহারা বিচিত্র বিমানমার্গস্থিত চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদির গতিবিধিপর্য্যবেক্ষণ করিয়া অমূল্য জ্যোতিষশাস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার জাজ্জ্বল্যমান ফল আজও সর্ব্বদা দৃষ্ট হইতেছে। এই সমুদায় কথা আমাদের সম্বন্ধে আমি বলিতেছি না। আমরা আজ ক্ষীণমস্তিষ্ক—বহুকাল হইতে হীনতর জাতির সহকাসে নিরত বাস করিতে করিতে আমরাও আজ নিতান্ত হীনদশাগ্রস্ত হইয়াছি। সুতরাং সেই সকল উচ্চ লোকের উচ্চ কথা—উচ্চভাব মনে মনে ধারণা করিতেও আমরা অক্ষম। যদি পূর্ব্বকার সেই দিনই থাকিত, তাহা হইলে আমরাও আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় মরা মানুষ তাজা করিতে পারিতাম। যদি আমাদিগের সেই শল্যতন্ত্র শালাক্য তন্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতেই আমরা সক্ষম হইতাম, তাহা হইলে আমরাও যুদ্ধে আহত সৈনিক পুরুষদিগকে বিলক্ষণ সবল করিয়া আবার তখনই তাহাকে যুদ্ধসাজে সাজাইয়া দিতে পারিতাম। এইক্ষণ আর সে দিনও নাই, সে লোকও নাই।

কখনও তদ্রূপ আশা করা যাইতে পারিবে কি না তাহাও ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত রহিয়াছে।

যে হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসার জন্য ডাক্তারদিগের মধ্যে অভিনব সম্প্রদায় সর্ব্বদা সগর্ব্বে পাদবিক্ষেপ করিতেছেন, বক্তৃতার ঘনঘটায় আকাশপাতাল কাঁপাইয়া তুলিতেছেন, তাহাও বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্যমস্তিষ্ক হইতেই সমুদ্ভাবিত হইয়াছে। ভারতীয় সদৃশ বা অবধৌতিক চিকিৎসাই কালসহকারে ভিন্নদেশে যাইয়া হোমিওপ্যাথী নাম ধারণ করিয়াছে। কিন্তু সেই চিকিৎসাই যে সকল অবস্থায় সবিশেষ কার্য্যকারী তাহা বলা যাইতে পারে না। অস্মদ্দেশীয় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের সহিত বৈদেশিক এলোপ্যাথী-চিকিৎসার তুলনা করিতে গেলে অধিকাংশস্থলেই সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ফলও উভয়স্থলে প্রায় সমানই হইয়া থাকে। যদি বর্ত্তমান সময়ে দুর্দ্দশাগ্রস্ত কবিরাজী শাস্ত্রের উপর রাজার কিঞ্চিৎ ভ্রূক্ষেপ থাকিত, যে প্রকার ধরণে এলোপ্যাথী ডাক্তরগণ শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন কবিরাজদিগেরও যদি তদ্রূপ কোন প্রশস্ত উপায় উদ্ভাবিত হইত, এলোপ্যাথী ঔষধের ন্যায় কবিরাজদিগেরও যদি বিশুদ্ধ ঔষধ সংগ্রহ করিবার কোন যোগাড় থাকিত, তাহা হইলে কবিরাজদিগকেই সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতে হইত।

কিন্তু এত বিপদেও যে কবিরাজগণ অভিনব উন্নতিশীল ডাক্তারীবিদ্যা অপেক্ষা অবস্থাবিশেষে অধিকপরিমাণে বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে।

কোন কোন ডাক্তার সময় সময় বলিয়া থাকেন যে, বর্ত্তমান সময়ে হোমিওপ্যাথী ঔষধই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তরুণজ্বর প্রভৃতি রোগে ইহা যেমন বিশুদ্ধরূপে শীঘ্র শীঘ্র কায করে, এমন আর কিছুতেই নয়। কিন্তু এই কথা তাঁহারা স্থিরবুদ্ধিতে বলেন কি কোন পানীয় বস্তুর জোরে বলেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এদিকে আমরা জাজ্জ্বল্যমান সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, তরুণজ্বর, ওলাউঠা প্রভৃতি রোগের যেরূপ অবস্থায় হোমিওপ্যাথী ঔষধ সবিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে, তদ্রূপ অবস্থায় কোনপ্রকার ঔষধ না হইলেও রোগীর কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় না। তবে কি জন্য যে হোমিওপ্যাথী-চিকিৎসার এত সমাদর তাহার কিছুই বুঝিয়া উঠা যায় না। অথবা সংসারের নিয়মই এইরূপ, যখন যাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, তখন সে ভাগ্য-

মধ্যেও রত্নলাভ করিয়া থাকে। কি জানি কি জন্তে কোন কোন সময় কোন কোন রোগীর রোগ আরাম হয়, নাম হইতে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার হইয়া পড়ে। আমরা আবার সময় সময় এরূপও দেখিতে পাই শূলবেদনাগ্রস্ত রোগী শাস্ত্রোক্ত নানাবিধ ঔষধ সেবন করিয়াও কোন ফল পায় না, কিন্তু দুই একজন কেবলমাত্র উষাপান বা প্রাতঃকালে চাউল জল খাইয়াই দিব্য আরাম হইয়া যায়। বোধহয় হোমিওপ্যাথী-চিকিৎসাতেও এইরূপ ফলই ফলিয়া থাকে। নতুবা জ্বরই হউক, আর ওলাউঠাই হউক, কিঞ্চিৎ সাংঘাতিক আকার ধারণ করিলে, হোমিওপ্যাথী ঔষধে আমি কখনও ফল হইতে দেখি নাই।

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।
সাং উমারপুর, পোঃ নাকালীয়া, পাবনা।

বিবাহ-বিচার।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, জীব ও উদ্ভিদরাজ্যে প্রথম বয়সে সন্তান হইলে সে সন্তান প্রায়ই দুর্ব্বল হইয়া জন্মায়। এক্ষণে দেখা যাউক, ঐরূপ দুর্ব্বল সন্তান কতগুলি জন্মাইতে পারে। যাহাতে অধিক দুর্ব্বল সন্তান জন্মগ্রহণ না করে, প্রকৃতি তাহার উপায় বিধান করিয়াছেন। জীব ও উদ্ভিদরাজ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, জননেন্দ্রিয় সন্তান ধারণক্ষম হইয়াও কিছুদিন গত না হইলে প্রায়ই সন্তান হয় না। জীবগণের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং মনোবৃত্তি ক্রমে ক্রমে গঠিত হয়। জীবজন্তু একবারেই পূর্ণযৌবনে উপস্থিত হয় না। উহারা কোন এক নির্দ্দিষ্ট বয়সের সীমায় উপস্থিত না হইলে তাহাদের জননেন্দ্রিয়ের কার্য্য করিবার ক্ষমতা হয় না, আবার তারপরও কিছুদিন গত না হইলে সেই ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয় না। এসংসারে সমস্ত জীবকার্য্যই ক্রমে উপস্থিত হয়। খেজুর বা তালগাছের রস বাহির

করিবার জন্য গাছ কর্ত্তন করিলে প্রথমে খুব অল্পমাত্রায় রসক্ষরণ হয়, ঐ রসে গুড়তৈয়ার করিলে উহা অল্প লবণাক্ত এবং কম মিষ্ট হয়। তারপর কিছুদিন পরে ঐ রস পূর্ণমাত্রায় ক্ষরণ হয়। জীব ও উদ্ভিদগণের জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াও এইরূপে অল্প অল্প বিকশিত হইয়া পূর্ণমাত্রা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যতদিন জীবগণ বয়সের পূর্ণতা প্রাপ্ত না হয়, ততদিন সহবাসসত্ত্বেও সন্তান প্রায়ই জন্মায় না। উদ্ভিদরাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথমবৎসর প্রায়ই সুধু ফুল হইয়া ঝরিয়া যায়, তারপর বৎসর হইতে ফল ধরিতে আরম্ভ হয়। পুংজীবগণের সন্তানোৎপাদিকা রস বা শুক্র যৌবনের সূত্রপাত হইতেই অল্প অল্প ক্ষরিতে আরম্ভ করে, কিন্তু উহার পরিমাণ এত অল্প এবং অপরিপক্ক যে সহবাস ঘটিলেও তাহাতে সন্তান জন্মগ্রহণ করে না। আবার স্ত্রীগণেরও ডিম্ব প্রথম ঋতুতে সম্যক্ পরিপুষ্ট হয় না। দুই একবার মিথ্যা ঋতু হইয়া তারপর সন্তানোৎপাদনোপযোগী ডিম্ব উৎপন্ন হয়। মনুষ্যের প্রথম ঋতু খুব অল্পমাত্রায় উৎপন্ন হয়, তারপর দুই চারি বা ছয়মাস গত না হইলে প্রায়ই পুনর্ব্বার ঋতু দেখা দেয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া আরম্ভ হইবার পর কিছুদিন গত না হইলে প্রায়ই সহবাসে সন্তান হইবার সম্ভাবনা নাই। এইজন্যই নিতান্ত অপরিণত বয়সে সহবাস ঘটিলেও সে সহবাস নিষ্ফল হয়। আমাদিগের দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, তত্রাচ সচরাচর দেখা যায় সন্তান হইবার উপযুক্ত বয়ঃক্রম না হইলে প্রায়ই সন্তান হয় না। এবিষয়ে যদিও রীতিমত তালিকা দিতে পারিলাম না, তত্রাচ প্রত্যেক লোকে আপন আপন বাসস্থান ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমুদয়ের স্ত্রীলোকের বিষয় অনুসন্ধান করেন, তবে ভরসা করি আমার মতের সহিত তাঁহাদের মতের ঐক্য হইবে। এদেশে স্ত্রীলোকের ঋতু একাদশ হইতে ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে সংঘটিত হয়, কিন্তু পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে প্রায়ই সন্তান হয় না। সচরাচর ১৬ বৎসর গত না হইলে প্রায়ই সন্তান হয় না। একাদশ কি ত্রয়োদশ বর্ষে সন্তান সম্ভাবনা খুব কম। ঠিক প্রথম ঋতুতে সন্তান হওয়া প্রায়ই শুনা যায় না, আর হইলেও তাহা দৈবঘটনার মধ্যে। আমি একটি কি দুইটিমাত্র এইরূপ ঘটনা হইতে শুনিয়াছি। যেমন স্ত্রীর পক্ষে দেখা গেল যে, জননেন্দ্রিয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবার অনেকদিন পরে সন্তান হইতে আরম্ভ হয়, পুরুষের পক্ষেও অবিকল

ঐরূপ নিয়ম। বালকদিগের শুক্র দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলেই অল্প অল্প উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু ঐরূপ বয়সে সহবাস ঘটিলেও সন্তান জন্মাইতে পারে না। আমাদিগের দেশে বাল্যবিবাহকারী যুবকদিগের আঠার উনিষ বৎসর বয়ঃক্রমের কম প্রায়ই সন্তান হয় না। বিশ বাইশ বৎসরেই সচরাচর সন্তান হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে সন্তান জন্মাইবার ক্ষমতা পরিপক্ক না হইলে প্রায়ই সন্তান জন্মায় না। জীবও উদ্ভিদরাজ্যে নিতান্ত অপরিণত বয়সে সন্তান হওয়া নিতান্তই বিরল। এইরূপে দেখা যায় যে প্রকৃতি জীবজন্তুকে অতি বলবতী সন্তানোৎপাদিকাবৃত্তি দিয়াও এইরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছেন যে দৈবাৎ তৎশক্তির পরিচালনা হইলেও উপযুক্ত বয়ঃক্রম না হইলে প্রায়ই সন্তান জন্মগ্রহণ করে না।

অনেকে তর্ক করিয়া থাকেন, স্ত্রীলোক অনুপযুক্ত বয়সে গর্ভধারণ করিলে শরীরের বিশেষ অনিষ্ট হয়। এস্থলে অনুপযুক্ত বাক্যটী প্রকৃতরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না, কারণ যে বয়সে সন্তান হইতে আরম্ভ হয় তাহাকেই প্রকৃত উপযুক্ত বয়স নাম দেওয়া যায়। কারণ সন্তান হইবার বয়স না হইলে প্রায়ই সন্তান হয় না। তবে অল্প বয়সেই হউক বা বেশী বয়সেই হউক, সন্তান উৎপন্ন কার্য্যটীই যে বলক্ষয়কারী, তাহার সন্দেহ নাই। এক জীবের ক্ষয় না হইলে অপর জীবের উৎপত্তি হয় না। নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর জীবগণ মধ্যে দেখা যায়, সন্তান জন্মগ্রহণ করিবামাত্র প্রসূতি মরিয়া যায়। যথা, রেসমকীট ডিম পাড়িয়াই জীবনলীলা সম্বরণ করে। কাঁকড়ার গর্ভসঞ্চার হইলেই উহার মৃত্যু ঘটে। গর্ভস্থ সন্তানেরা কাঁকড়ার উদরের সমুদয় মাংস ভক্ষণ করে এবং অবশেষে খোলা খানিমাত্র পড়িয়া থাকে। একবৎসর স্থায়ী উদ্ভিদগুলি ফলপ্রসব করিয়াই মরিয়া যায়। বাস্তবিক দেখিতে গেলে দেখা যায়, যেন জীবগণ অপর জীবের উৎপত্তির জন্যই জন্মগ্রহণ করে। এই জন্যই বিখ্যাত গ্রন্থকার এডিসন্ বলিয়া গিয়াছেন যে "আমরা জীবন ভোগ করিবার নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করি নাই, কিন্তু অন্যকে জীবন দিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছি।" কিন্তু এইরূপ সন্তানের জন্য জীবন ধ্বংশকারী হইলেও উচ্চশ্রেণীর জীবগণের পক্ষে এই জীবনধ্বংশকারী ক্ষমতা ক্রমেই হ্রাস হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর জীবগণ প্রাণে না মরিলেও উহাদের বল যে কিয়ৎপরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

উদ্ভিদমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বড় বড় আম্রবৃক্ষে আম্র ধরিলে সেই বৃক্ষের কতকগুলি পাতা শুখাইয়া যায়। জীবজন্তুর স্ত্রীগণও সন্তান হইবার পর কিছুদিনপর্য্যন্ত শ্রীভ্রষ্ট ও দুর্ব্বল থাকিয়া যায়। কিন্তু এইরূপ দুর্ব্বল হইলেও দীর্ঘজীবী জীবগণ, যাহারা পুনঃ পুনঃ সন্তান প্রসব করিবে, তাহারা যাহাতে অতিরিক্ত দুর্ব্বল হইতে না পায়, প্রকৃতি সে পক্ষে যথেষ্ট দৃষ্টি রাখিয়াছেন। উদ্ভিদ্‌মধ্যে দেখিতে পাই যে, যে বৃক্ষে যে বার ফল ধরিবে, সেই বৃক্ষে তার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে নূতন পাতা বহির্গত হওয়া বন্ধ হয়। যথা যে আম্র-বৃক্ষে মুকুল ধরিবে, সে বৃক্ষে সে বৎসর আর নূতন পাতা বাহির হয় না। আমড়াগাছ প্রভৃতিও ফল ধরিবার বৎসর একবারেই পত্রশূন্য হয়। বৃক্ষ সকলের নূতন পত্রস্থানে ফুল বা মুকুল বাহির হয়, অর্থাৎ ফল হইবার জন্য বৃক্ষটীর যে পরিমাণে বলের ব্যয় হইবে, প্রকৃতি অগ্র হইতেই সেই পরি-মাণ বল যাহাতে বৃক্ষে সঞ্চয় হয়, তাহার উপায়বিধান করিবার জন্য আর পত্র বাহির হইতে দেন না। পত্র বাহির হইতে বৃক্ষের যে পরিমাণ বলের ব্যয় হওয়া সম্ভব, সেই বলটী বৃক্ষের ফলপোষণ জন্য বৃক্ষে সঞ্চিত হয়, সুতরাং ফল হইলে বৃক্ষটী একবারে অধিক পরিমাণে দুর্ব্বল হয় না। বেল-প্রভৃতি কতকগুলি বৃক্ষের ফল ও পত্র একত্রে বাহির হয়, কিন্তু এ সকল বৃক্ষও ফল পাকিবার সময় কিছুদিন পর্য্যন্ত পত্র শূন্য থাকে, তাহাতেই ক্ষয়ের ক্ষতিপূরণ হইয়া যায়। গরু, শৃগাল, কুক্কুর প্রভৃতি জন্তুর প্রতি বৎসর সন্তানোৎপাদন সময়ের পূর্ব্বে তাহাদের শরীরের চেহারা নূতনভাব ধারণ করে, তাহাদের রূপ অতীব রমণীয় হয় এবং তাহারা অপেক্ষাকৃত হৃষ্ট পুষ্ট হয়। বসন্তকালে পক্ষীগণ অতি রমণীয় রূপ ধারণ করে, শরীরে অতিরিক্ত বল সঞ্চয় হইবার জন্যই এইরূপ ঘটনা হয়। এইরূপ ব্যাপার হইবার আরও একটী উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জীবগণ বিবাহবিষয়ে রূপ ও গুণের পক্ষপাতী। এজন্য বোধ হয় স্ত্রীপুরুষের পরস্পর মনোরঞ্জন করিবার জন্যও প্রকৃতি জীবজন্তুদিগকে সন্তানোৎপাদন সময়ে অধিকতর রূপ ও বলে ভূষিত করেন। মনুষ্যের স্ত্রীগণের মাসে মাসে কিছু কিছু শোণিত ঋতুরূপে বাহির হইয়া যায়। পুরুষের ও স্ত্রীর শরীর তুলনা করিলে দেখা যায়, স্ত্রী শরীরে পুরুষাপেক্ষা বিভিন্ন তেজ নিহিত রহিয়াছে। এই বলটীকে ইংরাজি ভাষায় "ভেজিটেটিব্ ফোর্স"

বা ঔদ্ভেদিক বল বলা যায়। এই অতিরিক্ত বলটী মাসে মাসে রক্তরূপে ক্ষয় হইয়া যায়। যদি এই রক্তস্রাবের কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে, তবে স্ত্রী শরীরে অতিরিক্ত বল সঞ্চয় হইয়া নানাবিধ শারিরীক উপদ্রব আনয়ন করে। কোন কারণবশতঃ স্ত্রীগণের শরীর দুর্ব্বল বা রক্তহীন হইলে ঐ রক্ত আপনা হইতেই বন্ধ হয়। স্ত্রীলোকের গর্ভ সঞ্চার হইলে বলহ্রাসের সম্ভাবনা, এজন্য গর্ভাবস্থায় ঋতুবন্ধ হইয়া স্ত্রীশরীরে প্রয়োজনাতিরিক্ত বল সঞ্চয় হইতে থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্যাল এম, বি।

আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

সপ্তম মাসে শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে, গর্ভিণীর নানাবিধ মিষ্টস্বাদে অভিলাষ জন্মে এবং তাহা অচিরাৎ পূর্ণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যাহাতে গর্ভের অনিষ্ট হইতে পারে বা প্রসবের কোনপ্রকার বিঘ্ন জন্মিতে পারে, এমন কোন বস্তু কখনও ভোজন করিতে দিবে না। এই সময় কোন যানাদিতে আরোহণ করিয়া দূরদেশে যাইবে না, কোন উচ্চস্থানে আরোহণ বা নিম্নস্থানে হঠাৎ অবরোহণ করিবে না এবং প্রসবকালপর্য্যন্ত কোনমতেই একবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে না। অল্প অল্প অর্থাৎ পরিমিতরূপে প্রতিদিন শারীরিক পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য। নতুবা প্রসববাধা জন্মিতে পারে।

সপ্তম মাসে গর্ভ-বেদনায় শতমূলী ও পদ্মমূল বাঁটিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে। অথবা কয়েতবেল, সুপারীমূল, খই ও চিনি, শীতল জলের সহিত সেবন করিতে দিবে।

রক্তস্রাবে পাণিফল, মৃণাল, দ্রাক্ষা, কেশুর, যষ্টিমধু ও চিনি, দুগ্ধের সহিত সেবনীয়।

সুবর্ণ সহস্রবার আধ্মাত হইলে যেরূপ বিশুদ্ধ হয়, সেইরূপ শরীরস্থ ভুক্তবস্তুর রস বারম্বার পক্ক হইয়া বিশুদ্ধ শুক্রত্বে পরিণত হয়, তখন তাহার

কিছুমাত্র মল থাকে না। অনন্তর সেই সারভূত রস, স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই ভাগে বিভক্ত হয় এবং স্নেহময় সূক্ষ্মভাগ, ওজঃ নামক এক প্রকার সারপদার্থে পরিণত হয়। আবার তাহাকে বলও কহা যায়। অষ্টম মাসে গর্ভস্থ সন্তানের সেই ওজের সঞ্চার হয়। এই মাসে গর্ভিণী এবং গর্ভস্থ শিশু ক্ষণে ক্ষণে পরস্পর পরস্পরের ওজঃ গ্রহণ করিয়া থাকে। যখন মাতা, সন্তান হইতে ওজঃ গ্রহণ করে, তখন মাতা প্রফুল্ল ও সন্তান ম্লান হয়, আবার সন্তান, মাতা হইতে ওজঃ গ্রহণ করিলে সন্তান প্রফুল্ল ও মাতা ম্লান হয়। অষ্টম মাসে ওজের কোন স্থিরতা নাই বলিয়া ঐ মাসে সন্তান হইলে সেই সন্তান প্রায়ই জীবিত থাকে না। অথবা দুর্ব্বল ও অল্পায়ু সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। সন্তান রক্ষার জন্য অষ্টমমাসে নৈঋ্র্তকোণের অধিষ্ঠাতা রাক্ষসের উদ্দেশ্যে বলিপ্রদান করা কর্ত্তব্য। উক্ত রাক্ষস, গর্ভস্থ সন্তানের অংশ-ভাগী।

অনন্তর অম্বিকা কহিলেন, ভূতনাথ! আমি ত এই কথার কোন তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পরিলাম না। নৈঋ্র্তকোণের অধিষ্ঠাতা রাক্ষস কি প্রকারে গর্ভস্থ সন্তানের অংশ-ভাগী হইল? আর সেই রাক্ষসই বা কে? এবং কেনই বা তাহার উদ্দেশ্যে বলিপ্রদান করিতে হইবে?

মহা। ভূতেশ্বরি! এই ভূতময় জগৎপ্রপঞ্চের প্রত্যেক ভৌতিক-কার্য্যের বিষয়ই কি আজ্ তোমাকে নূতন করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে? সংসারে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই ত একই উপাদানে উৎপাদিত হইয়াছে, সুতরাং প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে প্রত্যেক বস্তুরই পরস্পর নৈকট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। তবে অবস্থাভেদে কোন কোন কার্য্যদ্বারা সেই সম্বন্ধ স্পষ্ট হয় এবং কোন কোন কার্য্যদ্বারা কখনও তাহা লুপ্তপ্রায় থাকে।

অম্বি। হে চরাচর বিধাতঃ বিশ্বপতে! অল্পবুদ্ধি মানবগণ ত কখনই ইহার গুঢ় রহস্যভেদ করিতে পারিবে না এবং তাহাহইলে আমার সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যও সফল হইবে না।

মহা। প্রিয়ে! সংসারে সকলেই সকল বিষয় সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে না। যাহারা বিচক্ষণ তাহারাই অনায়াসে সমুদায় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয়। অথবা আমার প্রতি বা শাস্ত্রে যাহাদের একান্ত ভক্তি আছে, তাহারাও কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারে। মেঘাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলের দিক্ দৃষ্টিপাত করিয়া যাহারা বলিয়া থাকে যে "মেঘরাশি সূর্য্যমণ্ডলকে আবৃত করিয়াছে।"

তাহারাই অজ্ঞানতাবশতঃ প্রকৃততত্ত্বকে অপ্রকৃত বলিয়া কল্পনা করিতে পারে। সেই সকল অর্ব্বাচীনগণই হয়কে নয় বলিয়া নানাবিধ ব্যঙ্গোক্তি করিয়া থাকে। তাহারা একবারও মনে করে না যে, মেঘরাশি হইতে সূর্য্যমণ্ডল যতদূরে অবস্থিত, তদপেক্ষা তাহাদের চক্ষুই ত অধিকতর নিকট-বর্ত্তী। সুতরাং সমস্ত ভুবনপ্রকাশক ভগবান সূর্য্যদেব আবৃত না হইয়া অল্পদর্শী তাহাদের চক্ষুই ত আবৃত হইয়াছে। অতএব এই বিশাল সংসারে রাক্ষস, নিশাচর নামধারী কোন বস্তু আছে কি না, এবং তাহাদের সহিত গর্ভস্থ সন্তানের কোন নৈকট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে কি না, সেই সমস্ত অল্পবুদ্ধি মূঢ়গণ অথবা আত্ম-পক্ষ-সমর্থন-কারী দাম্ভিকগণ তাহা কি প্রকারে বুঝিয়া উঠিবে? তবে দুই একটী দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিলে, দুই এক জন বুঝিলেও বুঝিতে পারে। কিন্তু তাহাই বা তাহারা চেষ্টা করে কোথায়? তাহারা ত আমাকেই বিশ্বাস করে না! তবে আমার কার্য্যই বা বিশ্বাস করিবে কেন?

অম্বি। হে যোগ-মায়া-ধারিণ্ মহাকাল! আর আমি বাহ্য কথা শুনিতে চাই না। উহা কখনও চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতিপন্ন নহে। যাহারা প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধিৎসু তাহারা আপনারাই উহা বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিবে। যাহারা নিজে কিছু না বুঝিয়া "কেবল আমিই সর্ব্বদর্শী, আমিই সর্ব্বজ্ঞ," বলিয়া বৃথা জনসমাজে আস্ফালন করিয়া থাকে, বক্তৃতার ঘন ঘটায় সকলকে মোহিত করিয়া আকাশপাতাল কম্পিত করিয়া তুলে, শাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব কখনই তাহাদের নিকট সত্য বলিয়া বোধ হইবে না। তাহারা যে প্রকার অন্ধকারে আছে, চিরকাল সেই প্রকার অন্ধকারেই থাকুক। তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। এইক্ষণ দয়া করিয়া আমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর প্রদান করুন।

মহা। দেবি! তুমি রমণীদিগের হিতের জন্য যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ক্রমে ক্রমে তাহার উত্তর দিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। অষ্টমমাসে গর্ভবেদনা হইলে, তণ্ডুলোদকের সহিত ধনিয়া বাঁটিয়া খাওয়াইবে। অথবা সুশীতল জলের সহিত পলাশপত্র বাঁটিয়া খাওয়াইবে। ইহাতে শীঘ্র গর্ভবেদনা দূরীকৃত হয়।

রক্তস্রাব নিবারণার্থ কয়েতবেল, বেল, বৃহতী, পটোল, ইক্ষু ও

কণ্টকারী, ইহাদের মূল সমভাগে দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিতে দিবে।

পণ্ডিতগণ নবম, দশম ও একাদশ মাসকেই প্রসবের প্রকৃত সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তদপেক্ষা অধিক বিলম্ব হুইলে, বিকৃত গর্ভ বলিয়া স্থির করেন। কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে দশম মাসে যে সন্তান প্রসব হয়, তাহাই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার পূর্ব্বে সন্তান জন্মিলে, স্পষ্টতঃই হউক বা সূক্ষ্মরূপেই হউক, অবশ্যই তাহার কোন না কোন ইন্দ্রিয়ের শক্তি হ্রাস হইয়া থাকে। আবার কোন দোষাদির আধিক্যে প্রসবের ব্যাঘাত না জন্মানসত্ত্বেও যদি স্বভাবতঃ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার কোন না কোন অঙ্গ অধিক বা কোন ইন্দ্রিয় প্রবল হইয়াছে এরূপ দেখা যায়।

নবম মাসে বেদনা হইলে বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। প্রকৃত প্রসব-বেদনা হইলে তদনুরূপ কার্য্য করিবে। নতুবা এরণ্ডমূল ও কাকোলী শীতল জলের সহিত কিম্বা পলাশবীজ, কাকোলী ও ঝাঁটিমূল কাঞ্জিকের সহিত বাটিয়া সেবন করাইবে।

রক্তস্রাবে যষ্টিমধু, অনন্তমূল, ক্ষীরকাঁকলা ও শ্যামালতা জলে বাটিয়া সেবন করাইবে। যদি কেহ ভ্রমবশতঃ প্রসব-বেদনার সময়ই এই সমস্ত যোগ প্রয়োগ করে, তবে তাহাতেও বিশেষ কিছু দোষ হবে না। কেন না সময় ও অবস্থানুসারে গর্ভের পক্ষে যাহা একান্ত হিতকর, কেবল তাহাই বলিতেছি।

দশমমাসে বেদনা উপস্থিত হইলে নীলোৎপল, যষ্টিমধু, মুগ ও চিনি দুগ্ধের সহিত ভোজন করাইবে। ইহাতে গর্ভের দোষ ও বেদনা নিবারিত হয়।

কখন কখন কোন বিকৃত গর্ভ একাদশ, দ্বাদশ বা ততোধিককাল অতীত হইলেও প্রসব হয় না, এরূপ দেখা যায়। তদ্রূপ অবস্থায় একাদশ মাসে গর্ভশূল হইলে যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, মৃণাল ও নীলোৎপল ; অথবা ক্ষীরকাঁকলা, উৎপল, কুড়, বরাক্রান্তামূল ও চিনি শীতলজলে বাঁটিয়া সেবন করিতে দিবে। দ্বাদশমাসে চিনি, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী ও ক্ষীরকাকলা বাঁটিয়া সেবন করাইবে।

কখন কখন বায়ুদ্বারা গর্ভ বা বালক শুষ্ক হইয়া প্রসবের ব্যাঘাৎ জন্মায়, তদ্রূপস্থলে চিনি, যষ্টিমধু ও গাম্ভারীফলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধপানার্থ ব্যবস্থা করিবে। তাহাতে গর্ভ পুষ্ট হয়।

আবার অকালে গর্ভপাতের লক্ষণ উপস্থিত হইলে কেশুর, পানিফল, জীবনীয়গণ (অর্থাৎ জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তি, যষ্টিমধু) পদ্মকেশর, উৎপল, এরণ্ডমূল ও শতমূলী, এই সমুদায়ের সহিত সিদ্ধদুগ্ধ চিনির সহিত পান করাইবে। ইহাতে গর্ভ-স্রাব নিবারণ হয়।

ছাগদুগ্ধ ।॰ পোয়া, মধু ২ মাষা ও কুম্ভকারমর্দ্দিত হণ্ডিকাস্থ মৃত্তিকা ৪ মাষা একত্রিত করিয়া পান করিলে গর্ভপাত নিবারণ হয়।

গর্ভস্রাবের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে কেশুর, পানিফল, পদ্মকেশর, উৎপল, মুগানী, যষ্টিমধু ও চিনি দুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে এবং দুগ্ধ ও অন্ন পথ্য দিবে। তাহাতেই গর্ভ প্রকৃতিস্থ হইবে। নতুবা গর্ভবিলাস তৈল মর্দ্দন করিবে। তাহাতে গর্ভশূল ও রক্তস্রাবাদি নিবারণ হইয়া পতনোন্মুখ গর্ভও স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়।

গর্ভবিলাসতৈল।

বিদারীদাড়িমং পত্রং রজনী চ ফলত্রয়ম্।
শৃঙ্গাটকস্য পত্রঞ্চ জাতীকুসুমমেব চ॥
বরীনীলোৎপলং পদ্মং তৈলমেতৈঃ পচেৎ সুধীঃ।
এতদ্‌গর্ভবিলাসাখ্যং গর্ভসংস্থাপনং পরম্॥

মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ সের। কল্কার্থ ভূমিকুষ্মাণ্ড, দাড়িমপত্র, কাঁচা-হরিদ্রা, ত্রিফলা, পানিফলপত্র, জাতীপুষ্প, শতমূলী, নীলোৎপল, পদ্মপুষ্প মিলিত /১ সের। যথাবিহিত পাকশেষ করিয়া প্রয়োগ করিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন, জীবিতনাথ! এ ত গর্ভের সাধারণ লক্ষণ ও তাহার আনুষঙ্গিক কয়েকটী রোগের কথা শুনিলাম। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন ব্যারাম উপস্থিত হইলে কি উপায়ে তাহার প্রতীকার করিতে হইবে? তাহাও বিশেষ করিয়া শুনিতে ইচ্ছা করি।

মহাদেব কহিলেন, প্রিয়ে! সংসারে যতপ্রকার রোগ আছে, তৎসমস্তই গর্ভাবস্থায় উপস্থিত হইতে পারে। সেই সকলের বিশেষ কোন বিবরণ বলিবার প্রয়োজন নাই। অবস্থাদৃষ্টে যাহা গর্ভের পক্ষে হিতকর অথচ রোগপ্রশমক, বিবেচনাপূর্ব্বক তাহাই প্রয়োগ করিবে। কিন্তু আবার এমন কতগুলি রোগ আছে যে, শীঘ্র শীঘ্র তাহার প্রতিকার না করিলে গর্ভিণীর জীবন শঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহাই বলিতেছি, গর্ভিণীর চিকিৎসা করিতে হইলে স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। কখনও সাধারণ বিধান অনুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। অথবা কোনপ্রকার তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধও সেবন করিতে দিবে না। তাহাহইলে গর্ভিণী ও গর্ভস্থ সন্তান উভয়েরই ভাবী অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

গর্ভাবস্থায় জ্বর হইলে রক্তচন্দন, অনন্তমূল, লোধ, দ্রাক্ষা, (কিস্‌মিস্) এই সমুদায় দ্রব্যের ক্বাথ চিনির সহিত পান করাইবে।

এরণ্ডমূল, গুলঞ্চ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, দেবদারু ও পদ্মকাষ্ঠ এই সমুদায়ের ক্বাথপানে গর্ভিণীর জ্বর নিবারণ হয়।

বাসকছাল, গুলঞ্চ, কণ্টকারী মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ।৷ সের, শেষ অর্দ্ধপোয়া; প্রক্ষেপ মধু। এই কষায়পান করিলে গর্ভিণীর শোথ, শ্বাস, কাস, জ্বর ও বমি নিবারণ হয়।

শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই কয়েকটী দ্রব্যের ক্বাথ মধুর সহিত অথবা এই কয়েকটী দ্রব্য দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধপান করিলে গর্ভিণীর জ্বর শান্তি হয়।

এতদ্ভিন্ন রসাদিপ্রয়োগেরও নিয়ম আছে; যথা, (—

গর্ভচিন্তামণিরস।

রসং তালং তথা লৌহং প্রত্যেকং কর্ষমাত্রকম্।
কর্ষদ্বয়ং তথাচাভ্রং কর্পূরং বঙ্গং তাম্রকম্॥
জাতীফলং তথা কোষং গোক্ষুরঞ্চ শতাবরী।
বলাতিবলয়োর্মূলং প্রত্যেকং তোলকং শুভম্॥
বারিণা বটিকা কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ।

অর্থাৎ কজ্জলী ৪ ভাগ, শোধিত হরিতাল, জারিতলৌহ প্রত্যেকে ২

ভাগ, জারিত অভ্র ৪ ভাগ এবং কর্পূর, বঙ্গভস্ম, তাম্রভস্ম, জায়ফল, জয়িত্রী, গোক্ষুরবীজ, শতমূলী, বেড়েলামূল ও শ্বেতবেড়েলামূল প্রত্যেকে ১ ভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে গর্ভবতী স্ত্রীর জ্বর ও দাহ এবং প্রদর প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়। এই ঔষধে কজ্জলীর পরিবর্ত্তে কেবল রসসিন্দুরও ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং তজ্জন্যই মূলে কেবল রসের উল্লেখ আছে।

গর্ভবিলাসরস।

রসগন্ধকতুত্থঞ্চ ত্র্যহং জম্বীরমর্দ্দিতম্।
ত্রিভাবিতং ত্রিকটুনা দেয়ং গুঞ্জাদ্বয়োন্মিতম্॥

শোধিত পারদ, গন্ধক এবং তুতিয়া, সমভাগে গোঁড়ালেবুর রসে তিনদিন মর্দ্দন করিয়া ত্রিকটুর ক্বাথে তিনবার ভাবনা দিবে এবং ২ রতিপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা গর্ভিণীর জ্বরাদিরোগে প্রয়োজ্য।

ইন্দুশেখররস।

শিলাজত্বভ্রসিন্দুরপ্রবালায়ো রজাংসি চ।
মাক্ষিকঞ্চ তথা তালং সমভাগানি মর্দ্দয়েৎ॥
ভৃঙ্গরাজস্য পার্থস্য নির্গুণ্ড্যা বাসকস্য চ।
স্থলপদ্মস্য পদ্মস্য কুটজস্য চ বারিণা॥
ভাবয়িত্বা বটীঃ কৃত্বা কলায়পরিমাণতঃ।
যথাদোষানুপানেন গর্ভিণীষু প্রয়োজয়েৎ॥

শিলাজতু, অভ্র, রসসিন্দুর, প্রবাল, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক ও হরিতাল, প্রত্যেকে সমভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া ভৃঙ্গরাজ, অর্জ্জুনছাল, নিসিন্দা, বাসক, স্থলপদ্ম, পদ্ম ও কুড়চিছালের রসে ভাবনা দিয়া মটরপ্রমাণ বটীকা করিবে এবং দোষানুসারে অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে গর্ভিণীর জ্বর, শ্বাস, কাস, শিরঃপীড়া, রক্তাতিসার, গ্রহণী, বমন, ক্ষুধামান্দ্য, আলস্য ও দৌর্ব্বল্য নিরাকৃত হয়।

বালা, সোণাছাল, রক্তচন্দন, বেড়েলা, ধনিয়া, গুলঞ্চ, মুথা, বেণারমূল, দুরালভা, ক্ষেতপাঁপড়া, আতইচ ইহাদের ক্বাথ পান করিলে নানাপ্রকার অতিসার, রক্তস্রাব ও সূতিকারোগ নষ্ট হয়।

আমছাল ও জামছালের কাথ, খইচূর্ণের সহিত সেবন করিলে গর্ভিণীর গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়।

লবঙ্গ, সোহাগার খই, মুথা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ. ধনিয়া, জাঁয়ফল, শ্বেত-ধুনা, শুল্‌ফা, দাড়িমফলের ছাল, জীরা, সৈন্ধব, মোচরস, নীলসুঁদীমূল, রসোত, জারিত অভ্র ও বঙ্গ, বরাক্রান্তা, রক্তচন্দন, শুঁঠ, আতইচ, কাঁকড়া-শৃঙ্গী, খদির এবং বালা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহাকে লবঙ্গাদি চূর্ণ কহে। এই ঔষধ কিঞ্চিৎ ছাগদুগ্ধের সহিত গর্ভাবস্থায় সেবন করাইলে সংগ্রহ গ্রহণী, অতিসার ও আমরক্তাদি পীড়া শীঘ্র প্রশমিত হয়।

এতদ্ভিন্ন আরও কতগুলি পীড়া গর্ভাবস্থায় প্রবল হইয়া গর্ভিণীকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়া থাকে। সেই সকল পীড়ার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করিতে হয় না। সন্তান প্রসব হইলে আপনা হইতেই তাহা উপশমিত হইয়া থাকে।

পার্ব্ব। প্রভো! কি প্রকার আচারব্যবহার গর্ভের পক্ষে একান্ত হিতকর?

মহা। প্রিয়ে! এক্ষণে গর্ভিণীর কৃত্যাকৃত্যসম্বন্ধে যথোচিত বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। গর্ভের প্রথম দিবস হইতে স্ত্রীলোক উত্তম বস্ত্রা-লঙ্কারে ভূষিতা হইয়া সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্তে থাকিবে এবং একান্ত শুদ্ধাচারিণী হইয়া দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণের সেবাতে সর্ব্বদা অবহিত থাকিবে। সুমিষ্ট, স্নিগ্ধ, হৃদ্য, দ্রব, সুসংস্কৃত ও সুখ্যপাচ্য দ্রব্য সকল আহার করিবে। ব্যায়াম বা অপকৃষ্ট বিষয়ে অধিক আনন্দ অনুভব করিবে না। পুরুষসংসর্গ বা অতি-রিক্ত আমোদ, রাত্রিজাগরণ, শোক, যানারোহণ, রক্ত-মোক্ষণ, বেগরোধ এবং উৎকট আসন পরিত্যাগ করিবে। এমন কি অষ্টমমাসে যে গর্ভিণী পুরুষাভিলাষিণী হইয়া মৈথুনাদি কার্য্যে ব্যাপৃতা হয়, তাহার গর্ভনাশ বা মৃত্যুপর্য্যন্তও হইতে পারে। অথবা নিতান্ত পক্ষে অন্ধ, মূক, বধির বা কুব্জ সন্তান উৎপন্ন হয়। গর্ভবতী নারী, বিকৃতাকার, মলিন বা হীনাঙ্গী স্ত্রী-লোককে স্পর্শ করিবে না। দুর্গন্ধ আঘ্রাণ, অপ্রীতিকর বস্তু দর্শন, উদ্বর্ত্তন বা অঙ্গে অধিক তৈলমর্দ্দন করিবে না। শুষ্ক, পচা বা অপক্ব অন্ন আহার পরিত্যাগ করিবে। কখনও উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবে না, বা যাহাতে গর্ভনাশ হয়, এরূপ কোন কার্য্য করিবে না। চৈত্য, শ্মশানবৃক্ষ, অযশস্কর ভাব,

বহির্নিক্রমণ, ক্রোধ ও শূন্যাগার বর্জ্জন করিবে। মৃত্তিকাতে শয়ন বা উপবেশন সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে।

পার্ব্ব। হে দেবাদিদেব মহাদেব! এইক্ষণ আরও একটী বিষয় শুনিবার জন্ত আমার মন অত্যন্ত ব্যাগ্র হইয়াছে। কি প্রকারে জীবগণ গর্ভমধ্যে জীবন ধারণ করে? এবং কি খাইয়াই বা তাহারা ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া যথাসময় ভুমিষ্ঠ হয়?

মহা। প্রিয়ে! এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যাহা কিছু দেখিবে, তৎসমস্তই আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমিই পঞ্চমহাভূতে বিভক্ত হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছি। সেই মহাভূত সকলের বিকার এবং চেতনানামক ষষ্ঠধাতুর সমবায়ে জরায়ুরূপ আকাশমধ্যে গর্ভের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অগ্নি, সোম, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সত্ব, রজঃ, তম, পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও ভূতাত্মা, এই কয়টী গর্ভের জীবনী-শক্তি-দায়ক। অগ্নিপাচন, ভ্রাজন, প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা গর্ভস্থ বালককে জীবিত রাখে; সোম ওজঃ প্রভৃতি সৌম্য ধাতুর পোষণ এবং বায়ু ও অগ্নিদ্বারা যে ভাগ শুষ্ক হয় সেই ভাগকে আর্দ্র করতঃ গর্ভস্থ বালককে জীবিত রাখে। মৃত্তিকা শরীরস্থ জলক্লিন্ন ভাগকে অপেক্ষাকৃত কঠিন করিয়া বায়ু নিশ্বাস, প্রশ্বাস, দোষ, ধাতু ও মলাদির সঞ্চালন করিয়া, আকাশ বায়ু ও অগ্নিদ্বারা বিদারিত স্রোত সকলকে উর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্ গমনে অবকাশ প্রদান করিয়া গর্ভস্থ বালককে জীবিত রাখে। সত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক মন জীবাত্মার শরীরান্তর গ্রহণ ও মোক্ষণের কারণ বলিয়া গর্ভস্থ বালক জীবিত থাকে। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয় দর্শন স্পর্শনাদি কর্ম্মদ্বারা জীবন রক্ষা করে এবং কর্ম্ম পুরুষ-ভূতাত্মা অশেষ কর্ম্মরাশির চৈতন্তস্বরূপ দেহে অবস্থান করিয়া দেহীর জীবন রক্ষা করে। আবার গর্ভস্থ সন্তানের নাভির সহিত জননীর রস-বহনাড়ী সংযুক্ত থাকে, তদ্দ্বারা সন্তান, জননীর আহাররসাদি আকর্ষণ করিয়া দিন দিন নিজদেহ বর্দ্ধিত করে এবং জননীর নিশ্বাসপ্রশ্বাস, সঞ্চালন ও নিদ্রা অনুসারে সন্তানেরও নিশ্বাসপ্রশ্বাস, সঞ্চালন ও নিদ্রা হইয়া থাকে। আরও গর্ভস্থ শিশুর নাভিমধ্যে স্থির জ্যোতিঃস্থান আছে, তথায় সর্ব্বদা বায়ু ধমন করে; সেই ধমিত বায়ু উষ্ণতা সহকারে স্রোতঃপথে শরীরের উর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যগ্ ভাগে গমন করিয়া গর্ভস্থ সন্তানের দেহ বৃদ্ধি করে।

পার্ব্ব। তবে নাথ! জননীর আহারাদিদ্বারা যখন গর্ভস্থ সন্তানেরও আহার কার্য্যসম্পন্ন হয়, তখন কেনই বা উক্ত সন্তান গর্ভমধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করে না? আর উদরে সমাস্ত শব্দ হইলেও যখন তাহা বাহির হইতে অনায়াসে শুণিতে পাওয়া যায়; তখন গর্ভস্থ সজীব সন্তানের ক্রন্দন বা অন্য কোনপ্রকার শব্দ কেনই বা বাহির হইতে শুনা যায় না? তাহারা কি ক্রন্দন করে না?

মহা। দেবি! আহার করিলে অবশ্যই মলমূত্র ত্যাগ করিতে হয়, তাহা সত্য, কিন্তু গর্ভস্থ সন্তান ত তদ্রূপ কিছু আহার করে না। বিশেষতঃ তাহাদের বাতাদির পরিমাণ অত্যন্ত অল্প এবং তাহাদের বায়ু ও পক্কাশয় পরস্পর ঈষৎ সংযুক্ত রহিয়াছে, তজ্জন্যই তাহারা কখন মলমূত্র ত্যাগ করিতে পারে না; আবার তাহাদের মুখমণ্ডল জরায়ুকর্তৃক আচ্ছন্ন, কণ্ঠ কফদ্বারা বেষ্টিত এবং বায়ুর পথ অবরুদ্ধ থাকে, তজ্জন্যই তাহারা কখন রোদন বা অন্য শব্দও করিতে পারে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ
উমারপুর, পোঃ নাকালীয়া, পাবনা।

শিশু-চিকিৎসা।

হোমিওপ্যাথি মতে

মনুষ্য জীবন চারিভাগে বিভক্ত;—শৈশবকাল, বাল্যকাল, প্রৌঢ়াবস্থা ও বৃদ্ধকাল। এতন্মধ্যে শৈশবকালের মৃত্যুসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সকল দেশের জন্মমৃত্যুর তালিকা লইয়া দেখা হইয়াছে যে, এই কালে জন্ম হইতে দন্তোদ্গমকাল পর্য্যন্ত প্রায় তিনভাগের একভাগ লোকের মৃত্যু হয়। ইহার কারণ এই যে, ঐ সময় নানাপ্রকার কঠিন পীড়া হওয়ার সম্ভব এবং জীবনীশক্তির স্বল্পতাহেতু যে কোন পীড়া হউক, তাহাই সাজ্বাতিক হওয়ার সম্ভব; তদ্ভিন্ন রোগী নিজের অবস্থা বলিতে না পারায় পীড়া স্থির বা ঔষধ নির্ণয় করা চিকিৎসকের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু ডাক্তার হানিমান সাহেবের অনুকম্পায় শিশুচিকিৎসা আর তত কঠিন বলিয়া বোধহয় না এবং

সেই জন্য যে সকল দেশে ঐ সকল ঔষধ প্রচলিত আছে, সে দেশে শিশুদিগের মৃত্যু সম্ভাবনা অল্প হইয়াছে।

শৈশবকাল চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথা—

১। জন্মকাল।

২। সূতিকাগৃহে অবস্থিতি কাল।

৩। স্তন্য দুগ্ধদ্বারা জীবনপোষণ কাল।

৪। দন্তোদ্গম কাল।

এই চারিকালে উহাদিগের নানাপ্রকার পীড়া জন্মিতে পারে। ইহার প্রত্যেককালে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কি কি রোগ জন্মিতে পারে ও তাহাদিগের চিকিৎসাই বা কি এস্থলে তাহা ক্রমে বর্ণনা করা যাইবে। এই চারি অবস্থার সহিত মাতার প্রসবকাল, সূতিকাবস্থা, স্তন্য দুগ্ধদ্বারা সন্তান প্রতিপালন ও সন্তানকে স্তনপান পরিত্যাগ করান এই চারি অবস্থার সমতা দৃষ্ট হয়, শৈশবাবস্থায় যে সকল পীড়া জন্মে তন্মধ্যে যে সকল পীড়া যে কালে অধিক দেখা যায়, সেই কালের মধ্যে দেওয়া যাইবে।

১। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে চিকিৎসকের কর্ত্তব্য। সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ামাত্র উহাকে এমতভাবে রক্ষা করিতে হইবে, যেন শ্বাসপ্রশ্বাসের বাধা না জন্মে এবং যে পর্য্যন্ত নাড়ীতে অর্থাৎ কর্ডে ধমনীর স্পন্দন বন্ধ না হয় বা কমিয়া না যায়, ততক্ষণ ফুল প্রসব না হইলে ক্ষতি নাই, সন্তানের গ্রীবায় বা অন্যকোন অংশে নাড়ী জড়ান থাকিলে তাহা ছাড়াইয়া দিতে হইবে এবং সন্তানকে এমতভাবে একপার্শ্বে কাত করিয়া শয়ন করাইতে হইবে যেন যোনির দ্বারের দিকে মুখ না থাকে, ইহাতে সন্তানের মুখমধ্যে শ্লেষ্মা থাকিলে নির্গত হইয়া যাইবে এবং যোনি হইতে রক্তস্রাব হইলে উহার নাসিকা অবরোধ করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করিতে পারিবে না। তৎপরে সন্তানের নাভিদেশে যে কর্ড সংলগ্ন থাকে, তাহার দুই ইঞ্চ উপরে সরু সূত্রদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিতে হইবে, বন্ধন করার অগ্রে দেখা কর্ত্তব্য যে নাড়ীর মধ্যে সন্তানের অন্ত্রপ্রবেশ করিয়াছে কি না, যদি তাহাই হইয়া থাকে তাহা হইলে ঐ অন্ত্র আস্তে আস্তে টিপিয়া উদরের মধ্যে দিতে হইবে এবং তৎপরে কর্ড বন্ধন করিতে হইবে। এইরূপে বন্ধন করা হইলে ঐ বন্ধনের উপর অর্থাৎ ফুলের দিকে তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা কর্ত্তন করিতে হইবে, কর্ড কর্ত্তন করা হইলে

সন্তানের মুখ ও নাসারন্ধ্র মধ্যস্থিত যে কোন পদার্থ থাকে, তাঁহা একখানি কোমল বস্ত্রদ্বারা পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে, তৎপরে সন্তানের দেহ অল্প উষ্ণজলে ধৌত করিয়া শুষ্ক ও উষ্ণ বস্ত্রদ্বারা মোছাইতে হইবে, এইরূপে দেহ পরিষ্কৃত হইলে নাভিমণ্ডলে একটি ব্যাণ্ডেজ্ বন্ধন করা কর্ত্তব্য এবং সন্তানকে গরম বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া শুষ্ক পরিষ্কার শয্যায় শয়ন করাইয়া এমনভাবে রাখিতে হইবে যেন শ্বাসপ্রশ্বাসের রক্তসঞ্চালনক্রিয়ার ও হস্তপদাদির গতির ব্যাঘাত না জন্মে, উহাকে কেহ কেহ ব্রাণ্ডীদ্বারা ধৌত করিতে উপদেশ দিয়াছেন কারণ উহাতে গাত্রে কোন মেদসংযুক্ত দ্রব্য থাকিলে সহজে দ্রবীভূত হইয়া যায়; কিন্তু বস্তুত ব্রাণ্ডীর এ সকল পদার্থ দ্রবীভূত করার ক্ষমতা নাই, অধিকন্তু উহাতে সন্তানের কোমল চর্ম্ম উগ্র হইয়া উঠে, বরং এস্থলে কোনপ্রকার অনুগ্র তৈলদ্বারা শরীর মর্দ্দন করা যাইতে পারে, এইরূপে সন্তানের বস্ত্রাদি ও শয্যা স্থির হইলে উহাকে মাতার পার্শ্বে রাখিতে এবং প্রসূতি আরোগ্য হইলে স্তনপান করাইতে পারেন। যে দুগ্ধ অগ্রে নিস্রাব হয়, তাহাকে কলোষ্ট্রাম কহে। উহা সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর নহে কিন্তু উহাতে মেকোনিয়াম নামক যে মল অন্ত্রে থাকে, তাহা নির্গম করিতে সক্ষম। কোন প্রসূতির নিজের সন্তানকে স্তনদুগ্ধ হইতে বঞ্চিত করান উচিত নহে, কারণ দুগ্ধ সন্তানের ভরণপোষণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। যে স্থলে দুগ্ধ মন্দ বা প্রসূতি রুগ্ন ও রোগাক্রান্ত সেখানে না দেওয়াই কর্ত্তব্য। সকল জন্তুতেই তাহাদের সন্তান স্তন্য দুগ্ধদ্বারা প্রতিপালন করে, কেবল মনুষ্যজাতির মধ্যে কোন কোন নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর প্রসূতিরা তাহাদিগের নিজের সন্তানকে ঈশ্বর প্রেরিত আহার হইতে বঞ্চিত করেন। যেখানে প্রসূতি ইচ্ছাক্রমে বা সুখের জন্য এইরূপ ব্যবহার করেন, সেখানে প্রায়ই তাহাদিগকে স্বভাবের নিয়ম লঙ্ঘনহেতু রোগাক্রান্ত হইয়া বিশেষ যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়, যদি শারীরিক দুর্ব্বলতা, রোগ বা দুগ্ধের অভাবহেতু সন্তানকে স্তন্যদুগ্ধ সেবন করান না হয়, তাহা হইলে এমত একটী প্রসূতি আবশ্যক যাহার দুগ্ধ মাতার দুগ্ধের অনুরূপ, অধিক দিনের প্রসূতি হইলে তাহার দুগ্ধ এত গুরুপাক হয় যে, সদ্যজাত শিশু উহা সেবন করিয়া পরিপাক করিতে পারে না, কাজেই সন্তান ক্রমে শুষ্ক ও রোগগ্রস্থ হইয়া উঠে। মাতার দুগ্ধের ন্যায় অন্যকোন দুগ্ধ না পাওয়া গেলে টাটকা গরুর দুগ্ধের সহিত তিন অংশের এক অংশ উষ্ণজল

মিশ্রিত করিয়া অল্প চিনি মিশাইয়া সেবন করাইতে হইবে। প্রতিবারে প্রথম প্রথম ২। ৩ চামচা অর্থাৎ ৩। ৪ ড্রামের অধিক দেওয়া উচিত নহে; কিন্তু পুনঃ পুনঃ সেবন করাইতে হইবে; ক্রমে আহারের পরিমাণ বৃদ্ধি ও দুগ্ধের সহিত যে জল মিশ্রিত করিতে হয় তাহার পরিমাণ কমাইতে হইবে, কাঁচের কৃত্রিম স্তন ব্যবহার করা কোনমতে উচিত নহে, কারণ একবার ব্যবহার করিলে বিশেষ সাবধানেও উহা পরিষ্কার করা যায় না, পরিষ্কার না হইলে ঐ দুগ্ধ অম্ল হইয়া উঠে এবং অম্লদুগ্ধ সেবনে সন্তানের মুখে জাড়িঘা প্রকাশ পাইতে পারে, যে সকল যন্ত্রে রবারের নল না থাকে সমস্তই কাচনির্ম্মিত ও সহজে খুলিয়া পরিষ্কার করা যাইতে পারে তাহা ব্যবহার করায় হানি নাই। সন্তানকে পরিষ্কার রাখার নিমিত্ত প্রত্যহ কালবিশেষে উষ্ণ বা শীতল জলে স্নান করান উচিত। প্রথম দন্তোদ্গমকালে উষ্ণজল ব্যবহার করা উচিত।

২ সূতিকাগৃহে অবস্থিতিকাল। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র ক্রন্দন করে, ইহা স্বাস্থ্যের লক্ষণ, এই ক্রন্দন ফুস্‌ফুস্ মধ্যে বহির্ব্বাতাস যাওয়ায় অসুস্থতা অনুভবহেতু ক্রন্দন করে, অতএব ইহা দোষের বিষয় নহে বরং উহাতে সন্তানের শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ হইয়াছে তাহাই অনুমান করিতে হইবে। কখন কখন ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হওয়ায় ক্রন্দন করিতে পারে না; শ্বাসপ্রশ্বাস জীবনরক্ষার প্রধান উপায়, উহার অভাবে অন্যান্য ক্রিয়া বন্ধ হইয়া সন্তানের শ্বাস অবরোধ হইয়া মৃত্যু হয়। কখন বা জীবিত সন্তান প্রসব হয় কিন্তু উহার মস্তক স্ফীত অথবা ত্বক্ নীল বা পীতবর্ণ অথবা কঠিন কিম্বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকৃতি হইয়া প্রসব হয়। এই সকল অবস্থায় তৎক্ষণাৎ তাহার উপায় উদ্ভাবন করা চিকিৎসকের অতীব কর্ত্তব্য।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে নিম্নলিখিত রোগ সকল সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, সংন্যাস (এপোপ্লেক্‌সি), শ্বাসঅবরোধ (এস্কীকৃসিয়া), দেহ নীলবর্ণ (সায়ানোসিস্) কামোল (জণ্ডিস), মস্তকের স্থানে স্থানে রক্তসঞ্চার এবং স্থানে স্থানে স্ফীত হওন বা পেশির কাঠিন্যতা, স্তনদ্বয় স্ফীত হওন, অঙ্গের বিকৃতি এবং অন্ত্রবৃদ্ধি ইত্যাদি।

(ক) এপোপ্লেক্‌সি বা সংন্যাশ। এই অবস্থায় সন্তান কখন

কথন ভূমিষ্ঠ হয়, উহা কষ্টকর ও বহুকালব্যাপি প্রসবে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে সন্তানের দেহ স্ফীত অনুভব হয়, মুখমণ্ডল এবং সর্ব্বাঙ্গ আরক্ত বা নীলবর্ণ হইয়া উঠে, পেশি সকল নিস্পন্দ থাকে, হাত পা নরম এবং শরীরের উত্তাপ থাকে, কর্ড অর্থাৎ নাড়ীতে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন প্রায় পাওয়া যায় না অথবা স্পন্দন অতি মৃদু এবং শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ থাকে। এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা এ অবস্থায় তৎক্ষণাৎ কর্ড ছেদন করিয়া উহা হইতে টিপিয়া রক্ত-স্রাব করেন, এপ্রকারে দুর্ব্বল শিশুর গাত্র হইতে এ অবস্থায় রক্তবাহির করা আমাদের বিবেচনায় উচিত নহে, এস্থলে ওরূপ প্রক্রিয়ার কোন আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না, কেবলমাত্র ঔষধ সেবনে আরোগ্য হইতে পারে। এ রোগের প্রধান ঔষধ ১৮ক্রমের একোনাইটের একটী বটিকা জিহ্বাগ্রে দিলে তৎক্ষণাৎ অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়ার সম্ভব। যদি ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে কোন উপকার না দর্শে তাহা হইলে এণ্টিমটার্ট ঐ প্রকারে ব্যবহারে আরোগ্য হইবে, সন্তানের দেহ আরক্ত দেখিলে ১২ ক্রমের ওপিয়াম ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, সংন্যাসের সহিত শ্বাস অবরোধপীড়ার ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে কোন ভ্রম হওয়ার সম্ভব নাই, এ দুই অবস্থার চিকিৎসা স্বতন্ত্র।

(খ) শ্বাস অবরোধ বা এস্‌কিকৃসিয়া। সদ্য জাত শিশু অতিশয় দুর্ব্বল হইলে বা ভূমিষ্ঠ হইতে অতিরিক্ত বিলম্ব কিম্বা প্রসবকালীন অতিরিক্ত রক্তস্রাব অথবা গর্ভাবস্থায় মাতার অন্য কোন পীড়া থাকিলে সন্তানের এ অবস্থা ঘটে, উহাতে শিশুর রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয় না কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার এবং পেশির গতি অবরোধ হয়। ত্বক রক্তশূন্য পেশি সকল কোমল ও থলথলে এবং শিশুর অবয়ব মৃত্যুবৎ বলিয়া বোধ হয়, এ অবস্থায় কর্ডে ধমনীর স্পন্দন যে পর্য্যন্ত অনুভূত হইবে সে পর্য্যন্ত ঐ কর্ড কর্ত্তন করা উচিত নহে, উহার নাশারন্ধ্রে শ্লেষ্মা থাকিলে তাহা পরিস্কার করিয়া দেওয়া আবশ্যক, অবশেষে ১৮ ক্রমের চায়নার তিনটী বটীকা জিহ্বাগ্রে দিয়া শিশুকে ফ্লানেলের বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া আর একখণ্ড ঐ বস্ত্রদ্বারা গাত্র ঘর্ষণ করিতে হইবে। ইহাতে যদি শিশুর শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া আরম্ভ না হয় কিম্বা নাড়ীর স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে কর্ড বন্ধন করিয়া কর্ত্তন করিতে হইবে এবং শিশুকে উষ্ণজলের মধ্যে রাখিয়া শরীরের উত্তাপ রক্ষা করিতে হইবে ও পেশির কার্য্য সংস্থাপন করার নিমিত্ত হাত

পায় ও বক্ষে কোমল ভাবে আঘাত করা কর্ত্তব্য। চায়না ব্যবহারে ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে কোন উপকার না দর্শিলে এণ্টিম টার্ট ঐ মাত্রায় দেওয়া যাইতে পারে। অথবা চায়নার সহিত ১৫ মিনিট অন্তর পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা যায় ইহাতেও দুই ঘণ্টার মধ্যে কোন উপকার না পাইলে ল্যাকেসিস ব্যবস্থা। এই সময় সন্তানের মুখের উপর মুখ দিয়া যোরে ফু দিতে হইবে। যেন ঐ বায়ু সন্তানের ফুস ফুস মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। ঐ সময় নাশারন্ধ্রে অঙ্গুলি দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখা উচিত।

ডাক্তার লিলিএন্থ্যাল সাহেবের মতে ১ গ্রেণ এণ্টিমটার্ট ৪ ছটাক জলে মিশ্রিত করিয়া উহার ৮।১০ ফোটা ১৬ মিনিট অন্তর মলদ্বারে পিচকারিদ্বারা বা যে কোন উপায়ে প্রবেশ করাইলে উপকার দর্শিবে, উহাতে আরোগ্য না হইলেও শিশুর মুখমণ্ডল নীলবর্ণ দৃষ্ট হইলে ওপিয়াম ও রক্ত শূন্য দেখিলে চায়নার একটী মাত্র বটীকা মুখে দিতে হইবে। জীবনের চিহ্ন প্রকাশ হইলে ও মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইলে একোন এবং রক্ত শূন্য দেখিলে চায়না ঐ প্রকারে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

ঔষধের প্রয়োগ লক্ষণ।

একোন। সন্তানের দেহ উষ্ণ ও পিঙ্গল বর্ণ, নাড়ী লোপ এবং শ্বাসাবরোধ দৃষ্ট হইলে ব্যবস্থা।

বেলেডোনা। মুখমণ্ডল অতিশয় আরক্ত ও চক্ষু রক্তবর্ণ দেখিলে ইহাতে উপকার হইবে।

চায়না। মাতার অতিরিক্ত রক্তস্রাব হওয়ায় সন্তানের এ অবস্থা ঘটিলে ইহাই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

টার্টারএমেটিক। শিশুর দেহ রক্ত শূন্য এবং উহার শ্বাসাবরোধ সত্বেও নাড়ীর (আম্বেলাইকেল্ কর্ডের) স্পন্দন অনুভব হওয়া ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

ক্যাম্ফার। টার্টার এমেটিক ব্যবহারে কোন উপকার না দর্শিলে উহার পরে ক্যাম্ফার দ্বারা উপকার হওয়া সম্ভব।

উপরোক্ত সকল ঔষধের ৬ ক্রমের একটী করিয়া বটীকা সেবন করাইলে

চলিতে পারে। ঔষধ ব্যবহারের সহিত কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস প্রণালী অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শিশুকে চিৎ করিয়া শয়ন করাইয়া তাহার বাহুদ্বয় দুই হস্তদ্বারা দৃঢ়রূপে ধরিয়া একবার মস্তকের উপরে ও পুনরায় সন্তানের বক্ষের উপর আনিয়া চাপিতে হইবে, এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ করিলে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস করান হইল।

৩। সায়েনোসিস্ বা দেহ নীলবর্ণকারক পীড়া। সদ্যজাত শিশুর এরোগ কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কারণ—ধমনীর ও শিরার রক্ত পরস্পর মিশ্রিত হইয়া দেহমধ্যে সঞ্চালিত হইলে বর্ণের পরিবর্ত্তন হয়। শিরার রক্ত কাল ও অপরিষ্কার, ধমনীর রক্ত উজ্জ্বল লাল ও বিশুদ্ধ, হৃদ্‌পিণ্ডের দক্ষিণ অরিকেলে শিরার অপরিষ্কার রক্ত আসিয়া দক্ষিণ ভেণ্ট্রিকেলে যায় এবং তথা হইতে ফুস্‌ফুস্ মধ্যে যাইয়া বায়ুসংযোগে পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ হয়, তৎপরে পুনরায় হৃৎপিণ্ডের বাম অরিকেলে আসিয়া বাম ভেণ্ট্রিকেলে গমন করে এবং তথা হইতে এয়োর্টা ধমনীর মধ্যে যাইয়া ধমনী দ্বারা শরীরের সর্ব্বত্র চালিত হয়। সন্তান জরায়ু মধ্যে অবস্থিতি কালিন ফুসফুসের ক্রিয়া না থাকায় শিরার রক্ত দক্ষিণ অরিকেলে আসিয়া দক্ষিণ ভেণ্ট্রিকেলে না যাইয়া ফোরোমেন ওভেলি দ্বারা বাম অরিকেলে নীত হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে স্বভাবতঃ ঐ ফোরোমেন ওভেলি আবদ্ধ হইয়া যায় ও উপরোক্ত প্রকারে রক্তের চলাচল হইতে থাকে, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ ঐ ফোরোমেন ওভেলি সম্পূর্ণ আবদ্ধ না হইলে শিরার অপরিষ্কার রক্ত কতক পরিমাণে হৃদ্‌পিণ্ডের বাম পার্শ্বে যায় ও অবশিষ্ট রক্ত স্বাভাবিক পথে গমন করিয়া ফুসফুসে বায়ু দ্বারা পরিষ্কৃত হয়। এই হেতু পরিষ্কৃত ও অপরিষ্কৃত রক্ত মিশ্রিত হইয়া শরীরে চালিত হওয়ায় দেহ নীলবর্ণ দৃষ্ট হয়। এস্থলে সালফার, ক্যালকেরিয়া, বা ডিজিটেলিস উৎকৃষ্ট ঔষধ, ঐ সকল ঔষধ অতি অল্প মাত্রায় সেবন করাইলে উপকার হওয়ার সম্ভব।

৪। ইকটেরাস বা কামল। সদ্য প্রসূত শিশুর ধাত্রীর অনবধানতা হেতু ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র হিম লাগায় অথবা অন্ত্রে যে মেকোনিয়াম নামক পৈত্তিক পদার্থ থাকে, তাহা মলদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত না হইলে এরোগ দেখিতে পাওয়া যায়। এ পীড়া কখনই সাঙ্ঘাতিক হয় না এবং অনেক সময় বিনা চিকিৎসায়ও আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। ২।১ দিবসের মধ্যে

আরোগ্য না হইলে অথবা গাত্র উষ্ণ ও শুষ্ক অনুভব হইলে একোনাইটের ৩টি বটীকা অর্দ্ধ গ্লাস জলে মিশ্রিত করিয়া তাহার এক ড্রাম পরিমাণ দিবসে দুইবার সেবন করাইলে আরোগ্য হইবে।

৫। পেশির কাঠিন্যনতা। শিশুদিগের ইহা একটী অতিশয় গুরুতর রোগ। সচরাচর এ রোগ প্রসবের ১০ দিবসের মধ্যে প্রকাশ হয়, প্রায় অধঃশাখা ও গণ্ডদেশ অগ্রে আক্রান্ত এবং ওখান হইতে ক্রমশ ব্যাপ্ত হইয়া উদর ও বক্ষ আক্রমণ করে, আক্রান্ত অংশের ত্বক সর্ব্বাগ্রে ঈষৎ গোলাপি রঙ্গের অথবা রক্তবর্ণের কিম্বা নীলবর্ণ দৃষ্ট হয়, পীড়া গুরুতর হইলে উহার গতি অতিশয় দ্রুত হয়, শরীরের উত্তাপ শীঘ্র শীঘ্র হ্রাস হয়, নাড়ী এত মৃদু হয় যে অনুভূত হয় না, ক্রমে কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস হইয়া শিশু আর ক্রন্দন করিতে পারে না এবং মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়া শ্বাসাবরোধ হেতু মৃত্যু হয়। সচরাচর তৃতীয় দিবসে এই ঘটনা ঘটে, কখন কখন পীড়া পুরাতন হয় সেস্থলে ৪ হইতে ৮ম দিবসের মধ্যে মৃত্যু সম্ভব। কিন্তু কদাচিৎ অষ্টম দিবস পর্য্যন্ত পৌঁছায়। এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসায় আরোগ্য হইতে কখনই দেখা যায় নাই। হোমিওপ্যাথিক চিকৎসায় এ রোগ ১৮ ক্রমের একোনাইট ব্যবহারে অতি শীঘ্র আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে; ২।৩ মাত্রায় কোন উপকার না দর্শিলে ব্রাইয়োনিয়া ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এই দুইটী ঔষধের ৬টী বটীকা অর্দ্ধ গ্লাস জলে মিশ্রিত করিয়া তাহার এক ড্রাম পরিমাণ তিন চারি ঘণ্টা অন্তর সেবন করান উচিত। কিছুতেই উপকার না হইলে সালফারের তিনটী বটীকা একমাত্রা মধ্যবর্ত্তি ঔষধস্বরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

৬। মস্তকের ত্বকে রক্তসঞ্চার বা মস্তকপেশীর স্ফীততা। কখন কখন সন্তানের মস্তকের এই অবস্থার সহিত প্রসব হয় অথবা প্রসবের অব্যবহিত পরে ঘটে। ইহা অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা প্রসব বা প্রসবকালিন মস্তকে অস্বাভাবিক চাপ লাগায় উৎপন্ন হয়। মস্তকের এ অবস্থা সচরাচর আর্ণিকার লোষণ দ্বারা ধৌত করিলে আরোগ্য হয়। এই লোষণ ১০ ফোঁটা আর্ণিকার অরিষ্ট অর্দ্ধ গ্লাস জলে মিশাইয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহাতে সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইয়া কোন স্থান স্ফীত থাকিলে রাসটক্সের

তিনটি বটীকা সেবন করাইলে আরোগ্য হইবে, মস্তকে ক্ষত প্রকাশ হইলে সিলিসিয়া ঐ প্রকারে ব্যবহার করা আবশ্যক। ক্রমশঃ

চৈত্র } ডাক্তার শ্রীশিখরকুমার বসু এল, এম, এস্
কলিকাতা } হোমিওপ্যাথিক প্রাকৃটীসনার

ঔষধ-প্রস্তুত ও প্রয়োগ-প্রণালী।

(কবিরাজীমতে)

জ্বরাধিকার।

পূর্ব্বপ্রকাশিত লালবটীর শেষ।

ক্রিয়া ও প্রয়োগপ্রণালী। অবসেক ও আচয়ন (১) এই উভয় বিধ স্থলে লালবটী সবিশেষ হিতকর। এজন্য জ্বরাবস্থায় ফুস্ফুস্, যকৃৎ প্রভৃতি আশয়ে বা অন্য কোন দেহভাগে রক্তসঞ্চালনের আধিক্য ঘটিয়া পীড়াদায়ক হইলে কিম্বা রক্তকফাদি আবদ্ধ হইয়া বেদনা জন্মাইলে লালবটী প্রয়োগ করা গিয়া থাকে। শ্লেষ্মাবসেকে বা আচয়নে তুলসীপত্র স্বরসের সহিত ব্যবস্থা করিবে। রক্তকফাদি বদ্ধ হইয়া বেদনা জন্মাইলে মধুর সহিত মাড়িয়া লেহন করিতে দিবে।

লালবটী উৎকৃষ্ট পচননিবারক (১)। এজন্য সান্নিপাতিক জ্বরে স্রোতঃপাকের (২) লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। স্রোতঃ-

---

(১) যকৃৎ, প্লীহা, ফুস্ফুস্ প্রভৃতি আশয়ে কিম্বা শরীরের অন্য কোন স্থলে যদি স্বভাবাতিরিক্তরক্তাদি সঞ্চালিত হয় তাহা হইলে তাহাকে অবসেক Congestion বলা যায়।

"আ" পূর্ব্বক "চি" ধাতুর অর্থ আবদ্ধ হওয়া। দেহের কোন অংশে রক্তাদি আবদ্ধ হইলে তাহাকে আচয়ন Determination বলা যাইতে পারে।

(১) Antiseptic. (২) Solution of tissues.

পাকের প্রারব্ধাবস্থায় বুড়িপানের স্বরসের সহিত, পচনক্রিয়া আরব্ধ হইলে হাতিশুঁড়ার পাতার রসের যোগে ব্যবস্থা করা বিহিত।

সান্নিপাতিক কিম্বা অন্য কোন জ্বরে স্রস্তাঙ্গাবস্থায় (৩) অর্থাৎ রোগী যখন এলাইয়া পড়ে তখন, এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগী চাঙ্গা হইয়া উঠে। লালবটীর ওজস্কারিতা (৪) শক্তিনিবন্ধন তথাবিধ উপকার পাওয়া যায়। দিবসে ৩।৪ বটী প্রয়োগ করা যায়। উপদ্রবাদির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অনুপান কল্পনা করিবে।

লালবটী উরঃসন্ধান কর (৫)। তজ্জন্য জ্বরে কি রক্তপিত্তরোগে ফুস্‌ফুস্‌ হইতে ক্ষতশোণিত, নিষ্ঠীবনের সহিত উঠিতে থাকিলে কিম্বা বমন হইয়া উঠিলে, এই ঔষধের ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে। জ্বরাবস্থায় আলতার রসের সহিত পান করিতে দিবে। রক্তপিত্তে আলতা, পাকা যজ্ঞডুম্বর এবং দুগ্ধ একত্র মর্দ্দন করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহযোগে ব্যবস্থা করিবে।

উদকমেহে লালবটী অড়লের পাতার স্বরসের সহিত ব্যবস্থা করিলে উপকার দর্শে।

ধেতের পীড়ায় এই ঔষধ আমি পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি। নূতন ও পুরাতন ধেতের পীড়ায় প্রয়োগ করা যায়। উভয় স্থলেই ১বটীর সহিত কাবাবচিনি চূর্ণ ৵ আনা, কর্পূর ॥ অর্দ্ধরতি, সারচন্দন ঘসা ২ তোলা এবং মসিনা ভিজান জলের সহিত মাড়িয়া সেবন করিতে দিবে। দুইবেলা ২ বটী প্রয়োগ করিবে।

স্থতিকাতঙ্কে এই ঔষধ অত্যাশ্চর্য্য ফলপ্রদ। ইহার প্রয়োগে জরায়ুতে বলাধান হয়; স্থতরাং জরায়ুতে ক্লেদ সঞ্চয় থাকিলে তাহাকে সহজে নিঃসরণ করিয়া দেয়, এবং ইহা দ্বারা অতিস্রাব সংযমিত হয়। নিম্নলিখিত কষায়ের সহিত ব্যবহার করা যায়;—

ঝিট্‌কী	...	...	২৭ রতি
কুড়কাষ্ঠ	...	...	২৭ রতি
বেতের মূল	...	...	২৭ রতি

(৩) Prostration (৪) Tonicity. (৫) Styptic.

বুঁজের শিকড় ... ... ২৭ রতি
দেবদারু ... ... ২৭ রতি
কুলথকলাই ... ... ২৭ রতি

৩২ তোলা জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহার কিয়দংশের সহিত বটী মাড়িয়া খাইয়া অবশিষ্টাংশ পান করিতে হইবে।

প্রদর রোগে লালবটী মহৌষধ। অশোকফুলের বৃক্ষের ছালের কষায়ের সহিত সেবন করিলে রক্তপ্রদর ও শ্বেতপ্রদর এই উভয় স্থলেই সুফল পাওয়া যায়।

কফকেতু।

শঙ্খভস্ম ১ * শুঁটচূর্ণ ১ পেঁপুলচূর্ণ ১ * মরিচচূর্ণ ১ * সোহাগার খৈ ১ * অমৃত ৫।

শঙ্খভস্ম প্রভৃতি পাঁচখানি দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইতে হইবে; শোধিত অমৃত সর্ব্বতুল্য। আদার রসে অমৃত সিক্ত করিয়া রাখিয়া পেষণ করিয়া লইবে। তার পর একে একে শঙ্খভস্ম প্রভৃতি দ্রব্যগুলি মিশাইয়া উপযুক্ত পরিমাণে আদার স্বরস দিয়া খুব ভাল করিয়া মাড়িবে। পরে রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। এই চূর্ণীভূত ঔষধে আবার আদার স্বরস দিয়া ভাবনা দিবে। এই প্রণালীতে তিন দিনে তিনটী ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া শুষ্ক করতঃ যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিবে।

শঙ্খভস্ম। শঙ্খ নামক সামুদ্র জলচর জন্তু সকলেরই পরিচিত পদার্থ। মৃত শঙ্খের দেহের কঠিন আবরণ মাঙ্গলিক বাদ্যযন্ত্ররূপে হিন্দুর গৃহে গৃহে বিরাজ করে। জীবিত এবং মৃত এই উভয় অবস্থাতেই ইহা শঙ্খ নামে পরিচিত। যে শঙ্খের গাত্র গ্রন্থি শূন্য, বেশ মস্থন, রেখাদি বর্জ্জিত এবং বিশুদ্ধ শ্বেতবর্ণ তাহাই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। শঙ্খ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভস্মাগ্নিতে উত্তমরূপে দগ্ধ করিয়া রাখিয়া দিলে ফুটিয়া চূর্ণ হইয়া যায়। এই চূর্ণ কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া ঔষধার্থে ব্যবহার করা গিয়া থাকে। মুক্তাভস্মের পরিবর্ত্তে শঙ্খভস্ম ব্যবহার করিবার উপদেশ আছে।

ক্রিয়া ও প্রয়োগ প্রণালী। কফকেতু তরুণ সান্নিপাতিক

জ্বরের ঔষধ। কিন্তু সকল সন্নিপাত জ্বরে প্রয়োগ হয় না; যে জ্বরে প্রয়োগ করা বিধেয় তাহার সকল অবস্থায়ও দেওয়া যায় না। সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা, অতিশয় তীব্র জ্বর সন্তাপ, পরিপুষ্ট ধমনী, হৃল্লাস, চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ, উদরের গুরুতা, মস্তকে দারুণ যাতনা এবং রোগীর চেতনার অল্পতা অথবা এককালীন চৈতন্যাভাব; এই সকল লক্ষণ যে সন্নিপাত জ্বরে বিদ্যমান থাকে, তাহার প্রথমাবস্থায় কফকেতু প্রয়োগে বিশেষ ফল দর্শে। প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় এক বটী আদার স্বরসে প্রয়োগ করিবে। শূন্যোদরে এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মৃদু থাকিলে প্রয়োগ নিষিদ্ধ। গাত্রবেদনা সম্বলিত সামান্য জ্বরেও প্রয়োগ হইয়া থাকে।

সচরাচর যাহাকে কাণ-গলাফুলা বলে, নবজ্বরে তদ্রূপ লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে বা কাণ-গলাফুলিয়া জ্বর হইলে কফকেতু প্রয়োগে বেশ সুফল পাওয়া যায়। সেবনার্থে দুই বেলা দুই বটী ব্যবস্থা করিবে। এবং ৫।৭ বটী আদার স্বরসের সহিত মাড়িয়া ফুলার উপর প্রলেপ দিবে।

জহর বাত বা জরবাত নামে প্রসিদ্ধ গলরোগে কফকেতুর তুল্য দ্বিতীয় ঔষধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! আদার স্বরসের সহিত দিবসে ৪।৫ বটী প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এবং উক্তবিধরূপে গলায় প্রলেপের ব্যবস্থা করিবে।

আমবাত সংযুক্ত জ্বরে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। ইহার প্রয়োগে জ্বরের লাঘব হয়; সঙ্গে সঙ্গে আমবাত জন্য ফুলা ও বেদনার উপশম হয়।

দাঁতের গোড়া ফুলিয়া যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে, কফকেতু চর্ব্বণ করিয়া ব্যাধিতস্থলে সংলগ্ন করিয়া দিলে আশু যন্ত্রণার লাঘব হয়। ঔষধ গলাধঃকরণের আবশ্যক নাই; কিছুক্ষণ রাখিয়া লাল ছাড়িয়া দিলে সেই সঙ্গে ঔষধ পড়িয়া যাইবে।

সর্ব্বতো-ভদ্র।

* অভ্র ৪ * গন্ধক ১ হিঙ্গুলোত্থরস ॥০ কর্পূর ॥০ নাগকেশর ॥০ জটামাংসী ॥০ তেজপত্র ॥০ লবঙ্গ ॥০ জয়ত্রী ॥০ জায়ফল ॥০ ছোটএলাচ ॥০ গজপেঁপুল ॥০ কুড়কাষ্ঠ ॥০ তালীশপত্র ॥০ ধাইফুল ॥০ দারুচিনি ॥০ মুথা ॥০ * হরীতকী ॥০ * মরিচ ॥০ * শুঁট ॥০ * বহেড়া ॥০ * পেঁপুল ॥০ * আমলকী ॥০।

জারিতনিশ্চন্দ্র অভ্র ২ কর্ষ অর্থাৎ ৪ তোলা। শোধিত গন্ধক ১ তোলা হিঙ্গুলোত্থরস ॥০ অর্দ্ধ তোলা কর্পূরাদি দ্রব্যগুলি প্রত্যেক ॥০ অর্দ্ধ তোলা।

প্রথমতঃ ॥০ তোলা হিঙ্গুলোত্থরসে ॥০ অর্দ্ধ তোলা গন্ধকের সহিত মিশাইয়া মাড়িয়া মাড়িয়া কজ্জলী করিবে; তারপর আরও ॥০ অর্দ্ধ তোলা গন্ধক তাহার সহিত মিশাইয়া মাড়িয়া লইবে। কজ্জলী সুসিদ্ধ হইলে অভ্র দিবে; তার পর কর্পূর মিশাইয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া মাড়িবে। তদনন্তর নাগকেশর প্রভৃতি দ্রব্যগুলির শ্লক্ষ্ণচূর্ণ প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় পর পর মিশাইয়া লইবে। সমস্ত দ্রব্যগুলি মিশান হইলে, কিছুক্ষণ ধরিয়া মাড়িতে হইবে। তার পর পরিষ্কার জল দিয়া মাড়িবে। ভাল করিয়া মাড়া হইলে, ২ রতি প্রমাণ বটী বাঁধিবে।

হিঙ্গুলোত্থরস। রাসায়নিকপ্রক্রিয়া বিশেষে পারা এবং গন্ধক-যোগে হিঙ্গুল প্রস্তুত হয়। আবার প্রক্রিয়া বিশেষে হিঙ্গুল হইতে রস অর্থাৎ পারা বিযুক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কারখানার হিঙ্গুল প্রস্তুতার্থে আকরিক পারা ব্যবহার করে। আকরিক পারা বিশুদ্ধ নহে। তাতে রাং সীসা প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য মিশ্রিত থাকে। এরূপ অবিশুদ্ধ পারা লইয়া হিঙ্গুল প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া হিঙ্গুল হইতে রস আকর্ষণ করা হয়, তাতে বিশুদ্ধ পারাই পাওয়া যায়। পারায় অন্য আর যাহা কিছু মিশ্রিত থাকুন না কেন, গন্ধকের সহিত ভস্মীভূত হইয়া পৃথক্ হইয়া পড়ে; রূঢ় পারদধাতু বিযুক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া হিঙ্গুল হইতে রস আকর্ষণ করা হয়, তাহার প্রণালী এইরূপ;—

হিঙ্গুল উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। সেই চূর্ণীকৃত হিঙ্গুল গোঁড়া নেবুর রসের সহিত বা পালিশা মাদারের পাতার রস দিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া মাড়িয়া মাড়িয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণ একটা প্রশস্ত পানের উপর রাখিয়া একটী নূতন সুদৃঢ় হাঁড়ীর ভিতর রাখিয়া দিবে; আর একটী নূতন হাঁড়ী অধোমুখে (উবুড় করিয়া) সেই হাঁড়ীর উপর স্থাপন করিতে হইবে। হাঁড়ী দুটী এরূপ হওয়া চাই যে, একটীর উপর আর একটী উবুড় করিয়া দিলে, উভয়ের মুখে মুখে বেশ মিলিয়া

যায়। এখন স্থালীদ্বয়ের সন্ধি স্থানে লেপ দিবে। ভাল আঁটাল মাটী চূর্ণ করিয়া, কিঞ্চিৎ পাট কুটি কুটি করিয়া কাটিয়া তাহার সঙ্গে ভাঁজাইয়া দিবে; শেষে জল দিয়া ছানিয়া মোমের ন্যায় হইলে যেস্থানে হাঁড়ীদ্বয়ের কাণায় কাণায় মিলিয়াছে, তথায় লেপ দিয়া লেপের উপর একখানি নেকৃড়া দিয়া আবার মাটী দিয়া লেপিয়া দিবে। তার পর রৌদ্রে রাখিয়া লেপ শুকাইয়া লইতে হইবে। এই সকল কাজ সমাধা করিবার সময় সাবধান হইতে হইবে, যেন নীচের হাঁড়ীর হিঙ্গুল ছঁড়াইয়া না যায়।

এইরূপে প্রস্তুতকৃত যন্ত্রের নাম ডমরু যন্ত্র। ডমরু যন্ত্র চুল্লীতে চড়াইয়া তীব্র জ্বাল দিতে থাকিবে। যন্ত্রের উর্দ্ধদেশে ৮।১০ অঙ্গুল দীর্ঘ প্রস্থ এক খণ্ড নেকৃড়া ভিজাইয়া পটী করিয়া দিতে হইবে; জ্বাল দিতে নেকৃড়া যেমন শুখাইয়া যাইবে, অমনি জল দিয়া আবার ভিজাইয়া দিবে। জল এমত পরিমাণে দিতে হইবে, যেন নেকৃড়া ভিজিয়া গড়াইয়া না পড়ে।

প্রয়োজন অনুসারে হিঙ্গুল ৪ তোলা, ৮ তোলা বা তন্ন্যূনাধিক মাত্রায় লইয়া যন্ত্র বদ্ধ করা যাইতে পারে। পারা ৮ তোলা লইলে, তিন প্রহর জ্বাল দিতে হয়, ৪ তোলা লইলে ১৷৷০ প্রহর; এই হিসাবে হিঙ্গুলের পরিমাণ ধরিয়া জ্বাল দিবার কাল নিরূপণ করিবে। নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত জ্বাল দিয়া উপরের পটীখানা তুলিয়া ফেলিয়া চুল্লীর উপর রাখিয়া দিবে। যখন চুল্লীর অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যন্ত্রটী সুশীতল হইবে তখন নামাইয়া লইবে।

এখন স্থালীদ্বয়ের সন্ধিস্থানের লেপ আস্তে আস্তে ফেলাইয়া দিয়া উপরের হাঁড়ীটী লইয়া উহার তলদেশে ভস্মের ন্যায় যে দ্রব্য সঞ্চিত হইয়াছে দেখিতে পাইবে, তাহা আঁচড়াইয়া পৃথক্ করিয়া লইতে হইবে। এই সঞ্চিত ভস্ম যদি সাদা পাংশুর ন্যায় হইয়া থাকে, তাহা হইলে জানিবে যে পাককার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে; আর যদি ভূষা কালীর ন্যায় হইয়া থাকে তাহা হইলে বুঝিবে যে, নিয়মিতভাবে নিয়মিত সময় পর্য্যন্ত জ্বাল দেওয়া হয় নাই। ভস্ম প্রথমোক্ত প্রকারের হইলে তাহা হইতে যে পরিমাণ পারা সংগৃহীত হইবে, শেষোক্ত প্রকার ভস্ম হইতে কদাচ তত পরিমাণ পারা পাওয়া যাইবে না; পারা কালীর মধ্যেই রহিয়া যাইবে। ভস্ম হইতে পারা সহজেই বিযুক্ত করিয়া লওয়া যায়। একখান পুরু শক্ত নেকৃড়ায় ভস্ম

রাখিয়া পোট্টলির ন্যায় করত অঙ্গুলি দ্বারা চাপ দিতে দিতে বিন্দু বিন্দু পারা বাহির হইয়া পড়িবে। সেইগুলি একত্র করিয়া পুনরপি কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। ক্রমশঃ—

মাগুরা, বারুইপাড়া। } শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন।

তৈলপাক ও প্রয়োগ-প্রণালী।

মূৰ্চ্ছাপাক।

কটাপাকের পরেই মূৰ্চ্ছাপাক। তৈলের কটাপাক সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে মূৰ্চ্ছাপাককালে কেবল মূৰ্চ্ছাপাক বলিয়া কেন, এক শেষপাক ভিন্ন কল্কাদি যে কোন পাকের সময়ে বল, আর কোনই আশঙ্কা থাকে না। যাহা হউক, ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কটাপাকের পর তৈল শীতল হইলে তখন তাহাতে মঞ্জিষ্ঠাদি দ্রব্য প্রদান করিয়া মূৰ্চ্ছাপাক দিবে, অতএব এস্থলে সেই মূৰ্চ্ছাপাকের বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। আবার মূৰ্চ্ছাপাকের পূর্ব্বে একথা বলা আবশ্যক যে, তৈল বা ঘৃতের মূৰ্চ্ছা, কল্ক অথবা ক্বাথপাকসম্বন্ধে বৈদ্যশাস্ত্রে এমন কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ আছে, যাহাদের বিষয় অগ্রে উল্লেখ না করিয়া তৈলপাকসম্বন্ধে অন্য কোন কথারই উল্লেখ করা বিধেয় নহে। কিন্তু পরিভাষাসম্বন্ধীয় আমূলবৃত্তান্ত এস্থলে উল্লেখ করিতে হইলে প্রবন্ধটী অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ স্থানাভাব, সুতরাং আমরা এস্থলে বিস্তৃত ব্যাখ্যা না করিয়া পারিভাষিক শব্দের মধ্যে যে গুলি না জানিলেই নহে, স্থানবিশেষে কেবল তাহাদেরই উল্লেখ করিব। তন্মধ্যে অগ্রে মূৰ্চ্ছাপাকের বিষয় বলিতেছি।

তিলতৈল বা সার্ষপ তৈলাদির যে কোন তৈলের মূৰ্চ্ছাপাক সময়ে মঞ্জিষ্ঠা ও হরিদ্রা প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য দেওয়া হয়, তাহাকেই মূৰ্চ্ছাদ্রব্য বলে। এই মূৰ্চ্ছাদ্রব্য গ্রহণের সাধারণ নিয়ম এই যে, তৈলের পরিমাণ যত, মঞ্জিষ্ঠার পরিমাণ তাহার ষোড়শাংশ অর্থাৎ ষোলভাগের একভাগ,

আর হরিদ্রাদি অন্যান্য দ্রব্যের প্রত্যেকের পরিমাণ মঞ্জিষ্ঠার চতুর্থাংশ। বিষয়টী আরও একটু পরিস্কাররূপে বলা যাউক, মনে কর তৈলের ভাগ যদি যোলশের লওয়া হয়, তবে মঞ্জিষ্ঠার পরিমাণ একশের লইতে হইবেক। আর হরিদ্রা ও লোধ প্রভৃতি দ্রব্যের পরিমাণ মঞ্জিষ্ঠার চতুর্থাংশ অর্থাৎ একপুয়া মাত্রায় লওয়া উচিত। আর এস্থলে ইহাও জানা আবশ্যক যে, মঞ্জিষ্ঠাদি মূর্চ্ছাদ্রব্যদ্বারা তৈলপাককালে মঞ্জিষ্ঠাদি মূর্চ্ছাদ্রব্য এবং তৈলের চতুর্গুণ জল দিয়া মূর্চ্ছাপাক করিতে হইবে। এবং কিছু জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রাখিয়া দিবে। নিম্নে তিলাদি তৈলের পৃথক্ পৃথক্ মূর্চ্ছাপাক বলা যাইতেছে।

তিলতৈলমূর্চ্ছা।

যোলশের তিলতৈলে মূর্চ্ছাপাক দিতে হইলে পূর্ব্বদিবস উৎকৃষ্ট অরুণাভ মঞ্জিষ্ঠা একশের এবং লোধ, মুথা, নালুকা, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, কেয়ারমূল ও বালা এই কয়খানি দ্রব্য প্রত্যেকে /।০ একপুয়া ওজনে লইয়া একত্রে আবশ্যকমত জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিবস প্রাতে ঐ সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া প্রথমে তৈলে কটাপাক দিয়া (কটাপাক পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) তৈল কিছু শীতল হইয়া আসিলে অগ্রে তাহাতে পেষিত হরিদ্রা জলে গুলিয়া অথবা কাঁচা হরিদ্রা বাটীয়া অল্পে অল্পে উক্ত তৈলে প্রদান করিবে, কিন্তু এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, তৈলের অধিক উষ্ণাবস্থায় উক্ত হরিদ্রা প্রক্ষেপ দিলে তৈল হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিতে পারে, এজন্য তৈলটী অপেক্ষাকৃত শীতল হওয়া চাই। যাহা হউক, হরিদ্রা দেওয়ার পরেই পূর্ব্বোক্ত জলে ভিজান ও কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা এবং লোধ প্রভৃতি মূর্চ্ছাদ্রব্য এবং উক্ত যোলশের তৈলের চারিগুণ অর্থাৎ চৌষট্টিশের জল উক্ত তৈলে প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার জ্বাল দিতে আরম্ভ করিবে। জ্বাল দিতে দিতে যখন কিঞ্চিৎ জল অবশিষ্ট থাকিবে, তখন তৈল নামাইয়া কিছু দিবস তদবস্থায় রাখিয়া দিবে। অন্ততঃ ১৫ দিবসের কম না হয় এবং একমাসের অধিক না হয় এই অবস্থায় রাখা উচিত। এই মূর্চ্ছাপাকদ্বারা তৈলের দুর্গন্ধ নিবারণ হইয়া উহা উত্তম সুগন্ধিযুক্ত ও অরুণবর্ণ হইয়া থাকে।

কটুতৈলমূর্চ্ছা।

কটু অর্থাৎ সার্ষপ তৈলের মূর্চ্ছাপাকপ্রণালী ও মূর্চ্ছাদ্রব্যের পরিমাণ

ঠিক্ পূর্ব্ববৎ তিলতৈলের ন্যায়ই জানিবে। তবে মূর্চ্ছাদ্রব্যের কিছু পার্থক্য আছে। অর্থাৎ ষোলশের সার্ষপতৈলে পূর্ব্ববৎ মঞ্জিষ্ঠা একশের এবং আমলকী, হরিদ্রা, মুথা, বেলছাল, দাড়িমছাল, নাগেশ্বর, কৃষ্ণজীরা, বালা, নালুকা ও বহেড়া প্রত্যেক দ্রব্য একপুয়ার হিসাবে লইতে হইবেক এবং পূর্ব্ববৎ তিলতৈলের ন্যায় পাঁক করিয়া কিছু দিবস রাখিয়া দিবে।

এরণ্ডতৈলমূর্চ্ছা।

এই তৈলের মূর্চ্ছাপাকসম্বন্ধেও নূতন কিছুই বলিবার নাই, কেন না তিলতৈল ও সার্ষপতৈলের মূর্চ্ছাপাকসম্বন্ধে যে সমস্ত নিয়মের অধীন হইতে হয়, ইহাতে সেই সেই নিয়ম অবলম্বন করা আবশ্যক। তবে মূর্চ্ছাদ্রব্যগত এক হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্যের সহিত অবশ্য কতকটা পার্থক্য আছে। অর্থাৎ এরণ্ডতৈলের মূর্চ্ছাদ্রব্যের জন্য পূর্ব্ববৎ হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা এবং মুথা; ধনে, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, জয়ন্তীপত্র, বালা, বনখেজুর, বটের ঝুরী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নালুকা, কেয়ারমূল, দধি ও কাঁজী, এই সমস্ত দ্রব্যের পরিমাণ পূর্ব্ববৎ লইয়া তদ্দ্বারা মূর্চ্ছাপাক সমাধা করিবেক।

ক্রমশঃ—

চৈত্র
কলিকাতা } শ্রীজগদ্বন্ধু সেনগুপ্ত

(উদ্ধৃত)

প্রাচীনভারতের স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী।

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ স্বাস্থ্যরক্ষার যে সকল নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করিয়া জগতের সেই আদিম সময়েও জনসমাজের মহদুপকার সাধন করিয়াছিলেন, আজি কালিকার পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত নূতন সভ্যতাভিমানী আমরা কি সে সকল নিয়ম অনুসরণ করিলে উপকৃত হইতে পারি না? যদি দীর্ঘজীবনই স্বাস্থ্যবিধান শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা এই শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, কেন না অনেকেই স্বীকার করিবেন যে, মোটের

উপর এখন অপেক্ষা প্রাচীনকালের লোক দীর্ঘজীবী ছিলেন। অতএব তাঁহারা কিরূপ নিয়ম অনুসরণ করিতেন এবং আমাদিগের প্রতি কিরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা পর্য্যালোচনা করা অকিঞ্চিৎকর বিষয় নহে। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি এখন যেরূপ ইদানীন্তন পণ্ডিতগণ বর্ণনা করেন, তখন সেইরূপ ছিল কি না তাহাও আলোচনা করা উচিত ; কেন না তুলনা ভিন্ন উৎকৃষ্টাপকৃষ্টের বিভেদ করা যায় না। সুতরাং একে একে সেই গুলি আলোচনা করা যাউক।

দৈনিককার্য্য।

১। প্রাতরুত্থান।

যে সকল জাতি বলবীর্য্যের নিমিত্ত বিখ্যাত, তাহারা সকলেই প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করে। পণ্ডিতবর টড লিখিয়াছেন যে, ফ্রান্স্ যখন উন্নতির চরম সীমা লাভ করিয়া ছিল, তখন রাত্রি চারি ঘটিকার সময় পারিস নগরের অধিকাংশ দোকান খোলা হইত এবং রাজপথ জনস্রোতে পরিপূর্ণ হইত। সভ্য দেশমাত্রেই এই সময়ে উঠিবার নিয়ম। ভারতবর্ষেও আর্য্যগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া ধর্ম্ম ও অর্থ চিন্তা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন এবং ঈশ্বরচিন্তা করিতে বলিয়াছেন। ঈশ্বরচিন্তা করিবার আর ইহা অপেক্ষা উত্তম সময় কোথায়? জগতের যে ভয়ানক কোলাহলে আমরা অহর্নিশি নিমগ্ন হইয়া থাকি, এখনও সে কোলাহল আরম্ভ হয় নাই, এখনও অর্থচিন্তা, যশলালসা, চতুরতার জাল আচ্ছন্ন করিবার সময় আইসে নাই। মনুষ্যের সহিত সহবাস করিয়া মন যে সাংসারিক তরঙ্গে গত কল্য আন্দোলিত হইয়াছিল, রাত্রির গভীর সুষুপ্তির সঙ্গে সে আন্দোলন অনেক পরিমাণে কমিয়াছে। এখন জগতের চতুর্দ্দিক শান্ত ও সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে এবং বিহঙ্গগণের কূজনধ্বনি সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা প্রচার করিতেছে। দেখ, গত রাত্রিতে যখন অন্ধকার হইয়াছিল, তখন বোধ হইয়াছিল যে সমস্ত জগৎ গাঢ়তর তমসাচ্ছন্ন হইয়া বিশ্বকাণ্ডকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে, কিন্তু কি দয়া!—কয়েক ঘণ্টা না যাইতেই তিনি তাঁহার সূর্য্যকে নূতন বেশে বিভূষিত করিয়া জগৎকে আবার একবার আলোকিত, আর একবার আশ্বস্ত করিতে পাঠাইলেন, আর একবার বলিয়া পাঠাইলেন, মানব! তুমি এখনও মর নাই, এখনও সৎপথে আইস, জীবন সংশোধন

কর? গত কল্য শরীর এত ক্লান্ত হইয়াছিল যে, রাত্রিতে কোন কার্য্যই করিতে পারি নাই, চক্ষু ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, জগতের কিছুই ভাল লাগে নাই, মৃত্যুর সহোদরা নিদ্রা আসিয়া আক্রমণ করিয়াছিল, জগৎ ভুলিয়া গিয়াছিলাম, বন্ধু বান্ধব ভুলিয়াছিলাম, ঈশ্বরকেও ভুলিয়াছিলাম। যদি তিনি না জাগাইতেন, তবে তেমনই থাকিয়া যাইতাম। অতএব এখন জীবিত হইয়া উঠিয়া স্থির মনে যদি তাঁহাকে না ভাবিব? তবে আর কখন চিন্তা করিব? অতএব প্রত্যূষ সময়ই ঈশ্বরচিন্তার সময়। সেই জন্যই বলিয়াছেন, "ধ্যায়েত্তু মনসেশ্বরং *।"

কিন্তু "অর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ" এ কথা কেন বা হইল? অন্য সময়ে কি অর্থ চিন্তা হয় না? সমস্ত দিন পড়িয়া রহিয়াছে, তখন অর্থের চেষ্টা করিলে কি হইবে না? প্রাতঃকালে কেন একটু ঘুমাই না?

না না তাহা হইলে চলিবে না, তাহা করিলে অর্থ উপার্জ্জন হইবে না। বাঙ্গালীরা যে এত দরিদ্র তাহার কারণ এই যে, ইহাঁরা সময়ের ব্যবহার শিখেন নাই। যে মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ইউরোপ ও মার্কিন্ ধন মানে আজি জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছেন, সময়ের যে সুব্যবহার বশতঃ তাহাদিগের জাতি সাধারণ, সমাজ সাধারণ, জন সাধারণ দেখিতে দেখিতে পাঁচ সাত বৎসরের ভিতর মুষ্টি ভিক্ষার অবস্থা হইতে সম্রাট্পদবাচ্য হইতেছে, যে মূলমন্ত্র বুঝিয়া সমগ্র পাশ্চাত্য জাতি সর্ব্বদা বলিয়া থাকে যে, সময়ই অর্থ, সময়ই মূল্যবান, সময়ের মূল্য যে না বুঝিয়াছে, সে যতই কেন সভ্য হউক না, সে মনুষ্য নহে। সময়ের মন্ত্র কি আজি ভারতবর্ষ জপ করিতেছে? নানা করে না, সেই জন্যই ভারত এত দরিদ্র। আমাদের বিবেচনায় আর্য্যঋষিগণ সময়ের মূল্য বুঝিতেন। তাঁহারা জানিতেন যে, অর্থলালসা যেমনই অসার তেমনই ক্লেশপ্রদ। অটল অধ্যবসায়, নিরঙ্কুশ সাহস, নিরন্তর চেষ্টা না করিলে, নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতার বন্ধন ছেদ না করিলে ধন মান লাভ হয় না, প্রাতঃসূর্য্যের কিরণজাল যাহার প্রকোষ্ঠমধ্যে নিদ্রাতুর নেত্রে পতিত হয়, তাহার ধনলাভ করা অসম্ভব, সেই জন্যই তাঁহারা প্রত্যূষে উঠিয়া ধনাগমের উপায়

---

* ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় ধর্ম্মমর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। কায়ক্লেশসমুদ্ভূতং ধ্যায়েত্তু মনসেশ্বরং। কূর্ম্মপুরাণ। ১৭ অধ্যায়।

চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন, সেই জন্য ইউরোপ ও মার্কিন্‌বাসী কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিগণ প্রত্যুষে উঠিয়া সমস্ত দিবসের কার্য্যের হিসাব করিয়া লয়েন, সেই জন্যই ইংরাজি প্রবচন বলে যে, প্রত্যুষে উঠিলে বলী, ধনী ও জ্ঞানী হওয়া যায়। যাঁহারা ধনোপার্জ্জন করিতে পারেন না, তাঁহারা অর্থের অসঙ্গতিবশতঃ বিধাতাকে নিন্দা করেন, তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন যে, এ পৃথিবীতে ধনমানাদি লাভ করিবার ইচ্ছা বা সামান্য চেষ্টা করিলে সামান্য ফলই হইবে, তাহা তো মনুষ্য মাত্রেরই হইয়া থাকে। তবে যদি তুমি যশের উচ্চমঞ্চে আরোহণ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাক এবং লক্ষ্মীর বরপুত্র হইতে চাও, তাহা হইলে তদুপযুক্ত উদ্যম আবশ্যক। যাহাকে পাশ্চাত্যবাসী "উদ্যমের জ্বর" বলে, তাহা হওয়া আবশ্যক। জ্বর হইলে যেমন সমস্ত শরীর চঞ্চল ও আবেগপরিপূর্ণ হয়, রক্তস্রোত বেগে বহিতে থাকে, সেইরূপ উৎসাহ, উদ্যম ও অধ্যবসায়ের অহর্নিশি যাহার মনকে মত্ত রাখে এবং কার্য্যকে পরিচালিত করে, সেই কেবল এ জগতে অর্থ, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়।

যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিবেন, তাঁহাদের পক্ষেও এই নিয়ম। মহাত্মা মনু বলিয়াছেন ঃ—

নৈনং গ্রামেঽভিনিম্লোচেৎ সূর্য্যোনাভ্যুদিয়াৎ ক্বচিৎ।

মনুসংহিতা। ২১৯।

তিনি যে গ্রামে থাকুন, সূর্য্য তাঁহাকে নিদ্রাগত দেখিয়া অস্ত যাইবেন না, অথবা উদিত হইয়া তাঁহাকে নিদ্রাগত দেখিবেন না।

প্রাতঃকৃত্য।

প্রভাতে উঠিয়া মুখ প্রক্ষালন, দন্তধাবন ও জিহ্বা মর্দ্দন প্রভৃতি কার্য্য সকল দেশের লোকেই করিয়া থাকে। ইংরাজের অনুকরণে এতদ্দেশীয় উন্নতিশীল ব্যক্তিগণ কেহ কেহ টুথব্রশ্‌ সাবান প্রভৃতি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন *। টুথব্রশের প্রধান দোষ এই যে, ইহা দ্বারা দন্তধাবন

---

* এস্থলে বলা উচিত যে ইংলণ্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশগুলির দারুণ শীতবশতঃ অধিকাংশ লোকেই প্রাতঃকালে উঠিয়া মুখ ধোয় না। সাধারণতঃ স্পঞ্জ বা ব্রুশ্‌দ্বারা মুখের উপরিভাগ ধৌত করাই সে সকল দেশের অধিকাংশ লোকেরই অভ্যাস। কেবল যাঁহার

করার পর যদি ব্রশ্ ভালরূপ পরিষ্কার করা না হয়, তাহা হইলে দন্তমল লাগিয়া উহাকে অতিশয় দুর্গন্ধময় করিয়া তুলে, সুতরাং হয়, উহাকে উত্তমরূপ পরিষ্কার করা নতুবা নিত্য নূতন ব্রশ্ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ সাবান কিম্বা তদনুরূপ অন্য কোন পদার্থ দ্বারা ব্রশের কুচিগুলি কোমল না করিলে দন্তমাড়িতে বিলক্ষণ আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা। তৃতীয়তঃ যাহারা চিরদিন জন্তু বিশেষকে ভয়ানক ঘৃণা করিয়া আসিতেছেন, সেই জন্তুর কেশ নিজ মুখমধ্যে দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে অতিশয় ক্লেশের কথা বটে। সাবানদ্বারা দন্তের মল পরিষ্কৃত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতেও সমস্ত দুর্গন্ধ নষ্ট হয় না। ইহা অপেক্ষা তৈল দ্বারা মর্দ্দন করা অধিক উপকারী। আমাদের দন্তের পার্শ্বে খাদ্যদ্রব্যের যে সকল কণা লাগিয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই উদ্ভিদ্‌প্রধান, সুতরাং সোদা, পোতাস চূর্ণক প্রভৃতি পরিপূর্ণ। সোদা, পোতাস প্রভৃতির সহিত তৈল সংযুক্ত হইলে সাবানের ন্যায় এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়, এবং দন্তমল অনায়াসে উঠিয়া যায়। এই জন্য তৈল দ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিলে এক প্রকার শ্বেত পদার্থ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যদি সাবান হইলেই দন্তমল উঠিয়া যায়, তবে সাবান দিয়া দন্ত ঘর্ষণ নাকর কেন? কিন্তু সাবান ব্যবহার করা উদ্দেশ্য নহে এমন কোন পদার্থ ব্যবহার করিতে হইবে, যাহা দন্তমলের সহিত সংযুক্ত হইলে সাবান হইয়া যায়, সে পদার্থ তৈল ভিন্ন আর কিছুই নহে। তৈলের দ্বিতীয় গুণ এই যে, ইহা দুর্গন্ধাপহারক, সুতরাং তৈল দ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিলে মুখের দুর্গন্ধ সম্যক্‌রূপে বিনষ্ট হয়। তৈলের সঙ্গে লবণ মিশ্রিত করিয়া দন্তঘর্ষণ ও মুখপ্রক্ষালন করিলে মুখের ক্লেদ ও গন্ধ যায়, মুখ হইতে প্রচুর পরিমাণে লালা নির্গত হইয়া মুখগহ্বর পরিষ্কার হয় এবং দন্তমূলের রস নির্গত হইয়া যাওয়াতে মাড়ি দৃঢ় হয়।

কয়লার গুঁড়া দ্বারা দাঁত মাজিলে দাঁত পরিস্কার ও গন্ধহীন হয় বটে, কিন্তু দন্তের উপরকার আবরণ (Crusta petrosa) শীঘ্র শীঘ্র নষ্ট হইয়া

উচ্চশ্রেণীস্থ লোক, তাঁহারা সভ্যতার খাতিরে মুখের অভ্যন্তর ভাগ পরিষ্কার করিতে বাধ্য হন। এ দেশে আসিয়া ভদ্র ইংরাজমাত্রেই মুখ ধোন, ইতর লোকেও অনেকে ধোয়, কিন্তু আমাদের দেশের ছোটলোকের দাঁতগুলি দাঁতনদ্বারা যেমন ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার থাকে, তাহাদের তেমন কখনই হয় না।

যায়। অন্যান্য প্রকার দন্ত শোধন চূর্ণের এইরূপ নানা দোষ আছে। ইহাদের মধ্যে মিশি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু মিশিতে যেরূপ লৌহের আধিক্য, তাহাতে দন্ত অতিশয় কৃষ্ণবর্ণাক্ত হইয়া উঠে।

দন্তধাবন বা দাঁতন সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ উপায়। ইহা প্রায় সকল স্থানেই পাওয়া যায় এবং কদাচিৎ মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। দাঁতন কাষ্ঠ নিত্য নূতন হওয়াতে ব্রশের ন্যায় ইহাতে কোন আপত্তি নাই, বিশেষতঃ যদি প্রথমে উত্তমরূপ চর্ব্বণ করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে ব্রশের ন্যায় কোমল হইয়া উঠে। এই নির্দোষ ও উৎকৃষ্ট উপায় কত দিনে ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছে বলা যায় না, কিন্তু এক্ষণে ইহার ব্যবহার প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষেই দেখা যায়। কিন্তু দাঁতন ব্যবহার করিতে জানা উচিত। যদি দাঁতন করিতে মাড়ি ঘসিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্র মাঢ়ি নষ্ট হইয়া যায় ও অকালে দন্ত পড়িয়া যাওয়াতে অকালবৃদ্ধ হইয়া বসিতে হয়। রাজবল্লভ ইহা জানিয়াই পরামর্শ দিয়াছেন ঃ—

"ভক্ষয়েদ্দন্তকাষ্ঠকং দন্তমাংসান্যবাধয়ন্।"

দেখিও যেন দাঁতন করিতে গিয়া মাঢ়ি নষ্ট করিও না। কিন্তু এ কথাটি এত অল্প লোকে বুঝে যে, অনেকেই দাঁতন লইয়া জোরে পার্শ্বা-পার্শ্বি ঘসিয়া দন্ত পরিষ্কার হউক না হউক মাঢ়ি নষ্ট করে, সুতরাং দাঁতন করিবার সময় রক্তপাত হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে দাঁত পড়িয়া যায়। সেই জন্য রাজবল্লভ পরামর্শ দিয়াছেন যে,—

"দন্তানূর্দ্ধমধ্যো ঘৃষ্ট্বা জলসিঞ্চেচ্চ লোচনে॥"

দন্তকে ঊর্দ্ধ ও অধোদিকে ঘর্ষণ করিবে, পার্শ্বাপার্শ্বি ঘসিলে কোন উপ-কার নাই বরং অপকার। তিনি বোধ হয় অনেক মূর্খকে পার্শ্বাপার্শ্বি ঘসিতে দেখিয়া এ কথা বলিয়াছেন, নতুবা এত সামান্য কথা কে শিখাইয়া দেয়? কিন্তু দন্তমাংসের উপকারী দাঁতন প্রাপ্ত হইবার কি কোন উপায় নাই? হাঁ আছে,—

করবীররসালশ্চ করঞ্জবকুলাসনান্।
দন্তকাষ্ঠার্থমন্যে তু সর্ব্বাগুরূন্ কণ্টকিতান্॥ *

---

* গুবাকতালহিন্তাল খর্জ্জুরৈঃ কেতকীচ্যুতৈর।
নারিকেলেন তাড্যা চ ন কুর্য্যাদ্দন্তধাবনং॥

যাহারা উদ্ভিদ্ বিদ্যা (বা বটানি) জানেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, করবীর, আম্র, করঞ্জ, বকুল এবং কণ্টকিত উদ্ভিদ যথা—বেল, অপমার্গ প্রভৃতির রসে সঙ্কোচক গুণ আছে, অতএব দাঁতনের পক্ষে এইগুলিই প্রশস্ত। এই সামান্য বিষয়ে এত শাস্ত্রের জ্ঞান ও এত ভূয়োদর্শন সেই প্রাচীন সময়ে পৃথিবীর অন্য কোন জাতির ছিল কি না, জানি না, কিন্তু ইহা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের মহাপ্রভার পরিচায়ক ও আমাদিগের বর্ত্তমান প্রথার পরিপোষক।

জিহ্বামার্জ্জনঃ—

জিহ্বানির্লেখনং রৌপ্যং সৌবর্ণতাম্রমায়সং।
তন্মলাপহরং শস্তং মৃদু স্নিগ্ধং দশাঙ্গুলং।
নিহন্তি বক্তৃবৈরস্যং জিহ্বাদন্তাশ্রিতং মলং॥

তাহার পর নিশিজল পান সম্বন্ধে বলা হইয়াছেঃ—

প্রাতর্ভুক্ত্বা চ পানীয়ং কষায়কটুতিক্তকং।
ভক্ষয়েদ্দন্তকাষ্ঠকং দন্তমাংসান্যবাধয়ন্॥

"A glass of cold water taken early in the morning is to some persons a purgative. The cankery taste, hot sensation in the mouth, slack of appetite for break fast experienced by many persons on water is removed by drinking half a tumbler of pure cold water half an hour before break fast." *Dr. Ringer.*

শ্রীযদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বিএ, এম্, বি,।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

চিকিৎসাসম্মিলনীর সৃষ্টি হইতে এপর্য্যন্ত প্রায় প্রতিসংখ্যাতেই আমরা আমাদের দেশীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় উপদেশগুলির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া আসিতেছি। কিন্তু আজ্ নিতান্তই আহ্লাদের বিষয় এই যে,

---

এগুলিতে দাঁতন করিলে মাঢ়ি নষ্ট হইতে পারে। পাছে তুমি না শুন, তবে এই ভয়ে ক্রিয়া-কৌমুদী বলিয়াছেন ইহা দ্বারা দাঁতন করিয়া "তাবদ্ভবতি চণ্ডালো যাবদ্ গাং নৈব পশ্যতি।" গো দর্শন পর্য্যন্ত চণ্ডাল থাকে।

উপরোক্ত প্রবন্ধ লেখক যদুবাবু একজন খাঁটী এবং সুবিজ্ঞ এলোপ্যাথি ডাক্তার হইয়াও যে তিনি শতমুখে আমাদের সেই সেকেলে পুরাতন স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের সম্বন্ধে বাহবা দিয়াছেন, ইহা যথার্থই অপরিসীম আনন্দের কথা। আমরা আশা করি, ডাক্তার সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা দেশীয় স্বাস্থ্যপ্রণালীকে নিতান্ত তুচ্ছ বা ঘৃণা করিয়া থাকেন, যদুবাবুর প্রবন্ধ পাঠে তাঁহাদের সে ভ্রম ঘুচিবে। চি, স, স,

---

শোথ ও উদরী।

শোথ বা উদরী ইহারা স্বয়ং কোন পীড়া নহে। অন্যান্য পীড়ার লক্ষণ বা উপলক্ষ মাত্র। রক্তবহা শিরাসকল হইতে রক্তের জলীয়পদার্থ বহিষ্করণ হইয়া, ত্বকের নিম্নস্থ উপাদানে মস্তিস্ক, বক্ষ ও উদরগহ্বর মধ্যে উহাদিগের সঞ্চার হইয়া থাকে। এই কারণেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানের শোথের ভিন্ন ভিন্ন নাম উল্লেখ করা হয়। যেমন সার্ব্বাঙ্গিক ত্বকের নিম্নের শোথকে অ্যানাসারকা বা শোথ কহে, কিন্তু প্লুরাগহ্বর মধ্যের শোথকে হাইড্রাথোরাক্স, পেরিকার্ডিয়ামের গহ্বরমধ্যের শোথকে হাইড্রপেরিকারডিয়াম, নিম্ন উদরগহ্বর মধ্যের শোথ হইলে য্যাসাইটীস বা উদরী কহিয়া থাকে। শোথ, কখন কখন অল্পস্থান লইয়া আবার কখন কখন সার্ব্বাঙ্গীনরূপেও বিস্তৃত হইয়া থাকে।

শোথ অনেকপ্রকার কারণে জন্মিতে দেখা যায়, তন্মধ্যে মোটামুটি ধরিতে গেলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে কোন প্রকারেই হউক, শরীরস্থ শিরা সকল প্রসারিত হইয়াই শোথ জন্মিয়া থাকে। কারণ নিম্নস্থ শিরা বা প্রশিরা সকল হইতে উপযুক্ত পরিমাণে রক্তসঞ্চালন ও গমনাগমন করিতে না পারায় শিরা প্রসারিত হইয়া সদা সর্ব্বদা শোথ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়ায় রক্তচালনার ব্যাঘাত হইয়া, মূত্রপিণ্ডের পীড়ায় রক্তের জলীয়পদার্থ ও ইউরিক এসিড উপযুক্ত পরিমাণে নিঃসৃত না হওয়ায়, যকৃতের পীড়ায় ও ঐ যকৃতাদি যন্ত্র হইতে রক্তচালনের ব্যাঘাত হওয়ায়, আবার গর্ভ অবস্থায় জরায়ু প্রসারিত হওয়ায় নিম্নাঙ্গ হইতে কিয়ৎপরিমাণে রস ও রক্তের যথারূপে সঞ্চালিত ও ধাবিত না হওয়ায় বা কোন স্থানিক আঘাত

ও প্রদাহজনিত বা অন্য কোন কারণবশতঃ স্ফীততায়, নিম্নস্থ শিরাসকল হইতে রসাদি ধাতুসমূহের ন্যূনাতিরেক বা আদৌ সঞ্চালন না হওয়া প্রযুক্ত সর্ব্বদা শোথ দৃষ্ট হয়। পুরাতন পীড়ায় যেমন জ্বর, প্লীহা-যকৃৎ, ক্ষয়কাশ ও অন্যান্য দৌর্ব্বল্যকর অসুস্থাদিতে, ম্যালেরিয়া বিষ ইত্যাদি রক্তহীনতায় সঞ্চালনক্রিয়ার কার্য্যকারিতার বিকৃতিবশতঃ শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কখন কখন সহসা কোন প্রকার চর্ম্মরোগ একেবারে অদৃশ্য হওয়া প্রযুক্ত শোথের আবির্ভাব হয়। রোগনিদানবিষয়ক প্রবন্ধ পুলিন বাবুরদ্বারাই সুন্দররূপে বিবৃত করা হইতেছে, তাহার জন্য উক্ত বিষয়ে ক্ষান্ত থাকিয়া, কেবল সকলপ্রকার শোথরোগের হোমিওপ্যাথিকমতে ঔষধ নির্ব্বাচন করা যাইতেছে।

উদরী (Ascites)। যকৃতের শিরোসিস নামক পীড়া, যকৃতের কর্কট-রোগ, গণ্ডমালাজনিত রোগ, পোর্ট্যাল শিরার অবরোধ, মূত্রপিণ্ডের ব্রাইটস্‌ডিজিজ্ নামক রোগ, হৃদ্‌পীণ্ডের পীড়ায়, পুরাতনজ্বর ও প্লীহাবিবৃদ্ধি প্রভৃতি পীড়া হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু শিরোসিস্ ও মূত্রপিণ্ডের পীড়াদির জন্যই অধিকাংশ সময় উদরীর উদয় হয়।

লক্ষণ। এই রোগ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে রাত্রিতে অস্থিরতা, নিয়ত পিপাসা, পরিপাকশক্তি ও ক্ষুধার অল্পতা, জিহ্বা মলিন, ন্যূনাধিক জ্বরবোধ, বমনেচ্ছা বা বমন, প্রস্রাবের অল্পতা, কোষ্ঠাবরোধ, বা উদরের জড়তা, যকৃত, স্কন্ধদেশ ও কটিদেশে ব্যথা বা যাতনা বোধ থাকে। অনন্তর ক্রমশঃ উদরবৃদ্ধি হইয়া থাকে। উদরী পরীক্ষাকালিন উদরের এক দিকে হাত রাখিয়া অন্য দিকে অঙ্গুলিরদ্বারা প্রতিঘাত করিলে উদরমধ্যে/তরঙ্গের ন্যায় অনুভূত হয়। ঐ তরঙ্গ উদরমধ্যস্থ জলের ধাক্কা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ক্রমশঃ রোগী দুর্ব্বল হইয়া যায়। শ্বাসকষ্ট হইয়া সদত রোগী হাঁসফাস্ করিতে থাকে। উদরীর সহিত নিম্ন অঙ্গের এবং কখন কখন মুখমণ্ডলের ও বাহুর শোথ হইয়া থাকে। কিন্তু মুখমণ্ডল ও বাহুর শোথ প্রায়ই মূত্র-পিণ্ডের পীড়াজনিত ঘটিয়া থাকে; চর্ম্মের স্থিতিস্থাপকত্বগুণের শিথিলতা হওয়ায় স্ফীতস্থান টিপিলে তথায় টোল পড়িয়া থাকে, কিন্তু ঐ প্রকার টোলপড়া অন্য কোন প্রকারদ্বারা শরীরস্থ কোন স্থান ফুলিলে হয় না।

ভাবীফল। জ্বর, কাশী ও পেটের পীড়ার সহিত উদরী হইলে এবং

যদ্যপি ঐ উদরীর জন্য সমস্ত অঙ্গ বা অর্দ্ধাঙ্গ স্ফীত হয়, আর যদি নিম্ন-ভাগে শোথ হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধভাগে মুখপর্য্যন্ত গমন করে, তবে সেই রোগীর শোথ অতি কষ্টসাধ্য আরোগ্যকর। আর যে শোথের প্রপীড়নে শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট, পিপাসা, বমি, ভয়ানক দুর্ব্বলতা, অষ্টপ্রহর জ্বর-ভোগ, সমস্ত খাদ্য ও পানীয়মাত্রেই অরুচি, হিক্কা, পেটের পীড়া অথচ সাদা সাদা আম থোলো থোলো নির্গত হয়, যেন মাকড়সার জালের ন্যায়, প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়, সে শোথে মৃত্যুই প্রায় নিশ্চয়ই ঘটিয়া থাকে। যে রোগীর শোথ অত্যন্ত উচ্চ ও কাষ্ঠের ন্যায় খস্‌খসে, মসৃণতা ও কোমলতা মোটেই নাই, আর যদি কোন রোগীর মলদ্বারপর্য্যন্ত শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাতে তাহার মৃত্যুই সম্ভব। বিষজনিত বা আঘাতজনিত শোথের পক্ষে উক্তপ্রকার লক্ষণ বা উপরোক্ত প্রকার ভাবিফল ঘটিলেও কখন কখন আরোগ্য হইতে দেখা যায়। আবার কোন কোন স্থানে উপরোক্তপ্রকার না ঘটিলেও মৃত্যু হইতে দেখা গিয়াছে। তবে ইহা নিশ্চয় যে আঘাত ও বিষজনিত শোথ তত ভয়াবহ নহে। কিন্তু মর্ম্মস্থানের শোথে মৃত্যুই সম্ভব।

চন্দননগর, হরিসভা দাতব্য চিকিৎসালয় } ডাক্তার শ্রীগগনচন্দ্র নন্দী H. P.

শোথরোগে হোমোঃ ঔষধপ্রয়োগ।

Ascites উদরী শোথে পশ্চাৎ লিখিত ঔষধগুলিই সচরাচর প্রযোজ্য। যথা, এপিস, এপোসাইনাম, আর্স, আসপার, ব্রাই, চায়না, ডিজিটেলিস্, হেলেবোর, কালীকার্ব, লাইকো, সিনিসিও, সালফার।

Hydrothorax বক্ষগহ্বরশোথে (Hydrothorax) এপিস্, এপোসাই-নাম, ক্যানাবিস, আর্স, ব্রাই, কলচিকাম, ডিজিটেলিস্, আইওডিয়াম, কালি হাইড্রিয়ডিকাম্, কালিকার্ব্ব, ল্যাকেসিস্, টার্টএমে, লাইকো, স্পিজিলিয়া, স্কুইল, সালফার।

Dropsy of joints সন্ধিস্থানের শোথে যথা,—এণ্টিমক্রুড্, আর্স, ব্রাই, বেল, চায়না, আইওডিয়াম, ক্যালকেরিয়া কার্ব, কোনায়াম, কালি-হাইড্রো, মার্ক, সাইলিসিয়া, সালফার।

Ovaries ওভারির শোথে, এপিস্, আর্স, ব্রাই, বেল, চায়না, আইওডিয়াম, ল্যাকেসিস্, লাইকো, প্ল্যাটীনা, প্রুণ, স্পিঞ্জিলিয়া, সিপিয়া, ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া।

Scrotums কোষের শোথে, আর্ণিকা, কোনায়াম, আরাম, ডিজিটেলীস্, গ্র্যাফাইটিস্, য়াইওডিয়াম, সবিনাম, পলস, রডডেনড্রন, সালফার, মার্ক, লাইকো, ক্লেমেটিস্, ব্যারাইটা, থুজা, জিংক্‌মেট।

অধিকপরিমাণে রক্ত বা স্রাবের পর শোথরোগে ; এপোসাইনাম, চায়না, ফেরাম, হেলনিয়াস, লাইকো, মার্ক, সালফার।"

"গলক্ষত বা ডিপথিরিয়ার পর শোথে, এপীস্, আর্স আসকেল, বেল, ক্যালেনডুলা, মার্ক, আইওডিয়াম, সালফার, আর্জ্জণ্টা ...ইট্রীকাম ইত্যাদি"।

"এণ্টারাইটীস বা অন্ত্রের অবরোধ জন্য শোথে—এপিস্, আর্স, ডিজিটেলীস্, ডালকেমারা, আর্ণিকা, চায়না।"

"চর্ম্মরোগের হটাৎ বিলুপ্ত জন্য শোথে—এপিস, আর্স, ব্রাই, ডিজিটেলিস, হেলেবোর, ল্যাক, মার্ক, নাক্স, সালফ্।"

"ম্যালেরিয়া জ্বরের পর শোথে—আর্স, চিমাফিলা, ডালকেমারা, ফেরাম, হেলেবোর, ল্যাক, নাক্স, সলফার, ব্রাই, ইত্যাদি।"

"অতিরিক্ত পারাসেবনের পর শোথরোগে— চায়না, ডালকেমারা, হিপার, নাইট্রিকএসিড, ফাইটলেখা, থুজা, ব্যারণাইটা, সালফার।"

এপিসমেলেফিকাই ৩× । রোগীর গাএর রং ফ্যাঁকেসে, সাদামত, দক্ষিণ ডিম্বাধারের শোথ, সর্ব্বাঙ্গীন ছুঁচের ন্যায় বিদ্ধবৎ বেদনা ও জ্বালাকরা, মূত্র অল্প ও প্রস্রাবের সময় জ্বালাকরা ও ঘোর লাল রং জন্য কালমত দেখায়।

দক্ষিণ ওভেরি ও জরায়ুর শোথে ইহা ব্যবহার্য্য।

এপোসাইনামক্যানা ১× । মূত্র ঘোর হরিদ্রাবর্ণ ও অল্প ; এই ঔষধটী সকলপ্রকার শোথরোগে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহার বিশেষ গুণ এই যে, সিরশিশ বা টীউবার্কের সংযুক্ত বা যান্ত্রিক অন্যকোন পীড়াসংযুক্ত শোথে ইহা প্রচুর ফলদায়ী। পিপাসা কম, ইহার আর একটী লক্ষণ।

আর্সনিকএলবাম্। ৩০ পদ ও হস্তের শোথসংযুক্ত উদরী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও ক্ষয়কারী, ভয়ানক পিপাসা, কিন্তু প্রতিবার অল্পপরিমাণেই সন্তুষ্ট ও শান্তিদায়ক। ছটফটকরা, বড়ই মৃত্যুভয়, ম্যালেরিয়া জনিত পুরাতনজ্বর ও প্লীহা বা যকৃত বিবৃদ্ধিসংযুক্ত, রক্তহীনতা, হৃদপিণ্ডের পীড়া, ব্রাইটডিজিজ, মুখে বা স্থানে স্থানে ঘা ইত্যাদি।

আস্পারেগাস্। এই ঔষধটী ইউরোপে শোথ রোগীর খাদ্য বলিয়া প্রচলিত আছে। খড়ের জলের বর্ণ মূত্র, দুর্গন্ধ ও অনেকবার প্রস্রাব হয় বটে, কিন্তু পরিমাণ খুব অল্প, শোথের সহিত বুকধড়ফড়ানি খুব অধিক, এমন কি বুকধড়ফড়ানি দৃষ্টিগোচর স্পষ্ট হয়।

ব্রাইওনিয়া। ৩০ চক্ষুর নিম্নপাতা ফুলাসংযুক্ত শোথ, সময় সময় বুকে খোঁচা বেঁধার ন্যায় বেদনা, সতত শয়নেই শান্তিবোধ; কোষ্ঠ কাঠিন্য, শক্ত-পোড়ার ন্যায়, সামান্য মল নিসঃরণ, ঠোঁটের রং নীলাভ, ফাটা ফাটা বা চিড়-সংযুক্ত, পিপাসা।

চায়না। ৩০ রসাদিধাতুর অতিরিক্ত স্রাবের পর শোথ, প্লীহা ও যকৃত বিবৃদ্ধি ম্যালেরিয়া প্রদেশের শোথ প্রায়ই এই ঔষধে আরোগ্য হয়। অত্যন্ত বলহীন বৃদ্ধদিগের এই ঔষধটী বড়ই উপকারী; তদ্ভিন্ন উদরাময়ের সহিত দুর্ব্বলকারী শোথে বিশেষ উপকারী।

কলচিকাম্। ৩ পেরি কার্ডিয়াম ও পেরিটোনিয়ামের শোথে ব্যবহৃত হয়, মুখের বেশী বেশী শোথ ও পায়ে তদপেক্ষা অল্প কিন্তু ফুলা থাকে, রাত্রে-জ্বর, চর্ম্ম খস্‌খসে। হৃদস্পন্দন, মূত্র ঘোলাটে ও পরিমাণ অল্প, বাতের পর ও শরৎকালের পর উদরাময় হইয়া হটাৎ বন্ধপ্রযুক্ত শোথরোগে প্রযোয্য।

কন্‌ভালভিউলাস। ৩০ পেটে পরিপূর্ণ জল, মূত্র প্রায়ই হয় না যা হয় ২।১ কোঁটামাত্র, রাক্ষুসে ক্ষুধা, শরীর ও মন খুব অসুস্থ, কিন্তু খাইবার সময় যেন আর তার কিছুই রোগ নাই, এইরূপ হটাৎ উঠিয়া বসে ও খাদ্যাদি চায় ও খায়।

ডিজিটেলিস্। ১+ যে শোথ টিপিলে খুব টোল পড়ে ও ২।১ ঘণ্টার পর আবার ক্রমশঃ সমান হয় এবং হাঁটুর ও কোষের শোথের পক্ষে উপ-

কারী। হৃদপিণ্ডের পীড়া, বক্ষে জলসঞ্চয়, পেরিকার্ডাইটীস্ প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়।

হেলেবোরাস্। নূতন সর্ব্বাঙ্গীন শোথের উত্তম ঔষধ, মাথাধরা.
৩
পেট ও বুকে কসিয়া ধরার ন্যায় বন্ধন, পেট সময় সময় বেদনা ও থালধরা, সদত প্রস্রাবের চেষ্টা, কিন্তু পরিমাণ অল্প ২, এই ঔষধটীর লক্ষণ হটাৎ শোথের অর্থাৎ খুব তরুণ জ্বরের বা অন্য রোগের পরই একেবারে শোথ দেখা দেয়।

কালিকার্ব। ক্ষয়কাশের পর, যকৃত ও হৃদপিণ্ডের পীড়ার পর,
৩
শোথে ব্যবহার হয়, বক্ষে জলসঞ্চয় ও খুব বৃদ্ধদিগের যকৃতের কার্য্যকারিতা মন্দ হইয়া শোথের উৎপন্নে উপকারী।

ল্যাকেসিস্। যকৃত, হৃদপিণ্ড ও প্লীহা বিকৃতজনিত শোথ, বাম-
৩০
ডিম্বাধারের শোথ, তলপেটে ও জরায়ুর উপর এমন বেদনা যে, কাপড়খানি কসিয়া পরিধান করিতে পারে না। মূত্র অল্প ও কালো।

লইকোপডিয়াম। মাতালদিগের শোথের উৎকৃষ্ট ঔষধ, নিম্নাঙ্গে
৩০
শোথ কিন্তু ঊর্দ্ধাঙ্গে শোথ দৃষ্ট হয় না, এমন কি ঊর্দ্ধাঙ্গ খুব থসথসে ও শুষ্ক, যদি কোন স্থানে ঘা থাকে, তাহা হইলে তাহা হইতে ক্রমশঃ অবিরত জলনিঃসরণ হয়। বালির ন্যায় লাল খাঁকৃড়ি প্রস্রাবের তলায় পড়ে।

সিলিসীয়া। স্ত্রীলোকদিগের ঋতুসম্বন্ধীয় কোনপ্রকার গোলযোগের পরেই যে শোথ উৎপন্ন হয়, ও যদি তাহার সহিত হৃদস্পন্দনের পীড়া থাকে। আর পায়ের ও হাতের চেটোমাত্রে শোথ হয়।

সালফার। হটাৎ চর্ম্মরোগ অন্তর্হিত হওয়ায় শোথ উৎপন্ন হয়, বা শোথের সহিত চর্ম্মের রোগ ও ফুস্কুড়ি ফুস্কুড়ি বর্ণ, জ্বালা, শুষ্কভাব এবং এই ঔষধ সকল সময়ে ২।১ বার মধ্যে মধ্যে ব্যবহৃত হয়।*

চন্দননগর হরিসভা। } ডাক্তার শ্রীগগনচন্দ্র নন্দী।
দাতব্যচিকিৎসালয়। }

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

লেখক মহাশয় ক্ষমা করিবেন। আর অধিক কি বলিব? চি, স, স,

(উদ্ধৃত)

চিকিৎসাবিজ্ঞান।

কৃষিপত্রিকায় সাধারণ পাঠকগণের হিতের জন্য অনেক সময় আমরা চিকিৎসার আলোচনাও করি। এজন্য এই বৎসরে বিলাতে যে সকল নূতন ঔষধ ও চিকিৎসা-প্রণালী আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাও সংক্ষেপে এস্থলে লিখিত হইতেছে ;

রজোরোধ।—এই পীড়ায় পূর্ব্বে লৌহ মুসব্বর ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহার হইত, বর্ত্তমান বৎসরে ডাক্তার সিডনিরিংগার এবং মরেল permanganate of potass কিম্বা Soda এক গ্রেন হইতে দুই গ্রেন মাত্রায় দিবসে তিনবার করিয়া ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন এবং তাঁহাদের এই ব্যবস্থা অনুসারে এক্ষণে বিলাতে এই নূতন ঔষধ ব্যবহার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ঋতুকালের ৩।৪ দিন পূর্ব্ব হইতে এই ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে শরীরের কোন স্থানে অস্ত্র করিতে হইলে সাধারণতঃ রোগীকে Chloroform দ্বারা অজ্ঞান করিয়া লওয়া হইত। ইহাতে অস্ত্রের সময় রোগী কষ্ট অনুভব করিতে পারিত না সত্য কিন্তু মেয়েদের সময়ে অন্যরূপ অনিষ্ট হইত। এক্ষণে বিলাতে ক্লরোফরমের পরিবর্ত্তে নূতন একটি উপায় অবলম্বন করিয়া অস্ত্র করা হইতেছে। ডাক্তার রোমেন বর্গ সম্প্রতি পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন Menthol নামক একটি ঔষধ ইথারের সহিত মিশ্রিত করিয়া শরীরের কোন স্থানে প্রলেপ দিলে সে স্থানের আর অনুভব শক্তি থাকে না, তখন অনায়াসে সেই স্থানে অস্ত্র করা যাইতে পারে। এই ঔষধ আবিষ্কার হওয়ায় অস্ত্র চিকিৎসার পক্ষে যে কত সুবিধা হইয়াছে তাহা লেখা বাহুল্য।

হাঁপানিরও একটি অতি আশ্চর্য্য ঔষধ অল্প দিবস হইল আবিষ্কার হইয়াছে। বিলাতের ডাক্তার বি, ডাবলিউ, রিচার্ডস্‌সন পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন Nitrite of amyl নামক ঔষধ এক হইতে তিন ফোটা পর্য্যন্ত গরম জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ৪।৫ বার ব্যবহার করিলে হাঁপানির যাতনা অতি শীঘ্র নিবৃত্তি হইবে। এ ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য নহে।

স্ফোটক—ফোড়া হইলেই অস্ত্র করিতে হয় এ বিশ্বাস অনেক চিকিৎ-

সকলেরই আছে। বিলাতের প্রধান প্রধান এলোপ্যাথি চিকিৎসকগণ কিন্তু এ মতের পক্ষপাতী নহেন। ঔষধ ব্যবহার করিলে যদি আপনা হইতে ফোড়া আরোগ্য হইয়া যায়, তবে কষ্টকর অস্ত্রচিকিৎসা অবলম্বন করা কখনই কর্ত্তব্য নহে এরূপ তাঁহাদের মত। এত দিন ডাক্তারিমতে ফোড়ার ভাল ঔষধ ছিল না। সম্প্রতি বিলাতের চিকিৎসকগণ স্থির করিয়াছেন Sulphide of Calcium এক গ্রেনের দশ ভাগের এক ভাগ পরিষ্কার চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবসে তিনবার সেবন করাইলে যেমন কঠিন ফোড়া হউক না কেন শীঘ্র আরোগ্য হইবে।

শরীরের কোন স্থান আগুণে পুড়িলে Permanganate of Potash এক ছটাক জলে চারি গ্রেণ পরিমাণ মিশ্রিত করিয়া উহা দ্বারা একটু পাতলা কাপড় ভিজাইয়া ঐ স্থান জড়াইয়া রাখিলে অতি শীঘ্র জ্বালাযন্ত্রণা নিবারণ হয়। এই নূতন ঔষধটি রুষিয়ার এক জন প্রধান ডাক্তার জিউপ্প আবিষ্কার করিয়াছেন। দগ্ধটা যদি কিছু গুরুতর রূপের হয়, তবে Cocaine কোকিন নামক একটি ঔষধ অধিক পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঐরূপ দগ্ধ স্থানে রাখিলে পূর্ব্বলিখিত ঔষধ অপেক্ষাও অধিক উপকার পাওয়া যাইবে। এই ঔষধটি Dr. E. D. Isla আবিষ্কার করিয়াছেন।

বহুমূত্র।—বহুমূত্র পীড়ায় এদেশের শিক্ষিত সমাজে যে কি ভয়ঙ্কর অনিষ্টসাধন করিতেছে তাহা কাহারই অবিদিত নাই। এই পীড়ার ভাল ঔষধ এলোপ্যাথিতে এপর্য্যন্ত প্রায় কিছুই ছিল না। সম্প্রতি বিলাতের ডাক্তার হোলডান্ এই পীড়ার একটি সুন্দর ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। Salicylic Acid দশগ্রেণ হইতে পনেরগ্রেণ মাত্রায় দিবসে তিনবার করিয়া ব্যবহার করাইয়া ইনি পাঁচ ছয়টি রোগীকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়াছেন। কিন্তু বাতগ্রস্ত রোগীর বহুমূত্র পীড়ার পক্ষে এইটী ভাল ঔষধ। সাধারণ বহুমূত্র রোগীর পক্ষে ডাক্তার প্যাণ্ডলেটী Iodoforn ব্যবস্থা করেন। ইহাতে প্রস্রাবের পরিমাণ অতি শীঘ্র হ্রাস হইয়া আইসে এবং উহাতে শর্করার অংশও ক্রমে অল্প হইয়া যায়। এ দুইটিই বহুমূত্র রোগীর পক্ষে সুলক্ষণ। বহুমূত্র রোগের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর একটি ঔষধ অতি অল্পদিন হইল ডাক্তার থি ওডোর ক্লিমেন্স আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার নাম Lipuor Brom-arseuite এই ঔষধ দুই ফোটা অর্দ্ধছটাক জলের সহিত মিশ্রিত

করিয়া আহারের অব্যবহিত পরেই দিবসে তিনবার করিয়া ব্যবহার করিতে হইবে। ইহাতে নিতান্ত কঠিন বহুমূত্রও আরোগ্য হইবে, এইরূপ ইহার আবিষ্কারকর্ত্তা ডাক্তার থিওডোর বলেন। ক্রমশঃ শিল্প ও কৃষিপত্রিকা।

আমরা অতিকৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। অনেক দিবস হইল, এই সমস্ত পুস্তক সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি. কিন্তু নিতান্তই দুঃখ ও লজ্জার বিষয় এই যে, নানাকারণে বিশেষতঃ সম্পাদকীয় বিভ্রাটে এপর্য্যন্ত আমরা এই সমস্ত পুস্তকের সমালোচনা করিতে না পারিয়া নিতান্তই অন্যায় করিতেছি। আশা করি, প্রকাশকগণ ক্ষমা করিবেন, যত শীঘ্র পারি পুস্তকগুলির সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য লিখিব।

(১) চক্রদত্ত।—বঙ্গাক্ষরে মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহিত চিকিৎসা সম্মিলনীর ম্যানেজার শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও সংশোধিত।

(২) নাড়ীবিজ্ঞান।—নন্দলাল বিদ্যারত্ন কবিরঞ্জন কবিরাজ কর্ত্তৃক বিবৃতি ও বঙ্গানুবাদ সহিত। মূল্য ৷৵০ আনা।

(৩) সুরাপান বা বিষপান।—কলিকাতা আশাদলের জনৈক সভ্য-কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

(৪) ভারতের গোধনরক্ষা।—তাহিরপুর কৃষিকার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

(৫) সারকৌমুদী।—কবিরাজ বসন্তকুমার রায়-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

(৬) ভারতভৈষজ্যতত্ত্ব।—ডাক্তার অম্বিকাচরণ রক্ষিত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

গ্রাহকগণের প্রতি।

পূর্ব্ব অঙ্গীকৃত পরীক্ষাতত্ত্ব অদ্যাপিও গ্রাহকগণ প্রাপ্ত হইলেন না; বিশেষতঃ এবারে চিকিৎসা-সম্মিলনী প্রকাশে অসম্ভব বিলম্ব দেখিয়া গ্রাহক-বর্গের মধ্যে অনেকেই যারপর নাই বিরক্ত ও ব্যস্ত হইয়া কারণ জানিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে পত্র লিখিতেছেন। কিন্তু সেই সমস্ত পত্রের উত্তরে আমাদের আর অধিক বলিবার কি আছে? একবৎসরের মধ্যে দুই

জন সম্পাদকের মৃত্যুতে কোন্ বুদ্ধিমান্ গ্রাহকের ইহার প্রকৃত কারণ জানিতে বাকী আছে?

ম্যানেজার।
চি, স, স,

৫ম খণ্ড। মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র। ১০ম, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

(চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিকপত্রিকা)

৫ম খণ্ড, ১২৯৫ সাল।

টাকীর বিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমীদার

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,

মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে

ডাক্তার শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম, বি,

ও

কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন।

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা।

২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীপ্যারীমোহন সেন

কর্ত্তৃক প্রকাশিত

৫ নং সিমলা ষ্ট্রীট, জ্যোতিষ প্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল দ্বারা মুদ্রিত।

চিকিৎসা-সম্মিলনী ১২৯৫ সাল ৫ম খণ্ডের

সূচীপত্র।

এলোপ্যাথি মতে।

হোমিওপ্যাথি মতে

চিকিৎসা—সম্মিলনী।

৪র্থ খণ্ড।]　　বৈশাখ, ১২৯৫ সাল।　　[১ম সংখ্যা।

গতবর্ষ।

বর্ষান্তে নূতন বৎসরের প্রারম্ভে অতীতবর্ষের সমালোচনা করা সম্পাদকের অবশ্যকর্ত্তব্য। কেবল কর্ত্তব্য নহে, যথাসময়ে প্রণালীপূর্ব্বক লিখিত হইলে এই সমালোচনা, পাঠক, লেখক ও সম্পাদক প্রভৃতি সকলেরই পক্ষে বেশ আমোদজনক হয়, আর অসময়ে হইলে যে নিতান্তই বিরক্তিজনক হইয়া থাকে, তাহা নিঃসন্দেহ। দুঃখের বিষয় এই যে, সম্মিলনীসম্পাদক আজ্ অসময়ে পড়িয়া সাধারণকে বিরক্ত এবং নিজেকেও বিড়ম্বিত করিতে বসিয়াছে। কেননা কোথায় ৪র্থ বর্ষ অতিক্রম করতঃ সম্মিলনী গত বৈশাখে ৫ম অর্থাৎ নব বর্ষে পদার্পণ করিয়া মহা আনন্দে প্রাণ খুলিয়া গ্রাহক ও পাঠক বর্গকে দু চারিটী কথা শুনাইবে, এবং পাঠকবর্গও তদ্দ্বারা বুঝিবেন যে, গত বর্ষে সম্মিলনী দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কি কি কাজ সাধিত হইল, আর আগামী বর্ষেই বা সম্মিলনী কোন্ পথে কিরূপভাবে চালিত হইবেক, তাহারও আভাস তাঁহারা পাইবেন; কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় আমার নিতান্তই দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সব্ আশাতেই ছাই পড়িয়াছে। বস্তুতঃ কিকুক্ষণেই সম্মিলনী ৪র্থ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিল। বর্ষ পূর্ণ হইতে না হইতে যে দুইটী ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা আর ইহজনমে ভুলিবার নহে। ডাক্তার অন্নদাচরণ ও ভগবান্ চন্দ্রের অকাল মৃত্যুতে সম্মিলনীর যে কি গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে, তাহার আলোচনাও আর করিতে চাহি না।

ক্ষতি যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, ক্রমে দুইজনের মৃত্যুতে সম্মিলনীর যে বিশৃঙ্খলা ঘটিবার তাহা চূড়ান্তই ঘটিয়াছে, সুতরাং আর তাহা লইয়া অনর্থক সময় নষ্ট করা উচিত নহে। তবে কথা এই যে, ক্ষতি গুরুতর হইলেও সম্মিলনী যে একবারেই অনাথা হইয়াছে, সে কথাও কোন মতেই বলিতে পারি না। কেননা ভগবানের কৃপায় চিকিৎসাসম্মিলনীর এখনও যে সমস্ত উপযুক্ত লেখক, ও তত্ত্বাব-

ধায়ক বর্ত্তমান আছেন, তাহাতে প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের আন্তরিক যত্ন থাকিলে সম্মিলনী সম্বন্ধে কোন হানিরই সম্ভাবনা নাই। বরং বর্ত্তমান বর্ষ হইতে সম্মিলনীর সুযোগ্য ও প্রধান লেখক ডাক্তার পুলিন বাবু, ইহার অন্যতর সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়া নিয়মিতরূপে লেখা ও আন্তরিক যত্নসম্বন্ধে যেরূপ আভাস দিয়াছেন, তাহাতে একথা খুব্ সাহস পূর্ব্বক বলা যাইতে পারে যে, সম্মিলনীর অস্তিত্বসম্বন্ধে আর কোন আশঙ্কাই নাই। এস্থলে পুলিন বাবুর পরিচয় সম্বন্ধেও বলা আবশ্যক যে, তিনি কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে বেশ যোগ্যতার সহিত এম্ বি, পরীক্ষায় পাশ করিয়া অনেক দিবস পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের চাকরী করতঃ এখন স্বাধীনভাবে চিকিৎসা কার্য্য করিতেছেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার প্রণীত স্ত্রী-চিকিৎসা ও শিশুচিকিৎসা প্রভৃতি পুস্তকগুলিও সাধারণের নিকট বেশ সমাদৃত আছে, এবং তদ্দ্বারা তিনি প্রায় অধিকাংশ লোকের নিকটেই বিশেষরূপ পরিচিত হইয়াছেন। আর তাঁহার লেখা যে বেশ সরল, সহজবোধ্য ও সারগর্ভ, তাহা বোধ হয় সম্মিলনীর পাঠকবর্গের মধ্যে আর কাহারও জানিতে বাকী নাই। সুতরাং এহেন সুযোগ্য লেখকের হস্তে সম্পাদকীয় ভার ন্যস্ত হওয়ায় সম্মিলনীর যে উত্তরোত্তর আরও শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকিবে, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ অন্যান্য অনেক সুযোগ্য কবিরাজ ও ডাক্তার মহোদয়গণ যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে সম্মিলনীর উন্নতিসাধনের ভারগ্রহণ করিয়াছেন। যাহাহউক, সে ভাবী ফলাফলের আলোচনা এখন অসঙ্গত। বরং অতীত সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

গত ৪র্থ বর্ষের আলোচ্যের মধ্যে উপর্য্যুপরি দুইজন সম্পাদকের মৃত্যু ঘটনাই সর্ব্ব প্রধান। কিন্তু এই মৃত্যু ঘটনা লইয়া ক্রমে কয়েকবারই পাঠকগণকে শোকার্ত্ত করিয়াছি, সুতরাং আর এবিষয়ের পুনরুল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগের শোকের বৃদ্ধি করিতে চাই না। এখন দেখা যাউক, গত বর্ষের সম্মিলনী কোন্ পথে কিরূপ ভাবে চালিত হইয়াছে। এবং ভবিষ্যৎ আশাই বা কতটুকু আছে। গত বর্ষের প্রকাশিত প্রবন্ধের মধ্যে এলোপ্যাথিমতে ডাক্তারচূড়ামণী জগদ্বন্ধু বাবুর লিখিত কুইনাইন-প্রয়োগ ও জ্বরচিকিৎসা এবং ডাক্তার পুলিন বাবুর লিখিত শোথরোগের লক্ষণ ও চিকিৎসাই বিশেষ আলোচ্যের বিষয়। বস্তুতঃ জগদ্বন্ধু বাবুর

প্রবন্ধ পড়িয়া যে কত শত অন্ধের চক্ষু ফুটীয়াছে, পাঠক বর্গই তাহার বিচার করিবেন। হোমিওপ্যাথিমতে ডাক্তার হরনাথ বাবু ও শিখর বাবুই প্রধান। কবিরাজী মতে কবিরাজ শীতল বাবু ও হরিমোহন গুপ্ত, মহাশয় দ্বয়েরই জয় অধিক। তার পর কবিরাজ জগদ্বন্ধু বাবু এবং প্রসন্ন বাবুও পাঠকগণকে সন্তুষ্ট করিতে ত্রুটী করেন নাই। ফলতঃ ডাং জগদ্বন্ধু বাবুর কুইনাইন ও জ্বরতত্ত্ব,পুলিনের শোথতত্ত্ব,হরিমোহনের আয়ুর্ব্বেদতত্ত্ব, শীতল চন্দ্রের ঔষধপ্রস্তুত ও প্রয়োগ প্রণালী এবং কবিরাজ জগদ্বন্ধুর তৈলপাক বিধি পড়িয়া সাধারণেই সন্তুষ্ট এবং বিশিষ্ট উপকৃত হইয়াছেন বলিয়াই অধিকাংশ গ্রাহকবৃন্দের দৃঢ়বিশ্বাস। তার পর ডাক্তার ক্ষীরোদ বাবু প্রভৃতি আরও ২। ৪ জন উপযুক্ত লেখক যে কয়টী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং ভবিষ্যতের পক্ষে যেরূপ আভাস দিয়াছেন, তাহাও সম্মিলনীর পক্ষে নিতান্তই শুভজনক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক। তদ্ভিন্ন সম্পাদকের লিখিত প্রবন্ধগুলি যাহা সম্মিলনীতে স্থান পাইয়াছে, তদ্দ্বারা যদি পাঠকবর্গের কিয়ৎ পরিমাণেও উপকার হইয়া থাকে, তাহাও সম্মিলনীর শ্রীবৃদ্ধির কারণ বলিতে হইবেক। ফলকথা লেখক মহাশয়দিগের অনুগ্রহই যে, সম্মিলনীর জীবনরক্ষার একমাত্র উপায়, তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। অতএব আশা করি যে, ভগবানের কৃপায় তাঁহারা সকলেই সুস্থ থাকিয়া সম্মিলনীর উন্নতি সাধন করিতে থাকুন।

যে দুরূহকার্য্য সাধনের জন্য চিকিৎসাসম্মিলনীর সৃষ্টি হইয়াছে, যদিও গত চারি বৎসরের সম্মিলনী দ্বারা তাহার আংশিক আশা এখনও পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু যে ধরণে যে সমস্ত উপযুক্ত লেখক দ্বারা সম্মিলনী পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে সময়ে সে আশা পূর্ণ হইবে বলিয়া অবশ্যই ভরসা করা যাইতে পারে। কেননা ইতি পূর্ব্বে অর্শ ও ক্রিমি প্রভৃতি রোগের বিষয় ত্রিবিধ মতে যেরূপ ধরণে লিখিত হইয়াছে এবং জ্বর ও শোথাদি রোগের বিষয় বর্ত্তমান্ সময়ে যেরূপ ধরণে লিখিত হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে যদি ঠিক্ এই ধরণেই রক্তপিত্ত, কাস, যক্ষ্মা, বাত, গুল্ম,. প্রমেহ ও প্রদরাদি সমস্ত রোগের বিষয় লিখিত হইতে থাকে, এবং যখন সমস্ত রোগ গুলির বিষয় লেখা সম্পূর্ণ হইবেক, তখন যে আমাদের এই আশা পূর্ণাশা বলিয়া মনে করিব না, এই পরিশ্রমের যে সার্থকতা স্বীকার করিতে পারিব না, একথা কে বলিতে পারে? ফলতঃ যখন

এত সমস্ত দুরন্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সম্মিলনী এত দূর আসিয়া পড়িয়াছে, তখন সে আশা, পরিশ্রমের সে সার্থকতা সম্পন্ন হইবে বলিয়াই সম্পূর্ণ ভরসা করিতে পারি।

পরিশেষে আমাদের নিতান্ত হিতাকাঙ্খী কতকগুলি গ্রাহক ও পাঠক, যাঁহারা ডাক্তার খাস্তগির ও রুদ্রের মৃত্যুর পর হইতেই সম্মিলনীর অস্তিত্বে মহান্ সন্দিহান্ হইয়া নানাবিধ শোক, বিলাপ ও দুঃখপূর্ণ হৃদয়ে আমাদিগকে পত্রাদি লিখিয়া সম্মিলনীর অস্তিত্বের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগের প্রতি এবং তাঁহাদের সেই সমস্ত পত্রের উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহারা যেন সম্মিলনী সম্বন্ধে এরূপ বৃথা আশঙ্কা না করেন, কেননা যতদিন পর্য্যন্ত সম্মিলনীর অন্যতর সম্পাদকের জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত না হইবে, ততদিন তাহার হৃদয় হইতে চিকিৎসা-সম্মিলনীর পরিচালনরূপ এই মহাব্রত অপনীত না হওয়ারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তবে যদি নৈসর্গিক নিয়মানুসারে ও দুরন্ত কালের উৎপীড়নে সহসা বর্ত্তমান সম্পাদককে মৃত সম্পাদকদ্বয়ের সঙ্গী হইতে হয়, তাহা হইলে অবশ্য নাচার। তবে সাহস পূর্ব্বক এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, জীবন থাকিতে শারীরিক ও মানসিক বিন্দু মাত্রও সামর্থ্য থাকিতে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক। প্রতিজ্ঞার কথা তুলিয়া এ স্থলে সেই পরীক্ষাতত্ত্বের কথা মনে পড়িল। আজ্ও পর্য্যন্ত আমাদের অঙ্গীকৃত পরীক্ষাতত্ত্ব না দেওয়ায় ত্রুটী যতদূর হওয়ার তাহা হইয়াছে, কিন্তু তাহা বলিয়া এখনও আমরা পাঠকবর্গকে হতাশাস হইতে নিষেধ করি! কেননা বিলম্বে সমধিক সুফল ফলিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

অতঃপর চিকিৎসাসম্মিলনীর সর্ব্বপ্রধান উদ্‌যোগ ও সাহায্যকর্ত্তা শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল্. জমীদার মহোদয়ের সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, এজগতে ধনীসম্প্রদায় মাত্রেই প্রায়শঃ রকমবেরকম খেয়ালের দাস। সদসৎ একটী না একটী খেয়াল তাঁহাদের না হইলেই চলে না। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এমত লোক খুব্ কমই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাঁহার মতি অধিকাংশ সময়ে প্রকৃত সৎখেয়ালে পরিচালিত হয়। অধিক কি লক্ষাধিক টাকা ব্যয়সাধ্য বিড়ালের বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া বারবিলাসিনী লইয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনয় পর্য্যন্ত

সংসারের কোন খেয়ালই প্রায় তাঁহাদের বাদ যায় না। তাহা ছাড়া গাড়ীঘোড়া ইত্যাদি খেয়াল ত নগণ্যেরই মধ্যে। যাহা হউক, এত সমস্ত অসংখ্য মজাদার খেয়াল থাকিতে অথচ প্রচুর ধনেরও অভাব না থাকিতেও যে তাঁহার অন্তঃকরণ এই সম্মিলনীর স্থষ্টিরূপ নিতান্ত শুষ্ক (পক্ষান্তরে অতি মহান্) খেয়ালে মাতিয়াছিল, এ অপার আনন্দ আর রাখিবার স্থান নাই। যাহা হউক, তাঁহার উদ্‌যোগ ও সাহায্যে প্রতিপালিতা সম্মিলনী যে আজ, দুরন্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতঃ প্রায় সহস্র গ্রাহক লইয়া ৫ম বর্ষে পদার্পণ করিল, ইহা তাঁহারই সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব ও আনন্দের বিষয়। অতএব ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি যে, এ সংসারে যাঁহারা যে খেয়াল লইয়া আছেন, তাঁহারা তাহাতেই এই নশ্বর জীবনের যথার্থ সার্থকতা করুন। এদিকে এই নীরস সম্মিলনী জীবিত থাকিয়া দিন দিন যতীন্দ্র বাবুর এইরূপ গৌরব ও আনন্দের বৃদ্ধি করিতে থাকুক্।

বিবাহ বিচার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমার বিবাহবিচার প্রবন্ধ সম্পূর্ণ না হইতেই অনেকে দু একটী বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসু হইয়াছেন। এসম্বন্ধে এই মাত্র বক্তব্য যে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া প্রবন্ধের শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন। আমার দ্বারা যতদূর সম্ভব, তাঁহাদের আপত্তি সকলের মীমাংসা করিতে চেষ্টা পাইব। সম্প্রতি আমার দু একজন বন্ধু বলিতেছেন, তা যেন বুঝিলাম, বাল্য-বিবাহে সমস্ত জাতির বংশাবনতি হয় না। কিন্তু অল্প বয়সে ইন্দ্রিয় পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলে যে দম্পতীর শরীর দুর্ব্বল ও ভগ্ন হয়, তাহার কি? অদ্য এই প্রশ্নের মীমাংসাতেই প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

আমি প্রথমেই বলিয়া রাখি, যে আমাদিগের শরীরস্থ যন্ত্র সমুদয়ের ক্রিয়া তাহারা সম্যক পরিপুষ্ট না হইতেই আরম্ভ হয়, এবং ঐরূপ ক্রিয়ার পরিচালনাবশতঃ তাহাদিগের বৃদ্ধি ও পুষ্টতা লাভের হানি হয় না, ইহা একটী প্রাকৃতিক নিয়ম।

যাঁহারা বাল্যবিবাহের বিরোধী, তাঁহাদের অনেকেই এইরূপ আপত্তিটী উত্থাপন করেন, যে যেরূপ কাঁচা হাঁড়ী ছাঁচে ঢালিয়া তৈয়ার হইবামাত্র তাহা ব্যবহার করিলে ভাঙ্গিয়া বা বিকৃত হইয়া যায়, কিন্তু কিছু দিন সময় দিয়া তাহাকে শুষ্ক করিয়া লইলে আর বিকৃত হয় না। সেইরূপ আমাদিগের জননেন্দ্রিয়ের গঠন সমাপ্ত হইবা মাত্র তাহার পরিচালনা আরম্ভ করিলে সমূহ অনিষ্টের সম্ভাবনা। কিন্তু বিশেষ রূপে ভাবিয়া দেখিলে এ আপত্তিটী আংশিক সত্য হইলেও তাদৃশ গুরুতর নহে।

শারীরতত্ত্ব অধ্যয়ন করিলে জানিতে পারা যায়, যে জীবগণের শারীর যন্ত্র সকল সমস্তই ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হয়। মনুষ্যের মাতৃ-গর্ভে উদয় হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত যন্ত্র সকলের কোন না কোন অংশ বর্দ্ধিত ও পরিপক্ক হইতে থাকে। কোন যন্ত্রবিশেষ একবারে বর্দ্ধিত হইয়া চরম সীমায় উপনীত হয় না। ভূমণ্ডলে যাবতীয় জীব জন্তু ও উদ্ভিদের কোন না কোন অংশ ক্রমাগতই বাড়িতে থাকে। যখন এইরূপ বৃদ্ধি হওয়া স্থগিত হয়, তখনই তাহার লয় উপস্থিত হয়। জীব শরীরে ক্ষয় ও বৃদ্ধি প্রতিনিয়ত চলিতেছে। জীব জন্মাইবার পর হইতে কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত ক্ষয় অপেক্ষা বৃদ্ধির ভাগ অধিক থাকে, এইজন্য সেই কাল পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর বা তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ আকারে বড় ও ওজনে ভারি হইতে থাকে। যখন জীবগণ পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়, তখন শরীরের আয়ব্যয় সমান হইয়া যায়। তখন আর পূর্ব্বের ন্যায় শরীর শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে না। অথবা নূতন কোন যন্ত্রও আর সৃষ্ট হয় না। কিন্তু তখনও পূর্ব্ব লিখিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ক্রমেই দৃঢ় ও পুষ্ট হইতে থাকে।

মনুষ্য সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে প্রথমে তাহার যকৃত অত্যন্ত বৃহৎ থাকে এবং তাহার দন্ত থাকে না। পরে বয়োবৃদ্ধি সহকারে যকৃত যন্ত্র ছোট হইয়া স্বাভাবিক আকার ধারণ করে এবং দু একটী করিয়া দাঁত উঠিতে থাকে। শরীরের অনেক অস্থি তখনও নির্ম্মিত হয় না। তার পর যত বয়স বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই নূতন নূতন অস্থি নির্ম্মিত এবং পূর্ব্ব নির্ম্মিত কোমল অস্থি সকল সুদৃঢ় হইতে থাকে। মাংসপেশী গুলিও ক্রমে ক্রমে দৃঢ় হইতে থাকে। কোন্ বয়সে কোন্ অস্থি নির্ম্মিত ও দৃঢ়তা প্রাপ্ত

হয়, তাহার সমস্ত গুলির বর্ণনা এ প্রবন্ধে সম্ভবে না, তবে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দু একখানি অস্থির বিষয় সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। আমাদিগের পৃষ্ঠের দাঁড়া ভিন্ন ভিন্ন অস্থি খণ্ডে নির্ম্মিত। ঐ সকল খণ্ডের পৃথক পৃথক নাম আছে, যথা ১ম, ২য় ইত্যাদি। পৃষ্ঠের দাঁড়ার সমস্ত অস্থির বৃদ্ধি মনুষ্যের বিশ বৎসর বয়সে শেষ হয়। অতি শৈশব কালে প্রত্যেক অস্থি খণ্ড দুই অংশে বিভক্ত থাকে, পরে তৃতীয় বর্ষে দুই খানি মিলিত হইয়া একখানি অস্থিতে পরিণত হয়। আমাদিগের পাঁজরের অস্থি সকল ২৫ হইতে ৩০শ বৎসর মধ্যে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। গলার কণ্ঠাস্থি খানি ২৫ বৎসর বয়সে সম্পূর্ণ হয়। উপর বাহুর অস্থি খানি পরিপক্ক হইতে অষ্টাদশ বৎসর বয়ক্রম অতীত হয়। পাছার অস্থি দুই খানি ২৫ বৎসরে পূর্ণ হয়। উরুদেশের অস্থি খানি পরিপক্ক হইতে বিশ বৎসর আবশ্যক করে। মনুষ্য সন্তানের ২২ বৎসর বয়সের সময় "আক্কেল মাড়ির দাঁত" উঠে। এইরূপে দেখা যায় যে, জীবশরীর পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে অনেক সময় অতিবাহিত হয়। এক্ষণে দেখা যাউক, কোন শারিরীক যন্ত্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার ব্যবহার আরম্ভ হইলে কোন অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা কিনা? মনুষ্যের দন্তোদ্গম বাইশ বৎসর বয়ক্রমে পরি সমাপ্ত হয়, কিন্তু মনুষ্য শিশুর প্রথম দাঁত দেখা দিবামাত্র অল্পে অল্পে তাহার ক্রিয়া আরম্ভ হয়। দাঁত উঠিলে শিশু আপনা আপনিই আঙ্গুল কামড়াইতে থাকে এবং কোন শক্ত দ্রব্য পাইলেই দাঁত দিয়া কাটিতে থাকে। মনুষ্যের হস্ত পদের অস্থি সকল অনেক দিন পর্য্যন্ত অসম্পূর্ণ ও কোমল থাকে, কিন্তু শিশুগণ যেরূপ হাতপায়ের চালনা করিতে পারে, পরিপক্ক অস্থি বিশিষ্ট লোকে তেমন পারে না। এই জন্যই কুস্তির মল্লগণ বলিয়া থাকে, অতি শৈশব হইতে কুস্তি অভ্যাস না করিলে পরে আর তাহা শিক্ষা করা যায় না। লোক কথায় বলে পাকা হাড় ভাঙ্গিলে আর যোড়া লাগিবে না। শিশুগণ শুইয়া শুইয়া ক্রমাগত হাত পা ছুড়িতে থাকে, গো বৎস দাঁড়াইবা মাত্র দৌড়াইতে আরম্ভ করে। পক্ষি শাবক ক্রমাগত তাহার অপরিণত পক্ষহীন ডানা নাড়িয়া উড়িবার চেষ্টা করে। কৌমার বয়সে পাকস্থলীও অসম্পূর্ণ থাকে, তত্রাচ বালকগণ যেমন শীঘ্র শীঘ্র খায় ও হজম করে, পরিণত বয়স্কেরা তেমন পারেন না। মাকড়সার সন্তান ডিম্ব হইতে নির্গত হইবামাত্র জালবুনাইতে আরম্ভ করে, তবে বড় মাকড়সার

ন্যায় শীঘ্র শীঘ্র পারে না। মনুষ্যের মস্তিষ্ক পূর্ণ হইতে অনেক দিন লাগে কিন্তু শৈশব বয়স হইতেই মস্তিষ্কের ক্রিয়া শক্তি আরম্ভ হয়। যখনই বালকগণ কিছু কিছু চিন্তা করিতে শিক্ষা করে, তখনই তাহাদিগের মস্তিষ্কের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। প্রত্যুত অল্প বয়স হইতে মস্তিষ্কের চালনা আরম্ভ করিলে যেমন চিন্তা শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হয়। অধিক বয়সে হটাৎ চালনা করিলে তদ্রূপ ফল হয় না। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় সমস্ত শারীর যন্ত্র গঠিত হইবামাত্র তাহাদের ক্রিয়া শক্তি অল্প অল্প করিয়া আরম্ভ হয়। এবং যেমন ক্রমে ক্রমে যন্ত্রটী বৃদ্ধ হইতে থাকে, তার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়া করিবার ক্ষমতাও বৃদ্ধি হইতে থাকে। মূল কথা, শারীর যন্ত্রের উৎপত্তি বৃদ্ধি ও ক্রিয়া শক্তি এক সঙ্গেই আরম্ভ হয়, এবং যতই ক্রিয়া করা যায়, যন্ত্রটীও সেই সঙ্গে বাড়িয়া উঠে ও অধিকতর কার্য্যক্ষম হয়। যাঁহারা শারীর যন্ত্রের সহিত মৃণ্ময় পাত্রের তুলনা করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ভুল বলিয়াই উপলব্ধি হয়। মনুষ্য-কৃত জীবনশূন্য যন্ত্রে ও দৈহিক যন্ত্রে অনেক ইতর বিশেষ লক্ষিত হয়। মনুষ্য কৃত যন্ত্র একবারে সম্পূর্ণ না হইলে কার্য্যক্ষম হয় না, কিন্তু দৈহিক যন্ত্র নির্ম্মিত হইবা মাত্র তাহার ক্রিয়া করিবার ক্ষমতা উপস্থিত হয় এবং ঐ যন্ত্রের পরিচালনাই তাহার বৃদ্ধির সহায়স্বরূপ হয়।

শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন জীবগণের জননেন্দ্রিয়ের কার্য্য অনেক বয়সে আরম্ভ হয়। বাস্তবিক শরীরের অন্যান্য যন্ত্রগুলি অপেক্ষাকৃত পরিপক্ক না হইলে সন্তানোৎপাদিকা শক্তি উপস্থিত হয় না। অন্যান্য যন্ত্রের পরিচালনায় যেরূপ শরীর ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা, জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া আরম্ভ হইলে শরীর ক্ষয়ের ভাগ কিছু বেশী হইয়া যায়, এই জন্যই অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে যখন অন্যান্য যন্ত্র প্রায় পুষ্ট হইয়া আসে। জননেন্দ্রিয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। কিন্তু ইহাও জানা আবশ্যক, যে জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহার কোন কোন ভাগ নির্ম্মিত হইতে বাকী থাকে, এবং যেমন ঐ সকল অংশ নির্ম্মিত হয়, তৎক্ষণাৎ অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায় অল্পে অল্পে তাহাদের কার্য্য আরম্ভ হয়। শৈশবে জননেন্দ্রিয়ের আকার প্রকার যেরূপ থাকে, যৌবন বয়সে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। অতএব যেমন অন্যান্য যন্ত্র সকল নির্ম্মিত হইবা-

মাত্র অল্পে অল্পে তাহাদের ক্রিয়া আরম্ভ হয়, জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া-সম্বন্ধেও এই প্রাকৃতিক নিয়মের কোন ব্যভিচার লক্ষিত হয় না। কিরূপ বয়সে কিরূপভাবে জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া আরম্ভ ও বৃদ্ধি হয়, তাহা এই প্রবন্ধের স্থানে স্থানে উল্লেখ করা গিয়াছে। সমস্ত জীব ও উদ্ভিদগণের জননশক্তি, বয়ঃক্রমপরিপক্ক হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই অল্প অল্প আরম্ভ হয়। ইতর শ্রেণীর জীবগণমধ্যে অতি শৈশব কাল হইতেই আসঙ্গলিপ্সার প্রথম অঙ্কুর দেখিতে পাওয়া যায়। ইতর জীবের বংসগণ পরস্পরের পৃষ্ঠদেশে উঠিয়া খেলা করিতে থাকে। কিঞ্চিৎ বয়ঃক্রম বেশী হইলেই পুংজীব ও স্ত্রীজীবের মধ্যে কেমন একরূপ আশক্তিদৃষ্টিগোচর হয়। মনুষ্যগণও অসভ্যাবস্থায় ঠিক্ ইতর জন্তর ন্যায় ছিল। ক্রমে সভ্যতা, শিক্ষা ও সমাজ শাসন বৃদ্ধির সহিত তাহাদের আচরণ বিভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তত্রাচ বালক বালিকাদিগের আচরণ অতি সূক্ষ্ম চক্ষে দেখিলে উহাতে পশুভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। নৈতিক শাসন একটু শিথিল হইলেই বালক বালিকারা দম্পতীর ন্যায় আচরণ অভ্যাস করিতে থাকে। ইহাকে অনুকরণ বা শিক্ষা দোষ বলা যায় না। যেহেতু কোন ইতর জন্তুকে জন্মাইবা মাত্র অন্যান্য পশু হইতে তফাৎ করিয়া রাখিলেও ঐ প্রবৃত্তি আপনা হইতেই স্ফূরিত হইতে দেখা যায়। যেমন জীবগণ ভূমিষ্ঠ হইবা-মাত্র আপনা আপনিই স্তন খাইতে শিখে। জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে।

তবে সুসভ্য মনুষ্য বহুকালের শিক্ষা ও অভ্যাস বশতঃ তাঁহাদের স্বভাব অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছেন। এবং সে পরিবর্ত্তনও যতটা বাহিরে দেখা যায়, ভিতরে ভিতরে তাঁহারা ইতর জন্তু হইতে কোন অংশে বিভিন্ন নহেন। তবে শিক্ষা ও সমাজ শাসন সহকারে ইচ্ছার ও প্রবৃত্তির দমন-শক্তি বৃদ্ধি হইয়া মনুষ্যের আচরণ বিভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে। এত সুশিক্ষা, নৈতিক আলোচনা ও প্রবৃত্তিদমনশক্তি বৃদ্ধি হইলেও মনুষ্য সন্তান অতি অল্প বয়সে যেরূপ অসদুপায়ে জননেন্দ্রিয়ের পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, ইতর জন্তুগণমধ্যে তাদৃশ ব্যাপার কদাচিৎ লক্ষিত হয়। এই কদভ্যাস আরম্ভ হইয়া শরীর একবারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। মনুষ্য সভ্য হইয়া যেমন বাহ্যিকভাবে ইন্দ্রিয়দমনশক্তি দেখা-

ইয়া থাকেন, ভিতরে তেমনিই তাঁহারা কঠোর সমাজ বন্ধনবশতঃ স্বাভাবিক সুযোগাভ্যাস কৃত্রিম উপায়ে ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হন। জননশক্তি পরিচালনাপ্রবৃত্তি ইতর জন্তু ও সভ্য মনুষ্যমধ্যে একই প্রকারের। তবে ইতর জন্তুগণ ঐ প্রবৃত্তির বশীভূত হইলে স্বাভাবিক ভাবে তাহার পরিচালনা আরম্ভ করে। সভ্য মনুষ্য সামাজিক নিয়মে এমনিই আবদ্ধ যে স্বাভাবিকরূপে পরিচালনার সুযোগাভাবে অস্বাভাবিক অবলম্বন করেন। পশুগণ সুযোগ না পাইলে প্রবৃত্তি দমন ও তাহার উদ্বেগ সহ্য করিয়া থাকে। মনুষ্য বুদ্ধিমান্ জীব। সর্ব্বদা স্বীয় অভিলাষ ও অভাব পুরণ করিতে ব্যস্ত, এজন্য যে কোনউপায়েই হউক তাহার তৃপ্তিসাধনে অগ্রসর হন। বাস্তবিক মনুষ্য সভ্য হইয়া পশুর অপেক্ষাও কোন কোন বিষয়ে অধম হইয়াছে। মনুষ্য যখন পশুর অবস্থায় ছিল, তখন বোধ হয় কৃত্রিম উপায়ে ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করা কাহাকে কহে, তাহারা তাহা আদৌ জানিত না। পরে সমাজরক্ষণের সহিত তাহাদের স্বাভাবিক ভাবে ইন্দ্রিয়পরিচালনার সুযোগ বন্ধ হওয়ায় বুদ্ধিবলে এই অসীম অনিষ্টকর ও ঘৃণিত উপায়ের আবিষ্কার করিয়াছে।

এ পাপ যে কত দিন হইতে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা বলা যায় না; তবে বহু প্রাচীন কাল হইতে যে চলিয়া আসিতেছে তাহার সন্দেহ নাই। যতই সভ্যতা ও সুশিক্ষার বিস্তার হইতেছে, ততই এই রাক্ষসী করালবদনবিস্তার করিয়া [illegible] যুবকগণকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইতেছে। সভ্যতার বৃদ্ধি সহকারে মনুষ্যসন্তানগণ ন্যায্যভাবে ইন্দ্রিয় পরিচালনা মহাপাপ বোধ করিয়া অস্বাভাবিক উপায়ের আশ্রয় লইতেছেন। যতই মনুষ্যের বাহিরে বাহিরে সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি হইতেছে, ততই ভিতর ভিতর এই পাপের প্রশ্রয় হইতেছে। যে সকল যুবকগণ বাল্যবিবাহের এবং ইন্দ্রিয় সেবনের নাম শুনিলে কর্ণে হস্ত দেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে ইন্দ্রিয় দমনে অশক্ত হইয়া এই পাপের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। মনুষ্য সন্তান সভ্যতা ও শিক্ষা লাভের খাতিরে সময় উপস্থিত হইলেও বহু দিন পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তি পরিচালনার সুযোগ পান না, এজন্য পাঠার্থীদিগের মধ্যেই এই পাপ পূর্ণ মাত্রায় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কারণ স্বাভাবিক শারিরীক ক্রিয়া কয়জন লোকে নিরোধ করিতে পারে? এইরূপ ইন্দ্রিয়দমনশক্তি দুই একজনের থাকিলেও

সাধারণের থাকিবার সম্ভাবনা নাই। অপিচ ইন্দ্রিয় দমনশক্তি বহুচিন্তা ও একাগ্রতার ফল। এইরূপ চিন্তা ও একাগ্রতা শক্তি অপরিণত বয়স্ক-দিগের সম্ভবে না। তাহাদের মন যেন স্রোতে ভাসিয়া যায়। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয় দমনার্থ মনের যেরূপ প্রভূত বলের ও সংযমের দরকার, বয়স পরি-পক্ক না হইলে সে ক্ষমতা প্রায় উপস্থিত হয় না।

ক্রমশঃ—

বিবাহ-বিচার।

হিন্দু-শাস্ত্রীয়মতে।

হুজুকপ্রিয় বঙ্গদেশে হুজুকের আর ইয়ত্তা নাই। যখন যে হুজুক আইসে, দুঃখের বিষয় এই যে, তাহার তর্জ্জনগর্জ্জনে সে সময়টা এদেশে তিষ্ঠান ভার হইয়া উঠে। কিন্তু অমনি কিছু দিন পরে দেখ, সব্ই চুপ চাপ। যেন সে সম্বন্ধে একটী কথাও কখনও উঠে নাই। ফকিরের জল পড়া হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান গো-রক্ষণী ও ন্যাস্‌ন্যাল ফণ্ড পর্য্যন্ত রাশি রাশি হুজুকের বিষয় বেশ ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টতঃ প্রতীতি হয় যে, সর্ব্বত্র প্রায়ই গোলযোগ সার হইয়া থাকে। যাহা হউক, সেই রাশি রাশি হুজুকের মধ্যে আমাদের আলোচ্য বিবাহ বিচার ব্যাপারটী ও দিনকতক বেশ খরবেগে প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। কিন্তু জানি না কি কারণে এখন উহা একবারেই নির্ব্বাপিত হইয়াছে। যদিও এই নির্ব্বাণ স্বভাব সিদ্ধমতই হইয়াছে, তথাপি নাকি এত কাণ্ড-কারখানার পর আজ কাল আর একটু আধটুকুও সাড়া শব্দ নাই, তাই একথা বলিলাম। যাহা হউক, আমাদেরও অনেক দিন হইতে এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার বড়ই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বড় বড় হোমরা চোমরা লোকের গলা বাজির দ্বারা আমাদের এই অভিলষিত বিষয় সুসম্পন্ন হইবে বলিয়া মনে করিয়া এত কাল নিরস্ত ছিলাম, বিশেষতঃ আমাদের মত ক্ষুদ্র প্রাণীর অতি মৃদু আওয়াজ কেহ শুনিতে পাইবেন না, ইহাও এক ভয়ানক আশঙ্কা ছিল। ভাবিতাম ঢাকের কাছে ট্যাম্‌টেমে না বাজানই ভাল কিন্তু এখন সেই ঢাকের বাদ্য থামিয়াছে, সে হৈ চৈর আর বিন্দু

বিসর্গও নাই, সুতরাং এই উপযুক্ত অবসর। অক্ষম বলিয়া যতই মৃদু স্বরে বলি না কেন, অন্য কোন শব্দ নাই বলিয়া অবশ্যই আমাদের এই ক্ষীণ স্বর অনেকের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু এ সম্বন্ধে যে তুমুল আলোচনা হইয়া গিয়াছে, সেই সময় এক একটী সভামন্দির বক্তাগণের গভীর নিনাদে যেরূপ থরহরি কাঁপিয়াছিল, সে কথা মনে করিলে এখনও আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

সকলেই জানেন যে বোম্বাই সহরে সেই রুক্মা কেলেঙ্কারই এই বিবাহ-হুজুকের মূল-ভিত্তি। অর্থাৎ রুক্মার খুব্ বাল্যকালেই বিবাহ হয়। তিনি যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলে পর পূর্ব্ব স্বামী তখন আর তাঁহার মনে ধরিল না। নূতন মধুকরের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। জীবনযৌবন তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। সূর্য্যের পদ্মিণী ভ্রমরের হস্তগত হইল। তখন তপনদেব পরিতপ্ত হইয়া আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। ক্রমে তপনদেবের করজাল হিমাচল হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। দেশের সংবাদ পত্র সকল মাতিয়া উঠিলেন, ভারত প্রতিধ্বনিত হইল। অনন্তর সেই প্রতিধ্বনির শব্দ অপার সমুদ্র পার হইয়া বিলাতের কর্ণ বধির করিল। চতুর্দ্দিকেই "বিবাহ" "বিবাহ" এই রব উঠিল। যাঁহার যেরূপ ধীশক্তি, যেরূপ বাক্‌শক্তি, সেইরূপ, পথে, ঘাটে, মাঠে, সভায় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই ঐ আলোচনা। মনে করিলাম এবার নিশ্চয়ই একটা স্থির সিদ্ধান্ত হইবে, কিন্তু মনের আশা মনেই বিলীন হইল।

যাহা হউক, এখন দেখা যাউক যে, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বিবাহ সম্বন্ধে কিরূপ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এবং যুক্তিপথ অবলম্বন করিয়া সেই নিয়ম কত দূর সঙ্গত, তাহাও আলোচনা করা উচিত।

আয়ুর্ব্বেদ বলেন—

"চতুর্বিংশতিকঃ পুরুষো দ্বাদশবার্ষিকীং কন্যামুপযচ্ছেৎ।"

ইহার অর্থ—এই যে চব্বিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ দ্বাদশ বর্ষের কন্যাকে বিবাহ করিবেন। এদিকে স্মৃতিশাস্ত্রের প্রধাননেতা মনু বলেন—

"ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরম্॥"

ইহার অর্থ এই যে, ত্রিশ বর্ষবয়স্ক পুরুষ দ্বাদশ বর্ষের কন্যা এবং চব্বিশ বর্ষের পুরুষ, অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবেন। যদিও বচন-দ্বয়ের আপতত্তঃ পরস্পর বিরোধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে স্পষ্টতই উপলব্ধি হয় যে, উভয়বচনই সম্পূর্ণ সার্থক, কেবল স্থলবিশেষে যুক্তিমতে প্রয়োগকরাই উভয়ের উদ্দেশ্য।

এই জন্যই মহামহোপাধ্যায় চরক বলিয়াছেন যে,—

" নৈকান্তেন নির্দ্দিষ্টেঽপ্যর্থেঽভিনিবিশেদ্ বুধঃ ॥ "

ইহার অর্থ এই যে, একান্ত নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয়েই পণ্ডিতগণ স্থির-সিদ্ধান্ত বলিয়া অভিনিবেশ করিবেন না, অর্থাৎ যুক্তিমতে সমর্থন করিয়া লইবেন। সুতরাং উভয় বচনের সামঞ্জস্য, পশ্চাৎ প্রদর্শিত নিয়ম ও যুক্তি অবলম্বন করিয়া একতা সম্পাদন করিতে আমরা সাধ্যমত যত্ন করিব।

ক্রমশঃ—

আয়ুর্ব্বেদোক্ত—মারীভয়ের কারণ।

এক এক প্রদেশে এক সময়ে এক লক্ষণাক্রান্ত যে ভয়ঙ্কর ব্যাধি প্রাদু-র্ভূত হইয়া তৎপ্রদেশস্থ বহু সংখ্যক লোককে অকালে কালকবলিত করে, সেই দুরন্ত দেশব্যাপি-ব্যাধিকেই লোকে " মারীভয় " বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

ইহার অনিবার্য্য আক্রমণে কত পরিবার সমূলে সমুচ্ছিন্ন হইতেছে, কত জনকজননী জীবনের এক মাত্র অবলম্বন প্রাণাধিক পুত্রশূন্য হইয়া চিরজীবন গভীর আর্ত্তনাদে গগণ মেদিনী বিকম্পিত করিতেছে—কত শিশু, জনক জননীর অভাবে একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পরানুগ্রহে অতি-কষ্টে জীবন ধারণ করিতেছে--কত রমণী, এক মাত্র আশ্রয়-পতিশূন্য হইয়া উপায়াভাবে পরগৃহে পরপরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতেছে। ঈদৃশ দুরন্ত মারীভয়ের কারণনির্ণয়ার্থ বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ অনেক দিন যাবৎ বহু আয়াস, বহু চিন্তা ও বহু গবেষণা করিয়েছেন। এবং পর্য্যা-লোচনা ফলে যিনি যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়েছেন, তিনি তদ্রূপই তাহা প্রকাশ করিতেছেন।

এ বিষয়ে আমাদিগের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ কোন রূপ পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন কিনা, পর্য্যালোচনা করিয়া থাকিলে তাঁহারা কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, ইহা প্রদর্শনকরাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বহু শত বর্ষপূর্ব্বে চরকসংহিতার রচয়িতা মহামতি অগ্নিবেশ, তদীয় গুরু পরম বৈজ্ঞানিক মহর্ষি পুনর্ব্বসুর নিকটে একদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "ভগবন্! এক প্রদেশবাসী হইলেও পরস্পর বিভিন্ন প্রকৃতি, বিভিন্ন বয়ঃক্রম ও বিভিন্ন আহারাদি বিশিষ্ট মানবগণের কি কারণে একদা একই ব্যাধি সমুৎপন্ন হইয়া তৎপ্রদেশকে প্রায় জনশূন্য করে?"

তদুত্তরে সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মা পুনর্ব্বসু বলিলেন যে "বৎস অগ্নিবেশ! এক প্রদেশবাসী মানবগণের প্রকৃতি, বয়ঃক্রম ও আহারাদি পরস্পর অসমান হইলেও তত্রত্য বায়ু, জল, দেশ ও কাল, এই চতুর্ব্বিধ পদার্থ সকলের পক্ষেই সমান ক্রিয়াকারী ও সমান প্রয়োজনীয়।

সুতরাং সকলের পক্ষেই সমান ক্রিয়াকারী ও সমান প্রয়োজনীয় বায়ু, জল, দেশ ও কাল বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে তৎপ্রদেশবাসী সমস্ত লোকেরই তৎবিকৃতি জন্য ফল তুল্য রূপেই ভোগ করিতে হয়। অতএব বিকৃতি প্রাপ্ত বায়ু, জল, দেশ ও কাল এই চতুর্ব্বিধ পদার্থই দেশব্যাপি-মারীভয়ের কারণ।" (১)

উক্ত চতুর্ব্বিধ পদার্থ কিরূপ বিকৃতিপ্রাপ্ত হইলে দেশব্যাপি-মারীভয় সমুৎপাদন করে, তাহার লক্ষণ নিম্নে উল্লিখিত হইল।

বিকৃত বায়ুর লক্ষণ।

বায়ু বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে উহা অস্বাভাবিক ঋতুগুণযুক্ত, অতিশয় জলসিক্ত, অতিশয় চঞ্চল, অতিশয় পরুষ, অতিশয় শীতল অথবা অতি উষ্ণ,

(১) "—ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ। + × অপিতু খলু জনপদোদ্ধ্বংসনমেকেন ব্যাধিনা যুগপদসমানপ্রকৃত্যাহারদেহবলসাত্ম্যসত্ত্ববয়সাং মনুষ্যাণাং কস্মাদ্ভবতীতি, তমুবাচ ভগবান্ আত্রেয়ঃ। এবমসামান্যানামেভিরপ্যগ্নিবেশ প্রকৃত্যাদিভির্ভাবৈর্মনুষ্যাণাং যেহন্যে ভাবাঃ সামান্যাস্তদ্বৈগুণ্যাৎ সমানকালাঃ সমানলিঙ্গাশ্চ ব্যাধয়োহভিনির্ব্বর্ত্তমানা জনপদমুদ্ধ্বংসয়ন্তি। তেতু খল্বিমে ভাবাঃ সামান্যা জনপদেষু ভবন্তি—তদ্যথা বায়ুরুদকং দেশঃকাল ইতি। (চরকসংহিতা)

অতি রুক্ষ, অতিশয় অভিষ্যন্দী, অতি ভয়ঙ্কর শব্দযুক্ত, এবং বিভিন্ন দিক্ হইতে সমাগত বায়ুদ্বারা পরস্পর প্রতিহত গতি অথবা কুণ্ডলীভূতগতি ও অনিষ্টগন্ধযুক্ত এবং বাষ্প, সিকতা, ধূলি কিংবা ধূমসংযুক্ত হইয়া থাকে। ঈদৃশ বিকৃত বায়ুই মারীভয় সমুৎপাদক॥ ২॥

বিকৃত জলের লক্ষণ।

জল বিকৃত প্রাপ্ত হইলে উহা নিতান্ত অনিষ্ট গন্ধ, বর্ণ, রস ও স্পর্শ-যুক্ত এবং ক্লেদ বিশিষ্ট হইয়া থাকে, এবং উক্ত জলের স্বাভাবিক শৈত্য ও মাধুর্য্যাদি গুণের অভাব হওয়াতে উহা পানে নিতান্ত অপ্রীতিকর হইয়া থাকে, এবং উক্ত জলাশয় দিন দিন শুষ্ক হইতে থাকে, মৎস্য, কচ্ছপ প্রভৃতি জলচর প্রাণীগণ ও জলবিহারী পক্ষিসমূহ সহসা উক্ত জলাশয় পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করে। জলের এইরূপ বিকৃতি ঘটলেই উহা স্নানপানাদি কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া মারীভয় সমুৎপন্ন করে। (৩)

বিকৃত দেশের লক্ষণ।

দেশ (ভুমি) বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে উহা নিতান্ত অনিষ্ট গন্ধ, বর্ণ, রস ও স্পর্শযুক্ত এবং ক্লেদবহুলহয়। এবং উক্ত প্রদেশ সরীসৃপ, ব্যাল (সর্প) মশক, পতঙ্গ, মক্ষিকা, মূষিক, উলূক, (পঁ্যাচা) শ্মশানচারী শকুন ও শৃগালাদি দ্বারা নিতান্ত উপদ্রুত হয়। এবং তত্রত্য উপবন সমূহ বিবিধ তৃণ লতাদি দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠে। এবং অদৃষ্ট পূর্ব্ব পক্ষিসমূহ অন্য স্থান হইতে সহসা সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। শস্যসমূহ সহসা শুষ্ক ও বিনষ্ট হইয়া যায়, নিরন্তর ধূমযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। পক্ষিসমূহ ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া চতুর্দ্দিক সমাকুলিত করে, কুক্কুর সমূহ

২। তত্রবাতমেবংবিধমনারোগ্যকরংবিদ্যাৎ। তদ্যথা ঋতুবিষম-মতিস্তিমিতমতিচলমতিপরুষমতিশীতমত্যুষ্ণমতিরুক্ষমত্যভিষ্যন্দিনমতিভৈ-রবারাবমতিপ্রতিহতপরস্পরগতিমতিকুণ্ডলিনমসাত্ম্যগন্ধবাষ্পসিকতা পাংশু-ধূমোপহতমিতি। (চরকসংহিতা)

(৩) উদকন্তু খলু অত্যর্থবিকৃতগন্ধবর্ণরসস্পর্শবৎক্লেদবহুলমপক্রান্ত জলচর বিহঙ্গমুপক্ষীণজলাশয়মপ্রীতিকরমপগতগুণং বিদ্যাৎ।

(চরকসংহিতা।)

উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকে। মৃগ ও পক্ষিসকল ব্যথিতচিত্তে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে, তৎপ্রদেশবাসী লোকসমূহ ক্রমশঃ সত্য, ধর্ম্ম, লজ্জা ও সদাচার বর্জ্জিত হইয়া থাকে এবং তত্রস্থ জলাশয় সমূহ নিরন্তর সংক্ষোভিত ও উচ্ছলিত হইতে থাকে এবং প্রায়ই উল্কাপাত ও ভয়ঙ্কর শব্দসহ ভূমিকম্প হইতে থাকে--চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র সমূহ যেন অতিরুক্ষ, তাম্রবর্ণ, অরুণবর্ণ, বা শুভ্রবর্ণ মেঘ মণ্ডল দ্বারা সমাচ্ছন্ন বোধ হয়। কোন স্থানে সসম্ভ্রম উদ্বেগধ্বনি, কোন স্থানে ত্রাসিত ব্যক্তির আর্ত্তনাদ, কোন স্থানে যেন ভৌতিক বিকট চীৎকার ধ্বনি শ্রুত হইতে থাকে। দেশের অবস্থা এইরূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে উহা মারীভয় সমুৎপাদক হয়।

বিকৃত কালের লক্ষণ।

কাল বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে ঋতু বিপরীত লক্ষণ সমূহ উপস্থিত হয়। অর্থাৎ যে যে ঋতুর যেরূপ স্বাভাবিক লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার অভাব বা হীনতা, বা আতিশয্য সংঘটিত হইয়া থাকে। কালের এইরূপ বিকৃত ভাব, মারীভয়সমুৎপাদক। ৫

মহাত্মা পুনর্ব্বসু শিষ্যসমীপে পূর্ব্বোক্তরূপ মারীভয়ের কারণ বর্ণনা করিলে পরে তদীয় শিষ্য অগ্নিবেশ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন যে "ভগবন্! আপনি যে বিকৃতি প্রাপ্ত বায়ু, জল, দেশ ও কাল এই

---

(৪) দেশংপুনঃ প্রকৃতিবিকৃতিবর্ণগন্ধরসস্পর্শংক্লেদবহুলমুপসৃষ্টংসরীসৃপ-ব্যালমশকশলভমক্ষিকামুষিকোলুকশ্মশানিকশকুনি জম্বুকাদিভিস্তৃণো-লুপবনবন্তং প্রতানাদি বহুলমপূর্ব্ববদাপতিতং শুষ্ক নষ্টশস্যংধূম্রপবনং-প্রধ্মাতপতত্রিগণমুৎক্রুষ্টশ্বগণমুদ্ভ্রান্তব্যথিতবিবিধমৃগপক্ষিসঙ্ঘমুৎ সৃষ্টনষ্ট-ধর্ম্ম সত্যলজ্জাচারগুণজ নমেদং শশ্বৎ ক্ষুভিতোদীর্ণসলিলাশয়ং প্রত-তোল্কাপাত নির্ঘাত ভূমিকম্পং অতিভয়ারাবরূপং রুক্ষতাম্রারুণসিতাভ্র-জালসংবৃতার্কচন্দ্রতারকমভীক্ষ্ণং সসম্ভ্রমোদ্বেগমিব সত্রাসরুদিতমিব সতমস্ক মিব গুহ্যকাচরিতমিবাক্রন্দিত শব্দবহুলঞ্চাহিতং বিদ্যাৎ। চরক-সংহিতা।)

(৫) কালন্ত খলু যথর্ত্তুলিঙ্গাদ্বিপরীতলিঙ্গমতিলিঙ্গংহীনলিঙ্গঞ্চাহিতং বিদ্যাৎ॥ চরকসংহিতা।

চতুর্ব্বিধ পদার্থকে মারীভয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, কি কারণে উক্ত চতুর্ব্বিধ পদার্থের বিকৃতি সংঘটিত হয়, কৃপাপূর্ব্বক তাহা জানাইলে নিতান্ত অনুগৃহীত হইব।”

তদুত্তরে মহর্ষি পুনর্ব্বসু বলিলেন, “হে অগ্নিবেশ! জনপদবাসি-মানবগণের অধর্ম্মাচরণহেতুই বায়ু ও জলপ্রভৃতি পদার্থ বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব অধর্ম্মই উহার মূল।” (৬)

“যখন দেশের রাজা বা রাজপ্রতিনিধিগণ ধর্ম্মলঙ্ঘনপূর্ব্বক অধর্ম্মভাবে পরিচালিত হইয়া প্রজাশাসন করেন, তখন তদাশ্রিত প্রজা ও ব্যবহারাজীব (উকীল মোক্তার) সমূহও রাজদৃষ্টান্তানুসারী হইয়া ক্রমশঃ অধর্ম্মপথ অবলম্বন করে। দেশের রাজা ও প্রজা সমস্তই অধর্ম্মপরায়ণ হইলে সেই দেশও তদধিবাসিগণকে দেবতারাও পরিত্যাগ করেন। সুতরাং অধর্ম্মের বৃদ্ধি ও দেবতার তিরোধানহেতু সেই প্রদেশে সহসা ঋতুসমূহ ব্যাপন্ন (অস্বাভাবিক লক্ষণযুক্ত) হইয়া উঠে এবং পর্জ্জন্যদেবও যথাকালে বারিবর্ষণ করেন না, কদাচিৎ বর্ষণ করিলেও তাহা নিতান্ত বিকৃতিভাবাপন্ন দৃষ্ট হয়। বায়ু সম্যক্‌রূপে প্রবাহিত হয় না। ভূমির বিকৃতিভাব উপস্থিত হয়। জলাশয়ের জলরাশি বিশুষ্ক হইয়া যায়। খাদ্যদ্রব্য সমূহ স্ব স্ব স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া বিকৃতভাব ধারণ করে। সুতরাং উক্তপ্রকার দূষিত বায়ু ও জল প্রভৃতির সংস্পর্শ ও পানাহারাদিদ্বারা তৎপ্রদেশবাসি-জনসমূহের দুরন্ত মারীভয় সমুপস্থিত হইয়া জনপদমণ্ডলকে একেবারে সমুধ্বংস করে।” (৭)

---

(৬) ইতি শ্রুত্বা জনপদোদ্ধংসনে কারণান্যাত্রেয়স্য ভগবতঃ পুনরপি ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ। অথ খলু ভগবন্ কুতো মূলমেষাং বায়্বাদীনাং বৈগুণ্যমুৎপদ্যতে যেনোপপন্না জনপদমুদ্ধংসয়ন্তীতি॥ তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ সর্ব্বেষামগ্নিবেশ বায়্বাদীনাং যদ্বৈগুণ্যমুৎপদ্যতে তস্য মূলমধর্ম্মস্তন্মূলঞ্চা সৎকর্ম্মপূর্ব্বকৃতং তয়োর্যোনিঃ প্রজ্ঞাপরাধএব॥ (চরকসংহিতা)

(৭) তদ্‌যথা—যদা দেশনগরনিগমজনপদপ্রধানা ধর্ম্মমুৎক্রম্যাধর্ম্মেণ প্রজাং বর্ত্তয়ন্তি। তদাশ্রিতোপাশ্রিতাঃ পৌরজানপদাব্যবহারোপজীবিনশ্চ তমধর্ম্মমভিবর্দ্ধয়ন্তি। ততঃ সোঽধর্ম্মঃ প্রসভং ধর্ম্মমন্তর্ধত্তে ততস্তেঽন্তর্হিতধর্ম্মাণো দেবতাভিরপি ত্যজ্যন্তে। তেষাং তথান্তর্হিতধর্ম্মাণামধর্ম্মপ্রধানা-

মারিভয়-সমুৎপাদক পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ পদার্থমধ্যে দুষ্পরিহার্য্যত্বহেতু বায়ু অপেক্ষা জল ও জল অপেক্ষা দেশ এবং দেশ অপেক্ষা কাল উত্তরোত্তর অধিকতর দোষাবহ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। (৮)

আর্য্যঋষিগণ শস্ত্রজনিত-মারীভয়কেও (যুদ্ধ বিগ্রহাদিদ্বারা এক সময়ে বহু লোকের বিনাশকে) অধর্ম্মসম্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যখন রাজা বা রাজপ্রতিনিধিগণ অতি দুরন্ত লোভ, ক্রোধ ও অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যায় পূর্ব্বক দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে আক্রমণ করেন, কিম্বা পুর্ব্বোক্তকারণেই অন্য প্রবল ব্যক্তিকর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হন, তখন তদাশ্রিত লোকসমূহও স্ব স্ব প্রভুর সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়া অধর্ম্মকার্য্যে সংলিপ্ত হয়। সুতরাং রাজা এবং তদাশ্রিত প্রজাসমূহ ন্যায়পথভ্রষ্ট হইয়া উক্তরূপ অধর্ম্মাচারী হইলে অগৌণে দেশমধ্যে শস্ত্রজনিত মহামারী উপস্থিত হইয়া থাকে। (৯)

বহুশতাব্দী পূর্ব্বে সূক্ষ্মদর্শী আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ যে চতুর্ব্বিধ পদার্থকে মারীভয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা উপরে স্থূলভাবে উল্লিখিত হইল। সত্যানুসন্ধিৎসু বিজ্ঞ পাঠকগণ নিবিষ্টচিত্তে উহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে, উক্ত চতুর্ব্বিধ পদার্থমধ্যেই সমস্ত মারীভয়-বীজ সম্যক্ নিহিত রহিয়াছে। সুতারং প্রাচীন আর্য্যদিগের নির্দ্দেশ

নামপক্রান্তদেবতানামৃতবো ব্যাপদ্যন্তে। তেন নাপো যথাকালং দেবো-বর্ষতি বিকৃতং বা বর্ষতি। বাতা ন সম্যগভিবান্তি। ক্ষিতির্ব্যাপদ্যতে সলিলান্যুপশুষ্যন্তি। ওষধয়ঃ স্বভাবং পরিহায়াপদ্যন্তে বিকৃতিং। ততঃ উদ্ধ্বংসন্তে জনপদাঃ স্পর্শাভ্যবহার্য্যদোষাৎ॥ (চরকসংহিতা)

(৮) বৈগুণ্যমুপপন্নানাং দেশকালানিলাম্ভসাং। গরীয়স্ত্বং বিশেষেণ হেতুমৎ সম্প্রবক্ষ্যতে। বাতাজ্জলং জলাদ্দেশং দেশাৎ কালং স্বভাবতঃ। বিদ্যাদ্দুষ্পরিহার্য্যত্বাদ্গরীয়স্তরমর্থবিৎ॥ (চরকসংহিতা)

(৯) তথা শস্ত্রপ্রভবস্যাপ্যধর্ম্ম এব হেতুর্ভবতি, তেঽতিপ্রবৃদ্ধলোভ-ক্রোধমানা দুর্ব্বলানবমত্য আত্মস্বজনপরোপঘাতয়ে শস্ত্রেণ পরস্পরমভিক্রামন্তি, পরান্ বাভিক্রামন্তি পরৈর্ব্বাভিক্রাম্যন্তে রক্ষোগণাদিভির্ব্বা বিবিধৈর্ভূতসঙ্ঘৈস্তমধর্ম্মমন্যদ্বাপ্যপচা[illegible]॥ (চরকসংহিতা)

যে,অভ্রান্ত ও অখণ্ডনীয়, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। কিন্তু সমধিক বিস্ময় ও দুঃখের বিষয় এই যে, যখন অন্যান্ত দেশ ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, সেই স্মরণাতিগ কালে পর্ণকুটীরবাসী ফলমূলাশী আর্য্যঋষিগণ যে সমস্ত সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং সন্দিগ্ধবিষয়ের মীমাংসায় যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান সভ্যতালোকসম্পন্ন উন্নতিশীল বৈজ্ঞানিকগণ অনেকবিষয়ে বহু পর্য্যালোচনার পরে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই সত্য ও সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতেছেন। তথাপি প্রাচীন আর্য্যগণ অসভ্য ও তাঁহাদিগের গ্রন্থ অবৈজ্ঞানিক এবং আধুনিক পণ্ডিতগণ সভ্য ও তাঁহাদিগের গ্রন্থ বৈজ্ঞানিক! কালমাহাত্ম্যে সকলই শোভা পায়।

বিক্রমপুর,
ঢাকা। } কবিরাজ শ্রীহরিমোহন দাসগুপ্ত।

সম্পাদকীয়মন্তব্য।

পাঠকগণের বোধহয় স্মরণ থাকিতে পারে যে, ইতিপূর্ব্বে আমরা ৪র্থ খণ্ড সম্মিলনীতে বৈদ্যমতে পুরাতন জ্বর লিখিবার সময় ম্যালেরিয়া প্রভৃতির কারণস্বরূপ দূষিত জলবায়ু সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছিলাম। কিন্তু বড় আহ্লাদের বিষয় এই যে, পণ্ডিতবর সম্মিলনীর সুযোগ্যলেখক হরিমোহনবাবু আজ্ সে বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণের কৌতূহল চরিতার্থ করিলেন। চি, স, স,

---

লিভর বা যকৃৎবিবৃদ্ধি

বাল্যাবস্থায়।

অস্মদেশে দিন দিন এই রোগের আধিক্য দেখিয়া এই রোগসম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ অনেক চিকিৎসকদ্বারা কলিকাতা চিকিৎসকমণ্ডলীর সভার গতবার্ষিক অধিবেশনে পাঠ করা হয়.; মহাশয় আপনকার পাঠকবর্গের গোচরার্থে আমি তাহার সারাংশ এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিব। দিন দিন যে এই রোগের বৃদ্ধি হইতেছে, ইহা সকল চিকিৎসকেই বিদিত আছেন এবং বাল্যাবস্থায় যে এই রোগ অত্যন্ত মারাত্মক, তাহাও বোধ হয় কাহারও

অবিদিত নাই। অনেক মাতা ক্রমে ক্রমে ৫।৬ টী পুত্রকে এই রোগে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। আমাদের পরিবারমধ্যে কোন বালকের লিভর হইয়াছে, ইহা শুনিলেই বন্ধুবর্গ একেবারে হতাশ্বাস হয়েন। বালকদিগের পক্ষে উহা এরূপ দুঃশ্চিকিৎস্য রোগই বটে। কয়েকটী সভায় অধিবেশনে এই বিষয়ের কোন মীমাংসা হয় নাই। সর্ব্বসাধারণে ইহা অবগত আছেন যে, ইহা একপ্রকার যকৃতের বিবৃদ্ধি, কিন্তু উহা যে কি প্রকার বিবৃদ্ধি, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। ডাক্তার গিবন্স্ বলেন (Biliary cirrhhosis) পিত্তপ্রণালীসম্ভূত যকৃতের আয়তনের হ্রাস, এই হ্রাস হইবার পূর্ব্বে যে আয়তন বিবৃদ্ধি, ইহা তাহাই। প্রকৃতির নিয়ম সর্ব্বত্র সমান; হ্রাস, বৃদ্ধিকে ও বৃদ্ধি, হ্রাসকে অনুগমন করে; কিন্তু এই বিষয়ে বহুতর মতভেদ আছে। তিনি বলেন যে মেদবিবৃদ্ধি (Fatty Hypertrophy) বা শ্বেতসার বিবৃদ্ধি (Amylyd Hypertrophy) নহে এবং ইহা তিনি একপ্রকার প্রমাণ করিয়াছেন।

চিকিৎসাসম্বন্ধেও তিনি নিজমত প্রকাশ করেন যে, রোগীকে পারদ সেবনের দ্বারা মুখ আনাইলে আরোগ্য হইবার সম্ভব। আমরা বলিতে পারি না ডাক্তার গিবন্সের চিকিৎসা কিরূপ ফলপ্রদ হইবে। এবং ভরসা করি হইতেও পারে, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা উহা গ্রহণে অসমর্থ। ঐ চিকিৎসাপ্রণালী এখন এতদূর প্রশস্ত নহে, যাহাতে আমরা উহা আদর্শ করি। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা যে এ রোগে শুভ ফলপ্রদ নহে, ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। এইজন্য আমি আপনকার পাঠক কবিরাজগণকে এই চিকিৎসাসম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমি ক্রমান্বয়ে এই রোগের নানাপ্রকার রূপভেদ, স্থিতি ও পরিণাম যতদূর সাধ্য প্রকাশ করিব, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইব বলিতে পারি না। এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসার কতকটা আদর্শও দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। এখন প্রথমতঃ কয়েকটী অপরাপর বিষয় এই রোগসম্বন্ধে লিখিতেছি। এই রোগ ইংরাজ কিম্বা ফিরিঙ্গিদিগের সন্তানগণ মধ্যে অতি বিরল। এমন কি ডাক্তার ম্যাক্লিওড্ সাহেব বলেন যে, প্রায় দেখা যায় না। আর আমি প্রায় নয় বৎসরকাল কলিকাতার চিকিৎসালয়ে চিকিৎসা করিতেছি, কিন্তু গরিবদিগের সন্তানগণমধ্যে ইহা প্রায় পাওয়া যায় না। প্লীহাবিবৃদ্ধি ইহাদিগের মধ্যে অনেক কিন্তু লিভর বা

যকৃৎ বিবৃদ্ধি কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা কেবল আমাদিগের বড়-মানুষ ও মধ্যশ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের সন্তানমধ্যে দৃষ্ট হয়। একএক পরিবার মধ্যে ক্রমান্বয়ে সকল সন্তানগণ প্রায় এই রোগে বিনষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে, মাতা প্রতিবৎসর সন্তান প্রসব করিতেছেন এবং সন্তানগণ অত্যন্ত দুর্ব্বল ও ক্ষীণ, কিন্তু একটীরও লিভরের কোন দোষ হয় নাই। এই কারণ নির্দ্দেশ করা অত্যন্ত কঠিন। কলিকাতার কোন সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক বলেন যে, মাতার অম্লপীড়াজনিত দূষিত দুগ্ধপানে সন্তানগণের এই রোগ জন্মিতে পারে। আমার বোধহয় বালকদিগকে ঘৃতপক্ক বাজারসম্ভূত মিঠাই খাওয়ান একটা কারণ বটে, কিন্তু সেটা শিশুগণের পক্ষে নহে। আমা-দের দেশের পূর্ব্বপ্রথানুসারে মুড়ি মুড়কি জলপান এখন একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। কারণ সুসভ্য গৃহস্থের মতে উহা ছোটলোকের খাদ্য। আর মাতাগণ সন্তান মোটা করিবার জন্য অধিক পরিমাণে দুগ্ধ দেওন ইহার একটা কারণ, শিশু উহা পরিপাক করিতে পারুক বা না পারুক, মাতা ভাবেন যে ২।৩ সের দুগ্ধের কমে শিশু মোটা হইতে পারে না। এই বিশ্বাস এখনও অনেক প্রসূতির মধ্যে আছে। ইহা ব্যতীত পুনঃ পুনঃ অপত্যোৎ-পাদন প্রভৃতি যে সকল কারণ মাতার শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর, তদ্দ্বারা শিশুগণের যে বিশেষ ক্ষতি হইবে, ইহাও বলা বাহুল্য। কি বয়সে এই রোগ হয় দেখিতে গেলে ইহা প্রায় দেখা যায় যে, আট মাস হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্তই অধিক। কিন্তু তৎপূর্ব্বে বা পরে এই রোগ অতি অল্পমাত্রায় দেখা যায়। আর শিশুগণকে বেড়াইতে না দিয়া অনবরত কোলে রাখাও এই রোগের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী বিশেষ কারণ বলিয়া আমার বিশ্বাস।

বাহুরবাগান-গবর্ণমেণ্ট হাঁসপাতাল, কলিকাতা। } শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত এম, বি।

সম্পাদকীয়মন্তব্য।

লেখক মহাশয়ের ইতিপূর্ব্বে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে লিখিত "আর্য্যচিকিৎসা-গ্রন্থের মাহাত্ম্য" নামক প্রবন্ধ বোধহয় এখনও পাঠক মহাশয়গণ ভুলিয়া যান নাই। এলোপ্যাথিমতের চিকিৎসক হইয়া এলোপ্যাথি চিকিৎসায়

মন্ত্র লইয়া বিশেষতঃ আবার গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক চিকিৎসাকার্য্যে একজন বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী হইয়াও তিনি স্বাধীনভাবে কেবলমাত্র একটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যেরূপ আর্য্য আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রীয় গ্রন্থের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যথার্থই অপার আনন্দের কথা। অতএব আশা করি যে, লেখক মহাশয় উপস্থিত প্রবন্ধটীও সেইরূপ স্বাধীনভাবে আদ্যোপান্ত লিখিয়া পূর্ব্ববৎ সৎসাহসের সম্পূর্ণ পরিচয় দিবেন। আর তাঁহার ইচ্ছামত কবিরাজী ও হোমিওপ্যাথিকমতেও যাহাতে সুযোগ্য লেখক কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে লিখিত হয়, তৎপক্ষে আমরাও অবশ্য যত্নের ত্রুটী করিব না। ফলতঃ উপস্থিত বিষয়টী যে, কবিরাজী প্রভৃতি ত্রিবিধমতেই বিশেষ যোগ্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে আলোচিত হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য, তৎপক্ষে আর কোন সন্দেহই নাই। চি, স, স।

ঔষধপ্রস্তুত ও প্রয়োগ-প্রণালী।

(কবিরাজীমতে)

জ্বরাধিকার।

পূর্ব্বপ্রকাশিত সর্ব্বতোভদ্রের শেষ।

হিঙ্গুল হইতে রস অর্থাৎ পারদ আকর্ষণের অন্যতম অথচ সহজ উপায় বলা গেল। আকৃষ্টরস বিশুদ্ধ রূঢ়ধাতু। বিশুদ্ধিতা এবং রূঢ়ত্বসত্বেও ইহা নপুংসক সুতরাং নির্বীর্য্য। প্রক্রিয়াবিশেষদ্বারা ইহার নপুংসকদোষ নষ্ট করিয়া লইতে হয়, নতুবা ইহার বীর্য্যাধান হয় না। নির্বীর্য্য পারদের রোগনাশক শক্তি থাকে না।

যে প্রক্রিয়াদ্বারা পারদের নপুংসকদোষ নিরাকরণ করা যায়, তাহার নাম বোধন। বোধনের প্রক্রিয়া এইরূপ ;—

চারিসের জলে অর্দ্ধসের সৈন্ধবচূর্ণ গুলিয়া একটী স্থালীতে রাখিয়া দিবে। তারপর হিঙ্গুলাকৃষ্ট রস ভূর্জ্জপত্রে বাঁধিয়া লইবে। রস ভূর্জ্জপত্রে বাঁধিবার পূর্ব্বে পত্র জলে সিক্ত করিয়া লইবে। হাঁড়ীমুখে একখানা কাটী

আড়ভাবে রাখিয়া দিয়া একগাছি সূত্রদ্বারা ঐ রসবদ্ধ পোট্টলী ঝুলাইয়া দিবে। পোট্টলী জলমধ্যে নিমগ্ন থাকিবে অথচ হাঁড়ীর তলদেশ স্পর্শ করিবে না। তারপর ঐ হাঁড়ী চুল্লীতে চড়াইয়া ১ একপ্রহারকাল যাবৎ মৃদু অগ্নিতে জাল দিবে। তারপর পোট্টলী হইতে রসগ্রহণ করিয়া নির্জ্জল করিয়া পুনর্ব্বার পুরুকাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে।

নাগকেশর ;—বসন্তকালে নাগকেশর ফুল ফুটে। এই সময়ে বৃক্ষ হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া লইবে ; তলায় পড়াফুল গ্রহণ করিবে না। সংগৃহীত পুষ্পের সর্ব্বাবয়ব পরিত্যাগ করিয়া কেশরগুলি পৃথক্ করতঃ রৌদ্রে বেশ করিয়া শুকাইবে। তারপর আবৃত পাত্রমধ্যে রাখিয়া দিবে। প্রয়োজনমত এই কেশরচূর্ণ করিয়া ঔষধার্থ ব্যবহার করিতে হয়। বাজারে যে নাগকেশর ফুল বিক্রয় হয়, তার গন্ধ ও বর্ণ কিছুই থাকে না, সুতরাং উহা ঔষধের কাজে লাগান অকর্ত্তব্য।

তালীশপত্র ;—বাজারে যে তালীশপত্র বিক্রয় হয়, তাহাতে পাতাও থাকে, ডাঁটাও থাকে। ডাঁটাগুলি বাছিয়া ফেলাইয়া দিয়া পাতাগুলি গ্রহণ করিবে। এই পাতার মিশলেও কাঁকরাদি থাকে, তাহাও বাছিয়া বেশ করিয়া পরিষ্কার করিয়া লইবে।

ক্রিয়া ও প্রয়োগপ্রণালী ;—সর্ব্বতোভদ্র জ্বরের ভাল ঔষধ। নবজ্বরে প্রয়োগ হয় না ; মধ্য ও পুরাতনজ্বরে প্রয়োগ করা গিয়া থাকে। ইহার প্রয়োগে কফস্রাবণ সংযমিত হয় ; ক্রতশ্লেষ্মা সহজে নিঃসৃত হয় বা পরিপাক পায় ; এজন্য কাসসংযুক্ত জ্বরে সর্ব্বতোভদ্র বিশেষ উপকারী। এই ঔষধ কুপিত কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর অনুলোমক, পাচক এবং ক্লেদনাশক ও শ্লেষ্মার অস্বাভাবিক ক্ষতিরোধক। এইজন্য বিবিধ অজীর্ণ সংযুক্তজ্বরে সর্ব্বতোভদ্রপ্রয়োগে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

জ্বরাবস্থায় শোথ দেখা দিলে সর্ব্বতোভদ্র প্রয়োগে উপকার দর্শে।

উদকমেহ সংযুক্তজ্বরে এই ঔষধ বিশেষ ফলদায়ক।

কাসসংযুক্তজ্বরে ছাঁচিপানের পাতার রস ২ তোলা, পৈপুলচূর্ণ ২।৩ রত্তি এবং সিকিতোলা মধুর সহিত মাড়িয়া সেবন করাইবে। অথবা ব্রহ্মীশাকের রস ও মধুযোগে সেবন করিতে দিবে।

অজীর্ণসংযুক্ত জ্বরে অজীর্ণের অবস্থা বুঝিয়া অনুপান কল্পনা করিতে হয়।

শোথসংযুক্ত জ্বরে কুলিকাশাকের পাতার রস এবং মধুর সহিত সেব্য।

জ্বরে প্রস্রাবের আধিক্য থাকিলে অড়লের পাতার স্বরস ও মধু সহিত সেবনের ব্যবস্থা করিবে।

এই ঔষধ আবশ্যক বুঝিয়া দিবসে ২।৩ বার প্রয়োগ করা যায়।

ক্রমশঃ—

মাগুরা,
বারুইপাড়া, খুলনা। } শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন কবিরাজ।

তৈলপাক ও প্রয়োগ-প্রণালী।

কল্ক ও কাথপাকসম্বন্ধে দুইটী কথা।

মূর্চ্ছাপাকের পরেই ঘৃত ও তৈলে কাথ এবং কল্কপাক দিতে হয়। কিন্তু কাথ বা কল্কপাকসম্বন্ধে বৈদ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে একটী বিশেষ মতভেদ প্রচলিত আছে। অর্থাৎ কতকগুলি বৈদ্যচিকিৎসকের এসম্বন্ধে মত এই যে, মূর্চ্ছাপাকের পরেই তৈলে কল্কপাক দিয়া পরে যথালিখিত কাথাদি প্রদান করিবে। এবং সর্ব্বশেষে কল্ক ছাকিয়া ফেলিয়া দিয়া দুগ্ধাদিদ্বারা পাক শেষ করিবে। আর অন্য সম্প্রদায়ের মত এই যে, মূর্চ্ছাপাকের পরেই অগ্রে কাথাদিদ্বারা পাক করিয়া তার পর কল্ক ও দুগ্ধাদিদ্বারা পাক সমাধা করিবে। কিন্তু যেখানে কেবল কল্কপাকদ্বারা পাক নিষ্পন্নের কথা আছে, সেখানে অবশ্য মতদ্বৈধের কোন সম্ভাবনাই নাই। ফলতঃ এই মতভেদ কথাটী নিতান্ত হাসিয়া উড়াইবার যোগ্য নহে বিবেচনা করিয়া আমরা এসম্বন্ধে আজ্ কিছু লিখিতেছি। আশা করি যে, সম্মিলনীর উপযুক্ত লেখক ও পাঠকবর্গেরদ্বারা অবশ্যই ইহার প্রকৃত মীমাংসা হইতে পারিবে।

বঙ্গদেশে সাদারণতঃ দুই শ্রেণীর বৈদ্যচিকিৎসক আছেন, এক পূর্ব্বদেশীয়, অপর কলিকাতা ও বর্দ্ধমান আদি স্থানীয়। আমি নিজে পূর্ব্বদেশীয় হইলেও আমার উক্ত উভয় দেশস্থ চিকিৎসকেরই মতামত অনেকটা জানা আছে। কেবল তৈলঘৃতের পাক বলিয়া নহে। অশ্বগন্ধাপ্রভৃতি কতক-

গুলি অত্যাবশ্যকীয় ও সচরাচর ব্যবহার্য্য ঔষধের সত্যাসত্য-নির্ব্বাচন সম্বন্ধেও উক্ত উভয়সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে কথা পরে বলিব। আপাততঃ তৈলপাকসম্বন্ধে যাহা প্রথমেই তুলিয়াছি, সেই সম্বন্ধেই কিছু বলিতেছি।

মনে কর বৃহন্মাষতৈল (সচরাচর যাহাকে সপ্তপ্রস্থ মহামাষতৈল বলে) পাক করিতে হইবে অগ্রে ৪ সের অথবা আবশ্যকমত খাঁটী কৃষ্ণতিলের তৈল প্রথমে কটা ও মূর্চ্ছাপাক করিয়া লইয়া তার পর ইহাতে বেড়েলা, রাস্না ও দশমূলাদিদ্রব্যের কাথ এবং রাস্নাদিদ্রব্যের কল্ক ও দুগ্ধ প্রদান করিয়া পাকশেষ করিবে। এখন কথা এই যে, তৈলের মূর্চ্ছাপাকের পরেই উহাতে কল্কদ্রব্য প্রদান করিয়া ক্রমে ক্রমে কাথ ও দুগ্ধাদির পাক করা উচিত? অথবা প্রথমে কাথদ্বারা পাক করিয়া পরে কল্ক এবং দুগ্ধ পাকদ্বারা তৈল নিষ্পন্ন হওয়া উচিত? বলা বাহুল্য যে, এই উপস্থিত প্রশ্নটীর সম্যক্ মীমাংসার অভিলাষে আমি সাধারণের নিকট ইহার প্রস্তাব করিলাম। আশা করি সম্মিলনীর সুযোগ্য ও বহুদর্শী লেখক ও পাঠক কবিরাজ মহোদয়গণ আগামীবারে অতি সঙ্ক্ষেপে এসম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইবেন; এবং সম্পাদক মহাশয়ও এবিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করেন, ইহাও প্রার্থনীয়। আর এসম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহাও আগামীবারে বলিব। ক্রমশঃ—

কলিকাতা। ভাদ্র } শ্রীজগদ্বন্ধু সেনগুপ্ত কবিরাজ।

সম্পাদকীয়মন্তব্য।

লেখকের প্রস্তাবিত প্রশ্নটী বেশ সঙ্গত বলিয়াই বোধ হইল। অতএব এসম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য শেষ হইলে অবশ্যই আমাদের মন্তব্য প্রকাশিত হইবেক।

এলোপ্যাথিকমতে

জ্বরচিকিৎসা। *

ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার বা সবিরামজ্বর।

(৪র্থ খণ্ডে প্রকাশিত ৩১৯ পৃষ্ঠার পর)

বিরাম-অবস্থা।

সবিরাম জ্বরে অনেক সময়তে বিরাম অবস্থায় যকৃতের উপর চাপিলে অল্পপরিমাণে বেদনার অনুভব হয়। আর কথন বিরাম অবস্থাতে মস্তকের বেদনা সম্পূর্ণরূপে রোগীকে পরিত্যাগ করে না। উপরোক্ত দুই অবস্থায় জ্বরের বিরাম সত্বেও কুইনাইন প্রয়োগ করিলে জ্বরের পুনরাগমন বন্ধ হয় না। একারণ শারীরিক ঐ দুই গ্লানির উপশম না করিয়া জ্বরের বিরাম-সত্বেও কুইনাইন প্রয়োগ করা উচিত নহে।

যদি সবিরামজ্বরে যকৃতে প্রদাহ না থাকিয়াও ন্যাবা বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে এরূপ স্থলে জ্বরের বিরাম হইলেও কুইনাইন্দ্বারা কোনরূপ ফল পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় প্রথমতঃ ন্যাবার চিকিৎসা করিয়া যকৃতের স্বাভাবিক অবস্থা উপস্থিত হইলে কুইনাইনের প্রয়োগে জ্বরনিবারণ হয়। এই রকম ন্যাবা দুই কারণে উৎপন্ন হইতে পারে। প্রথমতঃ যকৃতের পিত্ত উৎপাদন ক্রিয়ার অল্পতা কিম্বা ধ্বংসতা; আর দ্বিতীয়তঃ যকৃতের পিত্ত উৎ-পাদনের পর নিঃসারণক্রিয়ার ব্যাঘাত। যকৃতের ক্রিয়ার অল্পতা বা ধ্বংসতা প্রভৃতি যে সকল কারণে ন্যাবার উৎপত্তি হইতে পারে, এস্থলে আর তাহার বিস্তৃত বিবরণের আবশ্যক করে না। তবে সাধারণের বুঝিবার জন্য এস্থলে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।

প্রথমতঃ ম্যালেরিয়া ফীবার অর্থাৎ জ্বরে অনেক সময়ে শরীরের আভ্য-

---

* এই প্রবন্ধ কোন গ্রন্থবিশেষ হইতে অনুবাদিত নহে। ডাক্তার জগবন্ধু বাবু বহুকাল হইতে সহস্র সহস্র রোগীর চিকিৎসা করিয়া চিকিৎসা-সম্বন্ধে তাঁহার বহুদর্শন-জনিত যে জ্ঞান জন্মিয়াছে, লম্বা চৌড়া ও ভাষার আড়ম্বর না করিয়া অতি সংক্ষেপে কেবলমাত্র তাহাই লিখিলেন। চি, স, স।

স্তরিক যন্ত্রসমূহে কন্‌জেস্‌সন্ বা রক্তাধিক্য হইয়া থাকে। লিবার বা যকৃতেও এই কারণবশতঃ রক্তাধিক্য হয়। আর কোন যন্ত্রে রক্তাধিক্য হইলে তাহার ক্রিয়া সাধারণতঃ সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয় না। সুতরাং পিত্তনিঃসরণ ক্রিয়ারও অল্পতা ঘটে। একারণবশতঃ রক্ত হইতে সমুদায় পিত্তের অংশ যে পরিমাণে বহির্গত হওয়া উচিত ছিল, তাহা না হওয়াতেই ক্রমে ক্রমে পিত্তের অংশ রক্তেতে অধিকপরিমাণে জমিতে থাকে এবং শেষে সমুদায় শরীরে রক্তের দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া ন্যাবার উৎপত্তি করে। ইহাদ্বারাই বিশেষরূপে জানা গেল যে, পিত্তের অল্পতা ঘটিলেই যখন এইরূপ ন্যাবার উৎপত্তি হইতে পারে, তখন যকৃতের কোষময় অংশ (যাহারা পিত্তকে রক্ত হইতে বাহির করিয়া লয়) কোনও কারণবশতঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের পিত্তকে রক্ত হইতে পৃথক্‌করণশক্তি যে ঐ সঙ্গে ধ্বংস হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। সুতরাং শরীরের সমুদায় পিত্তের অংশ রক্তে ক্রমাগত জমিয়া ও তাহাদ্বারা সমুদায় শরীরে সঞ্চালিত হইয়া গাঢ়রূপে ন্যাবা জন্মায়। শেষোক্ত কারণবশতঃ ন্যাবা ঘটিলে চিকিৎসকের অসাধ্য হইয়া উঠে।

দ্বিতীয়তঃ পিত্ত উৎপাদনের নিঃসরণক্রিয়ার ব্যাঘাত হইলে ন্যাবা উৎপন্ন হইতে পারে। এই নিঃসরণক্রিয়া সম্পূর্ণরূপেই হউক, অথবা তদপেক্ষা কমপরিমাণেই হউক্, উভয়কারণেতেই পিত্ত পুনর্ব্বার শরীরে শোষিত হইয়া রক্তস্রোতের সহিত মিশ্রিত হয়। পরে ঐ রক্তদ্বারা সমুদায় শরীরে সঞ্চালিত হইয়া ন্যাবা উৎপাদন করে।

যে কারণেই ন্যাবা উৎপন্ন হউক্ না কেন, সকল ন্যাবাতেই বিবমিষা বা বমনেচ্ছা সতত বর্ত্তমান থাকে ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা আর একটী প্রধান উপসর্গ বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। এ অবস্থায় বিরেচন ক্রিয়ারদ্বারা যে ন্যাবার বিলক্ষণ উপকার দর্শে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু রোগীর বিবমিষা বা বমনেচ্ছা থাকার দরুণ অনেক সময় বিরেচক ঔষধ সকল আমাশয়ে স্থায়ী না হইয়া বমন হইয়া যায়। অতএব বিরেচক ঔষধ দিতে হইলে বটীকা কিম্বা চূর্ণাকারে অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিবে। যেহেতু দ্রবাকারে অর্থাৎ তরল অবস্থায় এবং অধিকপরিমাণে বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিলে কখনই তাহা উদরে অবস্থিতি করে না। আর যদি বিরেচক ঔষধ সকল বটীকা কিম্বা চূর্ণাকারে অল্পমাত্রাতেও বমন হইয়া যায়, তবে

সে স্থলে আর বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া অগ্রে যাহাতে বিবমিষা বা বমনেচ্ছা দূরীভূত হয়, তৎপক্ষে বিশেষ চেষ্টা করিবে। এই বিচমিষা নিবারণের জন্ত আমি সচরাচর নিম্নলিখিত পিস্কৃপ্‌সন্ ব্যবহার করি। যথা—

স্যাইট্রী কৃয়্যাসিড্— ১০ গ্রেণ।

মিউরিয়েট্ অব্‌য়্যামোনিয়া বা নিশাদল ৫ হইতে ১০ গ্রেণ।

জলমিশ্রিত হাইড্রোসাইয়্যানিক্ য়্যাসিড্ ২ ফোটা হইতে ৪ ফোটা।

নাইট্রী কৃঈথার— অর্দ্ধড্রাম।

গোলাপজল কিম্বা অপর কোনও সুগন্ধি জল— ১ আউন্স

এই সমস্ত একত্রে মিশ্রিত করিয়া একমাত্রা নির্ম্মাণ করিবে এবং তাহার সহিত বাইকার্ব্বনেট্ অব্ পটাশ্ কিম্বা বাইকার্ব্বনেট্ অব্ সোডা ১৪ গ্রেণ পরিমাণে মিশ্রিত করিবে। এবং যখন ঐ আরক এবং ক্ষার একত্র মিশ্রণে ফুটিয়া উঠিবে, তখন তাহা রোগীকে পান করিতে দিবে। এই রকম দুই দুই ঘণ্টান্তর উপরোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে শীঘ্রই বিবমিষা বা বমন নিবারণ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু অনেকের আবার নাইট্রীক্ ঈথার সহ্য হয় না এবং উহার গন্ধেই বমনোদ্রেক হয়, সুতরাং সে স্থলে উপরোক্ত মিশ্র বা আরক হইতে নাইট্রীক্ ঈথার পরিত্যাগ করিয়া অপর কয়েকটী ঔষধ একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। এইরূপে বিবমিষা বা বমনেচ্ছার কিয়দংশ কিম্বা সম্পূর্ণরূপে নিবারণ হইলে পরে পিত্তনিঃসারক বিরেচক ঔষধ সকল প্রদান করিবেক। সেই সকল বিরেচক ঔষধ কি, তাহা আগামীবারে বলা যাইবেক। ক্রমশঃ—

আশ্বিন,
কলিকাতা।

শ্রীজগদ্বন্ধু বসু এম্, ডি।

শিশুচিকিৎসা।

হোমিওপ্যাথিমতে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৬৫ পৃষ্ঠার পর)

৭। সদ্য প্রসূত শিশুর স্তনস্ফীত হওন। অনেক দেশে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে ধাত্রীরা উহার স্তন ধরিয়া চাপিয়া দেয়। উহার অর্থ এই যে, স্তনে বিচি থাকিলে উহা ভস্ম হওয়ায় স্তন বড় হইতে পারে না। স্তন স্ফীত ও প্রদাহিত হওয়ার ইহাই একমাত্র কারণ। যদি প্রদাহ না হইয়া কেবল স্ফীত হয়, তাহা হইলে আর্ণিকা ব্যবহারে আরোগ্য হইবে। কিন্তু যদি প্রদাহ হইয়া ঐ স্থান রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বেলেডোনার একটী বটীকা সেবন করাইতে হইবে, উহাতেই আরোগ্য হইয়া যায়। স্তনে পুজ-সঞ্চার হওয়ার উপক্রম হইলে মার্ক-সল বা হিপার ব্যবহার করা উচিত এবং পুজ উৎপন্ন হইলে সিলিসিয়াদ্বারা আরোগ্য হইবে। স্তনে দূষিত অর্ব্বুদ প্রকাশ হইলে ক্যামমিলা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৮। সদ্যজাত শিশুর অন্ত্রবৃদ্ধি। অন্ত্রবৃদ্ধি নাভীদেশে বা কুচ্‌কিতে হইতে পারে। সচরাচর নাড়ী কর্ত্তন করার দোষে তন্মধ্যে অন্ত্র প্রবেশ করিতে পারে। ইহার প্রধান ঔষধ নাক্সভমিকা ও সালফার পর্য্যায়ক্রমে এক সপ্তাহ অন্তর একমাত্রায় তিনটি বটীকা সেবন করাইলে আরোগ্য হইবে। এক মাসের মধ্যে নিঃশেষ না হইলে অবস্থানুসারে ককুলাস্, অরাম ভেরাট্রাম বা ল্যাকেসিস্ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

অঙ্গবিকৃতি বা জন্মাবধি চর্ম্ম রোগ, অর্ব্বুদ ইত্যাদি। সচরাচর এ সকল বিকৃতি কিছু দিন পরে স্বভাবতই আরোগ্য হয়, এই হেতু হটাৎ ঔষধ কিম্বা অস্ত্র অথবা যন্ত্রাদি প্রয়োগ করা উচিত নহে, যে কোন প্রকার অঙ্গের বিকৃতি হউক না কেন সাল্‌ফারের তিন বটিকা দিন এক মাত্রায় কিছুকাল ব্যবহার করিলে ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হওয়াব সম্ভব। ৫।৬ সপ্তাহ মধ্যে কোন উপকার না দর্শিলে ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব ঐ প্রণালীতে ব্যবহার করা উচিত। সন্তানের উপরোক্ত যে সকল পীড়া উল্লেখ করা হইল, উহারা প্রসবমাত্র বা সূতিকা গৃহে মাসাবধির মধ্যে প্রকাশ হইতে

পারে। এখন দেখা যাউক, স্তনপানকালে অর্থাৎ শিশুর এক মাস বয়ঃক্রম হইতে ছয় মাসের মধ্যে কি কি পীড়া ঘটেও তাহাদের চিকিৎসাই বা কি।

স্তন্যপায়ী শিশুর পীড়া।

এ অবস্থায় নানাপ্রকার পীড়া জন্মিতে পারে, উহারা নিজের অসুখের বিষয় বলিতে পারে না বলিয়া এই কালে এত অধিক মৃত্যু হয়। চিকিৎসক সুবিজ্ঞ হইলেও অতিরিক্ত ঔষধ ব্যবহার না করিয়া স্বভাবের উপর আরোগ্যের ভার অর্পণ করিলে অনেক সময় সুবিধা হওয়ার সম্ভব। যে সকল রোগ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। হিক্কা, নাসারন্ধ্র আবদ্ধ হওয়া, শ্বাসকাশ, যকৃতের বিবৃদ্ধি, অনিদ্রা, ক্রন্দন, অন্ত্রশূল, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধ, সরলান্ত্রের অধঃপতন, মূত্রাবরোধ, চর্ম্মরোগ, মুখে জাড়িক্ষত, চক্ষু প্রদাহ, বিসর্প ইত্যাদি। ইহাদিগের লক্ষণ ও চিকিৎসা ক্রমশঃ বলা যাইবে।

১। হিক্কা। শিশুদিগের কখন কখন হিক্কা এত কষ্টদায়ক হইয়া পড়ে যে, ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়। সচরাচর মাতা সন্তানকে বুকের মধ্য করিয়া কিছুক্ষণ রাখিলে অর্থাৎ একটু উত্তপ্ত হইলে কিম্বা দুই এক ঝিনুক জল সেবন করাইলে বিনা ঔষধে নিবারণ হইতে পারে। কিন্তু পুনঃ পুনঃ হিক্কা হইতে থাকিলে ঔষধ দেওয়াই উচিত। ইহার প্রধান ঔষধ একোনাইট, নাক্স ও পাল্‌স, উহার কোন একটীর ২। ১টী বটিকা সেবন করাইলে নিবারণ হওয়া সম্ভব।

২। সর্দ্দিহেতু নাসারন্ধ্র আবদ্ধ হওয়া। ইহাতে শিশুর স্তনপান করার বিশেষ বিঘ্ন ঘটে। নাসিকা কোনপ্রকার তৈলদ্বারা মর্দ্দন করিলে আরোগ্য হইতে পারে। উপকার না হইলে নক্স একমাত্রা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহাতে কোন উপশম না দর্শিলে সাম্বুকাশ ব্যবস্থা। নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা নির্গত হইতে দৃষ্ট হইলে ক্যামমিলা উৎকৃষ্ট ঔষধ। সন্ধার সময়ে নাসারন্ধ্র অধিক আবদ্ধ হইলে কার্ব্ব-ভেজ ব্যবস্থা। বহির্ব্বাতাসে বৃদ্ধি হইলে ডালকামারা ব্যবহারে আরোগ্য হইবে। ক্রমশঃ—

ভাদ্র } শ্রীশিখরকুমার বসু এল, এম্, এস্।
কলিকাতা। } হোমিওপ্যাথিক্ প্রাকৃটীসনার।

পুরাতন প্লীহারোগীর চিকিৎসা।

এলোপ্যাথিকমতে।

প্লীহারোগ পুরাতন হইলে প্রায়ই দুঃশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে। এমন কি রোগ বেশীদিনের হইলে প্রায়ই রোগীকে বাঁচান যায় না। পূর্ব্বে ডাক্তারিমতে এই পীড়ার জন্য এক কুইনাইন আর লৌহ ব্যতীত আর ভাল ঔষধ ছিল না। পূর্ব্বে আমাদিগের দেশীয় কবিরাজেরা পুরাতন প্লীহা যেমন আরাম করিতে সক্ষম হইতেন, ডাক্তারেরা তেমন পারিতেন না। কিন্তু এক্ষণে চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি সহকারে এই রোগের নানারূপ চিকিৎসা প্রচলিত হইয়াছে। রোগ নিতান্ত পুরাতন ও অসাধ্য না হইলে ডাক্তারিমতে প্রায়ই আরাম হইয়া যায়। কিন্তু চিকিৎসা দীর্ঘকাল আবশ্যক। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আমাদিগের দেশীয় লোকের সংস্কার আছে যে, ডাক্তারদিগের ঔষধে যদি ঝটিতি উপকার না হইল, তবে আর উপকারের আশা নাই। এই সংস্কারবশতঃ রোগীর অভিভাবকগণ রোগীকে বেশীদিন ডাক্তারদিগের হাতে রাখেন না। দশপনর দিন চিকিৎসা করাইয়া যদি ফল না হইল, তবে রোগীকে ডাক্তারের হাত হইতে ছাড়াইয়া লইয়া অন্যবিধ চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্লীহারোগী চিকিৎসা করিতে কবিরাজদিগকে যত সময় দেওয়া হয়, ডাক্তার মহাশয়েরা সেইরূপ সময় পাইলে প্রায়ই রোগ আরাম করিয়া তুলিতে পারেন। কবিরাজীমতে হউক্ আর ডাক্তারিমতেই হউক্, পুরাতন জীর্ণরোগী আরাম করিতে হইলে রোগীর পক্ষে বিলক্ষণ তদ্বির ও ধৈর্য্য এবং চিকিৎসকের বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক। ডাক্তারগণ পুরাতন রোগী আরাম করিতে পারেন না, এই সংস্কারটীর ততদূর মূল নাই। তবে তরুণজ্বর যেমন দুই চারি ডোজে কুইনাইনের জোরে ডাক্তারগণ অতি সত্বর আরাম করিয়া তোলেন, পুরাতন রোগী সেইরূপ শীঘ্র আরাম করিতে পারেন না। এজন্য লোকেরও সংস্কার হইয়াছে; ডাক্তারিমতে অতি শীঘ্র ঔষধের ক্রিয়া দেখা না গেলে উক্তমত প্রায়ই নিষ্ফল হয়।

পুরাতন জীর্ণরোগী অনেক সময় আপন দোষে, কোথাও বা ডাক্তার-দিগের দোষে ডাক্তারিমতে চিকিৎসিত হইয়াও আরোগ্যলাভ করিতে পারে না। যদি ডাক্তার মহাশয় বিশেষ চেষ্টা করেন এবং রোগীও ধৈর্য্য সহকারে ডাক্তারের হাতে বেশীদিন থাকে, তবে অনেক স্থলেই রোগ আরাম হইয়া যায়। কিন্তু এই সকল স্থলে বিশেষ বিজ্ঞতা সহকারে চিকিৎসা করিতে হইবে। ক্রমাগত একরূপ ব্যবস্থায় কোন কাজ হইবে না। প্রত্যেক রোগীতে নূতন নূতন প্রথা অবলম্বন করিতে হইবে এবং মধ্যে মধ্যে ঔষধ বদলাইয়া দিতে হইবে।

আমরা অনেকদিন পর্য্যন্ত নানারকমের প্লীহারোগীর চিকিৎসা করিয়া অনেক স্থলেই কৃতকার্য্য হইয়াছি। অনেক যায়গায় নিষ্ফলও হইয়াছি। কিন্তু কাহারও দুই একস্থলে রোগীর পক্ষে তদ্বিরের ক্রটী ছিল।

প্লীহারোগ চিকিৎসা করিতে হইলে রোগটী কিরূপভাবে উপস্থিত হই-য়াছে এবং রোগী পূর্ব্বে কিরূপভাবে চিকিৎসিত হইয়াছে, তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক। প্লীহারোগের সমুদয় নিদান এস্থানে বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা না করিয়া অতি সঙ্ক্ষেপে ও সরলভাবে তাহার কারণ ক্রমশঃ বিবৃত করা যাইবে। ক্রমশঃ—

গ্রাহকগণের দ্রষ্টব্য।

চিকিৎসা-সম্মিলনীর দ্বিতীয় ও তৃতীয়াদি সংখ্যার মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। খুব্ সম্ভবপূজার বন্ধের পরেই গ্রাহকগণ একবারে কয়েক সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইতে পারিবেন। আশা করি, ৪র্থ বর্ষের দুরন্ত বিপদ-জন্য সম্মিলনীর এইরূপ নিতান্ত অসময়ে প্রকাশহেতু আমাদের যে ভয়ানক ক্রটী হইল, তজ্জন্য সকলেই আমাদিগকে এবারে ক্ষমা করিবেন। ম্যানেজার,

বিবাহ-বিচার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

যে দেশ যত সভ্য হইতেছে, যে দেশে যত অধিক আধুনিক নীতি শিক্ষাশূন্য বিদ্যার আলোচনা বৃদ্ধি হইতেছে, সেই সকল দেশে ততই এই পাপের প্রশ্রয় বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বে সভ্যতা অর্থে লোকে শিষ্টতা, শান্ততা, ভদ্রতা প্রভৃতি গুণসমষ্টি বুঝিত। এখনকার পাশ্চাত্য বিদ্যায় বিভূষিত যুবকগণ সভ্যতার যেরূপ অর্থ করেন তাহাতে সভ্যতা অর্থে স্বাভাবিক পথ ছাড়িয়া অস্বাভাবিক পথে গমন করা। স্বাভাবিক কার্য্য সকলকে মনুষ্য-জাতির পরিবর্ত্তিত অবস্থায় উপযোগী করিয়া লওয়াই এখনকার দিনের সভ্যতা। এখনকার সভ্যতা অর্থে কৃত্রিমতা। অবশ্য, প্রকৃতরূপে সভ্য হইয়া মনুষ্যনামের উপযোগী হইতে হইলে পশুভাব পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ঠিক্ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে মনুষ্য কদাচিৎ মনুষ্যনামের উপযুক্ত হইয়া এতদূর উন্নত হইত না। কিন্তু সকল বিষয়েই স্বাভাবিক কার্য্যের বিপরীত পথে চলামাত্র সভ্যতা নহে। সকলবিষয়ে স্বাভাবিক পথ পরিত্যাগ করিয়া সভ্যতার খাতিরে কৃত্রিমপথে গমন করিলে শারীরিক, মানসিক নানারূপ অনিষ্ট সংঘটিত হয়। অনাবৃত শরীরে বিচরণ করা পশুগণেরই সাজে, অতএব পশ্বাবস্থা হইতে উন্নত হইতে হইলে লজ্জা নিবারণার্থ বস্ত্র পরিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা বলিয়া এই গ্রীষ্মপ্রধানদেশে অহরহঃ আপাদমস্তক ফ্লানেল বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখা কখনই বিহিত নহে। মোজা ব্যবহার করিলেই বা কেন সভ্য হওয়া যায়, এবং মোজা ব্যবহার না করিয়া অনাবৃত পদে লোকসমক্ষে বাহির হওয়া কেনই বা অসভ্যতা? ইহার রহস্য বোঝা অতীব দুরূহ। অথবা সমাজে যখন যাহা প্রচলিত হয়, তাহাই সভ্যতা এবং তদ্বিপরীতাচরণই অসভ্যতা। মনুষ্যের সভ্যতার একটা বাস্তবিক আদর্শ নাই। আমাদিগের দেশে মস্তকে শিখাধারী, উলঙ্গগাত্র; চটি পরিধানকারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পূর্ব্বে সভ্যতার আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইত। এখন ঐরূপ অনাবৃতগাত্রে গমন করিলে ঘোরতর অসভ্যতা ও মূর্খতা বলিয়া বিবেচিত হয়। কেবলমাত্র বিদেশীয় লোকের সংসর্গদোষে

আমাদিগের মনের ভাব উল্টা হইয়া গিয়াছে। নচেৎ কিরূপ ভাবে চলিলে সভ্য হওয়া যায়, কিরূপ ভাবে চলিলেই বা অসভ্যতা প্রকাশ পায়, লোক-সমাজে তাহার একটা স্থির নিশ্চয় কিছুই নাই। সকল কার্য্যেরই সীমা আছে. উন্নতিরও একটা শেষ আছে। অতএব সভ্যতার বাড়াবাড়ী যে, নিতান্তই প্রাণ হানিকর তাহার আর সন্দেহ নাই। এখনকার পাশ্চাত্য ধরণের সভ্যতা সর্ব্বদা বিষ উদ্গীরণ করিতেছে। পতঙ্গ যেমন মরিবার জন্য অনলে প্রবেশ করে, মনুষ্য সেইরূপ উপর চাকচিক্যে মোহিত হইয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার অনলে ঝাপ দিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। এই সর্ব্বনাশকারী অশান্তিপ্রসবিনী পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা মনুষ্যকে এমনিই আশে পাশে বন্ধন করিয়াছে, এবং মনুষ্যের এতই নূতন নূতন অভাব সৃষ্ট করিতেছে, যে মনুষ্য এই সভ্যতার খাতিরে স্ব স্ব নৈসর্গিক শারীরিক ক্রিয়াসকল রুদ্ধ করিতে বাধ্য হইতেছে। এখনকার ভদ্রমজলিসে গমন করিলে হাঁইতোলা, চর্ব্বনকরা, শব্দকরা প্রভৃতি অসভ্যতাব্যঞ্জক। অনেকে সভা সমিতিতে গমন করিয়া সভ্যতার খাতিরে মলমূত্রের বেগধারণ করিয়া কষ্টপান, অনেক মহিলা নাট্যশালা, থিয়েটার প্রভৃতি স্থানে স্পঞ্জ লইয়া যাইতে বাধ্য হন। এখনকার পাশ্চাত্য সভ্যতার উপরে চাক-চিক্যতা, ভিতরে বীভৎসকাণ্ড; মুখে সরলতা, অন্তরে গরল। সকল জিনিসেই ভেজাল মিশ্রিত। সোনায় তামার খাদ, ঘৃতে বসা; বস্ত্রে কোষ্ঠা বা পাট, চিনিতে বালি, গুড়ে গোরক্ত; মুখে পাউডার মাখা; বক্ষস্থলে দাদ, গৃহ পরিষ্কার, গাত্রে জামা, কিন্তু পকেটে মুখ ও নাসিকার ক্লেদসিক্ত রুমাল। ঠোঁঠে আল্তা, দাঁতে ময়লা। সম্মুখে সাটীন বস্ত্রনির্ম্মিত ডবল ব্রেষ্টপ্লেট কিন্তু পৃষ্ঠদেশে গামছার থান। দিনে হরিণামামৃত পান, রাত্রে বেশ্যালয়ে গমন। ধর্ম্ম লইয়া ব্যবসাদারী, বাটপাড়ী জুয়াচুরী। সম্মুখে বিকসিত পুষ্পোদ্যানস্থিত বিচিত্র অট্টালিকা কিন্তু অন্দরে আস্তাকুড়। সর্ব্বদা মুখে অমৃতময় কথার বুকনি, কিন্তু অন্তর কুটিলতায় পরিপূর্ণ। এই পাশ্চাত্য সভ্যতার দাস হইয়া দুধের শিশু পিতামাতাকে গুড্মর্ণিং বলিয়া অভিবাদন করিতেছে; এবং মাতৃস্তন্য পান করিয়া "Thank you mamma" বলিয়া কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করিতেছে। এই উনবিংশ শতাব্দির সভ্যতার ফ্যাশনের খাতিরে ভদ্রমহিলাগণ কৃত্রিম উপায়ে মাজা সরু করিয়া স্বাস্থ্যহারা হইতে-

ছেন, এবং গর্ভে সন্তানধারণ করিয়া জিম্‌ন্যাষ্টিক্ শিক্ষা করিতেছেন। এখনকার মহিলাগণ দুরন্ত মাঘমাসের শীতে পাথার হাওয়া খাইয়া হাড়ে কাঁপিতেছেন, এবং বৈশাখের অসহ্য গ্রীষ্মে গাউন পরিয়া ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়িতেছেন। সমস্তই অত্যাচার, সকল কাযেই ভেল। অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ প্রবৃত্তিও এইরূপ সভ্যতার বাড়াবাড়ী হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এখনকার সভ্যতা ও শিক্ষার এমন কোন মহৎগুণ নাই, যদ্দারা লোকে শম, দম প্রভৃতি গুণে বিভূষিত হইতে পারে। এখনকার সমাজনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি সমস্তই বাবু গিরি ও বিলাসিতার পথপ্রদর্শক। এখনকার কালের রীতিনীতি সমস্তই ইন্দ্রিয় উত্তেজক। পাশ্চাত্যশিক্ষা লোক সকলকে বিলাসিতার সুখ দেখাইয়া দিতেছে, কিন্তু উপভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হইবার উপায় দেখাইয়া দিতেছে না। চোখ ফুটাইয়া দিতেছে, কিন্তু নয়ন তৃপ্তিকর দেখিবার জিনিষ নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক যুবতীগণ নাটক নভেল পাঠ করিয়া প্রেমের মাহাত্ম্য জানিতে পারিতেছে অথচ প্রেমোত্তেজিত অদম্য মনোবেগ সম্বরণ করিবার ক্ষমতা শিক্ষা করিতে না পাইয়া আত্মহারা হইয়া গভীর পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইতেছে। কোন এক ইউরোপীয় ভ্রমণকারী বলেন, "Woman and wine stand at the gate of European civilization" অর্থাৎ ইউরোপীয় সভ্যতার প্রবেশদ্বারে স্ত্রীলোক ও মদ্য দাঁড়াইয়া আছে। যদি মদ ও বেশ্যা ভক্ত হইতে পার, তবেই ইউরোপীয় ধরণের শিক্ষা ও সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতে পারা যায়। ইয়ুরোপীয় ধরণের শিক্ষা ও সভ্যতা মনুষ্যের অভাব এতদূর বৃদ্ধি করিয়াছে যে লোকের অবকাশ ও বিরামকাল ক্রমেই সংক্ষিপ্ত হইয়া জীবনযাপন অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে। রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফের সৃষ্টি হইয়া মনুষ্যও তেলের কলের ন্যায় অনবরত ঘুরিতেছে। না আছে খাইবার অবকাশ; না আছে ঘুমাইবার অবকাশ। সুধু অন্ন সংস্থানাভাবে ও শিক্ষিত মহিলার দোকানদারীর জ্বালায় অনেক সুসভ্য ইংরাজ চিরকাল পবিত্র দাম্পত্যসুখে বঞ্চিত হইয়া থাকিতেছেন। এখনকার কৃত্রিম সভ্যতায় লোকের এতই অনাটন ও অভাববৃদ্ধি হইতেছে যে লোকে এত উপায় করিয়াও নৈসর্গিক শারীরিক ক্রিয়াসকল দমন করিতে বাধ্য হইতেছে। সময় নষ্ট করিবার ভয়ে লোক যেমন একদিকে পশুর ন্যায় অর্দ্ধ চর্ব্বিত অন্ন আস্ত

গ্রাস করিতেছে। সেইরূপ যুবক যুবতীগণ যৌবনবয়সে বিবাহ করিলে অবকাশ কালসংক্ষিপ্ত হইয়া উচ্চশিক্ষা ও অর্থোপায়ের ব্যাঘাত হইবে বিবেচনায় অন্যবিধ পাপের আশ্রয় লইতেছেন। পূর্ব্বে আমাদিগের এই শস্য পূর্ণা রত্নগর্ভা ভারতবর্ষে জীবনোপায় অত্যন্ত সুলভ ছিল বলিয়া বাল্য-বয়সে বিবাহ করা উন্নতির অন্তরায় বলিয়া বিবেচিত হইত না। এখন অতিরিক্ত সভ্যতার বাড়াবাড়ীতে লোকের জীবনোপায় দিন দিন কঠিন হইয়া অবকাশ কালসংক্ষিপ্ত হইতেছে। সুতরাং উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হই-য়াও স্ত্রীপুত্র পরিবারের ভরণপোষণোপযোগী অর্থ উপায় করিতে না পারিয়া অনেকেই বাল্যবিবাহ মহাপাপ ও উন্নতির অন্তরায় বলিয়া বোধ করিতেছেন। পরন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার বৃদ্ধি হইয়া এককালে আমাদিগের এমত অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে, যখন লোকে অভাববশতঃ আধপেটা মাত্র খাইতে বাধ্য হইবে। অধিক সংখ্যক লোক অবিবাহিত থাকায় কেবল এই মাত্র বুঝায় যে দেশে অত্যন্ত অভাব ও অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। ঘোরতর সভ্যতা জঞ্জালে দেশকে এমনিই বিবৃত করিয়া তুলি-তেছে যে, লোকে বিবাহপ্রবৃত্তির দমন আবশ্যক বিবেচনা করিতেছে। কিন্তু এইরূপ সভ্যতাকে প্রকৃত সভ্যতা বলা যাইতে পারে না। কারণ সভ্যতা বৃদ্ধি হইয়া যদি লোকের সুখবৃদ্ধি না হইয়া অসুখের বৃদ্ধি হইল তবে এমন সভ্যতায় কায কি? বেশ কথা; মনুষ্যনামের গৌরব রক্ষার্থ কোন কোন বিষয়ে প্রকৃতির দমন আবশ্যক। গাছকে অযথাভাবে বৃদ্ধি হইতে দিলে সমস্ত স্থান জঙ্গলাবৃত হইবে। চুল, দাড়ি, নখ প্রভৃতি স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি হইলে এই সভ্যতার দিনে ঘোর অসুবিধা। নখ বাড়িতে দিলে লেখনী ধারণ করিয়া লেখাপড়ার কায করা অসম্ভব। এজন্য নখচ্ছেদন অতীব আবশ্যক। কিন্তু যে সকল স্থলে স্বাভাবিক ভাবের বিপর্য্যয় উপস্থিত করিয়া মনুষ্যগণ অন্য অবস্থা স্থাপন করিয়াছে, সেই সেই স্থলে স্বাভাবিক নৈসর্গিক-ক্রিয়া পরিচালন জন্য অন্যবিধ উপায়ের আবি-ষ্কার করিতে বাধ্য হইয়াছে। কারণ নৈসর্গিক নিয়মের ঠিক বিপরীত কার্য্য করিয়া জীবগণের জীবন ধারণ করা অসম্ভব। পূর্ব্বে মনুষ্যের বন্যপশুর ন্যায় অবস্থায় নখগুলি আত্মরক্ষার্থ প্রয়োজিত হইত। এক্ষণে সভ্যতার খাতিরে নখহারা মনুষ্যগণ আত্মরক্ষার্থ নখের স্থানে তরবারি

ও বন্দুকের সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছে। বর্দ্ধিত চুলে আতপ তাপ নিবারণ করিত। এক্ষণে চুল ও দাড়ি শূন্য মনুষ্যগণ মস্তকে ছত্র ও গলায় কলার ধারণ করিয়া তত্তৎ অভাব পূরণ করিতেছে। কিন্তু সকল স্থলে সকল বিষয়ে এইরূপ নৈসর্গিক কার্য্যের বিপর্য্যয় ঘটাইতে হইলে মনুষ্য অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্রই ধ্বংসমুখে পতিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে কৃত্রিম সভ্যতার দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হওয়া মনুষ্যের উন্নতির অন্তরায় বলিয়া বিবাহকার্য্য একবারে বন্ধ হইবার বিচিত্রতা নাই। সে দিন আমেরিকায় কোন ভদ্রমহিলা বিবাহ-শৃঙ্খলে মনুষ্যের আবদ্ধ হওয়া আদৌ উচিত নয় বলিয়া স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। উচ্চশিক্ষা লাভের খাতিরে অনেক বিবাহিত নবদম্পতী পরস্পর অনেক দূরদেশে বিচ্ছিন্নভাবে দীর্ঘকাল বাস করিতে বাধ্য হইতেছেন। এইরূপ সভ্যতা-রক্ষার জন্যই এখনকার মদ, বেশ্যা ও কৃত্রিম উপায়ে ইন্দ্রিয় সেবনের উৎপত্তি হইয়াছে। যেমন মস্তকের চুল মুণ্ডন করিয়া লোকে ছাতি মাথায় দিয়া চুলের অভাব পূরণ করিতেছে, সেইরূপ যৌবন বয়সে দাম্পত্যসুখ অনুভব করিবার পরিবর্ত্তে কাল্পনিক প্রেমকাহিনীর বোঝা মস্তকে লইয়া এখনকার যুবক-যুবতীগণ অশেষবিধ পাপে লিপ্ত হইতেছেন।

ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে অনেক কুমারীগণ অস্বাভাবিক উপায়ের আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। সুধু বালিকাবিবাহ প্রচিত না থাকাতে এবং স্ত্রীস্বাধীনতা বর্ত্তমানে সর্ব্বদা পুরুষ সংসর্গে থাকা বিধায় ইউরোপের স্ত্রীগণ মধ্যে এইরূপ পাপের প্রচলন হইয়াছে এরূপ অনুমান হয়। সুখের বিষয় এই যে আমাদিগের পুরুষগণের মধ্যে এবম্বিধ পাপ প্রচলিত থাকিলেও কুলকামিনীদিগের মধ্যে ইহার কদাচিৎ নাম শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের দেশের কুলকামিনী ও বিধবাগণ ইহার নাম পর্য্যন্ত শ্রুত হন নাই, কিন্তু ইউরোপ দেশে অনেক অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা মহিলাগণ এরূপ বীভৎস উপায়ের আশ্রয় লন যে, তাহা শুনিলেও কর্ণে হস্ত দিতে হয়। অনেক কুমারী ছোট ছোট ব্রস বা শিশি ব্যবহার করিয়া অবশেষে চিকিৎসকের আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। অস্মদ্দেশে বালিকা-বিবাহ প্রচলিত আছে বলিয়াই এবম্বিধ পাপ সকল অদ্যাবধিও আমাদিগের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হয় নাই। অল্পবয়সে স্বামীর হস্তে ন্যস্ত হইয়া আমাদিগের বালিকাদিগের মনে

একরূপ অপরূপ পবিত্র সতী ভাবের উৎপত্তি হয়। বাহ্যিকসংসর্গে প্রাপ্ত আচার আচরণ আসিয়া তাহাদিগের মন কলুষিত করিতে পারে না। তাহারা এক স্বামী ভিন্ন, ঘরকন্না করা ভিন্ন শ্বশুর শাশুড়ীকে ভক্তি করা ভিন্ন আর কিছু জানে না। স্ত্রীস্বাধীনতা নাই, পরপুরুষের সংসর্গ নাই, পবলিক্ স্কুলে শিক্ষা নাই, অতএব কেমন করিয়া বাহিরের জঞ্জাল ভিতরে যাইবার সুযোগ পাইবে। বাল্যবিবাহের অন্তর্দ্ধান তথা স্ত্রীশিক্ষার বহুল-বিস্তৃতি এবং স্ত্রী স্বাধীনতা হইয়া যথেচ্ছা পুরুষের সহিত বিচরণ, এই তিনটী প্রচলিত হইলেই আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোকের সতীত্ব বলিয়া পরম পবিত্র স্বর্গীয়পদার্থের বিলোপসাধন হইবে তাহার সন্দেহ নাই। মহাত্মা ডার-উইন সাহেব বলেন—বিবাহে বালিকা সম্প্রদান মনুষ্যের পরিণাম দর্শিতার ফল। যখন মনুষ্য ঘোর অসভ্যতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া বনে বনে পশুর ন্যায় বিচরণ করিত, তখন বাল্যবিবাহ ছিল কি না ছিল তাহা বলা যায় না। কিন্তু মনুষ্য যখন অল্প অল্প সভ্য হইয়া সতীত্বের আদর বুঝিতে শিক্ষা করিল, তখনই বাল্যবিবাহের প্রচলন করিল। অতি পুরাকালে এই ভারতবর্ষে অধিক বয়সে রমণীগণ স্বয়ম্বরা হইত কিন্তু যখন ভারতবর্ষে সতীত্বের আদর বাড়িল, তখনই দূরদর্শী বিচক্ষণ মুনিঋষিগণ অষ্টমে গৌরীদানের ফল কীর্ত্তন করিলেন। কারণ, যে কখনও স্বপ্নেও পরপুরুষের চিন্তা করে নাই, তাহা-কেই প্রকৃত সতী কহে। কোর্টসিপে নূতন নূতন পুরুষের সহিত বিচরণ-কারী, রমণীগণের সতীত্ব ও হিন্দু স্ত্রীর সতীত্ব এই উভয়ে স্বর্গ ও নরকের তফাৎ। অতএব মনে কামভাব উদয় হইয়া পুরুষসংসর্গলালসার উদয় অথবা অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিবার কামনা ও সুযোগ উপ-স্থিত হইবার পূর্ব্বেই বালিকাদিগের স্বামী করে সমর্পিত হওয়া একান্ত-বিহিত। যে সকল দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই, তাহারা এখনও অর্দ্ধ-সভ্য বলিয়া পরিগণিত। ব্রহ্মদেশে অবিবাহিতা রমণীদিগকে আপিয় বলে। ঐ দেশে ২২।২৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যুবতীরা অবিবাহিতা থাকে। ঐ সকল ব্রহ্মবাসিনী আপিয় রমণীগণের ভাবভঙ্গী দেখিলে আমা-দিগের চক্ষে বেশ্যাও আপিয়তে অল্প তফাৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ঐ দেশে পুরুষ রমণীর ন্যায়, রমণীই হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। পশ্চিমে বাইজীর সারঙ্গবাদ্যকারী ভেড়ুয়া ও ব্রহ্মবাসিনীদিগের স্বামীতে অল্প ইতর-বিশেষ

বোধ হয়। ইউরোপে কুমারীগণ স্বামীলালসায় হাটে পথে বাজারে, কাননে গির্জ্জায় পুরুষসঙ্গে মিশ্রিত হন। বালিকার মাতা মনমত পুরুষ দেখিলে তাহার দিকে বালিকাকে টুয়াইয়া দেন। এবং যাহার যত পুরুষ জোটে তাহার মাতা তত গৌরব বোধ করেন। এই সকল ব্যবহারকে অর্দ্ধসভ্যতার লক্ষণ বলা যায়। মনুষ্য পশুভাব ত্যাগ করিয়া যখন সভ্যতার প্রথম সোপানে আরোহণ করে, তখন রাজসিকভাব বর্ত্তমান থাকে। পরে সম্পূর্ণ সভ্য হইলে স্বাত্বিকভাব উপস্থিত হয়। তখন দাম্পত্য প্রণালী সুধু ঐহিক-সুখের জন্য না হইয়া ধর্ম্মের সঙ্গীভূত হয়। বহুকাল হইতে অনেক সমাজ-বিপ্লব উপস্থিত না হইলে কোন দেশ প্রকৃত সভ্য হইতে পারে না। ভারত-বর্ষ বহু প্রাচীনদেশ। এই দেশে যেমন মনুষ্যের ক্রমোন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় অন্যদেশে সেরূপ পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে বৈদিক সময়ে ভারতবর্ষে ঠিক্ এখনকার ইউরোপ ও ব্রহ্মদেশের ন্যায় বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল। পরে তাহাতে সমাজে অনেক দোষের সঞ্চার হয় দেখিয়া সুবিজ্ঞ মুনিঋষি-গণ এখনকার বাল্যবিবাহ প্রচলিত করিয়া যান। বাল্যবিবাহ প্রচলিত হওয়া বহুদর্শনের ফল। লোকে কথায় বলে "ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ"। অনেক দেখিয়া শুনিয়া অনেক ঠেকিয়া বিচক্ষণ পূর্ব্বপুরুষগণ বালিকা-বিবাহের প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। অতএব না ভাবিয়া না চিন্তিয়া সহসা বাল্যবিবাহ দেশ হইতে উঠাইয়া দেওয়া কখনত যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। এই ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহ অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, অতএব এবম্বিধ বিবাহে শারীরিক বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হইলে এত দিন সমস্ত ভারতবর্ষ ধ্বংশ হইয়া যাইত। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসর হইল ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য প্রদেশে গৌতমসূত্র রচিত হইয়াছিল। গৌতম-সূত্রকার বলেন, "কেহ কেহ ব্যবস্থা দেন বালিকা, বস্ত্রপরিধান শিক্ষা করি-বার পূর্ব্বে পরিণীত হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদিগের মতে অষ্টম বর্ষে বিবাহিত হওয়া উচিত" ইত্যাদি। অতএব দেখা যায় বহু পূর্ব্বকাল হইতে ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহ চলিয়া আসিতেছে। ভরসা করি, প্রবীন সহযোগী হিন্দুশাস্ত্রমতে বালিকাবিবাহ যুক্তিসিদ্ধ এবং কেনই বা যুক্তিসিদ্ধ, তাহার বচন ও প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধ লিখিবেন। কেননা হিন্দুশাস্ত্রে আমার তাদৃশ অধিকার নাই।

ক্রমশঃ—

বিবাহ-বিচার।

হিন্দুশাস্ত্রীয়মতে।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

হিন্দুশাস্ত্র কামদুঘা ধেনু। সময় নাই, অসময় নাই, দোহন করিলেই আবশ্যকমত দুগ্ধের অভাব হয় না। বাল্যবিবাহ চাও, যৌবনবিবাহ চাও অথবা বৃদ্ধবিবাহ চাও, শাস্ত্রকে মধ্যস্থ রাখিয়া তুমি সর্ব্বপ্রকার বিবাহেরই ব্যবস্থা পাইতে পার। কিন্তু ইহার মধ্যে একটী বিশেষ কথা আছে, সুবিশাল ভারতসাম্রাজ্যে দেশ, কাল ও পাত্রপ্রভৃতির এত অধিক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাতে কেবল কোনও রকমের একটী মাত্র নিয়ম দেশের সর্ব্বত্র কোনমতেই চলিতে পারে না। পারে না বলিয়া শাস্ত্রকারগণও বহুল চিন্তা এবং গবেষণাদ্বারা ক্রমে একই বিষয়ের জন্য বিভিন্ন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। যত আবশ্যক বুঝিয়াছেন, ততই নিয়মের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে [illegible]ছু। বলা বাহুল্য যে, বিবাহনিয়মও ক্রমে আবশ্যকতা অনুসারে [illegible]তে বিভক্ত ও প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। নচেৎ কোথায় চব্বি[illegible]সর বয়স্ক পুরুষের সহিত দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার বিবাহবিধি যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া যে হিন্দুশাস্ত্রের মত, আবার সেই হিন্দুশাস্ত্রই অন্যত্র উক্ত চব্বিশবৎসরের পুরুষকে ৮ম বর্ষীয়া কন্যার সহিত বিবাহ দিতে পরামর্শ দিবেন কেন? কিন্তু ইহার পূর্ব্বসংখ্যা চিকিৎসা-সম্মিলনীতে বলিয়াছি যে, উক্ত উভয় বচন আপাততঃ পরস্পর বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বিশেষ অভিনিবেশপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, উভয় বচন সম্পূর্ণ সার্থক, কেবল স্থলবিশেষে যুক্তিপূর্ব্বক প্রয়োগ করাই উভয়ের উদ্দেশ্য। নচেৎ হিন্দুর মধ্যে বাল্যবিবাহের এবং ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিধবা বা বয়ঃস্থা-বিবাহের এত আবশ্যকতা হইবে কেন?

কেবল তাহাই নহে, বাঙ্গলা, বেহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, বম্বে ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি সমস্ত দেশেরই বিবাহপ্রথা কেবল আবশ্যকতা ও সুবিধার প্রতিই সম্যক্ নির্ভর করিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। এই আবশ্য-

কতা বা সুবিধা শব্দ দুইটীই আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের মূলভিত্তি। আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি এবং পরেও দেখাইব যে, বিবাহই বল, আর আহারাচারাদিই বল, আবশ্যকতা ও সুবিধা অতিক্রম করিয়া প্রায়শঃ কেহ কোন কার্য্যই করিতে সমর্থ হন্ না। কেননা যিনি এ সংসারে নিতান্ত নিষ্ঠাবান্ খাঁটী হিন্দু, দেখা যায় তাঁহাকেও ইংরাজরাজত্বে সুবিধা বা আবশ্যকতার জন্য পদে পদে প্রকৃত হিন্দুয়ানী বিসর্জ্জন দিয়া চলিতে হয়। পক্ষান্তরে মহা অহিন্দু ব্যক্তিকেও আবার স্থলবিশেষে অপেক্ষাকৃত হিন্দুয়ানী ভাব না দেখাইলেই চলে না। ফলতঃ সুবিধা এবং আবশ্যকতাই যে মনুষ্যকে নিয়মবিশেষের সম্পূর্ণ অধীন করিয়া থাকে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কেন সন্দেহ নাই, তাহাও বলিতেছি। মনে করু হিন্দুশাস্ত্র ২৪ বৎসর বয়স্ক যুবককে ৮ম বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং এই বিবাহ নিয়ম একজন হিন্দুযুবকের পক্ষে বেশ সঙ্গত বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু যথার্থ বলদেখি, একজন ব্রাহ্মযুবকের পক্ষে এইরূপ বিবাহপ্রথা প্রকৃতপক্ষে সঙ্গত কি না? বোধ হয় কেই বলিবেন না যে, ২৪ বৎসর বয়স্ক অথচ আত্মীয়স্বজনত্যাগী ব্রাহ্মযুবকের পক্ষে ৮ম বর্ষীয়া বালিকার বিবাহ বেশ যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? কেন যে সঙ্গত নহে, তাহাও বলি—মনে কর একজন ব্রাহ্মযুবক হয়ত অথবা হয়ত কেন নিশ্চিতই তিনি আপনার পিতা মাতা ও ভ্রাতাভগিনী প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া কেবল স্বোপার্জ্জিত মাসিক আয় এবং স্বধর্ম্মাবলম্বী কয়েকজন নব্য বন্ধুর প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াই তাঁহাকে সংসারধর্ম্ম অতিবাহিত করিতে হইতেছে, সুতরাং এরূপ স্থলে ৭ম বা ৮ম কিম্বা তদধিক বর্ষীয়া বিশেষতঃ কঅক্ষরবর্জ্জিতা একটী মেয়েকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে কোনমতেই সঙ্গত নহে। যেহেতু তাঁহার দরকার স্ত্রীপুরুষে একত্রে ঈশ্বরোপাসনা করিবেন, একত্রে ধর্ম্মমন্দিরে যাইবেন, আবার কখন বা দলস্থ অথচ একবারে নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তিবিশেষের হস্তে স্ত্রীটীকে রাখিয়া দেশদেশান্তরে ভ্রমণাদিও করিতে হইবেক; সুতরাং এরূপ স্থলে একটী দুগ্ধপোষ্যা গোচের বালিকাকে সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসম্পাদন করা তাঁহার পক্ষে বড়ই বিড়ম্বনার বিষয় হইয়া উঠে। কাজেই ঐ সমস্ত ভয়ানক অসুবিধা দূর করিবার জন্য ব্রাহ্মযুবকের পক্ষে যথার্থই

একেবারে যুবতীবিবাহের নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। কেমন এরূপ স্থলে এরূপ প্রয়োজন অসঙ্গত বলিতে পার কি?

আবার পক্ষান্তরে বহু পরিবার-পরিবৃত হিন্দুযুবকের পিতামাতা ও ভ্রাতা-ভগিনী এবং ভ্রাতৃবধূপ্রভৃতি আটঘাটপরিবেষ্টিত সংসারের মধ্যে হটাৎ একটী ষোড়শী যুবতীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা যে, কি ভয়ঙ্কর বিড়ম্বনার বিষয়, তাহা বোধ হয় হিন্দুসন্তানকে আর অধিক করিয়া বুঝাইতে হইবে না। ষোড়ষী বলিয়া কেন, একটু বাড়ান্ত গোচের একাদশ বা দ্বাদশবর্ষীয়া বিবাহিতা কন্যা স্থলবিশেষে শ্বশুরবাটীতে গিয়া অনেক গৃহিণীর সম্বন্ধে ভয়ানক অশান্তি উৎপাদন করিতে দেখা গিয়া থাকে। মেয়েটী খুব্ ডাগর শুনিলে এখনও অনেক হিন্দুপরিবারের স্ত্রীমহলে প্রায়ই হৃৎকম্প ও আতঙ্ক উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে পিতামাতা বা ভ্রাতাভগিনীবিহীন এমন যুবকেরও বড় অভাব হয় না, যাঁহার অন্তঃকরণ ডাগর মেয়ের নামে নাচিয়া না উঠে। তাই প্রথমেই বলিয়াছি যে, সুবিধা লইয়াই আবশ্যকতা, যাঁহার যেমন সুবিধা বোধ হইবে, সে সম্বন্ধে আবশ্যকতাও তাঁহার ততদূর বৃদ্ধি পাইবে; সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিবাহসম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে যতই কেন রকমারি ব্যবস্থা না থাকুক, তৎসমস্তই এই সুবিধা ও আবশ্যকতার প্রতিই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ক্রমশঃ—

আয়ুর্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যা।

তৃতীয় অধ্যায়।

পার্ব্বতী। হে আশুতোষ! গর্ভরক্ষা ও গর্ভিণীর কৃত্যাকৃত্য বিষয় আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে যে উপায় অবলম্বন করিলে সুখে প্রসব হয় এবং প্রসূত সন্তানের মঙ্গলবিধান হয়, তাহাই বিশেষরূপ বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে আশু পরিতোষ কর।

মহা। দেবি! এরূপ না হইলে আর তুমি ত্রিলোক-জননী বলিয়া অভিহিতা হইবে কেন? জগতের হিতের জন্য—একমাত্র প্রজাগণের মঙ্গলের জন্য তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, ক্রমে সে সকলের উত্তর

দিতেছি। প্রথমতঃ সূতিকাঘরের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক। যে ঘরে সকলে সর্ব্বদা বাস করে, সেই ঘরে কখনও প্রসব হইতে দিবে না। ঘরখানি অত্যন্ত বড় বা একবারে ছোটও করিবে না। সাধারণতঃ আট হাত দীর্ঘ ও চারিহাত প্রশস্ত হইলেই যথেষ্ট হইবে। বাটীর মধ্যস্থিত কোন প্রশস্ত স্থানে শুভলগ্নে উপযুক্ত সময়ে পূর্ব্বদ্বারী বা উত্তর দ্বারী করিয়া সূতিকা ঘরখানি প্রস্তুত রাখিবে।

পার্ব্ব। কেন প্রভু, বাসগৃহে সন্তান প্রসব হইলে কি তাহাতে কোন দোষ আছে ?

মহা। তা না থাকিলে আর এরূপ বলিব কেন ? যে ঘরে লোকে বাস করে সেই ঘরখানি অত্যন্ত পবিত্র থাকা চাই,—

পার্ব্ব। তবে কি নাথ ! সন্তান এমনি তুচ্ছ হইল যে, সে, যে ঘরে জন্মগ্রহণ করিবে, সে ঘরখানিও অপবিত্র হইবে ?

মহা। না প্রিয়ে ! সন্তান এমন তুচ্ছ নয় ; কিন্তু তাই বলিয়া প্রসবের সময় অপত্যপথ হইতে যে সকল ক্লেদময় পদার্থ নির্গত হয় বা প্রসূতি যে সকল মলমূত্রাদি ত্যাগ করে, তাহাও কি পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে ? সেই সকল ক্লেদভাগ মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত থাকিয়া তত্রত্য বায়ুরাশি কি দূষিত করিয়া ফেলে না ? সেই ঘরে যে বাস করিবে তাহাতে কি তাহার সম্পূর্ণ বা আংশিক স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবে না ? আজ তুমি এরূপ বলিতেছ কেন ? ম্লেচ্ছ ও কিরাত প্রভৃতি জঘন্য জাতিগণ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে ; যাহাদের আচার বিচার, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম জ্ঞান নাই, যাহারা বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের কিছুমাত্র জ্ঞাত না হইয়া দিবারাত্রি কেবল বিজ্ঞান বিজ্ঞান করিয়া একবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা এই সকল কার্য্যকে ততদূর দোষাবহ বলিয়া মনে করিতে না পারে ; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী বিচক্ষণ লোকের পক্ষে ইহার অন্যথা করা কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত নয়। এমন কি, অশৌচান্তে প্রসূতি যখন সূতিকাঘর হইতে বাহির হইবে, তখন ঐ ঘর দূরে নিক্ষেপ করিয়া সেই স্থান খানি উত্তমরূপ পরিষ্কার করিয়া দিবে। পাছে প্রসূতির শরীরেও কোন প্রকার দুর্গন্ধ থাকে, এই আশঙ্কায় তৎক্ষণাৎ নখাদি ছেদন ও উত্তমরূপ গাত্রাদি মার্জ্জন করিয়া স্নান করিয়া আসিবে।

পার্ব্ব। ভাল, তাহাই যেন হইল, কিন্তু পূর্ব্ব বা উত্তরদ্বারী করিয়া ঘরখানি প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন কি? অন্য দিক্ দুয়ার রাখিলে কি কোন ক্ষতি আছে?

মহা। কোন ক্ষতি না থাকিলে আর একথা বলিব কেন? আমি যাহা বলিতেছি বা পরে যাহা বলিব, তাহার একটী কথাও অযৌক্তিক বলিয়া মনে করিও না। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে, ইহার প্রত্যেক কথাতেই বিজ্ঞানশাস্ত্রের যুক্তি পরস্পর জাজ্জল্যমান প্রকাশ পাইতেছে। একবার মনে করিয়া দেখ, সংসারে তেজঃ ভিন্ন কিছুই রক্ষা পায় না; তেজঃ দ্বারাই পরমাণুসমূহ পরস্পর দৃঢ়রূপে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, আবার সেই তেজঃ দ্বারাই তাহারা বিয়োজিত হইয়া নিত্য নূতন কতপ্রকার অত্যদ্ভূত রচনাকৌশল প্রদর্শন করিতেছে। তেজেই দেহীর দেহ রক্ষা হইয়া থাকে, আবার সেই তেজে বা তেজাভাবেই দেহ বিনষ্ট হইয়া যায়। সন্তান যতদিন পর্য্যন্ত মাতৃগর্ভে শয়ান থাকে, ততোদিন কেবল জননীর তেজেই তেজীয়ান হইয়া আপনার দেহ বর্দ্ধিত করে। সহসা সেই তেজঃ হইতে স্খলিত হইয়া যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়—যখন পাপ-তাপ-পূর্ণ ও সুখদুঃখ-ভরা শীতোষ্ণ সংসারসাগরে ঝম্পপ্রদান করে, তখন কি তাহার অন্য তেজের প্রয়োজন হয় না? আবার দিবাভাগ অপেক্ষা রাত্রিতে স্বভাবতঃই কিঞ্চিৎ শীতের পরিমাণ অধিক হইয়া থাকে। সুতরাং শীতাধিক্যবশতঃ রাত্রিতে প্রসূতসন্তানেরও তেজের অল্পতা হইয়া পড়ে। যাহাতে সেই অভাব শীঘ্র শীঘ্র পূর্ণ হয়, তদনুযায়ী কার্য্য করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ভগবান্ মার্ত্তণ্ডদেবের শরীর হইতে যে পরিমাণ তাড়িৎ প্রবাহিত হয়, ততো আর কিছু হইতেই নয়। প্রসূতসন্তান সেই তাড়িৎদ্বারা প্রাতঃকালে নিজের অভাব পূরণ করিবে বলিয়াই সূতিকা ঘরখানি পূর্ব্বদ্বারী করিয়া প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, বায়ু একটী যৌগিকপদার্থ। ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহার উপকরণ সমষ্টি পরিমাণ সকল সময় সমান থাকে না। তাই এক এক দিক্ হইতে প্রবাহিত বায়ুর গুণও এক এক রূপ হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্ব বা উত্তরদিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাই প্রসূতি ও প্রসূতসন্তানের পক্ষে একান্ত হিতকর। তজ্জন্যই সূতিকাঘর পূর্ব্ব বা উত্তরদ্বারী করিয়া প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। এতৎসম্বন্ধে

আরও অনেক যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাহইলে প্রস্তাবটী ক্রমেই বাড়িয়া যায়। যাঁহারা বিজ্ঞলোক, তাঁহারা আপনা হইতেই সেই সমস্ত যুক্তি ও কারণ অনুসন্ধান করিয়া লইবেন।

যথানিয়মে সূতিকাঘর প্রস্তুত হইলে প্রসূতির মলমূত্রাদির পরিত্যাগ করিবার জন্য স্বতন্ত্র একটী স্থান নির্ম্মাণ করিবে। তাহা সূতিকাঘরের সংলগ্ন বা যথাসম্ভব নিকটবর্ত্তী হওয়া আবশ্যক। যাহাতে ঐ পরিত্যক্ত মলমূত্রাদির দুর্গন্ধ সূতিকাঘরে প্রবেশ করিতে না পারে এরূপ কোন বন্দোবস্ত করা নিতান্ত আবশ্যক। অনন্তর প্রসবের সময় বা প্রসবান্তে যাহা যাহা প্রয়োজন হইবে, তাহা পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। ঘরে আবশ্যকমত অগ্নিকুণ্ড করিবার জন্য তিন্দুক বা ইঙ্গুদীকাষ্ঠ প্রস্তুত করিয়া রাখিবে।

পার্ব্ব। কেন নাথ! অপ্রশস্ত সূতিকাঘরে সর্ব্বদা অগ্নি জ্বালিয়া ঘর খানিকে একবারে উত্তপ্ত করিয়া রাখিবার প্রয়োজন কি? আর নিতান্ত পক্ষে যদি তাহাই কর্ত্তব্য হয়, তবে অন্য কাষ্ঠের ইন্ধনে দোষ কি?

মহা। প্রিয়ে! পূর্ব্বেই ত কহিয়াছি, একমাত্র তাপই পার্থিব কার্য্যের প্রধান উপকরণ। মাতৃদেহসম্ভূত উত্তাপ হইতে সহসা বিচ্যুত হওয়ায় জরায়ুমধ্যস্থিত উত্তপ্ত বায়ুমণ্ডল হইতে পার্থিব শীতল বায়ুর সহিত সহসা সংযুক্ত হওয়ায়, প্রসূত সন্তানের যার পর নাই বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। কেবল মাত্র সেই সকল অপকার হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সূতিকাঘরে সর্ব্বদা অগ্নি রাখিবার প্রয়োজন। আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, একটী দেহ হইতে অন্য একটী দেহ বাহির হইলে, সেই দেহ কতদূর প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে? দশমাস পর্য্যন্ত অসহ্য গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করিয়া গর্ভিণীর দৈহিক কার্য্যের অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। আবার প্রসব সময় যে সকল অদ্ভুত—অমানুষিক কাণ্ডকারখানা সম্পন্ন হইয়া যায়, তাহাতে প্রসূতির একপ্রকার নবজীবন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই সময় গর্ভস্থসন্তান যেরূপ ঘূর্ণিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাতে প্রসূতির অস্থি, মাংস শিরা, ধমনী প্রভৃতি একবারে শিথিল হইয়া যায়। এমন কি তখন তাহার ইন্দ্রিয়াদিও অনেকাংশে ভাবান্তরিত হইয়া উঠে। সুতরাং সেই সময় যাহাতে প্রসূতির কোনপ্রকার পীড়া জন্মিতে না পারে এবং শীঘ্র শীঘ্র তাহার শরীর আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া

উঠে, তদ্রূপ কার্য্য করা ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। অতিরিক্ত শৈত্য-সেবা করিলে সেই সকল বিপদ হইতে কখনও মুক্ত থাকিতে পারা যায় না। তজ্জন্যই সূতিকা-ঘরে অগ্নি-কুণ্ড করিয়া আবশ্যকমত প্রসূতি ও প্রসূত সন্তানকে সময় সময় স্বেদপ্রদান করা কর্ত্তব্য। উক্ত সন্তানকে ভাজা ভাজা করিবার অভিপ্রায়ে ঘরে আগুণ রাখিতে হয় না। তদ্দ্বারা অপকার অপেক্ষা উপকারের সম্ভাবনাই অধিক।

আবার দেখ, পাছে ধুঁয়াদ্বারা সন্তান ও প্রসূতির কোনপ্রকার অনিষ্ট ঘটে, এই আশঙ্কায় তিন্দুক ও ইঙ্গুদীকাষ্ঠের আগুণ রাখিতে হইবে। ঐ কাষ্ঠ আগুণের উপর ধরিলে অপেক্ষাকৃত সুগন্ধি বিস্তৃত হয়। চ'ক্ষে মুখে মূহর্ম্মুহুঃ ধুঁয়া লাগিলেও তাহাতে অধিক কষ্টবোধ হয় না। উহা মঙ্গল-জনক এবং গ্রহ-দোষ নিবারক। নিতান্তপক্ষে ঐ কাষ্ঠ না পাওয়া গেলে অন্য কাষ্ঠদ্বারাও কার্য্যোদ্ধার হইবে, কিন্তু ধুঁয়া নির্গমনের প্রশস্ত কোন উপায় উদ্ভাবিত করিয়া দিবে।

অনন্তর প্রয়োজনীয় ভেষজদ্রব্যাদিও সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। নতুবা সময়কালে সেই সকল বস্তুর অপ্রাপ্তিতে নানাপ্রকার অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে। এইক্ষণ সেই সমুদায়ের নামোল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যথা সময় ক্রমে ক্রমে তাহা বলিব।

সমুদায় আয়োজন শেষ হইলে গর্ভিণী হৃষ্টচিত্তে প্রসব-কালের জন্য অপেক্ষা করিবে। প্রসবের কাল আসন্ন জানিয়া তাহাকে তৈল মাখাইয়া উষ্ণজলে স্নান করাইবে এবং ঈষৎ যবাগূ (যবের মণ্ড) ঘৃতের সহিত যথা-পরিমাণে সেবন করাইবে। অনন্তর সূতিকা-ঘরে উপাধানযুক্ত সুকোমল শয্যা প্রস্তুত করিয়া ব্যথান্বিতা নারীকে আস্তে আস্তে তদুপরি শয়ন করা-ইবে এবং ঐ ব্যথান্বিতা নারীও আপনার উরুদ্বয় সঙ্কুচিতভাবে রাখিয়া ঊর্দ্ধমুখে অবস্থান করিবে। এই সময় প্রসব-কার্য্যে কুশলা চারিটী জন-য়িত্রী নখাদি উত্তমরূপ ছেদন করিয়া আসন্ন প্রসবার পরিচর্য্যা করিতে নিযুক্তা হইবে। যাহারা নিজে অনেকবার সন্তান প্রসব করিয়াছে, যাহারা প্রসবকার্য্যে অত্যন্ত চতুরা এবং বুদ্ধিমতী, যাহারা প্রসবসম্বন্ধে যাবতীয় উপদ্রব নিবারণ করিতে সক্ষম এবং মিষ্টভাষিণী, তাহাদিগকেই এই কার্য্যে বরণ করিবে। নতুবা যাহারা কেবল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বা গুরুর নিকট

উপদেশমাত্র লইয়া ধাত্রীপদে নিযুক্তা হইতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে কখনও আসন্ন প্রসবার পরিচর্য্যা করিতে দিবে না।

যখন দেখিবে গর্ভিণীর কুক্ষি শিথিল, হৃদয় বন্ধনমুক্ত, জঘন বেদনাযুক্ত, কটি ও পৃষ্ঠদেশ ব্যথিত এবং মুহুর্মুহুঃ মূত্র ও মলত্যাগে প্রবৃত্তি হইতেছে তখনই প্রসবের কাল আসন্ন জানিবে।

এই কথা শুনিয়া পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! প্রসবের সময় গর্ভিণী কি জন্ম মল-মূত্রাদি পরিত্যাগ করে?

অনন্তর মহাদেব কহিলেন, ভগবতি! সকলের সম্বন্ধে তাহা নয়। বাতাদিদোষ কুপিত থাকায় পূর্ব্বে যাহাদের রীতিমত কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, তাহারাই প্রসবের সময় মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়া থাকে। কার্য্যদক্ষ সুচতুরা ধাত্রীগণ তাহাতে কিছুমাত্র ঘৃণা প্রকাশ করিবে না। কেবল হৃষ্টচিত্তে মিষ্টবাক্যে আসন্ন প্রসবার সন্তোষবিধানই তাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

যখন দেখিবে মুহুর্মুহুঃ বেদনায় গর্ভিণী একবারে অস্থির হইয়া পড়িতেছে এবং সন্তানও হৃদয়বন্ধনমুক্ত হইয়া উর্দ্ধপদে হেটমুণ্ডে ভূমিষ্ঠ হইবার জন্ম অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়াছে, তখন বুদ্ধিমতী মিষ্টভাষিণী জনৈক জনয়িত্রী প্রসূতির অপত্যপথের চতুর্দ্দিকে তৈল মাখাইয়া কহিবে—"সুভগে! প্রবাহণ কর (কুন্থন দাও) যদি ব্যথা হইয়া থাকে তবে প্রবাহণ কর, ব্যথা না হইলে প্রবাহণ করিও না।" কেননা ব্যথারহিতা প্রসবিণী প্রবাহণ করিলে সন্তানের নানাপ্রকার বৈগুণ্য জন্মে। তাহাতে মূক, বধির, কুব্জ, শ্বাসকাস, প্লীহা ও ক্ষয়রোগগ্রস্ত সন্তান জন্মিতে পারে।

এই সময় আর একজন পরিচারিকা প্রসূতিকে বেশ কায়দামত বসাইয়া তাহার মস্তক আপনার স্কন্ধোপরি সংস্থাপন করিবে এবং আস্তে আস্তে তাহার কর্ণে এই মন্ত্র জপ করিবে। যথা—

"ক্ষিতির্জ্জলং বিয়ত্তেজো বায়ুর্ব্বিষ্ণুঃ প্রজাপতিঃ।
সগর্ভাং তাং সদা পান্তু বৈশল্যং চ দিশন্তু তে॥
প্রসুবস্বমবিক্লিষ্টমবিক্লিষ্টা শুভাননে।
কার্ত্তিকেয় দ্যুতিং পুত্রং কার্ত্তিকেয়াভিরক্ষিতম্॥"

এই সময় অন্যান্য স্ত্রীগণ কেবল গর্ভিণীকে হিতোপদেশ প্রদান করিবে।

আর কহিবে প্রথমে ধীরে ধীরে কুন্থন দিয়া পরে গর্ভ যোনিমুখে সমাগত হইলে বলপূর্ব্বক কুন্থন দাও। গর্ভিণী তদনুযায়ী কার্য্য করিলে নিকটবর্ত্তী স্ত্রীগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিবে "হয়েছে!!! হয়েছে!!! বেশ পুত্র সন্তান হয়েছে!!! ইত্যাদি।" কেননা এই কথা শুনিয়া গর্ভিণীর প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে।

অম্বিকা কহিলেন, নাথ! আজ তোমার মুখে প্রসবের কথা যেরূপ শুনিলাম, সকল সময় ত এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। কখন কখন এমনও দেখা যায় যে, তিন চারি বা ততোধিক দিন অতীত হইলেও সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না। তখন সন্তানের মঙ্গলকামনা দূরে থাক্, প্রসূতির প্রাণ লইয়াই যারপর নাই ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। এরূপ হইবার কারণ কি? এবং তাহাহইলে কি উপায় অবলম্বন করিলেই বা প্রসূতি ও প্রসূত সন্তানের মঙ্গলবিধান হয়?

এই কথা শুনিয়া পরমকারুণিক মঙ্গলময় মহাদেব কহিলেন প্রিয়ে! যে সকল রমণীগণ নিতান্ত মুখরা বা চঞ্চলা,-যাহারা কখনও দেবদ্বিজের প্রতি যথোচিত ভক্তিশ্রদ্ধা করে না, কখনো গুরুজনের সম্মান রক্ষা করে না, সর্ব্বদা কর্কশ বাক্যে আত্মীয় স্বজনকে জ্বালাতন করে, একদিনও প্রতিবাসীদিগের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ না করিয়া জলগ্রহণ করে না, তাহারাই প্রসব সময় যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণাভোগ করিয়া থাকে। সেই সকল দুষ্টা রমণীগণ আপনাদিগের অমূল্য ধন বিনয় ও লজ্জাশীলতার বিষয় স্বপ্নে ও একবার চিন্তা করে না; কেবল স্বভাবসিদ্ধ চাপল্যবশতঃ সর্ব্বদা অন্যায়রূপ আহারবিহার করিয়া থাকে। সেই মিথ্যা আহার বিহারদ্বারা গর্ভস্থ সন্তান বিকৃতভাবে অবস্থিতি করিয়া প্রসবের ব্যাঘাত জন্মায়। আবার কোন কারণে গর্ভিণী হঠাৎ ভয়প্রাপ্ত হইলেও কখনো নিরাপদে প্রসব করিতে পারে না। তাদৃশ অবস্থায় গর্ভিণী ও গর্ভস্থ সন্তান, এই উভয়েরই মঙ্গলের সম্ভাবনা অতি অল্প। সময় সময় এরূপও দেখা যায়, যাহারা একমাত্র আলস্য পরতন্ত্র হইয়া সর্ব্বদা বসিয়া বা শুইয়া থাকে, প্রসবের সময় তাহাদিগকেও অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়। কিন্তু এইরূপ ঘটনা ধনী লোকের মধ্যেই অধিক হইয়া থাকে। শারীরিক পরিশ্রমের অভাবই ইহার কারণ। প্রথমবারে সন্তান প্রসব করিতে প্রসবিনী যত কষ্ট পায়, আর কোনবারে

তজো নয়। সন্তান যমজ হইলেও প্রসূতিকে কিঞ্চিৎ অধিক কষ্টভোগ করিতে হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিতপূর্ব্বে অপত্যপথ হইতে সকলেরই একপ্রকার ক্লেদময় তরল পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোক-গণ সাধারণতঃ তাহাকে পানি-ঠুসী বলে। হৃদয়বন্ধন মুক্ত হইয়া প্রসবের জন্য সন্তান নিতান্ত ব্যগ্র হইলে যদি এই পানিঠুসী ভাঙ্গে, তাহাহইলে আর প্রসূতিকে অধিক কষ্ট পাইতে হয় না। কিন্তু যদি অধিক পূর্ব্ব হইতেই পানিঠুসী ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয়, তবে নিশ্চয় জানিবে যে প্রসূতির প্রসব-যন্ত্রণাও অনিবার্য্য।

যে কারণেই হউক, সহজে সন্তান ভূমিষ্ঠ না হইলে ক্রমে ক্রমে প্রসূতির জীবন সংশয় হইয়া পড়ে। তখন নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠান করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করিতে যত্ন করিবে। ইতিপূর্ব্বে যে সকল বস্তু সংগ্রহ করিয়া রাখিবার জন্য বলা হইয়াছে, তাহার মধ্য হইতে কুড়, এলাচি, লাঙ্গলিক, বচ, চিতা এবং নাটাকরঞ্জ এই সমুদয় দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া গর্ভিণীকে মুহুর্মুহুঃ তাহার গন্ধ প্রদান করিবে। মধ্যে মধ্যে ভূর্জ্জপত্র বা সিংসপাগারের ধুম দেওয়াইবে।

পরিশেষে একজন কার্য্যকুশলা জনয়িত্রী, গর্ভিণীর পেটে হাত বুলাইয়া বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, সন্তান কি ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। যদি প্রকৃতিস্থই থাকে এবং কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ মোচড় ঘুরিয়া প্রসবের জন্য অধোমুখী হইতে না পারে, তাহাহইলে ঈষৎ উষ্ণ তৈল গর্ভিণীর কটী, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ এবং উরুতে মাখাইয়া নীচমুখে আস্তে আস্তে মর্দ্দন করিতে থাকিবে। আবার যখন দেখিবে সন্তান গর্ভমধ্যে তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিতি করিতেছে অথবা ঐ ভাবেই প্রসব হইবার জন্য যোনিমুখে সমাগত হই-য়াছে, তখন প্রসব হওয়া বড় সহজ মনে করিবে না। তদ্রূপাবস্থায় গর্ভি-ণীর কটীদেশে কিঞ্চিৎ উষ্ণ তৈল মাখাইয়া এমনভাবে ঝাঁকি দিয়া দিবে যে, তৎক্ষণাৎ সন্তান সোজা হইয়া যায় এবং গর্ভিণীও অধিক কষ্ট না পায়।

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বারা জল সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া গর্ভিণীকে পান করিতে দিবে ;—

"ওঁ ক্ষিপ নিক্ষিপ উন্মথ প্রমথ মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা।"

উভয় ত্রিংশৎ বা উভয় পঞ্চদশক দর্শন করিলেও স্ত্রীগণ সহজে প্রসব

করে। ৮, ৩, ৪, ১, ৫, ৯, ৬, ৭, ২, এই কয়টী অঙ্ক যথাক্রমে নবকোষ্ঠকে পূরণ করিলে উভয় পঞ্চদশক হয় এবং ইহার দ্বিগুণ সংখ্যা প্রত্যেক ঘরে রাখিলে উভয় ত্রিংশৎ হয়।

উভয় পঞ্চদশক।

৮	১	৬
৩	৫	৭
৪	৯	২

উভয় ত্রিংশৎ।

১৬	২	১২
৬	১০	১৪
৮	১৮	৪

অথবা—যমুনা সরট করট তীরে জম্ভনা নাম রাক্ষসী।
তস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ সদ্যো নারী প্রসূয়তে॥

এই প্রসব-পত্র দর্শন করিলেও স্ত্রীগণ শীঘ্র সন্তান প্রসব করে। এই সমস্ত কার্য্যদ্বারা কোন ফল না দর্শিলে বিবেচনাপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঔষধগুলি প্রয়োগ করিবে; যথা—

* ১। সাপের খোসা শরাবপুটে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম মধুর সহিত গর্ভিণীর চক্ষে অঞ্জন দিবে। ইহাতে প্রসব-বাধা দূরীভূত হয়।

২। আকান্দী, [illegible], বাসক ও আপাঙ্গ * এই সকলের মধ্যে কোন একটীর মূল উত্তমরূপ বাটিয়া নাভি, বস্তি ও যোনিতে প্রলেপ দিবে। শালপর্ণীমূল বাটিয়া প্রলেপ দিলেও বিশেষ উপকার হয়।

* ৩। গোপনে একটী ভূলতা উঠাইয়া তাহার এক টুকরা কাটিয়া পানের সহিত গর্ভিণীকে চর্ব্বণ করিতে দিবে। প্রসবের বেগ না থাকিলে ইহাতে অত্যন্ত বেগ উপস্থিত হয়।

* ৪। ছোলঙ্গলেবুর মূল, যষ্টিমধু, ঘৃত ও মধুর সহিত পান করাইলে গর্ভিণী নির্ব্বিঘ্নে সন্তান প্রসব করে।

* ৫। কাঁজিতে গৃহধূম গুলিয়া পান করিলে শীঘ্র সন্তান প্রসব হয়।

৬। কাঁজি ২ পল, হিঙ্গু ২ রতি সৈন্ধব ১ মাষা একত্রে পান করিলে বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়।

৭। নাগদানামূল ১ মাষা ও চিতামূল ১ মাষা জলের সহিত বাটিয়া পান করিলে শীঘ্র গর্ভ নিঃসৃত হয়।

* ৮। যখন দেখিবে গর্ভমধ্যে সন্তান মরিয়াছে অথচ কোন প্রকারেই প্রসব হইতেছে না, তখন কিঞ্চিৎ সিজ-আটা গর্ভিণীর মস্তকে নিক্ষেপ করিবে। ইহাতে মৃতসন্তান বহির্গত হয়।

৯। এই সমস্ত কার্য্য করিলেও যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ না হয় এবং গর্ভিণীর অবস্থা ক্রমে ক্রমে নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে, তাহা হইলে চতুরঙ্গুলী পরিমিত এক খণ্ড অপামার্গমূল গর্ভিণীর অপত্য-পথে প্রবেশ করাইয়া দিবে। ইহার এমনই অত্যাশ্চার্য্য আকর্ষণীশক্তি আছে যে, সেই শক্তিপ্রভাবে মুহূর্ত্তমধ্যে গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িবে। কিন্তু কখনও সহজে এই যোগ প্রয়োগ করিবে না। যখন গর্ভিণীর বাহ্যিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইয়া পড়িবে—ক্ষণকাল বিলম্ব হইলে তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বোধ হইবে, কেবল মাত্র তখনই এই ঔষধ ব্যবহার করিবে। ইহাতে নিশ্চয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে।

অনন্তর অম্বিকা কহিলেন, দেব! সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেও ত কখনো প্রসূতিকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলিয়া জানা যায় না। কেহ কেহ বা প্রসব হইলেই অমনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহাদিগের প্রাণবায়ু এত শীঘ্র দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় যে, তাহার প্রতিকার করিবারও কিছুমাত্র সময় পাওয়া যায় না। এরূপ হইবার কারণ কি? এবং কি উপায় অবলম্বন করিলেই বা এই বিপদ হইতে মুক্ত থাকা যায়?

তখন মহাদেব কহিলেন, প্রিয়ে! সে সকলই তোমাকে বিশেষ করিয়া বলিতেছি। সন্তানের নাভি নাড়ীর সহিত প্রসূতির অমরানামক নাড়ী সংযুক্ত থাকে। এই নাড়ীকে স্ত্রীলোকগণ সাধারণতঃ ফুল কহে। ইহার সহিত প্রসূতির জীবন মরণের অতি নৈকট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই তাহার প্রতি কেহ দৃষ্টি না করিয়া সর্ব্বাগ্রে প্রসূতিকে লক্ষ্য করিবে, ফুল পতিত হয় কি না তদ্বিষয় বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। কেননা ফুল পতিত হইতে যতই বিলম্ব হইবে, ততই প্রসূতির পদে পদে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। আবার কোন কোন বিকৃত গর্ভকে যদি প্রকৃতিস্থ করিয়া

* চিহ্নিত ঔষধগুলি পরীক্ষা করা হইয়াছে।

প্রসব করাইতে হয়, আর ভাগ্যক্রমে প্রসবের সময় সন্তানের নাভি-নাড়ী ছিঁড়িয়া যায়, তাহাহইলে সেই প্রসূতি তদ্দণ্ডেই কালগ্রাসে পতিত হয়। সন্তান নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইলেও যদি কোন অপরিণামদর্শিনী জনয়ত্রী প্রসূতির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া প্রসূত সন্তানের শুশ্রূষা করিতে প্রবৃত্ত হয় কিম্বা তাহার নাড়ী ছেদন করিয়া দেয়, তাহাহইলে ঐ ফুল বাতাদির দ্বারা আকর্ষিত হইয়া অতি শীঘ্র প্রসূতির উদরমধ্যে উর্দ্ধগামী হইয়া যায় এবং প্রসূতিকেও শীঘ্র বিনষ্ট করিয়া ফেলে। অতএব প্রসূতি খালাস হইলেই অমনি কার্য্যকুশলা জনয়িত্রীগণ তাহার ফুলের প্রতি লক্ষ্য করিবে। ফুল পড়িতে একটু বিলম্ব হইলে নিম্নলিখিত উপায় সকল অবলম্বন করিবে।

১। একজন জনয়িত্রী দক্ষিণ হস্তদ্বারা প্রসূতির নাভির উপর বলপুর্ব্বক পীড়ন করিবে এবং বামহস্ত পৃষ্ঠের উপর রাখিয়া অতিশয় কাঁপাইবে।

২। পদদ্বারা প্রসূতির নিতম্ব স্থান কুটীল করিয়া ধরিবে।

৩। তাহার পর স্ফিচদ্বয় উত্তমরূপে চাপিয়া অবিরত পীড়ন করিবে।

৪। প্রসূতির কেশের অগ্রভাগ তাহার মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে।

৫। অথবা কেশের অগ্রভাগ অঙ্গুলীতে বেষ্টন করিয়া যোনিদ্বার ঘর্ষণ করিবে।

এই সকল কার্য্যদ্বারা অমরা পতিত না হইলে পরিশেষে ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

১। ভূর্জ্জপত্র, কাচ এবং সাপের খোসা একত্রে দগ্ধ করিয়া যোনিতে তাহার ধুঁয়া দিবে।

২। [illegible] সহিত তিত লাউ, সাপের খোসা, ঘোষাফল, সর্ষপ প্রভৃতির ধুপ প্রদান করিলে অমরা পতিত হয়।

৩। প্রসূতির হস্তে ও পদে জৈবলাঙ্গলীয়ার মূলদ্বারা প্রলেপ দিলেও শীঘ্র অমরা পতিত হয়।

৪। পিপুল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, হরিতকী, আমলকী ও শটী এই সমুদয় দ্রব্যের চূর্ণ মদ্যের সহিত অথবা শালীধান্যের মূল মদ্য বা কাঁজির সহিত পান করিবে।

৫। উলুমূল, কুলত্থ কলায়, দন্তী ও পিপুল, ইহাদের মধ্যে কোন এক-

টীর কাথের সহিত অথবা সুরামণ্ড বা মৈরেয়নামক মদ্যের সহিত কুড় ও তালীশপত্রের কল্ক মিশ্রিত করিয়া পান করিবে।

৬। শলুকা, কুড়, হিঙ্গু ও মদনফল দ্বারা সিদ্ধতৈলে তুলা ভিজাইয়া যোনিতে প্রদান করিবে। (ক্রমশঃ)

সাং উমারপুর,
পোঃ নাকালীয়া, পাবনা। } শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

লেখক মহাশয়ের প্রবন্ধটী পড়িবার জিনিষ বটে, ঠিক্ এই প্রণালীতে লিখিত হইলে কালে তাঁহার দ্বারা দেশীয় ধাত্রীবিদ্যা-বিষয়ক একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রস্তুত হইতে পারে। ফলতঃ এবারকার লিখিত প্রবন্ধটী যথার্থই আগ্রহের সহিত পড়িতে ইচ্ছা করে। চি, স, স,

শোথ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(এলোপ্যাথিমতে)

পূর্ব্বে শোথের চিকিৎসার বিষয় কতক বলিয়াছি, এক্ষণে আরও কিছু বলিয়া প্রবন্ধের শেষ করিব।

শোথের চিকিৎসা করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখিতে হইবে।—(১) শোথের জল দূরীভূত করা। (২) যাহাতে পুনর্ব্বার জল সঞ্চয় না হয় তাহার উপায় বিধান করা। (৩) যদি শোথ আরাম করা সম্ভবপর না হয়, তবে যথাসাধ্য উহার অনিষ্ট-কারিতাশক্তির লাঘব করিতে হইবে। এই তিনটী বিষয় মনে রাখিয়া চিকিৎসক যে কোন প্রকার শোথের চিকিৎসায় সম্পূর্ণ বা আংশিক কৃতকার্য্য হইতে পারেন। শোথের জল দূরীভূত করিতে হইলে চিকিৎসক শোথের কারণগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান লইবেন। নিম্নে শোথ-চিকিৎসার কতকগুলি সাধারণ নিয়ম লিখিত হইল।

(ক) শোথের কারণ দূরীভূত করা; যথা;—কোন স্থানে চাপ পড়িয়া শোথ উৎপন্ন হইলে সেই বিষয়টীর প্রতিকার করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যকৃৎ বৃদ্ধি হইয়া শোথ হইলে, যাহাতে যকৃৎ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ উপায় সকল অবলম্বন করিতে হইবে।

(খ) শোথ-পীড়িত অঙ্গের বিশ্রাম ও তাহার বিশেষ চিকিৎসা। যে অঙ্গে শোথ জন্মে সেই অঙ্গ কিঞ্চিৎ উচ্চ করিয়া রাখা উচিত। যথা;—পদদ্বয়ে শোথ নামিলে পা নীচের দিকে সর্ব্বদা ঝুলাইয়া না রাখিয়া বালিসের ঠেস দিয়া দেহ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া রাখিলে অতিশীঘ্র শোথ দূরীভূত হয়। শোথ হইয়া মুষ্কদ্বয় স্ফীত হইলে মুষ্কদ্বয় উন্নত করিয়া ব্যান্ডেজ বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। অথবা তুলার পুঁটুলি বা ছোট বালিস প্রস্তুত করিয়া মুষ্কদ্বয়ে ঠেস দিয়া রাখা কর্ত্তব্য। শোথ-পীড়িত অঙ্গ ব্যান্ডেজ দ্বারা বাঁধিয়া দিলে উপকার হইতে দেখা যায়। যথা;—শোথ হইয়া হস্তপদ অত্যন্ত স্ফীত হইলে ঐ সকল অঙ্গ কাপড় জড়াইয়া রাখিলে শোথের প্রতিকার হইতে দেখা যায়। কিন্তু এইরূপ কাপড় জড়াইয়া দিতে হইলে অল্প পরিমাণে চাপ প্রয়োগ করা উচিত। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, বেশী কসিয়া বাঁধিলে সঞ্চালিত স্থানের নিম্নাংশে শোথ জন্মিয়া বিপরীত ফল উৎপন্ন করে। শোথ স্থান ফ্লানেল বস্ত্রদ্বারা অল্প কসিয়া বাঁধিয়া দিলে অতি চমৎকার উপকার হইতে দেখা যায়।

(গ) শোথের জল দূরীভূত করা।—এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে ঘর্ম্মকারক, মূত্রকারক এবং বিরেচক ঔষধি প্রদান করিতে হইবে। এই তিনপ্রকার ঔষধে রক্তের জলীয়াংশ শরীর হইতে নির্গত হইয়া শোথ আরাম হইয়া যায়।

ঘর্ম্মকারক ঔষধের মধ্যে উষ্ণ জলের ভাপ গ্রহণ করা অতি উৎকৃষ্ট। একটা সছিদ্র হাঁড়ির ছিদ্রমুখ উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া জল ফুটাইতে হইবে, পরে তাহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বাষ্প তৈয়ার হইলে, হাঁড়ির ছিদ্র খুলিয়া দিয়া ঐ বাষ্পের ভাপ লইতে হইবে। রোগীকে বস্ত্রাবৃত করিয়া ঐ হাঁড়ির ছিদ্র খুলিয়া দিলে, উষ্ণ বাষ্প রোগীর গাত্রে লাগিয়া প্রচুর ঘর্ম্ম উৎপন্ন করে। এইরূপে বাষ্পের ভাপ লইবার প্রথা অস্মদ্দেশীয় কবিরাজী-চিকিৎসায় যথেষ্ট প্রচলিত দেখা যায়। কবিরাজ

মহাশয়েরা জলে নানাবিধ ঔষধ মিশ্রিত করিয়া দেন। কিন্তু শোথের চিকিৎসায় ঘর্ম্ম উৎপন্ন করিতে হইলে সুধু জল ফুটাইয়া বাষ্প তৈয়ার করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সুধু গরম জলে স্নান করিয়া স্নানের অব্যবহিত পরেই শরীর বস্ত্রাবৃত করিলে ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয়। ঘর্ম্ম আনয়ন জন্য ফ্লানেল বা পশম নির্ম্মিত বস্ত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তদভাবে আমাদিগের লেপ ও কাঁথা বা কম্বল মন্দ নহে। খাইবার ঔষধের মধ্যে ডোভার্স পাউডার, ইপিকাক, নাইট্রিক ইথর প্রভৃতি ঘর্ম্ম উৎপন্ন করে। ডাক্তার সনিয়ার উইলিয়মস্ বলেন, শোথের পক্ষে অল্প অহিফেণ সহযোগে টার্ টারেট্ অব্ এণ্টিমনি অতি উৎকৃষ্ট ঘর্ম্মকারক।

পূর্ব্বে শোথের নিদান বর্ণনায় উক্ত হইয়াছে যে, অনেক শোথ, বিশেষতঃ তরুণ শোথ মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়ার লাঘব হওয়াতে উৎপন্ন হয়। এইরূপ মূত্রযন্ত্রের বিকৃতিবশতঃ শোথ হইলে তাহার মূত্র, পরিমাণে অল্প ও কটু হয় এবং তাহা পরীক্ষা করিলে তাহাতে এল্‌বুমেন নামক পদার্থ পাওয়া যায়। এই মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হইয়া তরুণ শোথ উপস্থিত হইলে ঘর্ম্মকারক ও বিবেচক ঔষধে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। যে হেতু ঘর্ম্মকারক ও বিরেচক ঔষধে মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়া উৎপন্ন করিয়া রক্ত হইতে অতিরিক্ত জলীয় ভাগ ও অন্যান্য অপকৃষ্ট অংশ দূর করিয়া রক্তকে সংশোধন ও শোথ আরাম করে। এবং মূত্রযন্ত্রের উত্তেজনা ও প্রদাহ দূর করিয়া উহাকেও কার্য্যক্ষম করে। হঠাৎ ঘর্ম্মরোধ হইয়া শোথ উপস্থিত হইলে সচরাচর মূত্রযন্ত্র প্রপীড়িত হয়। এইরূপ তরুণ শোথে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ভাপ গ্রহণ করিলে চর্ম্মের স্বাভাবিক ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া অতি সত্বর শোথের প্রতিকার হয়। মূত্রযন্ত্রের উত্তেজনা (কন্‌জেস্‌সেন্) বর্ত্তমানে মূত্রকারক ঔষধ দেওয়া বিধেয় নহে। ঐরূপ অবস্থায় মূত্রকারক ঔষধ দিলে পীড়িতযন্ত্রের আরও উত্তেজনা উপস্থিত হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় মূত্রযন্ত্রকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিয়া শরীরের জল নির্গমনকারী অন্যান্য যন্ত্রের ক্রিয়া উৎপন্ন করা বিধেয়। মূত্রযন্ত্রের তরুণ উত্তেজনা বর্ত্তমানে মূত্রকারক ঔষধ খাইতে না দিয়া, মূত্রযন্ত্রদ্বয়ের উপর মষ্টার্ড অথবা ব্লিষ্টার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। তৎপরে মূত্রযন্ত্র কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে এবং পীড়ার তরুণত্ব অপনীত হইলে নানাবিধ মূত্রকারক ঔষধে সুফল ফলিতে পারে। শোথরোগে বিরেচক ঔষধের মধ্যে

এক্‌সট্রাক্ট অব্ ইলেটিরিয়ম্, ক্রিম্ অব্ টার্‌টার্, জোলাপ এবং গ্যাম্বোজ এই কয়টী শ্রেষ্ঠ। এক্‌সট্রাক্ট অব্ ইলেটিরিয়ম্ $\frac{১}{৬}$ হইতে $\frac{১}{২}$ গ্রেণ মাত্রায় দেওয়া যায়। জোলাপ অবস্থাবিশেষে ২০, ৩০, ৬০ গ্রেণ পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে। যে সকল বিরেচক ঔষধে মলের সহিত শরীরের জলীয় ভাগ নির্গত করে, শোথের চিকিৎসায় সেই সকল ঔষধ নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য।

মূত্রকারক ঔষধের মধ্যে নাইট্রিকইথর, ডিজিটেলিস্ সাইট্রেট্ অব্ পোটাস্ প্রভৃতি দেওয়া যায়। নানাবিধ মূত্র কারক ঔষধ একত্রে মিশাইয়া দিলে উপকার বৃদ্ধি হয়। কোন একবিধ ঔষধে উপকার না হইলে অন্যবিধ দেওয়া যায়। মূত্রে এলব্যুমেন থাকিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত মূত্রকারক ঔষধ ব্যবহার করিতে করিতে মূত্র হইতে এলব্যুমেন দুরীভূত হয়। ডাক্তার মণিয়ার উইলিয়ম্‌স বলেন মূত্রকারক ঔষধের মধ্যে টীংচার ক্যান্‌থারাইডিস্ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। প্রথমে অতি অল্পমাত্রায় টীংচার ক্যান্‌থোরাস্ প্রয়োগ করা বিধেয়। তাহাতে উপকার হইলে ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া ১০, ১৫, ২০, ফোটা মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রথমে অল্প করিয়া উপকার না পাওয়া গেলে আর মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া কোন ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তখন উপকার না হইয়া বরঞ্চ বৃক্কদ্বয়ের প্রদাহ উৎপন্ন করে। যদি নাইট্রিকইথর ক্যান্‌থারাইডিস্ প্রভৃতি উত্তেজক মূত্রকারক ঔষধে অপকার হয়, তবে এসিটেস্ অব্ পোটাস্ বাইকার্বনেট্ অব্ পোটাস্, বেন্‌জোয়েট্ অব্ এমনিয়া এবং আইওডাইড্ অব্ পোটাসিয়ম্ প্রভৃতি দিলে চিকিৎসক ফল পাইতে পারেন। এই সকল ঔষধ ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগে সুফল না করিলে, উহাদের দুই একটী একত্রে মিশ্রিত করিয়া দিলে উপকার হইবার সম্ভাবনা।

অনেকপ্রকার পুরাতন শোথে বিভিন্নপ্রকার চিকিৎসা অবলম্বন করিতে হইবে। অনেক পুরাতন শোথ এমন আছে, যাহাতে রোগীর মূত্র স্বাভাবিক থাকে, এবং পরীক্ষা করিলে তাহাতে এলব্যুমেন (Albumen) নামক পদার্থ পাওয়া যায় না। এই সকল শোথে রোগীর যাহাতে বলবৃদ্ধি হয়, শরীরের রক্ত বৃদ্ধি হয় এইরূপ চিকিৎসা করিতে হইবে। পুষ্টিকর ও সহজ পাচ্য খাদ্য; শরীরের বল বিধানকারী ঔষধ, এই সকল অবস্থায় প্রশস্ত।

যে কোন কারণেই প্রথম উৎপন্ন হউক্ না কেন, শোথ পুরাতন আকার ধারণ করিলেই রোগীর যাহাতে বলাধান হয়, সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় কোন যান্ত্রিক বিকৃতি বর্ত্তমান থাকিলেও তদ্‌পক্ষে অল্প দৃষ্টি রাখিয়া রোগীর বলের দিকেই চিকিৎসককে বেশী লক্ষ্য করিতে হইবে। পুরাতন এল্‌ব্যুমিনিউরিয়া রোগ ও তৎসহ পুরাতন শোথ বর্ত্তমান থাকিলে ঘর্ম্মকারক ও বিরেচক ঔষধ বেশী না দিয়া নানাবিধ তিক্ত বলকারী ঔষধের সহিত আইওডাইড্ অব্ পোটাসিয়ম, অথবা ধাতুঘটিত অম্ল ঔষধি (যথা—নাইট্রিক এসিড্) প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। তবে মধ্যে মধ্যে বিরেচক অথবা ঘর্ম্মকারক ঔষধি প্রয়োগ করিলে হানি নাই। এইরূপ পুরাতন শোথে লৌহঘটিত ঔষধি বিশেষ উপকার করে। লৌহঘটিত ঔষধ-সাধ্য টীংচার কেরিপার ক্লোরাইড্ অতি উৎকৃষ্ট। এমনিয়া সাইট্রেট্ অব্ আয়রণ, আইয়ডাইড্ অব্ পোটাসিয়ম সহযোগে মিশ্রিত করিয়া দিলে সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

যকৃত যন্ত্রের ক্রিয়া বিপর্য্যয় হইয়া পুরাতন শোথ উপস্থিত হইলে মূত্র-কারক ও পিত্তনিঃসারক ঔষধি এবং তৎসঙ্গে ক্যালম্বা, সিংকোনা ও বার্ক প্রভৃতি বলকারক ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য। (ক্রমশঃ)

আয়ুর্ব্বেদে শোথরোগ।

শোথচিকিৎসা।

৪র্থ খণ্ডে প্রকাশিত ৩০৪ পৃষ্ঠার পর।

ইতিপূর্ব্বে ৪র্থ খণ্ড চিকিৎসাসম্মিলনীর ৩০২ পৃষ্ঠাতে বৈদ্যমতে শোথ-রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে কেবলমাত্র পুনর্নবাষ্টক পাঁচনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছিল। অতঃপর দেখা যাউক, কোন্ কোন্ রোগের কিরূপ অবস্থার শোথে কিরূপ চিকিৎসা করা আবশ্যক।

গ্রহণী বা অজীর্ণজনিত শোথে বাঁধাঔষধ।

সকলেই জানেন যে, গ্রহণী অথবা কোনরূপ অজীর্ণ বা আমাশয়াদি রোগে রোগী বহুকাল হইতে ভুগিতে ভুগিতে ক্রমে যখন জীর্ণ শীর্ণ বা অস্থি-

চর্ম্মসার হইয়া পড়ে, তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ হস্তপদাদিতে প্রায়ই প্রভূত শোথের সঞ্চার হইয়া থাকে। এইরূপ গ্রহণী বা অজীর্ণাদিদোষ এবং ইহা হইতে উৎপন্ন শোথের শান্তির জন্য দেশীয় বা বিদেশীয় কোনপ্রকার চিকিৎসাতেই যখন রোগীর কিছুমাত্র উপশম দেখা না যায়, তখন দুগ্ধপোষ্য শিশু হইতে অশীতি বৃদ্ধ রোগীর পক্ষেও রোগীর অভিভাবক বড়ই আগ্রহের সহিত দেশীয় কবিরাজদ্বারা এই বাঁধাঔষধ ব্যবহার করাইতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। বাস্তবিকও এই বাঁধাঔষধের এমনই অসাধারণ শক্তি যে, ইহার অসীমগুণের পরিচয় হিন্দুদিগের স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত অবগত আছেন। ঐরূপ অজীর্ণ ও শোথাদিজন্য রোগীকে অপেক্ষাকৃত জীর্ণশীর্ণ দেখিলে বাটীর কর্ত্তাদের অমতসত্ত্বেও অনেক গিন্নী বিশেষরূপ জেদপর্য্যন্ত করিয়াও আপন সন্তানসন্ততিকে অনেক সময় বাঁধাঔষধ খাওয়াইয়া থাকেন এবং তাহার ফলও সেইরূপ প্রত্যক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ফলতঃ বাঁধাঔষধটী যে, হিন্দুচিকিৎসাশাস্ত্রীয় ভৈষজ্যতত্ত্বের মধ্যে একটী অমূল্য রত্ন এবং অত্যাশ্চর্য্য ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আর একথাও খুব্ অহঙ্কারের সহিত বলিলে বোধহয় পাপ স্পর্শিবে না যে, অজীর্ণ, অর্শ ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগের দ্বারা নিতান্ত জীর্ণশীর্ণ ও শোথগ্রস্ত রোগীকে আসন্নমৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য দেশীয়ই হউক্, আর বিদেশীয়ই হউক্, যদি কোন ঔষধ থাকে, তবে এক বাঁধাঔষধই আছে। এখন দেখা যাউক, এহেন অসামান্য গুণশালী বাঁধাঔষধ ব্যাপারটা কি?

সচরাচর বাঁধাঔষধ বলিতে দুধেবড়ী, বাঁধাবড়ী, লালবড়ী, লালগুঁড়া, স্বর্ণপর্প্পটী, বিজয়পর্প্পটী, রসপর্প্পটি, লৌহপর্প্পটী ও পঞ্চামৃতপর্প্পটী প্রভৃতিকে বুঝাইয়া থাকে। অর্থাৎ ইহার মধ্যে যে কোন ঔষধ হউক, বাঁধা অর্থাৎ লবণজলাদি বন্ধ রাখিয়া কেবল দুগ্ধভাতের উপর কঠোর নিয়মপূর্ব্বক ব্যবহার করাকেই "বাঁধা ঔষধসেবন" কহিয়া থাকে। আবার অধিকাংশ লোকের দৃঢ় সংস্কার এই যে, উক্তরূপ লবণজল বন্ধ রাখিয়া কেবল স্বর্ণপর্প্পটী নিয়মপূর্ব্বক প্রয়োগই বাঁধাঔষধের মধ্যে গণ্য। যাহা হউক, এসম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও মোট কথা এই যে, যেখানে এই শ্রেণীস্থ কোন রোগীকে অন্য সমুদায় আহার বন্ধ করিয়া কেবল দুগ্ধভাতের প্রতিই রাখা হয়, তৎসমুদায় স্থলেই বাঁধাঔষধের প্রয়োগ বুঝিতে হইবেক। এখন

কথা এই যে, উপরোক্ত ঔষধগুলি যদি সমস্তই বাঁধাঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইল, তবে এরূপ রোগীর চিকিৎসার সময় কি ঐ সমস্ত গুলিরই প্রয়োগ করিতে হইবেক? না উহার মধ্যে যে কোনটীই হউক, প্রয়োগ করিলেই চলিতে পারে? কিন্তু ইহার উত্তর ত পূর্ব্বেই একরূপ দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ লবণজল বন্ধ রাখিয়া অথচ কেবল দুগ্ধভাতের প্রতিই সম্যক্ নির্ভর করিয়া উহার মধ্যের কোন একটী ঔষধ প্রয়োগ করাকেই বাঁধা-ঔষধ বলা গিয়া থাকে; সুতরাং ঐ ঔষধগুলি যে সমস্তই একত্রে ব্যবহার করিতে হয় না, একথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। তবে এস্থলে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, উপরোক্ত ঔষধগুলির মধ্যে এক একটী ঔষধের প্রতি এক এক জনের দৃঢ়বিশ্বাস আছে। কেহ স্বর্ণপর্পটী ব্যবহার করিতে বড় ভক্ত, কাহারও বা বিজয়পর্পটীর প্রতিই প্রগাঢ়ভক্তি ও অটল বিশ্বাস এবং কেহ বা কেবল রসপর্পটীর দ্বারাই কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। আবার প্রবন্ধ লেখকের বিশ্বাস ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ স্বর্ণপর্পটীই বল, আর রস-পর্পটীই বল, কিম্বা লালবড়ীই বল, আর দুধেবড়িই বল, আমার একান্ত দৃঢ়-বিশ্বাস যে, এরূপ রোগীর চিকিৎসার জন্য উক্ত কোন ঔষধেরই অপেক্ষা না করিয়া কেবল দুগ্ধভাতরূপ স্বর্গীয় পর্পটীর প্রতি নির্ভর করিয়াই রোগীকে আসন্নমৃত্যু হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। যথার্থই খুব্ সাহস-পূর্ব্বক বলা যাইতে পারে যে, এরূপ রোগীর এরূপ অবস্থায় একমাত্র দুগ্ধভাতই প্রকৃতপক্ষে সকল পর্পটীরই কার্য্য করে। অতএব যদি তাহাই হইল, তবে কি দেশীয় কবিরাজসম্প্রদায় এতই নির্ব্বোধ যে, এমন সহজ পথ প্রশস্ত থাকিতে তাঁহারা স্বর্ণপর্পটী ও বিজয়পর্পটীরূপ মহাখরচান্ত ঔষধগুলি প্রস্তুত করিয়া থাকেন? কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর আর আমি কি দিব? তবে যাঁহারা কবিরাজীশাস্ত্রে প্রকৃতপক্ষে সুশিক্ষিত, গোঁড়ামী যাঁহাদিগকে কখনও স্পর্শ করে নাই, যদি তাঁহারাই প্রকৃত সরলভাবে প্রাণের কথা খুলিয়া এপ্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত হন, তাহাহইলে পাঠকগণ অবশ্যই প্রকৃত সদুত্তর প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত সুখী হইতে পারেন। কিন্তু সেরূপ গোঁড়ামী-শূন্য কবিরাজ আপনাদের ভাগ্যে জুটিবে কি? যাহা হউক, বাঁধাঔষধ সম্বন্ধে এখনও আমাদের অনেক বলিবার রহিল। ক্রমশঃ—

এলোপ্যাথিমতে

জ্বরচিকিৎসা। *

(৫ম খণ্ডে প্রকাশিত ২৮ পৃষ্ঠার পর)

বিরাম অবস্থা।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, "এইরূপে বিবমিষা বা বমনেচ্ছার কিয়দংশ কিম্বা সম্পূর্ণরূপে নিবারণ হইলে পরে পিত্তনিঃসারক বিরেচক ঔষধ সকল প্রদান করিবে।" অতএব সেই সকল বিরেচক ঔষধ কি, তাহা বলা যাইতেছে।

আমি বিরেচনক্রিয়ার জন্য প্রথমতঃ নিম্নলিখিত প্রস্ক্রীপসন্ ব্যবহার করি। যথা—

ব্লু পিল— ৫ গ্রেণ।

পডোফিলিম্— ১ গ্রেণের তৃতীয়াংশের এক অংশ।

হায়োসায়োমসের সার—৩ গ্রেণ।

এই সকল একত্রে মিশ্রিত করিয়া দুইটী বটীকা নির্ম্মাণ করিবে। এবং রাত্রে শয়নকালে অর্থাৎ নিদ্রার পূর্ব্বে রোগীকে প্রদান করিবে। পরদিবস প্রাতে কোন লাবণিক বিরেচক অর্থাৎ ইনোজ্ফ্রুট্ সল্ট কিম্বা পাইরেটিক্ স্যালাইন্ অথবা অপর কোনও তীব্র বিরেচক ঔষধ সুস্বাদাকারে প্রয়োগ করিবে। আমি কম্পাউণ্ড জ্যালাপ্ চূর্ণ, সিরাপ্ রোজ এবং গোলাপজল এই তিনটী একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রাতে রোগীকে পান করিতে দিয়া থাকি। সকল বিরেচক ঔষধের পরিমাণই রোগীর বয়সের পরিমাণ এবং দৈহিক অবস্থার প্রতি সম্যক্ নির্ভর করে। অতএব চিকিৎসক বিবেচনা পূর্ব্বক তাহাদের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিবেন। উত্তমরূপে

---

* এই প্রবন্ধ কোন গ্রন্থবিশেষ হইতে অনুবাদিত নহে। ডাক্তার জগবন্ধু বাবু বহুকাল হইতে সহস্র সহস্র রোগীর চিকিৎসা করিয়া চিকিৎসাসম্বন্ধে তাঁহার বহুদর্শনজনিত যে জ্ঞান জন্মিয়াছে, লম্বা চৌড়া ও ভাষার আড়ম্বর না করিয়া অতি সংক্ষেপে কেবলমাত্র তাহাই লিখিলেন। চি, স, স।

বিরেচন হইলে নাইট্রো মিউরিয়্যাটিক্ য়্যাসিড্, নিশাদল, নাইট্রিক্ ইথার, ট্যারাক্সেকমের সার. কোন তিক্ত ক্বাথ বা ফাণ্টের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবসে তিনবার করিয়া সেবন করিবে। যদ্যপি স্রাব য়্যাসিড্ সহ্য না হয়, তাহাহইলে লাইকার য়্যামোনিয়া য়্যাসিটেটিস্, নিশাদল, বাইকার্ব্বনেট্ অব্ পটাশ, নাইট্রিক্ ইথার, ট্যারাক্ সেকমের সার, এই সকল কোন উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের ক্বাথ বা ফাণ্টের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করিবে। পরে স্রাবা কমিয়া গেলে কিম্বা একবারে দূরীভূত হইলে জ্বরের বিরামবস্থায় কুইনাইন্ নাইট্রোমিউরিয়্যাটিক্ য়্যাসিডের সহিত মিশ্রিত করিয়া দুই দুই ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করিবে। ক্রমশঃ—

কার্ত্তিক।
কলিকাতা } শ্রীজগদ্বন্ধু বসু, এম্, ডি,

বৈদ্যমতে পুরাতন জ্বর।

চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত ২২৯ পৃষ্ঠার পর।

যিনি যাহাই বলুন, বর্ত্তমান বিষম জ্বর বা ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দূষিত জলবায়ুজনিত ম্যালেরিয়াবিষের অপেক্ষা আধুনিক পর্য্যাপ্ত কুইনাইনসেবন বিশেষতঃ রসের সম্যক্ পরিপাক পাইতে না পাইতেই তদুপরি চর্ব্ব্যচোষ্যাদি ভোজন এবং জ্বরসারার পরেও ২। ৪ দিন একটু বিশ্রাম না করা প্রভৃতি কারণগুলিকেই যেন বড়ই গুরুতর কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কেবল যে, হিন্দু-চিকিৎসা-শাস্ত্রীয় বচনের বলেই আমরা পরানুবৃত্তিপ্রিয় ও কেবলমাত্র হিন্দুনাম-ধারী ব্যক্তির নিকট একথা এত সাহসপূর্ব্বক বলিতেছি, তাহা নহে; বেশ প্রণিধানপূর্ব্বক আমরা পদে পদে বহুলদৃষ্টান্তদ্বারাই অহোরহ প্রমাণ পাইতেছি যে, অস্বাভাবিক বলপূর্ব্বক নূতন জ্বরের সহিত যুদ্ধ করা ও শেষে নিয়ম রক্ষা না করাতেই প্রায়শঃ অনেক ব্যক্তিই যকৃৎ বা প্লীহাসংযুক্ত পুরাতন বিষমজ্বর বা ম্যালেরিয়াজ্বরে সমধিক কষ্টভোগ করিয়া অবশেষে জীবনের আশা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। সুতরাং

যতদিন ভারতবর্ষে আবার লোকের "ব্যায়ামক ব্যবায়ক" ইত্যাদি বচনগুলি নূতন জ্বরান্তে ইষ্টমন্ত্র স্বরূপ না হইবে—যতদিন লোকের ২। ১ দিনের নূতনজ্বরেই আহারের জন্য ব্যগ্রতা না ঘুচিবে, বিশেষতঃ সেই উদ্দেশ্যে কুইনাইনের টানও কম না পড়িবে, ততদিনের মধ্যে যে ভারত-বর্ষ হইতে এই সর্ব্বনাশকারী ম্যালেরিয়া বা বিষমজ্বর একবারে দূরীভূত বা আংশিকও নিবারিত হইবে, তাহার আশা অতি অল্প। আর বিদে-শীয় রাজত্বে কেবল চাকুরীগতপ্রাণভারতবর্ষীয়গণ চাকুরীরদায়ে হিন্দুয়ানী রক্ষা করিয়াও যে ঐ সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিয়া উঠিবেন, সে বিশ্বাসও যেন কেহ না করেন। সুতরাং পরপদ-দলিত ভারতবাসীয় পরাধীন অবস্থায় যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহাই হইতে থাকুক, আমরা এসম্বন্ধে এস্থলে আর কিছুই বলিব না। অতঃপর দেখা যাউক যে, পূর্ব্বকথিত কারণসমূহ হইতে নূতন জ্বর ক্রমে ম্যালেরিয়া বা পুরাতনবিষম জ্বরে পরিণত হইয়া ক্রমশঃ কিরূপ অবস্থায় উপস্থিত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, নূতন জ্বর সারার অব্যবহিত পরেই আহা-রাদির অত্যাচারবশতঃ বাতাদিদোষ প্রকুপিত হইয়া রস ও রক্তাদি ধাতুকে আশ্রয়করতঃ সন্তত ও সততাদি জ্বর জন্মায়। অতএব সেই সন্ত-তাদি জ্বরের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। আবার ইহাও অগ্রে জানা আবশ্যক যে, সন্তত জ্বর রসকে আশ্রয় করিয়া, সতত জ্বর রক্তকে আশ্রয় করিয়া, অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর মাংসকে আশ্রয় করিয়া, তৃতীয়ক জ্বর মেদ ধাতুকে আশ্রয় করিয়া এবং চাতুর্থক জ্বর অস্থি ও মজ্জা এই উভয় ধাতুকেই আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যে জ্বর সাত, দশ কিম্বা বার দিন ব্যাপিয়া অবিচ্ছেদীক্রমে ভোগ করে, তাহার নাম সন্তত জ্বর। (২) যে জ্বর রাত্রিদিবসের মধ্যে দুইবার প্রকাশ পায়, তাহার নাম সততকজ্বর। (৩) যে জ্বর রাত্রিদিনের মধ্যে একবারমাত্র প্রকাশ হয়, তাহার নাম অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর। (৪) যে জ্বর তৃতীয় দিবসে প্রকাশিত হয় অর্থাৎ এক-দিন অন্তর এক দিন প্রকাশ হয়, তাহার নাম তৃতীয়ক জ্বর। আর যে জ্বর চতুর্থ দিবসে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ দুই দিবস অন্তর এক দিবস জ্বর হয়, তাহার নাম চাতুর্থক জ্বর। পরন্তু এই শেষোক্ত জ্বরের বিপরীত আর একপ্রকার জ্বর আছে, তাহার নাম চাতুর্থকবিপর্য্যয় জ্বর। এই জ্বরের

নিয়ম এই যে, এক দিবস জ্বর হইয়া ক্রমে দুই দিবস ভোগ করে, মধ্যে একদিন মাত্র ভাল থাকে। এই শেষোক্ত তৃতীয়ক ও চাতুর্থক উভয় জ্বরকেই আমাদের দেশে সাধারণে পালা জ্বর বলিয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রথমটীকে আবার কেহ কেহ "একাজ্বরও" বলেন। ক্রমশঃ—

দেশীয়-স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।

আহার-তত্ত্ব।

ইহা বোধহয় সকলেই অবগত আছেন যে, আমরা প্রতিনিয়ত যে সমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ করি, তৎসমস্ত দ্রব্যে সাধারণতঃ ছয়টী রস বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ গুড়, মধু ও দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্যে মধুর রস (১) আমড়া, তেঁতুল ও লেবু প্রভৃতি দ্রব্যে অম্লরস (২) দেশীলবণ, বিট্‌লবণ ও সৈন্ধবলবণ প্রভৃতি দ্রব্যে লবণরস (৩) মরিচ, লঙ্কা ও চৈ প্রভৃতি দ্রব্যে কটু অর্থাৎ ঝালরস (৪) পলতা, হেলেঞ্চা ও নিমপাতা প্রভৃতি দ্রব্যে তিক্তরস (৫) এবং হরীতকী ও আমলকী প্রভৃতি দ্রব্যে কষায়রস (৬) বিদ্যমান থাকে। বলা বাহুল্য যে, যে কোন দ্রব্যই হউক, উক্ত ছয়টী রসের মধ্যে কোন না কোনটী রস প্রত্যেক দ্রব্যে বিদ্যমান্ থাকিবেই থাকিবে। তন্মধ্যে কোন কোন দ্রব্যে আবার ২।৩টী করিয়া রসও বিদ্যমান থাকে। যেমন সুপক্ক আম্র ইত্যাদি। এখন কথা এই যে, যে ভোজ্যবস্তু প্রাণীগণের প্রাণস্বরূপ, এহেন পরম প্রয়োজনীয় পদার্থ সমূহের সাধারণতঃ গুণ কি, তাহা মানবমাত্রেরই জানা থাকা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। কিন্তু এক চিকিৎসক ভিন্ন সর্ব্বশ্রেণীস্থ লোকের পক্ষে দুগ্ধ, মৎস্য, গুড় ও তেঁতুল প্রভৃতি সর্ব্বপদার্থেরই গুণাগুণ অবগত থাকা বড় সহজ কথা নহে। অথবা একবারেই তাহা অসম্ভব। কিন্তু ইহা বোধ করি অসম্ভব নহে যে, মোটের উপর উক্ত ছয়টী রসের গুণাগুণের বিষয় স্মরণ রাখা কাহারও পক্ষে তাদৃশ কষ্টকর নহে। অর্থাৎ যে কোন মিষ্টরসপ্রধান-দ্রব্যমাত্রেরই সাধারণ গুণ এই—কোন অম্লরস-প্রধান-দ্রব্যমাত্রেরই সাধারণ গুণ এই—এবং যে কোন তিক্তরস-প্রধান-দ্রব্যমাত্রেরই প্রধান গুণ এই, ইত্যাদি কথা স্মরণ রাখিয়া ভোজন করা

বোধ করি কাহারও পক্ষেই অসঙ্গত নহে। আপত্তি নাই দেখিয়াই আমরা আজ্ আয়ুর্ব্বেদ-ভাণ্ডারের রত্নস্বরূপ চরকসংহিতা হইতে উক্ত ছয় রসের গুণাগুণের বিষয় পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিতেছি। আশা করি, বুদ্ধিমান্ পাঠক, নিম্নলিখিত ছয়টী রসের গুণাগুণ দেখিয়া নিত্যভোজ্য প্রায় সমস্ত দ্রব্যেরই গুণাগুণ স্থির করিয়া লইতে পারিবেন।

চরক বলেন—

(১) তেষাং ষণ্ণাং রসানামেকৈকস্য যথাদ্রব্যগুণকর্ম্মাণ্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তত্র মধুরো রসঃ শরীরসাত্ম্যাদ্রসরুধিরমাংসে মেদোঽস্থিমজ্জৌজঃশুক্রাভিবর্দ্ধন আয়ুষ্যঃ ষড়িন্দ্রিয়প্রসাদনো বলবর্ণকরঃ পিত্তবিষমারুতঘ্নস্তৃষ্ণাপ্রশমনঃ ত্বচ্যঃ কেশ্যঃ কণ্ঠ্যঃ প্রাণনো জীবনস্তর্পণঃ স্নেহনঃ স্থৈর্য্যকরঃ ক্ষীণক্ষতসন্ধানকরঃ ঘ্রাণমুখকণ্ঠৌষ্ঠতালুপ্রহ্লাদনো দাহমূর্চ্ছাপ্রশমনঃ ষট্পদপিপীলিকানামিষ্টতমঃ স্নিগ্ধঃশীতো গুরুশ্চ।

অর্থাৎ—পূর্ব্বোক্তপ্রকার ছয়টী রসের মধ্যে প্রত্যেকটীর দ্রব্যানুযায়ী গুণ এবং কর্ম্মের বিষয় বলা হইতেছে। তন্মধ্যে (১) মধুর রসের গুণ যথা—মধুররস শরীরের পক্ষে হিতজনকহেতু রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র এবং ওজধাতুর বৃদ্ধি করে; আয়ুর্ব্বর্দ্ধক হয়; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এবং মনের প্রসন্নতা জন্মায়; বল ও বর্ণপ্রদাতা; পিত্ত, বিষ এবং বায়ুনাশক; তৃষ্ণানাশক, ত্বক্ কেশ এবং কণ্ঠের হিতজনক, আহ্লাদজনক, জীবন, শুক্রবর্দ্ধক, তর্পণকারক, শরীরের স্থৈর্য্যকারক, ক্ষীণশরীরের পুষ্টিকারক, উরঃক্ষত রোগের মঙ্গলকারক; নাসিকা, মুখ, কণ্ঠ, ওষ্ঠ এবং জিহ্বার প্রসন্নতাকারক; দাহ এবং মূর্চ্ছানাশক; ভ্রমর এবং পিপীলিকা প্রভৃতির অতিশয় আনন্দদায়ক, স্নিগ্ধ, শীতল এবং গুরু।

(২) অম্লোরসো ভক্তং রোচয়তি, অগ্নিং দীপয়তি, দেহং বৃংহয়তি, ঊর্জ্জয়তি, মনোবোধয়তি, ইন্দ্রিয়াণি দৃঢ়ীকরোতি, বলং বর্দ্ধয়তি, বাতমনুলোময়তি, হৃদয়ং তর্পয়তি, আস্যং সংস্রাবয়তি, ভুক্তমপকর্ষতি, ক্লেদং জনয়তি

ক্রমশঃ—

☞ স্থানাভাবজন্য আগামীবারে প্রকাশ্য।

পুরাতন প্লীহারোগের চিকিৎসা।

এলোপ্যাথিমতে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩২ পৃষ্ঠার পর)

সকলেই অবগত আছেন যে, প্লীহারোগের প্রধান কারণ কম্পজ্বর। ক্রমাগত কম্পদিয়া জ্বর আসিতে আসিতে রোগীর প্লীহা ও যকৃৎ ক্রমে ক্রমে বড় হইয়া উঠে। রোগ-নিদানজ্ঞ ডাক্তারগণ বলেন যে, প্রতি কম্পে শরীরের বাহিরের রক্ত ভিতরদিকে গমন করিয়া দেহমধ্যস্থ যন্ত্রসকলে সঞ্চিত হয় এবং তাহাতেই প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি হইয়া উঠে। এইটী হইতেছে ডাক্তার ফারগুসনের মত। পাঠকগণ জানিয়া রাখিবেন শীতের গুণ-সঙ্কোচক এবং উষ্ণতার-গুণপ্রসারক। সমুদায় পদার্থ শীতপ্রভাবে সঙ্কুচিত হয় এবং উষ্ণতায় প্রসারিত হয়। শীতকালে অধিকক্ষণ জলে থাকিলে হাতের ও পায়ের নোখের চর্ম্ম সঙ্কুচিত হইয়া যায়। গাত্রে শীত লাগিলে গাত্রের লোমকূপ সমুদয় সঙ্কুচিত হইয়া রুদ্ধ হইয়া যায় এবং গা কাঁটা দিয়া উঠে। কম্পজ্বর হইলেও ঐরূপ গা কাঁটা দিয়া উঠে। কম্পজ্বর হওয়ার দরুণ রোগীর সমস্ত শরীরের চর্ম্ম ও বাহ্যিক শিরা সমুদয় সঙ্কুচিত হইয়া উপরকার রক্ত ভিতরদিকে দৌড়াইতে থাকে এবং প্লীহা ও যকৃতে সংগৃহীত হইয়া উহাদের আয়তন বৃদ্ধি করে। কিন্তু সুধু খানিক রক্ত জমিয়া যে ঐ সকল যন্ত্রকে আপাততঃ আয়তনে বৃদ্ধি করে তাহা নহে। ঐ সকল যন্ত্রের প্রত্যেক উপাদান বৃদ্ধি হইয়া যন্ত্রটী স্থায়ীরূপে বৃদ্ধি হয়। সুধু খানিক রক্ত জমিয়া বড় হইলে উহার বৃদ্ধি স্থায়ী হইত না, কারণ রক্ত সরিয়া গেলেই যন্ত্রটী পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইত। যকৃৎ ও প্লীহার শিরারমধ্যে পুনঃ পুনঃ রক্তসঞ্চালিত হইয়া উহাদের পোষণ বৃদ্ধি হইতে থাকে, এজন্যই যন্ত্রগুলি স্থায়ীরূপে বাড়িয়া উঠে। কিন্তু সুধু কম্পজ্বর হইলেই যে প্লীহার বৃদ্ধি হয়, এমত নহে। ম্যালেরিয়াপ্রদেশে বহুদিন বাস করিলে কম্পজ্বর না হইলেও ক্রমে প্লীহা বাড়িয়া উঠে। আবার তরুণজ্বরে পথ্য ও চিকিৎসার দোষেও রোগীর যকৃৎ ও প্লীহা বৃদ্ধি হইয়া উঠে। অতিরিক্ত কুইনাইনসেবন বশতঃও যকৃৎ প্লীহার বৃদ্ধি ও তৎসঙ্গে পুরাতন জ্বর হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশের লোকের সংস্কার আছে যে, কাঁচাজ্বরে কুইনাইন খাইলে অনিষ্ট হয়, একথাটী অতি

যথার্থ। কবিরাজেরা তরুণজ্বরে প্রথম দুই চারিদিন উপবাস দেন, তাহাতে রোগীর সমুদয় রস পরিপাক হইয়া যায়, কিন্তু ডাক্তারগণ গোড়া হইতেই রোগীকে পথ্যপ্রদান করেন, তাহাতে সমূহ অনিষ্ট হয় এবং এইরূপে কাঁচা-জ্বরে পথ্য দেওয়া প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধির একটা প্রধান কারণ। অতিরিক্ত কুইনাইন সেবনদ্বারা প্লীহাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একরূপ অবিচ্ছেদী জ্বর উপস্থিত হয়, উহাকে কুইনাইনের জ্বর বলা যায়।

যকৃৎ প্লীহাগ্রস্ত রোগীর জ্বর দুই রকমের আকার ধারণ করে, একরূপ জ্বর ছাড়িয়া ছাড়িয়া আসে, কাহারও বা কম্প হয়, কাহারও বা কম্প হয়না। আর একরূপ জ্বর দিবারাত্র লাগিয়া থাকে, কখনও বা জ্বরের বেগ কম হয়, কখনও বা বেশী হয়। সচরাচর প্রাতে অল্প বিরাম উপস্থিত হয়। কাহারও বা দিবারাত্র জ্বর সমান ভোগ করে। একই রোগীতে এইরূপ জ্বরের নানা অবস্থা দেখা যায়। এইরূপ জ্বর হইতে হইতে রোগী ক্রমশই রক্তহীন হইয়া উঠে। রোগ বেশী পুরাতন হইলে অবশেষে অন্যান্য নানা রোগ আসিয়া ধরে। কাহারও কাহারও কাসী উপস্থিত হয়। তবে এই কাসরোগে সচরাচর ফুষফুষের কোন বিশেষ পীড়া উপস্থিত হয় না, তবে যকৃতে প্লীহার চাপ লাগিয়া ফুষফুষের রক্তাধিক্যতা (Congestion) উপস্থিত করে। কাহারও কাহারও পরিণামে শোথ উপস্থিত হইয়া সমুদয় শরীর ফুলিয়া উঠে। কাহারও রক্তামাশয়ের ব্যারাম উপস্থিত হয়। কিন্তু এই রোগের সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক উপসর্গ মুখে ঘা হওয়া। মুখে ক্ষত হইলে প্রায় রোগীই দুঃশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে। এই মুখে ঘা দুই রকমের হইয়া থাকে, কাহারও প্রথমে দাঁতের গোঁড়া অল্প অল্প ফুলিয়া উঠে এবং তৎপরে দাঁতের গোড়ায় ঘা হইয়া ঐ ঘা ক্রমেই বিস্তৃত হয়। কাহারও বা প্রথমত গাল ফুলিয়া উঠে। গালের উপরিভাগ লাল হয় এবং চক্ চক্ করে। পরে দুই এক দিনমধ্যেই গালের মাংস পচিয়া খসিয়া পড়িয়া যায়। এইরূপ ঘা হইয়া অনেকের প্রায় সমুদয় মুখ খসিয়া পড়ে। এই ঘা হইবার সময় জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি হয়। কাহারও বা জ্বর সারিয়া গিয়াও রোগ আরোগ্যোন্মুখ হইয়াও ক্ষত উপস্থিত হয় এবং পুনরায় জ্বর প্রকাশ হয়। অনেকের প্লীহা সারিয়া গিয়া এবং রোগীর শরীর সারিয়া গিয়া বহুদিন পরে মুখে ক্ষত দেখা যায়। পরন্তু যে সকল রোগী

দীর্ঘকাল প্লীহাদ্বারা আক্রান্ত হইয়া রোগ ভোগ করিয়াছে, তাহাদের জীবন শীঘ্র নিরাপদ হয় না। কোন কোন স্থানে রোগ সারিবার একবৎসর পরেও মুখে ঘা হয়। এবং জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়. আবার ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত স্থানে এমন অনেক লোক দেখা যায় যাহাদের পেটে বারমাস প্লীহা ও যকৃৎ রহিয়াছে অথচ তার সঙ্গে জ্বর প্রভৃতি অন্য কোন উপসর্গ নাই। এই সকল রোগীর উদর প্রায়ই মোটা দেখা যায়। অনেক লোক বেশ স্বাভাবিক শরীরে থাকে এবং প্লীহার দরুণ তাহাদের বিশেষ কোন শারীরিক অসুখ হয় না। আমরা এক ব্যক্তির বিষয় জানি, অতি শৈশবকাল হইতে তাঁহার পেটে প্লীহা আছে। প্লীহাটী নিতান্ত ছোট নহে, তিনি কহেন উহা আমার বাস্ত প্লীহা। এবং সচরাচর কহিয়া থাকেন যে, তাঁর প্লীহা আরাম হইলেই তিনি আর বাঁচিবেন না। তাঁহার বয়ক্রম এখন ৪০।৪৫ বৎসর। তাঁহার শরীর বেশ সবল আছে এবং বিলক্ষণ পরিশ্রম করিতে পারেন। সহসা দেখিলে তাঁর পেটে যে অতবড় প্লীহা আছে তাহা অনুমান করিবার যো নাই।

প্লীহারোগে সচরাচর ডাক্তারেরা লৌহঘটিত ঔষধ সলফিউরিক্ এসিড ও কুইনাইন ব্যবহার করিয়া থাকেন। এখনকার অধিকাংশ ডাক্তারি প্যাটেণ্ট ঔষধ প্রধানত এই কয়েকটী উপাদানে বিনির্ম্মিত। ডাক্তারগণ বলেন-কুইনাইন নিয়মপূর্ব্বক খাইলে প্লীহা ক্ষুদ্র হইয়া যায়। কিন্তু আমরা যতদূর জানি অধিকাংশ স্থলেই কুইনাইন প্রয়োগে বিশেষ ফল ফলিতে দেখা যায় না। অনেক স্থানে সুধু কুইনাইন প্রয়োগে কিছুমাত্র ফল ফলিতে দেখা যায় না। বিশেষতঃ যে সকল স্থলে রোগী পূর্ব্বে কুইনাইন খাইয়াছে, সেরূপ স্থলে কুইনাইন প্রয়োগে জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি হয়। আমরা ইহা সচরাচর প্রত্যক্ষ করিতেছি। যদি রোগী পূর্ব্বে বেশী কুইনাইন না খাইয়া থাকে এবং রোগ স্বল্পদিনের হয়, তবে নিম্নলিখিত মিক্‌চারে অতি সত্বর উপকার হয়। যথা ;—

ফেরিসল্‌ফেটিস্ (হিরাকশ)	...	...	১ গ্রেণ কি ২ গ্রেণ
এসিড্ সল্‌ফিউরিক্ ডাইলুট	...	...	১০ মিনিম
কুইনাইন ...	...	...	৫ গ্রেণ
ইন্ ফিউসন্ কোয়াসিয়া	...	...	২ আউন্স

মিশ্রিত করিয়া একমাত্রা ঔষধ তৈয়ার কর। এই ঔষধ জ্বরের বিরাম-

কালে তিনবার করিয়া কিছুদিন খাওয়াইলে অতি সত্বর উপকার হয়। অবস্থা বিশেষে কুইনাইনের মাত্রা বৃদ্ধি বা কম করিয়া দিতে হয়। রোগীর যদি কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, তবে প্রতিমাত্রা ঔষধের সঙ্গে ২ ড্রাম মাত্রায় সল্‌ফেট্‌ অব্‌ম্যাগ্‌নেসিয়া মিশ্রিত করিয়া দিলে বেশ দাস্ত খোলসা হইয়া অতি সত্বর উপকার করে। অনেক স্থলে সল্‌ফেট্‌ অব্‌ ম্যাগ্‌নেসিয়া বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে হয়। কারণ অনেক স্থলে ইহার অযথা-প্রয়োগনিবন্ধন রোগীর আমাশয়ের ব্যাম উপস্থিত করে। সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত যে, সল্‌ফেট্‌ অব্‌ ম্যাগ্‌নেসিয়ার জোলাপ উষ্ণদেশের পক্ষে তত হিতকারী নহে। সল্‌ফেট্‌ অব্‌ ম্যাগ্‌নেসিয়া প্রয়োগ করিতে হইলে উহার সঙ্গে একটু টীংচার জিঞ্জার (Tincture ginger) মিশাইয়া দেওয়া উচিত। তাহাহইলে আর পেটের তত অসুখ হইবে না। এই মিক্‌চার খাইতে খাইতে যখন রোগীর জ্বরবন্ধ হইবে, তখন কুইনাইনের মাত্রা ক্রমে কম করিয়া প্রতি মাত্রা ঔষধ এক গ্রেণ কি ২ গ্রেণ মাত্র দেওয়া উচিত। যে রোগী পূর্ব্বে অনেক কুইনাইন খাইয়াছে, তাহাকে আর কোন-মতেই কুইনাইন দেওয়া উচিত নয়। যে রোগী অনেক দিন রোগ ভোগ করিয়া একবারে রক্তশূন্য হইয়াছে, তাহাকেও কুইনাইন প্রয়োগে কোন ফল হইতে দেখা যায় না। বরঞ্চ যতই কুইনাইনের মাত্রা বৃদ্ধি করা যায়, ততই জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি হয়। অনেক রোগী সুধু সল্‌ফিউরিক এসিড্‌ এবং ফেরিসল্‌ফেট্‌ সেবনদ্বারা আরোগ্য হয়। এই ঔষধ দীর্ঘকাল সেবন করা দরকার। দুই চারি দিনে কোন উপকার হয় না। দুই গ্রেণ মাত্রায় বিশুদ্ধ ফেরিসল্‌ফেট্‌ এবং ১০।১৫ বিন্দু ডাইলুটেড্‌ সল্‌ফিউরিক্‌ এসিড্‌, দুই আউন্স পরিমাণ কোয়াসিয়া বা চিরেতা ভিজান জলের সহিত প্রত্যহ তিনবার করিয়া খাইতে দিলে উপকার হয়। অবস্থাবিশেষে নিম্নলিখিত মিক্‌চারে বেশ ফল পাওয়া যায়। যে সকল স্থানে জ্বরের বিরাম পাওয়া যায় না, সেই-খানে এই ঔষধটীতে বেশ ফল পাওয়া যায়। যথা ;—

ক্লোরেট্‌ অব্‌ পোটাস্‌	৫—১০ গ্রেণ
এসিড্‌ সল্‌ফিউরিক্‌ ডাইলুট্‌	১০ ফোটা
ফেরিসল্‌ফেটিস্‌	১ গ্রেণ
ইন্‌ফিউসেন্‌ কুয়াসিয়া	২ আউন্স

একমাত্রা। প্রত্যহ তিনবার চারিবার সেবন করিতে দেওয়া যায়। যদি জ্বরের প্রকোপ বেশী থাকে, তবে প্রথম প্রথম ফেরিসল্‌ফেট্‌ বাদ দিয়া অবশিষ্ট ঔষধ খাওয়াইতে হইবে। কারণ লৌহঘটিত ঔষধ, অধিক জ্বরের উপর পড়িলে স্থানে স্থানে জ্বরবেগ বৃদ্ধি করে।

যদি রোগী অষ্টপ্রহর জ্বরভোগ করে এবং তাহার যকৃৎপ্রদেশে বেদনা থাকে, তবে কিয়দ্দিবসপর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ঔষধ দিলে সত্বর উপকার হয়।

এসিড্‌ নাইট্রোমিউরিয়েটিক্‌ ডিল্‌		...	...	৫—১০ মিনিম্‌
পোটাসিয়ম্‌ ক্লোরেট্‌		...	...	৫—১০ গ্রেণ
পল্‌ভ্‌ইপিকাক্‌	...	...	...	$\frac{১}{২}$ গ্রেণ-১ গ্রেণ
টীংচার রিয়াই	...	...	...	$\frac{১}{২}$ ড্রাম
ইন্‌ ফিউশন্‌ কোয়াসিয়া	...	...	...	১ আউন্স

মিশ্রিত করিয়া একমাত্রা। প্রত্যহ তিনবার চারিবার করিয়া প্রয়োগ করিবে। তৎপরে জ্বর বিরাম হইলে অথবা জ্বরের লাঘব হইলে পূর্ব্বোক্ত ফেরিসল্‌ফেট্‌ ও কুইনাইন্‌ যুক্ত ঔষধ খাওয়াইবে। উপরোক্ত ব্যবস্থায় পল্‌ভ্‌ইপিকাকের পরিবর্ত্তে ভাইনম্‌ ইপিকাক্‌ ৫ ফোটা মাত্রায় দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ভাইনম্‌ ইপিকাক্‌ প্রায়ই বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না। ভাইনম্‌ ইপিকাক্‌ অপেক্ষা পল্‌ভ্‌ইপিকাক্‌ সমধিক কার্য্যকারী। পল্‌ভ্‌ইপিকাক অগ্রে বেশ করিয়া গুলিয়া লইতে হয়। পরে প্রতিবার ঔষধ খাওয়াইবার সময় শিশি নাড়িয়া খাওয়াইতে হয়। যকৃৎ প্রদেশে অধিক বেদনা থাকিলে ঐ ব্যবস্থায় ক্লোরেট্‌ অব্‌ পোটাসের পরিবর্ত্তে ক্লোরাইড্‌ অব্‌ এমনিয়ম্‌ ১০ গ্রেণ মাত্রায় দেওয়া যাইতে পারে।

সোজাসুজি প্লীহারোগে নিম্নলিখিত গুঁড়া ব্যবহারেও উপকার পাওয়া যায়। যথাঃ—

কার্ব্বনেট্‌ অব্‌ আয়রণ		...	...	২ গ্রেণ
কুইনাইন	...	...	...	৫ গ্রেণ বা ৩ গ্রেণ
পল্‌ভ্‌রিয়াই	...	...	...	৫ গ্রেণ
জিঞ্জার পাউডার		...	...	৫ গ্রেণ

একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী পুরিয়া হইবে। এইরূপ পুরিয়া জ্বরের বিরা-

মাবস্থায় প্রত্যহ তিনটী করিয়া খাওয়াইতে হইবে। যে সকল রোগী উগ্র লৌহঘটিত ঔষধ সহ্য করিতে না পারে, তাহাদিগকে কার্ব্বনেট্ অব্ আয়রণ দিতে পারা যায়।

রোগ একটু কঠিন আকারের হইলে যদি সহজে জ্বর বন্ধ না হয়, তবে প্রথমে লিখিত ফেরিসল্ফেট্ ও কুইনাইনমিক্চারের সঙ্গে টীংচারওপিয়ম ৫—৮ মিনিম মাত্রায় দিলে অতি শীঘ্র উপকার পাওয়া যায়। কোন কোন প্লীহাসংযুক্ত কম্পজ্বর কেবল লৌহ ও কুইনাইন ব্যবহারে কিছুতেই বন্ধ হয় না। ঐ সকল স্থলে কুইনাইন এবং অহিফেন ও তৎসহ ক্লোরেট্ অব্ পোটাসিয়ম্ মিশ্রিত করিয়া দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। যে জ্বর শুধু কুইনাইনে বন্ধ হয় না, সেখানে কুইনাইন ও ক্লোরেট্ অব্ পোটাসিয়ম একত্রে দিলে কুইনাইনের কার্য্যকারী ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়।

প্লীহারোগে ক্লুয়োরাইড্ অব্ এমনিয়ম্ নামক আর একটী ঔষধ প্রচলিত হইয়াছে। ইহা অর্দ্ধ গ্রেণ হইতে দুই গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই ঔষধে অতি ত্বরায় প্লীহার আয়তন কমাইয়া আনে। ক্লুয়োরাইড্ অব্ এমনিয়ম্ প্রত্যহ তিনবার করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। নিম্নলিখিত প্রেস্ক্রপ্সন্ মতে ঔষধ তৈয়ার করিয়া দিলে অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

ক্লুয়োরাইড্ অব্ এমনিয়ম্	...	...	৫০ গ্রেণ
কুইনাইন্ ...	..	...	১০০ গ্রেণ
নক্সভমিকা পাউডার	...	...	১০০ গ্রেণ
আর্সিনিয়েট্ অব্ আয়রন্	...	...	১০ গ্রেণ

একত্র মিশ্রিত করিয়া ১০০ শত বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধের এক একটী বটিকা প্রতি দিন তিন বার করিয়া খাইতে দিতে হইবে।

ব্রোমাইড্ অব্ পোটাসিয়ম্ প্লীহারোগে উপকারী। রোগ একটু কঠিন হইলে অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে রাত্রে ১০ গ্রেণ মাত্রায় এক আউন্স ইন্ফিউসেন্ কোয়াসিয়ার সহিত এক বার করিয়া দিতে পারা যায়। ব্রোমাইড্ অব্ পোটাসিয়মে প্লীহার আকার ক্ষুদ্র করে এবং রোগীর ক্ষুধাবৃদ্ধি করে।

প্লীহারোগে আয়ডিন্ প্রয়োগে বিশেষ্ ফল পাওয়া যায়। অন্যান্য কোন ঔষধে উপকার না হইলে সময় সময় ইহাতে বেশ ফল পাওয়া যায় কিন্তু

ইহা সুধু না দিয়া অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া দিতে হইবে। আয়ডিন্ অর্দ্ধ গ্রেণ মাত্রায় দেওয়া যায়। নিম্নলিখিত মিক্‌চার বিশেষ ফলপ্রদ।

আয়ডিন্	... .	৩ গ্রেণ
পোটাসিয়ম্ আয়ডাইড্	... ...	৫ গ্রেণ
ফেরিসল্‌ফেট্	... ..	৬ গ্রেণ
ইন্‌ফিউসন্ কোয়াসিয়া	... ...	৬ আউন্স

একত্র মিশ্রিত করিয়া ছয় ভাগ কর। উহার এক ভাগ করিয়া প্রত্যহ তিন বার করিয়া খাওয়াইলে অতি সত্বর প্লীহাজ্বর আরোগ্য হয়। সম্প্রতি একটী প্লীহাগ্রস্ত বালিকার চিকিৎসায় উপরোক্ত ঔষধে বিশেষ উপকার হইয়াছে। রোগিণীর বয়ক্রম ১৫। ১৬ বৎসর। আজ প্রায় দেড়বৎসর প্লীহাজ্বরে কষ্ট পাইতেছিল। যখন প্রথম চিকিৎসাধীন হয়, তখন তাহার গাত্রে রক্তের লেশমাত্র ছিল না। প্লীহা উদরের অর্দ্ধেকের অপেক্ষা অধিক স্থান ব্যাপিয়াছিল। প্রথমে ফেরিসল্‌ফেট্ এবং কুইনাইন্‌মিক্‌চার দেওয়া হয়। তাহাতে প্রথমে দুই এক দিন জ্বর বন্ধ হইয়া আবার জ্বরপ্রকাশ হয়। পরে সেই একই ঔষধ খাওয়ান গেল কিন্তু জ্বর কমিল না। তখন উল্লিখিত অয়ডিন্‌মিক্‌চার এক সপ্তাহ খাওয়াইতে জ্বর বন্ধ হইয়া গেল। এবং প্লীহাও পূর্ব্বাপেক্ষা আকারে ছোট এবং টিপিতে নরম বোধ হইল। চক্ষের কোণে বেশ রক্ত দেখা গেল। আয়ডিন্‌ঘটিত ঔষধ তৈয়ার করিতে হইলে প্রথমতঃ আয়ডিন্ এবং পোটাসিয়ম্ আইওডাইড্ একত্রে একটু জল দিয়া গলাইয়া লইতে হয়। সুধু আয়ডিন্ জলে গলে না। এজন্য পোটাসিয়ম্ প্রয়োজন।

আয়ডিন্ ও লৌহঘটিত ঔষধ ফেরি আয়ডাইড্ আকারেও ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু ফেরি আওডাইড্ অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত মিশ্রনে বেশী ফল ফলিতে দেখা গিয়া থাকে।

প্লীহারোগে পেঁপিয়ার আঠা অনেকে উপকারী বলেন। কিন্তু আমরা দুইটী রোগীতে পরীক্ষা করিয়া ইহারদ্বারা বিশেষ কোন উপকার হইতে দেখি নাই। পেঁপিয়ার আঠা চিনিসহযোগে বটিকাকারে খাওয়াইতে হয়। এবং পেঁপিয়ার তরকারী পথ্য দিতে হয়। ১৮৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট পত্রিকায় ইভার্সসাহেব যকৃত-প্লীহাবিবৃদ্ধিরোগে

কাঁচা পেঁপিয়ার আঠার বিস্তর সুখ্যাতি করিয়াছেন। তিনি বলেন এক ড্রাম পেঁপিয়ার আঠা চিনিসহ মিশ্রিত করিয়া তিনটী বটিকা করিতে হইবে এবং প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যায় তিন বার খাইতে বলেন। পেঁপিয়ার আঠা খাইলে পাকস্থলী অল্প জ্বালা করে। ছোট ছোট শিশুদিগকে দিতে হইলে খুব অল্পমাত্রায় দেওয়া উচিত। পেঁপিয়ার আঠা বেশী দিনের প্লীহা-রোগে উপকার করে না। তবে অল্প দিবসের প্লীহারোগে বিধিপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে বোধ হয় উপকার হইবার সম্ভবনা। ইহার আরও পরী-ক্ষার প্রয়োজন।

অধিক দিনের পুরাতন প্লীহারোগের আর একটী সুন্দর চিকিৎসা আছে। পাতিলেবুর রসের সহিত ফেরিএট্ কুইনিসাইট্রাস্ নামক ঔষধ নিয়মপূর্ব্বক দীর্ঘকাল খাইলে প্লীহাবিবৃদ্ধিরোগে বিশেষ উপকার করে। একটী পাতি-লেবু চারি পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া জলদ্বারা অগ্নিতে সিদ্ধ করিতে হইবে। পরে উহা বেশ করিয়া জল সহিত কাপড়ে বাঁধিয়া নিঙ্গাড়াইয়া রস বাহির করিতে হইবে। একটী লেবুতে দুইবার ঔষধ খাওয়ান চলিবে। তার পর ঐ রসের অর্দ্ধেক পরিমাণ দুই গ্রেণ ফেরিএট্ কুইনিসাইট্রাসের সঙ্গে একবার প্রাতে এবং এক বার বৈকালে সেবন করিতে হইবে। লেবুর রস ম্যালে-রিয়াজ্বরে খুব উপকারী।

প্লীহারোগে প্লীহা অত্যন্ত বড় ও শক্ত হইলে প্রায় কোন ঔষধে উপকার হয় না। জ্বর সারিয়া গেলেও প্লীহার আকার কমান একরূপ অসাধ্য হইয়া উঠে। খুব দীর্ঘকাল ঔষধ ব্যবহার করিলে কিরূপ ফল হয় বলা যায় না কিন্তু তত দিন রোগীর ধৈর্য্য থাকে না। এবং প্রায় রোগীর অবস্থাতেও কুলায় না। যদি রোগী বেশীদিনেররও হয় অথবা তাহার প্লীহা টিপিলে তত শক্ত বোধ না হয়, তবে ঐ প্লীহা শীঘ্র শীঘ্র কমিয়া যায়। যে প্লীহা লম্বাকারে বৃদ্ধি হয়, তাহা শীঘ্র আরাম হয়। যে প্লীহা কচ্ছপের ন্যায় গোলাকার হয় এবং টিপিলে শক্ত বোধহয়, তাহা শীঘ্র আরাম হয় না।

কিন্তু প্লীহারোগের চিকিৎসায় সর্ব্বাপেক্ষা পথ্যের দিকে মনোযোগ করিতে হইবে। এই সকল স্থলে ঔষধ অপেক্ষা পথ্যের দ্বারায় অধিক উপ-কার হয়। পথ্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া সুধু ঔষধ খাওয়াইলে আশানুরূপ ফল হয় না।

অনেক চিকিৎসক মহাশয়দিগের সংস্কার আছে যে, প্লীহারোগে শরীর রক্তহীন হইয়া দুর্ব্বল হইয়া যায়, অতএব বলকারী পথ্য খুব্ বেশীপরিমাণে দিতে হইবে। কিন্তু অত্যন্ত জীর্ণরোগীতে যদিও বলকারী পথ্যের প্রয়োজন, তথাপি অপেক্ষাকৃত সবল রোগীকে বিশেষ বলকারী পথ্য না দিলেও চলে। বরঞ্চ বলকারী পথ্য অত্যধিক পরমাণে না দিয়া সোজাসুজি পথ্যের উপর রাখিলে অতি সত্বর জ্বর ও প্লীহা কমিয়া আইসে। অনেক রোগীতে এরূপ দেখা গিয়া থাকে যে, ডাক্তার মহাশয় রোগীর জ্বর আরাম করিলেন, রোগী উপরেও বেশ সবল দেখা গেল, কিন্তু উহার প্লীহা ক্রমেই বৃদ্ধি ও শক্ত হইতে লাগিল। এইরূপ রোগী আশু আরোগ্যলাভ করিলেও পরিণামে আবার অতি সত্বর পীড়িত হইয়া থাকে। পরন্তু সবলকারী পথ্য অত্যধিক পরিমাণে দিলে প্লীহা ও যকৃতের আয়তন বৃদ্ধি করে। বিশেষ জীর্ণ রোগীর আহারের দিকে বিশেষ স্পৃহা থাকিলেও পরিপাক শক্তি এত অধিক কমিয়া আইসে যে, সে অধিক পরিমাণে আহার কখনই সহ্য করিতে পারে না। যে যেমন ব্যক্তি তার তেমনি আহার, এইটীই স্বাভাবিক। অতএব রোগীর বল বিবেচনায় পথ্য প্রদান করিলেই সমূহ উপকার হয়। ডাক্তারগণ রোগীর বল হ্রাস করিতে চান না, রোগীর বল রাখিয়া চিকিৎসা করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট, কিন্তু এইরূপ বল রাখিয়া চিকিৎসা করিবার প্রথা এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তাঁহাদের অনেকেই প্রয়োজন হউক বা না হউক, সর্ব্বদা অধিক পরিমাণ পুষ্টিকর পথ্যপ্রদান করিয়া থাকেন। এই সকল পথ্যের জোরে রোগটী আরও বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়ায়। পরন্তু পথ্যসম্বন্ধে আমাদিগের দেশীয় কবিরাজ মহাশয়েরা যেরূপ মনোযোগ করেন, ডাক্তারগণ সেরূপ করেন না। তবে অনেক স্থলে কবিরাজ মহাশয়েরা প্রয়োজন হইলেও বলকারী পথ্যপ্রদান করেন না। সুতরাং কোন কোন স্থানে তাহাতে তাঁহাদের রোগী আরও রক্তহীন এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। পরন্তু পথ্যসম্বন্ধে আধুনিক ডাক্তারিমতের পথ্য এবং কবিরাজ মহাশয়দিগের পুরাতন প্রথা এই দুয়ের একটীও সম্যক উপযোগী বলিয়া বোধ হয় না। জীর্ণরোগীর পথ্যসম্বন্ধে এই দুই চিকিৎসার মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া কার্য্য করিলে অমৃতের ন্যায় ফল ফলিতে দেখা যায়।

জ্বরসংযুক্ত প্লীহারোগীর সর্ব্বাগ্রে ভাত পথ্য বন্ধ করা কর্ত্তব্য। আমরা

সর্ব্বদা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, ভাত বন্ধ না করিলে সহজে জ্বর ছাড়ান যায় না। অল্পই হউক আর বেশীই হউক, দিন কয়েকের জন্ত ভাত খাওয়া একবারেই বন্ধ করা ভাল। অনেক স্থলে এরূপ দেখা যায় যে, লৌহ এবং কুইনাইন ঘটিত ঔষধ দিয়া কোনই ফল বুঝিতে পারা যাইতেছে না। কিন্তু সেই ঔষধের কোন অংশ পরিবর্ত্তন না করিয়া রোগীকে ভাত বন্ধ করিয়া শুষ্ক পথ্য দিলেও দুই চারিদিন মধ্যে জ্বর বন্ধ হইয়া যায়। দুই একখান পাতলা রুটী, একটু মুগের ডালের, একটু চুনামাছের ঝোল ইত্যাদি পথ্য দেওয়া বিধেয়। দুগ্ধ অনেক স্থলে অপকারী। আমরা অনেক স্থলে দুই-মাস পর্য্যন্ত রুটী পথ্য দিয়া রোগীকে রাখিয়াছি এবং তাহাতে বেশ উপকার হইয়াছে। রুটী প্রথমে একবেলা দেওয়া উচিত। পরে ক্ষুধা বৃদ্ধি হইলে বৈকালে দুএকখান দেওয়া যাইতে পারে। প্লীহারোগীকে ওজন করিয়া পথ্য দেওয়া ভাল। উত্তমরূপে জ্বর ছাড়িয়া গেলে তখন অতি সূক্ষ্ম তণ্ডুল ওজন করিয়া তাহার ভাত রাঁধিয়া দেওয়া ভাল। প্রথমে একছটাক চালের ভাত ও অর্দ্ধছটাক মাত্র মুগের ডাল ও একটু চুনামৎস্যের ঝোল একবেলা করিয়া দেওয়া উচিত। এবং সন্ধ্যাকালে ১ খান কি ২ খান রুটী খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। পরে যখন রোগী অত্যন্ত ক্ষুধায় অস্থির হইবে, তখন ক্রমে পথ্য বাড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। ক্রমশঃ—

প্লীহারোগ।

বৈদ্যমতে।

জ্বর ও কাসি-প্রভৃতিরোগের ন্যায় বর্ত্তমান সময়ে প্লীহারোগও একটী বিশেষ আলোচ্যের মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিয়াছে। কেন না সে কালে এ রোগের এত অধিক প্রাদুর্ভাব ছিল না সুতরাং তখন বাহুল্যরূপে আলোচনারও প্রয়োজন হয় নাই। কেবল প্লীহারোগ বলিয়া নহে, যকৃৎ এবং উপদংশাদি আরও কতকগুলি রোগও পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কচিৎ কখনও দৃষ্টি-

গোচর হইত বলিয়া বৈদ্যশাস্ত্রে তাহাদেরও আলোচনা অতি বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। এবং সেই জন্যই বোধ হয় আধুনিক ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রে এই সমস্ত রোগের যত অধিক আলোচনা ও যেরূপ বিস্তৃতভাবে চিকিৎসা-প্রণালী দৃষ্টিগোচর হয়, বৈদ্যশাস্ত্রে ঠিক তাদৃশ হয় না। তথাপি মোটের উপর ঐ সমস্ত রোগের চিকিৎসাসম্বন্ধে বৈদ্যশাস্ত্রে যতটুকু আলোচনা আছে, তদ্দ্বারাই বৈদ্যচিকিৎসকদিগের এবং সাধারণেরও কার্য্যসিদ্ধি হয় বলিয়াই সকলের বিশ্বাস বদ্ধমূল আছে।

প্লীহারোগের লক্ষণ অথবা আকারপ্রকারাদিসম্বন্ধে বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। তবে ইহার উৎপত্তির কারণ অবশ্য অনেকে না জানিতে পারেন। যে যে কারণে যেরূপে সম্ভবতঃ প্লীহার উৎপত্তি হইতে পারে, ডাক্তার সম্পাদক, তাহা উত্তমরূপেই বর্ণন করিয়াছেন। তথাপি বৈদ্যমতে এই রোগের উৎপত্তির কারণ ও সম্প্রাপ্তি কি, তাহা নিম্নে বলা যাইতেছে,—

বৈদ্যশাস্ত্র বলেন,—

"শোণিতাজ্জায়তে প্লীহা বামতো হৃদয়াদধঃ।
রক্তবাহিশিরাণাং স মূলং খ্যাতো মহর্ষিভিঃ॥"

অর্থাৎ ঋষিগণ বলিয়াছেন যে, রক্ত হইতেই হৃদয়ের অধোভাগে বামপার্শ্বে প্লীহা জন্মিয়া থাকে এবং সেই প্লীহা রক্তবাহীশিরাসমূহের মূল।

"বিদাহ্যভিষ্যন্দিরতস্য জন্তোঃ প্রদুষ্টমত্যর্থমসৃক্‌কফশ্চ।
প্লীহাভিবৃদ্ধিং কুরুতঃ প্রবৃদ্ধো তং প্লীহসংজ্ঞং গদমামনন্তি॥
বামে স পার্শ্বে পরিবৃদ্ধিমেতি বিশেষতঃ সীদতি চাতুরোঽত্র।
মন্দজ্বরাগ্নিঃ কফপিত্তলিঙ্গৈরুপদ্রুতঃ ক্ষীণবলোঽতি পাণ্ডুঃ॥"

অর্থাৎ বিদাহপাকী ও অভিষ্যন্দকারক দ্রব্যাদি নিয়ত অধিক সেবন করিলে রক্ত ও কফ প্রদুষ্ট হইয়া শরীরস্থ প্লীহাকে বৃদ্ধি করে। এজন্যই উহাকে প্লীহারোগ বলে। এই প্লীহা বামপার্শ্বে বর্দ্ধিত হয় এবং ইহাদ্বারা রোগীর শরীর পাণ্ডুবর্ণ, অবসন্ন, অল্পজ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও বলহানি হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন রোগী শ্লেষ্মা ও পিত্তজনিত উপদ্রবেও উপদ্রুত হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ—

ঔষধপ্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী।

কবিরাজিমতে।

জ্বরাধিকার।

পর্প্পটী।

ভ্বাদিগণীয় পর্প ধাতুর অর্থ—গতি। "অট্" একটী উণাদিকপ্রত্যয়। পর্প ধাতুর উত্তর অট্ প্রত্যয় করিয়া পর্পট শব্দ গঠিত হইয়াছে। পর্পটী ঈপ্-বিহিত প্রথমান্ত পদ। প্রকৃতিপ্রত্যয়ের সার্থকতা পর্পটী প্রস্তুত-প্রণালী অবগত হইলে বুঝা যাইবে।

প্রক্রিয়াবিশেষে রসগন্ধক দিয়া পর্পটী প্রস্তুত হয়। আবার রসগন্ধকের সহিত দ্রব্যান্তর সংযোগ করিয়া নানাবিধ পর্পটী প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পারদ ও গন্ধকে কজ্জলী করিয়া সেই কজ্জলী দিয়া যে পর্পটী করা যায়, তার নাম "রসপর্পটী"। কজ্জলীর সহিত দ্রব্যান্তর যোগে স্বর্ণপর্প্পটী, লৌহ-পর্পটী, পঞ্চামৃত পর্পটী, বিজয় পর্পটী প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সকল পর্পটী, রসগ্রন্থে, গ্রহণীরোগ চিকিৎসাধিকারে উক্ত হইয়াছে।

রসপর্পটী স্বয়ং একটী ঔষধ, আবার স্থলবিশেষে ঔষধের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়। পুটপাকের বিষম-জ্বরান্তক লৌহনামক প্রসিদ্ধ ঔষধের অন্যতম উপাদান রসপর্পটী। অন্য কয়েকটী ঔষধেও ইহা উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়; এই জন্য জ্বরাধিকারে পর্পটীর নির্ম্মাণ ও ক্রিয়া প্রভৃতি বর্ণিত হইল। পক্ষান্তরে জ্বররোগে উদরাময়, শোথ প্রভৃতি পীড়ার যোগ থাকিলে অবস্থা অনুসারে সর্ব্বপ্রকার পর্পটীই প্রযুক্ত হয়। সুতরাং এই স্থলেই সর্ব্বপ্রকার পর্পটীর প্রস্তুত, ক্রিয়া এবং প্রয়োগ প্রণালীর বিষয় বিশদরূপে বলা যাইবে।

রসপর্পটী।

মল, শিখী এবং বিষনামক তিনটী পারদের নৈসর্গিক দোষ। স্বভাবতঃ পারদে এই দোষত্রয় বিদ্যমান থাকে। মলদোষ, শিখিদোষ এবং বিষদোষ-

দুষ্ট পারদ সেবনে ত্রিবিধ [illegible] সম্ভাবনা। পারদে মলদোষ বিদ্যমান থাকিলে মূর্চ্ছারোগ জন্মিতে পারে। শিখিদোষে দাহাখ্য পীড়া উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা, বিষদোষে হিক্কাসম্ভবের আশঙ্কা আছে। সুতরাং অগ্রে এই ত্রিবিধ দোষ নষ্ট করিয়া লইতে হয়।

গৃহকন্যা পারদের মলদোষ নষ্ট করে। একখানি সুদৃঢ় পাথরের খলে উপযুক্ত পরিমাণ পারদ রাখিয়া গৃহকন্যা অর্থাৎ ঘৃতকুমারীর স্বরস দিয়া মাড়িবে। যে পরিমাণ রস দিলে, রসে পারদ মগ্ন হয়, তাবন্মাত্র রস দিতে হইবে। ঘৃতকুমারীর পত্রাভ্যন্তরে যে স্বচ্ছ পদার্থ থাকে, তাহাই উহার স্বরস বলিয়া কথিত হয়। ইহা সংযত অবস্থায় থাকে। মাড়িলে তরল হইয়া যায়। অগ্রে গৃহকন্যা স্বরস মাড়িয়া তরল করিয়া লইবে, তারপর পারা দিবে। সংযত অবস্থায় দিলে পারা মগ্ন হয় না কাজেই পরিমাণ ঠিক পাওয়া যায় না। স্বরসে ও পারদে মাড়িতে মাড়িতে যখন রস বিলয় হইয়া যাইবে, তখন রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। এই প্রক্রিয়ায় পারদের মলদোষ বিদূরিত হয়।

ত্রিফলা অর্থাৎ হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া। ত্রিফলা পারদের শিখি অর্থাৎ বহ্নিদোষনাশক। অস্থি অর্থাৎ আটী বাদ দিয়া ত্রিফলাগণোক্ত প্রত্যেক দ্রব্য চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। প্রত্যেক প্রকার চূর্ণের পরিমাণ পারদের সমান ভাগে গ্রহণ করিবে, সুতরাং মিলিত ত্রিফলা-চূর্ণ পারদের তিনগুণ হইবে। এই ত্রিগুণ চূর্ণের সহিত পারদ খলে ২ দুই প্রহরকাল মর্দ্দন করিবে। তৎপরে পারা পৃথক করিয়া লইবে। মাড়িতে মাড়িতে ত্রিফলাচূর্ণের সহিত পারা জড়াইয়া যাইবে; কাজেই পৃথক করিবার সময় জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া পুনরপি খলে জল ঢালিয়া দিয়া ঘুঁটিয়া উপরের জল আস্তে আস্তে ঢালিয়া ফেলিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিলে ত্রিফলা চূর্ণ ভাসিয়া বাহির হইয়া যাইবে। গুরুত্ব প্রযুক্ত পারা নীচে থাকিয়া যাইবে। তারপর রৌদ্রে শুকাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হয়।

চিত্রক পারদের বিষদোষনাশক। রক্তচিতার পাতার [illegible] সহিত পারদ মাড়িয়া মাড়িয়া শুষ্ক করতঃ পৃথক করিয়া লইবে। ইহাতে পারদের বিষদোষ নষ্ট হয়। রসমযোচিত মাত্রায় চিতাপাতার স্বরস দিতে হইবে।

নৈসর্গিকদোষ ক্ষালনান্তর, পর্পটী প্রস্তুতার্থ পারদের বিশেষ শুদ্ধিতার

আবশ্যক। তাহার প্রণালী এইরূপ,—প্রস্তর খলে পারদ রাখিয়া জয়ন্তী-পত্রের স্বরসযোগে মর্দ্দন করিবে। রসমযোচিত মাত্রায় স্বরস দিতে হয়। যতক্ষণে রস শুষ্ক না হয় তাবৎকাল মর্দ্দন করিতে হইবে। তার পর এরণ্ড-পত্রের স্বরসে ঐ প্রকারে পারদ মগ্ন করিয়া মাড়িতে মাড়িতে শুকাইয়া ফেলিবে। তার পর আদার স্বরসে। তাহার প্রণালীও ঐরূপ। সর্ব্বশেষে কাকমাচীর পাতার স্বরসের সহিত ঠিক ঐ ভাবে মর্দ্দন করিয়া লইবে। শেষে প্রক্ষালন করিয়া পারদ পৃথক করিয়া লইবে। এইরূপে শোধিত পারদ পর্পটী প্রস্তুতার্থ ব্যবহার্য্য। ক্রমশঃ—

মাগুরা পোঃ অঃ বারুইপাড়া } শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন।

তৈলপাক ও প্রয়োগপ্রণালী।

গতবারে তৈলপাকসম্বন্ধে কল্ক ও ক্কাথপাকবিষয়ক যে মতভেদের উল্লেখ করা গিয়াছে, সম্প্রতি সেই মতের মীমাংসা এবং তৎসঙ্গে আমাদের মন্তব্য প্রচার এখন থাক্। কেননা সম্মিলনীর সুযোগ্য লেখক ও পাঠক কবি-রাজ মহোদয়গণের মতামত জানিয়া পরে আমাদের মত প্রকাশ করিব। অতএব আশা করি, আগামীবারে কবিরাজ মহোদয়গণ স্ব স্ব মতের পোষকতাপূর্ব্বক সদ্যুক্তিপূর্ণ মীমাংসাদ্বারা আমাদিগকে বাধিত করিবেন। সম্প্রতি তৈলপাকের নিয়ম বর্ণিত হইতেছে।

তৈল বা ঘৃত পাক করিতে প্রধানতঃ দুইটী পদার্থের দরকার। তন্মধ্যে একটী কল্কদ্রব্য এবং অপরটী দ্রবদ্রব্য। আয়ুর্ব্বেদীয় পণ্ডিতগণ এই দুইটী উপাদানকেই তৈলাদি স্নেহপাকের প্রধান অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। কারণ এই দুইটী প্রধান পদার্থ ভিন্ন কোনমতেই ঘৃততৈলাদির পাকক্রিয়া [illegible] হইতে পারে না।

কল্ক এবং দ্রব এই উভয়পদার্থের মধ্যে কোন্‌টীকে কল্ক এবং কোন্‌টীকে দ্রবপদার্থ বলে প্রথমতঃ তাহাই বলা যাইতেছে। যথা—যে সকল দ্রব্য পেষণকরতঃ স্নেহগর্ভে প্রদান করিতে হয়, তাহাকে কল্কদ্রব্য বলে, আর

জল, কাথ, স্বরস, দধি, দুগ্ধ ও কাঁজী ইত্যাদি তরলপদার্থকে দ্রবপদার্থ বলে। এস্থলে স্বরস, কল্ক এবং কাথ এই কয়টীর পারিভাষিক অর্থ চিকিৎসা-শিক্ষার্থী পাঠকগণের জ্ঞাত থাকা নিতান্ত আবশ্যক। যেহেতু ইহার পর যে সকল তৈলপাকের বিষয় বর্ণিত হইবে, তন্মধ্যে অধিকাংশ তৈলপাকেই ইহাদের নামোল্লেখ থাকিবে। সুতরাং নিম্নে ইহাদের অর্থ বিশেষরূপে বলা যাই-তেছে। যথা—

(১) স্বরস—দ্রব্যকে জলসংযুক্ত না করিয়া কুট্টিত অর্থাৎ থেঁতো করিয়া পীড়ন করিলে অর্থাৎ নিঙড়াইলে তাহা হইতে যে রস বাহির হয়, তাহাকে স্বরস বলে।

(২) কল্ক—আর্দ্র অর্থাৎ কাঁচা কিংবা শুষ্কবস্তু জলসংযুক্ত করিয়া পেষণ করিলে তাহাকে কল্ক বলা যায়।

(৩) কাথ—দ্রব্য কুট্টিত করিয়া তাহাতে আবশ্যকমত জল অথবা অন্য-কোন্ দ্রবপদার্থের সহিত অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধকরতঃ তাহার (ঐ সকল সিদ্ধ-দ্রব্যের) কিট্টাংশ (ছাঁকা) পরিত্যাগ করিয়া যে জলভাগ গ্রহণ করা যায়, তাহাকে কাথ বলে।

তৈলপাকের প্রধান অঙ্গস্বরূপ উপরি উক্ত দ্রব এবং কল্কের মধ্যে সর্ব্বত্রই দ্রবের আবশ্যক। কিন্তু কল্ক সর্ব্বত্র আবশ্যক হয় না। যেহেতু কল্ক ব্যতীতও কোন কোন স্থলে তৈলাদিপাকের উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এরূপ স্থল অতি বিরল। প্রায় অধিকাংশস্থলেই কল্কদ্বারা স্নেহপাকের বিধান দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আশ্বিন কলিকাতা } শ্রীজগদ্বন্ধু সেনগুপ্ত কবিরাজ।

---

(১) যন্ত্রপ্রপীড়নাদ্ দ্রব্যাদ্ রসঃ স্বরস উচ্যতে।

(২) যৎ পিণ্ডং রসপিষ্টনাং তৎকল্কং পরিকীর্ত্তিতং।

(৩) বহ্নৌ তু কথিতং দ্রব্যং শৃতমাহুশ্চিকিৎসকাঃ।
অত্র শৃতশব্দেন কাথো গৃহ্যতে। উক্তশ্চ কাথস্ত পর্য্যায়াঃ।
শৃতঃ কাথঃ কষায়শ্চ নির্য্যূহঃ স নিগদ্যতে।

ক্রমশঃ—

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ভাবিয়াছিলাম এবারেই কফ ও কাথপাকের মতভেদসম্বন্ধে লেখকের চূড়ান্ত মন্তব্য বাহির হইবে। এবং সেই সঙ্গে আমরাও কিছু বলিব, কিন্তু এখন দেখি, এবারেও তিনি বরাত দিয়া সারিলেন। এখন কথা এই যে, এইরূপ বরাতে বরাতে ক্রমে আসল কথা উড়িয়া যাইবে না ত? চি, স, স,

---

শিশুচিকিৎসা।

হোমিওপ্যাথিমতে।

পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩০ পৃষ্ঠার পর।

অন্যান্য ঔষধের প্রয়োগ লক্ষণ।

একোন। জ্বরের সহিত শর্দ্দি হইলে প্রথমাবস্থায় ইহাই উৎকৃষ্ট।

এমন-কার্ব্ব। পুনঃ পুনঃ হাঁচি, নাসারন্ধ্র সম্পূর্ণ আবদ্ধ, শিশু প্রতিবার নিদ্রাকর্ষনকালে চমকে উঠে, চক্ষু হইতে জলস্রাব এবং বায়ুনলিতে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ানি শব্দ শ্রুত হইলে ইহাই ব্যবস্থা।

এমন-মিউ। নাসিকা হইতে প্রচুর জলস্রাব হইলে ইহাতে উপকার দর্শে।

এরাম-ট্রিফাইলাম। নাসিকা হইতে প্রচুর জলস্রাব, উহা অতিশয় উষ্ণ ও পুঁজ সদৃশ, নাসারন্ধ্র উষ্ণ ও উহাতে ক্ষত প্রকাশ, অল্প জ্বর, ত্বক উষ্ণ ও শুষ্ক থাকা ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

সিপা। নাসিকা হইতে প্রচুর জলবৎ ক্ষতকারক নিস্রাব এবং প্রচণ্ড কাশির সহিত চক্ষু হইতে জলস্রাব হইতে থাকিলে ব্যবস্থা।

ক্যামমিলা। জলবৎ বা শ্লেষ্মার ন্যায় তরলপদার্থ নাসিকা হইতে অনবরত স্রাব হওয়া ইহার লক্ষণ।

ডালকামারা। শুষ্ককাশি বহির্ব্বাতাসে এবং বায়ু পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি হইলে ইহাতে আরোগ্য হইবে।

ইলাপ্স-কর। পুনঃ পুনঃ হাঁচি, সামান্ত বায়ু গাত্রে লাগিলে নাসিকা হইতে জলস্রাব, নাসিকা হইতে সাদা জলবৎ শ্লেষ্মা নিস্রাব হওয়া ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

ইউফ্রেসিয়া। নাসিকা হইতে অনবরত প্রচুর জলস্রাব, চক্ষু হইতে উগ্র জলস্রাব হেতু চক্ষের পাতায় ক্ষত প্রকাশ হইলে ব্যবস্থা।

আইয়োডাম। শিশুর দেহ উষ্ণ ও নাসিকা উত্তপ্ত এবং উহা হইতে প্রচুর জলস্রাব হইতে থাকিলে উপকার দর্শে।

কালি-বাইক্রো। নাসাস্রাব কঠিন ও সূত্রাকার, ঐ প্রকার শ্লেষ্মা কণ্ঠ মধ্যে সঞ্চার হইয়া শ্বাসাবরোধ হওয়ার আশঙ্কা থাকিলে ইহাই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মার্ক-সল। নাসারন্ধ্র আরক্ত, শুষ্ক, ক্ষতযুক্ত; অনবরত হাঁচি এবং নাসিকা হইতে প্রচুর জলবৎ শ্লেষ্মাস্রাবে ব্যবস্থা।

নাক্স-ভমিকা। নাসা-শর্দ্দি হেতু শিশু স্তনপান করিতে অক্ষম' বিশেষ রাত্রে ও প্রত্যুষে অধিক হইলে ইহাতে ফল দর্শিবে।

সাম্বুকাস। নাসারন্ধ্র সম্পূর্ণ শুষ্ক এবং আবদ্ধ, শিশুর শ্বাস গ্রহণ করিতে অসুবিধা হইলে ব্যবহার করা আবশ্যক। নাকে কথার ন্যায় শব্দ করা ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

ষ্টিক্টা-পালমা। উপদাহ হেতু অনবরত নাসিকা ফুলান, কিন্তু কোন প্রকার পদার্থ স্রাব হয় না।

সালফার। জলের ন্যায় প্রচুর নিস্রাব থাকিলে ইহাই ব্যবস্থা

টার্টর এমেটীক। নাসারন্ধ্র আবদ্ধ ও বায়ু নলীতে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ শ্রুত হওয়া ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

৩। কার্ডিয়াকৃস্প্যাজম্ বা যকৃতের বিবৃদ্ধি। ইহাতে পাকাশয় ও যকৃত স্থান হটাৎ কঠিন হইয়া স্ফীত হয় ও শ্বাসাবরোধ হইয়া আসিতে থাকে, শিশু ক্রমে অস্থির হইয়া উঠে, ক্রন্দন করে, শয্যায় এপাশ ওপাশ করিতে থাকে ও পদদ্বয় পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করে। ক্যামমিলা ইহার অমোঘ ঔষধ।

৪ শিশুর শ্বাসকাস। অনেকে ইহাকে ক্রুপ বলিয়া অনুমান করেন বস্তুত তাহা নহে। শিশুর ইহা এক প্রকার বক্ষের আক্ষেপ এবং ঐ আক্ষেপ হেতু শ্বাস বন্ধ হইয়া মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া উঠে, শিশু হটাৎ জাগ্রত হইয়া

উঠে, এবং শিশু হটাৎ জাগ্রত হইয়া করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকে, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ ও উদ্বেগগ্রস্থ হয় এবং শূন্য ও শুষ্ক কাশি হইতে আরম্ভ হয়। ইহার প্রধান ঔষধ ইপিকা; উহার দুইটী মাত্র বটিকায় সচরাচর আরোগ্য হয়, কখন কখন সাম্বুকাস ব্যবহারে উপকার দর্শে বিশেষ যে স্থলে নিদ্রাকালীন আক্রমণ হইয়া শিশু চিৎকার করিয়া উঠে ও শুষ্ক কাশি অনবরত হইতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের কোন প্রকার অস্বাভাবিক অবস্থা হেতু উৎপন্ন হইলে লরোসিরেসাস বা মস্কাস ব্যবহারে শান্তি হইবে, শিশু অতিশয় ক্ষীণ ও দুর্ব্বল ও লম্বা হইলে ফস্‌ফরাস উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৫। শিশুর অনিদ্রা। মাতার আহারের অত্যাচার ও অনিয়ম হেতু সন্তানের অনিদ্রা সচারচর ঘটে, যথা কাফি, চা, বা গুরুপাক দ্রব্য ইত্যাদি সেবন। ঐ সকল কুব্যবহার পরিত্যাগ করা সত্বেও যদি অনিদ্রা জন্মে তাহা হইলে কফিয়ার একটী বটিকা সেবন করাইলে প্রায়ই নিদ্রা হইবে, না হইলে ও শিশুর উদরে বায়ু সঞ্চার হেতু স্ফীত হইলে ক্যামমিলা ব্যবহারে উপকার হইবে, শিশুর মস্তকে রক্তসঞ্চার ও মুখমণ্ডল আরক্ত দেখিলে ওপিয়াম এক মাত্রায় নিদ্রা হইবে। কোন ঔষধে উপকার না হইলে রেনানকিউলাস-বালবোসাস দ্বারা বিশেষ ফল দর্শিবে।

৬। অজ্ঞাত কোন কারণ হেতু ক্রন্দন। কোন কারণ ব্যতীত স্তনাপায়ী শিশুরা প্রায় ক্রন্দন করে না, ক্রন্দন করিলে বুঝিতে হইবে যে কোন না কোন প্রকার অসুস্থতা ঘটিয়াছে, গাত্রের কোন স্থান চুলকাইলে বা শয্যার কোন অংশে কিছু গাত্রে বিদ্ধ হইলে বা কোন বাহ্যিক কারণে হউক ক্রন্দন করিতে পারে, সে স্থলে বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিতে হইবে, কোন কারণ পাইলে তাহা নিবারণ সত্বেও যদি ক্রন্দন করে তাহা হইলে নিম্নলিখিত অবস্থানুসারে ঔষধ প্রয়োগে শান্তি হইতে পারে। রাগ হেতু ক্রন্দনে একোন, ক্যাম বা আর্ণিকা। ভয়জনিত হইলে, ওপিয়াম, বেলেডনা ও ইগ্নেসিয়া। ক্রন্দনের সহিত তড়কা, দেহ কঠিন, উদর স্ফীত এবং মস্তক পশ্চাতে পুনঃ পুনঃ প্রক্ষিপ্ত করিতে থাকিলে ক্যামমিলা। শিশু অতিশয় অস্থির ওত্বক উষ্ণ হইলে কফিয়া বা একোনাইট। মুখমণ্ডল আরক্ত দৃষ্ট হইলে একোন ও বেল ব্যবস্থা। ক্রন্দন কোন ক্রমে নিবারণ না হইলে

বেল, একোন ও কফিয়া। শিশু অতিশয় অস্থির হইয়া প্রচণ্ড বেগে হাত পা নিক্ষেপ করিলে টার্টার-এমেটিক্ উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৭। অন্ত্রশূল ও পরিপাক যন্ত্রের বিকৃতি। শিশুর অন্ত্রশূল হইলে নানাপ্রকার উপসর্গ দ্বারা সহজে জ্ঞাত হওয়া যায়; যথা, দেহ মোচড়ান, বায়ু নিঃসরণ, পদদ্বয় আকর্ষণ করা ও ক্রন্দন ইত্যাদি। যে সকল ঔষধ এ রোগে প্রয়োগ হয় তাহাদিগের প্রয়োগ লক্ষণ নিম্নে দেওয়া গেল।

একোন। শিশুর গাত্র শুষ্ক ও উষ্ণ, অনিদ্রা বা মধ্যে মধ্যে নিদ্রাভঙ্গ, অতিশয় ক্রন্দন, আপনার হাত কামড়ান, সবুজ বর্ণের বা সাদা দাস্ত হওয়া ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

আর্সেনিক। অজীর্ণভুক্ত দ্রব্য দাস্তের নিঃসরণ, মল অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত, স্তনপান ও দুগ্ধ সেবন কালে ও পরে অতিশয় ক্রন্দন, এবং শিশুর দেহ ক্রমে কৃশ হইতে থাকিলে ব্যবস্থা।

বেরাইটা-কার্ব্ব্য। খর্ব্বাকৃতি শিশুর অন্ত্রশূল, ক্ষুধা সত্বে আহারের অনিচ্ছা, সামান্য আহার করিলে উদর পূর্ণ হওয়া অনুভব হইলে উপকার দর্শে।

বেলেডনা। হটাৎ চিৎকার করিয়া ক্রন্দন, এবং কিছুক্ষণ পরে পুনরায় হটাৎ শান্ত হওয়া, পেশির উৎক্ষেপ সহকারে চমকে উঠা, শিশু অতিশয় ক্রন্দন করে; কাতরস্বরে ক্রন্দন দৃষ্ট হইলে ইহাই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ব্রাইওনিয়া। শিশুকে সম্পূর্ণ স্থির ভাবে না রাখিলে অন্ত্রশূল বা অন্যান্য যন্ত্রণা নিবারণ হয় না, দাস্ত কৃষ্ণবর্ণের, শুষ্ক ও কঠিন, বোধ হয় যেন দগ্ধ হইয়াছে, ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ব্যবস্থা।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব। সাদা খড়ির ন্যায় দাস্ত, অনেকক্ষণ ক্রন্দন এবং কুচকিতে অন্ত্রবৃদ্ধি দৃষ্ট হইলে উপকার দর্শে।

ক্যামমিলা। প্রশ্বাসিত বায়ু অম্লগন্ধবিশিষ্ট, গণ্ডদেশ আরক্ত, জিহ্বা পুরু, শক্ত ও ঈষৎ পীত মিশ্রিত সাদা লেপ যুক্ত ও জিহ্বার ধারে দন্তের দাগ দৃষ্ট হওয়া, আহারান্তে অধিক যন্ত্রণা অনুভব, দাস্তে পচা ডিম্বের গন্ধ, সউহা সুজ এবং সাদা বা পীতবর্ণের আমমিশ্রিত অথবা জলের ন্যায় উদর

স্ফীত, হাত পায়ের উৎক্ষেপ এবং পদদ্বয় শীতল অনুভব হইলে ইহা প্রধান

চায়না। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় বেদনার বৃদ্ধি, উদর কঠিন, মলবদ্ধ বা কাঁচা ডিম্বের ন্যায় সাদা দাস্ত দেখিয়া প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল দর্শে।

সিনা। নাভীর উপরে বেদনা, নাড়ীর প্রায়ই কোন পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না, মুখমণ্ডল রক্তশূন্য ও শুষ্ক, উদর চাপিলে বেদনার শান্তি, শিশু কদাচিৎ স্থির ভাবে থাকে. এবং কেহ স্পর্শ করিলে ক্রন্দন করা ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

কলোসিন্থ। শিশু নানা প্রকারে দেহ মুচড়ায় ও অতিশয় কষ্ট হইতেছে বলিয়া অনুভব হয়, এবং করুণস্বরে ক্রন্দন করা ইহার লক্ষণ।

ইগ্নেসিয়া। মাতার বিশেষ কোন মনকষ্ট সত্ত্বে শিশু স্তনপান করিলে যে শূল বেদনা জন্মে, তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শে।

ইপিকা। বিবমিষা ও পচা গন্ধ বিশিষ্ট দাস্ত. শিশু চিৎকার করিয়া ক্রন্দন করিলে উপকার দর্শে।

আইরিস ভার্সিকলার। বিবমিষা বা বমনোদ্বেগ হইলে ইপিকা ব্যবহারে নিবারণ না হইয়া উহা অধিককাল স্থায়ী হইলে ও অতিশয় অম্ল গন্ধ বিশিষ্ট জল বমন এবং বিশেষ আহারের এক ঘণ্টা পরে বৃদ্ধি, সজোরে বায়ু উদ্গার, মলদ্বার হইতে প্রচুর বায়ু নিঃসরণ, অন্ত্রশূল ও উদরাময়ের সহিত পিত্ত মিশ্রিত দাস্ত হওয়া ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

জেলাপা। শিশু সমস্ত দিবস ভাল থাকিয়া সমস্ত রাত্র ক্রন্দন করিলে ইহাতে উপকার দর্শে।

লাইকোপোডিয়াম। শিশু মূত্র ত্যাগের অগ্রে প্রতিবার ক্রন্দন করে ও মূত্রত্যাগ হইলে তৎক্ষণাৎ শান্ত হয়. এবং উদরে গড়গড় শব্দ হইতে থাকিলে ইহাতে উপকার দর্শে।

ম্যাগ্নে-ফস। শিশুদিগের অন্ত্রে বায়ু আবদ্ধ হইয়া শূল বেদনা, পদদ্বয় আকর্ষণ করা, দাস্ত কখন হয়, কখন হয় না, বায়ু উদ্গার বা নিঃসরণ কিছুতেই দেখিতে পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় ইহাই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মার্ক-সল। অন্ত্রশূল, আম ও রক্ত মিশ্রিত দাস্ত ত্যাগ হইলে বেদনা নিবারণ হওয়া ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

নাক্স-ভমিকা। কোষ্ঠ বদ্ধের সহিত বেদনা, (ক্যাম উদরাময়ের সহিত) মাতার আহারের অত্যাচারে শিশুর পীড়ার উৎপত্তি, প্রচুর বায়ু নিঃসরণ, কোষ্ঠ বদ্ধ কিন্তু মধ্যে মধ্যে মলত্যাগের বৃথা বেগ থাকিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

পডোফাইলাম। প্রাতে প্রত্যহ বেদনাহেতু ক্রন্দন ও উদর কুঞ্চিত করণ ইহার প্রধান লক্ষণ।

পালস্। মাতার আহারের অনিয়ম বা শীতল দ্রব্য বা ফলাদি সেবন জনিত শিশুর পীড়া উহা সন্ধ্যায় আরম্ভ হইয়া সমস্ত রাত্র থাকে উদরে গড়গড় শব্দ হওন, মধ্যে মধ্যে কম্পন, মুখমণ্ডল রক্তশূন্য ও তৃষ্ণা থাকিলে ইহাই ব্যবস্থা।

রিযাম। প্রচণ্ড বেদনা, বায়ু বক্ষ মধ্যে উঠিতেছে অনুভব হওন ও দাস্ত অতিরিক্ত অম্ল গন্ধ বিশিষ্ট হইলে ব্যবস্থা।

সিনা। শিশু ক্রন্দন কালীন নীলবর্ণ হইয়া যায়, বায়ু আবদ্ধ হইয়া অন্ত্রশূল হইলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ষ্টেনাম। উদরে প্রচণ্ড জোরের সহিত চাপিলে বেদনা ও ক্রন্দনের শান্তি, অতিশয় ক্রন্দন কালীন উহার উদর বক্ষে রাখিয়া কোলে লইলে স্থির থাকা ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

সালফরি। গাত্রে পুঁজ পূর্ণ স্ফোট প্রকাশ, দাস্ত অন্তে মলদ্বারের চতুষ্পার্শ্বে রক্তবর্ণ হওন, কোন ঔষধে শিশুর পাকাশয়ের বিকৃতি প্রকৃতিস্থ না হইলে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে।

ভেরাট্রাম। প্রচণ্ড শূল, ললাট শীতল, বেদনার সময় পায়ের পাতা শীতল হওন ও গাত্র হইতে শীতল ঘর্ম্ম বাহির হইতে থাকা ইহার লক্ষণ।

৮। উদরাময় ও বিসুচিকা। অজীর্ণ. দাস্তে—সালফার, ক্যালক্সার্ব্ব (সংযত দুগ্ধ মিশ্রিত;) গ্রাফাই (পাতলা ধূষর বর্ণের দুর্গন্ধ

শুষ্ক); ক্যাল-ফস (উষ্ণ) ফসফরাস (অতিশয় ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতা); এসিড ফস (উদরাময় সত্ত্বেও অধিক দুর্ব্বল না হওয়া); হিপার (অম্ল গন্ধ বিশিষ্ট সাদা বা সবুজ বর্ণের দাস্ত); এণ্টিমোনি-ক্রুড (সংযত দুগ্ধের কঠিন খণ্ড); আর্সেনিক (আহারের পরক্ষণেই দাস্ত); আর্জেণ্ট-নাই (আহারান্তে দাস্ত ও রাত্রে উদরে গড়গড়ানি শব্দ); বেরাইকার্ব্ব এবং নেট্রাম-ফস (যাহারা স্তনপান না করে); কোনিয়াম (অম্ল গন্ধ বিশিষ্ট মলত্যাগ)।

জলবৎ দাস্তে—সালফ (হটাৎ মলত্যাগ); ক্যালকার্ব্ব ও ক্যালফস (উষ্ণ জলীয় দাস্তে); ফস্‌ফস্ (সাদা জল); সোরিনাম রাত্রে কাল ও দুর্গন্ধযুক্ত দাস্ত) এণ্টিক্রু (জলের সহিত মলের খণ্ড); এণ্টি-টার্ট (অতিশয় প্রচুর); গ্রাফাই (অর্দ্ধ জীর্ণ); কার্ব্ব-ভেজ (কালো পাতলা ও দুর্গন্ধ মল); আর্সেনিক (কাল বা ধুষর বর্ণের মলস্রাবের সহিত অতিশয় অস্থিরতা ও উদ্বেগ); এসিড্-ফস (ফসফরাসের ন্যায় দাস্ত কিন্তু উদরে অতিশয় গড়গড়ানি); এসিড-সালফ (অতিশয় দুর্ব্বল ও খিটখিটে); ম্যাগ্নে কার্ব্ব (সবুজ অম্ল গন্ধ বিশিষ্ট ও ফেণাযুক্ত); নেট্রাম—সালফ (পীত বর্ণের); এসিড—নাইট্রিক (সাদা বা হরিদ্রা বর্ণের); মার্ক-সল (সবুজ ও অম্ল গন্ধযুক্ত);

পুঁজের ন্যায় দাস্ত। আর্স; আয়ড, ক্যালকার্ব্ব, কালি-কার্ব্ব, লাইকো সালফ, সিপিও সিলি।

আম সংযুক্ত দাস্তে। সালফার (জলের সহিত আম মিশ্রিত দাস্ত); এসিড-সালফ (মাংস খণ্ডেরন্যায় ও ফেণাযুক্ত); ফসফরাস (সাদা দানাময়) বোরাক্স (পীতবর্ণের) সিলিসিয়া (মলের সহিত); গ্রাফাইটিস (কঠিন মল সাদা আমের দ্বারা আবৃত); ক্যাল-কার্ব ও সিপি (সবুজ আম); ম্যাগ্নে কার্ব্ব (সবুজ আম, সরের ন্যায় উপরে ভাসে); আর্জেণ্ট নাই (রাত্রে সবুজ আমের সহিত অতিরিক্ত বায়ু নিঃসরণ); আর্সেনিক (ধুষর বর্ণের) আয়ডাম (ফেণাময়); এসিড-নাই (দুর্গন্ধ সবুজ) মার্ক-সল (সবুজ আমের সহিত অতিশয় কুথনি)।

রক্ত মিশ্রিত দাস্তে—সালফার (রক্তের আঁশ সংযুক্ত); আর্জেণ্ট নাই, আর্স, ফস, সিপি, সিলি, মার্ক-সল, পাডো।

পিত্ত মিশ্রিত দাস্তে—আর্স; সালফ; ফস (সোণার ন্যায় বর্ণ) মার্ক (সবুজ পিত্ত)। সাদা দাস্ত—ক্যাল-কার্ব্ব; হাইড্রাষ্টিস (খড়ির ন্যায়) হিপার এণ্টি-ক্রু; ফসফরাস (দানাময়); ম্যাগ্নে-কার্ব্ব (চর্ব্বির ন্যায়); পডোফাইলাম (খড়ির ন্যায় ও অর্দ্ধজীর্ণ মল); কালি-কার্ব (ধুষর বর্ণের মল); লাইকো (পাণ্ডু বর্ণের মল)।

উদরাময় হেতু মলদ্বার ক্ষত বা রক্তবর্ণ হইলে;—সলেফ, আর্স,গ্রাফাই ফস,এণ্টি-ক্রু, ষ্টাফি, নেট্রাম-মিউ, মার্ক।

ঔষধের প্রয়োগ লক্ষণ।

পর্য্যায় ক্রমে কোষ্টবদ্ধ ও উদরাময়ে;—(মেসেণ্টারিক পীড়া) এণ্টিক্রু, লাইকো, ফসফরাস উৎকৃষ্ট ঔষধ।

একোন। পুনঃ পুনঃ সবুজ বর্ণের জলবৎ মল নিঃসরণ, শীতল গৃহে বাস বা হিম লাগায় পীড়ার উৎপত্তি; গাত্র শুষ্ক ও উষ্ণ, অতিশয় অস্থিরতা ও বমন ইত্যাদিতে ব্যবস্থা।

ইথুসা-সাইনেপিয়ম। পীড়ার মৃদুগতি, হঠাৎ এবং বেগের সহিত সংযত বা তরল দুগ্ধ বমন, বমন অন্তে অতিশয় ক্লান্তি হেতু নিদ্রা, নিদ্রা অন্তে তৎক্ষণাৎ স্তনদুগ্ধ পান, বমন বা দাস্ত অন্তে মোহবৎ অবস্থা, কনিনীকা প্রসারিত ও অসাড়, গাত্রে শীতল ঘর্ম্ম, মুখমণ্ডল তুবড়ে বা বসিয়া যাওয়া, আক্ষেপ সহকারে হিক্কা, বা অল্প পীতবর্ণের বা সবুজ তরল দাস্ত; দাস্ত কালীন প্রচণ্ড বেগ, দাস্ত অন্তে ক্লান্তি; গাভির দুগ্ধ অসহনীয় হইলে উপকার দর্শে।

এণ্টিমোনিয়াম-ক্রুডাম। শিশুকে কোলে লইলে বা স্পর্শ করিলে ক্রন্দন, অতিরিক্ত পিত্ত বা শ্লেষ্মা বমন, আহারান্তে বমন, স্তন পানান্তে সবুজ বমন, জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত, তৃষ্ণা রহিত, মুখমণ্ডল রক্ত-শূন্য, মধ্যে মধ্যে নিদ্রা ভঙ্গ, জলবৎ প্রচুর উদরাময়ের সহিত বমন, বৃহৎ সংযত দুগ্ধ খণ্ড উদ্গীরণ, বমনান্তে পুনরায় স্তনপান করা ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

এপিস মেল। গ্রীষ্মকালের উদরাময় একবার কিছু বিশেষ হইয়া পুনরায় প্রবল হয়, এই প্রকারে অধিক দিবস ভোগান্তে দেহ এতদূর

রক্তশূন্য ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে যে ক্রমে মস্তিষ্কে জল সঞ্চার হইয়া মস্তক বৃহৎ হইয়া উঠে (হাইড্রো কেফেলয়ড)। দাস্ত বারে অধিক হয় না প্রাতে অধিক হয় কিন্তু পরিমাণ ও অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন কখন অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত এবং কখন বা প্রায় গন্ধ থাকে না, ঈষৎ সবুজ ও পীতবর্ণের আমমিশ্রিত, অতিশয় তরল বা খণ্ড খণ্ড মল মিশ্রিত, উদর নিম্নে বসিয়া যাওয়া, ক্ষুধা তৃষ্ণারহিত জিহ্বা ও ত্বক শুষ্ক, হাত শীতল ও নীলবর্ণ, মূত্রস্তম্ভ বা প্রচুর মূত্রস্রাব, শ্বাস-কৃচ্ছ্র. মোহাবস্থা হইতে শিশু হঠাৎ চমকে উঠিয়া চিৎকার করে।

আর্জেণ্টাম-নাই। দাস্তের সহিত শব্দ করিয়া প্রচুর বায়ু-নিঃসরণ, দাস্ত কালো, সবুজ. জলবৎ দুর্গন্ধযুক্ত, আহারান্তে পাকাশয়ে বেদনা, মিষ্ট দ্রব্য সেবনে অতিশয় লালসা; উদ্গারে বেদনার শান্তি হইলে ব্যবস্থা।

আর্সেনিকাম। উদরাময় ও বমন, শীতল জলের অতিশয় তৃষ্ণা কিন্তু জলপান অন্তে তৎক্ষণাৎ বমন, ত্বক উষ্ণ, অতিশয় অস্থিরতা, দাস্ত ঘোর সবুজ বা কালো জলের ন্যায়, ক্ষতকারক ও দুর্গন্ধযুক্ত; হাত পা শীতল মুখমণ্ডল রক্ত শূন্য ও বসা, এবং মুষ্টি দ্বারা মস্তিষ্কে আঘাত করা ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

ব্যাপ্‌টীসিয়া। অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময়, দিবা রাত্র সমানা শিশু দুগ্ধ ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য গলাধঃ করণ করিতে পারে না।

বেলেডোনা। নিদ্রাকর্ষণের সহিত মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠা, গাত্র শুষ্ক ও উষ্ণ, অতিশয় তৃষ্ণা, বমন, ওষ্ঠ ও জিহ্বা শুষ্ক, সবুজবর্ণের অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ দাস্ত। মস্তক গরম, শিশু স্থিরভাবে থাকিতে পারে না, সামান্য শব্দে চমকিয়া উঠে, দাস্ত কালীন ও তাহার পুর্ব্বে মুখমণ্ডল আরক্ত হয়, ও বেগের সহিত জলবৎ দাস্ত হইলে ব্যবস্থা।

বেঞ্জইক-এসিড। দন্তোৎগম কালে উদরাময়, দুর্গন্ধযুক্ত প্রচুর দাস্ত, প্রস্রাব ঘোরবর্ণের, ও তীক্ষ্ণগন্ধ বিশিষ্ট, অতিশয় ক্লান্তি, মস্তকে শীতল ঘর্ম্ম।

বিস্‌মুথাম। উদরাময় ও বমন, যে কিছু আহার করে তৎক্ষণাৎ তাহা বমন হয়, উদর স্ফীত, মুখমণ্ডল রক্ত শূন্য, চক্ষুর নিম্নে নীলবর্ণের চক্র প্রকাশ হওয়া ইহার লক্ষণ।

ব্রাইওনিয়া। গ্রীষ্মকালের উদরাময়, শিশু আহার অন্তে অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্য বমন করে, অন্ত্রশূল, অধিক জল সেবনের তৃষ্ণা, ওষ্ঠ শুষ্ক ও কঠিন।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব। স্থূলকায় মেদবিশিষ্ট শিশুর অজ্ঞাতসারে দাস্ত। পচা ও অম্লগন্ধ বিশিষ্ট মেটেবর্ণের ফেণাযুক্ত দাস্ত, রাত্রে তৃষ্ণা, উদর স্ফীত, দেহ কৃশ, মূত্র পরিষ্কার কিন্তু উহাতে পচা তীক্ষ্ণ গন্ধ, পেশী কোমল ও থলথলে, মস্তকে ঘর্ম্ম হেতু বালিস ভিজিয়া যাওয়া ইত্যাদি ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

ক্যালকেরিয়া-ফস। অধিককাল স্থায়ী উদরাময়, বৃদ্ধের ন্যায় মুখাকৃতি, ত্বক শুষ্ক, প্রতি ঘণ্টায় দাস্ত, সাদা আমযুক্ত দাস্ত, দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হইলে ইহাই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ক্যাম্ফর। দেহ শীতল সত্বেও গাত্র আবরণ করিতে অনিচ্ছা, অতিশয় নিস্তেজস্কতা, কখন কখন রাত্রে গাত্র শীতল হয় এবং প্রাতে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়, বমন ও দাস্ত বন্ধ হওয়া সত্বেও দেহ শীতল ও অতিশয় দুর্ব্বলতা। ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস হওয়া ইহার প্রধান লক্ষণ।

কার্ব্ব-ভেজ। ব্রাইওনিয়া ব্যবহারে উপকার না হইলে ইহাই ব্যবস্থা। ইহার অন্যান্য প্রয়োগ লক্ষণের মধ্যে দাস্ত রক্তমিশ্রিত ও পচাগন্ধ বিশিষ্ট; মুখমণ্ডল রক্ত শূন্য বা ঈষৎ সবুজবর্ণ বিশিষ্ট, নাভী হইতে রক্ত শ্রাব, উদর স্ফীত, অতিরিক্ত বায়ু নিঃসরণ, দেহ শীতল, জিহ্বা ও প্রশ্বাসিত বায়ু শীতল, এবং স্বরভঙ্গ হওয়া ইহার লক্ষণ।

ক্যামমিলা। ঈষৎ সবুজ জলের ন্যায় অথবা কাঁচা ডিমের ন্যায় দাস্ত। শিশু শয্যায় শয়ন করিতে চাহে না, অল্প জ্বর, দাস্তে পচা ডিমের গন্ধ।

চায়না। বেদনা শূন্য অজীর্ণ, দুর্গন্ধ ও প্রচুর মলত্যাগ। এক দিবস অন্তর পীড়ার বৃদ্ধি হইলে ইহাই ব্যবস্থা।

কলোসিন্থ। অন্ত্রশূল, উদর চাপিয়া রাখিলে শান্তি, স্তনপান

কালীন বা অন্তে অজীর্ণ দাস্ত, মলঅম্ল, পিত্তমিশ্রিত ও ফেণাযুক্ত, মল ত্যাগের পূর্ব্বে প্রচণ্ড বেদনায় ফল দর্শে।

কলোষ্ট্রাম। অতিশয় স্নায়বীয় উত্তেজনা, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, জিহ্বা সাদা বা পীতবর্ণের লেপযুক্ত, অম্লবমন ও অন্ত্রশূলের সহিত জলেরন্যায় দাস্ত, শিশুর গাত্রে অম্লগন্ধ, ক্ষতকারক জলবৎ সবুজ বা পীতবর্ণের দাস্ত, জলবৎ প্রচুর দাস্ত হেতু দেহ শীর্ণ হওয়া ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

ক্রোটন-টীগ্লীয়াম। স্তনপানের পরক্ষণে অন্ত্রশূল; দাস্ত পীত বর্ণের, জলবৎ মল হটাৎ নিঃসরণ হইলে ব্যবস্থা।

ডালকামারা। শীতল বাতাস গাত্রে লাগিলে বা সিক্ত গৃহে বাস হেতু উদরাময়, পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তনশীল দাস্ত, সাদা, পীত বা সবুজ বর্ণের জলবৎ অম্ল গন্ধ বিশিষ্ট দাস্ত। মলত্যাগ কালীন বিবমিষা থাকিলে ফল দর্শে।

ফেরাম-পাইরোফস। বেদনা শূন্য অনৈচ্ছিক অজীর্ণ মল ত্যাগ, দাস্ত কালীন উদরে, পৃষ্ঠে, মলদ্বারে আক্ষেপিক বেদনা, জলবৎ দাস্তের সহিত বায়ু নিঃসরণ, এবং আহার অন্তে পুনঃ পুনঃ দাস্ত হইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

গ্রাফাইটীস্। অর্দ্ধ জীর্ণ, অতিশয় গন্ধ বিশিষ্ট, কোমল ও কাল দাস্ত, দাস্ত অন্তে ক্ষণস্থায়ী নিস্তেজকতা, ক্ষতকারক অম্ল মিশ্রিত দাস্ত হেতু মলদ্বার আরক্ত হইলে এবং চর্ম্ম রোগ থাকিলে ব্যবস্থা।

গ্রাসিওয়ালা। প্রচণ্ড বমন ও দাস্তের সহিত সবুজ বর্ণের মল ও বায়ু নিঃসরণ হওয়া ইহার লক্ষণ।

হেলিবোরাস। সাদা, স্বচ্ছ ও আম সদৃশ মলত্যাগের সহিত মলদ্বারে জ্বালা ও যন্ত্রণা। অন্ত্রশূল অন্তে দাস্ত ও বেদনার নিবৃত্তি হওয়া।

ইপিকা। এক সময়ে প্রচণ্ড বমন ও দাস্ত, মদের গন্ধ বিশিষ্ট মল নিঃসরণ, অতিশয় বিবমিষা, মুখমণ্ডল রক্ত শূন্য, শ্বাসকৃচ্ছ্র, চিৎকার করিয়া ক্রন্দন ও অস্থিরতা, আক্ষেপিক কাশি ও কণ্ঠে শ্লেষ্মার শব্দ, চক্ষের চতুর্পার্শ্বে নীলবর্ণের চক্র, খিটখিটে স্বভাব, স্থিরভাবে থাকিতে ইচ্ছা।

আইরিস ভার্সিকলার। উদর স্ফীত, ভুক্ত দ্রব্য, তিক্ত বা অম্ল বমন, দাস্ত পুনঃ পুনঃ ও প্রচুর এবং জলবৎ, দাস্তের সহিত দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ, দাস্ত অন্তে মলদ্বারে জ্বালা, মুখমণ্ডল রক্তশূন্য ও চক্ষের চতুষ্পার্শ্বে নীলবর্ণের চক্র।

ক্রিয়োজোট। দাস্ত ও বমন, অনবরত বমন ও বমনের বেগ উদরে কোন দ্রব্যের চাপ অসহনীয়। অতিশয় অস্থিরতা ও হঠাৎ বেদনা বৃদ্ধি হয়। অতিশয় তৃষ্ণা, নাড়ী উষ্ণ, হাত পা শীতল, লইয়া বেড়াইলে উদ্গার বা হিক্কা আরম্ভ হইলে ইহাই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ল্যাকেসিস্। অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত দাস্ত, হঠাৎ দাস্ত ও দাস্তের সহিত প্রচণ্ড বেগ, গ্রীষ্মকালে পুনঃ পুনঃ পাতলা ঘোলাটে দাস্ত, এবং নিদ্রান্তে ক্রন্দন করা ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

লরোসিরেসাস্। শিশুদিগের প্রখর উদরাময়, সবুজবর্ণের জলবৎ দাস্ত, জলীয় দ্রব্য পান করিলে শব্দের সহিত উদরে পতিত হওন, মূত্ররোধ বা মূত্রাবরোধ, কনিনীকা প্রশস্ত, শ্বাস প্রশ্বাস অতিশয় মৃদু, নাড়ী ক্ষীণ ও অসমান।

ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্ব। সবুজ, জলবৎ, ফেণাময়, অম্লগন্ধবিশিষ্ট ও মধ্যে মধ্যে সংযত দুগ্ধ খণ্ড মিশ্রিত দাস্ত, অম্ল বমনের সহিত অন্ত্রশূল।

মার্ক-সল। মস্তকের ফন্টানেলদ্বয় (অস্থি শূন্য স্থান) অসম্পূর্ণ, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, মুখে জাড়ীক্ষত, মধ্যে মধ্যে নিদ্রা ভঙ্গ, অম্লগন্ধ বিশিষ্ট ঘর্ম্ম বিশেষ মস্তকে অধিক, দাস্তের অগ্রে উদরে অতিশয় বেদনা, দাস্ত অন্তে শান্তি, মল ফেণাযুক্ত এবং অম্ল ও রক্ত মিশ্রিত অথবা সবুজবর্ণের দাস্তের সহিত কুথুনি, শিশুর পদদ্বয় ও জঙ্ঘা শীতল এবং ঘর্ম্মযুক্ত বিশেষ রাত্রে অধিক হইলে বিশেষ ফল দর্শে।

নেট্রাম সালফ। পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড অন্ত্রশূলের সহিত উদরে গড় গড়ানি শব্দ, পীতবর্ণের জলবৎ দাস্তের সহিত বায়ু নিঃসরণ হইলে বেদনার শান্তি হয় এবং প্রাতে অধিক দাস্ত হওয়া ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

নাইট্রিক এসিড। সবুজ আম ও রক্ত মিশ্রিত পচা দাস্ত, মুখে

পচা গন্ধ, মুখে ও জিহ্বার ক্ষত হইতে প্রচুর লালাস্রাব, অতিশয় ক্লান্তি ইত্যাদি।

নাক্‌স্‌-মস্কেটা। উদরাময়ের সহিত অতিশয় নিদ্রাকর্ষণ, মল প্রচুর ও দুর্গন্ধযুক্ত, এবং রাত্রে পীড়ার বৃদ্ধি হইলে ব্যবস্থা।

ওপিয়াম। ভয় হেতু উদরাময়, অনৈচ্ছিক মলমূত্রত্যাগ, মল ফেণাযুক্ত, এবং পাতলা ও প্রচুর, মলে অতিশয় দুর্গন্ধ থাকিলে উপকার দর্শে।

ফসফরিক-এসিড। বহু দিবস স্থায়ী উদরাময় সত্বেও শিশুকে অধিক দুর্ব্বল বা কৃশ দেখায় না। গাঢ় ও পীতবর্ণের অজীর্ণ ও অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত দাস্ত অথবা হরিদ্রা বর্ণের জলবৎ দাস্তের সহিত দানাময় পদার্থ নিঃসরণ, রাত্রে, প্রাতে এবং আহার অন্তে বৃদ্ধি, উদরে বায়ু সঞ্চার হেতু স্ফীত হওয়া এবং অতিরিক্ত ক্ষুধা থাকিলে বিশেষ ফল দর্শে।

ফসফরাস। নিদ্রালুতা, সর্ব্বদা নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা, জল সেবন অন্তে উদরে উষ্ণ হওয়া মাত্র বমন, দাস্ত সাদা, সবুজ, জলবৎ ও পিচকারির ন্যায় বেগে নির্গমন হওন এবং বধিরতা ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

পডোফাইলাম। অধিক জলসেবনের প্রবল ইচ্ছা কিন্তু আহারের ইচ্ছা আদৌ থাকে না। নিদ্রাকালীন মস্তকে অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, সবুজ ফেণাময় শ্লেষ্মা বা ভুক্ত দ্রব্য বমন, যে পরিমাণ আহার করে, তদপেক্ষা অধিক মলত্যাগ, পচা গন্ধযুক্ত প্রচুর মল বেগে বহির্গমন। পদদ্বয়ে খিল ধরা, মলদ্বারের অধঃপতন, অনবরত কাতরানি, চক্ষুদ্বয় অর্দ্ধ উন্মীলন ও মস্তক এপাশ ওপাশ করা ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

সরিনাম। ধূষর বর্ণের, পাতলা, পচা ডিম্বের গন্ধযুক্ত দাস্ত, অতিশয় দুর্ব্বলতা, সামান্য পরিশ্রমে প্রচুর ঘর্ম্ম, রাত্রে অধিক, বক্ষে ও ললাটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক প্রকাশ, অনবরত অস্থিরতা ও অনিদ্রা হইলে ব্যবস্থা।

পালসেটিলা। অন্ত্রশূল, উদরাময়, রাত্রে বৃদ্ধি, পরিবর্ত্তনশীল দাস্ত, দুই দাস্ত এক প্রকার কদাচিৎ দৃষ্ট হওয়াই ইহার প্রধান লক্ষণ।

রেটেন্হিয়া। পাতলা দুর্গন্ধ দাস্ত, মলদ্বারে অগ্নি দাহবৎ জ্বালা।

রিয়াম। ধূষর বর্ণের অম্ল গন্ধবিশিষ্ট দাস্তের সহিত অতিশয় বেগ, শিশুর গাত্রে অম্লগন্ধ, দাস্তকালীন কম্পন, আহারের অত্যাচারে ও শীতলতাপ্রযুক্ত উদরাময়, পাকাশয়ে ও অন্ত্রে অম্ল সঞ্চার হেতু অন্ত্রশূল,রাত্রে বেদনার বৃদ্ধি, প্রচুর দাস্তের সহিত বমন ও অতিশয় দুর্ব্বলতা ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

সিপিয়া। অনবরত মলদ্বার হইতে মলনিঃসরণ, সবুজ বা অম্ল গন্ধ বিশিষ্ট দাস্ত, দুর্ব্বলকারক উদরাময়, পচা দুর্গন্ধ, মল হঠাৎ একেবারে নিঃসরণ হওয়া ইহার প্রধান লক্ষণ।

সিলিসিয়া। অধিককাল স্থায়ী উদরাময় হেতু শিশু অতিশয় কৃশ হইয়া পড়ে, নিয়মিতরূপে আহার করে কিন্তু খাদ্য অজীর্ণাবস্থায় বহির্গমন হওয়ায় পুষ্টি সাধন হয় না, মধ্যে মধ্যে ক্ষুধা মান্দ্য ও বমন, মস্তকের ফণ্টানেল অসম্পূর্ণ, মস্তকে প্রচুর ঘর্ম্ম, অতিশয় তৃষ্ণা, দেহ কৃশ, হাত পা শীতল, উহাতে শীতল ঘর্ম্ম, মস্তক অনবরত নড়ান, মূত্রস্তম্ভ, জলবৎ দুর্গন্ধ দাস্ত হওয়া ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

সালফিউরিক-এসিড। পুনঃ পুনঃ অধিক পরিমাণে জলবৎ দুর্গন্ধ যুক্ত দাস্ত, মুখে জাড়ীক্ষত এবং খিটখিটে স্বভাবাপন্ন শিশুদিগের পক্ষে বিশেষ উপকার হওয়া সম্ভব।

সালফার। রাত্রে দুই প্রহরের পরে উদরাময় ও বমন, দাস্ত সবুজ ও জলের ন্যায়। অনৈচ্ছিক অম্লগন্ধ বিশিষ্ট অথবা অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত, অম্ল বমন, মুখে শীতল ঘর্ম্ম (ভিরাট্রামে ললাটে ঘর্ম্ম) মুখ মণ্ডল রক্ত শূন্য, মস্তকের ফণ্টানেলদ্বয় অসম্পূর্ণ, প্রথম হইতে হাত পা শীতল, শিশু অচৈতন্য ভাবে চক্ষু অর্দ্ধোন্মীলন করিয়া অবস্থিতি করে, অল্প তৃষ্ণা এবং সম্পূর্ণ মূত্র-স্তম্ভ। শিশুদিগের উদরাময়, আমযুক্ত সবুজ বা শাদা, মধ্যে মধ্যে সামান্য রক্তমিশ্রিত দাস্ত, মলদ্বারের চতুষ্পার্শ্ব আরক্ত, পায়ের ও হাতের পাতা উষ্ণ, মূত্র কৃচ্ছ, প্রাতে উপসর্গের বৃদ্ধি হইলে ইহাতে ফল দর্শে।

টারটার-এমেটিক। প্রচণ্ড বেগে ভুক্তদ্রব্য বমন অন্তে অতিশয় দুর্ব্বলতা, শীতবোধ ও নিদ্রাকর্ষণ, আগ্রহ সহকারে জলপান কিন্তু সামান্য

সেবন করিলেই বমন, জলবৎ কখন কখন আমযুক্ত, সবুজ উদরাময়ের দাস্ত স্তনপান অন্তে বৃদ্ধি, দাস্তের অগ্রে ও দাস্ত কালীন করুণস্বরে ক্রন্দন, অলক্ষণ নিদ্রা, দুগ্ধ বা কোন প্রকার আহারীয় দ্রব্যে অনিচ্ছা হওয়া ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

ভিরাট্রাম এলবাম। সামান্য নড়িলে বিবমিষার বৃদ্ধি, বমন অন্তে ললাটে শীতল ঘর্ম্ম, অতিশয় নিস্তেজস্কতা, অল্প মাত্র নড়িলে বেদনা শূন্য পাতলা দাস্তের সহিত অন্ত্রে গড়গড় শব্দ, দাস্ত কালীন বা পরক্ষণেই মোহ, শীতল জলের প্রচণ্ড তৃষ্ণা কিন্তু অল্প মাত্র সেবনে বমন, গাত্রে শীতল ঘর্ম্ম, প্রশ্বাসিত বায়ু শীতল। পুনঃ পুনঃ জলবৎ প্রচুর দাস্ত, দাস্তের সহিত তৃষ্ণা ও বমন থাকিলে ইহাই উৎকৃষ্ট।

জিন্‌কাম। পদদ্বয় অনবরত নাড়ান, নিদ্রাকালীন ক্রন্দন ও চমৃকিয়া উঠা, অধিক দিবস স্থায়ী, বেদনা শূন্য পাতলা দাস্ত, দাস্ত অন্তে উদরে বেদনা ও বায়ু নিঃসরণ হওয়া ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

কোষ্ঠবদ্ধ। শিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধ প্রায় আহারের অনিয়মে ঘটে এবং সচরাচর উহাদিগের খাদ্য পরিবর্ত্তন করিলে আরোগ্য হয়। ঔষধ ব্যবহার করিবার আবশ্যক হইলে নূতন কোষ্ঠবদ্ধে ব্রাইওনিয়া, নাক্স-ভমিকা ও ওপিয়ম ব্যবহার করিলে আরোগ্য হইবে। ঐ সকল ঔষধের একটী বা দুইটী বটীকা ২৪ ঘণ্টা অন্তর দুইবার ব্যবহার করিয়া উপকার না হইলে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধে সালফার বা এলুমিনা ৩। ৪ তিন চারি দিবস ঐ মাত্রায় ব্যবহার করিতে হইবে, অন্যান্য ঔষধের প্রয়োগ লক্ষণ নিম্নে দেওয়া হইল—

এলুমিনা। সরল অন্ত্রের শিথিলতা, এমন কি কোমল মল ত্যাগ কালীনও শিশুর প্রচণ্ড বেগ দেওয়া আবশ্যক হওয়া ইহার প্রধান লক্ষণ।

এণ্টিমোনিয়ম-ক্রুডাম।—কঠিন সাদা মল ও রক্তবর্ণ মূত্র ত্যাগ, অন্ত্রশূল, ক্ষুধামান্দ্য ও মল কঠিন ও এত বড় যে, ত্যাগ কালীন মলদ্বারে অতিশয় কষ্ট বোধ হয়, মুখ ও ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, পর্য্যায় ক্রমে উদরাময় এবং কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে ব্যবস্থা।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব।—অজীর্ণ কঠিন মলের কর্দ্দমের ন্যায় বর্ণ।

ক্যালকেরিয়া-ফস—কঠিন মলত্যাগ অন্তে ক্লান্তি, মল দ্বারে চুলকনা ও খিলধরা ইহার প্রয়োগ।

গ্রাফাইটীস—বৃহৎ আকার বিশিষ্ট ও আমের দ্বারা আবৃত মল এবং সর্ব্বাঙ্গে জলপূর্ণ স্ফোটক প্রকাশ হইলে উপকার দর্শে।

লাইকো পোডিয়াম। অন্ত্রের সম্পূর্ণ শিথিলতা, মল ত্যাগ করা অতিশয় কষ্টকর এবং উদরে বায়ু সঞ্চার হওয়া ইহার প্রধান লক্ষণ।

ম্যাগ্নেসিয়ামিউ। মলদ্বারের মুখে মল আসিয়া গুড়া হইয়া পতিত হওন, এবং পুনঃ পুনঃ মল ত্যাগের ইচ্ছা থাকিলে ইহাই উপযুক্ত ঔষধ।

নাইট্রিক এসিড। মলত্যাগের পরে মলদ্বারে অতিশয় যন্ত্রণা, বোধ হয় যেন শিশুর মলদ্বারে ভগন্দর হইয়াছে।

নাকস ভমিকা। মল আকারে বড় ও ত্যাগে কষ্ট, অথবা অন্ত্রশূলের সহিত পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমানে কষ্টদায়ক দাস্ত হওয়া ইহার প্রয়োগ লক্ষণ

ওপিয়াম—গোলাকার কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণের মল ত্যাগ এবং অন্ত্রের সম্পূর্ণ শিথিলতা বোধ হইলে ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শিবে।

প্লাম্বাম। ভেড়ার বিষ্ঠার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু সংখ্যক গোলাকার মল একত্র হইয়া পতন হওয়া ইহার প্রধান লক্ষণ।

সিপিয়া। মল নিঃসরণ হওয়া অতিশয় কষ্টসাধ্য, উহা মলদ্বারে আসিয়া আবদ্ধ হয় ও অঙ্গুলি দ্বারা টানিয়া বাহির করা আবশ্যক হইয়া উঠিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

সিলিসিয়া।—পুনঃ পুনঃ অতিশয় বেগ দেওয়া, মল গুহ্যদ্বারে আসিয়া পুনরায় উর্দ্ধে উঠে, সরলান্ত্র শিথিল ও মেরুদণ্ড দুর্ব্বল, এ প্রকার অবস্থা ঘটিলে ইহাতে উপকার হয়।

৯। জ্বর। শিশুদিগের জ্বর দন্তোদগম হেতু না হইলে প্রায়ই কোন প্রকার প্রখর পীড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়া অনুমান করিতে হইবে, যথা, কোন যন্ত্রের প্রদাহ বা কোন প্রকার দূষিত স্ফোটক জ্বর। অনেক সময় এই সকল জ্বরের সূচনা হওয়া মাত্র চিকিৎসা করিতে পারিলে ভাবী

অশুভ ঘটনা ঘটিতে পারে না। শিশুর গাত্র উষ্ণ, অতিশয় অস্থির এবং নাড়ী দ্রুত ও বলিষ্ঠ দেখিলে ১৮ ক্রমের একোনাইটের তিনটী মাত্র বটিকা অর্দ্ধ গ্লাস জলে মিশ্রিত করিয়া দুই ড্রাম পরিমাণ তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইতে হইবে, যে পর্য্যন্ত জ্বর মগ্ন বা অন্যান্য লক্ষণের শান্তি না হয়। জ্বর মগ্ন হইয়া অন্য কোন লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে তাহার উপযুক্ত যে ঔষধ তাহাই ঐ প্রকারে প্রয়োগ করিতে হইবেক। যে সকল ঔষধ ইহাতে ব্যবহার হয় নিম্নে তাহার বর্ণনা করা হইল।

ঔষধের প্রয়োগ লক্ষণ।

একোন। প্রখর জ্বরের সহিত তৃষ্ণা, অনিদ্রা বা পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ, অথবা নিদ্রা কালীন চমকে উঠিয়া ক্রন্দন করা ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

বেলেডোনা। অতিশয় কাতরানি, চমকে উঠা, মুখমণ্ডল আরক্ত, চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ অতিশয় উষ্ণ ও অন্যান্য মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যের চিহ্ন বর্ত্তমান থাকিলে ইহাই উপযুক্ত ঔষধ।

বোরাক্স। শিশুকে উর্দ্ধে তুলিয়া নিম্নে হটাৎ আনিতে গেলে ভীত হয়, উহার মস্তক মুখ ও হাতের পাতা গরম, প্রাতে নিদ্রা হইলে গাত্রে ঘর্ম্ম দেখা দেয়, কোলে লইলে শীত বোধ করা, ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ থাকিলে উপকার দর্শে।

ক্যামমিলা। শিশুর গাত্র অতিশয় উষ্ণ ও আরক্ত, পুনঃ পুনঃ জল সেবনের ইচ্ছা, অতিশয় অস্থিরতা, বিশেষ রাত্রে অধিক, শয্যায় এপাশ ওপাশ করা, উদ্বেগ মুখ ও গণ্ডদেশ আরক্ত বিশেষ (এক গণ্ড); মস্তকে উষ্ণ ঘর্ম্ম, শীঘ্র শীঘ্র উদ্বেগযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস, কণ্ঠে শ্লেষ্মার শব্দ, খুক্ খুকে শুষ্ক কাশি এবং হাত পায়ের আক্ষেপিক স্পন্দন ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

কফিয়া। অল্প জ্বর সত্বে স্নায়ুর অতিশয় উত্তেজনা, যথা, অনিদ্রা, অস্থিরতা, মধ্যে মধ্যে হটাৎ নিদ্রাভঙ্গ ও চমকে উঠা, খিটখিটে, রাগত কখন ক্রন্দন কখন বা হাঁসি ইত্যাদি ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

জেল্সিমিনাম। রাত্রে জ্বরের ও উপসর্গের বৃদ্ধি, মুখ ঘোর রক্তবর্ণ; স্নায়বিক উত্তেজনা হেতু অস্থিরতা, শিরঃ ঘূর্ণন বশতঃ শিশু হাটিতে

গেলে পড়িয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভব হওয়া, শব্দ ও আলোকাতঙ্ক থাকিলে ইহাতে উপকার দর্শিবে।

ইগ্নেসিয়া। অতিশয় স্নায়ুবীয়তা ও কম্পন, চীৎকার করিয়া নিদ্রা-ভঙ্গ ও পরক্ষণেই সর্ব্বাঙ্গে কাপনি, ব্যস্ত হইয়া জলপানান্তে তড়কার ন্যায় আক্ষেপ এবং হাত পায়ের উৎক্ষেপিক চালনা দৃষ্ট হইলে ইহাই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মার্ক-সল। উদর ও পাকাশয় চাপিলে বেদনা, সবুজ আম সংযুক্ত দাস্তের সহিত অতিশয় বেগ, মুখাকৃতি ঈষৎ পীতবর্ণ, মূত্র ঘোর রক্তবর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত, মুখে বেদনা থাকিলে ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শিবে।

নাক্স ভমিকা। অতিশয় খিটখিটে স্বভাব, একেবারে ক্ষুধা মান্দ্য, পাকাশয়ে বায়ু সঞ্চার ও বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ অথবা মল কষ্টে নিঃসরণ হইতে থাকিলে ইহাতে আরোগ্য হইবে।

পডোফাইলাম। যকৃতের কার্য্যাধিক্যহেতু স্বল্পবিরাম জ্বর দন্তোদ্গমকালে উদরাময় ও প্রাতে অম্ল গন্ধবিশিষ্ট দাস্ত, অতিশয় তৃষ্ণা অথচ ক্ষুধা মান্দ্য, শিশু যে কিছু আহার করে তাহাই উদরে অম্ল হয় এবং উদ্গারের সহিত উষ্ণ পদার্থ বমন হইলে ইহাতে ফল দর্শে।

১০। মূত্রের পীড়া। মূত্রাবরোধের প্রধান ঔষধ, একোন, বেলা বেঞ্জইক-এসিড; ক্যাম্ফর, ক্যান্থারিস, ইরিজিরন, হায়স, লাইকো ও পাল্‌স।

একোন। শিশুদিগের এ পীড়ায় ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ, বিশেষ ভূমিষ্ঠ হইয়া অল্পদিনের মধ্যে ঘটিলে অধিক উপকার দর্শে।

বেলেডনা। অতিশয় কাতরানি, যন্ত্রণা, মূত্রত্যাগ কালীন মূত্র আবদ্ধ হওয়ায় হটাৎ চমকে উটা ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

ক্যাম্‌ফার। মূত্র ত্যাগের বৃথা চেষ্টা, প্রস্রাব ফোটা ফোটা বাহির হওন ও মূত্র মার্গে জ্বালা থাকিলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ক্যান্থারিস। মূত্রত্যাগকালীন চিৎকার করিয়া উঠা ও এক এক ফোটা মূত্র ত্যাগ হইতে থাকিলে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে।

ইপিকা। মূত্রকৃচ্ছের সহিত তড়কা থাকিলে আরোগ্য হইবে।

লাইকোপোডিয়াম। মূত্র কৃচ্ছের সহিত উদরে বায়ুসঞ্চার ও গড়গড়ানি, মূত্রে বালুকা কণার ন্যায় স্তর পতিত হইলে ব্যবস্থা।

নক্স-ভমিকা। মূত্র ত্যাগের বৃথা চেষ্টা ও যন্ত্রণা, ফোটা ফোটা মূত্র ত্যাগের সহিত জ্বালা ও মূত্রমার্গ হইতে রক্তস্রাব হইলে উপকার দর্শে।

ওপিয়াম। শিশু সর্ব্বদা নিদ্রালু ও নিদ্রিত থাকিতে ভাল বাসে, মুখমণ্ডল স্ফীত, মূত্রস্তম্ভ, মূত্রাশয় পূর্ণসত্বেও মূত্রাবরোধ হইলে ইহাতে উপকার দর্শে।

পালস্‌টিলা। অনবরত মূত্রত্যাগের বৃথা চেষ্টা ও মূত্রত্যগের কালীন যন্ত্রণা বোধ হইলে ব্যবস্থা।

সাল্‌ফার। মস্তকোদক ও গণ্ডমালা ধাতুবিশিষ্ট শিশুদিগের প্রতিবার সর্দ্দি হইলে মূত্রাবরোধ হওয়া ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

মূত্রস্তম্ভ ;—সালফার; লাইকো, সিলিসিয়া, কার্ব্ব-ভেজ, এপিস আর্স, জিনক। মূত্র পরিষ্কার সত্বে উহা তীব্র ও পচা গন্ধ বিশিষ্ট হইলে ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব; অশ্বের মূত্রের ন্যায় গন্ধযুক্ত মূত্র ত্যাগে নাইট্রিক-এসিড; ঘোলাটে ও তীব্র গন্ধযুক্ত হইলে বেনজইক-এসিড; এমোনিয়ার গন্ধ থাকিলে আয়ডাম; দুগ্ধের ন্যায় সাদা হইলে এসিড-ফস; পচা গন্ধ যুক্ত হইলে ভাইলা-ট্রাই; মূত্রে লালবর্ণের বালুকা কণার ন্যায় স্তর পড়িলে লাইকো; মূত্র নির্গমনের পূর্ব্বে ক্রন্দন করিলে সারসাপারিলা; মূত্র পাত্রে রাখিলে অম্ল বা ঘোলাটে হইয়া নিম্নে লালবর্ণের স্তর পড়িলে গ্রাফাই; ময়দার ন্যায় স্তর পড়িলে ক্যাল-কার্ব্ব। ক্রমশঃ—

কার্ত্তিক } শ্রীশিখর কুমার বসু এল, এম, এস।
কলিকাতা } হোমিওপ্যাথিক প্রাক্‌টীসনার।

উত্তর।

উদ্ধৃত।

শ্রীযুক্ত বাবু পুলিনচন্দ্র সান্যাল এম, বি একজন এলোপ্যাথিক ও শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ রায় এল, এম, এস একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। "চিকিৎসা সম্মিলনী" নামক মাসিক পত্রিকায় এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্বন্ধে ইহাঁরা দুই জনে তর্ক উপস্থিত করেন। বিগত ফাল্গুণ ও চৈত্র সংখ্যার "চিকিৎসা সম্মিলনীতে" পুলিন বাবু "ইনি আবার কি বলেন"? বলিয়া যে প্রস্তাব বা প্রতিবাদ লিখিয়াছেন, তাহারই উত্তর দেওয়া আজ্ আমাদের উদ্দেশ্য। হরনাথ বাবু ও পুলিন বাবুর মধ্যে যে বিষয় লইয়া তর্ক উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মীমাংসা করা আমাদের আপাততঃ এখন উদ্দেশ্য নহে। পুলিন বাবু হরনাথ বাবুর কথার প্রতিবাদ করিতে গিয়া যে সমস্ত ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন, তাহাই প্রদর্শন করা আজ্ আমাদের উদ্দেশ্য। ভরসা করি পুলিন বাবু এবং তাঁহার সমশ্রেণীস্থ লোক আমাদের এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া কিছু শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন।

পুলিন বাবুর ধৃষ্টতা দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি। তিনি হোমিওপ্যাথি কি তাহা মোটেই জানেন না, অথচ তিনি আজ গম্ভীরভাবে অধ্যাপকের ন্যায় হোমিওপ্যাথি মতামত লইয়া আলোচনা করিতে বসিয়াছেন। আমরা বলি, ভাই, আগে পড়, শুন, জান, পরে গলাবাজির জোর থাকে করিও। তর্ক বিদ্যাবুদ্ধির ফল; গলাবাজি অশিক্ষার ফল। সমালোচনা করা কঠিন; ঝগড়া করা অতি সহজ। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সমালোচনা করিতে বসিয়া ঝগড়া করিতে দেখিলে বড়ই দুঃখ হয়। পুলিন বাবু আজ তর্ক করিতে গিয়া সম্প্রদায়কে আক্রমণ করিয়াছেন, যুক্তি দেখাইতে না পারিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদিগকে গালি দিয়াছেন,—যদিও আমরা জানি, এরূপ গালিতে হোমিওপ্যাথির কিছুই এসে যায় না। সামান্য ফুৎকারে মহীরুহ উৎপাটিত হয় না, সামান্য অঙ্গুলি-হেলনে অটল অচল কম্পিত হয় না, সামান্য ও অযথা বাক্যুদ্ধে বিজ্ঞান ও সত্য মস্তক অবনত করে না। মতামত সমালোচনা করিতে বসিয়া ব্যক্তি বা সমাজকে আক্রমণ করা

হীনবুদ্ধি ও অমার্জ্জিত রুচির পরিচয় দেওয়া মাত্র। আমরা তজ্জন্য পুলিন বাবুর প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া তাঁহার বুদ্ধিবিদ্যার ও তর্কশক্তির প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

পুলিন বাবু প্রথমে লিখিয়াছেনঃ—

"হরনাথ বাবু এলোপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের কতকগুলি দোষ উল্লেখ করিয়াছেন, যথা তিনি বলেন ডাক্তারেরা এণ্টিপাইরিন, স্যালিসিলেট অভ্ সোডা প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করিয়া কখন কখন কুফল আনয়ন করেন। একথা গুলি নিতান্ত মিথ্যা নহে। এণ্টিপাইরিন প্রভৃতি ঔষধের অযথা প্রয়োগে কখন কখন রোগীর বিপদ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এগুলি ঔষধের দোষ নহে, প্রয়োগকর্ত্তাদিগের দোষ। * * * এই সকল বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতে জানিলে সুফল ফলে ও অযথা প্রয়োগে অনিষ্ট করে।" আমরা পুলিন বাবুর এই উত্তরে অসন্তুষ্ট নহি, কিন্তু তৎপরে তর্ক করিতে না পারিয়া তিনি হোমিওপ্যাথিকে গালি দিয়াছেন। তর্ক করিতে বসিয়া নিম্নলিখিত গালিগালাজ গুলি না লিখিলেই পুলিন বাবুর শিক্ষোপযোগী কাজ হইতঃ—

"এলোপ্যাথি ও কবিরাজী চিকিৎসায় বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন, আর হোমিওপ্যাথির বিন্দু প্রয়োগে কোনও উৎপাত নাই। এই জন্যই বৈষ্ণব-তন্ত্রের ডাক্তার মহাশয়েরা হোমিওপ্যাথি ধরিয়া থাকেন। যে ডাক্তারগণ রক্ত দেখিলে মূর্চ্ছা যান, জোলাপ দিয়া দাস্ত আনাইয়া রোগীর একবারের অধিক দুইবার দাস্ত দেখিলে হতভম্ব হন, প্রায় তাঁহারাই শেষটায় হোমিও প্যাথি ধরিয়া বসেন।"

ইহা তর্কযুক্তি না গালাগালি? ঢিল মারিলেই পাটকেল খাইতে হয়, কথা তুলিলেই কথা শুনিতে হয়। বোধ করি পাটকেল খাইতে পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াই পুলিন বাবু এইরূপ কলম ধরিয়াছেন। আমরা পুলিন বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, এই যে মহেন্দ্র বাবু, বিপিন বাবু, নিতাই বাবু, হরনাথ বাবু অক্ষয় বাবু, হেম বাবু প্রভৃতি চিকিৎসকগণ হোমিওপ্যাথি অবলম্বন করিয়াছেন, ইহারা কি সকলেই রক্ত দেখিয়া মূর্চ্ছা যান এবং দাস্ত দেখিলেই হতভম্ব হন? আমরা ত তাহা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না।

পুলিন বাবু যেরূপ অস্ত্রচিকিৎসক, ইহাঁদের মধ্যে কেহই যে তাঁহা অপেক্ষা হীন, আমরা তাহা মনে করিতে পারি না। আর আমরা এস্থলে পুলিন বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, এলোপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের মধ্যে অস্ত্রচিকিৎসায় সকলেই কি সমান পারদর্শী? আমরা এমন এলোপ্যাথিক চিকিৎসকের নাম জানি—তাঁহারা বড় বড় পণ্ডিত—যাঁহারা চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করিয়া অবধি কখন অস্ত্র স্পর্শ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। তাই বলিয়া কি এলোপ্যাথি বা সমগ্র এলোপ্যাথিক চিকিৎসকদিগকে নিন্দা করিতে হইবে? যাঁহার রুচি, প্রবৃত্তি, মেধা, পারদর্শিতা যেরূপ, তিনি সেই বিষয়েরই অনুশীলন করিতে ভাল বাসেন ও করিয়া থাকেন। কেহ অঙ্ক শাস্ত্রে, কেহ সাহিত্যে, কেহ বিজ্ঞানে পারদর্শী, তাই বলিয়া কি তাঁহাদিগকে বা সমগ্র শিক্ষাকে নিন্দা করিতে হইবে? এ কিরূপ তর্ক আমরা ত বুঝিতে পারিলাম না। যদ্যপি নিন্দা করা প্রতিবাদ হয়, তবে আমরা সেরূপ প্রতিবাদকে শত হস্ত দূর হইতে নমস্কার করি।

পুলিন বাবুর মতে অস্ত্র চিকিৎসক না হইলে তিনি ডাক্তারই নহেন, পুলিন বাবুর কথা সত্য হইলে আজ ডাক্তার কোট্‌স, চন্দ্র, জগদ্বন্ধু প্রভৃতি প্রধান প্রধান চিকিৎসকদিগকে ডাক্তার সমাজ হইতে তাড়াইয়া দিতে হয়, পুলিন বাবু একথায় কি বলেন? কবিরাজী পত্রিকায় লিখিতে বসিয়াছেন বলিয়া তিনি কবিরাজদিগকেও একটু খোসামোদ করিয়াছেন; তাই বলিয়াছেন, "এলোপ্যাথি ও কবিরাজী চিকিৎসায় বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন, আর হোমিওপ্যাথির বিন্দু প্রয়োগে কোন উৎপাত নাই।" কথার ভাবে বোধ হয় যেন, উৎপাত থাকিলেই খুব বাহাদুরী হইল! এলোপ্যাথিক ঔষধের অপব্যবহারে অপকার হয়, হোমিওপ্যাথিক ঔষধের অপব্যবহারেও অপকার হয়, তাহা বোধ হয় পুলিন বাবু জানেন না। তবে এলোপ্যাথিক ঔষধের অপব্যবহারে অচিরাৎ যেরূপ প্রাণ সংশয়কারী অপকার ঘটিয়া থাকে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধের অপব্যবহারে সেরূপ অপকার ঘটে না। এটা হোমিওপ্যাথির পক্ষে সুখ্যাতির কথা না নিন্দার কথা? খুব যুক্তি ও সদ্বিবেচনা ত? অপকার হওয়াটা কি খুব প্রশংসা ও বাহাদুরীর কথা? যে চিকিৎসা শাস্ত্রে যে পরিমাণে উপকার দর্শে, সেই চিকিৎসাশাস্ত্র সেই পরিমাণে ভাল। আবার

যে চিকিৎসা শাস্ত্রে যত অল্প পরিমাণে অপকার ঘটিয়া থাকে, সেই চিকিৎসা-শাস্ত্র সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। পুলিন বাবু এই সামান্য সত্য কেন বুঝিতে পারেন নাই তাহা বুঝিতে পরিলাম না। পুলিন বাবু যেন ইহা বেশ মনে রাখেন যে, এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় অপব্যবহারের দোষে বেশী অপকার ও অনিষ্ট ঘটায় বলিয়া লোকে এলোপ্যাথিকে নিন্দা ও ভয় করিয়া থাকে এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সেরূপ কোন আশঙ্কা নাই বলিয়াই লোকে হোমিওপ্যাথির এত আদর করিয়া থাকে। ইহাতে কেবল হোমিওপ্যাথির শ্রেষ্ঠতাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

"বৈষ্ণব তন্ত্রের ডাক্তার মহাশয়েরা" হোমিওপ্যাথি ধরেন। যাঁহাদের বিজ্ঞানের প্রতি ভালবাসা আছে, হৃদয়ে উদারতা আছে, সত্যের প্রতি লক্ষ্য ও আস্থা আছে, তাঁহারাই এলোপ্যাথিক মত ত্যাগ করিয়া হোমিওপ্যাথি অবলম্বন করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিত্য চিকিৎসায় অকৃতকার্য্য এবং ঔষধের অপকারিতা দেখিয়াও ভ্রমান্ধ ও কুসংস্কারাবদ্ধ হইয়া নিজের অক্ষমতা ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের দোষ ঢাকিয়া রাখেন, তাঁহাদের হাজার ও বিদ্যাবুদ্ধি থাকিলেও আমরা তাঁহাদের সংশিক্ষার প্রশংসা করিতে পারি না। এলোপ্যাথি চিকিৎসার ন্যায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ফ্রাঙ্কলিন ও হেল্ মুথ প্রভৃতি অস্ত্রচিকিৎসক, গার্ণসি ও লিভিট প্রভৃতি ধাত্রীবিদ্যা-বিশারদ, এলেন ও নর্টন প্রভৃতি চক্ষুরোগ চিকিৎসক, হটন ও উইনস্লো প্রভৃতি কর্ণরোগ চিকিৎসক আছেন। শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাথ দত্ত অস্ত্রচিকিৎসায় অজ্ঞ বলিয়া সমগ্র হোমিওপ্যাথিকচিকিৎসক সমাজই যে অস্ত্রচিকিৎসায় অজ্ঞ তাহা নহে। দুই একজন মাত্র লোক লইয়া সমাজ নহে। অধুনা যাহারাই এলোপ্যাথিক চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়া হোমিওপ্যাথি মত অবলম্বন করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই অস্ত্র চিকিৎসায় সুদক্ষ। পুলিন বাবু এদেশের সংবাদ রাখেন না, ত ইংলণ্ড আমেরিকার সংবাদ রাখিবেন কি? সে সংবাদ যদি রাখিতেন—জ্ঞান যদি তত গভীর হইত—তাহা হইলে বলিতেন না, বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও বলিতে সাহস করিতেন না— যে "বৈষ্ণব তন্ত্রের ডাক্তার মহাশয়েরা হোমিওপ্যাথি ধরিয়া থাকেন।"

হোমিওপ্যাথিতে অশিক্ষিত লোক প্রবেশ করিয়াছে সত্য। এলো-

প্যাথিতে কোন্ কম? একজন ডাক্তারের নিকট দুই মাস কম্পাউণ্ডারি কাজ করিয়াই অনেক লোকে পল্লীগ্রামে মানুষ খুন করিতেছে। হাতুড়ে সব চিকিৎসাতেই আছে। হাতুড়ে দেখিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রের দোষ গুণ বিচার হয় না। তবে ইহা সত্য যে এলোপ্যাথিক হাতুড়ে অপেক্ষা হোমিওপ্যাথিক হাতুড়ে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। ইহা যে শুদ্ধ আমরা বলিতেছি তাহা নহে। ইহাই আপামর সাধারণ লোকের ধারণা। শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর কবিরাজ কয়জন আছেন? সহরের যে গলিতে গলিতে সাইনবোর্ড মারা কবিরাজ রহিয়াছেন, সকলেই কি সমান শিক্ষিত ও সুদক্ষ? আমরা জানি তাহা নহে, তাই বলিয়া কি কবিরাজী শাস্ত্রকে নিন্দা করিতে হইবে? পুলিন বাবু বলিয়াছেন "এখন যাঁহার সংসারে অন্ন জুটে না, তিনিই শেষটায় হোমিওপ্যাথিক হইয়া বসেন।" আমরা বলি, এখন যাহার সংসারে অন্ন জুটে না, তিনিই চিকিৎসক হইয়া ঔষধের বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন, তাহার মধ্যে কতক লোকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, কতক লোক এলোপ্যাথিক চিকিৎসা এবং কতক লোকে বা কবিরাজী চিকিৎসা অবলম্বন করিয়া বসিতেছেন। এমন অনেক কবিরাজ আছেন, যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না; এমন অনেক এলোপ্যাথিক চিকিৎসক আছেন যাঁহারা মেটিরিয়া মেডিকা কখন উল্টান নাই। ভাল মন্দ সকল চিকিৎসা শাস্ত্রেই আছে। পুলিন বাবু যেন ইহা বেশ করিয়া মনে ভাবিয়া দেখেন।

পুলিন বাবু হোমিওপ্যাথি মত কি তাহা সমালোচনায় নিজের যথেষ্ট বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। পুলিন বাবু হোমিওপ্যাথিক পুস্তকের এক পৃষ্ঠাও উল্টান নাই, অথচ হোমিওপ্যাথি মত সমালোচনা করিতে বসিয়াছেন। তিনি হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাহা আমরা তাঁহার লেখা হইতেই সপ্রমাণিত করিব। আমরা ভাবিয়াছিলাম, পুলিন বাবু একজন এম, বি, অবশ্যই হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধীয় শ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলি অধ্যয়ন করিয়াছেন, বুঝিয়াছেন এবং তৎপরে তাহার ভ্রমগুলি সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে বসিয়াছেন। এখন দেখিতেছি তাহার কিছুই নহে; পুলিন বাবু না পড়িয়াই পণ্ডিত। তিনি গায়ের জোরে, গলার জোরে, আজ হোমিওপ্যাথিকে সমুদ্র পার করিয়া দিতে বসিয়াছেন। এমন

জন্যাবাজি ইংলণ্ড আমেরিকায় অনেক হইয়া গিয়াছে, এখানের ত কথাই নাই, তাহা বোধ হয় পুলিন বাবু জানেন না। তাহা জানিলে সামান্য সপ্তম বর্ষিয় বালকের ন্যায় ভুল কথা সকল উল্লেখ করিয়া হোমিওপ্যাথি মতের বিপক্ষে আজ তর্ক করিতে বসিতেন না।

পুলিন বাবু লিখিয়াছেন,—"হোমিওপ্যাথির নিয়ম হইতেছে সমান সমান (Similis Similifus)।" কথাটা সমান সমান নহে, সদৃশে সদৃশ; Similis Similifus নহে, Similia Similibus। পুলিন বাবুর গোড়া কাঁচা তা হোমিওপ্যাথির বিপক্ষে তর্ক করিবেন কি? তাহার পর লিখিয়াছেন "অহিফেণ বিষাক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে রোগীর অচৈতন্যাবস্থা (কোমা) উপস্থিত হয়। এজন্য হোমিওপ্যাথিক মহাশয়েরা কোমারোগে অল্পমাত্রা-অহিফেণ দিয়া থাকেন। কিন্তু সূক্ষ্ম ভাবিয়া দেখিতে গেলে এটি এলোপ্যাথিরই মত।" কি সূক্ষ্মই ভাবিয়াছেন! এটি যথার্থই এলোপ্যাথি মত বটে!! বলি জিজ্ঞাসা করি, ভাই, তোমার এলোপ্যাথি মতটা কি একবার বল দেখি? এলোপ্যাথির কি একটা মত (Theory) বা নিয়ম (Law) আছে যে বলিবে? হোমিওপ্যাথির মত Similia Similibus; প্রত্যেক হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা- পুস্তকে সর্ব্বাগ্রে এই মত স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত আছে। প্রত্যেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক এই মত স্বীকার করেন, প্রত্যেক হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এই মতানুসারে রোগীদেহে প্রযুক্ত হয়। আর তোমার মত টা কি একবার শুনিই না কেন? কখন কখন গায়ের জোরে বলা হয় এলোপ্যাথি মত "Contraria Contraris"। আমরা জিজ্ঞাসা করি, প্রত্যেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকই যেরূপ সকল স্থলে ও সকল সময়ে Law of similars অভ্রান্ত ও অখণ্ডনীয় বলিয়া স্বীকার করেন, প্রত্যেক এলোপ্যাথিক চিকিৎসক কি সেইরূপ Law of Contraries অভ্রান্ত ও অখণ্ড বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন? কখনই নহে। শুদ্ধ তাহাই নহে, স্বীকার অস্বীকারের কথা নহে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মাত্রেই যখনই রোগী দেহে যে ঔষধ প্রয়োগ করুন না কেন, তিনি এই Law of similars অর্থাৎ সদৃশ নিয়মানুসারেই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। রোগের লক্ষণ সমষ্টি ঔষধের লক্ষণ সমষ্টির সদৃশ হইলে (সমান নহে, পুলিন বাবু যেমন

ভুল বলিয়াছেন) সেই ঔষধ সেই রোগে প্রযুক্ত হয়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসক মাত্রই কি সকল সময়ে ও সকল স্থানে এইরূপে Law of Contraries বা বিপরীত-মতানুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন? তাঁহারা কি ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে 'এই রোগের বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত ঔষধ কি' তাহা ভাবিয়া দেখিয়া ও বাহির করিয়া তবে তাহা প্রয়োগ করেন? তাঁহাদের মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য-তত্ত্ব পুস্তকে প্রত্যেক রোগের বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত ঔষধ সকল কি লিখিত আছে? তাহা যখন নাই, বিপরীত নিয়মানুসারে যখন সকল সময়ে ঔষধ প্রযুক্ত হয় না, তখন আবার "আমাদের এলোপ্যাথি মত" বলা হয় কেন? এলোপ্যাথির কি স্থির কোন মত আছে যে "আমাদের মত" বল? এলোপ্যাথি এলো প্যাথি—জগা খিচুড়ি। যখন যাহা ইচ্ছা, তখন তাই দিয়া চিকিৎসা কর। আজ অমুক বড় লোক—বড় ডাক্তার—একটী ঔষধ দ্বারা একটী রোগ চিকিৎসা করিতেছেন শুনিলে, অমনি কল্য তাঁহার লেজ ধরিয়া চক্ষু মুদিয়া (সত্য মিথ্যা না দেখিয়াই) সকলেই সেই রোগে বা তৎসদৃশ রোগে সেই ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তাই বলি, এলোপ্যাথির কি আবার একটা মত আছে যে, এলোপ্যাথিক মত এলোপ্যাথিক মত কর? যদি থাকে, আমরা শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকিলাম। পুলিন বাবু যদি তাঁহার এলোপ্যাথির জন্য একটা হাত পা দিয়া নূতন মত গড়াইতে পারেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে বাহাদুর বলিব।

এলোপ্যাথিক চিকিৎসা বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা নহে; হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা। এলোপ্যাথির কোন নির্দ্দিষ্ট মতামত (Theory, Principle বা Law) নাই। সাধারণ এলোপ্যাথিক চিকিৎসকদিগকে যদ্যপি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তাঁহারা কোন মত, শাস্ত্র বা Principle অনুসারে রোগে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিরুত্তর থাকেন। সকল বিজ্ঞানেরই, একটী করিয়া মত, নিয়ম বা Principle থাকা চাই। তজ্জন্য পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন :—

Science is "knowledge duly arranged and referred to general truth and principle on which *it* is founded; in brief, science is "knowledge reduced to principles"

কোন শাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলিতে গেলে (১) তাহার জ্ঞান পরীক্ষিত হওয়া আবশ্যক। (২)তাহার ভিত্তিস্বরূপ কোন একটী নির্দ্দিষ্ট অখণ্ডনীয় সত্য, মত বা principle থাকা আবশ্যক। যে জ্ঞান পরীক্ষিত হয় নাই এবং যে জ্ঞানের বা যে শাস্ত্রের ভিত্তি স্বরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট মত বা principle নাই, সে মত বা শাস্ত্র কখন বিজ্ঞান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এলোপ্যাথিক ঔষধ সম্বন্ধীয় জ্ঞান রীতিমত মনুষ্য দেহে পরীক্ষিত হয় নাই। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সকল রীতিমত সুস্থ মানবদেহে পরীক্ষিত হইয়াছে। সুস্থ মানবদেহে পরীক্ষিত হইয়া যে সমস্ত লক্ষণ উৎপন্ন হইয়াছে, ঔষধের সেই সমস্ত লক্ষণ তালিকাকারে লিখিত হইয়াছে। এই লক্ষণ সমষ্টিই হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকা বা ভৈষজ্যতত্ত্ব। ঔষধ সকল মানবদেহে পরীক্ষিত হওয়া চাই। শুদ্ধ মানবদেহে হইলে হইবে না, সুস্থ মানবদেহে হওয়া চাই। সুস্থ মানবদেহে না হইলে ঔষধের ও রোগের লক্ষণ এরূপ বিমিশ্রিত ও পরিবর্ত্তিতভাবে প্রকাশিত হইবে যে, কোন্ গুলি শুদ্ধ ভেষজ-জনিত লক্ষণ এবং কোন্ গুলি রোগের লক্ষণ তাহা বুঝা যাইবে না। মানব শরীর ব্যতীত নিম্ন জন্তু যথা কুকুর, বিড়াল, খড়্গশ, ভেক প্রভৃতির উপর ঔষধ পরীক্ষিত হইলে হইবে না, কারণ ঐ সমস্ত জন্তুর দেহ ও দৈহিক ক্রিয়া অনেক বিষয়ে মানুষের দেহ ও দৈহিক ক্রিয়া হইতে অনেক বিভিন্ন। শুদ্ধ তাহাই নহে। নিম্ন জন্তুদেহে ঔষধ পরীক্ষিত হইলে বাহ্যিক বিকশিত লক্ষণ যথা ভেদ, বমন, নিদ্রা, আক্ষেপ প্রভৃতি বেশ সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আভ্যন্তরিক অনুভূত লক্ষণ সকল যথা বেদনা, জ্বালা, যন্ত্রণা মানসিক অবস্থা ইত্যাদি কিছুই বুঝিতে পারা যায় না, কারণ জন্তুগণ আভ্যন্তরিক অবস্থা কিছুই প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না।

এক্ষণে দেখা গেল, যাহা যাহা বিজ্ঞানের অবশ্য প্রয়োজনীয়, অর্থাৎ যাহা না হইলে কোন শাস্ত্র বা মতকে বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র বা মত বলা যায় না, তাহা এলোপ্যাথির নাই, হোমিওপ্যাথির আছে। এলোপ্যাথির জ্ঞান পরীক্ষিত হয় নাই; হোমিওপ্যাথির জ্ঞান সুস্থ মানবদেহে পরীক্ষিত হইয়াছে। এলোপ্যাথির নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বা Law নাই, হোমিওপ্যাথির Law of similars বা সদৃশ নিয়ম আছে। যখন এলোপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্র

বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র নহে, তখন আবার "আমাদের এলোপ্যাথিক মত" বলিয়া চীৎকার কর কেন?

পুলিন বাবু লিখিয়াছেন হোমিওপ্যাথি মত সত্য হইতে গেলে : "কোন স্থান অস্ত্রদ্বারা কাটিয়া গিয়া যদি বেদনা উপস্থিত হয়, তবে সেই স্থলে অল্প অল্প দা দিয়া কাটিলে রোগীর অবশ্যই রোগ উপশম হওয়া উচিত।" কি চমৎকার তর্ক ও যুক্তি! হোমিওপ্যাথি অধ্যয়ন করিয়া পুলিন বাবুর এত দিনের পর বুঝি এই জ্ঞান জন্মিয়াছে? হোমিওপ্যাথি কি তাহা পুলিন বাবু মোটেই বুঝেন নাই, তাই তিনি এইরূপ বালকের ন্যায় ভ্রমপূর্ণ বাক্য সকল উচ্চারণ করিয়াছেন। পুলিন বাবুর শিক্ষার জন্য আমরা নিম্নে এই সম্বন্ধে সংক্ষেপ বর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম। হোমিওপ্যাথি কি তাহা সংক্ষেপে ইহাতে বুঝিতে পারিবেনঃ—

"ইলিস মৎস্য খাইয়া পেটের অসুখ করিয়াছে, আরও ইলিস মৎস্য খাও, পীড়া আরোগ্য হইবে; এই ত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা।—আমরা বলি উহা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা নহে। হোমিওপ্যাথি সদৃশ চিকিৎসা, সমান চিকিৎসা নহে। সদৃশ ও সমান বা সম এক কথা নহে। Similar এবং the same or Equal সম্পূর্ণ পৃথক। সদৃশ (Similar) ত্রিভুজ বলিলে সমান (Equal) ত্রিভুজ বুঝায় না। ইলিশ মৎস্য খাইয়া ভেদ হইলে পুনরায় ইলিশ মৎস্য খাইতে দিলে Homoeopathy হয় না; উহাকে Isopathy কহে। কর্পূর সেবন জনিত ভেদ বমন এবং ভেদবমন রোগ (যথা ওলাউঠা) এক রোগ নহে, সদৃশ রোগ। হোমিওপ্যাথিক মত এই যে, সুস্থ শরীরে কোনও ঔষধ সেবনে করিলে যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, তৎসদৃশ (Similar) লক্ষণযুক্ত কোন রোগ, বা তৎসদৃশ লক্ষণ কোনও রোগে দেখা গেলে সেই ঔষধে সেই পীড়া দূর করা যায়। সুস্থ শরীরে অধিক মাত্রায় কর্পূর সেবন করিলে ভেদ ও বমন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়; এক্ষণে রোগজনিত (কর্পূর খাইয়া নহে, তাহা হইলে Similar হয় না, the same or Equal হয়) ভেদ বমন লক্ষণ দেখিলে কর্পূর প্রয়োগ করা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা। কর্পূর সেবনজনিত ভেদবমন হইলে তাহাতে কর্পূর প্রয়োগ করিতে হইবে না, ভেদবমন রোগবশতঃ হওয়া চাই।" *

* হোমিওপ্যাথির বিপক্ষে আপত্তি খণ্ডন, ৪৭ পৃষ্ঠা।

পুলিন বাবু লিখিয়াছেন যে 'হরনাথ বাবু একোনাইট ও বেলেডনার ব্যবহার সম্বন্ধে বলেন যে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ লইয়া এলোপ্যাথিক মতে ব্যবহার করিলে কেবল অনিষ্টেরই সম্ভাবনা। এস্থলে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, হোমিওপ্যাথি সৃষ্টি হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই উক্ত ঔষধদ্বয় ব্যবহৃত হইতেছে।' আচ্ছা, তর্কস্থলে যেন স্বীকার করা গেল যে উক্ত ঔষধদ্বয় হোমিওপ্যাথি সৃষ্ট হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। ডাক্তার লডার ব্রণ্টন (Dr. Lauder Brunton) ইংলণ্ডের একজন অতি সুবিখ্যাত ও প্রধান চিকিৎসক। তিনি ইংলণ্ডের রয়াল কলেজ অভ্ ফিজিসিয়ান্সের একজন প্রধান পরীক্ষক। তিনি তাঁহার রচিত পুস্তকে (A treatise of Pharmacology, Therapeuties and Materia Medica) এমন অনেক ঔষধের নাম উল্লেখ করিয়াছেন যাহা এলোপ্যাথি কখন শুনে নাই, অথচ তাহা চিরকালই হোমিওপ্যাথি মতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ডাক্তার লডর ব্রণ্টনের সেই পুস্তকের General Index এর মধ্যে যে সকল ঔষধ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রায় সমস্তই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ। ডাক্তার ব্রণ্টনের পুস্তক মুদ্রিত হওয়ার বহু পূর্ব্বে এই সকল ঔষধ হোমিওপ্যাথি মতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ডাক্তার ব্রণ্টনের General Index পড়িবার সময়ে বোধ হয় যেন কোন হোমিওপ্যাথিক পুস্তকই যথার্থই পাঠ করা যাইতেছে। এই সমস্ত ঔষধ হোমিওপ্যাথি ভিন্ন এলোপ্যাথি কখনই ব্যবহার করে নাই। উক্ত পুস্তক হইতে নিম্নে তালিকাকারে ঔষধ সকল ও যে যে রোগে উহা ব্যবহৃত হয় তাহা উদ্ধৃত হইতেছে। তাহা যখন পাঠ করা যায়, তখন বোধ হয় যেন কোন হোমিওপ্যাথিক পুস্তক পাঠ করিতেছি:—

রোগের নাম।	ঔষধের নাম।
এব্সেস (Abscess)	ক্যালসিক সলফাইড (আমাদের হেপার সলফার।
অম্লের পীড়া (Acidity)	পলসাটিলা।
এলবুমিনুরিয়া (Albumenuria)	ক্যান্থারিস।
অল্প ঋতুস্রাব (Amenorrhoea)	ইগ্নেসিয়া, পলসাটিলা।

সংন্যাস (Apoplexy)	একোনাইট।
হাঁপানি কাসী (Asthma)	আর্সেনিক, ইপিকা।
পৈত্তিক দোষ বশতঃ মাথাধরা	ব্রাইওনিয়া।
ব্রংকাইটিস	একোনাইট, আর্সেনিক।
আঘাত (Bruise)	আর্ণিকা।
স্ফোটক (Boils)	আর্সেনিক, সলফাইড।
নাসিকার তরুণ সর্দ্দি	আর্সেনিক, ক্যাম্ফার, নক্সভমিকা, পটাস-আইওডাইড, পলসাটিলা।
মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য	একোনাইট, বেলেডনা।
ক্লোরোসিস (Chlorosis)	ককুলস।
ওলাউঠা (Cholera)	আর্সেনিক, ক্যাম্ফার, কুপ্রম, ভিরাট্রম-এলবম।
শূলবেদনা (Colic)	আর্সেনিক, ককুলস।
কণ্ডাইলোমেটা (Condylomata)	থুজা।
কঞ্জঙ্কটাইভা-প্রদাহ (Conjunctivitis)	বেলেডনা, ইউফ্রেসিয়া, মার্কুরিয়াস
কোষ্ঠবদ্ধ (Constipation)	হাইড্রাসষ্টিস, নক্সভমিকা।
শিশুদিগের আক্ষেপ (Infantile Convulia)	একোনাইট, বেলেডনা, ইগ্নেসিয়া।
কাসী (Cough)	পলসাটিলা।
প্রলাপ (Delerium)	বেলেডনা, ওপিয়ম।
বহুমূত্র (Diabetes)	আর্সেনিক, এসিড ফস্ফরিক।
উদরাময় (Diarrhœa)	আর্সেনিক, মার্কুরিয়স-কর, ডল্কামারা, পলসাটিলা রুবার্ব
শোথ (Dropsy)	আর্সেনিক, ব্রাইওনিয়া।
রক্তামাশায় (Dysentery)	আর্সেনিক, মার্কুরিয়স-কর।
রজঃশূল (Dysmenorrhœa)	পলসাটিলা।
অজীর্ণ (Dyspepsia)	আর্সেনিক, ব্রাইওনিয়া, ইপিকা, নক্সভমিকা।

প্রশ্বাস কষ্ট (Dysuria)	ক্যান্থারিস।
কানকামড়ানি (Earache)	পলসাটিলা।
নাসিকা হইতে রক্তস্রাব (Epistaxis)	একোনাইট, আর্ণিকা, হামামেলিস
জ্বর (Fever)	একোনাইট, জেলসিনিয়ম, রসটক্স
প্রমেহ (Gonorrhoea)	ক্যানাবিস, পলসাটিলা।
রক্তবমন (Hemalemesis)	হামামেলিস, ইপিকা।
অর্শ (Hœmorroids)	নক্সভমিকা, সলফার।
শিরঃপীড়া (Headache)	একোনাইট, বেলেডনা, ব্রাইওনিয়া ক্যামমিলা, নক্সভমিকা।
বুকজ্বালা (Heartburn)	নক্সভমিকা, পলসাটিলা।
প্রদাহ (Inflamation)	একোনাইট, আর্ণিকা, বেলেডনা, ব্রাইওনিয়া, পলসাটিলা।
উন্মাদ (Mania)	বেলেডনা, ক্যানাবিস, ইপিকা, হাইয়োসায়েমাস, ষ্ট্রামোনিয়ম।
হাম (Measles)	একোনাইট, পলসাটিলা।
বিবমিষা (Nausea)	ইপিকা, পলসাটিলা।
স্নায়ুশূল (Neuralgia)	একোনাইট, বেলেডনা, ক্যামমিলা, সিমিসিফুগা, জেলসিমিয়ম, ইগ্নেসিয়া, ষ্টাফিসোগ্রিয়া, নাইট্রো-গ্লিসিরিন, পলসাটিলা।
প্লুরিসি (Plurisy)	একোনাইট, ব্রাইওনিয়া।
নিউমোনিয়া (Pneumonia)	একোনাইট, ব্রাইওনিয়া, ফসফরস।
বাত	একোনাইট, ব্রাইয়োনিয়া, সিমি-সিফুগা, রসটক্স।
মচকাইয়া যাওয়া (Sprain)	আর্ণিকা, রসটক্স।
টন্সিল প্রদাহ ও সোরথ্রোট	একোনাইট, এপিস, বেলেডনা মার্কুরিয়স, ফাইটোলাকা।

দন্তশূল (Toothache)	একোনাইট, বেলেডনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যামমিলা, কফিয়া,জেলসিমিয়ম-মার্কুরিয়স, নক্সভমিকা, পলসাটিলা, ষ্টাফিসেগ্রিয়া।
টাইফইডজ্বর (Typhoid fev	আর্ণিকা. আর্সেনিক, ব্রাইওনিয়া, ফসফরাস, রসটক্স।
বমন (Vomiting)	আর্সেনিক. ব্রাইওনিয়া, ককুলস, ইপিকা, নক্সভমিকা, পলসাটিলা, এণ্টিম-টার্ট, জিঙ্কম।
ক্ষত (Ulcer)	আর্ণিকা, ক্যালেণ্ডুলা।

আর উদাহরণে প্রয়োজন নাই, বোধ হর যথেষ্ট হইয়াছে। পাঠকবর্গকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, উপরি লিখিত রিপার্টরি বা চিকিৎসা প্রদর্শিকা পাঠে, উহা হোমিওপ্যাথিক রিপার্টরি বলিয়া ভ্রম জন্মে কিনা? কিন্তু যথার্থ, দেখিতে গেলে, উহা এক খানি এলোপ্যাথিক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

এই Repertory, Index অথবা চিকিৎসা-প্রদর্শিকা সম্বন্ধে দুইটী কথা বলিবার আছে। এখন এই রিপার্টরির মধ্যে সমস্ত ঔষধই সদৃশ নিয়ম বা Homœopathic Law অনুসারে ব্যবহৃত হইয়াছে। যে ঔষধে সুস্থ শরীরে যে সমস্ত লক্ষণ উৎপাদিত করে, রোগে সেই সমস্ত লক্ষণে সেই ঔষধ প্রযুজ্য। ইহাই হোমিওপ্যাথিক নিয়ম বা Homœopathic Law। ইপিকা ও এণ্টিমণি-টার্ট দ্বারা সুস্থ দেহে বমন উৎপন্ন হয়; ফসফরস ও ব্রাইওনিয়া সেবনে ফুস্‌ফুস প্রদাহ (Pneumonia), সিমিসিমুগা ও রসটক্স দ্বারা বাতের ন্যায় অবস্থা, আর্ণিকা সেবনে আঘাতের বেদনার ন্যায় বেদনা, কালি বা পটাশ আইওডাইড কর্ত্তৃক নাসিকার সর্দ্দি, ক্যাম্ফর, আর্সেনিক, ভিরাট্রম, ও কুপ্রম দ্বারা ওলাউঠার সদৃশ অবস্থা, বেলেডনায় প্রলাপ প্রভৃতি উৎপন্ন হয় আমরা জানি। এক্ষণে যদ্যপি ঐ সকল ঔষধ ঐ সকল রোগেই অল্প মাত্রায় প্রযুক্ত হয় (যেরূপ উপরি লিখিত Repertory বা Index তে হইয়াছে, অর্থাৎ সদৃশ নিয়মানুসারে ঔষধ প্রয়োগ প্রদর্শিত হইয়াছে) তাহা হইলে তাহা হোমিওপ্যাথি হইল কিনা? যদি হইল, তবে তাহা

প্রকাশ্যে স্বীকার কর না কেন? ইপিকা দ্বারা বমন নিবারণ হয়, ইহা এলো-প্যাথিক চিকিৎসকগণ জানেন ও স্বীকার করেন, কিন্তু কেন হয় জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা নিরুত্তর হন। আমরা বলি Homoeopathic Law বা হোমিওপ্যাথিক নিয়মানুসারেই হইয়া থাকে। ইপিকা বমন উৎপন্ন করিতে পারে বলিয়াই উহা বমন নিবারণ করিতে পারে।

পুলিন বাবু লিখিয়াছেন "হোমিওপ্যাথিক মহাশয়েরা দুই শত ডাইলু-শনের (Cinna*) সিনা প্রয়োগ করিয়া ক্রিমি রোগ আরাম করিতে চান। সিনা নামক ঔষধে কখন ক্রিমি নামক জন্তু সৃষ্ট হয় না। অতএব ক্রিমি-রোগে ক্রিমি খাওয়াইলে উপকার হইবার সম্ভাবনা। নচেৎ হোমিওপ্যাথি হয় কই? ক্রিমি রোগে ক্রিমি উদরস্থ করিলে উভয় ক্রিমিতে পরস্পর কামড়া কামড়ি করিয়া মারা পড়িবার সম্ভাবনা।"

পুলিন বাবুর যেমন হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, তেমনি তর্কযুক্তি ও রসিকতা। পুলিন বাবু বলেন সিনা নামক ঔষধে কখন ক্রিমি নামক জন্তু সৃষ্ট হয় না। আমরাও বলি সিনায় ক্রিমি সৃষ্ট হয় না। পুলিন বাবু যে আজ একটা বড় নূতন কথা বলিলেন ও নূতন সত্য আবিষ্কার করিলেন তাহা যেন তিনি মনে না ভাবেন। কোন ঔষধ কর্ত্তৃকই কোন রোগ সৃষ্ট হয় না। আর্সেনিক বা ক্যাম্ফর কর্ত্তৃক ওলাউঠা রোগ সৃষ্ট হয় না, ওলাউঠার ন্যায় অবস্থা উৎপন্ন হয়। কোন ঔষধেরই রোগ সৃষ্টিকরিবার ক্ষমতা নাই,তবে তৎসদৃশ অবস্থা উৎপন্ন করিতে পারে মাত্র। ঔষধ কর্ত্তৃক সুস্থ দেহে কতক গুলি লক্ষণ উপস্থিত হয়, কোন রোগ উৎপত্তি হয় না। রোগ যথা জ্বর, ওলাউঠা, সর্দ্দি প্রভৃতি কেহই ঘরে বসিয়া সৃষ্টি করিতে পারে না। রোগ এক একটী রাসায়নিক পদার্থ নহে, যে লেবরেটারিতে বসিয়া উহা দুই চারিটী পদার্থ সহযোগে প্রস্তুত করিয়া ফেলিবে। ক্যাম্ফরে ওলাউঠা উৎ-পন্ন হয় না, ওলাউঠা সদৃশ অবস্থা উৎপন্ন হয়; সিনায়ও ক্রিমি উৎপন্ন হয় না, ক্রিমির ন্যায় লক্ষণ সমূহ উৎপন্ন হয়। আর্ণিকায় কালশিরা উৎপন্ন ও সিম্ফাইটমে অস্থি ভগ্ন হয় না। আর্ণিকায় কালশিরা ও ছেঁচা ঘার ন্যায় বা সদৃশ অবস্থা উৎপন্ন হয় মাত্র, যথার্থই আর্ণিকা কর্ত্তৃক ছেঁচা ঘা বা

* কথাটা Cinna নহে, Cina। হোঃ, চি, সং।

কালশিরা উৎপন্ন হয় না। সেইরূপ, সিম্ফাইটমেও অস্থি ভগ্ন হয় না, তবে অস্থি ভাঙ্গিলে যেরূপ অবস্থা (যথা বেদনা ইত্যাদি) উৎপন্ন হয়, সিম্ফাইটম কর্তৃক সেইরূপ অবস্থা দূরীভূত হইয়া থাকে। তজ্জন্য আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কোন ঔষধে কোন রোগ সৃষ্ট হয় না, তৎসদৃশ অবস্থা বা লক্ষণ প্রকাশিত হয় মাত্র। সিনা সুস্থদেহে সেবনকালে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় ঃ—

(১) অক্ষি কনিনীকা (pupil) বিস্তৃত; (২) অল্প দৃষ্টি ও অক্ষিপুটের উৎক্ষেপ; (৩) অতিরিক্ত ক্ষুধা; (৪) উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা; (৫) নাসিকা ও মলদ্বারে চুলকানি; (৬) পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব; (৭) আক্ষেপিক কাশী, তৎসঙ্গে সঙ্গে বমন; (৮) অস্থির নিদ্রা; (৯) জ্বর; (১০) শরীরের নানাস্থানে উৎক্ষেপ।

এই লক্ষণগুলি সিনার লক্ষণ। এই গুলি যে ক্রিমির লক্ষণ তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং এইরূপ লক্ষণে সিনা সদৃশ ঔষধ (Homoeopathic remedy)। কার্য্যতঃ রোগীকে সিনা প্রয়োগ করিয়াও সুফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, অর্থাৎ উপরিলিখিত লক্ষণগুলি বিদূরিত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

হোমিওপ্যাথিক-চিকিৎসক।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ডাক্তার হরনাথ বাবুর ও ডাক্তার পুলিন বাবুর ইতিপূর্ব্ব লিখিত প্রবন্ধদ্বয়ের উপস্থিত বিচারকর্ত্তা হোমিওপ্যাথিক-চিকিৎসকের বিচারপ্রণালীর নমুনা দেখিয়া আমরা হতবুদ্ধি হইয়াছি। তিনি নিজে বিচারক হইয়া ডাক্তার পুলিন বাবুর প্রতি যেরূপ অমৃতবর্ষণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিচারশক্তির প্রকৃত পরিচয়ই আমরা পাইয়াছি এবং তিনি নিজেও গাম্ভীর্য্যের চূড়ান্তই দেখাইয়াছেন। যাহাহউক, তাঁহার ক্রমশঃ দেখিয়া আমরা এখন এসম্বন্ধে কিছু বলিতে ক্ষান্ত থাকিলাম। আগে দেখা যাউক, তাঁহার দৌড় কতদূর, পরে রোগের অবস্থা বুঝিয়া অবশ্যই উপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করা যাইবেক। চি, স, স।

সূতিকা-তরুণজ্বর বা প্রসূতির পচাজ্বর।

(পিউয়ারপিরাল্ সেপ্‌টিসিমিয়া)

সাধারণতঃ ডাক্তারেরা এই রোগকে "পিউয়ারপিরাল ফিবার" বা সূতিকাজ্বর বলেন। চিকিৎসাসম্মিলনীতে হোমিওপ্যাথিমতে ইহা আলোচিত হইয়াছে, এক্ষণে এলপ্যাথিমতে ইহার বিষয় বলা যাইতেছে।

এই ভয়ঙ্কর সাংঘাতিক ব্যাধি বহুকাল হইতে প্রসূতিদিগের প্রাণ হানি করিয়া আসিতেছে। অনেকদিনের প্রাচীন চিকিৎসাগ্রন্থসকলে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। হিপক্রেটিস্ বলিয়া গিয়াছেন, প্রসূতিদিগের প্ল্যাসেন্‌টা বা ফুল পচিয়া উহাদিগের একরূপ সাংঘাতিক জ্বর উপস্থিত হয়। তিনি আধুনিক সময়ের সূতিকাজ্বরের কথাই বলিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। ডাক্তার হার্‌ভি প্রভৃতি অন্যান্য প্রাচীন চিকিৎসকগণও এই রোগের বিষয় অবগত ছিলেন এবং ইহার প্রকৃত নিদান অবগত হইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিগত অষ্টাদশ শতাব্দির শেষভাগেই চিকিৎসকদিগের মধ্যে ইহার বিশেষরূপে আলোচনা আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে প্যারিনগরের "হোটেল্ ডিউ" এবং অন্যান্য কতিপয় বিখ্যাত সূতিকা-চিকিৎসাগারে এই রোগদ্বারা অনেকগুলি রোগী মারা পড়াতে এই সাংঘাতিক ব্যাধি বিশেষরূপে চিকিৎসক সমাজে প্রচারিত হইয়াছে।

এই রোগের নিদানসম্বন্ধে নানা চিকিৎসকের নানামত। কেহ কেহ ইহাকে আদৌ জ্বররোগ না বলিয়া একরূপ স্থানীয়প্রদাহ বলেন। যথা, অনেকে বলেন, ইহা প্রসূতিদিগের অন্ত্রাবরণ ঝিল্লির প্রদাহ (পেরিটোনাইটিস্) আবার কেহ বলেন ইহা জরায়ুর তরুণপ্রদাহ (মেট্রাইটিস্) অথবা মেট্রোপেরিটোনাইটিস্ (জরায়ুর প্রদাহ হইতে উৎপন্ন পেরিটোনাইটিস্। আবার কেহ কেহবা বলেন যে ইহা প্রসূতিদিগের একরূপ বিশেষ সংক্রামক জ্বররোগ যাহা কেবল প্রসূতিদিগকেই আক্রমণ করে।

কিন্তু এখনকার বিচক্ষণ চিকিৎসকেরা কহেন যে, ইহা কেবলমাত্র প্রসূতিদিগের কোন বিশেষ রোগ নহে। তাঁহারা কহেন যে আধুনিককালের সেপ্‌টিসিমিয়া বা পাইমিয়া ও যে ব্যাধি, ইহাও সেইরূপ ব্যাধি। অর্থাৎ ইহা প্রসূতিদিগের একরূপ সেপ্‌টিসিমিয়া। যদি এই নিদান সত্য

বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় তাহাহইলে ইহাকে সূতিকাজ্বর না বলিয়া সূতিকা সেপ্‌টিসিমিয়া বলাই বিহিত।

মোটের উপর বলিতে গেলে এই বলিতে পারা যায় যে, এই রোগের নিদানসম্বন্ধে এখনও নিশ্চয়রূপে কিছুই বলা যায় না। অনেক রোগের নিদানসম্বন্ধে ডাক্তারগণ এক্ষণেও ঘোর অন্ধকারে বিচরণ করিতেছেন। যথা ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি রোগ ঠিক কি কারণে উৎপন্ন হয়, তাহা এখনও কিছুই জানিতে পারা যায় নাই।

যে সকল চিকিৎসকেরা এই রোগকে একরূপ স্থানীয়প্রদাহ বলিয়া বোধ করিতেন, তাঁহাদের কথা এখনকার কালের চিকিৎসকেরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন না। মৃতদেহ ব্যাবচ্ছেদকালে এই রোগবশতঃ মৃতব্যক্তির জরায়ু-প্রদাহ, পেরিটোনাইটিস্ প্রভৃতি প্রায়শঃ বর্ত্তমান থাকে, এইজন্যই অনেকে এই রোগকে জরায়ুর প্রদাহ বা পেরিটোনাইটিস্ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখনকার নিদানজ্ঞ চিকিৎসকেরা বলেন যে, ঠিক পেরি-টোনাইটিস্, মেট্রাইটিস্ প্রভৃতি হইলে যে যে লক্ষণ উপস্থিত হয়, সূতিকাজ্বরে ঠিক সেই সেই লক্ষণ বা উপসর্গ উপস্থিত হয় না। বিশেষতঃ সূতিকাজ্বরে-মৃতা অনেক প্রসূতির শব ব্যাবচ্ছেদে কোনরূপ স্থানীয়প্রদাহ বর্ত্তমান থাকে না, এমনও সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। আবার আরও তাঁহারা বলেন যে এই রোগ সংক্রামক কিন্তু কেবলমাত্র পেরিটোনাইটিস্ বা মেট্রাইটিস্ এরূপ সংক্রামক নহে এবং এত সহজে এক রোগী হইতে অন্য রোগীকে আক্রমণ করে না।

যাঁহারা বলেন যে ইহা প্রসূতিদিগের একরূপ সংক্রামক জ্বর, তাঁহা-দিগের মধ্যে ফর্‌ডইস্ বার্কার প্রধান। এই শ্রেণীস্থ চিকিৎসকেরা বলেন যে, যহা হামজ্বর, বসন্তজ্বরের ন্যায় একরূপ বিশেষ জ্বর, যাহা কেবলমাত্র প্রসূতিদিগকেই আক্রমণ করে এবং হামবসন্তের ন্যায় এই রোগের বীজ রোগীহইতে অন্য রোগীতে গমন করে। কিন্তু হাম ও বসন্তে যেরূপ বিশেষ বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায়, সূতিকাজ্বরে কোন রোগীতে ঐরূপ কতকগুলি নির্দ্ধারিত লক্ষণ উপস্থিত হয় না। হাম ও বসন্তে সকল রোগীতেই গুঁটি বাহির হয় কিন্তু সূতিকাজ্বরে আক্রান্ত রোগীদিগের মধ্যে ঐরূপ গুঁটি বাহির হইবার ন্যায় আর কোন বিশেষ লক্ষণ কিছুই হয় না। এবং কোন

দুইটী বা চারিটী রোগীতে একই প্রকারের বিশেষ সাধারণ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে না।

অধুনাতনকালের নিদানজ্ঞ চিকিৎসকেরা এই রোগকে একরূপ সেপ্‌টি-সিমিয়া বা পাইমিয়া রোগ বলেন। পাঠকবর্গ জানিবেন কোনরূপ ক্ষত ইত্যাদি পচিয়া যে বিশেষ বিষ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই চিকিৎসকেরা সেপ্‌-টিক্ পয়জন্ বা পচা বিষ কহেন। এই বিষ কোনপ্রকারে রোগীর দেহে সঞ্চারিত হইয়া কতকগুলি উপসর্গ আনয়ন করে, সেই উপসর্গ সমষ্টিকে "সেপ্‌টিসিমিয়া" বলা যায়। পাইমিয়া ও সেপ্‌টিসিমিয়া প্রায় একই ধরণের রোগ এবং এক বিষ হইতেই উৎপন্ন। যেমন মুড়ি ও চাউল ভাজায় কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, পাইমিয়া ও সেপ্‌টিসিমিয়াতেও সেইরূপ একটু বিভেদ দৃষ্টিগোচর হয়। পাইমিয়া শব্দের অর্থ পুঁজ। অত-এব পচা পুঁজ রোগীর দেহে সঞ্চারিত হইয়া যে ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাকে পাইমিয়া এবং সাধারণ পচাক্ষত ইত্যাদির রস সঞ্চারিত হইয়া যে ব্যাধি উৎপন্ন হয় তাহাকে সেপ্‌টিসিমিয়া কহে। লক্ষণ দুই রোগেরই এক, তবে দেহের আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তনে দুই রোগে অল্প বিভিন্নতা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পাইমিয়াতে শরীরের স্থানে স্থানে আভ্যন্তরিক যন্ত্র ও অন্যান্য স্থানে ছোট ছোট এব্‌সেচ্ হইয়া পুঁজ জন্মে। সেপ্‌টিসিমিয়াতে ঐরূপ পুঁজোৎপত্তি হয় না। পাইমিয়া ও সেপ্‌টিসিমিয়া একই রোগের প্রকার-ভেদমাত্র।

পিউয়ার্‌পিরল্ সেপ্‌টিসিমিয়া অত্যন্ত সাংঘাতিক পীড়া। সময়ে সময়ে হস্‌পিটালের সমস্ত প্রসূতি এই রোগাক্রান্ত হইয়া মারা যায়। এই রোগ এত শীঘ্র শীঘ্র একরোগী হইতে অন্য রোগিতে সঞ্চারিত হয় যে, ডাক্তারেরা কোন উপায় অবলম্বন করিয়া তাহার প্রতিকার করিতে সমর্থ হন না। ১৭৬০, ১৭৬৮ এবং ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডননগরের হাঁসপাতালসমূহে ইহার এত অধিক প্রাদুর্ভাব হয় যে, প্রায় সমস্ত রোগী মারা পড়ে। ১৭৭৩ সালে এডিন্‌বরার হাঁস্‌পাতালে প্রায় সমস্ত প্রসূতি সন্তান প্রসব করিবার ২৪ ঘণ্টামধ্যে এই রোগদ্বারা আক্রান্ত হয় এবং সকলেই মরিয়া যায়। ১৮৬২ সালে বার্লিন্‌নগরের হাঁস্‌পাতালে প্রায় সমস্ত প্রসূতি মারা যায় এবং পরি-শেষে কর্ত্তৃপক্ষেরা হাঁসপাতাল বন্ধ করিতে বাধ্য হন।

এই সকল মৃত্যুসংখ্যা দেখিলে এইরূপ উপলব্ধি হয় যে, কোন সূতিকা-হাঁসপাতালে প্রসূতিকে ভর্ত্তি করিয়া লওয়া নিরাপদ নহে। কারণ একস্থলে অনেক প্রসূতি থাকিলে দৈবাৎ কোন রোগী উক্ত পীড়াদ্বারা আক্রান্ত হইলে সমস্ত রোগী মারা পড়িবার সম্ভাবনা। এখনকার আধুনিক চিকিৎসকগণ নানাবিধ স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রচার করিয়া হাঁসপাতাল সমূহে এই রোগের সংক্রামতা দোষ অনেক পরিমাণে নিবারণ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি যেরূপ ধরণে নিবারণ করা যায়, এই ব্যাধিকে সেইরূপ ধরণে নিবারণ করা যাইতে পারে। তবে এখনও কোন কোন হাঁসপাতালে এই রোগ সঞ্চারিত হইয়া অনেক রোগী প্রায় এক সঙ্গে মারা পড়িতে দেখা যায়। কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাঁস-পাতালে সময় সময় এই রোগবশতঃ অনেক রোগী মারা পড়িয়া থাকে। ইহার বহুব্যাপকতা দোষ নিবারণ করিতে হইলে যে রোগী ইহারদ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহাকে তৎক্ষণাৎ অন্যান্য রোগী হইতে পৃথক্ করিয়া অন্য আলাহিদা ঘরে লইয়া যাওয়া উচিত। এবং ঐ রোগীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে আর অন্য কোন রোগীর নিকট না যাইতে দেওয়া উচিত। এমন কি চিকিৎসক ঐ রোগী দেখিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিবেন বা স্নান করিবেন এবং তৎপরে কার্ব্বলিক লোসনদ্বারা হস্ত প্রক্ষালন করিয়া তবে অন্য রোগীকে স্পর্শ করিবেন। তার পর হস্‌পিট্যালে বিশেষরূপে বায়ু-সঞ্চালনের ব্যবস্থা ও অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা উচিত। এই রোগ হাঁস্‌পাতালের প্রসূতি ছাড়া অন্যান্য প্রসূতিকেও সচরাচর আক্রমণ করে। কিন্তু ইহা হাঁস্‌পাতালে সচরাচর যেরূপ বহুব্যাপকরূপে প্রাদুর্ভূত হয়, বাহিরে সেরূপ হয় না। কারণ হাঁস্‌পাতালে বহু রোগী একত্র থাকা-নিবন্ধন এক রোগী হইতে অন্য রোগীতে রোগ বিস্তৃতির যেরূপ সুবিধা হয়, বাহিরে সেরূপ হয় না। তবে কখন কখন বাহিরেও কলেরা প্রভৃতির ন্যায় অনেক প্রসূতি একাদিক্রমে বা একসঙ্গে আক্রান্ত হয়।

১৮২৭-২৮ খৃঃ অব্দে লণ্ডননগরে পিউয়ার্‌ পিয়াল্‌ সেপ্‌টি সিমিয়া বহু-ব্যাপকরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু কলেরা প্রভৃতি রোগ যেমন একরূপ বিষ হইতে উৎপন্ন হইয়া বহুলোককে একবারে আক্রমণ করে এ রোগ সেরূপ ভাবে প্রাদুর্ভূত হয় না। এই রোগ স্পর্শাক্রামক। সুতরাং

অতি সহজেই এই রোগের বীজ এক রোগী হইতে অন্য রোগীতে গমন করিতে পারে। এই স্পর্শাক্রামক দোষবশতঃ একাদিক্রমে অনেক রোগী এই পীড়াদ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় এই পীড়া ম্যালেরিয়া কলেরা প্রভৃতি দেশব্যাপক মহামারীর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। কোন এক গ্রাম বিশেষে যদি অনেকগুলি প্রসূতি থাকে, আর দৈবাৎ কোন প্রসূতি উক্ত পীড়াদ্বারা আক্রান্ত হয় তবে অন্যান্য প্রসূতিরা সম্পূর্ণরূপে সংস্পর্শ দোষ হইতে বিচ্যুত থাকাবিধায় তাহারা আক্রান্ত হইতে পারে না। কিন্তু কোন ধাত্রী বা চিকিৎসক যদি উক্ত রোগাক্রান্ত রোগীকে স্পর্শ করিয়া পরে অন্যান্য প্রসূতির নিকট গমন করেন, তবে তাহার সংস্পর্শে সমস্ত প্রসূতিগুলি ঐ পীড়াদ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। অনেক স্থলে কোন ডাক্তার বা ধাত্রী বিশেষের দ্বারা চিকিৎসিত প্রায় সমস্ত প্রসূতি এই রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। অথচ তাঁহাদের হস্তের বহির্ভূত অন্যান্য প্রসূতি সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকে। ইহাতে এইমাত্র বুঝা যায় যে, এই রোগদ্বারা কোন প্রসূতি বিশেষ আক্রান্ত হয় মাত্র। এবং ইহার বিষ সেই রোগীর দেহেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু ম্যালেরিয়া কলেরা প্রভৃতির বীজ কোন স্থান বিশেষে (সেই স্থানের জল, বায়ু বা ভূমিতে) উৎপন্ন হইয়া একবারে বহুলোককে আক্রমণ করে।

দৈহিক পদার্থ পচিয়া একরূপ বিষ উৎপন্ন হয়, ঐ বিষরোগীর দেহে সঞ্চারিত হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়। দেহের ক্ষত ইত্যাদি পচনশীল হইলে এই বিষ উৎপন্ন হয়। অস্ত্রদ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত অনেক রোগী সেপ্টিসিমিয়া-দ্বারা আক্রান্ত হয়। ঐ কারণবশতঃ প্রসূতিদিগের সেপ্টিসিমিয়া রোগ হইয়া জ্বর হইলে তাহাকেই পিউয়ার্ পিরাল্ সেপ্টিসিমিয়া বা সাধারণ কথায় সূতিকার তরুণজ্বর বা পিউয়ার্ পিরাল্ ফিবার বলে।

যে সকল স্ত্রীলোক সদ্য সন্তান প্রসব করে, তাহাদিগের শরীরে ক্ষতের অভাব নাই। জরায়ুর যে স্থানে প্ল্যাসেণ্টা বা ফুল সংলগ্ন থাকে, ফুল খসিয়া পড়িলে সেই স্থানে বড় একটা ক্ষতের ন্যায় হয়। সিম্‌সন্ প্রভৃতি ধাত্রীবিদ্যা-বিশারদ ডাক্তারগণ বলেন যে, প্রসূতিদিগের সন্তান হইবার সময় সমস্ত জরায়ুর ভিতরকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি (ছাল) উঠিয়া গিয়া টাট্‌কা ক্ষতের ন্যায় হয়। কিন্তু এখনকার ডাক্তারগণ একথা স্বীকার করেন না।

তাঁহারা বলেন কেবল যেস্থানে ফুল সংলগ্ন থাকে ফুল পড়িবার পর সেই স্থানে মাত্র ক্ষত হয়। এই ফুল সংলগ্ন স্থানে অনেক শিরা ছিঁড়িয়া যায় সুতরাং এই সকল ছিন্ন শিরামুখ দিয়া অনায়াসেই উৎপন্ন বিষ প্রসূতির দেহে সঞ্চারিত হইতে পারে। আবার ঐ ঘা পচিয়াই বিষ উৎপন্ন হইতে পারে। তদ্ব্যতীত জরায়ুর মধ্যে ফুলের অংশ থাকিয়া গেলে ঐফুল পচিয়া তাহাহইতে বিষ জন্মাইয়া ছিন্ন শিরা বাহিয়া রোগীণীর দেহে সঞ্চারিত হইতে পারে। আবার সন্তান হইলে জরায়ুর মুখ, অথবা যোনির কোন অংশ ফাটিয়া গিয়া ঐ ক্ষত পচিয়া বিষ উৎপন্ন হইতে পারে, সেই বিষ কোনরূপে কোন ছিন্ন শিরার আশ্রয় পাইলেই রোগীর দেহে গমন করিতে পারে। কোন ক্ষত না হইলেও কেবলমাত্র যোনির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির দ্বারা এই রোগের বীজ প্রসূতির দেহে সঞ্চারিত হইতে পারে, কিন্তু এইরূপ স্থলে বিষের বীজ অন্য রোগী হইতে আসা চাই। কারণ দৈহিক পদার্থ (ক্ষত প্রভৃতি) না পচিলে ঐ রোগের বীজ সৃষ্ট হয় না। উপদংশ রোগের বিষ ও তাহার বিস্তৃতির সহিত এই রোগের বিষ ও তাহার বিস্তৃতির সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। উপদংশ রোগের বীজ কেবলমাত্র জননেন্দ্রিয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আশ্রয় করিয়া রোগীণীর শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারে, ইহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় সমস্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির রোগবীজ চুষিয়া লইবার ক্ষমতা আছে। যে সময়ে প্রসূতি-দিগের ক্ষত সকল আরোগ্য হইতে আরম্ভ হয়, তখন আর তাহাদের বীজ চুষিয়া লইবার ক্ষমতা থাকে না, অথবা ঐ সকল ক্ষত হইতে আর বিষের সৃজন হয় না। এইজন্য প্রসব করিবার দুই চারি দিন মধ্যে যদি প্রসূতি এই রোগাক্রান্ত না হয়, তবে আর তাহার বড় একটা এই পীড়া হইবাব আশঙ্কা থাকে না।

কয়েকটী ঔষধের গুণ ও প্রয়োগ।

এলোপ্যাথিমতে।

অগ্নিদগ্ধে বাইকার্বোনেট্ অব্‌সোডা——কোন স্থান আগুনে পুড়িয়া

গেলে বাইকার্ব্বনেট্ অব্সোডা জলে গুলিয়া দগ্ধস্থানে দিলে তৎক্ষণাৎ জলন ও যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়।

উদরাময়ে অক্সাইড্ অব্জিঙ্ক—

অক্সাইড্ অব্জিঙ্ক— ৫৪ গ্রেণ।

বাইকার্ব্বনেট্ অব্সোডা—৭ $\frac{১}{২}$ গ্রেণ।

মিশ্রিত করিয়া চারি পুরিয়া ঔষধ* তৈয়ার কর। প্রতি ৬ ঘণ্টান্তর এক একটী পুরিয়া সেবন করিতে দিতে হইবে। ইহাতে বহুদিনের পুরাতন উদরাময় অতি সত্বর আরাম হয়। কোন কোন স্থলে তিনবার ঔষধ সেবনেই উপকার হয়।

ফস্ফাইড্অব্জিঙ্ক——স্বল্পবিরামজ্বর, টাইফয়েড্জ্বর প্রভৃতির শেষাবস্থায় যখন রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন ফস্ফাইড্ অব্জিঙ্ক প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। ইহার মাত্রা $\frac{১}{৮}$ গ্রেণ হইতে $\frac{১}{১২}$ গ্রেণ। নিউর‍্যালজিয়া বা স্নায়ুশূল রোগে $\frac{১}{৮}$ গ্রেণমাত্রায় বটিকাকারে প্রয়োগে উপকার দর্শে। তদ্ভিন্ন এন্জাইনাপেক্টোরিস্ রোগে ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ধ্বজভঙ্গরোগে ইহা মহৌষধ। স্মরণশক্তির অল্পতা হইলে ইহা প্রয়োগে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি হয়। তদ্ভিন্ন উৎকট চিন্তা ও দুর্ভাবনা বশতঃ অনিদ্রারোগে ইহার ব্যবহার সুফল ফলে। অতিরিক্ত পরিশ্রম, শরীরের অত্যধিক ক্ষয়বশতঃ যে সকল স্নায়বীয় পীড়া উপস্থিত হয়, তাহাতে ফস্ফাইড্ অব্জিঙ্ক প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। যে সকল স্থলে ফস্ফরস্ প্রয়োগে উপকার হয়, সেই সেই স্থলে ফস্ফাইড্ অব্জিঙ্ক ব্যবহৃত হয়। ফস্ফরস্ প্রয়োগ করিলে উদ্গারের সহিত ফস্ফরাসের গন্ধ বাহির হয় এবং অন্যান্য উপদ্রব আনয়ন করে। কিন্তু ফস্ফাইড্ অব্জিঙ্ক প্রয়োগে অন্যকোন উপদ্রব উপস্থিত হয় না। প্রফেশর হ্যামণ্ড নিম্নলিখিত ব্যবস্থা প্রদান করেন। যথা :—

---

* এই ঔষধটী কোন ইংরাজি পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত। পাঠকগণ ইহার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। সং।

জিঙ্ক্ ফস্‌ফাইড্‌— $\frac{১}{১৬}$ গ্রেণ।

একস্‌ট্রাক্ট নক্‌স ভমিকা $\frac{১}{৪}$ গ্রেণ।

এই ঔষধদ্বয় একত্র মিশ্রিত করিয়া বটীকাকারে সেবন করিতে দেওয়া যায়। ক্রমশঃ—

পরীক্ষিতমুষ্টিযোগ।

সম্পাদকীয়।

প্রমেহ বা ধাতের পীড়ার ঔষধ।

আজকাল প্রমেহ বা ধাতুর পীড়ার কিছু বাড়াবাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। এমন যুবক খুব্ কম আছেন, যাঁহার অনবরত ধাতুনিঃস্রব না থাকুক্, অন্ততঃ প্রস্রাবের সময় একটু জ্বালার সহিত প্রস্রাব, না হয় প্রস্রাবান্তে এক আধ ফোঁটা ধাতুনিস্রব, নেহাৎ না হয় বৈকালবেলাটা একটু খড়িগোলা প্রস্রাব না হইয়াই যায় না।

বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে সাধারণতঃ উক্ত রোগের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রধান দুইটী কারণের উপলব্ধি হয় *। এক আহারাদির অযথাব্যবহার, অর্থাৎ অসময়ে স্নানাহার, পথপর্য্যটন, রাত্রি-জাগরণ ও পেয়াজরসুন মাংস প্রভৃতি তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্যানিয়তভোজন, আর দ্বিতীয়তঃ যে সমস্ত কুলটা স্ত্রীজাতির বিষাক্ত প্রমেহ আছে, তাহাদের সহিত সংসর্গদ্বারা একপ্রকার ধাতের পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে এই শেষোক্তটীই ভয়ানক।

যে কারণেই এই রোগ উৎপন্ন হউক, ইহার প্রথমাবস্থায় প্রায়ই প্রস্রাবের সময় ভয়ানক জ্বালা ও যন্ত্রণা এবং টন্‌টনানি প্রভৃতি ভয়ানক অসহ্য

---

* কেহ মনে করিবেন না যে, প্রমেহরোগের কারণ ও লক্ষণ কিম্বা চিকিৎসাসম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তৎসমস্তই আমরা এস্থলে বলিতেছি। ফলতঃ ইহার রীতিমত চিকিৎসার নিয়ম স্থানান্তরে বলা যাইবে, এখন কেবল কতকগুলি দৃষ্টফল মুষ্টিযোগের বিষয় বলিব।

যাতনা উপস্থিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যখনকার যে অবস্থায় যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই ক্রমে বলিব।

(১) অত্যন্ত জ্বালার অবস্থায়।

এই অবস্থায় রোগী প্রত্যহ প্রাতে কাঁচা গোদুগ্ধ ৵০ অর্দ্ধপুয়া ও শীতল জল অর্দ্ধপুয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। এবং প্রাতে ও বৈকালে কাঁচা হরিদ্রার নির্জ্জল রস প্রতিবারে ৩০ অর্দ্ধ ছটাক আন্দাজ লইয়া অল্প মধুর সহিত পান করিবে। তদ্ভিন্ন মিশ্রির জল, ইক্ষু, পাকা পেঁপে প্রভৃতি ঠাণ্ডাদ্রব্যও খাইতে পারা যায়। যেমন অধিক জ্বালা যন্ত্রণাই কেন না হউক, আমার বোধ হয় যে, ৪।৫ দিবস ঠিক্ এইরূপভাবে আহার করিলে তাহার বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। আর যদি তাহাতেও না হয়, তবে কাঁচা দুগ্ধের সহিত হিঞ্চা বা হেলেঞ্চা শাকের রস মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলেও বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত ঔষধ এতাদৃশ উপকারী হইলেও রোগীর যদি জ্বর থাকে, অথবা এই ঔষধ ব্যবহারে তাহার হাটু বা শরীরের অন্য কোন স্থানে বেদনাবোধ হয়, তবে তৎক্ষণাৎ উক্ত সমস্তই পরিত্যাগ করিবে, কেননা অনেক নির্ব্বোধ লোক ঐরূপ জ্বালার অবস্থায় অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ক্রিয়া করিয়া পরে তদ্দ্বারা ভয়ানক বাত-রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। সুতরাং এই সমস্ত ঔষধ খুব্ সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা আবশ্যক, এসম্বন্ধে আরও বলিবার রহিল। (ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

সুরাপান বা বিষপান।—অনেক দিন অতীত হইল, এই গ্রন্থখানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু সময়াভাব বিশেষতঃ আরও কতকগুলি কারণে এপর্য্যন্ত আমরা উক্ত গ্রন্থসম্বন্ধে কোনরূপ মতামত ব্যক্ত করিতে না পারিয়া গ্রন্থকারের নিকট বিশেষ অপরাধী আছি। বিদেশীয় রীতি-নীতির অনুকরণ করিতে গিয়া ভারতবাসী দিন দিন যে সকল মহান্ অনর্থের ভাগী হইতেছেন, সেই সমস্তের মধ্যে মদ্যপানজনিত মহান্ অনর্থকে শীর্ষস্থানীয় বলিতে হইবে। বস্তুতঃ মদ্যপানদ্বারা দেশ যে কিরূপে দিন দিন

উৎসন্ন যাইতেছে এবং ইহার ভাবী পরিণামই বা ক্রমে আর কতদূর দাঁড়াইবে, তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে আর অধিক করিয়া বুঝাইতে হইবে না। অনেকদিন পূর্ব্বে একজন সুযোগ্য লেখক এই চিকিৎসা-সম্মিলনীতেই মদ্যপানের অপকারিতাসম্বন্ধে একটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখেন, "প্রবন্ধটী এতদূর উৎকৃষ্ট বিশেষতঃ সময়োপযোগী হইয়াছিল যে, তাহার মধ্য হইতে এস্থলে পুনর্ব্বার একটুকু উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছিলেন, "মদ্যপানজনিত দারিদ্র্য ও ভীষণ পাপাচার প্রভৃতি কত যে মহান্ অনর্থসকল সমাজমধ্যে প্রতিনিয়ত সঙ্ঘটিত হইতেছে, তাহা আর কাহাকেও চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া না দেখাইলেও চলে। ধনীর ধনক্ষয়, উপার্জ্জনশীলের অনাটন, গরিবের অনাহার, গৃহে বিবাদবিসম্বাদ, কলহ, বিরহ; বাহিরে অনাচার, কদাচার, অত্যাচার, মারামারি ধরাধরি, কাটাকাটি ও লাঠালাঠি প্রভৃতি কত যে পাপকাণ্ড কেবল মদের জন্যই আচরিত হইতেছে, তাহা কে না জানে? একজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার বলিয়াছেন যে, মদের ব্যবহার না থাকিলে পৃথিবী হইতে অর্দ্ধেক পাপ ও তিনভাগ দারিদ্র্য বিদূরিত হইয়া যাইত" কথাগুলি কতদূর সত্য, তাহা পাঠকগণ বিশেষতঃ মদ্যের সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ, তাঁহারাই ইহার বিচারে অনেকটা অধিকারী। এখন কথা এই যে, এমন একটা ভয়ঙ্কর, সর্ব্বনাশকারী বিষম শত্রুকে দমন বা শাসন করিবার জন্য যিনি অগ্রসর হন্, তিনি আমাদের পক্ষে অবশ্যই পরমোপকারী ব্যক্তি। কিন্তু উপস্থিত গ্রন্থকর্ত্তা যে কেবল অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা নহে। তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য না হইলেও কিন্তু অনেকটা যে হইয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। বাস্তবিকই মদ্যপানের সমূহ অপকারিতাসম্বন্ধে তিনি যেরূপ অধ্যবসায়, যেরূপ পরিশ্রম ও যেরূপ অসাধারণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক উপরোক্ত গ্রন্থের সংকলন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি কেবল আমাদের পরম উপকারী নহেন, তিনি আমাদের পক্ষে যথার্থই পরম বন্ধুর মধ্যে গণ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এশ্রেণীস্থ বন্ধুবর্গকে ভারতবাসী অনেক দিন হইতেই ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আবার কেবল ভুলিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন, প্রকৃত সদ্বন্ধুর দুর্দ্দশাও ভারবাসীর হস্তে যতদূর ঘটিবার তাহাও দিন দিন চূড়ান্তই ঘটিতেছে। ফলতঃ কেবল সুরাপানের গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া নহে, যেখানেই দেখিবে, গ্রন্থকর্ত্তার উদ্দেশ্য অতি মহৎ,

সেই খানেই দেখিবে অন্নাভাবে তাঁহার কণ্ঠাগত প্রাণ। পক্ষান্তরে লম্পট-যুবকযুবতীর লাম্পট্য-ব্যঞ্জক গ্রন্থকর্ত্তাদের অন্নবস্ত্রের কষ্টের কথা শুনিয়াছেন কি? বোধ হয় সেই জন্যই সুবিজ্ঞ প্রাচীন হিন্দীকবি মহাত্মা তুলসী দাস একদিন বড় মনের দুঃখেই বলিয়াছিলেন যে—

"সাঁচ্চা কহেত মারে লাঠ্যা ঝুটা জগৎ ভুলাই।
গোরস গলি গলি ফিরে স্বরা বৈটল বিকায়॥"

অর্থাৎ—"যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সত্যকথা বলে, তাহার ভাগ্যে প্রহার ভিন্ন কিছুই মিলে না অর্থাৎ প্রহারই তাহার সত্যের প্রকৃত পুরস্কার হয়। আর যে মিথ্যাবাদী ব্যক্তি জগতের লোককে প্রতারণা ও মিথ্যা বাক্যদ্বারা ভুলাইয়া খায়, সেই ব্যক্তি সর্ব্বত্রই যশ প্রাপ্ত হয়।" এই কথা বলিয়াই কবিপ্রবর উপমা দেখাইয়াছেন যে "যেমন অমৃততুল্য গোদুগ্ধ নিতান্তই অনাদরের সহিত দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া বিক্রয় হয়, কিন্তু মনুষ্যের ভয়ানক শত্রু মদ্য এক স্থানে বসিয়া অতি আস্পর্দ্ধা ও গর্ব্বের সহিত বিক্রয় হয় অথচ তাহা ফিরি করিয়া এগলি ওগলি করিয়া বেড়াইতে হয় না।" সুতরাং কবিবরের অনুকরণ করিয়া আমরাও উপস্থিত গ্রন্থকর্ত্তাকে বোধ হয় বেশ সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে, যদি এই গ্রন্থদ্বারা তাঁহাকে আর্থিক কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, তবে তাহাতে যেন তিনি কিছুমাত্র দুঃখিত না হন। পরিশেষে আমরা নিতান্তই আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিতেছি যে, যাঁহাদের একটী মুদ্রা ব্যয় করিতে প্রাণান্ত না ঘটে, তাঁহারা এরূপ একখানি সারবান্ গ্রন্থ পাঠ করিতে ঔদাস্য না করেন। গ্রন্থখানি ২৪৫ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। কলিকাতা ১০নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট্। প্রকাশক শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বসাকের নিকট প্রাপ্তব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

এত দীর্ঘকাল সম্মিলনীর অদর্শনে অনেকেই ইহার অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়াছিলেন। আশা করি, তাঁহাদের সে সন্দেহ সম্যক্ দূর হইবে। আর গ্রাহকবর্গের নিকট বিনীতভাবে ইহাও জানাইতেছি যে, যাঁহার নিকট যাহা বাঁকী আছে, পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। গ্রাহকগণ এ বিনীত নিবেদনে কর্ণপাত করিবেন কি?

ম্যানাজার।

বিবাহ-বিচার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বাল্যবিবাহসম্বন্ধে অনেকগুলি লোকে এই আপত্তি করেন যে, বালিকারা অল্প বয়সে বিবাহিত হওয়াতে তাহাদিগের অকালে যৌবন উদয় হয়। কথা সত্য হইলেও আপত্তিটী তাদৃশ গুরুতর নহে। কারণ আপত্তি উত্থাপনকারীরা এরূপ কারণ দেখাইতে পারেন না যে, অসময়ে যৌবনসঞ্চার হওয়াতে বালিকাদিগের শরীরের অনিষ্ট হয়। এইরূপ অসময়ে যৌবনসঞ্চারজন্য বালিকাদিগের শরীরগত অনিষ্ট হইলে কখনও আয়ুর্ব্বেদ-পারদর্শী মহাত্মা শুশ্রুতাচার্য্য দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যার সহিত চতুর্ব্বিংশবর্ষীয় যুবার বিবাহের ব্যবস্থা দিতেন না। শীতপ্রধান দেশবাসী অপেক্ষা উষ্ণপ্রদান দেশবাসীদিগের যৌবনসঞ্চার কিঞ্চিৎ অল্প সময়মধ্যে হয়। আমাদিগের দেশে বালিকাদিগের ঋতু সচরাচর ১২ হইতে ১৩ বৎসরের মধ্যে হয়। শীতপ্রধান দেশে দুই এক বৎসর বিলম্বে ঋতু হয়। অনেক ডাক্তার বলেন যে, ভারতবর্ষে বালিকাবিবাহ প্রচলিত থাকাতেই এত শীঘ্র ঋতু হয়, কিন্তু বিবাহের জন্য কিঞ্চিৎ অগ্রে ঋতু হইলেও সে সময়ের ইতরবিশেষ অতি যৎসামান্য। আদত কথা—গ্রীষ্মপ্রধানদেশে কিঞ্চিৎ অল্পবয়সে যৌবনসঞ্চার হয়। মধ্য আফ্রিকার "ইউগুণ্ডা," "মাকৃরাকা নিয়াম নিয়াম" ও "আকা" প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নিগ্রোজাতির বালিকাদিগের অল্পবয়সে যৌবনসঞ্চার হয়। আবার গ্রীনলণ্ড প্রভৃতি অত্যন্ত শীতপ্রধানদেশে ১৯।২০ বৎসর বয়সে বালিকাদিগের যৌবনসঞ্চার হয়। অত্যন্ত শীতপ্রধানদেশে যৌবনসঞ্চার ত বিলম্বে হয়ই, আবার ঋতুও মাস মাস স্রাব না হইয়া তিনমাস চারিমাস অন্তর হইয়া থাকে। গ্রীন্‌লণ্ড রমণীদিগের এইরূপ তিনমাস অন্তর ঋতু হওয়াতে অনেকে অনুমান করেন যে, আদিম অবস্থায় মনুষ্যদিগেরও ঠিক্ পশুদিগের ন্যায় বৎসরান্তে একবার ঋতু হইত *। মনুষ্যদিগের নিজ আচরণ ও সভ্যতার খাতিরে তাহাদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া এইরূপ মাসে মাসে ঋতু হইয়া থাকে। কিন্তু মধ্য আফ্রিকার ও অন্যান্য স্থানের অসভ্য জাতির মধ্যে মাসে মাসে

---

* বৈজ্ঞানিক দাম্পত্যপ্রণালী ২য় সংস্করণ।

ঋতু হইয়া থাকে। ইহাতে এই অনুমান হয় যে, নারীদিগের জননেন্দ্রিয়ের অবস্থা এখনও যেরূপ আছে, বহুকাল পূর্ব্বেও তাহাই ছিল। গ্রীন্‌লণ্ডবাসী রমণীদিগের যে বহুবিলম্বে এবং বহুদিন অন্তর অন্তর ঋতু হয়, তাহা স্থানীয় জলবায়ু গুণে হইয়া থাকে। মূলকথা, শীতের গুণ সঙ্কোচক এবং গ্রীষ্মের গুণ প্রসারক। শীতপ্রধানদেশবাসীদিগের শরীর গ্রীষ্মপ্রধানদেশবাসী-দিগের ন্যায় শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে না। শীতপ্রধানদেশের উদ্ভিদপর্য্যন্ত বহুকাল অবধি ক্ষুদ্র থাকিয়া যায়। গ্রীষ্মপ্রধানদেশবাসীদিগের শরীর শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে, এই জন্যই অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে আমাদিগের বালিকারা যুবতি হইয়া উঠে। আবার এই কারণবশতই আমাদিগের স্ত্রীগণ অল্পকাল-মধ্যেই যৌবন-সুলভ চাকৃচিক্য হারাইয়া থাকেন। অনেকে বলেন-অল্পবয়সে সন্তানের জননী হওয়াতে এইরূপ ঘটনা হয়, কিন্তু সে অনুমান ঠিক্ নহে। এমন দেখা যায়—যে সকল রমণীগণ বাঁঝা অর্থাৎ সন্তান প্রসব করে নাই, তাহাকেও অল্পবয়সে যৌবনশ্রী হারাইয়া থাকে। মধ্য আফ্রিকার মাক্‌রাকা নিয়াম্ নিয়াম্ (Makraka nyam nyam) আকা (Akka) প্রভৃতি জাতির স্ত্রীগণের অতি অল্পবয়সে যুবতী সুলভ চাকৃচিক্য দূরীভূত হয়। * কিন্তু এইরূপ অল্পবয়সে যৌবনসঞ্চার হইলেও যে ঐ সকল দেশের স্ত্রীগণ দীর্ঘজীবী হয় না এমত নহে। মধ্য আফ্রিকা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের অসভ্যজাতি বহুকালপর্য্যন্ত জীবিত থাকে। তবে মধ্য আফ্রিকা আরব প্রভৃতি দেশ অত্যন্ত উষ্ণ বলিয়া তত্তৎদেশবাসী মনুষ্য শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। আমাদিগের দেশে যে সকল বালিকারা (যেমন কুলিনের ঘরে) কিঞ্চিৎ অধিক বয়সপর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে, তাহারাও প্রায় ১৩ হইতে ১৪ বৎসরের মধ্যে ঋতুমতী হয়। আর অল্পবয়সে বিবাহিত হইলে ইহার পাঁচমাস কি চারিমাস অগ্রে ঋতুমতী হয়। অতএব এই মাত্র বলা যায় যে, বিবাহ সংস্কারদ্বারা এই ঘটনায় কিঞ্চিৎমাত্র অগ্র পশ্চাৎ হইয়া থাকে। একটী সপ্তম বৎসর বয়সের বালিকার বিবাহ দিলে কথনও ৮।৯ বৎসর বয়সে সে বালিকা ঋতুমতী হয় না। এবং ইংলণ্ডীয় বালিকা ২৫ বৎসর বয়সের সময় বিবাহিতা হইলেও চৌদ্দ পনর বৎসর বয়সে তাহার যৌবন সঞ্চার

* Vide, life like pictures of Nyam Nyam girls in "Travels in central Africa" by Col. C. Loug.

হয়। মনের সহিত দেহের ঘনিষ্টসম্বন্ধ আছে, একথা স্বীকার্য্য, কেন না কোন মানসিক বৃত্তিবিশেষের চালনা হইলে তৎবৃত্তির আধারস্বরূপ যন্ত্র-বিশেষও চালিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু এইরূপ বৃদ্ধির একটা সীমা আছে। মনুষ্য শত চেষ্টা করিয়াও এক বৎসর বয়ক্রমের আম্রবৃক্ষে ফল ফলাইতে পারেন না। আর যদিচ বাল্যবিবাহে কিঞ্চিৎ অগ্রে যৌবনসঞ্চার হয়, কিন্তু তাহা হইলেও শারিরীক কোন অনিষ্ট হয় না। অসময়ে যৌবন উপস্থিত হওয়া কথাটি প্রকৃতপক্ষে অনর্থক। অল্পবয়সে মানসিক বৃত্তির স্ফূরণ হওয়াতে শরীরের স্বাস্থ্য ভাল এইরূপ সূচিত হয়। যে গাছটী গোড়া হইতে অত্যন্ত তেজবান্ হয়, তাহাতেই শীঘ্র ফল ফলে। যে বৃক্ষে বিলম্বে ফল হয়, সে গাছের তত তেজ নাই এই বুঝায়। সংসারে দেখা যায়, যে সকল ইতর জন্তুযোগ হইতে অত্যন্ত সতেজও বলবান্ তাহারাই শীঘ্র সন্তানবতী হয়। অত্যন্ত তেজবতী কুক্কুরী একবৎসর মধ্যে সন্তানপ্রসব করে। তেজবতী বলবতী গোবৎসা অতি শীঘ্র দুগ্ধবতী হইয়া উঠে। এবং এইরূপ গাভিই দীর্ঘকাল জীবিত থাকে। ধনীলোকের সন্তানগণ সর্ব্বদা ভাল খায় পরে। এজন্য অল্পবয়সে তাহাদের শরীরে বিলক্ষণ বলসঞ্চয় হয় এবং শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। বিবাহ হউক বা না হউক, ধনীকন্যারা একা-দশ দ্বাদশবর্ষেই ঋতুমতী হয় এবং গরিবের মেয়েরা বিবাহিতা হইলেও অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে ঋতুমতী হয়। Arrest of growth simply signifies want of nourishment and Vigor. অধিক বয়সপর্য্যন্ত যৌবনসঞ্চার না হওয়াতে কেবল দরিদ্রা বালিকার শরীরের অবস্থা তত ভাল নয় এইমাত্র বুঝায়। প্লেফেয়ার প্রভৃতি বড় বড় ডাক্তারদিগের মত এই যে, যে সকল বালিকারা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে ঋতুমতী হয়, তাহাদিগের ঋতু বিলম্বে স্থগিত হয়। অর্থাৎ তাহাদিগের সন্তানধারণ ক্ষমতা বহুদিন-পর্য্যন্ত থাকে। স্ত্রীগণের ঋতু সচরাচর ৪৫।৫০ বৎসরে স্থগিত হয়, কিন্তু যে সকল বালিকারা অতি অল্পবয়সে ঋতুমতী হয়, তাহাদিগের ঋতু ৬০।৬৫ বৎসর বয়ঃক্রমপর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। আবার যাহাদিগের বহুবিলম্বে প্রথম ঋতু হয়, তাহাদিগের সন্তানধারণ ক্ষমতা অতি শীঘ্রই স্থগিত হয়। যে অতিরিক্ত বলসঞ্চয় জন্য অতি অল্পবয়সে ঋতু হয়, সেই বলবশতই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ঋতুকাল স্থায়ী হয়। শরীরের স্বাস্থ্যের সহিত সন্তানোৎপাদনকারী

ক্ষমতার ঘনিষ্টসম্বন্ধ। সন্তানোৎপাদনকারী ক্ষমতা অল্পবয়সে বিকাশ হওয়াতে শরীরের অবস্থা খুব ভাল এইরূপ বুঝায়। অল্পবয়সে বিবাহিত হওয়াতে কিঞ্চিৎ অগ্রে যৌবনের বিকাশ হইলেও বালিকাদিগের শারীরিক কোনও অনিষ্ট হয় না। এবং তাহাদিগের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমানভাবে বাড়িয়া উঠে। এইরূপ সমানবৃদ্ধি বিষয়ে প্রকৃতির একটী সুন্দর নিয়ম আছে। তাহাকে Correlation of growth বৃদ্ধির পরস্পরসামঞ্জস্য বলা যায়। কোন জীব বা উদ্ভিদের একাঙ্গ বৃদ্ধি বা হ্রস্ব হইলে তাহার অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাহার মানান মাফিক হ্রাস বা বৃদ্ধ হইয়া থাকে। এই জন্য বালিকারা অল্পবয়সে ঋতুমতী হইলে তাহাদিগের গর্ভাশয় ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমানভাবে বৃদ্ধি পায়। এবং এইরূপ সমানভাবে সমস্ত শারীরিক যন্ত্র ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বৃদ্ধি হওয়াতে তাহাদের স্বাস্থ্যের কোনরূপ হানি হয় না। এবং সন্তান প্রসব করিতে কষ্ট হয় না।

এইরূপে দেখা যায় অল্পবয়সে যৌবনসঞ্চার হইলেও তাহা শরীরের পক্ষে ততদুর হানিজনক নহে। আবার বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দিলেও মনুষ্যসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় অপক্কবয়সে যৌবনসঞ্চার যে রহিত থাকিবে, তাহারও কোন কারণ দেখা যায় না। ইন্দ্রিয়উত্তেজক এত বাহ্যিক কারণ পরস্পরা সভ্যসমাজে বর্ত্তমান আছে, যাহা বিবাহ অপেক্ষাও হানিজনক (যদি বাল্যবিবাহকে হানিজনক বলা যায়) এবং সে সকল কারণ সমাজ হইতে একেবারে দূরীভূত করা এখনকার উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার ক্ষমতার অতীত। ইউরোপ প্রভৃতি সভ্যদেশে বালিকাবিবাহ না থাকিলেও যেরূপ স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার, তাহাতে বালিকারা অল্পবয়সে নাটকনভেল পাঠ করিয়া মনে মনে বিবাহকল্পনা করিতে শিখে। এবং ঐসকল দেশে অল্প বয়সে বিবাহ না হইলেও যৌবনসঞ্চার হইবামাত্রই বালিকাগণের পিতামাতা বরনির্ব্বাচনে সচেষ্টিত হন এবং বালিকারাও কোর্ট্‌সিপ্ করিবার উপযুক্ত শিক্ষা পায়। পুরুষের মন ভুলাইবার যে সকল উপকরণ ও শিক্ষার দরকার, ইউরোপবাসী বালিকাগণ অগ্র হইতে সেইরূপ শিক্ষালাভ করিতে সচেষ্ট হয়। আমাদিগের দেশে অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকগণ ছোট ছোট ছেলে মেয়ে লইয়া বিরহের গল্প করে। বালিকারা বৌ বৌ খেলা করে, ইহা দেখিয়া এখনকার সুসভ্য বাঙ্গালী বাবুদের মহা রাগ। কিন্তু সুসভ্য ইউ-

রোপ দেশে এইরূপ কথোপকথন ও শিক্ষা সচরাচর হাতে কলমে হইয়া থাকে। ইউরোপ মহিলারা তাঁহাদিগের কন্যা সমভিব্যাহারে হাট বাজারে ভ্রমণে বহির্গত হন এবং কোন মনোমত "হবপাত্র" দেখিলে অনুচ্চস্বরে সঙ্গিনীর কানে কানে বলেন, আমার কন্যার বিবাহে পাঁচহাজার টাকার যৌতুক দিব। অভিপ্রায় এই যে, যদি বর জুটিয়া যায় *। অনেক ইউ-রোপীয় যুবকযুবতীর ইচ্ছা অল্পবয়সেই পরিণীত হওয়া। তবে অবস্থায় কুলায় না বলিয়া দায়ে পড়িয়া দীর্ঘকালপর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য হন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি এখনকার সভ্যতার যেরূপ বাড়াবাড়ী, আর দিনকতক পরে লোকে আহার পর্য্যন্ত কমাইতে বাধ্য হইবে। ইচ্ছাসত্ত্বে অনেক দিন অবিবাহিত থাকা আর সাংসারিক অসচ্ছলতা সমান কথা। আমাদিগের দেশে আমরা যেমন কন্যাদায়ে ব্যিব্রত, ইউরোপীয়গণও সেইরূপ। ইউরোপীয় মহিলাগণেরও আমাদিগের ন্যায় বর ভিন্ন সুখ সম্ভোগের উপায় নাই। অনেক ইউরোপীয় রমণী বর অভাবে বিমর্ষভাবে পিত্রালয়ে যৌবন কাটাইতেছেন। এইরূপ কৌমার অবস্থায় কাল-যাপন করা কেবল কঠোর সভ্যতাশাসনের জন্যই। পুরুষদিগের অবস্থায় কুলায় না এজন্য ইংলণ্ডীয় যুবাগণ শীঘ্র বিবাহে রাজী হন না। নচেৎ আমাদিগের ন্যায় সচ্ছল অবস্থা থাকিলে উরোপীয় বিবাহ-শাস্ত্রের বিধি আর একরূপ হইত তাহার সন্দেহ নাই। এই দেখ আমা-দিগের দেশে ইউরোপীয় সভ্যতা প্রবিষ্ট হইয়া অবধি আমাদিগের অবস্থা ক্রমেই অসচ্ছল হইতেছে এবং আমরাও শিক্ষার খাতিরে আমাদিগের যুবকগণকে বহুকালপর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিতে বাধ্য হইতেছি। এখন এম, এ পাস করিয়া শিক্ষা সমাপন করিতে সচরাচর ২৫ বৎসর সময় গত হইতেছে। ইহার পর আরও সভ্যতা ও শিক্ষার বৃদ্ধি হইলে আরও দুএকটী পাস বাড়িবে। তখন শিক্ষা সমাপন করিতে ৩০ বৎসর বয়ঃক্রম অতীত হইল। কিন্তু মনুষ্যের দৈহিক প্রকৃতিসিদ্ধ অভাব চিরকাল সমান থাকিবে। মনুষ্য শত চেষ্টা করিয়াও ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি দৈহিক ক্রিয়া সকল দমন করিতে পারিবে না। বরঞ্চ শিক্ষার সহিত বিলাসিতা সম্ভোগ প্রবৃত্তি

---

* John Bull and his Island by Max O. Rell.

আরও বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। মনুষ্যসন্তান যেরূপভাবে সভ্যতার দিকে ধাবিত হইতেছে, তাহাতে পরিণামে সংসার হইতে সুখ ও আরাম একবারে দূরীভূত হইবে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কাহাকে উন্নতি এবং কাহাকে অবনতি বলে তাহা এখনও আমরা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। এইজন্যই পতঙ্গের ন্যায় বিষম কষ্টকর ইউরোপীয় সভ্যতার জ্বলন্ত অগ্নিতে ঝম্প প্রদান করিতেছি।

অতএব অল্পবয়সে বিবাহিত হইলে যেরূপ মনোবৃত্তি উত্তেজিত হইবার সম্ভাবনা, বিবাহ না হইলেও এখনকার সভ্যসংসারে নানা কারণে মনোবৃত্তি স্ফুরিত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আমাদিগের বালিকারা অল্পবয়সে বিবাহিত হইলেও সৎশিক্ষায় বঞ্চিত হয় না। বরঞ্চ বিবাহের অগ্রে তাহারা যেরূপ স্বাধীনতা পায় ও স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, বিবাহের পর হইতে সে সকল বিষয়ে তাহারা যথেষ্ট সতর্ক হইতে শিখে এবং মনোবৃত্তি দমন করিতে শিক্ষা করে। আমাদিগের অন্তঃপুরে নববিবাহিতা বালিকারা যেরূপ সৎশিক্ষা পায়, বালিকাগণ অধিক দিন অবিবাহিতা থাকিলে সেরূপ কদাচিত হয়। বালকগণ অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিলে তত দোষজনক নহে। কিন্তু বালিকাগণ যৌবন সীমায় পদার্পণ করিবার পরেও অবিবাহিতা থাকায় বিলক্ষণ দোষ স্পর্শে। পাপে মন কলুষিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই পাপের প্রলোভন হইতে সুদূরে পলায়ন করাই উচিত এবং হিন্দুমতে বিবাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়াই বালিকাদিগের সৎচরিত্রবতী হইবার প্রকৃষ্ট উপায়। বালিকারা স্বামীকরে সমর্পিত হইবার পর অন্তঃপুরমধ্যে স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট প্রচলন হইলেও ক্ষতি নাই। বাহিরে শত শত সৎশিক্ষা পাইলেও আজিকের সভ্যতার দিনে নিষ্কলঙ্ক থাকা মহা দায়। বালকবালিকাদিগের পাঠার্থ সদ্‌গ্রন্থ নির্ব্বাচিত হইলেও তাহারা অন্যান্য নানাবিধ কল্পনাউত্তেজক গ্রন্থ পাঠ করিবার সুযোগ পায়। এইরূপ সুযোগ বন্ধকরা আজিকের উনবিংশ শতাব্দীর সংবাদপত্র ও নাটকনভেল ছড়াছড়ির দিনে অভিভাবকদিগের একরূপ অসাধ্য। অতএব বালকদিগের পক্ষে যাহাহউক, বালিকাদিগের পক্ষে এক বিবাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়াই প্রকৃত সৎশিক্ষা, এবং হিন্দুমতে বিবাহপ্রণালী সম্পূর্ণ মানব ধর্ম্মানুযায়ী।

ইউরোপীয় সংস্কার প্রাপ্ত অনেকে বলেন ভারতবর্ষীয়বালিকাগণ অল্প-

বয়সে বিবাহসংস্কারে আবদ্ধ হওয়ায় তাহাদের স্কন্ধে গুরুভার অর্পিত হয়, সুতরাং তাহারা বাল্য-সুলভ ক্রিড়া কৌতুক প্রভৃতি সম্ভোগে অতি স্বরায় বঞ্চিত হয় ; কিন্তু ইংরেজ বালিকাগণ কেমন সুখে মন খুলিয়া বহুদিনপর্য্যন্ত বাল্যক্রীড়া সম্ভোগ করে। এই সকল আপত্তির উত্তর দেওয়া বৃথা। এখনকার পাশ্চাত্য শিক্ষাদোষে আমাদিগের চক্ষু একবারেই অন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেইজন্যই কথায় কথায় ইউরোপীয় আচরণ অপরূপ পদার্থ বলিয়া আমাদিগের ধারণা হইতেছে। মনুষ্য অস্থির জীব. তাহাদের সুখের একটা চরমসীমা নির্দ্দিষ্ট নাই। যাহা নূতন দেখে তাহাই ভাল মনে করে কিন্তু দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া কোন জিনিষ নূতন দেখিবামাত্র তদনুকরণে ধাবিত হওয়া পরিণামে বিশেষ অসুবিধাজনক। ভালই হউক, আর মন্দই হউক, আমাদিগের বহুকালের প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি আমাদিগের অস্থিমজ্জায় এরূপ বসিয়াছে, যে সামাজিক রীত্যানুযায়ী চলিলে আমাদিগের কোনই কষ্ট বোধ হয় না। বরঞ্চ তদ্বিপরীত আচরণ অভ্যস্ত হইতে আমাদিগকে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হয়। মনুষ্যেরা আপন আপন সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করে সুখবৃদ্ধির জন্য। যদি বর্ত্তমান অবস্থায় কোন অসুখ নাই, তখন সে অবস্থা পরিবর্ত্তনের কোন কারণ দেখা যায় না। কোন এক ইউরোপীয়ভ্রমণকারী তিনমাস কাল ভারতভ্রমণ করিয়া আমাদিগের অন্তঃপুরনিবদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা দেখিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, যে ভারতললনাগণ পিঞ্জরের পাখির ন্যায় স্বাধীনতা হারাইয়া দিবারাত্র অশ্রুজল ত্যাগ করিতেছে। এবং বোধ হয় অল্পদিন মধ্যেই ভারতললনাগণ স্বাস্থ্যসুখে বঞ্চিত হইয়া একবারেই ধ্বংসমুখে পতিত হইবে। কথাগুলি কি ঠিক ? আমাদিগের দুএকজন বেলাতফেরত বাবু তাঁহাদিগের স্ত্রীগণকে বিবি সাজাইতে গিয়া নানা অনুরোধ উপরোধ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমাদিগের অন্তঃপুরনিবদ্ধা সতীললনাগণ বরঞ্চ শির কাটিয়া দিতে পারে, তত্রাচ পরপুরুষের দিকে মুখ তুলিয়া তাকাইতে পারে না। এটী কি স্বামীর তাড়নায় না শাশুড়ীর শাসনে হয় ? আমাদিগের বালিকারা বিবাহের পর আপনা হইতেই ঘোমটা দিতে শিখে। অবশ্য এবম্বিধ আচরণ অভ্যস্ত হইবার পূর্ব্বে শিক্ষা ও শাসন প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু পুরুষানুক্রমে এই সকল আচরণ এখন এত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, যে

এই সকল রীতিনীতির বিপরীত আচরণ করিতে গেলেই আমাদিগের ললনা-গণের যথেষ্ট মনোকষ্ট উপস্থিত হয়। তাহারা যে সুখ চায় না, ভালবাসে না, সে সুখ প্রদান করিতে আমরা এত ব্যস্ত কেন? এখনকার পরোপকারী লোকেরা বলেন তোমার ঘরে ছারপোকা আছে, অতএব তোমার ঘরে আগুণ ধরাইয়া দি"। আমাদিগের স্মরণ হইতেছে, বঙ্গবাসী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতার কোন "বিবাহ-বিচার" সভায় গত বৎসর এইরূপ ধরণের কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া-ছিলেন। কথাগুলি খুব সারগর্ভ। উহা ভাবিয়া দেখিবার জিনিষ বটে। মুসলমানগণ যেমন ব্রাহ্মণসন্তানকে জোর করিয়া কলমা পড়াইত, আমরাও আমাদিগের স্ত্রীগণকে সেইরূপ জোর করিয়া কলমা পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছি। চীনদেশে সম্রাট চিন্‌ভ্যাং যে সময় সিংহাসন আরো-হন করেন, সেই সময় উৎসব উপলক্ষে চীন কারাগারে নিক্ষিপ্ত সমস্ত কয়েদীগণকে একদম খালাস দেন। তন্মধ্যে একজন ৮০ বৎসের বৃদ্ধ কয়েদী বলিল—হুজুর আমার বিশ বৎসর বয়সের সময় আমি কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত হইয়া এই ৬০ বৎসর কাল তথায় যাপন করিয়াছি। আপনি আমাকে যে স্বাধীনতা দিয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া পুনর্ব্বার আমাকে সেই গৃহে নিক্ষেপ করুন। আমার স্বাধীনতা ও সূর্য্যের আলোক বিষম কষ্টকর বোধ হইতেছে। ইউরোপদেশে বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া যেরূপ ভীতিব্যঞ্জক, আমাদিগের দেশে সেরূপ নহে। আমাদিগের সামাজিক রীতিনীতি আর এক ধরণের। ইউরোপীয়বালিকা-গণ বিবাহের পরে স্বামীর সহিত একাকী সুদূর প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হইয়া সন্তান প্রসব করিয়া বিবাহের দুঃসহ কষ্ট ভোগ করেন। কারণ ইউ-রোপীয়দিগের সংসার এক স্বামী ও স্ত্রী লইয়া গঠিত। আমাদিগের দেশের ছোট ছোট বধুরা শ্বশুরবাড়ী গিয়া বাপের বাড়ী অপেক্ষাও স্নেহ ও ভালবাসা পায়। সংসারের জ্বালা কাহাকে বলে তাহারা তাহা প্রথম প্রথম কিছুই টের পায় না। বরঞ্চ সংসারের দুর্ব্বহ ভার বহন করিতে অল্প অল্প অভ্যস্ত হয়। সুতরাং ভবিষ্যতে একাকী সংসারভার ঘাড়ে লইতেও আর তত কষ্ট বোধ করে না। বধুকুল শ্বশুরবাড়ী গিয়া শাশুড়ীরূপী স্নেহময়ী মাতা, পিসি মাসী ভ্রাতা ভগিনী সমস্তই প্রাপ্ত হয় এবং মহা আনন্দে দিন যাপন

করে। পিত্রালয় অপেক্ষা শ্বশুরবাড়ী অধিকতর সুখে থাকে, এবং শরীর ও মন অধিকতর ভাল থাকে। আমাদিগের পাঁচজন আত্মীয় লইয়া সংসার। ইউরোপীয় সংসারে এরূপ সুশৃঙ্খলবদ্ধ সামাজিক নিয়ম কোথায়? ইংরেজ বালিকার এক স্বামীস্নেহ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আমাদিগের দেশে বিবাহের পর বালিকাদিগের স্বামীর সহিত বড় একটা সম্পর্কই থাকে না। বালিকারা এক মাতার ক্রোড় হইতে অন্য মাতার ক্রোড়ে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভবিষ্যতের নূতন জীবনের রীতিপদ্ধতিতে ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া থাকে। দুই এক স্থলে শাশুড়ী বা স্বামীর হাতে নূতন বধু নির্যাতন সহ্য করে এরূপ দেখা যায়। কিন্তু এরূপ ঘটনা দুই একটী মাত্র। যে সকল পরিবারমধ্যে সৎশিক্ষার অভাব সেই সকল পরিবারমধ্যেই এইরূপ ঘটনা হয়। কিন্তু দুই একজন মাতাও আপন সন্তানকে নির্যাতন করে। অতএব এক মাতা কু বলিয়া সকল মাতা কু হইতে পারে না। দুই একস্থলে নির্দ্দয় স্বামী বালিকাস্ত্রীর উপর পশুবৎ আচরণ করে। কিন্তু দুষ্টের হাত হইতে নিষ্কৃতি কোথায়? অধিক বয়স্কা স্ত্রীগণ কি স্বামীর হাতে নিষ্পীড়িত হয় না? এই সকল পশুবৎ আচরণ ভদ্রসংসারে নাই বলিলেই হয়। সমাজে বহুলপরিমাণে সৎশিক্ষার বিস্তার হইলেই এই সকল দোষ কমিয়া যাইবে। আর তাহা না হইলে বাল্য-বিবাহ উঠাইয়া দিলেও সেই নির্যাতন বর্ত্তমান থাকিবে। ইংলণ্ডে অনেক স্ত্রীগণ স্বামীর হাতে পশুর ন্যায় প্রহারিত হয় এবং স্ত্রীপুরুষে ফৌজদারী মোকদ্দমা লাগিয়াই আছে। *

আমাদিগের দেশে বাল্য-বিবাহ এরূপ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, বালিকারা কিঞ্চিৎ অধিক বয়স পর্য্যন্ত পিত্রালয়ে অবিবাহিতা অবস্থায় বাস করিলে তাহাদিগের মহা ভাবনা উপস্থিত হয়। কোন এক চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বিবাহিতা বালিকা তাহার একাদশবর্ষীয়া ভগিনীর বিবাহের জন্য মহা উৎকণ্ঠিতা হইয়াছে, এরূপ ঘটনা সচরাচর দেখা যায়।

বাল্য-বিবাহবিরোধীদিগের প্রধান আপত্তি এই যে বালিকা বয়সে বিবাহিত হওয়াতে মনোমত স্বামী নির্ব্বাচিত হয় না, এজন্য হিন্দুসংসারে প্রকৃত দাম্পত্য-সুখ বিরাজ করে না। যে সকল বাবুরা ইউরোপীয় সভ্যতার বাহ্যিক আড়ম্বরে বিমোহিত হইয়াছেন, তাঁহারাই এই সকল কথা

* John Bull and his Is land by Max O'Rell.

বলেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইউরোপীয় সভ্যতা কৃত্রিম। নচেৎ দুগ্ধপোষ্য বালক মাতৃস্তন্য পান করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে কেন? হিন্দুসংসারে যেরূপ পবিত্র দাম্পত্যসুখ দেখা যায়, এরূপ আর কোন্ জাতীয় সংসারে আছে? এই হিন্দুসংসারে বালিকাবয়সে পরিণীতা হইয়াও সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি সতীত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের বালিকারা অল্পবয়সে বিবাহিতা হইয়া কিশোর বয়স হইতেই এক স্বামীকেই ভালবাসিতে শিখে। উপযুক্ত বয়স হইয়া মনে প্রণয়ের প্রথম অঙ্কুর হইতেই এক স্বামী তাহাদিগের হৃদয় অধিকার করে। যখন নবযৌবন সঞ্চারিত হইয়া বালিকাগণের মন, প্রণয়অন্বেষণে ধাবিত হয়, তখন পূর্ব্ব হইতেই সম্মুখে প্রণয়ের আধার বর্ত্তমান থাকায় তাহাদিগের মন আর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে পারে না। তাহারা সমস্ত মন ও প্রাণ সেই একই আধারে ঢালিয়া দেয়। আগে যাহাকে ভালবাসিতে শিক্ষাকরা যায়, তাহাকে জন্মেও ভুলা যায় না। প্রকৃতির নিয়ম এই যে, কাঁচা বাঁশ যে দিকে ঘুরাও সেই দিকেই বাঁকা হয়। অল্পবয়সে যে সংস্কার বিধিবদ্ধ হয়, তাহা মনমধ্যে পাষাণ অঙ্কিত রেখার ন্যায় হইয়া উঠে। সুতরাং আমাদিগের ললনাগণের স্বামীর প্রতি ভালবাসা ও স্নেহ লোকদেখান না হইয়া আন্তরিক হইয়া উঠে। স্বামীর জীবনান্ত হইলেও স্ত্রী সে মমতা ভুলিতে পারে না। এই আশ্চর্য্য প্রেমের প্রতিমূর্ত্তীস্বরূপা মহিলাগণই এককালে স্বামীবিচ্ছেদ যাতনা সহ্য করিতে অপারক হইয়া স্বামীর সহিত জলন্ত চিতায় ঝম্পপ্রদান করিত!! এই সহমরণ গমন কি সমাজশাসনে হইত? কখনই না। রাজপুতদিগের ইতিহাসে সতীত্বরক্ষার নিমিত্ত রাজপুতরমণীগণের জলন্তচিতায় আত্ম সমর্পণের বিষয় পাঠ করিয়া পাঠকদিগের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হয়? বাল্যবিবাহ লোপ হইলে কি এই সকল অকৃত্রিম প্রেমকাহিনী আর শুনা যাইবে? মনুষ্য যে অধিক বয়সে বিবাহ করে কেবল পশুভাবে চালিত হইয়াই করে। সে প্রণয় ক্ষণভঙ্গুর। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিই সে প্রেমের সাধনা। সংসারে ভালবাসা কিসে জন্মায়? ভালবাসা কি? বহুকাল একত্র অবস্থিতিবশতঃ পরস্পরের মন পরস্পরে আকর্ষিত হওয়াই ভালবাসা। এবং কিশোর বয়স হইতে যে ভালবাসা বর্দ্ধন হইতে থাকে তাহাই প্রকৃত প্রণয়।

বালিকারা ইচ্ছামত স্বামী নির্ব্বাচন করিতে পায় না। তাহাতে তাহাদের অসুখ নাই। বরঞ্চ উপকার আছে। মনুষ্যের অতি আদিম অবস্থা হইতে এ পর্য্যন্ত সংসারের যত গুরুভার তাহা পুরুষেরাই বহন করিয়া আসিতেছে। স্ত্রীগণ চিরকালই স্বামীরদ্বারা প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। মনুষ্যের আদিম অসভ্যাবস্থাতেও স্ত্রীগণ বৃক্ষতলে বসিয়া থাকিত এবং পুরুষগণ শিকারে বহির্গত হইত। আফ্রিকা অষ্ট্রেলিয়া নিউগিনি প্রভৃতি অসভ্যদেশীয়দিগের মধ্যেও পুরুষগণই সংসারের ভার বহন করে। সকল দেশে আজিও এইরূপ নিয়ম বর্ত্তমান। কেবল ব্রহ্মদেশে বিপরীত নিয়ম শুনা যায়। সেখানে নাকি স্ত্রীগণই পুরুষদিগকে প্রতিপালন করে। মোটের উপর এই বলা যায়, স্ত্রীগণ চিরকালই পুরুষের অধীন হইয়া আসিতেছে। তাহারা কখনও স্বাধীন হয় নাই, হইতেও পারিবে না। মিল সাহেব তাঁহার পুস্তকে (Subjugation of women) মতপ্রকাশ করেন যে, স্বার্থপর মনুষ্য স্ত্রীগণের স্বাধীনতা লোপ করিয়াছে। কিন্তু একথা কতদূর সঙ্গত তাহা বলা যায় না। তর্ক ও যুক্তি সব দিকেই চলে। এজন্য বড় বড় শিক্ষিত লোকে যখন যেদিকে টানিয়া বলেন, লোকের মন স্বভাবতই সেই দিকে ধাবিত হয়। স্ত্রী ও পুরুষ প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, স্ত্রীপ্রকৃতি স্বভাবতই পুরুষ অপেক্ষা কোমল উপাদানে গঠিত। সুতরাং স্ত্রীগণকে পুরুষের বাধ্য হইয়া থাকিতেই হইবে। স্ত্রীকে স্বাধীনতা দিলেও তাহারা পুরুষের সাহায্য ব্যতীত সংসারের গুরুতর কার্য্য সকল চালাইতে অসমর্থ। স্ত্রীগণকে অতি সামান্য বিষয়েও পুরুষের মুখাপেক্ষা করিতে হইবে। বিধাতা এমনই ধরণে স্ত্রীজাতিকে সৃষ্ট করিয়াছেন যে, সামান্য শারীরিকবৃত্তি বিশেষ পরিচালনা জন্যও স্ত্রীজাতিকে পুরুষের ইচ্ছার দাস হইয়া থাকিতে হইবে। স্ত্রী ইচ্ছা করিলে পুরুষের উপর বলপ্রয়োগ করিতে পারে না। পুরুষ ইচ্ছার দাস হইলে স্ত্রীর অনিচ্ছায় স্ত্রীর উপর বলপ্রয়োগ করিতে পারে। এইজন্যই স্ত্রীপুরুষে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বর্ত্তমান স্বত্বেও ব্যবস্থাপ্রণয়নকারীরা স্ত্রীস্বত্ব রক্ষার জন্য পুরুষের বিপক্ষে কঠিন ব্যবস্থার বিধান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শুধু মনুষ্য বলিয়া নহে, ইতর জন্তুমধ্যেও পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীগণ দুর্ব্বল প্রকৃতি এবং স্ত্রীগণ পুরুষের বশ হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতির অস্থিমজ্জা প্রকৃতি

কোমল উপাদানে গঠিত। উহাদিগের মস্তিষ্কও পুরুষের মস্তিষ্ক অপেক্ষা ক্ষুদ্র, সুতরাং মানসিক শক্তিও অল্প। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, কার্থেজ ও রাজপুত রমণীগণ অসিহস্তে পুরুষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। এখনও অনেক দেশের রমণীগণ ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধে গমন করে। কিন্তু যে দেশের রমণীগণ এইরূপ বল ও সাহসসম্পন্না, সে দেশের পুরুষগণ তদপেক্ষাও বলবান্ ও সাহসী, ইহাতে কেবল এইমাত্রেই সূচিত হয়। সে সকল দেশেও রমণীগণ সাংসারিক কাযকর্ম্মে পুরুষের বাধ্য হইয়া চলেন। স্ত্রী ও পুরুষগণকে সমান-ভাবে শিক্ষা দিতে যাওয়াও অনিষ্টকর। শিক্ষাবিষয়ে সমান অধিকার পাইলেও স্ত্রীগণ্ কখনই পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারিবে না। প্রকৃতির বিপরীত কায করা মনুষ্যের অসাধ্য। তবে ২।৪ জন স্ত্রীলোক যেমন লীলাবতী প্রভৃতি প্রগাঢ় অঙ্কশাস্ত্রপারদর্শী হইয়াছেন বলিয়া সকলে হইতে পারে না। ইংলণ্ড ও আমেরিকার শিক্ষা বিষয়ে স্ত্রী ও পুরুষ সম্যক্ অধি-কার পাইলেও কয়জন স্ত্রীলোক পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারিয়াছেন? বিশেষতঃ স্ত্রীকে পুরুষের ন্যায় সমান শিক্ষা ও অধিকার দিতে গেলে স্ত্রীগণ তাহাদিগের স্বাভাবিক স্ত্রীপ্রকৃতি হারাইয়া পুরুষভাব ধারণ করিবে। আমাদিগের বঙ্গনারীতে যেরূপ স্ত্রীস্বভাব দেখা যায়, ইংলণ্ডীয়রমণীগণ সর্ব্বদা পুরুষের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে সেরূপ কোমল ভাব প্রায় দেখা যায় না। স্ত্রীর কায সন্তানধারণ ও পালন করা। অতএব সুমাতা হইতে শিক্ষা করাই প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা। যখন পুরুষগণই সংসারের ভারবহন করিতেছেন, তখন স্ত্রীগণ আপন ইচ্ছামত স্বামীনির্ব্বাচনে অধি-কারী হইতে পারেন না। অন্ততঃ উক্ত নির্ব্বাচনে পিতামাতার অধিকতর অধিকার থাকা কর্ত্তব্য। মনুষ্যের বর্ত্তমান অবস্থায় স্বামী উপায়ক্ষম না হইলে স্ত্রীগণের এক পাও চলিবার উপায় নাই। সুতরাং বিদ্বান্ ও উপায়ক্ষম পাত্রে অর্পিত হওয়া যদি বালিকাদিগের কর্ত্তব্য হয়, তবে বর-নির্ব্বাচন বিষয়ে অভিভাবকের অধিকার থাকাই উচিত। বালিকাগণের হাতে স্বামীনির্ব্বাচনভার অর্পিত হইলে তাহারা প্রকৃতির নিয়মানুসারে রূপের পক্ষপাতীই হইবে, গুণের পক্ষপাতী হইবে না। যার সঙ্গে মনের মিলন হইবে, আপনার ভবিষ্যত না ভাবিয়া তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিবে। বিবাহ বন্ধন যখন যাবজ্জীবনের সম্পর্ক; যখন সুপাত্রে ন্যস্ত

হওয়াই বালিকাদিগের সুখে জীবনকাটাইবার একমাত্র পথ, তখন উক্ত নির্ব্বাচন বিষয়ে বহুদর্শী বিজ্ঞব্যক্তিদিগেরই পরামর্শানুসারে চলা উচিত। স্ত্রীলোক পুরুষাপেক্ষা অল্পবয়সে যুবতী হইলেও, অনেক বয়স পর্য্যন্ত তাহারা হিতাহিত বিবেচনা শূন্য থাকে। এইজন্যই সামান্য প্রলোভনে স্ত্রীগণ কুলের বাহির হইয়া চিরকাল মনস্তাপ ভোগ করে। তাহাদের পরিণাম চিন্তা অত্যন্ত কম। এই জন্যই মনু ব্যাবস্থা দিয়াছেন, যে স্ত্রীগণ বালিকা বয়সে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের বশ হইয়া থাকিবে। কথনও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবেনা। বাস্তবিক স্ত্রীগণকে পুরুষেরা সর্ব্বদা সকল বিষয়ে রক্ষা না করিলে স্ত্রীলোক দিগের আর উপায়ান্তর নাই। ইউরোপ দেশে স্বাধীন বিবাহ বর্ত্তমান থাকাতে অনেক রমণী বাহ্যিক রূপে বিমোহিত ও অপাত্রে ন্যস্ত হইয়া পরিণামে বিষম পরিতাপ ভোগ করিয়াছেন। অস্মদ্দেশেও কন্যাগণ সময় সময় অপাত্রে ন্যস্ত হয় স্বীকার করি কিন্তু বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দিলেও সে দোষ বৃদ্ধি বই কম হইবেনা। মনুষ্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সংসারকে একবারে সুখের আগারে পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেনা। যে দিকেই যাও কু ও সু দুইই থাকিবে। তবে যে পথে সুর ভাগ বেশী, সেই পথ অবলম্বন করাই উচিত। যেমন মূর্খ পিতা সপ্তম বর্ষের কন্যাকে অশীতিবর্ষের বৃদ্ধার করে সমর্পণ করিয়া তাহার একবারে মাথা খাইয়া দেন, সেইরূপ অনেক মূঢ় জনক, স্বীয় পুত্রকে লেখা পড়া না শিখাইয়া অথবা চুরি বিদ্যা শিখাইয়া ছেলেটীর একবারে পরকাল নষ্ট করিয়া দেন। এই সকল সমাজ কলঙ্ক মনুষ্য সমাজ হইতে একবারে দূরীভূত করা সমাজের অসাধ্য। তবে বহুল পরিমাণে সুশিক্ষার বিস্তার হইলে এই সকল দোষ ক্রমেই হ্রাস হইয়া যাইবে। আমরা কেবল বালিকাদিগের সম্বন্ধেই অনেক কথা বলিলাম। বালকদিগের সম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই, বলিবার তত প্রয়োজনও নাই। যেহেতু আমাদিগের দেশে বালকদিগের প্রায় বিবাহের বয়স উপস্থিত হইলেই বিবাহ হইয়া থাকে। সে সময় তাহারা প্রায়ই স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়। বিশেষতঃ আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় পুরুষের বিবাহ কিঞ্চিৎ অধিক বয়সে হওয়াই উচিৎ। যে হেতু সংসারের সমস্ত গুরুভার পুরুষকেই বহন করিতে হয়। অতএব পুরুষদিগের বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ

হইবার পূর্ব্বে কিছু সময় উক্ত বিষয় চিন্তা করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। নিতান্ত অল্প বয়সে পুরুষের বিবাহ একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে, এজন্য উক্ত বিষয় আর বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন।

বাল্য বিবাহের দোষ গুণ লইয়া আর অধিক আলোচনা করিয়া আমরা পাঠকগণের বিরক্তি উৎপাদন করিব না। পরবারে বিবাহসম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে।

ক্রমশঃ—

বিবাহ-বিচার।

হিন্দুশাস্ত্রমতে।

ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, সুবিধা ও আবশ্যকতার অনুরোধেই সমাজের বিবাহবন্ধন ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। পক্ষান্তরে দেশ, কাল ও পাত্রগত তারতম্যানুসারে নিয়ম ও চির প্রচলিত আচারের বিভিন্নতাও সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। মনে কর এক ভারতবর্ষে যে কত প্রকার জাতি বাস করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আকার-গত বলাবল ও মানসিক বলাবল বিশেষরূপে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অবলোকন করিলে একজাতির নিয়ম অন্য জাতিতে যে পরিণত হইতে পারেনা, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হয়। যে সমস্ত লোক পার্ব্বত্য অঞ্চলে বাস করে—যাহাদের আহারীয় দ্রব্য সবিশেষ পুষ্টিদায়ক,—শীতের দারুণ হিমানী, গ্রীষ্মের ভয়াবহ সূর্য্যকিরণ যাহাদের কঠোর দেহের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর, তাহাদিগের সহিত যাহারা মৎস্যসেবী এবং সমুদ্রের নিতান্ত নিকটবর্ত্তী—যাহাদের আহার্য্য সামান্য তণ্ডুলমাত্র, তাহাদের সহিত তুলনা করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? এই উভয়ের প্রভেদ এত অধিক যে, একের নিয়ম কোনও রূপে অন্যের উপর বর্ত্তিতে পারে না। আবার এক এক জাতির মধ্যে অবস্থাভেদে অশন, শয়ন, বিহার, অবস্থান, পরিচ্ছদ, প্রভৃতির এরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয়, যে, শুদ্ধ সেই জাতির মধ্যে বর্ত্তমান কালে এক নিয়মও প্রবর্ত্তিত হইতে পারেনা। এক মাত্র অধুনাতন বাঙ্গালীদিগের সমাজ অবলোকন করুন। কোনও সম্প্রদায় চির প্রচলিত আর্য্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিদিন প্রাতঃ ও মধ্যাহ্নকৃত্য

সমাগম করিয়া বেলা ২ কি ২॥০ টার সময় মধ্যাহ্ন [illegible] ও রজনীতে দুই প্রহরের সময় ভোজন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে [illegible]শী, সংক্রান্তি, পৌর্ণমাসী ও অমাবস্যা প্রভৃতি পর্ব্ব সমূহে অবলীলাক্রমে উপবাস দিতেছেন। উদ্ভিজ্জই ইহাদের প্রধান অবলম্বন। মৎস্যমাংস বা মদ্য ইহাদের গৃহমধ্যেও প্রবেশ করে নাই। সুতরাং ইহাদের রক্ত ও শুক্র প্রভৃতি ধাতুও তদনুসারে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রভৃতির ভাব ইহাদের পার্শ্ববর্ত্তী সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এদিকে কৃষিজীবিগণ দিবারাত্র পরিশ্রমে ব্যাপৃত আছে। যেমন পরিশ্রম, তেমনি ক্ষুধা, সেইরূপ পরিপাক ও তদনুসারে শরীরের ও মনের বলাধান হইতেছে। শীত, গ্রীষ্মবর্ষা প্রভৃতি ঋতুগণ পর্য্যায়ক্রমে উলঙ্গ পৃষ্ঠের উপর দিয়া সদর্পে প্রবাহিত হইতেছে—তাহাতে অনুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নাই। শাল নাই, বালাপোষ নাই, আলোয়ান নাই কিছুই নাই, কেবল তাহাদের মধ্যে সৌভাগ্যশালীগণের একমাত্র মোটা চাদর আছে, অধিকাংশের কোঁচার খুট্ ভরসা। তাহাদের আহার্য্য মোটা চাউল, মণ্ড, গোটা কলাই সিদ্ধ, শাক সবজী, ভিজে চাউল ইত্যাদি এবং তাহাও সভ্যগণের অপেক্ষা ৮ গুণ অধিক। মনে করুন ইহাদের দেহ, বল, ও ওজস্বিতা অবলোকন করিয়া দেশ কাল ও পাত্র অনুসারে যে ব্যবস্থা ব্যবস্থাপিত হইতে পারে, যাঁহারা নিতান্ত সুক্ষ্মতণ্ডুলভোজী, অসূর্য্যম্পশ্য, শীত বাত বর্ষা ও গ্রীষ্মে যাঁহাদের দেহ ক্ষণমাত্রও স্থাপিত হয় নাই, যাঁহারা ঋতুপরিবর্ত্তনের সহিত আপনাদের আহার, বিহার, শয়ন ও গমনের পরিবর্ত্তন করিতেছেন; অধিক কি পরমপাতা পরমেশ্বরের প্রাকৃতিক কার্য্যের সহিত যাঁহাদের সম্পূর্ণ বিরোধ, তাঁহাদের প্রতি সেই ব্যবস্থা কিরূপে চলিতে পারে, আধুনিক ইংরাজরাজত্বে পরিবারপোষণ, অর্থসঞ্চয় ও জীবনযাত্রানির্ব্বাহ এই তিনটী গুরুতর কার্য্যে লোকগণ এতাদৃশ নিমগ্ন ও তাহার জন্য এতদূর ব্যতিব্যস্ত যে, তাহাদের অনুরোধে সাধারণতঃ তাহাদের সময় নাই, শয়নের বিচার নাই ও অবস্থানের পরিদর্শন নাই। পূর্ব্বে এক হিন্দুজাতি কেবল মাত্র কৃষিকার্য্যেই নিযুক্ত ছিল, তাহাদের আহার, পরিশ্রম, বিহার ও শয়নের সময় একরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল। যাঁহারা জমীদারে কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন- তাঁহাদেরও স্নান, ভোজন, উত্থানও শয়নাদির সময় সাধারণতঃ এক ছিল। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই, সে ভাব নাই, সে নিয়ম নাই। এখন লোক কার্য্যের বশবর্ত্তী, কার্য্য

লোকের বশবর্ত্তী হয়। এখন সময় যে রূপ আজ্ঞা করিবে, কাহার সাধ্য তাহার অন্যথা করে। যখন আবশ্যক তখনিই প্রবৃত্তি, তখনিই ভোজন তখনিই উত্থান—তাহার আর দ্বিরুক্তি নাই। আবশ্যক যখনিই আহ্বান করিতেছে তখনই পদবিক্ষেপ। সামান্য দুই একটী উদাহরণ দিলেই স্পষ্ট-রূপে প্রতীতি হয় যে আবশ্যকতা এখন বলবতী। এই মহানগরী কলি-কাতায় অনেক গুলি কল আছে, রাত্রি ৪ টার সময় কল উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলে অমনি কলকর্ম্মচারীকুলের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। রাত্রিতেই স্নান-রাত্রিতেই ভোজন কার্য্য সম্পন্ন হইল। সতেজে কলের অভিমুখে যাত্রা, সেখানে দেড়ামজুরীর লালসায় সন্ধ্যাপর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া রাত্রিকালে পুনর্ভোজন হইল। তাহাদের আর দিবাভোজন, দিবাস্নান, দিবালোক দর্শন বা দিবা বিহার কিছুই নাই। দিবা তাহাদের রজনী এবং রজনী তাহাদের দিবা স্বরূপ। এক সামান্য রাত্রির মধ্যে দিবার কার্য্য ও রজনীর বিশ্রামাদি কার্য্য সমস্তই সম্পন্ন কবিতে হয়। এই সম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ও অন্ত্যজ চণ্ডাল পর্য্যন্তও বর্ত্তমান আছে সুতরাং বর্ণভেদে নিয়মের একতাই কিরূপে সংস্থাপিত হয়।—যাহারা এইরূপ ব্রতে ব্রতী তাহাদের দেহ. বল, তেজ, ধাতু. শুক্র প্রভৃতি ক্রমশঃ স্বতন্ত্রভাব অবলম্বন করিয়াছে তাঁহাদের বংশীয়গণ সমাজের অপর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কেহ প্রভাত ভোজী, কেহ প্রহর ভোজী. কেহ সন্ধ্যাভোজী, কেহ নিরামিষ, কেহ সামিষ, কেহ বা মাংসাসী, কেহ বা মদ্য না হইলে সে দিন আপনাকে অসার ভোজী বলিয়া মনে করেন। কেহ পাদচারী, কেহ ভ্রমণকারী, কেহ বা যানবিহারী। আহার অনুসারে, ভোজনের ব্যবস্থানুসারে, শয়ন, উপ-বেশন—সংসর্গ,—কার্য্য, ও বাধ্যবাধকতা ভেদে বাঙ্গালীদের মধ্যে এত ভেদ হইয়াছে যে ইহার প্রায় ঘরে ঘরে, এখন সাধারণ দেহ বল ও শুক্রাদিগত প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। শুদ্ধ বাঙ্গালি কেন—সমস্ত ভারতবর্ষের দশাই এইরূপ। এইজন্যই বলি—ইহার আর বর্ত্তমান সমাজে একনিয়মতা চলিতে পারে নাই। জগৎ সুবিধা ও আবশ্যকতার দাস—আজ্ নূতন দাস নয় কিন্তু চিরদাস। অতএব আমাদের বর্ত্তমান সমাজও সুবিধা ও আবশ্যকতার অধীন। ইহা ভিন্ন ইহার আর উপায়ান্তর নাই।—অতএব যখন দেশ কাল ও পাত্রভেদে যেরূপ সুবিধা ও আবশ্যকতা প্রাপ্ত হইবে—সেই অনুসারে

অনুবর্ত্তন করাই যুক্তিসিদ্ধ। সুতরাং কোথাও বাল্যবিবাহ, কোথাও যৌবন-বিবাহ, কোথাও বা বরকন্তার অভেদ্য প্রণয়সংস্থাপন, যে ভাবেই যে বিবাহ হউক না কেন, দেশ, কাল, পাত্র ও সুবিধা এবং আবশ্যকতার অধীন হইয়া করিলে কোন রূপেই দোষাবহ হইতে পারে না। ক্রমশঃ—

আয়ুর্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যাহাতে বাতাদির অনুলোম সাধিত হয়, এরূপ কোন কার্য্য করিলে অবশ্যই ফুল পড়িয়া যাইবে। কেননা মলমূত্রাদি নানাপ্রকার অন্তর্মুখ এবং বহির্মুখ পদার্থ সকল বায়ুদ্বারা ঐ ফুলের সহিত সংলগ্ন থাকে, তাহাতেই ফুল পড়িতে কাহারো কাহারো কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়।

এই সকল কার্য্য দ্বারাই হউক অথবা ইহার পূর্ব্বেই হউক, ফুল পড়িয়া গেলে প্রয়োজনমত তৈল জলাদিদ্বারা একজনে প্রসূতিকে সুস্থ করিতে থাকিবে এবং অন্যান্য সকলে সদ্যপ্রসূত সন্তানের যথোচিত শুশ্রূষা ও তাহার জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করিবে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই যদি কাঁদিয়া উঠে, তাহা হইলে শীতল বা ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা তাহার গাত্র বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিবে এবং কাশ-নির্ম্মিত রজ্জু-বদ্ধ এক খান কুলা দ্বারা কিছু কাল বাতাস করিবে। এইরূপ করিলে গর্ভ নিষ্ক্রামণজনিত ক্লেশ দূর হয় এবং নবপ্রসূত শিশু অচিরে প্রাণলাভ করে। সন্তান প্রকৃতিস্থ হইলে তাহাকে স্নান করাইবে এবং মলদ্বার ধৌত করিয়া দিবে। পরে একজন সুশিক্ষিতা স্ত্রী আপনার নখাদি উত্তমরূপ ছেদন করিয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলীর অগ্রভাগ তুলাদ্বারা বেশ করিয়া জড়াইবে এবং তদ্দ্বারা ঐ সদ্যজাত শিশুর কণ্ঠ, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও তালু মার্জ্জন করিয়া দিবে। পরে সৈন্ধবযুক্ত ঘৃতদ্বারা শিশুকে বমন করাইবে। তাহাতে কোকিলের ন্যায় স্বর ও বাক্‌শক্তি-বৃদ্ধি হয়, নতুবা ঐ বালক তোতলা বা মূক হইতে পারে।

আবার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেও যদি কাঁদিয়া না উঠে এবং একবারে

নিস্পন্দভাবে মৃতবৎ পড়িয়া থাকে, অথচ তাহার বর্ণের ভিন্ন অঙ্গের কিছু-মাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই এরূপ দেখা যায়, তাহাহইলে এরূপ বুঝিতে হইবে যে, ঐ সন্তান গর্ভনিক্রামণজনিত যন্ত্রণায় কাতর হইয়া মূৰ্চ্ছিত হইয়াছে; অথবা তাহার প্রাণ-বায়ু নাভিনাড়ীদ্বারা অমরা মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। একটুসুশ্রূষা করিলেই তাহার প্রাণ আবার প্রত্যাগত হইবে। কিন্তু অধিক বিলম্ব হইলে বা নাড়ী ছেদন করিয়া ফেলিলে আর তাহার বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকে না।

সন্তানের নাভি নাড়ীর যে দিক্ ফুলসংযুক্ত থাকে, সেই দিক্ হইতে অর্থাৎ ফুলের মধ্য হইতে আস্তে আস্তে টিপিতে টিপিতে ক্রমে নাভির দিক্ আসিতে হইবে। এরূপ করিলে ঐ ফুল হইতে ক্রমশঃ রক্ত সঞ্চালিত হইয়া সন্তানের শরীরে প্রবেশ করিবে এবং তাহার প্রাণও প্রত্যাগত হইবে। ইহাতে ঐ সন্তান কাঁদিয়া না উঠিলে অবিলম্বে একটী মৃৎপাত্রের উপর ঐ ফুল সংস্থাপন করিবে এবং তাহা কিঞ্চিৎ শূন্য করিয়া নীচে অগ্নি জ্বালিয়া দিবে। পাত্রস্থিত ফুল ঈষৎ নাড়াচাড়া করিয়া ভাজিয়া তুলিবে। তাহা হইলে অচিরে সদ্যজাত শিশু কাঁদিয়া উঠিবে এবং পরে উল্লিখিত কার্য্যাদির অনুষ্ঠানদ্বারা সন্তানের সুশ্রূষা করিতে থাকিবে।

এই কথা শুনিয়া চরাচর-প্রসবিনী জগৎপালিনী এবং অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গল-বিধায়িনী মহামায়া কহিলেন, হে আদি পুরুষ! কি জন্ম জীবগণ ভূতলে প্রবিষ্ট হইয়াই অমনি কাঁদিয়া উঠে? আর কেনই বা সেই ক্রন্দনকে সকলে মঙ্গলজনক বলিয়া মনে করে?

তখন নিখিলজগতের আধারভূত অচিন্ত্যশক্তি, মহাদেব কহিলেন প্রিয়ে! সংসারে সকলেই আপন আপন কর্ম্মের ফলভোগ করে। সেই কর্ম্ম-বশে জীবগণ পাশবদ্ধ বানরের ন্যায় পুনঃ পুনঃ সংসার সাগরে সন্তরণ করিয়া বেড়ায়। যে প্রকার নিশীথোগে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলে দিবাভাগে চেতনাবস্থায়ও তাহা বেশ মনে থাকে, কিন্তু আবার নিদ্রাকর্ষণ হইলে তাহার বিন্দুমাত্রও স্মরণ হয় না, সেইরূপ চৈতন্যস্বরূপ জীবগণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত চেতন থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার সাক্ষাৎকার লাভে বঞ্চিত না হয়, ততক্ষণ তাহাদের সমস্ত কথাই মনে থাকে, ততক্ষণ তাহাদের দুরতিক্রম্য জঠরযন্ত্রণার কথা অনন্ত সংসারের অনন্ত যন্ত্রণার কথা একে একে হৃদয়ক্ষেত্রে উদয় হইয়া

অনুতাপানলে তাহাদিগকে সর্ব্বদা দগ্ধীভূত করিতে থাকে। কিন্তু যেই পূর্ব্ব [illegible] কর্ম্মবশে আবার জীব দেহ ধারণ করিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হয়, অমনি সমুদায় তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া ঘোর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তখন আবার আপনার অভিরুচি মত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; আবার পর জন্মে সেই কর্ম্মের ফলভোগ করে। ইত্যাকারে জীবগণ নিয়ত সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিতেছে। প্রিয়তমে! তোমাকে আর নূতন করিয়া বেশী কি বলিব, প্রথমতঃ সামান্য জরায়ু মধ্যে জীবদিগের সামান্য দেহ অবস্থিতি করে, পরে কালসহকারে সেই দেহ বর্দ্ধিত হইলে যখন সেই অপ্রশস্ত স্থানে থাকিতে না পারিয়া ঘোর ফাঁফরে নিয়ত ছট্ ফট্ করিতে থাকে, আর কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব স্তুতি করিয়া আমার নিকট স্থান প্রার্থনা করে, আমি তখন হৃষ্টচিত্তে নানাবিধ উপদেশ দ্বারা তাহাদিগকে নির্গমনের পথ দেখাইয়া দেই। তাহারাও আর নীতিবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সংসারে জন্মগ্রহণ করে। জন্মগ্রহণ করিয়াই "ওঁ" শব্দে আমাকে স্তব করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু তুমিই তখন মহামায়া-রূপে সংসারে বিরাজমান থাকিয়া ঘোরমোহপাশে জীবকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেল, তখন তাহাদের জিহ্বা জড়তা প্রাপ্ত হয়, আর কিছুই বলিতে পারে না। সুতরাং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কাঁদিয়া ফেলে; আর অর্দ্ধো-চ্চারিত "ওঁ" শব্দ "ওঁয়া" বা "ওঁঙা" হইয়া অনন্ত বায়ুরাশির মধ্যে ভাসিয়া যায়। তাই বলি প্রিয়ে! একবার মনে করিয়া দেখ, যদি ইহাই না হইবে তবে ম্লেচ্ছ, কিরাত এবং সৌমার প্রভৃতি যে কোন জাতিই কেন না হউক, সকলেরই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে "ওঁ" বা "ওঁঙা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিবে কেন? সকলকেই এই এক শব্দ কে শিখাইয়া দিল? আবার দেখ, সমস্ত জীবন কাল জীবগণ আপনার ইচ্ছানুরূপ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ঘোর মৃত্যু যন্ত্রণায় অধীর হইয়া যখন বারম্বার ছট্ ফট্ করিতে থাকে, যখন কর্ণ থাকিতে কিছুমাত্র শুনিতে পায় না—চক্ষু থাকিতে দেখিতে পায় না—জিহ্বা থাকিতে কিছুই প্রকাশ করিতে পারে না, তখন আবার আমারি কথা মনে পড়ে। সেই সময় আবার "ওঁ" বলিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করে। কিন্তু আর চেষ্টা করিলে কি হইবে? যেই অব্যক্তভাবে প্রথমার্দ্ধ উচ্চারিত হয়, অমনি শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত অপরার্দ্ধ অনন্ত আকাশে মিশিয়া যায়। আর

বলিয়া শেষ করিতে পারে না। এই সম্বন্ধে আর অধিক বলিতে ইচ্ছা করি না। ইহা বলিলে ফুরাইবার নয়। এইক্ষণ সদ্যজাত সন্তানের নাড়ীচ্ছেদনের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর।

যে জনয়িত্রী নাড়ীচ্ছেদন করিবে, তাহাকে অত্যন্ত সাবধান হইতে হইবে। একবারে গোড়া ঘেঁসিয়া বা অধিক লম্বা করিয়া কখনো নাড়ীচ্ছেদন করিবে না। অথবা ঘসিয়া ঘসিয়া বা অসমান করিয়া নাড়ী কাটিলে সন্তানের নানাপ্রকার দুশ্চিকিৎস্য কঠিন পীড়া জন্মে। সেই সকল পীড়ার কথা পরে বিশেষ করিয়া বলা যাইবে। নাড়ীচ্ছেদনের জন্য তীক্ষ্ণ ও উর্দ্ধধার রজত বা লৌহনির্ম্মিত অস্ত্র প্রস্তুত কবিয়া রাখিবে। সাধরণত গরিব লোকেরা বাঁশের নেইল্‌দ্বারা কাটিয়া থাকে। প্রসূত সন্তানের নাভি মূল হইতে ৭।৮ অঙ্গুলী পরিত্যাগ করিয়া যে স্থান কাটিতে হইবে সেই স্থান নির্দ্দেশপূর্ব্বক নিবিষ্টচিত্তে তাহার দুইটী পার্শ্ব ধারণ করিয়া ঝটিতি কাটিয়া ফেলিবে। পরে ঐ ছিন্ন নাড়ীর একদেশে সূত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া কুমারের গ্রীবাতে ঝুলাইয়া দিবে।

নাড়ীচ্ছেদনের পর আপনাপন বেদানুযায়ী কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করিবে এবং তন্ত্রোক্ত মন্ত্রাদিদ্বারা যথারীতি ঘৃত ও মধু সংস্কৃত করিয়া ঐ বালককে লেহন কবিতে দিবে। অনন্তর স্তন্য দায়িনী উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া পূর্ব্বমুখে সুখাসনে উপবেশন কবিবে এবং প্রসূত বালকের মস্তক উত্তর দিকে রাখিয়া তাহার শিয়রে মন্ত্র-সংস্কৃত জলপূর্ণ কুম্ভ স্থাপন করিবে। পরে দক্ষিণ স্তন ধৌত ও মন্ত্রঃপূত করিয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধ নিঃসরণ করিয়া ফেলিবে এবং আস্তে আস্তে বালককে ক্রোড়ে লইয়া স্তন্যপান করাইবে। প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ দুগ্ধ নিঃসারিত করিয়া না ফেলিলে বালকের গলনলীতে অধিক পরিমাণে দুগ্ধ প্রবিষ্ট হওয়ায় ঐ বালক শ্বাস, কাশ ও বমিতে অত্যন্ত পীড়িত হইতে পারে।

বালককে প্রথম স্তন্যপান করাইবার পূর্ব্বে কোন সুযোগ্য ব্রাহ্মণ অথবা ঐ বালকের পিতা নিম্নলিখিত মন্ত্রটী পাঠ করিবেন। সেই সময় স্তন্যদাত্রী দক্ষিণ হস্তদ্বারা দক্ষিণ স্তন স্পর্শ করিয়া থাকিবে।

"ক্ষীরনীরনিধিস্তেহস্তু স্তনয়োঃ ক্ষীরপূরকঃ।
সদৈব সুভগো বালো ভবত্যেব মহাবলঃ॥

পয়োঽমৃতসমং পীত্বা কুমারস্তে শুভাননে।
দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতু দেবাঃ প্রাপ্যামৃতং যথা॥"

উপরি উক্ত রূপে স্তন্যপান করাইলে ঐ শিশুর রক্ষার নিমিত্ত আদানী-কন্দু, খদির, পীলু এবং ফলসা, এই সমুদয়ের যথাপ্রাপ্ত শাখা দ্বারা সূতিকাগারের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া দিবে। ঘরের মধ্যভাগে সর্ব্বত্রই শ্বেত সর্ষপ, মসিনা, এবং চাউলের ক্ষুদ ছড়াইয়া ফেলিবে। দ্বারদেশে একটী মুষল বক্রভাবে স্থাপন করিবে। বচ, কুড়, ক্ষৌমক, হিঙ্গু, শ্বেতসর্ষপ, মসিনা, রশুন, ও চাউলের কুঁড়া এই সকল দ্রব্যকে রক্ষোঘ্ন ঔষধ বলে। এইসমুদায় ঔষধ পুঁটলী বদ্ধ করিয়া সূতিকা ঘরের উত্তর দিকে ঝুলাইয়া রাখিবে। বুদ্ধিমতী মিষ্ট ভাষিণী স্ত্রীলোকগণ সর্ব্বদা সূতিকা ঘরে জাগরিত থাকিবে এবং দুইবেলা কুল প্রথানুসারে মঙ্গলজনক কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করিবে।

ইতি তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

একদা বিশ্বজননী ভবানী জীবনসহচরী জয়া বিজয়া সহিত বিচিত্র কদম্ব কাননে বিচরণ করিতেছিলেন *। ভূলোক দ্যুলোক প্রভৃতি বিশাল

* যে দিকে মহামায়ার আবির্ভাব সেই দিকের জয়ও অবশ্যম্ভাবী, তাই জয়া বিজয়া তাঁহার চির-সহচরী।

প্রাচীন ঋষিগণ বড়ই অলঙ্কার শাস্ত্রের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহাদিগের রচিত নানাবিধ শাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণাদিতে রূপক অলঙ্কারের বড়ই ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল রূপকের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া বর্ত্তমান ম্লেচ্ছ ভাবাপন্ন পণ্ডিতগণ প্রকৃত শাস্ত্রকে সময় সময় একবারে অশাস্ত্ররূপে পরিণত করিতেছেন। ভগবান্ বসিষ্ঠ শ্যামা কবচের ব্যখ্যা করিতে বসিয়া একস্থানে বলিয়াছেন—"কদম্ব-বন-সঞ্চারা কদম্ব-বন-বাসিনী। কদম্ব পুষ্প-সন্তোষা কদম্ব-পুষ্প-মালিনী।" অর্থাৎ নিখিল জগতের আধার যে একমাত্র আকাশ তাহাকে তিনি কদম্ব বৃক্ষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতি রূপিনী মহাদেবী সেই কদম্ব-বনে বিচরণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ নিশাকালে নভোমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলে চতুর্দ্দিগ্ হইতে যখন অসংখ্য অসংখ্য প্রস্ফুটিত কদম্বসমূহ নয়ন-পথে পতিত হয়,

গোলকের কথা পর্য্যালোচনা করিতে করিতে সহসা বিজয়া কহিলেন, মাত! সৃষ্টি সৃষ্টি করিয়া তোমাকেই যে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিতে দেখি। যোগেশ্বর কৈলাশনাথ তো কথনো কিছুতে লিপ্ত হয়েন না! তবে কি তাঁহার অপেক্ষা তোমারই যোগ্যতা অধিক? আর যদি তাহাই হয় তবে কেনই বা তাঁহাকে সকলে পিতা বলিয়া সম্বোধন করে? কোন্ গুনেই বা তিনি জগৎ পিতা নাম ধারণ করিলেন?

এই কথা শুনিয়া পরমেশ্বরী ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! এখনও তোমাদের বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হইতে বিলম্ব আছে, এখনও তোমাদের জ্ঞাননেত্র উন্মিলিত হয় নাই, তাই সেই ত্রিলোক পিতা সৃষ্টিপতিকে বৃথা যোগ্যতা হীন বলিয়া কল্পনা করিতেছ। ফলতঃ সেই অসীম যোগ্যতার সহিত আমার এই সামান্য যোগ্যতার তুলনা করাও এক প্রকার বাতুলতা। সদ্য প্রসূত সন্তান মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই যেমন কিছু বুঝিতে পারেনা এবং কাহাকে চিনিতেও পারেনা, পরে মাতৃ-যত্নে বর্দ্ধিত হইতে হইতে প্রথমে মাতাকেই চিনে এবং অপেক্ষাকৃত জ্ঞান লাভ করিলে শেষে পিতাকেও চিনিতে পারে; অজ্ঞানান্ধ জীবের সম্বন্ধেও এই কথা জানিবে। মাতৃ সেবার অর্থাৎ আমার উপাসনায় আমার অনুগ্রহ-ভাজন হইয়া জ্ঞানের পথ প্রশস্ত করিতে না পারিলে অথবা দিব্য জ্ঞান লাভে বঞ্চিত থাকিলে, কথনও সেই বিশ্ব-নিয়ন্তা পরম পিতাকে কেহ জানিতে পারেনা। সুতরাং তাদৃশ জীবের পক্ষে মোক্ষ লাভও সুদুর্লভ। জগৎ প্রসব সম্বন্ধে আমি

তখন কেইবা এই কথা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে? তখন কোন্ মূঢ়ই বা সেই সৃষ্টিকর্ত্তার অদ্ভুত সৃষ্টি বিষয় ভাবিতে ভাবিতে ভক্তিভাবে বিগলিত না হয়? আবার ব্যাসদেব যে গোপীদিগের বস্ত্র হরণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের কদম্ব বৃক্ষারোহণের কথা লিথিয়াছেন তাহাও এই বৃক্ষ ভিন্ন আর কিছুই নয়। তবে কতগুলি ভক্তি বিচল পাষণ্ড বঞ্চক সম্প্রদায় ইহাকে নিতান্ত জঘন্য আকারে পরিবর্ত্তন করিয়াছে। তাহারা পবিত্র কৃষ্ণ চরিত্রে যে অযথা দোষারোপ করিয়া বেড়ায় তাদৃশ দোষ ঈশ্বরে থাকা অসম্ভব। মহাত্মা ভাস্করাচার্য্য নিজ প্রবর্ত্তিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রথমেই "কদম্ব-প্রসূণবৎ পৃথ্বী" এই কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বোধ হয় কদম্ব পুষ্প ইউরোপে দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই তত্রত্য পণ্ডিতগণ কমলা লেবুর সহিত পৃথিবীর তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কমলা লেবু অপেক্ষা কদম্ব পুষ্পের সহিত পৃথিবীর অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। প্রস্ফুটিত কদম্বের ন্যায় পৃথিবীর ও রেণু আছে। এস্থলে সেই সমুদায় উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

কেবল উপলক্ষ মাত্র। সেই অচিন্ত্য-শক্তি বিশ্বনাথের যে শক্তি হইতে সৃষ্টি সমুদ্ভূত হয়, তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্যান্য অপরিসীম গুণের বিষয় আমারও বচনাতীত, সুতরাং তোমাকেই বা তাহা কি প্রকারে বুঝাইয়া দিব?

বিজয়া। আমিও তো আর কিছু শুনিতে চাইনা। সৃষ্টি প্রকরণের বিষয় বলিলেই আমার বাসনা পূর্ণ হয়।

পার্ব্ব। তবে তাহাই বলিতেছি;—তুমি যাহা কিছু দেখিবে—পার্থিব অপার্থিব যাহা কিছু তোমার নয়ন-পথে পতিত হইবে, প্রকৃতি এবং পুরুষই তদুৎপত্তির একমাত্র কারণ।

বিজয়া। সেই পুরুষ কে? এবং প্রকৃতিই বা কাহাকে বলে?

পার্ব্ব। যিনি অব্যক্ত, অব্যয়, অপর এবং অলিঙ্গ; যিনি শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র এবং আকাশাদি পঞ্চমহাভূতে বিভক্ত হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন; যাঁহার আদিতে কিছুই ছিলনা এবং পরেও কিছু থাকিবে না; তিনিই পুরুষ। যাহা বিশ্ব সৃষ্টির একমাত্র কারণ এবং সত্ব, রজঃ তমো গুণান্বিত, যাহা না হইলে কেবল পুরুষের সাহায্যে এই বিশ্ব-রাজ্যের কিছুই উৎপত্তি হইত না, তাহাকেই প্রকৃতি বলে।

বিজয়া। প্রকৃতির সহিত পুরুষের এমন কি সম্বন্ধ রহিয়াছে যে তাহা না হইলে কিছুই হইত না?

পার্ব্ব। বিজয়ে! আজ এমন নির্ব্বোধের ন্যায় কহিতেছ কেন? একবার মনে করিয়া দেখ, এই যে তুমি এখানে অবস্থিতি করিতেছ, তোমার ইচ্ছা না হইলে কি তুমি এখন কিছু করিতে পার? ইহা যেমন অসম্ভব, তেমনই সেই সুখদুঃখরহিত নিষ্ক্রিয় মহাপুরুষের প্রকৃতি ব্যতীত বিশ্বোৎপত্তি ও অসম্ভব। আবার পুরুষের অভাব হইলে প্রকৃতিই হইত না; সুতরাং সৃষ্টি ও হইতে পারিত না। তবেই দেখা যাইতেছে যে, পুরুষ এবং প্রকৃতি এই উভয়ই অখিল ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তির একমাত্র কারণ।

জয়া। তবে ত যাহারা মোক্ষ-পদ-প্রত্যাশী তাহাদিগের পক্ষে প্রকৃতি পুরুষের একত্রে উপাসনা করাই যুক্তিযুক্ত।

পার্ব্ব। হাঁ, যাহারা দিব্য-জ্ঞান লাভ করিয়াছে তাহারা তাহাই করে-বটে; নির্ম্মল জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে যাহারা আলোকিত হইয়াছে তাহারা এই উপাসনাকেই জীবনের সার বলিয়া মনে করে। যদি একবার

অনিত্য মায়া-বন্ধন ছিন্ন করিয়া নিষ্কাম এই উপাসনায় মনপ্রাণ ঢালিয়া দেওয়া যায়, তবে সেই মোক্ষরূপ চিরশান্তিতে প্রশান্ত হইবার জন্য বিশুদ্ধাত্মা আপনা হইতেই শান্তিধামের অভিমুখে ধাবিত হয়। তজ্জন্য আর বিশেষ কোন চেষ্টা করিতে হয় না। কিন্তু মায়া-বন্ধন ছিন্ন করিয়া ভক্তি-যোগ অভ্যাস করা অতীব দুরূহ। তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

জয়া। কি প্রকারে মায়া বন্ধন ছিন্ন করা যায়? এবং ভক্তি-যোগ অভ্যাস করিবারই বা উপায় কি?

পার্ব্বতী। যাঁহারা কামনা করিয়া উপাসনা করে তাহাদের পক্ষে কালাকালের কোনও নিয়ম নাই। যাহারা নিষ্কাম উপাসনার অভিলাষী তাহাদিগকে প্রথমে যথোচিত জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে হইবে। পরে একদিকে সংসার বাসনা পরিতৃপ্তি অন্যদিকে একটু একটু করিয়া ভগবানে চিত্তসংযম এই উভয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সংসার হইতে অপসৃত হইয়া বিশ্বপতির অতুল প্রেমে মনপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া দিতে পারিলে শেষে আর কিছুই করিতে হয়না। কোন কোন লোক আপনাদিগের ভক্তি-ভাব অটল রাখিবার জন্য যে একখানি শব-শিবারূঢ়া মুক্তকেশী চতুর্ভুজা কালী মূর্ত্তি সম্মুখে স্থাপন করিয়া একচিত্তে পূজা করে তাহাও এই উপাসনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। ইহাকেই প্রকৃতির উপাসনা কহে। মায়া-বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভক্তিযোগ অভ্যাস করিবার পক্ষে ইহাই প্রশস্ত। প্রকৃতি কখনও আশ্রয়ীভূত পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেনা, তাই সেই লোলরসনা উগ্রচণ্ডা চামুণ্ডার উগ্রমূর্ত্তি খানি মহাদেবের উপর স্থাপিতা। সেই নৃমুণ্ড-মালিনী দিগম্বরীর অপূর্ব্ব মূর্ত্তিখানির উপর দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টতঃই বোধ হয় যেন মহাকালী নির্ব্বিকার মহাপুরুষের দেহ হইতে সমুত্থিতা হইয়া এই বিশাল জগৎ প্রসব করিয়াছেন।

বিজয়া। মাতঃ! প্রকৃতি এবং পুরুষ হইতে কি প্রকারে জগতের উৎপত্তি হইল? তাহাও শুনিতে ইচ্ছা করি।

পার্ব্বতী। বিজয়ে! তোমাকে আর বেশী কি বলিব? এইমাত্র যাঁহাকে যোগ্যতাহীন বলিয়া স্থির করিলে তিনিই সেই পুরুষ এবং আমাকেই তাঁহার প্রকৃতি বলিয়া জানিবে। জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যতীত আমাদিগের স্বরূপ কেহ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। সংসারে যাহা কিছু দেখিবে সকলই আমা-

দিগের আদর্শ। সৃষ্টির প্রথমে যখন কিছুই ছিল না, তখন আমিই তাঁহা হইতে অভ্যুত্থান করিয়াছিলাম। আমার সহযোগে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল দেখিয়া কেহ কেহ আমাকেই আদি বলিয়া স্থির করেন; কিন্তু তাহা ভ্রম। প্রকৃত পক্ষে তাঁহা হইতেই আমার উৎপত্তি হইয়াছে। পরে সেই মহাপুরুষ আমার সহিত অপূর্ব্ব সুরতে রত হইলে সর্ব্বাগ্রে আকাশ এবং পরিশেষে একে একে বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবীপ্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। ইহাদিগকেই মহাভূত কহে। ভূতনাথ এই সকল ভূত দ্বারাই সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এই সকল উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বে আবার ধৃতি, মেধাপ্রভৃতি মহদ্‌গুণ রাশিও সমুদ্ভূব হইয়াছিল। এই যে গ্রহনক্ষত্র শোভিত বিচিত্র বিমানস্থিত বিশাল জগৎ দেখিতেছ, এইরূপ আরও শত শত জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহা-দিগের জন্য আরও পৃথক্ পৃথক্ চন্দ্র সূর্য্য নিযুক্ত আছে।

বিজয়া। মাতঃ! এই যে চন্দ্রসূর্য্য সমন্বিত প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড শূন্যভরে ঝুলিয়া রহিয়াছে, ইহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া কেনই বা সরিয়া পড়িতেছে না?

পার্ব্ব। বৎসে! আপাততঃ তোমরা যে সেই বিশ্বপতিকে নিস্ক্রিয় বলিয়া মনে কর, প্রকৃত পক্ষে তাহা ভ্রম। তিনি নিয়ত আপনার রুদ্রতেজ দ্বারা এক একটী ব্রহ্মাণ্ডকে পৃথক্‌ভাবে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন; সুতরাং স্থানচ্যুত হইয়া কোনটাই কোন দিক্ সরিয়া যাইতে বা পরস্পর পৃষ্ট হইতে পারিতেছে না। আবার দেখ, সংসারে তাঁহা অপেক্ষা বৃহৎ আর কিছুই নাই, সুতরাং তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। তদনুসারে প্রত্যেক বস্তুই একটু একটু করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার দিকে আকর্ষিত হইতেছে। এইরূপ যখন সকলই যাইয়া তাঁহাতে যুক্ত হইবে, তখনই মহাপ্রলয় হইবে। তিনি ভিন্ন আর কিছুই থাকিবে না। তোমার আমারও অস্তিত্ব লোপ হইবে।

বিজয়া। ভক্ত-বৎসলে! পৃথিবীর উৎপত্তির বিষয় যাহা কিছু শুনিলাম, ইহাই যথেষ্ট, এইক্ষণ প্রাণীসমূহের বিষয় শুনিবার জন্য বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে।

এইরূপে তাঁহারা কথোপকথন করিতে করিতে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করি-তেছিলেন। সহসা পার্ব্বতী অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! আর

আমাকে অধিক বলিতে হইবে না। ঐ যে দেখ একটী মহাপুরুষ নীরবে বসিয়া মনে মনে কি ধ্যান করিতেছেন; এসো, আমরা তাঁহার নিকট যাইয়া সবিস্তার সমুদায় শ্রবণ করি।

অনন্তর শিব-বক্ষ-বিহারিণী পার্ব্বতী জয়া বিজয়া সহিত সেই মহাপুরুষের চিত্তাকর্ষণ করিয়া কহিলেন, হে যোগী-জন-বল্লভ যোগেশ্বর! হে সর্ব্বসন্তাপ-হারী মহাকাল! হে গৃহীজনের আদর্শ ত্রিলোচন! তুমি সর্ব্বান্তর্যামী—সকল বিষয়েই সম্যক পরিজ্ঞাত, এই যে খরস্রোত সংসার সমুদ্রে জীব-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, কিপ্রকারে এই জীবদেহের উৎপত্তি হয় আজ তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করি।

এই কথা শুনিয়া সর্ব্ব-লোক-রঞ্জন দেবাদিদেব মহাদেব কহিলেন, প্রিয়ে! জীবোৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল নিগূঢ় রহস্য আছে, আজ্ তাহাই তোমাকে কহিতেছি। যে প্রকার আমার সঙ্গমে তোমা হইতে এই বিশাল জগৎ সমুত্থিত হইয়াছে, সেই প্রকার আমার ইচ্ছানুসারে পিতামাতার সঙ্গমে তাহাদের দেহস্থ শুক্র শোণিত পরস্পর সংযুক্ত হইয়া সংসারে জীব-স্রোত ক্রমশঃ প্রবল করিতেছে। তন্মধ্যে কতকগুলি জীবের জন্ম গ্রহণ করিতে পিতামাতা কাহারো আবশ্যক হয় না। তাহারা আপনা হইতেই মলমূত্রাদি ক্লেদোময় পদার্থের নির্য্যাস হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাদৃশ প্রাণীর বিষয় বলিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। যাহারা পিতামাতার দেহসম্ভূত শুক্র-শোণিতের সহযোগে জরায়ুমধ্যে অবস্থিতি করিয়া কাল সহকারে ভূমিষ্ঠ হয় তাহাদের কথাই কহিতেছি, শ্রবণ কর—

পার্ব্ব। তবে নাথ! এই যে বলিলে পদার্থবিশেষের নির্য্যাস হইতেও কোন কোন প্রাণীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেইরূপ যে যে উপকরণ সমষ্টি একত্রিত হইলে মানব দেহের উৎপত্তি হয় তাহা অন্য উপায় পরস্পর সংযোগ করিয়া দিলে পিতামাতা ব্যতীত কি মানবোৎপত্তি হইতে পারে না?

মহা। না, তাহা অসম্ভব। ক্রিমিকীটাদির সহিত কখনও মানব-দেহের তুলনা হইতে পারে না। বিশেষতঃ যে যে উপকরণে মানব দেহের উৎপত্তি হয়, শুক্রশোণিত ব্যতীত তাহা অন্য কোন পদার্থে নাই এবং হইতেও পারে না। আবার সেই শুক্রশোণিতও পিতামাতার দেহ হইতে

রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন হইয়াথাকে। সুতরাং মানব বা জরায়ুজ প্রাণীর উৎপত্তি সম্বন্ধে পিতামাতাই প্রধান কারণ।

পার্ব্ব। আচ্ছা, পিতামাতাদিগের দেহস্খলিত শুক্র শোণিত মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া দিলে কেনই বা তাহাতে জীবদেহ সংগঠিত না হয়? (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ

সাং উমারপুর পোঃ নাকালীয়া, জেলা পাবনা।

কলিকাতার কলেরা ও কলের জল।

এলোপ্যাথিমতে।

১৮৮৩ সালে মিশর ও ভারতবর্ষের কলেরার কারণ নিবারনার্থ জারমানি দেশ হইতে ডাক্তার জর্জ গ্যাচ্‌কি এবং ডাক্তার রবার্ট কচ্‌প্রমুখ যে কলেরা কমিশন প্রেরিত হয়, কলিকাতা নগরীর স্বাস্থ্যরক্ষক ডাক্তার সিম্‌সন্ সাহেব তাঁহার ১৮৮৭ সালের কলিকাতার স্বাস্থ্যবিবরণীতে উক্ত কমিশনের কার্য্যের বিবরণের কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা আমাদিগের পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উক্ত কমিশন কলিকাতার কলেরা ও কলের জল সম্বন্ধে যে মতব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সারাংশ সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি। ইহা পাঠ করিয়া আমাদিগের পাঠকবর্গ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, অপরিস্কার ও ময়লা জল ব্যাবহারই ওলাউঠা রোগের প্রধান কারণ এবং পরিস্কার জল পানই ওলাউঠার হাত হইতে বাঁচিবার একমাত্র উপায়।

কলিকাতা মহানগরীর দিকে দৃষ্টি করিলে দেখা যায় দক্ষিণভাগে ইউরোপীয়েরা বাস করিতেছেন। ঐ দিকে বাটীঘর সুন্দর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং রাস্তা গুলি প্রশস্ত। সহরের উত্তরাংশে দেশী লোকের বাস। মধ্যস্থানে গরীব ইউরোপীয়, এবং চীন ও অন্যান্য মিশ্র জাতি বাস করে। এই অংশে বড় বড় সওদাগরদিগের আফিশ দেখা যায়। সহরের প্রায় সমস্ত

অংশে এমন কি দক্ষিণভাগেও বড় বড় এমারতের মধ্যে মধ্যে গরিব লোকেরা খোলারঘর করিয়া স্থানে স্থানে ছোট ছোট পল্লি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। এই গুলিকে বস্তি কহা যায়। এই সকল বস্তির মধ্যে অসংখ্য ময়লা জল পূর্ণ পুষ্করণী বা ডোবা দেখা যায়। এই সকল ডোবা বা পুস্করণীর উৎপত্তির কারণ এইরূপ ঃ—বঙ্গদেশে নিম্নভাগ অর্থাৎ নিম্নবঙ্গ সমূদ্রকুল হইতে অতি অল্প উচ্চ। এজন্য বর্ষাকালে নিম্নবঙ্গের প্রায় সমস্তভাগ জলপ্লাবিত হয়। নিম্ন বঙ্গের অধিবাসীগণ তাহাদিগের বাস্তুভূমি এই কারণ বশতঃ মাটি তুলিয়া উচ্চ করিয়া তাহার উপর বাটী নির্ম্মাণ করে। কলিকাতাও নিম্নবঙ্গের অন্তর্গত। পূর্ব্বে কলিকাতাও বর্ষাকালে ডুবিয়া যাইত। এজন্য কলিকাতায় ও সহরতালির অধিবাসীগণ পূর্ব্বে গর্ত্ত কাটিয়া মাটি তুলিয়া তাহাদিগের বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই জন্যই কলিকাতার ও সহরতালিতে এত ডোবা দেখিতে পাওয়া যায়।

বিগত কয়েক বৎসর হইতে কলিকাতার মিউনিসিপালিটী সহরের ভিতরের ডোবা সকল বোজাইয়া ফেলিতেছেন। কিন্তু এখনও অনেক ডোবা বোজাইতে বাকী আছে। কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব স্বাস্থ্যরক্ষার ডাক্তার কে ম্যাক্লিয়ড্ তাঁহার ১৮৮৩-৮৪ সালের বিবরণীতে বলেন যে কলিকাতার কূপ ও পুষ্করণী সকল বোজাইতে আরম্ভ করা গিয়াছে মাত্র। এবং যতদিন পর্য্যন্ত কলিকাতার অধিবাসীগণ এই সকল পুষ্করণী ও ডোবার জল ব্যবহারকরণরূপ আত্মহত্যার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ না করে, ততদিন পর্য্যন্ত এই কার্য্য করা যাইবে। পাঠকগণ জানিবেন এই সকল ময়লা জলপূর্ণ ডোবা বা পুষ্করণীর চতুর্দ্দিকেই কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়

* সহরতলীর দিকে বেড়াইতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় অল্প অল্প স্থান ব্যাবধানে এক একটী পুষ্করণী রহিয়াছে। উহার ধারে ধারে বড় বড় নারিকেল, তাল, সুপারি ও অন্যান্য বৃক্ষ রহিয়াছে। ঐ সকল জঙ্গলের মধ্যে অধিবাসীগণ বাঁশ, গোলপাতা ও মৃত্তিকানির্ম্মিত কুটীরে বাস করিতেছে। ঐ সকল পুষ্করিণীতে পাতা, লতা, এমন কি, আস্ত গাছ পড়িয়া পচিতেছে। এবং অধিবাসীদিগের বাটীর আবর্জ্জনা ও মলমূত্রমিশ্রিত ময়লা জল আসিয়া ঐ ডোবায় পড়িতেছে। এই অপরিষ্কার ময়লাজলপূর্ণ ডোবার জল স্নানার্থ ও রন্ধনকার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে।

গ্রীষ্মকালে ঐ সকল ডোবা বা পুষ্করিণীর জল শুখাইয়া যায় এবং যাহা অবশিষ্ট থাকে, তলা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ঐ জল এবং সহরের ময়লাধৌত জলে অল্পই প্রভেদ দৃষ্টিগোচর হয়।

আবার সহরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ। সহরের পুষ্করিণী সকলের দুরবস্থাও ততোধিক। ডাক্তার পেন সাহেব বলেন, এমন কোন কথা নাই যদ্দারা কলিকাতার পুষ্করিণীর জলের বিষয় বর্ণনা করা যাইতে পারে। এই জল সহরের প্রস্রাব বা ময়লা ধৌত জল বলিলেই হয়। কলিকাতার পুষ্করিণীর জল, লণ্ডননগরধৌত ময়লা জল অপেক্ষাও ভয়ানক জিনিষ।

দুইদিকে বাটীর উচ্চ প্রাচীর তাহার মধ্যে মধ্যে বাটীর ময়লা জল বহন করিয়া জলপ্রণালী সকল চলিয়াছে। ড্রেনের দুই ধারের প্রাচীরের গাত্রে বিষ্ঠাজাত পোকা সকল সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। এই সকল পোকা বিষ্ঠা মূত্র এবং বাটীর ময়লামিশ্রিত জল ড্রেন বহিয়া নিকটবর্ত্তী গর্ত্তে বা পুষ্করিণীতে গিয়া পড়িতেছে। পুষ্করিণীর পাড়ের চারিদিকে রাশিকৃত ময়লা বা আবর্জ্জনা রহিয়াছে। তাহাও ধুইয়া ঐ পুষ্করিণীতে পড়িতেছে। গৃহস্থেরা ঐ পুষ্করিণীতে স্নান করিতেছে, কাপড় কাচিতেছে, বাসন মাজিতেছে, উহার জলে মুখ ধুইতেছে, উহার জল পান করিতেছে এবং পানীয় দুগ্ধে মিশ্রিত করিতেছে। কলিকাতার বস্তির লোকে যদি একটা ময়লাপূর্ণ গর্ত্ত পায় এবং ঐ ময়লা যদি এমন তরল হয় যে গায়ে দিলে গায়ে না লাগিয়া থাকে তবে ঐ ময়লাই জল বলিয়া ব্যবহার করে, তাহাতেই স্নান করে, মুখ ধোয় এবং রন্ধনকার্য্যে ব্যবহার করে।

মিঃ এ, পেড্লার সাহেব কলিকাতার ১২৪ টী পুষ্করিণীর এবং ৭৬ টী কূপের জল পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, "আমি সহরের ২০০ শত পুষ্করিণী ও কূপের জল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, তন্মধ্যে শতকরা ৪৪ টীর জল কেবল সহরের ময়লা ধোয়া জল বই আর কিছুই নহে। শতকরা ২২ টীর জল অত্যন্ত অধিক ময়লাযুক্ত, শতকরা ২০ টীর জল অধিক ময়লাযুক্ত। শতকরা ৯ টীর জল সাধারণ অপরিস্কার জল এবং শতকরা ৪ টী কি ৫ টীর জল পানের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। এই শেষোক্ত গুলি কলিকাতার ময়দানস্থিত রক্ষিত পুষ্করিণীর জল।" পেড্লার সাহেব বলেন যে বর্ত্তমান কলের জলের ছয়ভাগ লইয়া তাহাতে যদি সহরে খুব ঘন ময়লা ধৌত জল

দুইভাগ মিশাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ মিশ্রিত জল গড় পড়তা কলিকাতার পুষ্করিণী ও কূপের জলের সমান হয়।

কলিকাতায় কলের জল প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে সহরের সমস্ত অধিবাসীগণ এই সকল পুষ্করিণীর, কূপের এবং গঙ্গার জল ব্যবহার করিত। এক্ষণেও অনেকে গঙ্গাজল ব্যবহার করে। গঙ্গার জলও নানা কারণে অপরিষ্কার হয়। কলিকাতার গঙ্গায় অসংখ্য নৌকা ও জাহাজ রহিয়াছে। নৌকার ও জাহাজের লোকেরা জলে মলমূত্র ত্যাগ করে। ঐ সকল মলমূত্র নদীর কিনারায় (যেস্থলে স্রোত কম) ভাসিতে থাকে। কলিকাতার লোকে ঐ জলে স্নান করে, মুখ ধোয় এবং ঘড়া পূরিয়া বাটীতে লইয়া যায়। কলিকাতায় কলের জল হওয়া স্বত্বেও বিস্তর লোক গঙ্গায় গিয়া স্নান করে এবং গঙ্গার জল ব্যবহার করে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে কলিকাতার গঙ্গার স্নানের ঘাটসকল জনপূর্ণ হয়। একদল যাইতেছে, আর একদল আসিতেছে। কমিশন স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে ছোট ছোট শিশুদিগকে পর্য্যন্ত গঙ্গাস্নানার্থ লইয়া যাওয়া হয়।

১৮৬৯ সাল হইতে কলিকাতায় কলের জল প্রচলিত হয়। ডাক্তার সিম্সন্ সাহেব বলেন—যে সময় কমিশন কলিকাতায় ছিলেন, সে সময় কলিকাতায় প্রত্যহ প্রায় ৮০ লক্ষ গ্যালন জল যোগান হইত।

জলের কল আরম্ভ হইতেই প্রথমতঃ সহরের প্রধান প্রধান গলি ও রাস্তায় জলের পাইপ বসান হয়। ঐ সকল রাস্তার সংখ্যা ৩৬০ টী। ১৮৭০ সালের শেষে ১১৬৪ টী বাটীতে কলের জল লইয়া যাওয়া হয়। ১৮৭২ সালে ৫৮৭৪ টী বাটীতে কল হয়, ১৮৭৫ সালে ৮৯৭০ এবং ১৮৭৭ সালে ১০৪৭১ টী বাটীতে জলের কল হয়।

প্রথমতঃ এই আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল যে হিন্দুরা এই জল ব্যবহার করিবে কিনা। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, সকল লোকেই জল ব্যবহার করিতেছে। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ ত ব্যবস্থা দিলেন যে কলের জল ব্যবহারে দোষ নাই, তবে দেবসেবায় ব্যবহার না করিলেই হইল। মিঃ পেড্লার্ সাহেব এই কলের জল পরীক্ষা করিয়া বলেন, যে এই জল লণ্ডননগরের টেমস্ নদীর কলের জল অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। এডিন্বরা, ডব্লিন এবং লিভারপুলের কলের জল অপেক্ষা কলিকাতার কলের জল ভাল।

কলেরাকমিশনও পুনঃ পুনঃ এই জল পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, কলিকাতার কলের জল বার্লিননগরের কলের জলের সমান।

এখন দেখা যাউক, কলের জল প্রচলিত হওয়ায় কলিকাতার ওলাউঠা প্রকৃতপক্ষে কমিয়াছে কি না? ১৮৭১—৭২ সালে বঙ্গদেশে সর্ব্বস্থানে ঐ পীড়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়। অথচ ঐ দুই বৎসর কলিকাতার কলেরায় অতি অল্প লোকেই মরিয়াছে! ইহাতে ইহাই জানা যায়, যে কলের জল প্রচলিত হওয়ায় কলিকাতার ওলাউঠা খুব কম পড়িয়াছে।

অনেকে অনুমান করিতে পারেন, যে কলিকাতায় ড্রেনের সৃষ্টি হইয়া কলিকাতার অবস্থার এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু কমিশন বিবেচনা করেন যে তাহা হইতে পারে না। যেহেতু ১৮৬৫ সাল হইতে কলিকাতায় ড্রেনের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তৎপরেও ড্রেনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ওলাউঠার বৃদ্ধি হইতে থাকে। কলিকাতার স্বাস্থ্যরক্ষক ডাক্তার ১৮৭৪ সালের রিপোর্টে প্রকাশ করেন যে, ড্রেণবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় স্বাস্থ্যবৃদ্ধি হইতেছে না। বরঞ্চ ড্রেনবৃদ্ধির সঙ্গে কলিকাতায় স্বাস্থ্য মন্দ হইতেছে।

ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, ১৮৭০ সাল হইতে কলিকাতায় যে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব কম পড়িয়াছে তাহা কলিকাতার ড্রেন বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধির জন্য নহে।

কলিকাতায় কলের জল প্রচলিত হওয়াতেই ওলাউঠা কম পড়িয়াছে। কলের জল প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে সহরের লোক বাধ্য হইয়া পুষ্করিণীর ময়লা জল ব্যবহার করিত, কারণ মিউনিসিপালিটীর দ্বারা রক্ষিত দুই চারিটী পুষ্করিণী ভিন্ন সহরে ভাল জল পাইবার উপায় ছিল না। কিন্তু কলের জল প্রচলিত হইবামাত্র কলেরার প্রাদুর্ভাব হঠাৎ কমিয়া যায়। কলিকাতার সহরতলীর অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায়ই আছে। সহরতলীর লোকে পূর্ব্ববর্ণিত ডোবা বা পুষ্করিণীর জল ব্যবহার করিতে বাধ্য হয় এজন্য সহরতলীতে বৎসর বৎসর ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। সহরতলী ও কলিকাতার উত্তরাংশের অবস্থা প্রায়ই একরূপ। সেইরূপ মৃত্তিকা, সেই বায়ু, সেই গরিবলোকের খোলার ঘর। সেই ডোবা সেই পুষ্করিণী। কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, সহরের অন্তর্গত লোকে কলের জল ব্যবহার করিতে পায় কিন্তু সহরতলীর লোকে কলের জল ব্যবহার করিতে পায় না। অতএব

কেবল একমাত্র কলের জল ব্যবহার জন্যই কলিকাতায় কলেরা কম পড়িয়াছে বলা যাইতে পারে।

কেহ কেহ বলেন যে, কলিকাতায় কলের জল ব্যবহারস্বত্বেও ১৮৮০ সাল হইতে কলিকাতায় কোন কোন পল্লীতে কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ইহাতে কমিশন বলেন যে, কলের জল ব্যবহার বৃদ্ধি হওয়ায় ১৮৭২ সালের এপ্রিল মাস হইতে সন্ধ্যা ৬ টার সময় হইতে ভোর ৫ টা পর্য্যন্ত কল বন্ধ থাকিত। ১৮৮০ সাল হইতে কলের জলের অত্যন্ত অকুলান হইয়া পড়ে। ১৮৮৬ সালের রিপোর্টে স্বাস্থ্যরক্ষক ডাক্তার সিম্‌সন্ সাহেব প্রকাশ করেন যে, সহরের যে সকল স্থানে কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তত্তৎস্থানে কলের জলের অত্যন্ত অভাব দৃষ্টিগোচর হয়। কলিকাতার কুমারটুলিতে ঐ বৎসর খুব কলেরা হয়। ডাক্তার সিম্‌সন্ সাহেব বলেন যে ঐ স্থানে কলের জল যথোচিত পরিমাণে যোগান হয় নাই। কলিকাতার অনেক স্থানে দেখা যায় যে সমস্ত পাড়ার মধ্যে রাস্তার ধারে একটীমাত্র কল (Water post) রহিয়াছে এবং পাড়ার সমস্ত লোকে জল পাইবার জন্য চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া কলসী লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। একটা কল্‌সী পূরিতে প্রায় ১৫ মিনিটকাল গত হইতেছে, কেহ পাইতেছে কেহ পাইতেছে না।

তার পর কমিশন দেখাইয়াছেন যে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে পূর্ব্বে কলেরা হইত কিন্তু ১৮৬৫ সাল হইতে ফোর্ট উইলিয়মে পরিস্কার জল ব্যবহৃত হওয়ায় এককালে তিরোহিত হইয়াছে।

তার পর কমিশন দেখাইয়াছেন যে গোদুগ্ধ দ্বারা কলেরা রোগ বিস্তৃত হইতে পারে। কলিকাতার গোপপল্লী সকল অত্যন্ত অপরিস্কার, ঐ সকল গোয়ালা বস্তির মধ্যেও প্রায় সকল স্থানেই পচা জলপূর্ণ পুষ্করিণী আছে। গোয়ালারা দুগ্ধের সহিত ঐ জল মিশ্রিত করিয়া কলিকাতায় দুগ্ধ বিক্রয় করে। ঐ পুষ্করিণীর জলে অবশ্যই নানা কারণে কলেরার মল মিশ্রিত হয়। সুতরাং কলেরা রোগের বীজ বা জীবাণু (Chobra Bacilli) ঐ জল সহিত দুগ্ধে মিশ্রিত হয়। কলেরা রোগের জীবাণু দুগ্ধে পুষ্টিতা লাভ করে, ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব কলেরা ব্যাসিলাই মিশ্রিত দুগ্ধ জাল না দিয়া কাঁচা পান করিলে তদ্দ্বারা কলেরা রোগ জন্মিতে পারে, এই কলেরার বীজ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া কলিকাতার বাহির হইতেও

সহরে আসিয়া আমদানী হয়। ১৮৭২ সালের ইণ্ডিয়ান্ মেডিকেল গেজেটে ডাক্তারকেলি সাহেব বলেন যে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কেদারহাটী নামক গ্রামে ৩০০ ঘর্ লোকের মধ্যে প্রায় ৭০ ঘর গোয়ালা আছে। উহারা কলিকাতায় আসিয়া দুগ্ধ বিক্রয় করে। এই ৭০ ঘর গোয়ালার বাস একটী পচা পুষ্করণীর চতুর্দ্দিকে। এই পুষ্করণীর জলে গোয়ালারা স্নান করে, পানার্থ উহার জল ব্যবহার করে এবং দুধেও মিশাইয়া দেয়। দুধের ভাঁড়ও ধোয়। ১৮৭২ সালে ঐ গোয়ালাদের মধ্যে কলেরা উপস্থিত হইয়া ১৬ জন লোক আক্রান্ত হয়, তন্মধ্যে ৮ জন মারা পড়ে। তৎপর বৎসরও উহাদের মধ্যে কলেরা দেখা দেয়। অতএব অনুমান হয় ঐ ঐ বৎসর কেদারহাটীর গোয়ালদিগের দ্বারা কলিকাতায় কলেরার বীজ আনীত হইয়াছিল।

ঐ ১৮৭২ সালেই ডাক্তার সি, ম্যাক্‌নামারা একটী ঘটনার উল্লেখ করেন যদ্দারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, গোয়ালার দুগ্ধদ্বারা কলেরা বিস্তৃত হইবার একটী প্রধান্ কারণ। কলিকাতার কোন একটী বেশ স্বাস্থ্যকর পল্লীতে তিনটী ইউরোপীয়দিগের বাড়ী ছিল, উহাতে ৬ জন অধিবাসী বাস করিতেন। উহারা সকলেই এক রান্নাঘরের খাদ্য খাইতেন। ঐ ছয় জনই ক্রমান্বয়ে ৪৮ ঘণ্টা মধ্যে সকলেই কলেরার দ্বারা আক্রান্ত হয়, অথচ ঐ সময়ে সে পল্লীতে কোন স্থানে ওলাউঠা হয় নাই। উহাদের চাকরদিগের মধ্যে কেবল একজন মাত্র আক্রান্ত হয়। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, ঐ চাকরটীও তাঁহাদের রান্নাঘরের খাবার খাইয়া ছিল, কিন্তু অবশিষ্ট চাকরেরা তাহাদের আপন আপন খাবার খাইত। ইহাতে স্পষ্টই বোঝা গেল যে, খাদ্যের সংস্রবেই কলেরার বীজ আনীত হইয়াছিল। পরে অনুসন্ধানে প্রকাশ হইল যে, যে গোয়ালা দুধ যোগাইত, ঐ গোয়ালা একটী পুষ্করণীর জল ব্যবহার করিত। ঐ পুষ্করণীর নিকট কিয়দ্দিন পূর্ব্বে ৮ জন লোক কলেরার দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল।

ইহাতে এই বোঝা যায় যে, গোয়ালাদিগের আনীত দুগ্ধ কাঁচা পান করা নিরাপদ নহে। তবে দুগ্ধ অগ্নিতে সিদ্ধ করিলে কলেরার বীজ মরিয়া যায়।

অনেকে বলেন যে, ভূমির নিম্নস্থ জলের উচ্চতার হ্রাস বৃদ্ধির সহিত কলেরার সংস্রব আছে। যে সময় ভূমির নিম্নস্থ জল অত্যন্ত হ্রাস হয়, সেই

সময় নাকি কলেরার খুব প্রাদুর্ভাব হয়। কিন্তু কমিশন বলেন একথা ঠিক্ নহে। যেহেতু যে মাসেই বঙ্গদেশের ভূমির নিম্নস্থ জল অত্যন্ত কম পড়ে, অথচ যে মাসেই যে কলেরার প্রকোপ বেশী হয় তাহা নহে। ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে নিম্নস্থজল কম পড়িতে আরম্ভ হয় অথচ ঐ সময়ে বরঞ্চ কলেরা কম পড়িতে আরম্ভ হয়। বৃষ্টিপাতের সহিত কলেরার সম্বন্ধ বিষয়ে ডাক্তার লিউইস্ ও কনিংহাম্ সাহেব বলেন যে, বৃষ্টিপাতের সহিত কলেরার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। তবে ইহা নিশ্চয় যে, অধিক বৃষ্টি হইলে কলেরার বিস্তৃতির হ্রাস হয়।

কলিকাতা ও বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানের ওলাউঠার প্রকোপ বিষয় বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, ঠিক বর্ষাকালে অর্থাৎ জুন হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কলেরা প্রায় দেখা যায় না। যদি কলেরা দেখা যায়, তাহাও খুব অল্প পরিমাণে। কিন্তু কোন কোন বৎসর ইহার বিপরীতও দেখা যায়। যথা, ১৮৬৫ সালের জুন ও জুলাই মাসে ওলাউঠা কম হয় কিন্তু আগষ্ট মাস হইতে বৃদ্ধি হয়। আবার ১৮৬৬ সালে জুলাই মাসে ও আগষ্ট মাসে কলেরার অত্যন্ত প্রকোপ দৃষ্ট হয়। আবার ইহাও বলা যাইতে পারে যে, গ্রীষ্মকালে কলেরার বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু গ্রীষ্মকালেও মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইয়া থাকে। যে মাসে বর্ষাকাল আরম্ভ হয়, কিন্তু তৎপূর্ব্বেও মধ্যে মধ্যে খুব বৃষ্টি হইয়া থাকে। আবার বর্ষাকালেই যে প্রত্যহই জল হয় এমনও নহে। অতএব বৃষ্টিপাতের সহিত কলেরার ঠিক্ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। ডাক্তার পেন সাহেবও বলেন যে, কলিকাতার বৃষ্টির পরিমাণের সহিত কলিকাতার কলেরা বৃদ্ধি বা হ্রাসের ঠিক সম্বন্ধ নাই।

তবে ডাক্তারগণ মত প্রকাশ করেন যে, গ্রীষ্মকালে অল্প এক পশলা বৃষ্টি হইলে কলেরার প্রকোপ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অধিক জল হইলে উহার প্রকোপ কম পড়ে। কলিকাতায় গ্রীষ্মকালে বা শীতকালে যে দিন অল্প পরিমাণ বৃষ্টি হয়, তাহার পরই হাঁসপাতালে অনেক কলেরা রোগী আসিয়া ভর্ত্তি হয়। ইহাতে ডাক্তার পেন সাহেব বলেন যে, অল্প জল হইলে সহরের ময়লা ধৌত হইয়া পুষ্করণীর জলে পড়িয়া উহার জলকে আরও ময়লা করে। কিন্তু বেশী জল হইলে পুষ্করণীসকলের জল বৃদ্ধি হইয়া উহাদের জলের মলিনত্ব অনেক কমিয়া যায়। পেন সাহেব আরও বলেন—ঠিক্ বর্ষাকালের

প্রারম্ভে কলেরার প্রকোপ কম পড়ে না। কিন্তু যে সময় পুষ্করণী ও ডোবা সকল জলপূর্ণ হয়, সেই সময় হইতে কলেরা কম পড়িতে আরম্ভ হয়। তাহার কারণ পুষ্করণীর জল বৃদ্ধি হইয়া পুষ্করণী সকলের জল অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত হয়। কলিকাতায় কলের জল প্রচলিত হইবার পরও যে সকল গরিব লোকেরা পুষ্করণীর জল ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়, তাহাদেরই মধ্যে কলেরা দেখা দেয়। এবং উহাদের মধ্যে কলেরা হইলেও ইহা দেখা যায় যে, বর্ষা-কালে যে সময় পুষ্করণী সকল জলপূর্ণ থাকে, সে সময় তাহাদের মধ্যে কলে-রার তত প্রকোপ দেখা যায় না; কিন্তু যে সময় পুষ্করণী সকলের জল কম পড়ে বা অল্প বৃষ্টি হইয়া সহরের পুষ্করণী সকলের জল আরও ময়লা হয়, সেই সময় তাহাদের মধ্যে রোগ প্রকাশ হয়। ডাক্তার পেন বলেন ১৮৭৭ সালে জানুয়ারী হইতে জুনমাস মধ্যে কলিকাতায় ৫৫০ জন লোক কলেরার দ্বারা মরে; তন্মধ্যে ৫০৮ জন নিতান্ত গরিব ও ইতর শ্রেণীর, অবশিষ্ট কয়েক-জন ছাত্র, শিক্ষক ও কেরাণী ছিল। কিন্তু ধনী লোকের মধ্যে একজনেরও ঐ পীড়া হয় নাই।

শীতকালে কলিকাতায় অত্যন্ত কলেরার বৃদ্ধি হয়, তাহাতে ডাক্তার পেন সাহেব বলেন যে, মধ্যাহ্নকালে সহরের লোক পুষ্করণীর জল ব্যবহার করে। ঐ সময় যে সকল লোক বাড়ীতে থাকে অর্থাৎ স্ত্রীলোক ও শিশু তাহারাই ঐ জল ব্যবহার করে, সুতরাং এই সকল স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের মধ্যেই কলেরার প্রকোপ বেশী হয়।

অবশেষে কমিশন মত প্রকাশ করেন যে, কলেরার কারণ একমাত্র কলেরার জীবাণু (cholera Bacilli) কলিকাতায় যে গ্রীষ্মকালে ও শীত-কালে কলেরার প্রকোপ বৃদ্ধি হয় এবং বর্ষাকালে কলেরা কম পড়িয়া থাকে, তাহার কারণ কলিকাতার জলাশয় সকলে উক্ত কলেরার জীবাণুর হ্রাস এবং বৃদ্ধি। যেহেতু গ্রীষ্মকালে ঐ সকল পুষ্করণীর জল অত্যন্ত কম পড়ে এবং যাহা থাকে তাহা অধিবাসীদিগের দ্বারা আনীত ময়লায় আরও মলিন হয়। সুতরাং গ্রীষ্ম বা শীতকালে অল্প জল হইলেই কলেরার জীবাণু সকল ধুইয়া আসিয়া পুষ্করণীতে পড়ে এবং সেই সুত্রে ঐ জল ব্যবহার করিলেই কলেরা হয়। কিন্তু বর্ষাকালে অতিরিক্ত জল বৃদ্ধি হওয়ায় ঐ সকল জীবাণুর অধিকাংশ হয় মরিয়া যায়, না হয় ধৌত হইয়া যায়। কলেরার জীবাণু

সকল কলেরার মলে ও বমিতে খুব্ পুষ্টিতা লাভ করে। কলেরার যে মল ও বমি ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাতে ঐ সকল জীবাণু সংখ্যায় অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। গ্রীষ্মকালে সামান্য জল হইলেই ঐ সকল কলেরার জীবাণু-সকল (cholera Bacilli) ধুইয়া আসিয়া পুষ্করণীতে পড়ে এবং ঐ জল ব্যবহার করিলেই পীড়া হয়। অনেকে আপত্তি করেন যে, কলেরার জীবাণু কলিকাতায় গ্রীষ্মকালের অত্যন্ত পচা জলে মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। তাহাতে কমিশন বলেন যে, কলেরার জীবাণুসকল পুষ্করণীতে পৌঁছান মাত্র লোকের শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারে, যেহেতু লোকে সর্ব্বদাই পুষ্করণীর জল ব্যবহার করে।

উপরোক্ত বিবরণী পাঠে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, কলেরা যে বিষের দ্বারাই সৃষ্ট হউক না কেন, ময়লা ও অপরিষ্কার জলপানই উহার প্রকৃত কারণ এবং পরিষ্কার ফিল্‌টার করা জলপানই যে কলেরার আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র উপায়, তাহার আর সন্দেহ নাই। যাহা কলিতায় খাটে তাহা সমস্ত বঙ্গদেশের উপরই বর্ত্তে। বাঙ্গালাদেশে বর্ষাকালে সমস্তদেশ জলপ্লাবিত হয়, সুতরাং সমস্ত খাল, বিল ও পুষ্করণী জলপূর্ণ হয় এবং দেশ জলে ধুইয়া যায় সুতরাং অতিরিক্ত জলে ঐ সকল কলেরার জীবাণু সকল ধৌত হইয়া যায় বা মরিয়া যায়। কিন্তু গ্রীষ্ম বা শীতকালে নিকটবর্ত্তী স্থান ধৌত হইয়া ঐ সকল জীবাণু জলাশয়ে গিয়া নীত হয় সুতরাং তদবস্থায় ঐ জল পান করিলেই কলেরা পীড়া জন্মিয়া থাকে। এবার মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুর অঞ্চলে কার্ত্তিক মাসের শেষ হইতে অগ্রহায়ণের প্রায় অর্দ্ধেক দিন পর্য্যন্ত কলেরার খুব প্রকোপ হইয়াছিল। আবার কার্ত্তিকমাস হইতেই বহরমপুরের নিম্নস্থ ভাগীরথীর জল অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। এতদূর কমিয়াছে যে, হোরমিলার কোম্পানীর ক্ষুদ্র ষ্টীমার (যাহাতে দেড়হাতমাত্র জল কাটে) যাতায়াত কার্ত্তিকমাস হইতেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। খাগড়া গোরাবাজার ও বহরমপুরের প্রায় অধিকাংশ লোকে ঐ গঙ্গাজল ব্যবহার করে। আবার খাগড়ার মধ্যেও দুএকটা পচা জলপূর্ণ পুষ্করণী দেখিতে পাওয়া যায়। এবার কার্ত্তিকমাসের শেষে মুর্শিদাবাদ জেলায় সামান্য পরিমাণ বৃষ্টি হইয়াছিল। অতএব অনুমান হয়, ঐ সামান্য বৃষ্টিতে বহরমপুরের ময়লা ধৌত হইয়া ভাগীরথীর অল্প

মাত্র জল আরও কলুষিত করিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ কলেরার জীবাণুসকল ধৌত হইয়া ভাগীরথীর জলে নীত হইয়াছিল। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, এবার বৃষ্টি হইবার ঠিক্ এক সপ্তাহমধ্যেই বহরমপুরে ওলাউঠা দেখা দিয়াছিল। অতএব বর্ষাকালে যেমনই হউক, শীত ও গ্রীষ্মকালে নদী ও পুষ্করণীর জল ফিল্টার না করিয়া ব্যবহার করা অনুচিত। ফিল্টার অভাবে জল অধিকক্ষণ অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া লইলেও চলিতে পারে। যেহেতু অধিক উত্তাপে কলেরার জীবাণুসকল মরিয়া যায়। গ্রীষ্ম ও শীতকালে সামান্যাকারের বৃষ্টি হইলে পানীয় জলের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। আর গোয়ালাবাটী হইতে আগত দুগ্ধ অগ্নিতে সিদ্ধ না করিয়া কোনক্রমেই পান করা বিহিত নহে।

দেশীয়-স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।

আহারতত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬৪ পৃষ্ঠার পর)

(২) অম্লরসের গুণ যথা—অম্লরস আহারীয় দ্রব্যে রুচিকারক, অগ্ন্যদীপক, শরীরের পুষ্টিকারক, বলকারক, মনের প্রসন্নতাজনক, ইন্দ্রিয়সমূহের দৃঢ়তাসম্পাদক, বলবর্দ্ধক, বায়ুর অনুলোমকারক, হৃদয়ের তৃপ্তিজনক, মুখ হইতে লালাস্রাবকর, অন্নের অধোগামীকারক, ক্লেদজনক, ভুক্তদ্রব্যের জীর্ণকারক এবং শরীরের তৃপ্তিজনক। অম্লরসের, লঘুত্ব, উষ্ণত্ব ও স্নিগ্ধত্ব এই তিনটী গুণ।

(৩) লবণং রসঃ পাচনঃ ক্লেদনঃ দীপনঃ চ্যাবনঃ ছেদনঃ ভেদনস্তীক্ষ্ণঃ সরো বিকাস্যধঃস্রংস্যবকাশকরো বাতহরঃ স্তম্ভবন্ধসংঘাতা বিধমনঃ সর্ব্বরসপ্রত্যনীকভূত আস্যং বিস্রাবয়তি, কফং বিষ্যন্দয়তি, মার্গান্ শোধয়তি, সর্ব্বশরীরাবয়বান্ মৃদূকরোতি, রোচয়ত্যাহারমাহারযোগীনত্যর্থ গুরুঃ স্নিগ্ধ উষ্ণশ্চ॥

(৩) লবণরসের গুণ যথা—লবণরস—পাচক, ক্লেদজনক, অগ্ন্যদীপক, রেচক, ছেদনকারক, ভেদক, তীক্ষ্ণ, সারক, বিকাশজনক, ভ্রষ্টতাজনক, ছিদ্রজনক, বায়ুনাশক, দেহের জড়তা, বদ্ধতা ও কাঠিন্যনাশক এবং সকল

রসের বিপরীত। অপর ইহা লালানিঃসারক, কফের তরলতাসম্পাদক, শিরাসমূহের বিশোধক, সর্ব্বশরীরের মৃদুত্বাকারক, আহারে রুচিজনক এবং আহারের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। লবণরসের গুরুত্ব, স্নিগ্ধত্ব এবং উষ্ণত্ব এই কয়টী গুণ আছে।

(৪) কটুকো রসো বক্ত্রং শোধয়তি, অগ্নিং দীপয়তি, ভুক্তং শোষয়তি, ঘ্রাণমাস্রাবয়তি, চক্ষুর্ব্বিরেচয়তি, স্ফুটীকরোতীন্দ্রিয়াণি, অলসকশ্বয়থূপচয়োদর্দ্দাভিষ্যন্দস্নেহস্বেদক্লেদমলানুপহন্তি, রোচয়ত্যশনং, কণ্ডুর্ব্বিনাশয়তি, ব্রণানবসাদয়তি, ক্রিমীন্ হিনস্তি, মাংসং বিলিখতি, শোণিতসঙ্ঘাতং ভিনত্তি. বন্ধাংশ্ছিনত্তি, মার্গান্ বিবৃণোতি, শ্লেষ্মাণং শময়তি, লঘুরুষ্ণো রুক্ষশ্চ।

(৪) কটু অর্থাৎ ঝালরসের গুণ যথা—কটু (ঝাল) রস, মুখের বিশুদ্ধিকারক, অগ্নিদীপ্তিকারক, ভুক্তদ্রব্যের শুষ্ককারক, মুখ ও নাসিকা হইতে কফনিঃসারক, চক্ষুহইতে জলস্রাবকারক, ইহাদ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহ বিকশিত হয়। অলসক (অজীর্ণরোগ বিশেষ), শোথ, শরীরের পুষ্টিতা, উদর্দ্দরোগ, অভিষ্যন্দ, স্নেহ, ক্লেদ, মেদ এবং শরীরের মলনাশ করে; আহারে রুচি জন্মায়, কণ্ডুর (চুলকনা) ধ্বংস করে, ব্রণস্থানের অবসন্নতাকারক, ক্রিমিনাশক, মাংসের বিলেখনকারক, রক্ত জমিলে উহার ভেদক, বন্ধের ছেদনকারক, শিরাসমূহের বিকৃতিকারক এবং কফের শান্তিকারক। কটুরসের লঘুত্ব, উষ্ণত্ব এবং রুক্ষত্ব এই তিনটী গুণ আছে।

(৫) তিক্তোরসঃ স্বয়মরোচিষ্ণুররোচকঘ্নো বিষঘ্নঃ ক্রিমিঘ্নঃ মূর্চ্ছাদাহকণ্ডূকুষ্ঠতৃষ্ণাপ্রশমনঃ ত্বঙ্মাংসয়োঃ স্থিরীকরণো জ্বরঘ্নো দীপনঃ পাচনঃ স্তন্যশোধনো লেখনঃ ক্লেদমেদোবসামজ্জলসীকাপূয়স্বেদমূত্রপুরীষপিত্তশ্লেষ্মোপশোষণঃ রুক্ষঃ শীতো লঘুশ্চ ॥

(৫) তিক্তরসের গুণ যথা—তিক্তরস নিজে অরুচি জন্মায় অর্থাৎ সেবনকালে অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত করে, কিন্তু ক্রমে সেবন করিতে করিতে অরুচি নষ্ট করে, বিষদোষ নষ্ট করে, ক্রিমিনাশক, মূর্চ্ছা, দাহ, কণ্ডু, কুষ্ঠ এবং তৃষ্ণারোগের শান্তিকারক, চর্ম্ম এবং মাংসের স্থৈর্য্যকারক, জ্বরনাশক, অগ্নির দীপ্তিকারক, পাচক, স্তন্যদুগ্ধের শুদ্ধিকারক, লেখনকারক এবং ক্লেদ, বসা, লসীক, পুয, ঘর্ম্ম, মূত্র, বিষ্ঠা, পিত্ত এবং শ্লেষ্মার বিশুদ্ধিকারক। তিক্তরসের রুক্ষত্ব, শীতত্ব এবং লঘুত্ব এই কয়েকটী গুণ আছে।

(৬) কষায়ো রসঃ সংশমনঃ সংগ্রাহী সন্ধারণঃ পীড়নো রোপণঃ শোষণঃ স্তম্ভনঃ শ্লেষ্মরক্তপিত্তপ্রশমনঃ শরীরক্লেদস্তোপস্তোক্তা রুক্ষঃ শীতো গুরুশ্চ।

(৬) কষায়রসের গুণ যথা—কষায়রস ত্রিদোষের শান্তিকারক, মলমূত্ররোধক, ধারক, পীড়াজনক, ব্রণাদির রোপণকারক, স্তম্ভনকারক, শ্লেষ্মা ও রক্তপিত্তের শান্তিকারক এবং শরীরের ক্লেশজনক। কষায়রসের রুক্ষত্ব, শীতত্ব এবং গুরুত্ব এই তিনটী গুণ আছে।

মধুরাম্লাদি ছয়প্রকার রসের মধ্যে সাধারণতঃ যে যে রসের যে যে গুণ, তাহা ক্রমশঃ দেখান হইল। কিন্তু কেহ মনে করিবেন না যে, কেবল গুণের বিষয় বলিয়াই প্রবন্ধ শেষ করা গেল। অতএব মধুরাদি রস যথারীতি মাত্রানুযায়ী ব্যবহার করিলে যেমন গুণদায়ক হয়, পক্ষান্তরে নিরন্তর অধিকমাত্রায় ব্যবহৃত হইলে উক্ত মধুরাদিরস যে কিরূপ বিষের ন্যায় কার্য্য করে তাহা এবং তৎসম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য আগামীবারে প্রকাশিত হইবে।

ক্রমশঃ—

শোথ (সম্পূর্ণ)।

(এলপ্যাথিমতে)

হৃদয়, মূত্রযন্ত্র ও যকৃতের ক্রিয়া বৈলক্ষণ্যবশতঃ শোথ হইলে সে শোথ একবার ভাল হইয়া আবার হইয়া থাকে। বিশেষতঃ হৃদয়ের এমন অনেক পীড়া আছে, যাহা একবারে ভাল হয় না, সুতরাং তৎসংক্রান্ত শোথ ভাল হইলেও পুনর্ব্বার হইয়া থাকে। যেহেতু রোগের প্রকৃত কারণ দূরীভূত না হইলে তজ্জনিত রোগ দূরীভূত হয় না। এই সকল স্থলে সর্ব্বদা একবিধ ঔষধ ব্যবহার না করিয়া মধ্যে মধ্যে ঔষধ বদলাইয়া দেওয়া উচিত। বিশেষতঃ এই সকল পুরাতন শোথে কোন ক্রমেই রোগীর বলহ্রাস করা বিহিত নহে। শোথের প্রধান চিকিৎসা এই যে, শরীরের জলনির্গমনকারী যন্ত্র সকলের ক্রিয়া বৃদ্ধি করা, কিন্তু এই সকল পুরাতন শোথে কোন এক বিশেষ জলনির্গমনকারী যন্ত্রের ক্রিয়ার সর্ব্বক্ষণ উত্তেজন করা ভাল নহে। কখনও বা মূত্রকারক, কখনও বা ঘর্ম্মকারক এবং কখনও বা দাস্তকারক ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। এই সকল পুরাতন শোথে কোন এক

যন্ত্রবিশেষের উপর ক্রিয়া করে, এরূপ ঔষধ পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করিলে সেই যন্ত্রের পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে। আবার পুরাতন যকৃতের পীড়া সংসৃষ্ট শোথে পুনঃপুনঃ ক্রিম্ অব্ টার্টার্ প্রভৃতি দাস্তকারক ঔষধ দিলে রোগী অবশেষে আমাশয়ের পীড়া উপস্থিত হইয়া রোগী সমূহ বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়াবশতঃ পুরাতন শোথ রোগে সর্ব্বদা দুর্ব্বল-কারী ঔষধ ব্যবহার করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। বিশেষতঃ ইলেটি-রিয়ম প্রভৃতি অতি উগ্র ঔষধ ব্যবস্থেয় নহে। নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শোথরোগের গুটিকতক প্রেস্ক্রুপ্সন্ দেওয়া যাইতেছে। হাম বা স্কার্লেট্-ফিবার বশতঃ শোথ হইলে নিম্নলিখিত ঔষধে উপকার করিতে পারে। যথাঃ—

আইওডাইড্ অব্ পোটাসিয়ম্ ...	৫—১০ গ্রেণ
বাইটার্টারেট অব্ পোটাস্ ...	১ ড্রাম
টীংচার ডিজিটালিস্	৫—১০ মিনিম
জল	১ আউন্স

মিশ্রিত করিয়া একমাত্রা প্রত্যহ তিনবার সেবন। যকৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বৈলক্ষণ্যবশতঃ শোথ হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থেয় যথা :—

এসিটেট্ অব্‌পোটাস্	১০—১৫ গ্রেণ
একসট্রাক্ট ট্যারাক্সেকম্	১০ গ্রেণ
নাইট্রিক্ এসিড্ ডাইলুট	১০ ফোটা
জল	১ আং

মিশ্রিত করিয়া একমাত্রা প্রত্যহ তিনবার সেবন। অথবা—

নাইট্রেট্ অব্‌পোটাস্	১০ গ্রেণ
সককস্ ট্যারাক্সেকম্	১০½ ড্রাম
এসিড্ নাইট্রিক্ ডাইলুটেড্ ...	১০ মিনিম
জল	১ আং

মিশ্রিত করিয়া একমাত্রা।

একুাট্ এল্‌ব্যুমিনিউরিয়া বশতঃ শোথ হইলে :—

টীংচার্ ক্যান্‌থারাইডিস্	৫ ফোটা
টীংচার্ ডিজিট্যালিস্	৫ ফোটা

পোটাসিয়ম্ আইওডাইড্	...	...	৫ গ্রেণ
জল	...	... ...	১ আং
একমাত্রা	...	... ...	প্রত্যহ তিন বার।

এই ঔষধ ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে জোলাপ দিয়া অথবা কিড্নির (মূত্র-যন্ত্রের) উপর বেলেস্তারা বা মষ্টার্ড প্ল্যাস্টার দিয়া রোগের তরুণত্ব দূর করিবে। কারণ মূত্রযন্ত্রের তরুণপ্রদাহের অবস্থায় মূত্রকারক ঔষধ দেওয়া নিষিদ্ধ। মূত্রযন্ত্রের উপর ড্রাইকপিং প্রয়োগ করিলেও চলিতে পারে।

মূত্রযন্ত্রের পুরাতন পীড়া থাকিলে ও যে কোন কারণেই শোথ হউক না রোগী রক্তহীন হইলে লৌহঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যদি উগ্র লৌহ সহ্য না হয়, তবে সাইট্রেট্ বা টার্টারেট্ অব্ আয়রণ দিবে। দুর্ব্বলাবস্থায় মূত্রকারক ঔষধ দিতে হইলে উত্তেজক মূত্রকারক ঔষধ দিবে। যথা—নাইট্রিক্ ইথর্, টর্পেণ্টাইন্, জুনিপার, স্কুইল প্রভৃতি।

শোথ অত্যন্ত প্রবল হইলে জলনির্গমনকারী যন্ত্রসকল শোথের চাপ পড়িয়া উহাদের ক্রিয়া করিবার আদৌ ক্ষমতা থাকে না। এইরূপ অবস্থায় ঔষধ খাইতে দিলে বিশেষ কোন ফল দর্শায় না। যথা—অত্যন্ত অধিক জলোদরী হইলে কিড্নি (মূত্রযন্ত্র) প্রভৃতিতে এত চাপ পড়ে যে, মূত্রকারক ঔষধে কোন ফল দর্শে না। বক্ষগহ্বরের প্রবল শোথ হইলে হৃদয় ও ফুষ্ফুষে অত্যধিক চাপ পড়িয়া উহাদের ক্রিয়া করিবার ক্ষমতা কমিয়া আইসে; সুতরাং খাইবার ঔষধে ত ফল শীঘ্র হয়ই না, বিশেষতঃ রোগী শীঘ্রই হাঁপাইয়া মারা পড়ে। আবার পদদ্বয়ে অত্যন্ত অধিক শোথ হইলে ঐ শোথের চাপে পায়ের রক্তবহা নাড়ী (ভেসেল্) রসগ্রাহী নাড়ী, (লিম্ফেটিক্ ভেসেল) প্রভৃতির কাজ করিবার ক্ষমতা একবারেই বিলুপ্ত হয়, সুতরাং তদবস্থায় মূত্রকারক বা ঘর্ম্মকারক ঔষধে শীঘ্র ফল ফলিতে দেখা যায় না। আবার ঐরূপ শোথের শীঘ্র প্রতিকার না হইলেও পা দুইখানি একবারে পচিয়া যাইতে পারে। এমন অনেক অনারোগ্য শোথে দেখা গিয়াছে যে, অবশেষে রোগীর পা দুইখানি পচিয়া উঠিল। এই সকল স্থলে অস্ত্রকার্য্যদ্বারা শোথের কতক জল বাহির করিয়া দিয়া রোগীকে আশু মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করা উচিত।

যদি দেখা যায় যে, শোথ এত প্রবল হইয়াছে যে তদ্দ্বারা রোগীর রক্ত-

সঞ্চালন ও শ্বাসগ্রহণ প্রভৃতির কার্য্যের ব্যাঘাত হইতেছে অথচ খাইবার ঔষধে বিশেষ উপকার হইতেছে না, তবে অস্ত্রকার্য্য দ্বারা তৎক্ষণাৎ কতক পরিমাণে জল নির্গত করিয়া দেওয়া উচিত। কতক জল বাহির করিয়া দিলে পরে মূত্রকারকপ্রভৃতি ঔষধে বেশ ফল পাওয়া যায়। জলোদরী রোগে ডাক্তার মহাশয়েরা উদর ট্যাপ্ করিয়া জল বাহির করিয়া দিয়া থাকেন। ইহা সকল চিকিৎসকেই অবগত আছেন। পদদ্বয়ে অত্যন্ত অধিক শোথ হইলে পদদ্বয়ের স্থানে স্থানে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া দিয়া কতক জল বাহির করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। অতি ক্ষুদ্র ট্রোকার ও ক্যান্যুলা দ্বারা এই কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। ক্যান্যুলার গোড়াতে অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র সম্পন্ন রবারের নল (ক্যাপিলারি টিউব্) লাগাইয়া দিলে ঐ নল বহিয়া জল পড়িতে থাকে। ট্রোকার ও ক্যান্যুলা দ্বারা ছিদ্র করিয়া ট্রোকারটী তুলিয়া লইলে ক্যান্যুলা দিয়া জল নির্গত হইবে। ডাক্তারদিগের সচরাচর ব্যবহৃত ক্ষুদ্র এক্সপ্লোরিং নিডল্ দ্বারা সময় সময় কায চলিতে পারে। কিন্তু এইরূপ ছিদ্র করিবার অগ্রে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত, যেহেতু বেশী ঘন ঘন ছিদ্র করিলে প্রদাহ জন্মাইয়া পা পচিয়া যাইতে পারে। খুব্ তফাৎ তফাৎ ছিদ্র করা উচিত। যেহেতু শোথ-পীড়িতঅঙ্গে বেশী আঘাত লাগিলেই উহার প্রদাহ জন্মাইতে পারে। হাঁটুর নিম্নভাগের সমস্ত স্থান বাদ দিয়া হাঁটুর উপরিভাগে ছিদ্র করা উচিত। যেহেতু যে অঙ্গ হৃদয় হইতে বেশী দূরে অবস্থিত, সে অঙ্গে রক্ত চলাচল খুব্ কমই হয়, বিশেষ পুর্ব্বে যে রক্ত চলিতেছিল, শোথ হওয়ায় তাহাও বন্ধ প্রায় হইয়াছে, এরূপ স্থলে হাঁটুর নিম্নভাগ সমুদয় অংশ শীতল হইয়া থাকে। সুতরাং তদবস্থায় হাঁটুর নিম্নভাগে ছিদ্র করিলে হাঁটুর নিম্ন হইতে সমুদয় স্থান পচিয়া যাইতে পারে। হাঁটুর নিম্নভাগ অপেক্ষা উরুদ্বয়, হৃদয়ের অধিক নিকটবর্ত্তী, সুতরাং উরুদেশে ছিদ্র করাই যুক্তিযুক্ত।

এইরূপ ছিদ্র করিয়া কতক জল বাহির করিয়া দিয়া পা ও উরুদ্বয়ে বেশ একটু চাপ দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। দেখা গিয়াছে সমস্ত শরীর ফুলিয়া উঠিলেও শুধু একুপংচার দ্বারা পদদ্বয়ের কিয়দংশ জল বাহির করিয়া দিলে সমস্ত অঙ্গের শোথ আরোগ্য হইয়া যায়। কারণ পুর্ব্বে যে সকল আভ্যন্তরিক যন্ত্র ক্রিয়া করিতেছিল না, সমস্ত শরীরের

কতক জল পা দিয়া বাহির হইয়া যাওয়ায় একণে ঐ সকল যন্ত্রের কিয়দংশ চাপ অবসৃত হওয়ায় তাহাদের ক্রিয়া করিবার ক্ষমতা পুনর্জীবিত হয়। এই-রূপ অবস্থায় সামান্য ঘর্ম্মকারক বা মূত্রকারক ঔষধে বিশেষ ফল ফলিতে দেখা গিয়া থাকে।

এখন শোথের পীড়ায় কিরূপ নিয়মে পথ্যাদি দেওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা কর্ত্তব্য। এস্থলে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রোগীর বল বিবেচনায় পথ্য দিবে। তরুণ শোথে পুষ্টিকর পথ্য না দিয়া রোগীকে লঘু আহারে রাখাই কর্ত্তব্য। রোগী দুর্ব্বল হইলে পুষ্টিকর ও সহজ পথ্য দ্রব্য যথা—দুগ্ধ, মাংসের কাথ প্রভৃতি দেওয়া উচিত। শোথ-রোগীকে অতি-রিক্ত ঠাণ্ডা জল অধিক পরিমাণে খাইতে দেওয়া অন্যায়। অনেক স্থলে এমন দেখা যায়, দুর্ব্বল রোগী মিশ্রির সরবত, ডাব প্রভৃতি শীতল পানীয় খাইয়া তাহার শোথ হইয়াছে। অনেক পুরাতন জ্বররোগীর অবস্থা দেখিলে বুঝা যায় যে, রোগী রাত্রে ঠাণ্ডা জল পান করিয়া অল্প অল্প শোথগ্রস্ত হই-য়াছে এবং তাহার চোখ মুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে। রক্তহীন শরীরে বেশী ঠাণ্ডা জিনিষ খাওয়া নিতান্ত অনুচিত। আমাদিগের দেশের লোকের একটা সংস্কার আছে বায়ুকুপিত (বায়ুবৃদ্ধি) হইলেই ঠাণ্ডা জিনিষ খাওয়া উচিত। অনেকের সামান্য মাথা ঘুরিলেই বা শরীর দুর্ব্বল হইয়া ঝাঁ ঝাঁ করিতে থাকিলেই সরবত ডাব প্রভৃতির আশ্রয় লইয়া থাকেন। পুরাতন জ্বররোগীরও শরীর রক্তহীন ও দুর্ব্বল হওয়ার জন্য মাথা ঘুরিয়া থাকে এবং বায়ুকুপিত বলিয়া বোধ হয়। এই সকল স্থানে প্রায়ই দেখা যায়—রোগী বায়ু উগ্র হইয়াছে বলিয়া স্নানাদি করিয়া শোথগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু বায়ু-কুপিত হওয়া ও দুর্ব্বল হওয়া স্বতন্ত্র জিনিষ। বিশেষতঃ বায়ু উগ্র হইলেও বায়ু দমনের ঔষধ শীতল প্রয়োগ নহে, অপিচ পুষ্টিকর খাদ্য। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও এইরূপ ব্যবস্থা পাওয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদ বলেন বায়ুকুপিত হইলে মাংস প্রভৃতি খাদ্য দেওয়া উচিত। পরন্তু যে কারণবশতঃ শরীর দুর্ব্বল হইয়া মাথা ঘুরিতেছে, সে দৌর্ব্বল্য নিরাকরণ না করিয়া শীতল দ্রব্য ব্যবহার করিলে হিতে বিপরীত হয়, ইহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ। পুরাতন জ্বরে (যাহাতে বৈকালে অল্প অল্প জ্বর হয়) এতদ্দেশীয় অনেক লোক শীতল দ্রব্য ব্যবহার করিয়া এবং রুক্ষ হইয়াছে বলিয়া স্নান করিয়া হাতপায় শোথগ্রস্ত হয়।

এবং শোথগ্রস্ত হইলেই মূত্র কটু হয়, সুতরাং রোগী বায়ু বৃদ্ধি মনে করিয়া দধি অম্ল, সরবত প্রভৃতি খাইয়া অবশেষে দুরারোগ্য শোথরোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। পরন্তু শোথরোগীর ও সাধারণতঃ দুর্ব্বলরোগীর স্নানাদি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এইরূপ রোগীর উষ্ণ জলে স্নান বিহিত এবং সর্ব্বদা বিশেষতঃ স্নানের পর ফ্লানেল প্রভৃতি পশমনির্ম্মিত দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত রাখা কর্ত্তব্য।

আয়ুর্ব্বেদে শোথরোগ।

শোথচিকিৎসায় বাঁধাঔষধ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৯ পৃষ্ঠার পর)

যে যে রোগের যে অবস্থায় শোথ জন্মিলে বাঁধা ঔষধের প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা গতবারে বলিয়াছি। এবং যে সমস্ত ঔষধকে সাধারণতঃ বাঁধাঔষধ বলে, তাহাও বলিতে ত্রুটী করি নাই। পাঠকগণ মনে করিতে পারেন যে, এতগুলি বাঁধা ঔষধের কেবল নামই লেখা হইল, কিন্তু উহাদের প্রস্তুতের নিয়ম ত কিছুই বলা হইল না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, এ প্রবন্ধের মধ্যে অতগুলি ঔষধের প্রস্তুত বা প্রয়োগপ্রণালী লিখিতে হইলে প্রবন্ধটী অত্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ সুবিজ্ঞ লেখক শীতল বাবুর প্রবন্ধ দ্বারা পাঠকবর্গের সে ক্ষোভ ক্রমশঃ দূর হইতেছে মনে করিয়া আমরা এস্থলে ঔষধাদির প্রস্তুত বা প্রয়োগ নিয়মের উল্লেখ করিয়া পাঠকবর্গের সময় নষ্ট করিব না। অতঃপর দেখা যাউক, বাঁধা ঔষধ প্রয়োগের সময় রোগীকে কত দিন কিরূপ নিয়মের বশীভূত থাকা আবশ্যক।

প্রথমেই বলিয়াছি বাঁধা ঔষধের মধ্যে যে কোনটীই প্রয়োগ করা হউক, লবণজলাদি সমস্ত বন্ধ করিয়া কেবল দুগ্ধ ভাতের প্রতিই নির্ভর করিতে হইবে; সুতরাং গ্রহণী, অজীর্ণ বা অর্শজনিত শোথরোগীকে ঔষধ (সুবর্ণ

বা রসপর্পটী প্রভৃতির যে কোনটী হউক) প্রয়োগের প্রথম দিবস হইতেই কেবল দুগ্ধভাত আহার ও পিপাসার সময় নির্জ্জল দুগ্ধপান ভিন্ন অন্য সর্ব্বপ্রকারের আহার, স্নান, পরিশ্রম ও রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবেক। প্রথম প্রথম এক বেলা খুব্ পুরাতন চাউলের ভাত এবং রোগীর বয়ঃক্রম ও বলানুসারে একপুয়া হইতে অর্দ্ধ বা একসের দুগ্ধ ও আবশ্যক অনুসারে অত্যল্প মিশ্রির সহিত প্রদান করিবে। তৎপরে দিবসে বা রাত্রে যখনই পিপাসা বোধ হইবেক, তখনই জলের পরিবর্ত্তে খাঁটী দুগ্ধ পান করিতে দিবে। কিন্তু এটী যেন বেশ স্মরণ থাকে যে, প্রাতের দোয়া বাসী দুগ্ধ রাত্রে দেওয়া না হয় এবং রাত্রের দোয়া দুগ্ধ প্রাতে দেওয়া না হয়। প্রথম কয়েক দিন রোগীকে একবেলা ভাত ও রাত্রে দুগ্ধ এরারুট বা দুগ্ধসাগু কিংবা দুগ্ধ বার্লি না দিয়া রাত্রে শুদ্ধ দুগ্ধই পান করিতে দেওয়া উচিত। পরে ক্রমশঃ রোগীর ক্ষুধা ও বলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধেরও মাত্রা বৃদ্ধি এবং রাত্রে দুগ্ধ বার্লি প্রভৃতি দেওয়া উচিত। আমরা এমন শত শত রোগীর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে, যে রোগীর অহোরাত্রের মধ্যে সামান্য একটু জলবার্লি বা জলসাগু অথবা এক ছটাক দুগ্ধ পান করিবার সামর্থ্য নাই, বাঁধাঔষধের বলে সেই রোগীর সপ্তাহের মধ্যে একশের দুগ্ধ ও একপোয়া চাউলের অন্ন খাওয়ার সামর্থ্য জন্মিয়াছে। অধিক কি, এশ্রেণীর কোন কোন রোগীকে ২।৩ সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যহ তিন বা সাড়ে তিন সের দুগ্ধ পান করাইয়াও তাহার ক্ষুধার সম্যক্ নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় নাই।

বাঁধা ঔষধের আর একটী অসাধারণ গুণ এই যে, যে সমস্ত রোগীর প্রত্যহ ৫।৭ বার প্রচুর তরল দাস্তের সহিত প্রভূত শোথ আছে, এই ঔষধ দ্বারা তাহাদের সেই শোথের নিবৃত্তি অথচ দাস্তের সংখ্যা কম হইয়া মল স্বাভাবিক আকার ধারণ করে। পক্ষান্তরে যে শোথগ্রস্ত রোগীর দাস্ত ভয়ানক কঠিন অথবা মধ্যে মধ্যে দম্‌কা ভেদ হয়, বাঁধা ঔষধ সেবনে তাহাদেরও ক্রমশঃ কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হইয়া মলের স্বাভাবিক আকার ও বর্ণ জন্মিয়া থাকে। আবার এইরূপ কোষ্ঠবদ্ধাশ্রিত কোন কোন শোথরোগীর সম্বন্ধে এমনও দেখা যায় যে, প্রথমে বাঁধাঔষধ আরম্ভ করাইয়া প্রচুর দুগ্ধ-সেবন জন্য রোগীর ভয়ানক ভেদ অর্থাৎ প্রত্যহ ৮।১০ বার কি তদধিক দাস্ত হইতে আরম্ভ হয়। নিতান্ত দুর্ব্বল রোগীর সহসা এইরূপ অধিক

ভেদ হইতে আরম্ভ হওয়ায় রোগীর অভিভাবক এমন কি, সময় সময় চিকিৎসককে পর্য্যন্ত ভয় খাইয়া যাইতে হয়। কিন্তু বেশ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এইরূপ ভেদে প্রকৃতপক্ষে রোগীর কোনও অনিষ্ট ঘটে না। অপরন্তু প্রভূত শোথগ্রস্ত রোগীর এইরূপ দাস্ত হওয়াতে অচিরাৎই তাহার শোথের শান্তি হইয়া থাকে।

বাঁধা ঔষধ সেবন এতদূর কঠোর নিয়মের অধীন হইলেও (অর্থাৎ কেবল দুগ্ধ ভাত ও দুগ্ধপানের প্রতি নির্ভর) সকলের জানা আবশ্যক যে, রোগী এবং (বালক বৃদ্ধ বা স্ত্রীলোক) কালবিশেষে (গ্রীষ্মাদিকালে) অনেক স্থলে উক্ত নিয়মের বিপর্য্যয় ঘটাইতে হয়, অর্থাৎ রোগীবিশেষকে জলপান করিতে না দিলেই চলে না। অতএব বাঁধা ঔষধ সেবন কালে যদি এমন বোঝা যায় যে, রোগীকে একটু আধটু জল পান করিতে না দিলেই নয়, তবে অগত্যা বাধ্য হইয়া নিম্নলিখিত নিয়মে জল সিদ্ধ করিয়া রোগীকে পান করিতে দেওয়া উচিত।

পরিষ্কার জল—/৪ সের।
বিল্বপত্র—১০৮ টা।
গোলমরিচ—২৫ টা।

একত্র সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অর্থাৎ একসের অবশেষ থাকিতে নামাইবে। পরে শীতল হইলে পিপাসার সময় উহার একটু একটু পান করিতে দিবে। এই জল যে কেবল রোগীর পিপাসার শান্তির জন্যই দেওয়া হয় তাহা নহে, ইহার পানদ্বারা রোগীর ক্রমশঃ জলপান ইচ্ছারও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু এই জলও দিবসে সিদ্ধ করিয়া রাত্রে এবং রাত্রে সিদ্ধ করিয়া দিবসে পান করিতে দিবে না। বর্ত্তমান সুবিজ্ঞ বহুদর্শী প্রাচীন কবিরাজ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহোদয় এশ্রেণীস্থ অনেক রোগীর সম্বন্ধেই এইরূপ জল পানের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন আবশ্যক মত শুষ্ক মূলা অথবা বেলশুঁঠ সিদ্ধ জলও চিকিৎসক বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে পারেন।

ঠিক্ কত দিন পর্য্যন্ত বাঁধা ঔষধ ব্যবহার করান উচিত, এসম্বন্ধে বলা যাইতে পারে না। কেননা রোগের অবস্থা বুঝিয়া অতি অল্প বা দীর্ঘকালের প্রয়োজন হইতে পারে। তবে একথা নিশ্চিত যে, নিতান্ত

পক্ষে দেড়মাস অর্থাৎ ৪১ দিনের [illegible] প্রায়ই এশ্রেণীস্থ জীর্ণ শীর্ণ রোগীর রোগের প্রকৃত নিরাময় হয় না। বোধ হয় যে, এই জন্যই সকলের ধারণা আছে যে, ৪১ দিনের কমে বাঁধা ঔষধ সেবন করান চলিতে পারে না। কিন্তু আমরা এমন অনেক দেখিয়াছি যে, একমাস বা তাহার কম সময়েও অনেক রোগী রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছে, এবং উক্ত সময়ের অধিক আর তাহাকে ঔষধ দিতে হয় নাই। পক্ষান্তরে এমনও দেখিয়াছি যে, ৪১ দিনে রোগীর রোগের অর্দ্ধেক বই উপশম হয় নাই। সুতরাং সে স্থলে দুই বা আড়াই মাস পর্য্যন্তও বাঁধাঔষধের ব্যবহার করাইতে হইয়াছে। ফলতঃ এসম্বন্ধে চিকিৎসক নিজেই স্থলবিশিষে বিচার করিয়া কার্য্য করিবেন। কেননা এত সামান্য কথাও যাঁহাদিগকে না বুঝাইলে চলিবে না, তাঁহারা যেন এবৃত্তি হইতে দূরে অবস্থিতি করেন।

ক্রমশঃ—

শারীরিক উত্তাপের সহিত ধাতু ও শ্বাসপ্রশ্বাসের সম্বন্ধ।

ধাতু কাহাকে বলে তাহা বোধ করি সকলেই জানেন। শরীরের রক্তবাহিনী ধমনী সমুদয়ের ভিতর দিয়া অনবরতঃ রক্ত চালিত হইতেছে। বক্ষঃস্থলস্থ হৃদয় নামক যন্ত্র সজোরে দমে দমে ঐ সকল ধমনীর ভিতর রক্ত চালাইয়া দিতেছে। সেই দম বড় বড় ধমনীর ভিতর টের পাওয়া যাইতেছে। এই সকল ধমনীকেই ধাতু শব্দে লোকে অভিহিত করে। এই ধাতু বড় বড় ধমনীমাত্রেই হাত দিয়া পরীক্ষা করিলে জানিতে পারা যায়। তন্মধ্যে লোকে সচরাচর হস্তের মনিবন্ধের নিকটের ধমনীতেই ধাতু পরীক্ষা করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন বাহুর ভিতর দিকে পদদ্বয়ের গাঁইটের ভিতর দিকে এবং গলার দুই দিকেও ধাতু পাওয়া যায়। যে সকল ধমনী অপেক্ষাকৃত বড় এবং যাহা বেশী মাংসভেদী নহে অর্থাৎ চর্ম্মের অব্যবহিত নিম্ন দিয়া গমন করিয়াছে, তাহাতেই এই রক্ত চলার দপ্‌দপানি বেশ বুঝিতে পারা যায়। যাহাহউক, কবিরাজ মহাশয়েরা এই ধাতুকে ধাতু বলেন এবং ডাক্তারেরা

পল্‌স বলেন। এই ধাতু পরীক্ষার [illegible] যায়গা হস্তের মণিবন্ধ। এখন এই ধাতের সহিত শারিরীক উত্তাপ ও শ্বাস প্রশ্বাসের বেশ একটা সম্বন্ধ আছে। আমাদিগের সুস্থ শরীরের থার্‌মমিটার দিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করিলে এই উত্তাপ ৯৮°৪ ডিগ্রী হয়। ঐ অবস্থায় শ্বাসপ্রশ্বাস ঘড়ি ধরিয়া গণনা করিলে প্রতি মিনিটে ১৬ হয় এবং নাড়ী প্রতি মিনিটে ৬৪ বার স্পন্দন করে। তাহা হইলেই দেখা গেল যে, আমাদিগের ধাতু. শ্বাসপ্রশ্বাস অপেক্ষা চারিগুণ দ্রুত। তারপর যদি জ্বর প্রভৃতি হইয়া শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, তবে প্রতি ডিগ্রীর উত্তাপ বৃদ্ধির সহিত দশ বার ধাতের স্পন্দন বেশী হয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাস ২½ আড়াই বার বৃদ্ধি হয়। এইটী হইল গড় হিসাব। পাঠক মনে রাখিবেন, এই গড় পড়তা হিসাবটী পূর্ণবয়স্কদিগের পক্ষেই ধরা গেল। কিন্তু চিকিৎসকগণ সচরাচর যদিও উত্তাপ, ধাতু ও শ্বাসপ্রশ্বাসের এইরূপ একটা গড়পড়তা সম্বন্ধ ধরেন, কিন্তু নানাকারণবশতঃ এই সম্বন্ধটী ভাঙ্গিয়া যায়।

যদি রোগী দুর্ব্বল হয় বা স্নায়ুপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট হয়. তাহা হইলে তাহার শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি না হইলেও ধাতু কিঞ্চিৎ দ্রুত হয়। আবার যে সময় ঘড়ি ধরিয়া রোগীর নিশ্বাস গুণিতে আরম্ভ করা যায়, সে সময় হয় ত রোগী স্বাভাবিক ভাবে নিশ্বাস ফেলে না। সে জোরে জোরে ইচ্ছা করিয়া ভাল করিয়া শ্বাসগ্রহণ করে। আবার ডাক্তার পরীক্ষা করিয়াছে জানিতে পারিলেই রোগীর মনে একটু কেমন ভয়সঞ্চার হইয়া তাহার হৃদয়ের ক্রিয়া অল্প দ্রুত হয় এবং ধাতুও অল্প দ্রুত হয়, কিন্তু শারীরিক উত্তাপ সেই একই থাকে। আবার শয়ন অপেক্ষা দণ্ডায়মান অবস্থায় ধাতু কিঞ্চিৎ দ্রুত হইতে পারে। কিন্তু রোগী যে সময় নিদ্রা যায় সে সময় নিশ্বাস ও ধাতের সহিত এই সম্বন্ধটী বেশ টের পাওয়া যায়। আবার রোগী দৌড়াইলে বা অন্য কোন শারীরিক পরিশ্রম করিলে তাহার ধাতু ও শ্বাসপ্রশ্বাস দুইই দ্রুত হয়, কিন্তু শারীরিক উত্তাপ সেই একই থাকে।

ডাক্তার এইচ্ হ্যাণ্ডফোর্ড সাহেব বলেন, যে চল্লিশ বৎসরের অতিরিক্ত বয়সের স্ত্রী ও পুরুষের পক্ষে সচরাচর নাড়ী নিশ্বাস ও ধাতের উপরোক্ত গড়পড়তা সম্বন্ধটী ঠিক থাকে। বলবান পূর্ণবয়স্ক পুরুষের পক্ষেও এইরূপ সম্বন্ধ থাকে। কিন্তু অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এবং যে সকল পুরুষ

পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি অপেক্ষা কম উচ্চ এবং যাহারা স্নায়ুনিদান ধাতুবিশিষ্ট লোক অথবা যাহারা অধিক পরিশ্রম করিয়া দুর্ব্বল হইয়াছে, তাহাদিগের শারীরিক উত্তাপ ৯৮°৪ থাকে বটে, কিন্তু উহাদিগের ধাতু, মিনিটে প্রায় ৭০—৮০ বার স্পন্দিত হয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাস ১৭ হইতে ২০ বিশ অথবা ততোধিক বার হয়। তিনি আরও বলেন যে দশ বৎসরের অতিরিক্ত বয়স্ক বালকদিগেরও নাড়ী পূর্ণবয়স্কদিগের অপেক্ষা দ্রুত বয়।

জ্বর হইয়া শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে যদি কোন যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন না ঘটে, তবে নাড়ী, নিশ্বাস ও উত্তাপের সম্বন্ধটী বজায় থাকে অর্থাৎ প্রতি ডিগ্রী উত্তাপবৃদ্ধির সহিত ২॥ আড়াই বার নিশ্বাস বৃদ্ধি এবং দশ বার নাড়ী বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ডাক্তার হাণ্ডফোর্ড বলেন যে, স্বাভাবিক উত্তাপ অপেক্ষা উত্তাপ কমিয়া গেলে আবার এই সম্বন্ধটী ভাঙ্গিয়া যায়। ৯৮°৪ ডিগ্রীর কম উত্তাপ হইলেই নাড়ী ও নিশ্বাস দ্রুত হইয়া থাকে। ডাক্তার হাণ্ডফোর্ড যে সকল রোগীর পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাদিগের উত্তাপ ৯৬°৬ হইতে ৯৮°৬ মধ্যে হইয়াছিল। কিন্তু কোনস্থানেই তিনি ৬০ বারের কম নাড়ীর স্পন্দন অথবা ১৫ বারের কম শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে দেখেন নাই।

যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন ব্যতীত সোজাসুজি জ্বরে ১০৪ ডিগ্রী বা ১০৫ ডিগ্রীর অধিক শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে আবার এই সম্বন্ধটী ভাঙ্গিয়া যায়। টাইফয়েড্ বা আন্ত্রিক জ্বর প্রথম ১০ বা ১৫ দিনের মধ্যে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় ১০৪° বা ১০৫০ ডিগ্রী উত্তাপ স্থলে নাড়ী ১০০ হয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ২৫ হয়। কোন কোন কঠিন আরক্ত জ্বরে ১০৩ বা ১০৪ শারীরিক উত্তাপ হইলে নাড়ী অত্যন্ত অধিক দ্রুত হয়। এইরূপ নাড়ী দ্রুত হইলে (অর্থাৎ উত্তাপ বৃদ্ধির সহিত নাড়ী বৃদ্ধির সম্বন্ধটী ভাঙ্গিয়া গেলে) রোগ অত্যন্ত কঠিন বলিয়া অনুমান করিতে হইবে।

এইরূপ আন্ত্রিক জ্বর যদি শ্বাসপ্রশ্বাস ও উত্তাপ অপেক্ষা অত্যন্ত দ্রুত হয়, তবে ফুস্ফুসের পীড়া হইয়াছে অনুমান করিতে হইবে।

হৃদ্যন্ত্রের কোন কোন পীড়ায় (হৃদ্ কপাটের পীড়া) উত্তাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা কম হয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হয়, কিন্তু শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হইলেও ২৫ বা ৩০ এর অতিরিক্ত হয় না। ইহার অতিরিক্ত হইলেই বুঝিতে হইবে তাহার হাইপষ্টাটিক্ নিউমোনিয়া বা অপর কোন ফুস্ফুসের পীড়া হইয়াছে।

শিশুচিকিৎসা।

হোমিওপ্যাথিমতে

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯৮ পৃষ্ঠার পর)

১১। শিশুদিগের তড়কা রোগ। পূর্ব্বে চিকিৎসকেরা এ রোগ কঠিন ও ইহার ভাবিফল অতিশয় অশুভ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সৃষ্টি হওয়াবধি এ রোগের সুচিকিৎসা হইলে কুফল কদাচিৎ ফলে। নানা কারণে শিশুদিগের তড়কা হইতে পারে। উ[illegible]লিবর্ণ দিগকে এক স্থানে বর্ণনা না করিয়া যে কারণে উৎপন্ন হইলে যে [illegible]দরে প্রয়োগ হয় ও তাহাদিগের অন্যান্য লক্ষণই বা কি তৎসম্বন্ধে নিম্নে লিখিত হইতেছে।

একোন। জ্বরের অতিশয় উত্তেজনা, গাত্র শুষ্ক ও উষ্ণ, উদ্বেগ, দন্তোদ্গম বা কর্ণ প্রদাহ হেতু পীড়ার উৎপত্তি, হটাৎ চম্‌কে উঠা, শরীরের স্থানে স্থানে পেশীর আক্ষেপ, শিশু তাহার মুষ্টিবদ্ধ হস্ত কামড়ায় ও ক্রন্দন-করে, কোষ্টবদ্ধ অথবা কালো জলের ন্যায় দাস্ত, ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

ইথুসা-সাই।—আক্ষেপের সহিত মোহ, প্রলাপ, চক্ষুগোলক নিম্ন-দিকে ঘুরান, মৃগীর ন্যায় আক্ষেপের সহিত মুষ্টিবদ্ধ করা, মুখমণ্ডল আরক্ত, কনিনীকা প্রশস্ত ও নিশ্চল, মুখে ফেনা, দাঁত লাগা, নাড়ী ক্ষুদ্র, কঠিন ও দ্রুত, অতিশয় দুর্ব্বলতা, শিশুকে বসাইলে মস্তক স্থিরভাবে রাখিতে পারে না ইত্যাদি ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

এগারিকাস। আক্ষেপের সহিত সর্ব্বাঙ্গের কম্পন, জাগ্রতাবস্থায় অনৈচ্ছিক পেশীর গতি হইতে থাকিলে ইহাতে ফল দর্শে।

এমাইল-নাইট্রাইট। তড়কার সহিত মোহ ও গলাধঃকরণে অক্ষমতা, পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার, অনেক ক্ষণ স্থায়ী আক্ষেপ এবং আক্ষেপ অন্তে অতিশয় দুর্ব্বলতা ও সামান্য পরিশ্রমে ঘর্ম্ম; আক্ষেপকালে হাত পায়ের পেশীর অসাড়তা ইহার প্রধান লক্ষণ।

এপিস-মেল।—অতিশয় অস্থিরতা, তড়কা, হাত পায়ের কম্পন

ও উৎক্ষেপ, চিৎকার করা, বালিসের মধ্যে মস্তক খোঁসা ও মস্তিষ্ক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ব্যবস্থা।

আর্ণিকা। পড়িয়া যাওয়ায় বা কোন স্থানের ক্ষত হেতু যে তড়কা হয় তাহাতে উপকারী।

আর্সেনিক। মৃত্যুবৎ অবস্থিতি, দেহ পাণ্ডুবর্ণ কিন্তু উষ্ণ, ক্ষণস্থায়ী শ্বাসাবরোধ অন্তে মুখ মোচড়ান অর্থাৎ প্রথমে একপার্শ্বে পরে অপর পার্শ্বে আকৃষ্ট হওয়া, অবশেষে সমস্ত শরীর প্রচণ্ড বেগে উৎক্ষেপিত হইয়া শ্বাস-প্রশ্বাস ও সংজ্ঞা পুনরাগত হওয়া ইহার প্রধান লক্ষণ।

বেলেডোনা। নিদ্রা হইতে চমকে উঠিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় দৃষ্টি করা, কানীকা প্রসারিত, মস্তক ও হস্তদ্বয় উষ্ণ, চক্ষু ও মুখমণ্ডল আরক্ত, আক্ষেপ অন্তে নিদ্রালুতা, হস্তে অগ্রে আক্ষেপ আরম্ভ হইয়া পরে দেহের আক্ষেপ, আক্ষেপের সহিত মস্তিষ্ক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ব্যবস্থা।

ব্রাইওনিয়া। ঘাম বিলুপ্ত হইয়া যে তড়কা হয় তাহাতে বিশেষ উপকারী।

ক্যামফার। মস্তকের বা বক্ষের শর্দ্দি বিলুপ্ত হইয়া আক্ষেপ উৎপন্ন হইলে ব্যবস্থা।

কষ্ঠিকাম। দেহের উর্দ্ধাংশের আক্ষেপ ও জ্বরের উত্তাপের সময় হাত পা শীতল, নিদ্রাবস্থায় সন্ধ্যাকালে হাত পায়ের আক্ষেপ ও সর্ব্বাঙ্গ বরফের ন্যায় শীতল অনুভব হইলে বিশেষ ফল দর্শে।

ক্যামমিলা। শিশুর দেহ কঠিন হইয়া পশ্চাতে বক্র হয় এবং পদদ্বয় অনবরত বেগে নিক্ষেপ করে ও অস্বাভাবিক স্বরে চিৎকার করে, তড়কার সহিত হাত পা চালনা, মুখ দক্ষিণে ও বামে পর্য্যায় ক্রমে আকৃষ্ট হয়, চক্ষুদ্বয় অনবরত অর্দ্ধোন্মীলিত থাকে এবং একটী গণ্ড আরক্ত অপরটী রক্তশূন্য থাকা ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

সিকিউটাভির। প্রচণ্ড আক্ষেপ আরম্ভ হইয়া মস্তকে হস্তে ও পদদ্বয়ে একেবারে ব্যাপ্ত হয়, হাত পায়ের হঠাৎ উৎক্ষেপ, সর্ব্বাঙ্গে দৃঢ় হইয়া একপার্শ্বে বক্র হওন, শিশু সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় থাকিতে থাকিতে হঠাৎ উহার সর্ব্বাঙ্গ দৃঢ় হইয়া পুনরায় শিথিল হয়, সর্ব্বাঙ্গের আক্ষেপ সামান্য

কারণে, যথা স্পর্শ করিলে, লইয়া বেড়াইলে বা কথা কহিলে পুনরায় উৎপন্ন হয়। কৃমিজনিত আক্ষেপ হওয়া ইহার প্রধান লক্ষণ।

সিমিসিফিউগা। শিশু রাত্রে হঠাৎ জাগ্রত হইয়া ভয়সূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং হাত পা কাঁপাইতে থাকিলে ইহাতে আরোগ্য হইবে।

সিনা। রুগ্ন দুর্ব্বল শিশুদিগের আক্ষেপ, নড়িলে বা অন্য কেহ স্পর্শ করিলে সর্ব্বাঙ্গে বেদনা অনুভব করে, প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় এবং আহার অন্তে পীড়ার বৃদ্ধি, রাত্রে আক্ষেপ, হাত পা ছুড়িয়া ফেলা, আক্ষেপ কালীন হঠাৎ সর্ব্বাঙ্গ দৃঢ় হইয়া পরক্ষণে কাঁপিতে থাকে, ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ হয় এবং কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতে থাকে, আক্ষেপ কালীন কণ্ঠে ও উদরে বোতল হইতে জল পতন কালীন যেমত শব্দ হয়, সেই প্রকার শব্দ অনুভূত হইলে বিশেষ উপকার দর্শিবে।

কফিয়া। দন্তোৎগম কালীন তড়কা, দন্তঘর্ষণ, আক্ষেপ অন্তে দেহ শীতল হয়, দুর্ব্বল শিশুদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

কুপ্রাম। দন্তোৎগমহেতু আক্ষেপ, আক্ষেপের অগ্রে শ্লেষ্মা বমন, স্থানীয় আক্ষেপ, অঙ্গুলির অগ্রভাগে অগ্রে প্রকাশ হয়, শিশু উবুড় হইয়া থাকিয়া আক্ষেপ সহকারে পাছা ঊর্দ্ধে উঠায়, আক্ষেপ অন্তে শিশু চিৎকার করে এবং পুনরায় আক্ষেপ হওয়া পর্য্যন্ত দেহ ইতস্তত নিক্ষেপ করা ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

হেলিবোরাস। স্তন্যপায়ী শিশুদিগের আক্ষেপের সহিত সর্ব্বাঙ্গ শীতল হওন, প্রস্রাব গাঢ় রক্তবর্ণ এবং রাখিলে নিম্নে স্তর পতিত হয়, মস্তকে অসহনীয় বেদনা অনুভবহেতু ঐ স্থানে পুনঃ পুনঃ হাত দেওয়া দৃষ্ট হইলে ব্যবস্থা।

হায়সায়ামাস। আহারান্তে তড়কা, বিবমিষা ও বমন, হঠাৎ চিৎকার করিয়া অজ্ঞান হওয়া, হাত পায়ের উৎক্ষেপ, অধিকক্ষণ স্থায়ী আক্ষেপ এবং মুখে ফেনা উৎপন্ন হওয়া ইত্যাদিতে ফল দর্শে।

ইগ্নেসিয়া। প্রত্যহ এক সময় আক্ষেপ হেতু চিৎকার করা এবং সর্ব্বাঙ্গ প্রচণ্ড বেগে কম্পন, কোন এক অংশের আক্ষেপ, আক্ষেপের অগ্রে

ব্যগ্রতা সহকারে জলপান, ভয়হেতু অঙ্গগ্রহ, দন্তোদ্গম কালে আক্ষেপ, মুখে ফেনা দৃষ্ট হওয়া ও পদদ্বয়ের বেগে চালনা ইত্যাদিতে ব্যবস্থা।

হিপার স্যাল্‌ফার। প্রসবকালীন মস্তকে অতিরিক্ত চাপ লাগায় আভিঘাতিক তড়কায় ইহা প্রধান ঔষধ।

ইপিকা। আক্ষেপের অগ্রে বা আক্ষেপকালীন অতিশয় বিবমিষা ও বমন, শিশু আক্ষেপ সহকারে এক পার্শ্বে আকৃষ্ট হয়, দেহ ও হস্তপদাদি দৃঢ় ও সম্পূর্ণ প্রসারিত, মধ্যে মধ্যে উহাদিগের উৎক্ষেপ, গুরুপাক দ্রব্য সেবনে বা স্ফোটক বিলুপ্ত হইয়া যে আক্ষেপ উৎপন্ন হয়, তাহাতে বিশেষ উপকার হওয়ার সম্ভব।

ক্রিয়োজোট। দন্তোদ্গম কালে নাড়ী স্ফীত হইয়া আক্ষেপ; অতিশয় অস্থিরতা, রাত্রে অনবরত চিৎকার, দন্তোদ্গম হেতু বায়ু নলীর উগ্রতা, দন্ত যেমন বাহির হয় তেমনি ক্ষয় হইয়া যায়; কর্ণশূল ইত্যাদি ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

লরোসিরেসাস। আক্ষেপের পূর্ব্বে ও আক্ষেপ কালীন শ্বাসকৃচ্ছ্র, দেহ ঈষৎ নীলবর্ণ, ভয়হেতু আক্ষেপ, আক্ষেপ অন্তে শীত অনুভবে ব্যবস্থা।

লাইকোপোডিয়াম। উদরে বায়ু আবদ্ধ হওয়ায় আক্ষেপ; আক্ষেপের সহিত চিৎকার ও মুখে ফেনা হওয়া, জ্ঞান লোপ এবং হাত পা ইতস্তত নিক্ষেপ করা ইহার প্রধান ঔষধ।

মার্ক-সল। আক্ষেপের সহিত ক্রন্দন, দেহ কঠিন, উদর স্ফীত, কণ্ঠ ও নাসিকা কুঞ্চন ও লালাস্রাববন্ধ হইয়া পীড়ার উৎপত্তি, রাত্রে বৃদ্ধি হইলে ব্যবস্থা।

নক্স-ভমিকা। অপাক হেতু আক্ষেপ, মাতার গুরুপাক দ্রব্য সেবন, মানসিক উত্তেজনা ও রাগহেতু সন্তানের পীড়া, উহাকে স্পর্শ করিলে আক্ষেপ উৎপন্ন হয় এবং আক্ষেপ অন্তে গাঢ় নিদ্রা যাওয়া ইহার প্রধান

ওপিয়াম। মাতার ভয় বা রাগহেতু পীড়ার উৎপত্তি, শিশুর নিকটে অপরিচিত লোক গেলে পীড়ার আক্রমণ, আক্ষেপের পূর্ব্বে চিৎকার, আক্ষেপ অন্তে গাঢ় নিদ্রা বা মোহবৎ নিদ্রায় ইহা প্রধান ঔষধ।

সিলিসিয়া। শুক্লপক্ষে রাত্রে পীড়ার উৎপত্তি, টীকা দেওয়ার পর আক্ষেপ, আক্ষেপের পূর্ব্বে বামপার্শ্ব শীতল হওয়া ও বাম বাহুর স্পন্দন বা কম্পন দৃষ্ট হইলে উপকার দর্শে।

ষ্টেনাম। দন্তোদ্গমকালীন কৃমিজনিত আক্ষেপ, সিনার লক্ষণ অপেক্ষা গুরুতর উপসর্গে যথা অধিক উত্তেজনা, অধিক ভয় এবং অধিক মস্তিষ্ক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইহাই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ষ্ট্রামোনিয়াম। হাত পা ইতস্তত নিক্ষেপ, মলমূত্র অজ্ঞাতসারে নিঃসরণ, নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া যে কোন পদার্থ দেখিয়া বোধ হয় যেন ভয়ে চম্‌কে উঠে, শিশুর গাত্র স্পর্শ করিলে অথবা কোন উজ্জ্বল পদার্থ দেখিলে পুনরায় আক্ষেপ আরম্ভ, আক্ষেপ সহকারে মস্তক ইতঃস্তত নিক্ষেপ করা, প্রচুর মূত্রস্রাব, নাক ডাকিয়া গাঢ় নিদ্রা, মুখাকৃতি রক্তশূন্য ও ক্লান্তি-সূচক, জলে ঘৃণা কিম্বা ভয় হওয়া ইহার প্রয়োগ লক্ষণ। ভয় পাইয়া কিম্বা কোন প্রকার স্ফোট প্রকাশ হইতে না পারায় অথবা বিলুপ্ত হইয়া যে তড়কা প্রকাশ হয়, তাহাতে ইহাই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সাল্‌ফার্। বহুকাল স্থায়ী পীড়া কোন ঔষধে আরোগ্য না হইলে এবং স্ফোট বিলুপ্ত হইয়া উৎপন্ন রোগে সালফার প্রধান ঔষধ। প্রত্যূষে অপাক দাস্ত, আক্ষেপ অন্তে চিত্ত প্রফুল্ল থাকা ও প্রচুর পরিমাণে সাদা মূত্র ত্যাগ হওয়া ইহার প্রয়োগ লক্ষণ। আরক্ত জ্বরে স্ফোট সকল প্রকাশ-কালীন উৎপন্ন হইলেও ইহাতে আরোগ্য হইবে।

টার্টার-এমেটিক। স্ফোট বিলুপ্ত হইয়া রোগ উৎপত্তি, ত্বক রক্ত-শূন্য ও শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট থাকিলে ইহাতে বিশেষ ফল দর্শিবার সম্ভব।

ভেরাট্রম-ভিরাইড। ধমনির (পরিষ্কৃত রক্তবহা নলির) প্রচণ্ড উত্তেজনা, আক্ষেপ কালীন পৃষ্ঠদেশ বক্র হইয়া উর্দ্ধে উঠা এবং উদরাময় হেতু অতিশয় কৃশ শিশুদিগের ইহাই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

জিঙ্কাম। নিদ্রাবস্থায় চিৎকার করা বা চম্‌কে উঠা, জাগ্রত হইলে মুখের ভাব পরিবর্ত্তন ও মস্তক এপাশ ওপাশে নিক্ষেপ করা, স্থানের স্থানের পেশির স্পন্দন ও আক্ষেপ, বিশেষ দক্ষিণাঙ্গের অধিক, খিট্‌খিটে উগ্র স্বভাব, ক্ষুধার প্রখরতা; উদর স্ফীত, অনৈচ্ছিক মূত্র ত্যাগ ইত্যাদি ইহার প্রয়োগ

লক্ষণ। দন্তোদ্গমকালে যে সকল পীড়া হয়, তাহাতে বিশেষ উপকার হওয়ার সম্ভব।

উপরোক্ত ঔষধ সকলের ১২ কিম্বা ১৮ ক্রমের ১ টি অথবা ২ টি বটিকা অবস্থা ক্রমে দিবসে দুই তিনবার সেবনে আরোগ্য হইবে।

স্তন্যপায়ী শিশুদিগের এ অতি গুরুতর পীড়া। তড়কার উৎপত্তি কারণ নানাবিধ। উহা ঔষধের প্রয়োগ লক্ষণের মধ্যে কতক কতক দেওয়া হইয়াছে। পুনরায় চতুর্থাবস্থায় অর্থাৎ দন্তোদ্গম কাল হইতে যে সকল পীড়া ঘটে, তাহার মধ্যে স্তন্যপায়ী শিশুদিগের পীড়া গুলির চিকিৎসা যাহা এস্থলে দেওয়া হইল, তাহা আর পুনরায় সেস্থলে উল্লেখ না করিয়া কেবল তাহাদিগের উৎপত্তি কারণ ও লক্ষণ যথাসম্ভব দেওয়া হইবে। যেহেতু পীড়ার চিকিৎসা সকল অবস্থাতে একপ্রকার, ইহাতে কালাকাল ভেদ নাই।

ক্রমশঃ—

কলিকাতা। } শ্রীশিখরকুমার বসু, এল, এম্, এস্।
পৌষ } হোমিওপ্যাথিক্ প্রাক্টীসনার

ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী।

(কবিরাজী-মতে)

রসপর্পটী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭৮ পৃষ্ঠার পর)

গন্ধক,—নবনীতাখ্য গন্ধক সর্ব্বপ্রকার গন্ধকের চেয়ে ভাল। ইহার চলিত নাম আমলাসাগন্ধক। পর্পটীকার্য্যে এই গন্ধক ব্যবহার করার উপদেশ আছে। আমলাসা গন্ধকের স্বরূপতত্ব আগে বলিয়াছি; পর্পটীকার্য্যে কেমন করিয়া শোধন করিয়া লইতে হয়, তাই এখন বলিব।

একখানি পরিষ্কার দৃঢ় পাথরে কি খলে গন্ধক রাখিয়া নুড়ি দিয়া ঠুকিয়া ঠুকিয়া চূর্ণ করিবে; মাড়িয়া গুঁড়া করিবে না। চূর্ণগুলি তণ্ডুলকণা অর্থাৎ ক্ষুদের আকার দাঁড়াইবে। এইরূপে চূর্ণীভূত গন্ধক ভৃঙ্গরাজ রসে ভাবনা দিতে হইবে। রসপর্পটীকার্য্যে প্রয়োজনীয় গন্ধক, চক্রপাণি দত্ত তিনবার

ভাবিত করিতে বলেন। কোন কোন গ্রন্থে, ভৃঙ্গরাজ স্বরসে ভাবনা দিতে হইবে এইমাত্র বলা হইয়াছে; কতবার ভাবনা দিতে হইবে, তাহা বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই। কাজেই সাতবার দিতে হয়। অনুক্তস্থলে সাতবার ভাবনা দেওয়া পরিভাষার ব্যবস্থা। ভৃঙ্গরাজরসে ভাবনা দিলে গন্ধকে কি আসে এবং গন্ধকের কি যায় তাহা যখন আপাততঃ পাঠকবর্গকে বুঝাইতে পারিতেছি না, তখন ৩ বার দেওয়া ভাল কি সাতবার দেওয়া ভাল তদ্বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা যাইতে পারে না। তিনবার ভাবনা দিয়া লইলেও কার্য্য চলিবে; সাতবার দিয়া লইলেও ক্ষতি নাই। আমরা উভয় প্রকারে ভাবনা দিয়া দেখিয়াছি, ফলের কোন তারতম্য বুঝিতে পারি নাই।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারের চূর্ণীভূত গন্ধক, একখানা কাচের কি মসৃণ পাথরের বা তাদৃশ কোন অধাতব ভাজনে রাখিয়া (১) এমত পরিমাণ ভৃঙ্গরাজের স্বরস দিবে, যেন তাতে গন্ধক চূর্ণ আপ্লুত মাত্র হয়। তারপর রৌদ্রে দিয়া শুষ্ক করিবে। বেশ শুকাইয়া গেলে আবার রস দিবে, আবার শুকাইবে। এইরূপে তিনবার বা সাতবার ভাবনা দিতে হইবে। ভাবনা দেওয়া শেষ হইলে, পরিষ্কার জল দিয়া কচলাইয়া ধুইয়া লইতে হয়। যতক্ষণ ময়লা জল বাহির হয়, ততক্ষণ ধরিয়া ধৌত করা বিধেয়। তারপর রৌদ্রে সুশুষ্ক করিয়া বেশ চূর্ণ করিয়া লইবে। সাবধান গন্ধকে যেন জলীয়াংশ আদৌ না থাকে।

এখন এইরূপ গন্ধকের গুড়া পরিষ্কার লৌহার হাতায় রাখিয়া নির্ধূম অসারাগ্নির মৃদু সন্তাপে গালাইয়া লইবে। যেই মাত্র দ্রবীভূত হইবে, অমনি দ্রুতহস্তে কোন পাত্রস্থিত ভৃঙ্গরাজ স্বরসে ঢালিয়া দিবে। গলিয়া গেলে কদাচ বিলম্ব করিবে না। সাবধান যেন ধুঁয়াইয়া না যায়। যে পাত্রে ভৃঙ্গরাজ রস থাকিবে, সেটী অধাতব হওয়া উচিত এবং তাহার মুখে ঘৃতাক্ত পরিষ্কার বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া লইবে। দ্রবীভূত গন্ধক বস্ত্র-খণ্ডের উপর ঢালিয়া দিতে হয়। কিছুক্ষণ পরে ভৃঙ্গরাজ রস হইতে কঠিনীভূত গন্ধক উঠাইয়া লইয়া উষ্ণজলে সুধৌত করিয়া, তারপর রৌদ্রে খুব ভাল করিয়া শুখাইয়া চূর্ণ করিয়া লইবে।

---

(১) তন্ত্রচন্দ্রিকায় লৌহভাজনে রাখিয়া ভাবনা দিবার উপদেশ আছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শোধিত পারদ এবং এই প্রকারে শোধন করা গন্ধক, তুল্য পরিমাণে লইয়া মাড়িতে থাকিবে। কাজলের মত হইয়া আসিলে যেমন চট্ ধরিতে আরব্ধ হইবে, অমনি ক্ষান্ত দিবে—আর মাড়িবে না। এইরূপে সুসাধিত কজ্জলী গুছাইয়া রাখিয়া দিবে।

এদিকে শুষ্ক বদরকাষ্ঠ পোড়াইয়া নির্ধূম জ্বলদঙ্গারের কুণ্ড প্রস্তুত করিবে। অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে টাট্‌কা গোবরের একটি ক্ষুদ্র বেদিকা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি জালিকলার পাত পাতাইয়া রাখিবে। এবং কোমল কদলী পত্রে গোময় রাখিয়া একটী পোট্টলী প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। তার-পর একখানি পরিষ্কার লোহার হাতায় অল্প পরিমাণ গব্য ঘৃত অঙ্গুলি দ্বারায় লাগাইয়া তাতে কজ্জলী দিয়া অগ্নিকুণ্ডের উপর ধরিবে। এবং একখানি লৌহখুন্তি দ্বারা নাড়িয়া চাড়িয়া গলাইয়া লইবে। যেই মাত্র কজ্জলী গলিয়া দ্রবীভূত হইয়া যাইবে, তখনই সদ্যো-গোময়-নিহিত কদলী-দলোপরি ঢালিয়া কদলীপত্রবদ্ধ গোময় পোট্টলি দিয়া চাপিয়া ধরিবে। হাতায় যাহা লাগিয়া থাকিবে অথচ খুন্তি দ্বারা যুগপৎ কাঁকিয়া দেওয়া না যাইবে, কঠিনীভূত সেই অংশ আর গ্রহণ করিবে না।

রসপর্প্পটী প্রস্তুতপ্রস্তাবে আরও কিছু কিছু বলিবার আছে,—বলা হইয়াছে, তুল্য পরিমাণে রসগন্ধক লইয়া কজ্জলী করিবে, কিন্তু যদৃচ্ছাক্রমে উভয় দ্রব্য তুল্য পরিমাণে গ্রহণ করা যাইবে, অথবা তোলক, কর্ষ কি মনি একটা অবচ্ছিন্ন পরিমাণে গ্রহণ করিতে হইবে? একথার কোন মীমাংসা করা হয় নাই। যে সকল গ্রন্থে রসপর্প্পটীনির্ম্মাণ বিধান উক্ত আছে, তত্তৎ গ্রন্থে কোন অবচ্ছিন্ন পরিমাণের উল্লেখ নাই; "তুল্যতা কার্য্যা" ইত্যাদি রূপ উপদেশই দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে এই বুঝায় যে, যেমন প্রয়োজন তদনুসারে তুল্য পরিমাণে পারা এবং গন্ধক লইয়া কজ্জলী করিবে। কিন্তু টীকাকারদিগের মধ্যে কেহ কেহ মানাবধারণ করিয়া দিয়াছেন। চক্রপাণি দত্তকৃত সংগ্রহের টীকাকার শিবদাস, কর্ষ অর্থাৎ ২ তোলা পরিমাণে প্রত্যেক দ্রব্য গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন। তদুপদেশে রসগন্ধক কর্ষ কর্ষ পরিমাণে গ্রহণ করাই বিহিত এবং তাহাই প্রচলিত নিয়ম। তবে আবশ্যক অনুসারে তন্যূন বা তদধিক মাত্রায় রসগন্ধক গ্রহণ করিয়া কাজ করিলে নিষ্ফল হইবে এমত নহে।

দ্বিতীয় কথা।—পাককালে প্রস্তুতীকৃত সমুদয় কজ্জলী এককালীন দ্রবীভূত করিয়া কদলীদলোপরি ঢালিয়া পর্পটী প্রস্তুত করিবে, অথবা অল্প অল্প লইয়া পাককার্য্য সমাধা করিবে? অত্যধিক মাত্রায় কজ্জলী লৌহদর্ব্বিকায় রাখিয়া পাক করা সুবিধাজনক নহে। সুনিপুণ হস্তে এরূপ কার্য্য দুরূহ নহে বটে; কিন্তু অধিক পরিমাণ কজ্জলী সমভাবে আবর্ত্তন করা—কতক আগে গলিল, কতক তার পর গলিল, কিছু বা পাশে লাগিয়া রহিল এমন না হয় এরূপ ভাবে কাজ করা সকল হাতে হয় না। তাই যথানিয়মে প্রস্তুতীকৃত কজ্জলীর এক চতুর্থাংশ কি এক অষ্টমাংশ এক একবার গ্রহণ করিয়া গালাইয়া পর্পটী প্রস্তুত করাই ভাল; এরূপ করিলে বিশেষ কোন দোষ দেখা যায় না। যেহেতু কজ্জলীর কৃৎস্নাবয়বে রস গন্ধক তুল্য ভাগে থাকে। পরন্তু এই ভাবে পাক করিলে পর্পটী বেশ পাতলা হয়। এবং তাতে বিভাজনও সেবন সকল দিকেই সুবিধা। কিন্তু সমুদয় কজ্জলী যুগপৎ দ্রব করিয়া প্রশস্ত বেদিকায় ঢালিয়া প্রশস্ত গোময় পোট্টলীর চাপে পর্পটী প্রস্তুত করাই শ্রেষ্ঠকল্প। যথন এই সমুদয় ঔষধের উপাদান বিশ্লেষ করিয়া রাসায়নিক তত্ত্ব-ব্যাখ্যা করিব, তথনই উভয়প্রকারে প্রস্তুতীকৃত পর্পটীর মুখ্যকল্পতা এবং গৌণকল্পত্ব বুঝা যাইবে।

তৃতীয় কথা।—পর্পটী সুসিদ্ধির লক্ষণ কি? কথিত আছে, পর্পটীর পাক ত্রিবিধ;—মৃদু, মধ্য এবং খর। মৃদু ও মধ্যপাকের পর্পটী ব্যবহার্য্য, পাক খর হইলে পরিত্যাগ করিবে। খরপাকের পর্পটী ব্যবহারে অহিত ভিন্ন উপকার পাওয়া যায় না। খরপাকের পর্পটী রুক্ষ, কৃষ্টচ্ছবিবিশিষ্ট এবং বড় ভঙ্গপ্রবণ—টিপিলে ভর সহে না, খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। ভাঙ্গিলে অভ্যন্তরভাগেও রুক্ষকৃষ্ণবর্ণ দেখা যায়। মৃদু ও মধ্যপাকের পর্পটীর বর্ণ স্নিগ্ধ, কৃষ্ণ এবং তদুপরি ময়ুর পুচ্ছের অস্পষ্ট আভার ন্যায় চিহ্ন দেখা যায়। ভাঙ্গিলে সদ্যোভঙ্গ ইস্পাতের অভ্যন্তরের বর্ণের ন্যায় রং দেখা দেয়। মধ্যপাকের পর্পটী একটু জোরে ভাঙ্গে, মৃদুপাকের পর্পটী ভাঙ্গিতে তার চেয়ে আরও একটু জোর লাগে।

রসপর্পটীর প্রস্তুপ্রণালী বলা হইল, এক্ষণে স্বর্ণপর্পটী প্রভৃতি কয়েকটী পর্পটীর প্রস্তুতপ্রণালী বলিয়া সর্ব্বশেষে সমুদয়ের ক্রিয়া ও প্রয়োগ প্রণালী বলিব।

স্বর্ণপর্পটী।

শোধিত পারদ ৮ তোলা, জারিত সুবর্ণ ১ তোলা এবং শোধিত পরিশুষ্ক গন্ধকচূর্ণ ৮ তোলা। এই দ্রব্য ত্রিতয়যোগে স্বর্ণপর্পটী প্রস্তুত হয়। প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ;—প্রথমতঃ পারদ শোধন করিয়া লইবে। ঔষধ প্রস্তুত করিতে ৮ তোলা পরিমিত পারদের আবশ্যক; শোধনার্থ তদধিক মাত্রায় গ্রহণ করিতে হইবে। শোধন প্রক্রিয়ায় পারার কতক অংশ অপচয় হইয়া যায়, কাজেই কিছু বেশী করিয়া লইতে হয়। দশ তোলকপরিমিত পারা লইলেই চলিতে পারে। যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া মল, শিখী এবং বিষ নামক পারদের নৈসর্গিক দোষত্রয় নষ্ট করিতে হয়, রসপর্পটী প্রকরণে তাহা বলা হইয়াছে। এ স্থলেও অগ্রে সেই সেই প্রক্রিয়া অবলম্বনে মল, শিখী ও বিষ দোষ নষ্ট করিয়া লইবে। তার পর রসোনের স্বরস যোগে পারদ চারিপ্রহরকাল মর্দ্দন করিয়া পরিষ্কার জলে ধুইয়া লইবে। তদনন্তর রোদ্রে সুশুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। সংক্ষেপতঃ এই প্রকারে পারা শোধন করিয়া লইলে কাজ চলিতে পারে। মর্দ্দন, মূর্চ্ছন, স্বেদন এবং উর্দ্ধপাতন প্রভৃতি পারদের আনুপূর্ব্বিক শোধন ক্রমে অবলম্বন করিয়া লওয়াই শ্রেষ্ঠকল্প। সে সকল প্রক্রিয়ার পরিচয় পরে দিব।

পারদ শোধন করা হইলে, গন্ধক শোধন করিয়া লইবে। রসপর্পটী প্রকরণে যেরূপে গন্ধক শুদ্ধির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, এস্থলেও তদ্রূপে শোধন করিবে।

এখন ২ তোলা শোধিত পারদের সহিত ১ তোলা জারা সোনা মিশ্রিত করিয়া পরিষ্কার দৃঢ় পাথরের খলে মর্দ্দন করিবে। যদি সোনায় পারায় মিশিতে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ আমরুলীর স্বরস দিয়া মর্দ্দন করিবে, তাহা হইলে সত্বর মিশিয়া যাইবে। যখন উভয় দ্রব্য একীভূত হইয়া যাইবে এবং গোলক বাঁধিবার উপযোগী হইবে, তখন পরিষ্কার জলে বেশ করিয়া ধুইয়া নির্জ্জল করিয়া লইবে। তারপর অবশিষ্ট ৬ তোলা পারা মিশাইয়া শোধিত গন্ধকের শ্লক্ষ্ণ চূর্ণ ৮ তোলা দিয়া পরিষ্কার লৌহ খল্লে লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। কজ্জলী

সুসিদ্ধ হইলে রসপর্পটী প্রস্তুতক্রমে অবলম্বন করিয়া পর্পটী প্রস্তুত করিবে। ক্রমশঃ—

মাগুরা।
বারুইপাড়া পোঃ
(খুলনা)
কবিরাজ শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কবিরত্ন।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

বৈদ্যশাস্ত্র-শিক্ষার্থী পাঠকবর্গের পক্ষে শীতল বাবুর লিখিত প্রবন্ধ যে কত দূর উপযোগী হইতেছে, সে বিচার পাঠকবর্গই করিবেন। আমাদের কিন্তু তাঁহার লেখার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস দিন দিন বাস্তবিকই অধিকতর বৃদ্ধি পাইতেছে। চি, স, স।

তৈলপাক ও প্রয়োগপ্রণালী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭৯ পৃষ্ঠার পর)

মনে মনে বড়ই আশা করিয়াছিলাম যে, এদেশীয় ও বঙ্গদেশীয় এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তৈলপাকসম্বন্ধে যে মতভেদ চলিয়া আসিতেছে, তাহার মীমাংসা চিকিৎসা-সম্মিলনীর সুযোগ্য লেখক বা পাঠক মহোদয়গণ কর্ত্তৃক নিঃসন্দেহরূপে মীমাংসিত হইবেক। কিন্তু নিতান্তই দুঃখ ও লজ্জার বিষয় এই যে, আজ্ ৩। ৪ মাস অতীত হইতে চলিল, সম্মিলনীর এ হেন বিজ্ঞ-বিচক্ষণ কবিরাজগণ ইহার লেখক ও পাঠকরূপে বর্ত্তমান থাকাসত্ত্বেও এপর্য্যন্ত সে সম্বন্ধে কিছুমাত্রই মীমাংসা হইল না। মীমাংসা দূরে থাকুক, কেহ এবিষয়ে কর্ণপাত পর্য্যন্তও করিলেন না। যাহাহউক, এবিষয়ে আমাদের যাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্থির আছে এবং গুরুর নিকট যেরূপ উপদেশ পাইয়াছি, তাহাই এস্থলে বর্ণন করিতেছি।

মূর্চ্ছাপাকের পর অগ্রেই তৈলে কল্কপাক দেওয়া উচিত? কি অগ্রে ক্বাথ-পাক দিয়া পরে কল্কপাক দেওয়া উচিত? শাস্ত্রকে মধ্যস্থ রাখিয়া এ দুরূহ

প্রশ্নের ঠিক্ মীমাংসা করা বড় সহজ কথা নহে। কেন যে সহজ নহে, তাহা বলি। মনে কর স্নেহপাক (ঘৃত তৈলপাক) সম্বন্ধে বৈদ্যশাস্ত্রে যেখানে যত উপদেশ আছে, তাহাতে স্পষ্টতঃ এমন কোন স্থলে কিছুই লেখা নাই যে, যদ্দ্বারা নিশ্চয়ই বোঝা যায় যে, মূর্চ্ছাপাকের পর অগ্রেই ক্বাথ বা কল্কপাক করিতে হইবেক। তবে গুরূপদেশ এবং উভয় মতাবলম্বী কবিরাজ-মহাশয়-দিগের দ্বারা প্রস্তুত তৈলঘৃতের ব্যবহার দ্বারা ফলাফলের তারতম্যানুসারে যেন কতকটা ধারণা করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য যে, সেই বিশ্বাস ও ধারণাবলে আমি নিজে একথা খুব সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে, মূর্চ্ছা-পাকের পরেই তৈলের কল্কপাক দিয়া এবং তদবস্থায় কিছু দিন রাখিয়া কল্কগুলি তৈলের সহিত বেশ করিয়া পচিয়া আসিলে পরে তাহাতে ক্রমান্বয়ে ক্বাথ ও দুগ্ধাদির পাক দিলে সেই তৈল দ্বারা যতদূর উপকারের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, পক্ষান্তরে মূর্চ্ছাপাকের পরে ক্বাথাদির পাক দিয়া শেষে কল্কপাক দিয়া প্রস্তুত তৈল ঘৃত দ্বারা যেন সেরূপ উপকার কোন মতেই সম্ভবে না। কেন সম্ভবে না এ সম্বন্ধে আমি সাধারণতঃ দুইটী প্রধান যুক্তি দেখিতে পাই—প্রথমতঃ মূর্চ্ছাপাকের পর অগ্রে কল্কপাক দিয়া যদি কিছু দিবস তৈলটী রাখা যায়, এবং তাহার পর সেই কল্কগর্ভস্থ তৈলেই ক্বাথপাক করা যায়, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে কল্কের সারভাগ তৈলে যতদূর প্রবেশ করিয়া তৈলকে যে অধিকতর গুণশালী করিতে পারে, ইহা নিঃসন্দেহ। কেন না মূর্চ্ছাপাক, ক্বাথপাক বা গন্ধপাক প্রভৃতি সকল পাক অপেক্ষা কল্কপাকই তৈলের জীবনস্বরূপ। যেহেতু স্থলবিশেষে ক্বাথাদি পাককে উপেক্ষা করিয়া কেবল কল্কপাক দ্বারাই তৈলঘৃতের পাক সমাধার নিয়ম আছে। কিন্তু কল্কপাক উপেক্ষা করিতে কোন স্থলেই দেখা যায় না। ফলতঃ আমার এ সম্বন্ধে যতদূর বিশ্বাস, আমি সেই বিশ্বাসবলেই এ কথা লিখিলাম, তবে যদি এখনও কোনও সুযোগ্য পাঠক অগ্রে ক্বাথ-পাকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে পারেন, সারবান্ হইলে সে কথা অবশ্যই শিরোধার্য্য করিব। আমার ২য় কথা, তৈলের ব্যবহার দেখিয়া অর্থাৎ আমি নিরন্তরই উক্ত উভয় সম্প্রদায়ের কবিরাজ মহাশয় দ্বারা প্রস্তুত তৈল ঘৃতের ব্যবহার দেখিয়া আসিতেছি। কিন্তু এমন শত শত স্থলে বেশ মনঃসংযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, যে ভয়ঙ্কর

বাতরোগী পশ্চিমদেশীয় বৈদ্যকর্ত্তৃক প্রস্তুত মহামাষ তৈল অনবরতঃ ২। ৩ মাস পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া বিন্দুমাত্র উপকার প্রাপ্ত হয় নাই, সেই রোগীই পূর্ব্বদেশীয় কবিরাজের সেই মহামাষ তৈল সপ্তাহব্যবহারেই আশ্চর্য্য উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। অধিক দিনের কথা নহে,—একটী শিরঃ-পীড়া (আধ কপালে মাথা ধরা) গ্রস্ত রোগী এই কলিকাতাস্থ একজন এ দেশীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজের নিকট ক্রমাগত ১৫। ১৬ দিন ষড়বিন্দু তৈল ব্যবহার করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাহাতে তাঁহার কিছু-মাত্রও উপকার হয় নাই। কিন্তু অবশেষে রোগী এই সহরস্থ বঙ্গদেশীয় একজন কবিরাজের নিকট হইতে সেই ষড়বিন্দু তৈল লইয়া ৩। ৪ দিন ব্যবহারেই সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেন। কেবল যে, ২। ৪টী দৃষ্টান্ত দেখিয়াই আমার এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তাহা নহে, আমি অনেক দিন হইতে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া অনেক অনেক রোগীর সম্বন্ধেই এইরূপ ফলাফল দেখি-য়াছি। এবং দেখিয়াছি বলিয়াই নিতান্ত সরলভাবে আজ্ তাহা লিখিতেছি। আশা করি, পাঠকগণ যেন আমাকে সাম্প্রদায়িকশ্রেণীতে স্থানদান না করেন। অতঃপর দেখা যাউক—মূর্চ্ছাপাকের পর কিরূপে কিভাবে কল্ক-পাক করা উচিত!

কল্কপাক।

মূর্চ্ছাপাকের পর কটাহস্থ তৈলকে কিছুদিবস তদবস্থায় যে রাখিতে হয়, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অতএব কল্কপাকের সময় তৈল হইতে মূর্চ্ছাপা-কের সেই মঞ্জিষ্ঠাদি দ্রব্য উত্তমরূপে ছাকিয়া ফেলিয়া উত্তমরূপে কুট্টিত অথবা শিলায় পেষিত কল্কদ্রব্য তৈলে প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিতে থাকিবেক। কল্কদ্রব্যের মাত্রা সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, তৈল ঘৃত যত পরিমাণে লওয়া হইবে, কল্কদ্রব্য সমুদয়ে মোট তাহার সিকিভাগ লইতে হইবেক। অর্থাৎ তৈল বা ঘৃতের পরিমাণ /৪ সের হইলে কল্কদ্রব্য মোট /১ একসের লওয়া আবশ্যক। এবং জল, ঘৃততৈলের চতুর্গুণ অর্থাৎ ১৬ শের দিয়া পাক করিবে। পরন্তু পাককালে কিঞ্চিৎ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তদবস্থায় কিছু দিবস রাখিয়া দিবে। যেহেতু এইরূপে কিছু দিবস রাখিলে

কল্কদ্রব্য পচিয়া তৈলটী অধিক গুণশালী হইয়া থাকে। কল্কপাকের পরেই ক্বাথপাক, তাহা আগামী বারে বলিব। ক্রমশঃ—

পৌষ। } শ্রীজগদ্বন্ধু সেন গুপ্ত কবিরাজ।
কলিকাতা।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

লেখক এবারকার প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া প্রথমেই কবিরাজ মহাশয়-দিগের ব্যবহারের উপর কিছু দুঃখ জানাইয়াছেন। তা দুঃখ করিবারই কথা বটে, কেননা চিকিৎসাসম্মিলনীর এত সমস্ত বিজ্ঞবিচক্ষণ পাঠক থাকিতে এমন একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় কথায় কেহ যে কর্ণপাত করেন নাই, ইহা কেবল দুঃখের কথা নহে, সমধিক সরমেরও কথা বটে। যাহা-হউক, আগামীবারে আমরা তাঁহার এদুঃখ দূর করিতে অবশ্যই সাধ্যমত যত্ন করিব। চি, স, স।

কয়েকটী ঔষধের গুণ ও প্রয়োগপ্রণালী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১) ফস্‌ফাইড্ অব্ জিঙ্ক—ধ্বজভঙ্গ রোগে অতিশয় উপকার করে। কি স্ত্রী কি পুরুষ পুরাতন মেহরোগে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ঘটিয়া ইন্দ্রিয়শিথিলতা-রোগ হইলে নক্সভমিকার সহিত ফস্‌ফাইড্ অব্ জিঙ্ক সেবনে অতি চমৎকার উপকার হয়। নিম্নলিখিত রোগেও ফস্‌ফাইড্ অব্ জিঙ্ক প্রয়োগে উপকার হয়। যথা;—শরীরে দৌর্ব্বল্য বোধ, হাতপার কাঁপনি, রোগী উঠিয়া দাঁড়া-ইলেই যেন মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যায়, অথবা কিয়দ্দূর গমন করিয়া গাঘুরিয়া পড়িয়া যায়, অধিক লোকের মধ্যে গেলে যেন শরীর গরম বোধ হয়, ঘর্ম্ম হয় এবং মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। সর্ব্বদা মনে ভয় কেহ যেন তাহাকে মারিয়া ফেলিবে বা খাদ্যের সহিত বিষ মিশাইয়া দিবে। রাত্রে শয়নকালে ভয় দর্শন, স্মরণশক্তির অল্পতা, এখনি যে কায করিলাম ক্ষণকাল পরে আর তাহা মনে নাই, যে ব্যক্তি পূর্ব্বে বড় বড় অঙ্ক কসিত, এক্ষণে

সামান্য হিসাবে ভুল, মনে সর্ব্বদাই সন্দেহ, এক কার্য্য পুনঃপুনঃ করিতে ইচ্ছা মনে হইতেছে যেন সে কায করি নাই, সর্ব্বদা বুকের ভিতরে হাঁপর ফাঁফড় করিতে থাকে, নিদ্রার অল্পতা যে একটু নিদ্রা হয় তাহাও ভাল হইয়া হয় না, যেন নানাপ্রকারের এলমেল স্বপ্ন দেখিতে থাকে। শরীরের এইরূপ অবস্থা হইলে ফস্‌ফাইড্ অব্ জিঙ্ক মহোপকার সাধন করে। হস্তমৈথুন, অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস, অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমবশতঃ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ঘটিলে এই ঔষধে উপকার করে।

(২) সল্‌ফাইড্ অব্‌লাইম্---ইহাকে সল্‌ফাইড্ অব্ ক্যাল্‌সিয়ম্ বলা যায়। যে সকল শিশুসন্তান দুর্ব্বলশরীর অথবা স্ক্রফুলা পীড়াগ্রস্ত, তাহাদিগকে প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। যে সকল শিশুর গলার গাইট্ সকল স্ফীত (লিম্ফেটিক্ গ্লাণ্ড) হয়, মুখ ফুলা ফুলা দেখায়, তাহাদিগকে এই ঔষধ খাইতে দিলে বিশেষ উপকার হয়, স্ক্রফুলা পীড়াগ্রস্ত বালকদিগের একরূপ চক্ষের পীড়া হয়, তাহাতে শিশু চোখ মেলিয়া আলোর দিকে চাইতে পারে না এজন্য সর্ব্বদা চোখ বুজিয়া থাকে। এইরূপ চক্ষের পীড়ায় সল্‌ফাইড্ অব্ ক্যাল্‌সিয়ম্ খাইতে দিলে পীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ $\frac{1}{8}$ গ্রেণ অথবা $\frac{1}{10}$ গ্রেণ মাত্রায় লইয়া একটু দুগ্ধ শর্করার (সুগার্ অব্ মিল্ক) সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ তিনবার করিয়া দেওয়া যায়। যে সকল শিশু-দিগের গাত্রে সর্ব্বদা স্ফোটক বা ব্রণ হয়, তাহাদিগকেও এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার হইতে দেখা যায়।

রক্তামাশয় রোগে (৩) বেন্‌জোয়েট্ অব্ এমনিয়া—সার্জ্জন হারিস্ বলেন, ১৫ গ্রেণ মাত্রায় বেন্‌জোয়েট্ অব্ এমনিয়া অথবা সোডা দিবসে তিন বা চারিবার প্রয়োগ করিলে তরুণ বা অপেক্ষাকৃত পুরাতন রক্তামাশয় রোগে বিলক্ষণ উপকার করে। তিনি বলেন, বেন্‌জোয়েট্ অব্ এমনিয়া প্রয়োগ করিলে যকৃতের ক্রিয়া বৃদ্ধি হইয়া পিত্ত নিঃসরণ হয় এবং আমাশয়ের তরুণত্ব অল্পকাল মধ্যে দূর হইয়া মলের আকার পরিবর্ত্তন হয়। অধিকাংশ স্থানেই ঔষধ রোগী বেশ সহ্য করিতে পারে।

(৪) এণ্টিফেব্রিন্—পাঠকগণ জানেন পূর্ব্বে জ্বরের উত্তাপলাঘব জন্য ডাক্তার-গণ স্যালিসিলেট্ অব্ সোডা ব্যবহার করিতেন। তাহাতে উত্তাপের লাঘব হইত বটে, কিন্তু অনেক স্থলে অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইয়া রোগীর ধাত

বসিয়া যাইত। তাহার পর দিন কতক এণ্টিপাইরিণ নামক ঔষধ স্যালি-সিলেট্ অব্ সোডার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত, এক্ষণেও স্থানবিশেষে এণ্টিপাইরিণ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এণ্টিপাইরিণ প্রয়োগও বিপদশূন্য নহে। ইহাতেও অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইয়া রোগীর ধাত বসিয়া যায়। এক্ষণে প্রায় দুই বৎসর হইতে জ্বররোগে আর একটী ঔষধ ব্যবহৃত হইতেছে। ইটি এণ্টিফেব্রিন্। এই ঔষধটী স্যালিসিলেট্ অব্ সোডা বা এণ্টিপাইরিণ অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল। ইহাতে খুব্ ঘর্ম্ম হয় বটে, কিন্তু এণ্টিপাইরিণ বা স্যালিসিলেট্ অব্ সোডায় যেরূপ অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইয়া রোগীর ধাত দুর্ব্বল হয়, ইহাতে ধাত তত দুর্ব্বল হয় না। বেশ সাবধানতার সহিত প্রয়োগ করিলে ইহাতে কোনই আশঙ্কা নাই। ইহা নিতান্ত শিশুসন্তান-কেও দেওয়া যাইতে পারে।

অল্পদিন হইল ডাক্তার জি, ওয়াল্টার বার তাঁহার নিজের পীড়ায় এণ্টি-পাইরিন্ ও এণ্টিফেব্রিন্ এই দুইটী ঔষধ প্রয়োগ করিয়া তাহার ফলাফল ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মত নিম্নে প্রকটিত হইল ;—

এণ্টিপাইরিন্	এণ্টিফেব্রিন্
(১) ইহাদ্বারা অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে শারীরিক উত্তাপ হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়।	(১) এক ঘণ্টা বা আরও বিলম্বে উত্তাপ হ্রাস হয়।
(২) ক্রিয়া ২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়।	(২) ক্রিয়া ৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়।
(৩) অধিক ঘর্ম্মকারক।	(৩) অধিক মূত্রকারক।
(৪) প্রতি ক্রিয়া-কালে অবসাদক।	(৪) প্রতি ক্রিয়া-কালে কোন উপসর্গ ঘটে না।
(৫) মস্তিষ্ক অবসাদক।	(৫) মস্তিষ্কের ভাসো-মোটর ও পৈশিক উত্তেজক।
(৬) মাত্রা ১৫—৩০ গ্রেণ।	(৬) মাত্রা ৫—১৫ গ্রেণ।
(৭) দীর্ঘকাল ব্যবহারে সহ্য হয়।	(৭) দীর্ঘকাল ব্যবহারে সহ্য হয়।

উপরোক্ত বর্ণনা পাঠে বেশ বোঝা যায় যে, স্যালিসিলেট্ অব্ সোডা

অথবা এণ্টিপাইরিন্ অপেক্ষা এণ্টিফেব্রিণ ঔষধটী ভাল। আমরা অনেক জ্বররোগীকে এণ্টিফেব্রিণ প্রয়োগ করিয়া সুন্দর ফল পাইয়াছি। বেশ সাবধানতার সহিত প্রয়োগ করিলে ইহাতে কোনও বিপদ হইবার সম্ভাবনা নাই। দৈবাৎ কিঞ্চিৎ মাত্রার ইতর বিশেষ হইলেও এণ্টিফেব্রিণ তত বিপজ্জনক নহে। ইহার মাত্রা কিঞ্চিৎ বেশী হইয়া প্রচুর ঘর্ম্ম হইলেও শীঘ্র ধাত বসিয়া যায় না। বারান্তে এণ্টিফেব্রিণ দ্বারা চিকিৎসিত দুই একটী রোগীর বৃত্তান্ত বর্ণনা করা যাইবে। ক্রমশঃ—

প্রাপ্ত।

সাতক্ষীরা।

৩০এ অগ্রহায়ণ ১২৯৫।

মান্যবর শ্রীযুক্ত কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন

চিকিৎসা-সম্মিলনী পত্রিকা সম্পাদকমহাশয় সমীপেষু।

বিহিতসম্মানপূর্ব্বক বিজ্ঞাপন মিদম্—

মহাশয়!

আমি একজন রীতিমত চিকিৎসা ব্যবসায়ী অথবা উপাধিধারী কবিরত্ন অথবা এম্ বি, কি, এল্ এম্ এস্ ডাক্তার নহি, সুতরাং মহাশয়ের পত্রিকায় আমার অভীষ্ট লিখিতব্য লিখিবার পূর্ব্বে আত্মপরিচয় কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়া মহাশয়ের পত্রিকার পাঠকবর্গের নিকট পরিচিত হওয়া আবশ্যক বিবেচনায় নিম্নে তাহার সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। এইক্ষণে যে উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত অদ্য আমি মহাশয়ের নিকট একজন লেখক বলিয়া দাঁড়াইতেছি, ভগবদিচ্ছায় তাহা সুসম্পন্ন হয়, ইহাই একান্ত অভিলাষ।

আমি জেলা খুলনার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ গ্রাম সাতক্ষীরার জমিদার বংশ-সম্ভূত, মহীয়সী ধীশক্তিসম্পন্ন, বিখ্যাতনামা, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, ৺বাবু দেবনাথ রায়চৌধুরী মহাশয়ের পৌত্র। প্রশংসিত পিতামহ মহাশয় স্বকীয় অধ্যবসায়িতাগুণে বহুতর চিকিৎসা শাস্ত্র সমালোচনা ও অনেক সুবিজ্ঞ ডাক্তার, হাকিম, ও কবিরাজ প্রভৃতি চিকিৎসা ব্যবসায়ীগণের সহিত পরামর্শ দ্বারা যুক্তিযুক্ত ও সুপরীক্ষিত যে সমস্ত মুষ্টিযোগ ঔষধি ও পথ্য ব্যবহার করাইয়া

সহস্র সহস্র দুশ্চিকিৎস্য রোগীগণকে নিরাময় করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই লিপিবদ্ধ ছিল। সাধারণের উপকারার্থে তাহা মাসিকনিয়মে মহাশয়ের চিকিৎসাসম্মিলনীতে প্রকাশ করণাভিপ্রায়ে অদ্য কয়েকটী ঔষধি লিখিয়া পাঠাইতেছি। মহাশয়ের সম্মিলনীতে সম্মিলন করিয়া বাধিত করিবেন।

২। ৺স্তর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সঙ্কলিত শব্দকল্পদ্রুমাভিধান জগদ্বিখ্যাত অভিধান হইতে তাঁহার দ্রব্যগুণাভিধানভাগ সংগ্রহ করাইয়া, একরোগ কি কি দ্রব্য দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে অর্থাৎ কোন্ কোন্ দ্রব্য একগুণবিশিষ্ট, তাহা নির্ব্বাচন করাইয়া, প্রশংসিত পিতামহ মহাশয় আমার ও আমাদিগের একান্ত আত্মীয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র সেন গুপ্ত দ্বারা এক অভিধান প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন—এবং উহা তাঁহার অভীষ্টমত প্রস্তুত হওয়া হেতুক আমার প্রতি বাৎসল্য বশতঃ অভিধান খানির নাম "রামাভিধান" রাখিয়া ছিলেন। তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিমূলক পুস্তক খানি তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়া. ইহাও মাসিক নিয়মে মহাশয়ের সম্মিলনীতে প্রকাশ করাইবার ইচ্ছা করিয়া অদ্য কিছু লিখিয়া পাঠাইলাম, বোধ করি ইহা যুক্তিজ্ঞ চিকিৎসাব্যবসায়ীগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইতে পারে।

(১) ক্ষতজ কীটের ঔষধ।

যদি কোন স্থানে ক্ষত হইয়া কীট জন্মে, তবে সেই স্থানে বংশের অঙ্কুর অর্থাৎ বাঁশের কোঁড়ার রস করিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ উক্ত ক্ষতজ কীট সকল ক্ষতস্থান হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পঞ্চত্ব পাইবেক, তৎপরে অন্যৌষধীদ্বারা চিকিৎসা করিতে হইবেক।

(২) গোঁড়শূলের ঔষধী।

অত্যন্ত ক্লেশদায়ক গোঁড়শূল অর্থাৎ গুল্‌ফদেশে ছোট লম্বাকৃতি খানিক মাংস নির্গত হইলে উক্ত নির্গত মাংসের চতুস্পার্শে মেদীনামক বৃক্ষের পত্র এবং কাঁচা হরিদ্রা হুঁকারজল দিয়া পেশন করতঃ প্রলেপ দিয়া রক্তভেরেণ্ডার পত্রে বেষ্টন. করিয়া এক বস্ত্র বন্ধন করিবামাত্রেই উক্ত ক্লেশের অনেক লঘুতা বোধ হইবেক এবং তিন দিবস যাবৎ এইরূপ ব্যবহার করিলে ঐ নির্গতমাংস পতিত হইবে পশ্চাৎ ক্রমশঃ ক্ষত শুষ্ক হইবেক।

(৩) পাঁচড়া ও চুলকনা রোগের ঔষধী।

পাচড়া ও চুলকনা গ্রস্ত রোগীর অতি প্রত্যূষে এক মেছলায় তিক্ত তম্বু খণ্ড খণ্ড করিয়া স্থাপন করতঃ পাদদ্বারা এক ঘণ্টাপর্য্যন্ত পেশন করিতে হইবেক তাহাতেই রোগ মুক্তি হইবেক। এক দিবসাধিক ঐ প্রকার ব্যবহার করিতে হইবেক না। যে দিন উক্ত ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবেক, সেই দিন মুখ তিক্ত হইবেক তজ্জন্য চিন্তার বিষয় নাই।

(৪) একাশিরার ঔষধী।

মুষ্কদেশে কোষবৃদ্ধি হইলে চৌকা শেওলার শ্বেতমূল জলদ্বারা পেশন করতঃ কোষে লেপন করিয়া কদলীবৃক্ষের মাইজ পত্রে দুই তিন দিবস বন্ধন করিলে আরোগ্য হইবেক।

(৫) অর্শরোগের ঔষধী।

একটী দাড়িম্বকে চারি অংশ করিয়া তাহার তিন অংশ একত্র করতঃ তাহার সমান পরিমাণে তালের মিছিরি তাহার সহিত পিশিতে হইবেক, তৎপরে পিষ্টদ্রব্যে দুইটীমাত্র বটিকা প্রস্তুত করিয়া প্রাতঃকালে এক বটীকা এবং সন্ধ্যাকালে একটী, এইরূপে যত বৎসরের রোগ হইবে তত সপ্তাহ সেবন করিতে হইবেক। ইহাদ্বারা অর্শরোগ বিশেষ হয়। ক্রমশঃ—

সাতক্ষীরা } শ্রীরামনিরঞ্জন রায় চৌধুরী।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

আপনার পত্র সাদরে গৃহীত ও মুদ্রিত হইল। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরোপকারের জন্য আপনার ন্যায় লোক যেরূপ মহৎ সদনুষ্ঠানে ব্রতী হইলেন, তজ্জন্য নিতান্ত আনন্দের সহিত আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আর একথা বলাও বোধ করি অসঙ্গত নয় যে, ৺ দেবনাথের ন্যায় একজন প্রভূতজ্ঞানশালী অথচ প্রচুরআয়শালী জমীদার মহোদয়-কর্ত্তৃক বিশেষরূপে পরীক্ষিত ঔষধাদিদ্বারা যে সাধারণে অসীম উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র নাই। আপনার

প্রেরিত উভয় প্রবন্ধের মধ্যে অর্থাৎ পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ ও রামাভিধানের মধ্যে আপাততঃ আমরা প্রথমোক্তটাই ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে থাকিলাম। পরে সুবিধামত আপনার ২য় প্রবন্ধ এবং এসম্বন্ধে আমাদের বিস্তৃত মন্তব্য প্রকাশ করিব। অতএব আশা করি যে, উক্ত উভয়প্রবন্ধ সম্মিলনীতে একদা স্থান না পাওয়াতে আমরা যেন আপনার বিরাগভাজন না হই।

চি, স, স।

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

সম্পাদকীয়।

প্রমেহ বা ধাতের পীড়া।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

(১) অত্যন্ত জ্বালার অবস্থায়।

এই রোগে অত্যন্ত জ্বালাযন্ত্রণা নিবৃত্তির জন্য যাহা কর্ত্তব্য, তাহা গত-বারে বলিয়াছি। এবারে এসমন্ধে আরও একটু বলা আবশ্যক যে, যদি ইতি পূর্ব্বে লিখিত উপায় সমূহ দ্বারাও যন্ত্রণার নিবৃত্তি না হয়, তবে গোদুগ্ধ অর্দ্ধপুয়া, জল ॥০ শের এবং দুর্ব্বার মূল ২ তোলা একত্রে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধা-বশেষ নামাইয়া পান করিবে। তদ্ভিন্ন তীক্ষ্ণ মদ্যাদি পান, রাত্রি জাগরণ, লঙ্কা ও পেয়াঁজ রসুনাদি ভক্ষণ এবং স্ত্রীসংসর্গ এ অবস্থায় একবারে বর্জ্জন করিবে।

(২) অত্যন্ত টন্‌টনানির অবস্থায়।

প্রমেহ রোগে এ অবস্থাটী বড় ভয়ানক, অর্থাৎ প্রথমোক্ত জ্বালা যন্ত্রণার যে সমস্ত অজ্ঞ লোক তাহাতে সবিশেষ লক্ষ্য না করিয়া তদুপরি আহারাদির অত্যাচার, রাত্রিজাগরণ বিশেষতঃ স্ত্রীসংসর্গ করে, সেই সমস্ত লোকেরই প্রায় এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। ইহাতে রোগী যন্ত্রণায় উন্মাদের ন্যায় অস্থির হইয়া অনবরত চীৎকার করিতে থাকে, এমন কি যন্ত্রণার জন্য সে তখন জীবন দিতেও প্রস্তুত হয়। এই অবস্থাটীও সাধারণতঃ দুইভাগে

বিভক্ত, এক রোগীর ভয়ানক টন্‌টনানির সহিত বিন্দুবিন্দু প্রস্রাব নির্গত হইতে থাকে, আর দ্বিতীয়তঃ প্রস্রাব সরল থাকিলেও অনবরত টন্‌টনানির নিবৃত্তি না হওয়া। যাহা হউক, এই দুরন্ত যন্ত্রণা যে অবস্থাতেই ঘটুক না কেন, কেবল আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবন করিয়া ইহার আশু শান্তি হওয়াই দুষ্কর, সুতরাং এ অবস্থাতে সেবনীয় ঔষধ ভিন্ন তখন নিম্ন লিখিত উপায় অবলম্বন করিতে দিবে। খুব্ বড় হাঁড়ির চারি বা পাঁচ হাঁড়ি গরম জল একটা বড় টবে ভরিয়া অর্থাৎ গামলাটীতে এমন ভাবে গরম জল পূর্ণ করিবে, যেন তাহাতে বসিলে রোগীর কোমর পর্য্যন্ত অনায়াসেই ডুবিয়া যায়, সুতরাং রোগী ও জলপাত্রবিশেষে ৪।৫ হাঁড়ী গরম জলের স্থলে ২।৩ হাঁড়ী অথবা তদপেক্ষা কম জলেও হইতে পারে। যাহা হউক, এইরূপ উষ্ণ জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে রোগীকে বসাইতে হইবে, যাহাতে জলের অধিক উষ্ণতা জন্য রোগীর গায়ে অধিক উত্তাপ না লাগে অর্থাৎ রোগী সহ্য করিতে পারে, এমত অবস্থায় তাহাকে বসাইয়া প্রস্রাবের বেগ দিতে বলিবে। রোগীর যেমন কেন টন্‌টনানিই না থাকুক্, এইরূপে বেগ দিতে দিতে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রস্রাব সরল হইয়া টন্‌টনানির শান্তি হইয়া যাইবে। ফলতঃ উপরোক্ত যন্ত্রণার আশু শান্তির জন্য যদি কোনও উৎকৃষ্ট উপায় থাকে, তবে আমার বিশ্বাস ইহাই একমাত্র প্রশস্ত উপায়।

নূতন ধাতের পীড়াতে কোন কোনও রোগীর পুংলিঙ্গে ভয়ানক বেদনা এবং ফুলা জন্মিয়া রোগীকে অত্যন্ত কষ্ট দিয়া থাকে। যাহা হউক, এরূপ বেদনা বা ফুলা থাকিলে জাতীপত্র (চামেলী) কিংবা পেয়ারাপত্র সহিত জল সিদ্ধ করিয়া সেই জল একটী ভাণ্ডে রাখিয়া সেই ভাণ্ডমধ্যস্থ উষ্ণজলে কেবল মাত্র পুংলিঙ্গটী প্রবিষ্ট করাইয়া প্রস্রাবের বেগ প্রদান করিবে। ইহা দ্বারাও শীঘ্র শীঘ্র বেদনা এবং ফুলার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। অথচ পূর্ব্বাপেক্ষা এটী বেশ সহজ উপায়। জ্বালা ও টন্‌টনানি ভিন্ন সপূয় ধাতু নিঃস্রব ও কাপড়ে দাগ লাগা প্রভৃতি আরও কতকগুলি নূতন প্রমেহ রোগের উপদ্রবের বিষয় আগামীবারে বলা যাইবেক।

ক্রমশঃ—

সমালোচনা।

ভারতভৈষজ্যতত্ত্ব। ভৈষজ্যতত্ত্ববিষয়ক বিবিধ সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থ হইতে ভূতপূর্ব্ব চিকিৎসাতত্ত্ব মাসিকপত্রের সম্পাদক, ভিষক সহচর, পাশ্চাত্যভৈষজ্যতত্ত্ব. ম্যালেরিয়া জ্বরচিকিৎসা, গার্হস্থ্যচিকিৎসা বিদ্যা প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা ও নয়াতুমকা রাজকীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভূতপূর্ব্ব চিকিৎসক শ্রীঅম্বিকাচরণ রক্ষিত কর্তৃক সঙ্কলিত দ্বিতীয় সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত, পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত।

অনেক দিনের কথা গ্রন্থকার বড়ই আগ্রহের সহিত উপরোক্ত গ্রন্থখানি আমাদিগকে সমালোচনার জন্য প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু নিতান্তই দুঃখের বিষয় এই যে, সম্পাদকীয় চিরপ্রচলিত অভ্যাসদোষে সচরাচর যেরূপ ঘটিয়া থাকে, উপস্থিত আলোচ্য গ্রন্থখানিও সেই কুঅভ্যাসবশতঃ এত দিন আমাদিগকে স্পর্শপর্য্যন্তও করিতে পায় নাই। বিশেষতঃ অনেক দিনের পুরাতন গ্রন্থ বলিয়া বাস্তবিকই এপর্য্যন্ত পড়িতেও ইচ্ছামাত্র হয় নাই। কিন্তু এতদিন পরে গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সে ভ্রম সম্পূর্ণ ঘুচিয়াছে।

ভারতভৈষজ্যতত্ত্ব গ্রন্থখানি নূতন প্রকাশিত না হইলেও আজ সমালোচকের চক্ষে কিন্তু একটী অপূর্ব্ব নূতন জিনিষ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। কেবল নূতন বলিয়া নহে, সমালোচকের বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই চিকিৎসাশাস্ত্রের যে বিষয়টী অহোরহ চিন্তার বিষয় ছিল এবং এখনও যে অভাব প্রতি মুহুর্ত্তে হৃদয়ে আঘাত প্রদান করিতেছে—ভৈষজ্যতত্ত্ব পাঠে দেখিলাম, উপস্থিত গ্রন্থকার সমালোচকের সেই হৃদয়ের গভীর অভাবেতেই হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তবে যদিও তাঁহার উপস্থিত গ্রন্থদ্বারা প্রাণের আশা সম্যক মিটে নাই কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, গ্রন্থকার দুরন্ত প্রাণান্তকারী পিপাসায় কথঞ্চিৎ জল প্রদান করিয়া পিপাসার সম্যক শান্তি করিতে না পারুন, কিন্তু জীবনকে যে রক্ষা করিয়াছেন, ইহাতেই তিনি সমালোচকের নিকট সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতার পাত্র।

প্রাণের-কথা আর একটু খোলাসা করিয়া বলি—বোধ হয় চিকিৎসা-সম্মিলনীর পাঠকগণ অবগত আছেন যে, কিছুকাল পূর্ব্বে সম্মিলনীতে দেশীয় দ্রব্যগুণতত্ত্ব ও দ্রব্যাভিধান নামক একখানি গ্রন্থসম্বন্ধে একটী জম-

কাল গোছের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, যাহার উদ্দেশ্য—বৈদ্যশাস্ত্রীয় কোন্ কোন্ ঔষধের দেশভেদে কি কি নাম ও কি কি গুণ ও প্রয়োগনিয়ম ইত্যাদি আলোচ্য বিষয় ছিল, কিন্তু অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় এই যে, আমাদের সেই বিজ্ঞাপনটী এবং পরীক্ষাতত্ত্ব ঘটিত আরো একটী বিজ্ঞাপন এপর্য্যন্ত কেবল বচনেতেই পরিণত হইয়া আছে, কার্য্যে কবে কতদূর কি ঘটিবে তাহা ভগবানই জানেন। যাহাহউক, সে কথা তুলিয়া আর পাঠকগণকে দুঃখিত করিতে চাই না। এখন উপস্থিত ভারতভৈষজ্যতত্ত্ব পাঠ করিয়া আজ্ যে কেন এত আনন্দে গদগদ হইতেছি তাহা বলি, অথবা গ্রন্থকর্ত্তার নিজের লিখিত কথাই একটু তুলি "ইউরোপীয়দিগের চিকিৎসা শাস্ত্রে যেরূপ ভৈষজ্যতত্ত্ব বলিয়া একটী বিভাগ আছে, আর্য্যআয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ঠিক্ তদ্রূপ কোন বিভাগ নাই। পাশ্চাত্য ভৈষজ্যতত্ত্বের বর্ণনা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তজ্জন্য এই পুস্তকখানি সেই প্রণালী অবলম্বনে ও অকারাদি বর্ণক্রমে ঔষধের বিবরণ বিবৃত হইল। ইহাতে ভারতবর্ষজাত ঔষধ দ্রব্য সকলের নাম, পর্য্যায়, উৎপত্তি, স্থান, স্বরূপ, রাসায়ণিকতত্ত্ব, ক্রিয়া, আময়িক প্রয়োগ, মাত্রা, ডাক্তারী মতের প্রয়োগরূপ, আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ ও মুষ্টিযোগ প্রভৃতি সবিস্তারে বিবৃত হইল।" সবিশেষ আহ্লাদ ও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গ্রন্থকারের এই সমস্ত উক্তি কেবল বচনমাত্র নহে, পরন্তু ভূমিকায় যেরূপ লিখিয়াছেন কার্য্যতঃ ও তাহাতে যথাসাধ্য যত্ন করিতে ক্রটী করেন নাই। অকারাদি বর্ণক্রমে অশোক, অশ্বগন্ধা প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া দুগ্ধ, ঘৃত, দাড়িম, সোহাগা, স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ দ্রব্যের যে নিয়মে ক্রিয়া ও প্রয়োগ প্রণালী লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার গ্রন্থ ভারত-ভৈষজ্যতত্ত্ব নামে অভিহিত হওয়ারই সম্পূর্ণই উপযুক্ত হইয়াছে। আর ইহাও নিশ্চিত যে, যদি কেহ কখন এই শ্রেণীর কোন গ্রন্থ প্রণয়নে হস্তার্পণ করেন, তবে তাঁহার পক্ষে এই গ্রন্থ একটী সোপানস্বরূপ গৃহীত হইবে। গ্রন্থখানি ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে পাওয়া যায়। মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র। আমাদের বিশ্বাস দেশীয় দ্রব্যগুণতত্ত্বজ্ঞানে যাঁহাদের কিছুমাত্রও কৌতূহল আছে, তাঁহারা এরূপ গ্রন্থ একখানি গ্রহণ করিতে কখনই ঔদাস্য করিবেন না।

ধাতু।

এলোপ্যাথিমতে।

আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞানবিদ্‌পণ্ডিতগণ বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মাকে শরীরধারণের মূল বলিয়া গিয়াছেন। সুশ্রুতাচার্য্য বলেন, "বায়ুপিত্তকফই দেহের উৎপত্তির কারণ। যেমন তিনটী স্তম্ভে গৃহধারণ করে, সেইরূপ ইহারাও শরীরের অধ-ঊর্দ্ধ এবং মধ্যদেশে অবিকৃতভাবে থাকিয়া এই শরীরকে ধারণ করে। এইকারণ কোন কোন পণ্ডিত এই শরীরকে ত্রিস্থূল (তিনটী স্তম্ভবিশিষ্ট) গৃহ বলিয়া থাকেন। ইহাদের বিকৃতিভাব হইলেই দেহের নাশ হয়। এই তিনটী এবং শোণিত, এই চারিটী উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিনাশকালেও শরীরে অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে। বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা এবং শোণিত এই চারিটী ব্যতিরেকে দেহরক্ষা হয় না। ইহারাই দেহকে নিরন্তর ধারণ করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে বা ধাতুর অর্থ গতি, ইহার উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিয়া বাত-শব্দ উৎপন্ন হয়। তপধাতুর অর্থ সন্তাপ বুঝায়, তাহার উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিয়া পিত্ত শব্দের উৎপত্তি হয় এবং শ্লিষধাতুর অর্থ আলিঙ্গন করা, তাহার উত্তর মন্‌ প্রত্যয় করিয়া শ্লেষ্মা শব্দের উৎপত্তি হয়।*

এই ত বায়ুপিত্ত কফবিষয়ে আর্য্যদিগের মত। ইহার মধ্যে পিত্ত ও শ্লেষ্মা কি, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। কিন্তু আর্য্যগণ কাহাকে যে বায়ু বলিয়া গিয়াছেন, তাহা হঠাৎ বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। সুশ্রুত বলেন, "পিত্ত তীক্ষ্ণ গুণ ও পূতিগন্ধবিশিষ্ট, নীল অথবা পীতবর্ণবিশিষ্ট এবং তরল"। পিত্তের স্থান যকৃত, প্লীহা, হৃদয়, দৃষ্টি, ত্বক্‌ এবং পক্ক ও আমাশয়ের মধ্য-স্থান"। পাঠকগণ দেখিবেন ইংরেজি চিকিৎসাশাস্ত্রে যাহাকে বাইল বা পিত্ত বলে, সুশ্রুতাচার্য্য তাহাকেই পিত্ত বলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর শ্লেষ্মার বিষয়ে সুশ্রুত বলেন "শ্লেষ্মার স্থান আমাশয়, শ্লেষ্মা আমাশয়ের স্থানেই উৎপত্তি হয়। শ্লেষ্মা গুরু, শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল এবং শীতল। আর্য্যদিগের শ্লেষ্মার বর্ণনাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, যাহাকে ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ ফ্লেম (Phlegm) কহেন, আর্য্যেরা তাহাকেই শ্লেষ্মা বলিয়া

---

* সুশ্রুত, সূত্রস্থান একবিংশতিতম অধ্যায়।

গিয়াছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মিউকশ ও আয়ুর্ব্বেদের শ্লেষ্মা একই জিনিষ। তবে অধিকাংশ ইউরোপীয় চিকিৎসকগণই শ্লেষ্মাকে অতি সামান্ত পদার্থই জ্ঞান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আর্য্যেরা এই শ্লেষ্মাকে শরীর ধারণের একটী মূল পদার্থ বলিয়া গিয়ছেন। যাহাকে ডাক্তারগণ ষ্টমাক্ বলেন, আমাশয় তাহাই। পক্বাশয় অর্থাৎ যাহাতে অন্ন পরিপাক হয়। ইহা ক্ষুদ্র অন্ত্র বা (Small intestine)। সুশ্রুতাচার্য্য বলেন, পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যস্থানে পিত্ত আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহাতে বোধহয় ডাক্তারগণ যাহাকে পিত্তকোষ বা গলব্ল্যাডার বলেন, আর্য্যেরাও তাহাকেই পিত্তের স্থান বলিয়া গিয়াছেন। অতএব আর্য্যদিগের পিত্ত ও শ্লেষ্মার বিষয় অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু বায়ু জিনিষটী কি ? একি সত্যসত্যই বায়ু না বাতাস ? খ্যাতনামা ও সম্মিলনীর উপযুক্ত লেখক শ্রীযুক্ত বাবু শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন মহাশয় একবার এই সম্মিলনী পত্রিকাতেই "আয়ুর্ব্বেদবৈজ্ঞানিক না অবৈজ্ঞানিক ?" নামক প্রবন্ধে এই বায়ুর বিষয়ে একবার আলোচনা করিয়াছিলেন। আমার যতদুর স্মরণ হয়, তাহাতে তিনি বায়ুকে ফোর্স (Force) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু সুশ্রুতাচার্য্য বলেন—বায়ু কটিদেশ এবং মলাশয় আশ্রয় করিয়া থাকে। চরক বলেন—বায়ুর প্রধান স্থান উরুদেশ। আবার সুশ্রুতাচার্য্য বাতব্যাধিনিদানস্থানে বলেন—পক্বাশয় ও গুহ্যদেশ বায়ুর আলয় *। এই শেষোক্ত বর্ণনাপাঠে যেন বোধহয় আমরা সোজাসুজি উদরে যে বায়ুর সঞ্চার হইয়া থাকে, যাহা কুপিত হইয়া পেট ফুলিয়া উঠে তাহাকেই বায়ু বলে। কিন্তু আর্য্যগণ বায়ুর অর্থ আরও বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র বহুবিস্তৃত। এই শাস্ত্র একবারে একজনের দ্বারা রচিত হয় নাই। সুতরাং ইহাতে নানামুনির নানামত নিহিত আছে। সেই সকল মত পাঠ করিয়া এখনকার ইংরেজি গ্রন্থাদির সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লইলে বায়ু পদার্থটী কি, তাহা কতক পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়। এখনকার ইউরোপীয় শারীরতত্ত্বশাস্ত্রে যে সকল বিষয় অধ্যয়ন করা যায়, সে সকল সিদ্ধান্তকে কখনই ভুল বলিতে পারি না।

* আশুকারী মুহুশ্চারী পক্বাধানগুদালয়ঃ।
দেহে বিচরতস্তস্য লক্ষণানি নিবোধ মে॥

যেহেতু শারীরতত্ত্বশাস্ত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা গঠিত। যাহা পাঠ করা যায়, তাহা মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদদ্বারা চক্ষে দেখিয়া মিলাইয়া লওয়া। সুতরাং এনাটমি বা শা[illegible]র ভুল থাকিবার যো নাই। মনুষ্যের চক্ষের দ্বারা যতদূর দেখা যায়, তাহা ভাবিলে এখনকার ডাক্তারি শারীরশাস্ত্রকে সম্পূর্ণ বলিতে পারা যায়। আবার এদিকে আর্য্যগণও প্রগাঢ়ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। অতএব তাঁহারা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা ভ্রমপ্রমাদসঙ্কুল এমন কথা বলা যায় না। অতএব আয়ুর্ব্বেদোক্ত শারীরবিদ্যা ও ডাক্তারি শারীরবিদ্যার পরস্পর মিল হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়। যেহেতু এই দুই চিকিৎসাশাস্ত্রই মোটের উপর সেই একই ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। বিশেষতঃ মনুষ্যের দেহ তখনও যেমন উপাদানে গঠিত ছিল, এখনও সেই উপাদানে গঠিত আছে। সুতরাং এক শরীরে দুই সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। দুই হাতের যায়গায় চারিহাত হইতে পারে না। তবে আয়ুর্ব্বেদের শারীরস্থানে বা এনাটমি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসক কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই আর্য্যেরা মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ ছাড়িয়া দিয়াছেন। সুতরাং বহুকালের পরিবর্ত্তনে মূলবিষয়ে অনেক স্থলে এখনকার আধুনিক শারীরস্থানের সহিত সুশ্রুতের শারীরস্থানের মিল নাই। অন্ততঃ বিলক্ষণ গোলযোগ দৃষ্ট হয়। যথা সুশ্রুত বলেন, ধমনী নাভি হইতে উৎপন্ন ইত্যাদি ইত্যাদি। যাহা হউক, সে সকল বিচারে আপাততঃ প্রয়োজন নাই। এখন বায়ুপিত্তকফের বিষয়ই পর্য্যালোচনা করা যাউক্। এখনকার শারীরস্থান সম্বন্ধে ডাক্তারগণ যেরূপ নির্ভুল মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, শরীরের ক্রিয়াসম্বন্ধে (ফিজিওলজি) সেইরূপ শেষ মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই। কারণ এনাটমি বা দেহতত্ত্বের জ্ঞান মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদদ্বারাই শিক্ষা করা যাইতে পারে। ইহাতে শরীরের কোথায় কোন্ যন্ত্র আছে তাহা বেশ দেখা যায়। কিন্তু ফিজিওলজি বা দেহের ক্রিয়া জীবিত দেহ ভিন্ন অধ্যয়ন করিবার উপায় নাই। কারণ জীব, মৃত হইলেই তাহার শরীরের ক্রিয়া থামিয়া গেল। কিন্তু জীবিতাবস্থায় দেহের ভিতর কি কার্য্য হইতেছে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার যো নাই। এজন্য ফিজিওলজি বা দেহের ক্রিয়া অনুমান ভিন্ন জানিবার উপায় নাই। এই যে শরীরের প্রধান ক্রিয়া রক্তসঞ্চালন, তাহারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। কারণ কে

কবে প্রত্যক্ষ করিতে সুযোগ পাইয়াছে যে, হৃদয়ের রক্ত, ধমনী দিয়া গমন করিয়া পরে শিরাদ্বারা চালিত হইয়া আবার সেই হৃদয়েই ফিরিয়া আসি-তেছে। এক্ষণে দেখা যায় বায়ু পিত্ত কফও এইরূপ অদৃশ্য পদার্থ। অন্ততঃ ইহারা শরীরের কোন্ স্থান আশ্রয় করিয়া কিরূপ কায করে, তাহা প্রত্যক্ষ হইবার যো নাই। যখন কাসটী তুলিয়া ফেলিলে তখনই শ্লেষ্মার বোধ হইল। যখন পিত্ত বমন করিলে তখনই পিত্ত জানিতে পারা গেল। মৃতদেহ ব্যব-চ্ছেদে পিত্তকোষটী মাত্র পিত্তপূর্ণ দেখা গেল। কিন্তু কিরূপ নিয়মক্রমে জনডিস্ (Jaundice) পীড়া হইলে ঐ পিত্ত, রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া চক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহা চিকিৎসকগণ অনুমান দ্বারা অনেকটা জানিতে পারিলেও তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পান নাই। জানিবার উপায় নাই। এই সকল কারণবশতঃই চিকিৎসাবিদ্যাটাই অনিশ্চিত। এবং চিকিৎসাকার্য্যও অনুমান মাত্র। তা ডাক্তারিই বল, আর কবিরাজিই বল, আর হোমিওপ্যাথিক বল, সবই সমান। আর্য্যেরা চিকিৎসাশাস্ত্রের সম্যক উন্নতি করিলেও তাঁহারা দৈহিক সমস্ত ক্রিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। অন্ততঃ তাঁহাদিগের চিকিৎসাশাস্ত্রসম্বন্ধীয় যে সকল পুস্তক আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয়। আয়ুর্ব্বেদ কোন স্থানে বলিয়া গিয়াছেন শরীরের সূক্ষ্মতম পদার্থ জানিবার উপায় নাই। আবার যে আয়ুর্ব্বেদ শল্যতন্ত্রের সাহায্যে দক্ষের ছিন্ন মস্তক জোড়া দিয়া-ছিলেন, সেই আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের অনেক রোগ অসাধ্য বিবেচনায় চিকিৎসককে রোগীবিশেষ ত্যাগ করিয়া যাইবার উপদেশ দিয়াছেন। যদি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র সম্পূর্ণ হইত, তবে এসকল কথা আয়ুর্ব্বেদে স্থান পাইত না। আবার অনেক শারীরিক ক্রিয়া বুঝাইবার সময় আয়ুর্ব্বেদও অনুমান মাত্রের উপর নির্ভর করিয়া একরূপ মনগড়া বা গুজামিলন দিয়া বুঝাইয়া গিয়াছেন। যথা সুশ্রু-তাচার্য্য ফুস্ফুসের উৎপত্তি বিষয়ে বলিয়াছেন—রক্তের ফেণা হইতে ফুস্ফুস উৎপন্ন হইয়াছে। বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদান্তর্গত নানা গ্রন্থে শারীরবিধান অর্থাৎ জীবিতদেহের কার্য্যনির্ণয় সম্বন্ধে নানা মত দৃষ্ট হয়। সুতরাং আর্য্যেরাও দেহের উৎপত্তি ও ক্রিয়ানির্ণয় সম্বন্ধে আঁধারে বিচরণ করিয়া-ছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অন্ততঃ সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন মতের ঐক্য স্থির করা অতীব দুরূহ। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র ঋষি প্রণীত, এজন্য তাহাতে ভ্রম

থাকিবার যো নাই, এ সিদ্ধান্ত কতদূর ঠিক্ তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। আয়ুর্ব্বেদসম্বন্ধে কোন কথা তুলিলে অনেক বিজ্ঞ বিজ্ঞ কবিরাজগণ কিঞ্চিৎ ক্রোধবিশিষ্ট হন, এজন্য আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির পক্ষে মুনিঋষিগণ অনেকস্থলে নরদেহ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়াছেন একথা বলা ধৃষ্টতা মাত্র। তবে কবিরাজমহোদয়গণ গোঁড়ামি ছাড়িয়া দিয়া যদি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের (অন্ততঃচরকসুশ্রুতাদির) উচিত বিচার করেন, তবে বোধ হয়, তাঁহাদের মতের সহিত আমার মতের ঐক্য হইতে পারে। এবং এইরূপ গোঁড়ামিশূন্য হইয়া বিচার করিলে ডাক্তারি ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের অনেক বিষয়ে পরস্পর মিল হইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদ যে ভ্রমসঙ্কুল এবং ডাক্তারিই ভ্রমপ্রমাদশূন্য, একথা বলা আমার অভিপ্রায় নহে। এখনকার ডাক্তারিও অনিশ্চিত। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রেও চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞানের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি নাই। অতএব কবিরাজ ও ডাক্তারগণ একমিল হইয়া যদি আয়ুর্ব্বেদ ও ডাক্তারির একত্র মিলন করিয়া কবিরাজী চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি বিধানে যত্নশীল হন, তবে প্রাচীন কবিরাজী চিকিৎসা সমূহ উন্নত হইতে পারে। কবিরাজীশাস্ত্রের উন্নতির কথা তুলিয়া একথা বলা অসঙ্গত নহে যে, এপর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদপারদর্শী যে সকল বিজ্ঞ কবিরাজ মহোদয়গণ দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতিকল্পে মনোযোগ দিয়াছেন, তাঁহারা প্রায়ই আয়ুর্ব্বেদীয় পুস্তকসকলের অনুবাদমাত্র করিয়া আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করিতেছেন। এইরূপে দেখা যায় এক ভাবপ্রকাশ ও সুশ্রুতেরই কতবার অনুবাদ হইল। কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন সুশিক্ষিত কবিরাজই আয়ুর্ব্বেদসম্বন্ধীয় নানা গ্রন্থের ঐক্য করিয়া আয়ুর্ব্বেদের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া প্রচার করেন নাই। এইরূপে এখনকার দেহতত্ত্ব প্রভৃতির সহিত আয়ুর্ব্বেদের মিল করিয়া আয়ুর্ব্বেদ ব্যাখ্যা করিলে হিন্দুচিকিৎসাশাস্ত্র সকলের বোধগম্য অন্ততঃ জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদিগের বোধগম্য হইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদপুস্তকসকলের বর্ত্তমান অবস্থায় আয়ুর্ব্বেদোক্ত শ্লোক মুখস্থ করা ভিন্ন চিকিৎসাশিক্ষার্থীর আর কিছুই শিখিবার সুযোগ নাই। তৈল ঘৃত ঔষধ প্রভৃতি প্রস্তুতশিক্ষা সহজ, কিন্তু প্রয়োগপ্রণালী বড়ই দুরূহ। আয়ুর্ব্বেদ জিনিষটা কি, আয়ুর্ব্বেদের মূলভিত্তি বাত পিত্ত কফই বা কি? বাতপিত্তকফ মিলিয়া কিরূপে রোগ উৎপন্ন করে? এই সকলের বিশদ ব্যাখ্যা ব্যতীত শুধু চরকসুশ্রুত পড়িয়া

জানিবার উপায় নাই। অন্ততঃ ভাল করিয়া তাহার ভাবগ্রহ হয় না। *পরন্তু এইরূপে আয়ুর্ব্বেদব্যাখ্যার সহিত প্রচার করিতে গেলে ইংরেজি* চিকিৎসাশাস্ত্র হইতে সাহায্য লওয়া অতীব আবশ্যক। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধে এখনকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে ভুল থাকিবার যো নাই। যেহেতু সে সমুদয় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থ। গোঁড়ামীশূন্য নিরপেক্ষ কবিরাজ মহোদয়গণ এই সামান্য ব্যক্তির কথায় কর্ণপাত করিবেন কি? না উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া হাঁসিয়া উড়াইয়া দিবেন।

এক্ষণে বায়ু কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি এখনকার পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও শরীরের আভ্যন্তরিক কার্য্যসমুদয় চক্ষে দেখিতে পান না, পাইবার যো নাই। গুড় গুড় শব্দ করিয়া পেট ডাকিল, ডাক্তার বলিলেন উদরের নাড়ী ভুঁড়ী নড়িয়া উঠিল। বস্তুতঃ ব্যাপারও তাহাই। কিন্তু ঠিক্ কেমন করিয়া এই ঘটনা ঘটিল তাহা জীবিত দেহে দেখিবার উপায় নাই। সুতরাং পেটে শব্দহওয়া জ্ঞান অনুমানের উপর নির্ভর কর। একটী ঘটনা দেখিয়া আর একটী ঘটনা অনুমান করিয়া লওয়া মাত্র। সংসারে এইরূপ হইলে এইরূপ হইতে পারে তাহাই অনুমান। পরন্তু ইংরেজি চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান প্রায় অধিকাংশই বাহ্যিক পদার্থজ্ঞান হইতে সমুদ্ভূত। আমরা জানি কতকগুলি দ্রব্যের রাসায়নিকসংযোগে তাপ উৎপন্ন হয়, এজন্য জীবরসায়নবিদ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, শরীরের ভিতর অম্লজান বায়ু ও অঙ্গার (Carbon) একত্র হইয়া শরীরের তাপ উৎপন্ন করে। আবার ডাক্তারি শাস্ত্রকারগণ দেখিয়াছেন যে শরীরের কাল রক্ত শিরা কাটিয়া খানিকটা বাহির করিয়া বাহিরের বাতাসে রাখিলে উহা লালবর্ণ ধারণ করে। এজন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে, শরীরের অপরিস্কার কালরক্ত ঐরূপে দেহের ভিতর ফুক্‌ফুসের বাতাস পাইয়া লালবর্ণ ধারণ করে। কিন্তু শরীরের তাপ উদ্ভাবন কার্য্য তথা শরীরের ভিতর কালরক্ত লাল হওয়া ও লালরক্ত কাল হওয়া ব্যাপার মনুষ্যের দেখিবার উপায় নাই। সুতরাং এ সকল জ্ঞানও অনুমান হইতেই সিদ্ধ। এইত গেল এক কথা, আবার নানা সময়ে শরীরের নানাবিধ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। যথা, কোন দিন হঠাৎ শরীর ভার বোধ হইল। কি হঠাৎ মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করিয়া উঠিল। এই সকল

শারীরিক বিপর্য্যয় যে ঠিক্ কিজন্য ঘটে, ইংরেজি চিকিৎসাশাস্ত্র তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেয় না। এই বেশ আছি, কিন্তু হঠাৎ রাত্রে ভাল হইয়া ঘুম হইল না। কি অদ্য স্নান করিবার সুযোগ পাইলাম না বৈকালে শরীরটা গরম বোধ হইল, রাত্রে ঘুমও কম হইল। কি আজ ধাতটা একটু চঞ্চল বোধ হইল। কি হঠাৎ কোথাও কিছু নাই পায়ের গোছটা কামড়াইয়া উঠিল। কবিরাজ বলিলেন ঐ স্থানে শ্লেষ্মা বা রস সঞ্চয় হইয়া পা কামড়াইল। ইংরেজি চিকিৎসাশাস্ত্রের দৌড় আরও অধিক, এজন্য ডাক্তার বলিলেন না তা নয় ঐ স্থানে অম্ল বিশেষ (ল্যাক্‌টিক্‌এসীড্) সংযুক্ত শারীরীক রস গমন করিয়া ঐ স্থানে বাতের ন্যায় রোগ উৎপন্ন করিল। কিন্তু শরীরের অন্যস্থানে রস না গিয়া ঠিক্ ঐ এক পায়ে কেন রস ধাবিত হইল, তাহা কবিরাজ ও ডাক্তার কেহই বুঝাইয়া দিতে পারেন না। পরন্তু গুরুতর রোগের উৎপত্তির কথা জানিতে পারা দূরে থাক, আমাদিগের মাথা ঘোরা, শরীর ঝাঁ ঝাঁ করা প্রভৃতি সামান্য শারিরীক পরিবর্ত্তনও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ এইরূপ শারীরশাস্ত্রের সমস্ত কার্য্যকারণ বুঝিতে না পারিয়াই বায়ুপিত্তকফের কল্পনা করিয়া গিয়াছেন এইরূপ অনুমান হয়। ঠিক্ আমাশয় হইতে শ্লেষ্মা উৎপন্ন হয় কিনা তাহাই বা কেমন করিয়া জানিব ? প্লীহাতে পিত্ত আছে না আছে তাহারই বা ঠিক্ কি ? অতএব আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে এক বিশ্বাস করা ভিন্ন উপায় নাই। পরন্তু বায়ু পিত্ত কফ সমস্ত রোগের মূল না হউক (ঠিক্ বলিতে পারি না) বায়ু পিত্ত কফ দ্বারা যে শরীরের নানাবিধ ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তাহার সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ শরীর ভারবোধ হওয়া মাথা ঘোরা প্রভৃতি যে সকল শারীরিক পরিবর্ত্তন আমরা আপন আপন শরীরে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার কারণ সকল বায়ু পিত্ত কফ দ্বারা আয়ুর্ব্বেদ যেরূপ বুঝাইয়া গিয়াছেন, তাহা অতি উৎকৃষ্ট এবং তাহা লোকের সামান্য আত্মজ্ঞানের সহিত বেশ ঐক্য হয়। এই সকল সামান্য শারীরিক পরিবর্ত্তনসম্বন্ধে ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে তাদৃশ আলোচনা দৃষ্ট হয় না। থাকিলেও তাহা তত বিশদ নহে। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ বায়ু পিত্ত কফ অবলম্বন করিয়া এই গুলির সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং শরীরের অবস্থার সহিতও বেশ মিলিয়া যায়। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র যে সকল রোগের মূল এক বায়ু পিত্ত কফ দ্বারা

ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সকল রোগের নিদানে বুঝিয়া উঠা যায় না। আয়ুর্ব্বেদ রোগবশতঃ ঠিক্ শারীরিক উপাদানের কি পরিবর্ত্তন হয় সিটি না বলিয়া বায়ু পিত্ত কফের বিকৃতি সকলস্থানেই খাটাইয়া দিয়াছেন। যথাঃ— শোথরোগের নিদানস্থানে দেখা যায় আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন, "বায়ু বাহ্য শিরাতে উপস্থিত হইয়া কফ রক্ত ও পিত্তকে দূষিত করিলে ঐ দূষিত কফ, পিত্ত ও রক্ত, বায়ুর মার্গ বা পথ রোধ করিয়া থাকে। এই প্রকারে মার্গ বা পথ রোধ হওয়ায় বায়ু বিসর্পিত হইয়া উৎসেধ লক্ষণ শোথ জন্মায়।" এই শোথের নিদান পড়িয়া শোথটী ঠিক্ কি কারণ বশতঃ হইতে পারে, আয়ুর্ব্বেদ তাহা খোলসা করিয়া বলেন না। সুধু এক বায়ু পিত্ত কফের উপর বরাত দিয়াছেন। কিন্তু তাহাও খোলসা বুঝা যায় না। যেহেতু বাহ্য শিরায় বায়ু উপস্থিত হইয়া কিরূপভাবে কফ রক্ত ও পিত্তকে দূষিত করে, আবার সেই রক্ত পিত্ত ও কফ দূষিত হইলেই বা কেন বায়ুর পথ রোধ হইবে? আবার শিরা হইতে বায়ুর পথ রোধ হইলেই বা কেন শরীরের ত্বকের নিম্নে জল সঞ্চয় হয়, তাহা বুঝিয়া উঠা সহজ নহে।

আয়ুর্ব্বেদ বলেন—বায়ু শব্দের অর্থ গতি। বায়ু শরীরের কোন্ স্থানে উৎপত্তি হয়, সে কথার বিচারে প্রয়োজন নাই, তাহা দেখিবারও উপায় নাই। তবে যাহারা দেহযন্ত্রে চালিত হয়, আয়ুর্ব্বেদ মতে তাহাই বায়ু। আয়ুর্ব্বেদ বলেন প্রধান বায়ু পাঁচটী এবং উপবায়ু পাঁচটী, তন্মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়াবিশিষ্ট প্রাণবায়ুই প্রধান। তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে দেহস্থ কুণ্ডলিনী নাম্নি শক্তি হইতে সেই প্রাণবায়ু সমুদ্ভূত হইয়াছে। তন্ত্রকারেরা সেই কুণ্ডলিনী শক্তিকে বায়ু এবং অগ্নির সূক্ষ্মাংশ তড়িন্ময় পদার্থ বলিয়া বর্ণনা করেন। সেই শক্তি মেরুদণ্ডের মধ্যে থাকিয়া জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া, এই তিনরূপে বিভক্ত হইয়া কি বাহেন্দ্রিয়ের কার্য্য কি আন্তরিক যন্ত্রকার্য্য দেহস্থ সমস্ত কার্য্যেরই প্রবর্ত্তিকা হইয়াছেন। অসংখ্য বায়ু বাহিনী ধমনী মেরুদণ্ডে সংলগ্ন বলিয়া তন্ত্রে বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে জ্ঞানশক্তি বাহিনী, ইচ্ছাশক্তি বাহিনী, এবং ক্রিয়াশক্তি বাহিনী এই তিন নাড়ী প্রধান। সেই সকল ধমনী পথে তড়িন্ময় সূক্ষ্ম বায়ু সহকারে জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি দেহে এবং দেহস্থ সমস্ত যন্ত্রে সংযোজিত হয়। তন্ত্রের এই বর্ণনাদৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, এখনকার ইংরেজি চিকিৎসাশাস্ত্রে (পাশ্চাত্য চিকিৎসা) যাহাকে

স্নায়ু বা নার্ভ বলে, * তন্ত্রকারেরা সেই গুলিকেই বায়ুবাহিনী ধমনী বলিয়াছেন। Spinal cord বা মেরুদণ্ডে প্রধান স্নায়ুদণ্ড অবস্থিতি করিতেছে এবং তাঁহার দুই পার্শ্ব হইতে মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুসূত্র সকল বাহির হইয়াছে। ঐ মেরুদণ্ডীয় মজ্জা বা প্রধান স্নায়ুদণ্ড বাহিয়াই আমাদিগের দৈহিক কার্য্য সম্পন্নের ইচ্ছা উপরে ও নীচে চালিত হয়। নরশারীরবিৎ পাশ্চাত্যপণ্ডিতেরা যদিও সমস্ত স্নায়ুর ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া উঠিতে সক্ষম হন নাই, তত্রাচ তাঁহারা যতদুর পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, মেরুদণ্ড হইতে নির্গত প্রত্যেক স্নায়ুসূত্র তিন অংশে বিভক্ত। ডাক্তার কার্পেণ্টার সাহেব অনেক বকাবকির পর এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন যে, প্রত্যেক মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুসূত্র (Spinal nerve) চারি প্রকার উপাদানে বা সূত্রে গঠিত।

(১) জ্ঞানবাহিনী (Sensory) বরাবর উপরদিকে ধাবিত হইয়া মস্তিষ্কের দিকে গমন করিয়াছে।

(২) ইচ্ছাবাহিনী (Motor set from the brain) ইহাতে মস্তিষ্ক হইতে ইচ্ছাশক্তি বহন করিয়া যন্ত্র সকলে আনয়ন করে।

(৩) উত্তেজকসূত্র (ক্রিয়াবাহিনী যাহা মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত না গিয়া মেরুদণ্ডেই (Spinal ganglion) শেষ হইয়াছে।

(৪) ক্রিয়াবাহিনী (Spinal motorset) যাহা মেরুদণ্ড হইতে ক্রিয়াশক্তি বহন করিয়া শরীরের মাংসের সহিত সংযুক্ত করে।

ডাক্তার কার্পেণ্টার বলেন—দুইরকম স্নায়ুসূত্র, জ্ঞান ও ইচ্ছা সম্বন্ধে মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত। আর দুইরকম স্নায়ুসূত্র মেরুদণ্ড হইতেই ক্রিয়াশক্তি বহন করে। মেরুদণ্ডের ইচ্ছা করিবার ক্ষমতা নাই, উহার জ্ঞানও নাই, যেহেতু জ্ঞান ও ইচ্ছা মস্তিষ্কের কার্য্য। সুতরাং মেরুদণ্ড হইতে যে জ্ঞানবাহিনী নাড়ী উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহাতে মস্তিষ্কের কোন সংযোগ নাই, তাহাকে Sensory না বলিয়া excitor উত্তেজক মাত্র বলা যায়। সুতরাং ইহাও

* nerve শব্দের অর্থ বাঙ্গালা ডাক্তারি পুস্তক সমূহয়ে স্নায়ু বলিয়া লিখিত আছে। এজন্ত আমিও নার্ভকে স্নায়ু শব্দে উল্লেখ করিলাম। কিন্তু সুশ্রুতাচার্য্য লিগামেণ্ট বা বন্ধনী সূত্র সকলকে স্নায়ু বলিয়া গিয়াছেন।

ক্রিয়াবাহিনী মাত্র। একটী ভেকের মস্তক ছেদন করিয়া যদি উহার উরু-দেশে ছুঁচ ফুটাইয়া দেওয়া যায়, তবে উহা ঐ ছুঁচটী সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করে এবং পা নাড়িতে থাকে। এই পরীক্ষা দ্বারা বুঝা যায় যে মস্তিষ্ক ব্যতীতও স্রধু মেরুদণ্ডেই একরূপ ইচ্ছাশক্তি নিহিত আছে। কিন্তু মেরু-দণ্ডের ইচ্ছা করিবার ক্ষমতা নাই এজন্য মেরুদণ্ডে সংলগ্ন দুইরকম স্নায়ু-সূত্রকেই একরূপ অর্থাৎ ক্রিয়াবাহিনী মাত্র বলিতে পারা যায়। অতএব মেরুদণ্ড কেবল ক্রিয়াবাহিনী মাত্র এবং প্রত্যেক মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুসূত্রে মোটের উপর তিনরকম সূত্র আছে। এক সূত্র দ্বারা কোন অঙ্গ বিশেষ হইতে জ্ঞান বা বোধ মস্তিষ্কে চালিত হয়, আর এক সূত্র হইতে মস্তিষ্ক হইতে ক্রিয়া করিবার ইচ্ছা আসিয়া সেই অঙ্গে প্রতিফলিত হয়, তাহাতেই সেই অঙ্গের চালনা হয়। আর একরূপ সূত্র আছে তাহা দুই ভাগে বিভক্ত তাহার একভাগ কোন অঙ্গবিশেষ হইতে উত্তেজনা (বোধ নহে) লইয়া মেরুদণ্ডে পৌঁছাইয়া দেয়। আর একভাগ মেরুদণ্ড হইতে ক্রিয়াশক্তি বহন করিয়া সেই অঙ্গে আনিয়া দেয়। এই শেষোক্ত দুই ভাগকে কেবল ক্রিয়া-শক্তি বাহিনী মাত্র বলিতে পারা যায়। যেহেতু মেরুদণ্ডের প্রকৃত ইচ্ছা বা বোধশক্তি নাই। অতএব তন্ত্রের মতে ও আধুনিক ইউরোপীয় শারীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মতে প্রত্যেক মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুসূত্রের ক্রিয়া সেই তিন রকমই। তন্ত্রকারের মতে বায়ু সূক্ষ্ম অতীন্দ্রীয় পদার্থ যাহা জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি সমস্ত দেহে চালিত করে। অতএব যাহাকে nervous force বলা যায় বা যাহাকে স্নায়ু যন্ত্রের ক্রিয়া বলা যায় তাহাই বায়ু। এই সকল স্নায়ুর ক্রিয়া একরূপ তড়িন্ময় পদার্থ বিশেষ দ্বারা সম্পন্ন হয়, উহাকে animal magnetism বলা যায়। অতএব স্নায়ুসূত্র গুলিকে টেলিগ্রাফের তারের স্বরূপ বলা যায়।

এইত গেল বায়ুর এক অর্থ। সুশ্রুতাচার্য্য বায়ুর কার্য্যের যে সকল দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয় এখনকার ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যে সকল কার্য্য স্নায়ু যন্ত্রের ক্রিয়া বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, সুশ্রুতাচার্য্য ও তাহাই বলিয়াছেন। যথাঃ—

"ইনি প্রাণী সমূহের উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশের কারণ। স্বয়ং অব্যক্ত, ইহার ক্রিয়া সকল প্রত্যক্ষ। ইহা রুক্ষ শীতল লঘু খর তীর্য্যকগামী, শব্দ ও

স্পর্শ গুণবিশিষ্ট, দেহস্থ দোষসমূহের নায়ক এবং রোগ সমূহের রাজা। ইনি দেহ মধ্যে আশুকার্য্যকারী ও শীঘ্র বিচরণকারী। পক্কাশয় ও গুহ্যদেশ, ইহার আলয়ন। দেহমধ্যে বিচরণ করিতে থাকিলে বায়ুর যে লক্ষণ প্রকাশ হয়, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। বায়ু কুপিত না হইলে দোষ ধাতু ও অগ্নি সমভাবে থাকে, তাহাদিগের স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তি হয়। এবং বায়ুর ক্রিয়া সকল ও সরলভাবে হইতে থাকে। নাম, স্থান ও ক্রিয়াভেদে একমাত্র বায়ুও সেই পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত। প্রাণ, উদান, সমান ব্যান ও অপান এই পঞ্চ বায়ু পঞ্চ স্থানে থাকিয়া দেহীদিগের দেহ রক্ষা করে। যে বায়ু মুখ মধ্যে সঞ্চরণ করে তাহাকে প্রাণ বায়ু বলে। প্রাণ বায়ুর দ্বারা দেহ রক্ষা হয়, ভুক্ত অন্ন জঠর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং প্রাণ ধারণ হয়। এই বায়ু দূষিত হইলে প্রায়ই হিক্কাশ্বাস প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। যে বায়ু ঊর্দ্ধদিকে সঞ্চরণ করে তাহাকে উদান বায়ু বলে, ইহা কুপিত হইলে স্কন্ধ সন্ধির উপরিস্থিত রোগ সকলই বিশেষরূপে জন্মে। আমাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যস্থলে সমান বায়ু অবস্থিতি করে। সমান বায়ু জঠরস্থিত অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া ভুক্ত অন্ন পরিপাক করে এবং তজ্জনিত রস সমূহ পৃথক করে। ব্যানবায়ু সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চরণ করে এবং আহারজনিত সকল রস শরীরে বহন করে। ইহার দ্বারা ঘর্ম্ম নিঃসরণ ও দেহ হইতে রক্ত স্রাব হয়" ইত্যাদি। অতএব দেখা যায় স্নায়ু যন্ত্রের দ্বারা যে সমস্ত দৈহিক কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, বায়ুর দ্বারাও তাহাই ঘটে। সুতরাং এখনকার পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ যাহাকে স্নায়ুর ক্রিয়া বলেন, সুশ্রুতের মতে তাহা বায়ুর ক্রিয়া। শ্বাস, হিক্কা, ঘর্ম্মনিঃসরণ, হৃদয়ের স্পন্দন, অন্ন পরিপাক প্রভৃতি সমস্তই স্নায়ু যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হয়। কিন্তু সুশ্রুত ও চরকের বর্ণনা পাঠ করিলে সোজাসুজি মারুত বা বাতাসকেই বায়ু বলিয়া বোধ হয়। * কারণ শরীরের মধ্যে বাতাস রহিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। আবার সুশ্রুতাচার্য্য এই বাতাসকেই বায়ু বলিয়া গিয়াছেন। আবার অন্যান্য অনেক আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থে বায়ুকে মারুতও বলা হইয়াছে। হিক্কা শ্বাস প্রভৃতি কার্য্য সোজাসুজি বায়ুর দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়; যদিচ ঐ সকল কার্য্যের মূলে স্নায়ু যন্ত্রের সাহায্য আবশ্যক হয়। যেহেতু স্নায়ু ভিন্ন

* চরক বায়ুকে মারুত বলিয়াছেন।

দেহের কোন ক্রিয়াই নিষ্পন্ন হয় না। অতএব আয়ুর্ব্বেদমতে বায়ু অর্থে সোজাসুজি বাতাস এবং স্নায়ুর ক্রিয়া এই দুইই বুঝাইতেছে।

শ্লেষ্মা অর্থে আয়ুর্ব্বেদমতে এখনকার ইংরেজি মিউকশকে বুঝায়। তদ্‌-ব্যতীত শরীরের স্নেহময় পদার্থ এবং শরীরে নিহিত অবস্থান্তর প্রাপ্ত জলীয় পদার্থ বিশেষকে বুঝায়। যথাঃ সুশ্রুত বলেন শ্লেষ্মা উদকক্রিয়ার দ্বারা শরীরের কার্য্য সম্পাদন করে। সন্ধি স্থানে যে স্নেহময় পদার্থ আছে, যাহা সাইনোভিয়াল মেম্‌ব্রেণ (Synovial membrane) হইতে ক্ষরিত হয়, তাহাও আয়ুর্ব্বেদমতে শ্লেষ্মার অন্তর্গত। আবার পিত্ত শব্দে সুধু পিত্ত না বুঝাইয়া আয়ুর্ব্বেদমতে আরও কিছু বুঝায়। যথাঃ—রাগ, পাক, ওজঃ অথবা তেজঃ, মেধা এবং উষ্ণকারিতা আয়ুর্ব্বেদমতে পিত্তের এই পাঁচটী গুণ আছে। অতএব শরীরের তাপোদ্ভাবন কার্য্যও আয়ুর্ব্বেদমতে পিত্ত নামক পদার্থ দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

এইরূপে দেখা যায় বায়ু পিত্ত কফের অর্থ বহুবিস্তৃত। আয়ুর্ব্বেদীয় পণ্ডিতগণ দেহের প্রায় সমস্ত কার্য্যেই এই তিনটীর দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদ বায়ু পিত্ত কফকে মূল পদার্থ বলিয়াছেন। তদ্ব্যতীত আরও সাতটী ধাতু এবং মলকেও শরীরের মূল বলিয়াছেন। সে সাতটী ধাতু এই এইঃ— যথাঃ—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, এবং শুক্র। ইহার যথাক্রমে ইংরেজি নাম এই এইঃ—

রস (lymph) রক্ত (blood) মাংস (flesh) মেদ (fat) অস্থি (bone) মজ্জা (marrow) শুক্র (semen) তদ্ব্যতীত পুরীষ মূত্র ও স্বেদকে শরীরের ময়লা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদমতে ধাতুর অর্থ আমি যেরূপ বুঝিলাম সেইরূপ বলিলাম। আমার মতের সহিত অন্যের মতের মিল নাও হইতে পারে। তবে কোন এক দুর্ব্বোধ জটিল বিষয় সম্বন্ধে সকলেরই আপন আপন মত ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য, এই জন্যই এই প্রস্তাবটীর অবতারণ করিলাম।

হাকিমি মতের চিকিৎসা শাস্ত্রও আয়ুর্ব্বেদ হইতে গৃহীত। এজন্য হাকিমি মতেও বায়ু পিত্ত কফ আছে। হাকিমেরা উহাকে যাহা বলেন তাহা ইংরেজি **humour** শব্দে ব্যক্ত করা যায়। হাকিমদিগের হিউমর ও বায়ু

পিত্ত কফ একই জিনিষ। হাকিমী জ্বর চিকিৎসায় লেখা আছে—বায়ু পিত্ত কফ অথবা রক্ত বিকৃত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জ্বর উৎপন্ন হয় এবং তদনুযায়ী ঔষধ অর্থাৎ বায়ু জ্বরে শীতল গুণবিশিষ্ট ঔষধ প্রয়োগ প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং হাকিমী চিকিৎসায় ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় অতি সামান্য প্রভেদ লক্ষিত হয়।

ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রও হাকিমি হইতে গৃহীত। হিপক্রেটিশ ও গেলেন, চরক ও সুশ্রুত হইতে চিকিৎসা শাস্ত্রের মূল গ্রহণ করিয়াছিলেন ইতিহাস পাঠে এইরূপ জানা যায়। কিন্তু বহু পরিবর্ত্তনে ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্র বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র একথা স্বীকার করেন না, যে, এক বায়ু পিত্ত কফ বিকৃত হইয়া সমস্ত রোগ উৎপন্ন করে। তাহা স্বীকার না করুন, কিন্তু ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ বায়ু পিত্ত কফকে শরীরের humour বলিয়া স্বীকার করেন। এবং এই সকল ধাতুর ন্যূনাধিক্যে যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট মনুষ্য হয়, তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বায়ু পিত্ত কফকে temperament বলেন। ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের মতে চারি রকম ধাতুর মনুষ্য আছে। যথাঃ—

(১) লিম্‌ফেটিক্ বা শ্লৈষ্মিক ধাতু। এই ধাতু প্রবল হইলে শরীর গোলাকার, পরিপূর্ণ (খোল খাল রহিত) হয়। মাংসপেশী নরম হয়। চর্ম্মের নিম্নে মেদ সঞ্চয় হয়, চুল ঘনও নয়, পাতলাও নয়, চর্ম্ম মসৃণ ও তেল তেলে। এবং চক্ষু দুটী যেন ম্যাজমেজেভাব ধারণ করে, যেন ঘুমে অর্দ্ধ নিমিলিত। এই ধাতু বিশিষ্ট লোকে বেশী পরিশ্রম করিতে পারে না। সকল কার্য্যেই যেন আলস্য বোধ হয়। বুদ্ধিবৃত্তি ও তত তীক্ষ্ণ বোধ হয় না। মোটা থলথলে শরীরবিশিষ্ট লোক প্রায় এই ধাতুর হইয়া থাকে।

(২) স্যাংগুইন (Sanguine) বা রক্ত প্রধান ধাতু—শরীর পাতলাও নয় মোটাও নয়, বেশ নধর গড়ন। চক্ষু উজ্জ্বল, নীল বা কাল বর্ণ। চুল পাতলা, বর্ণ গৌর বা উজ্জ্বল শ্যাম। মুখশ্রী লাল বা গোলাপী বর্ণের। গালে টোকা মারিলে যেন রক্ত ফুটিয়া পড়ে। এই ধাতুর লোক অঙ্গ সঞ্চালন প্রিয় হয় এবং চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসে না। শরীরে রক্ত সতেজে ধাবিত হয়।

(৩) কাইব্রস্ বা বিলিয়স্ (পৈত্তিক)—কাল চুল, কাল চর্ম্ম। মাংসপেশী দৃঢ়, সমস্ত গড়ন যেন জড়ান জড়ান, রুক্ষ এবং শক্ত। এই শ্রেণীর লোক অধিকক্ষণ পরিশ্রম করিতে পারে এবং কষ্ট সহ্য হয়। মুখশ্রী নিরানন্দ এবং কর্কশভাব ধারণ করে।

(৪) স্নায়ু প্রধান ধাতু—(নার্ভস্) বা বায়ু প্রধান ধাতু—পাতলা চুল, মুখশ্রী পাণ্ডুবর্ণ, শরীর দুর্ব্বল, অস্থিরপ্রকৃতি, মাংসপেশী পাতলা। সর্ব্বদা মানসিক পরিশ্রম করিতে ভাল বাসে, মস্তিষ্কের ক্রিয়া সতেজ, মন সর্ব্বদা চঞ্চল।

এই চারিটী মূল প্রকৃতি, এই চারিটী সর্ব্বদা অবিমিশ্রভাবে প্রায় দেখা যায় না। প্রায় মনুষ্যই দুই ধাতুর সংযোগে গঠিত। যে সকল ভিন্ন ভিন্ন সংমিশ্রন দেখা যায়, তন্মধ্যে রক্তশ্লৈষ্মিক বাতশ্লৈষ্মিক এবং বাতপৈত্তিক ধাতুই প্রধান।

আয়ুর্ব্বেদ মতেও বাত প্রকৃতি, পিত্ত প্রকৃতি ও শ্লেষ্মা প্রকৃতিই প্রধান। চরক ও সুশ্রুতে এই সকল প্রকৃতির লোক কিরূপ হয় তাহা বিস্তার বর্ণিত আছে। তদ্ভিন্ন মিশ্র প্রকৃতির বিষয়ও উল্লেখ আছে। সে সকল কথা বহুবিস্তৃত এজন্য এস্থলে উদ্ধৃত হইল না, তবে সে সকলের লক্ষণও প্রায় এইরূপই।

শরীরে যে সকল ভাবান্তর উপস্থিত হয় তাহা এই সকল ধাতুর কোন না কোন ক্ষয়বৃদ্ধি বশতঃই হইয়া থাকে। এই সকল শারীরিক পরিবর্ত্তনের বিষয় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র বাতপিত্ত কফ ও সপ্ত ধাতু দিয়া যেরূপ সুন্দর বুঝাইয়া দিয়াছেন, তাহা কোনও ইংরেজি চিকিৎসাগ্রন্থে পাইবার যো নাই। এই সকল ধাতুর ক্ষয়বৃদ্ধি বশতঃ অহরহঃ শরীরের নানা ভাবান্তর সংঘটিত হইতেছে। এই সকল ভাবান্তর শারীরিক কোন অতীন্দ্রিয় structural change বা বিধানের পরিবর্ত্তন বশতঃ ঘটিতেছে। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ যেমন এই পরিবর্ত্তনের সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইংরেজি চিকিৎসাশাস্ত্র সেরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় ওরূপ সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা কোন ইংরেজি গ্রন্থে দেখা যায় না। স্নান না করাতে একটু বায়ু রুক্ষ হইল, বা শরীরের শ্লেষ্মা (স্নেহ পদার্থ) কম পড়িয়া রাত্রে ঘুম কম হইল। পরদিন স্নান করিবামাত্র সেই ধাতুটুকুর পূরণ হইয়া বেশ একটু নিদ্রা হইল।

এইরূপ মনুষ্যের প্রকৃতি বা ধাতু আয়ুর্ব্বেদ যেমন সহজে বুঝাইয়া দিয়াছেন পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র এত জীবরসায়ন (animal chemistry) এবং ফিজিওলজি শাস্ত্রের উন্নতি করিয়াও এরূপ বুঝাইতে সক্ষম হন নাই।

পরন্তু ইংরাজীমতেই চিকিৎসা কর, আর কবিরাজী মতেই কর, শরীরের প্রকৃতিটী বুঝিয়া চিকিৎসা করা অতীব কর্ত্তব্য। ডাক্তারগণ এই প্রকৃতি গুলির বিষয় আদৌ মনে না রাখিয়া রোগীকে ক্রমাগত ঔষধ খাওয়ান। তাহাতে কোন না কোন ধাতু কুপিত হইয়া রোগটী কোন কোন স্থলে বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। রুক্ষধাতু বা বায়ুধাতু গ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ক্রমাগত তীক্ষ্ণবীর্য্য ও রুক্ষ গুণশালী ঔষধ প্রযোজ্য নহে। অনেকে রোগীকে আদৌ স্নান করিতে দেন না। ওদিকে রাত্রে রোগীর আদৌ নিদ্রা হয় না। তখন নানারূপ নিদ্রাকারক ঔষধ ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এইসকল স্থলে মাথায় একটু সামান্য তৈল জল দিলে যে কায হয়, শত ঔষধে তাহা হয় না। ইংরাজী চিকিৎসাগ্রন্থে বড় বড় রোগের নিদান ও চিকিৎসা বর্ণিত আছে। ইংরেজী স্বাস্থ্যরক্ষার গ্রন্থ সমুদয়ে বড় বড় স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম, দেশের জল হাওয়া ভাল করিবার কথা লেখা আছে। গৃহ পরিষ্কার রাখা, গৃহে বায়ু সঞ্চালন করা প্রভৃতি বড় বড় বিষয়ের তর্ক আছে। কিন্তু নিজের নিজের শরীরটি ঠিক কিরূপ ভাবে ভাল রাখা যায় তাহার ব্যবস্থা বড় ভাল নাই। এইরূপ নিজ নিজ শরীরের ভাবান্তর ও তাহার প্রতিকার আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। রাত্রে ঘুম হইতেছে না, পদদ্বয়ে একটু তৈল ও জল দিলাম, আর অমনিই ঘুম হইল, একটু শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হইল। আবার শরীরটী আজ হঠাৎ ভার বোধ হইল অথচ এখনও কোনও রোগ হয় নাই, অদ্য স্নান বন্ধ করিলাম, বা তৈল মাখিলাম না, আর শরীরটী পাতলা বোধ হইল। পরন্তু শরীরে এমন অনেক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে, যাহা প্রকৃত পক্ষে রোগ বলিয়া গণ্য নহে এবং যাহা চিকিৎসকগণকেও বুঝাইয়া বলা যায় না। এই সকল স্থলে আয়ুর্ব্বেদোক্ত নিয়মে বাতপিত্ত কফের সমতা বিধান করিয়া চলিলেই শরীরটী বেশ ভাল থাকে। কাহার ধাতুতে কি সহ্য হয় না হয় তাহা সে যেমন আপনি বুঝিতে পারে অপরে তেমন পারে না। সুতরাং শরীরস্বাস্থ্য সম্বন্ধে সুধু চিকিৎসকের পরামর্শের উপর নির্ভর না করিয়া আপন আপন প্রকৃতি বুঝিয়া চলা

উচিত। তবে রোগ উপস্থিত হইলে পদে পদে চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

আয়ুর্ব্বেদীয়-ধাত্রীবিদ্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মহা। প্রিয়ে! তাও কি হয়? উপযুক্ত বীজ উপযুক্ত ক্ষেত্রে বপন করিলে তাহা হইতে যেমন আশানুযায়ী শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ উৎকৃষ্ট বীজ যে কোন ক্ষেত্রে ছড়াইয়া ফেলিলেই কি সেইরূপ হয়? আবার সকল প্রকার বীজ কখনো সকল প্রকার ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইতে পারে না; কোন কোন শস্য উৎপন্ন হইতে রসাল ক্ষেত্রের আবশ্যক হয়, কোন কোন শস্য একবারেই তাহাতে হয় না। জরায়ুজ প্রাণীর উৎপত্তি সম্বন্ধেও তাহাই জানিবে। মানুষ, গরু প্রভৃতি প্রাণীগণ জরায়ু ব্যতীত আর কোথায়ও সংগঠিত হইতে পারে না, উহাই তাহাদের পক্ষে একমাত্র উপযুক্ত ক্ষেত্র। ঐ ক্ষেত্র স্ত্রীলোকের দেহ ভিন্ন আর কোথায়ও গঠিত হয় নাই। ইহা ঠিক্ জানিও যে এক একটী জীব-দেহ এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের আদর্শ স্বরূপ; ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে জীব-দেহেও তাহাই আছে, ব্রহ্মাণ্ড যেমন তোমা কর্ত্তৃক একবার চালিত হইয়া সেই নিয়মেই চলিয়া আসিতেছে, জীব-দেহও সেইরূপ মাতৃগর্ভে অবস্থিতি করিয়া সেই দেহস্থিত প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান এবং সমান কর্ত্তৃক দশমাস পর্য্যন্ত চালিত হইয়া পরে সেই নিয়মেই অবিরত চলিয়া থাকে। আবার এই ব্রহ্মাণ্ডও যেমন একদিন প্রকৃতিবশে উপযুক্ত সামগ্রীর অভাবে আমাতে বিলীন হইবে, জীব-দেহও সেইরূপ মধ্যে মধ্যে বিনাশ হইয়া থাকে। এইজন্যই জীব-দেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড কহে।

পার্ব্ব। নাথ! এই যে জরায়ুর কথা কহিলে, এই জরায়ু কি? এবং ইহার আকৃতিই বা কিরূপ?

মহা। মলদ্বার এবং মূত্রদ্বার ইহার মধ্যভাগে যে একটী দ্বার লক্ষিত হয়, তাহাকে যোনিদ্বার কহে। ইহার আকৃতি ঠিক্ সংখ্য নাভির ন্যায় এবং ইহার অভ্যন্তরে তিনটী আবর্ত্ত আছে। তাহারই তৃতীয় আবর্ত্তে

রোহিতমৎস্তের মুখের স্থায় যে একখান আবরণ লক্ষিত হয়, তাহাকেই গর্ভশয্যা বা জরায়ু কহে। এই গর্ভ-শয্যার স্থিতি এবং আকৃতি প্রায়ই রোহিত মৎস্তের মুখের স্থায়। অর্থাৎ রোহিত মৎস্ত যেমন জলমধ্যে অবস্থিতি করে, ইহাও তেমনি পিত্তাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যে স্থাপিত রহিয়াছে। রোহিত মৎস্তের যেমন মুখ ক্ষুদ্র কিন্তু আশয় মহৎ, তদ্রূপ গর্ভশয্যার মুখ ক্ষুদ্র হইলেও তাহার আশয় মহৎ। ইহাই জীবোৎপাদনের একমাত্র ক্ষেত্র।

পার্ব্ব। ঋতুকাল কাহাকে বলে? কেনই বা সেই সময় রমণীদিগের যোনিদ্বার দিয়া শোণিত-স্রাব হয়? এবং কি প্রকারেই বা সেই শোণিতের উৎপত্তি হইয়া থাকে?

মহা। সুকুমারী কামিনীগণ কৌমার অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলে তাহাদের দেহস্থ রস আর্ত্তবরূপে পরিণত হয় এবং সময় সময় ঈষৎ বিবর্ণ হইয়া বায়ু সহকারে যোনিদ্বারা নির্গত হইয়া যায়। এই সময়কেই ঋতুকাল কহে। শরীরস্থ ভুক্ত বস্তু বারম্বার পক্ক হইতে হইতে রক্ত, মাংস, মেদ, প্রভৃতি কান্তিজনক ও পুষ্টিকারক এক একটী পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপে এক মাসের পর পুরুষের শুক্র এবং স্ত্রীলোকের আর্ত্তব প্রস্তুত হয়। আর্ত্তব ব্যতীত স্ত্রীদিগেরও আবার শুক্রবৎ এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহাও গর্ভ গ্রহণের অন্যতম কারণ। দ্বাদশবৎসর হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি মাসে এক একবার করিয়া স্ত্রীদিগের এই আর্ত্তবস্রাব হইয়া থাকে এবং উহা সাধারণতঃ তিন দিন কাল স্থায়ী থাকে। তবে শারীরিক বল এবং কোন প্রকার ব্যাধির তারতম্যানুসারে এই নিয়মের বিপরীত ভাবও কোন কোন সময় কোন কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে দৃষ্ট হয়। তাই বলিয়া তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। যে সময় হইতে নারী-দেহে অধিক পরিমাণে আর্ত্তব সংগৃহীত হয় এবং মাসে মাসে তাহা নির্গত হইয়া যায়, সেই সময় হইতে দৈহিক উপাদান অতিরিক্ত রূপে উৎপন্ন হইতে পারেনা বলিয়াই তখন দেহ-বৃদ্ধির ব্যাঘাত জন্মায়। এইজন্য যৌবনকাল উপস্থিত হইলে আর শৈশবের স্থায় কাহারো দেহ-বৃদ্ধি হয়না। পুরুষের দেহ-বৃদ্ধি সম্বন্ধেও এই নিয়ম জানিবে। তবে শৈশব কালেও যে পুরুষের শুক্র এবং স্ত্রীলোকের আর্ত্তব না থাকে এমন নয়,

কিন্তু অত্যন্ত অল্পতাপ্রযুক্ত তাহাতে পুষ্টিকারক পদার্থোৎপাদনে কোন প্রতি-বন্ধক জন্মায় না, সুতরাং অনায়াসে ক্রমশঃ দেহ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

পার্ব্ব। নাথ! রমণীগণ গর্ভবতী হইলে প্রায়ই তাহাদিগকে পীনোন্নত পয়োধরা ও সুপুষ্টা হইতে দেখা যায়, কিন্তু সন্তান প্রসব হইলে কিছুদিন পরে আর সেরূপ থাকেনা, ইহার কারণ কি ?

মহা। গর্ভবতী নারীর আর্ত্তববাহী পথ সকল অবরুদ্ধ হয়, সুতরাং সেই সময় তাহারা রজঃস্বলা হইতে পারে না, সেই সকল আর্ত্তব কাল-সহকারে ঊর্দ্ধগামী হইয়া প্রথমতঃ গর্ভের আবরণ রূপে পরিণত হয় এবং পরে আরও ঊর্দ্ধগামী হইয়া স্তনদ্বয় পর্য্যন্ত ধাবিত হয়, তাহাতেই স্তনদ্বয় আয়ত ও পীনোন্নত হইয়া থাকে। ঐ সকল শুক্ক আর্ত্তব আরও ঊর্দ্ধে উঠিলে অক্ষিপুট অপেক্ষাকৃত স্থূল ও মুখশ্রী সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য হইয়া পড়ে।

পার্ব্ব। কিপ্রকার আর্ত্তব সম্পূর্ণরূপ নির্দ্দোষ এবং গর্ভ গ্রহণের পক্ষে একান্ত হিতকর ?

মহা। যাহা লাক্ষাধোয়াজল বা শশক রক্তের ন্যায় ঈষৎ বিবর্ণ, যাহা কাপড়ে লাগিলে ধুইবামাত্রেই অমনি উঠিয়া যায়, কিছুমাত্র দাগ থাকে না, তাহাই বিশুদ্ধ এবং তাহাতেই গর্ভ গৃহীত হইয়া থাকে। ইহার অন্যথা হইলে আর্ত্তবকে দোষযুক্ত বলিয়া জানিবে এবং তাহা হইতে কখনও গর্ভ সঞ্জাত হয় না।

পার্ব্ব। এইমাত্র যে শুক্রের কথা কহিলেন, সেই শুক্রের সাধারণ গুণ কি ? এবং কিপ্রকার অবস্থাপন্ন হইলেই বা তাহার গর্ভোৎপাদিকা শক্তি বজায় থাকে ?

মহা। শুক্র সৌম্য, শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, বল এবং পুষ্টিকারক। উহাই গর্ভের বীজ, শরীরের সার এবং জীবনের প্রধান আশ্রয়। দেহস্থ শুক্রের ক্ষয় হইলে দেহী কখনো জীবন ধারণ করিতে পারে না। যে শুক্রের বর্ণ স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল, যাহা দ্রব, স্নিগ্ধ, মধুর এবং মধুগন্ধি, তাহাতেই গর্ভোৎপত্তি হইয়া থাকে।

পার্ব্ব। এই শুক্র কোথায় অবস্থিতি করে ? এবং কি প্রকারেই বা স্খলিত হইয়া জরায়ু মধ্যে বিশ্ব-বিমুগ্ধকর অপূর্ব্ব কারুনৈপুণ্য প্রকাশ করে ?

মহা। পূর্ব্বেই কহিয়াছি শরীরস্থ ভুক্ত বস্তু বারম্বার পচ্যমান হইয়া

যথাক্রমে রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি এবং মজ্জারূপে পরিণত হয়। ইহার প্রত্যেক বারেই কিছু কিছু করিয়া মলভাগ অবশিষ্ট থাকে এবং উহা সমশ্রেণী ধাতু সকলকে ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্ট করিয়া যথাক্রমে বিষ্ঠা, মূত্র, মেদ, মল, ঘর্ম্ম, কর্ণমল এবং নখ কেশাদিরূপে বহির্ভাগে নিক্ষিপ্ত হইয়া শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পরে মজ্জা হইতে উদ্ধৃত সারাংশও পূর্ব্ববৎ পচিত হইয়া শুক্রস্থানে উপস্থিত হয় এবং শুক্রধাতুকে যথোচিত পরিপোষণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদায় শরীরস্থ ত্বকের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাই শুক্রের অবস্থিতির স্থান। যেপ্রকার দুগ্ধে ঘৃত এবং ইক্ষু-দণ্ডে রস নিয়ত ব্যাপ্ত থাকে, কিঞ্চিৎ পীড়ন করিলেই তাহারা বাহির হইয়া পড়ে, তদ্রূপ কামমদে-প্রমত্ত-পুরুষ মদোন্মত্তা প্রমদাগণের সহিত উপগত হইবার সময় তাহাদিগের যোনি-মেঢ্র সংঘর্ষণে যে তাপোদয় হইয়া থাকে, সেই তাপ দ্বারা পুরুষের দেহস্থ শুক্র একটু একটু করিয়া দ্রবীভূত হয় এবং ধরাধরস্থিত নির্ঝরের ন্যায় ঝর্ ঝর্ শব্দে মেহনমার্গ দ্বারা প্রবল-বেগে নারীর ভগে পতিত হয়। এই শুক্র আগত আর্ত্তবের সহিত মিশ্রিত হইলে পরিশেষে গর্ভাকারে পরিণত হইয়া থাকে।

পার্ব্ব। এইক্ষণ জরায়ু মধ্যে যে প্রকারে জীব-সঞ্চার হয়, তাহাই বিশেষ করিয়া শুনিতে পারিলে আমার বাসনা চরিতার্থ হয়।

মহা। যেদিন হইতে রমণীদিগের প্রথম রজঃ নিঃসৃত হইতে আরম্ভ হয়, সেইদিন হইতে ষোড়শ দিন পর্য্যন্ত যে কাল, সেই কালকেই তাহাদিগের ঋতুকাল কহে। ইহাই গর্ভ গ্রহণের প্রকৃত সময়। এই সময় কামিনীগণের কাম-প্রবৃত্তি কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং পতি সহবাসের বাসনা নিতান্ত বলবতী হয়। দিবাকর করে কমলিনী দল যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে এবং নিশাগমে আবার অধোবদনে একবারে মলিন হইয়া যায়, সেইরূপ ঋতুকাল উপস্থিত হইলে রমণীদিগের জরায়ুর মুখ খুলিয়া যায় এবং উহা ষোড়শ দিন পর্য্যন্ত ঐ রূপ থাকিয়া শেষে আবার মুদিত হয়। সুতরাং ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে স্ত্রীসম্ভোগ করিলে তাহাতে কখনো সন্তানোৎ-পত্তি হইতে পারে না। তবে ব্যাধি পীড়িতা রমণীদিগের পক্ষে নিয়মিত রূপে কিছুই সম্পন্ন হয় না। কাহারো বা জরায়ুর মুখ দুই এক দিন বেশি ও আল্‌গা থাকে, আবার কাহারো বা দুই এক দিন পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়া যায়।

এমন কি কোন কোন স্ত্রীলোককে আবার মাসের মধ্যে দুইবার করিয়াও ঋতুবতী হইতে দেখা যায়। এই সকল স্ত্রীলোকদিগের শরীরে কোন পীড়ার বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ না পাইলেও ইহাদিগকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলিয়া কখনো মনে করা উচিত নয়। বিনা কারণে মাসের মধ্যে কখনো দুইবার ঋতুবতী হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় দৈবাৎ কাহারো গর্ভ গৃহীত হইলে সেই গর্ভকে বিকৃত গর্ভ বলিয়া স্থির করাই উচিত। আবার বিবেচনা করিয়া দেখিলে রজঃ নিঃসরণের প্রথম তিন দিনও স্ত্রীসহবাস বর্জ্জন করা উচিত। কেন না এই সময় রমণীদিগের অত্যন্ত শোণিতস্রাব হইয়া থাকে, সুতরাং নিষিক্তবীর্য্য স্রোতপথে পতিত হইয়া ভাসিয়া যায়। তাহাতে কখনো গর্ভগৃহীত হইতে পারে না। লাভের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই নানাপ্রকার গুরুতর পীড়া জন্মে। চতুর্থ দিনে ঋতুবতী নারী অঙ্গাদি মার্জ্জন করিয়া স্নান করিবে এবং শোণিতস্রাব বন্দ হইলে উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া স্বামীর নিকট গমন করিবে। তখন উভয়ে হৃষ্টচিত্তে অপত্যার্থী হইয়া পরস্পর সুরতরূপব্যায়ামে নিযুক্ত হইবে। এই রূপ করিলে হর্ষবশতঃ পুরুষের দেহ হইতে নির্দ্দোষ বীর্য্য স্খলিত হইয়া সবেগে রমণীর জরায়ু মধ্যে পতিত হয়, কিছুকাল পরে আবার তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া জরায়ু-পার্শ্বস্থিত ডিম্বাশয়ে আশ্রয় লয় এবং গর্ভ-গ্রহণোপযোগী উপাদানের সহিত মিশ্রিত হইয়া পুনর্ব্বার জরায়ু মধ্যে অবস্থিতি করে। যে প্রকার সূর্য্য-কিরণ সংযোগে সূর্য্যকান্ত মণি হইতে অগ্ন্যুদ্গম হইয়া থাকে, অথচ কেহই তাহার কোন কারণ উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হয় না, সেইরূপ নির্দ্দোষ শুক্র জরায়ু-মধ্যস্থিত নির্দ্দোষ আর্ত্তবের সহিত মিশ্রিত হইয়া গর্ভ-মধ্যে জীব সঞ্চার করে। প্রতিনিয়ত পরিদর্শন করিয়াও কেহ ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারে না। অর্থাৎ সেই অব্যক্ত, অনন্ত, বাক্য ও মনের অতীত, একরূপী আত্মা জগতের হিতের জন্য মায়াময় হইয়া কিপ্রকারে যে গর্ভ-মধ্যে প্রবেশ করে, অল্পদর্শী স্থূলবুদ্ধি মানব তাহার বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারে না। এইরূপে গৃহীত-গর্ভ (জীব) প্রতিদিন একটু একটু বর্দ্ধিত হইয়া, হৃদয়, ফুস্‌ফুস্, যকৃত, প্লীহা, পিত্তাশয়, পক্কাশয় প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্রগুলী যথানিয়মে পরিপুষ্ট করিয়া, এবং মাতৃদেহস্থিত সেই সেই যন্ত্রগুলী যে নিয়মে কার্য্য করে ও চালিত হয়, সেই নিয়মে

কার্য্য করিবার ও প্রতিচালিত হইবার ক্ষমতা লাভ করিয়া কাল সহকারে ভূমিষ্ট হয়। কোমল বস্তুমাত্রই যে ছাঁচে ঢালা যায়, সেই অনুসারেই তাহার আকৃতি হইয়া থাকে, এই জন্যই মাতার আকৃতির সহিত সন্তানের আকৃতির সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আবার গর্ভ-গ্রহণোপযোগী শুক্রের মধ্যে জীবোৎপাদক যে পদার্থ আছে, তাহার সহিত পিতার সাদৃশ্যতা বশতঃই সন্তানও পিতার ন্যায় হয়। অথবা পিতা মাতা উভয়ের মিশ্রিত আকৃতির ন্যায়ও সন্তানের আকৃতি হইতে পারে।

পার্ব্ব। গর্ভোৎপত্তি হইল কি না, সঙ্গমকালে তাহা জানিবার জন্য কি কোন উপায় আছে?

ক্রমশঃ—

উমারপুর, নাকালিয়া, পাবনা। } শ্রী প্রসন্ন চন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

উত্তরে প্রত্যুত্তর।

পাঠকগণের স্মরণ আছে যে, ডাক্তার হরনাথ বাবু এই সম্মিলনী পত্রিকায় "হোমিওপ্যাথিমতে জ্বর চিকিৎসা" নাম দিয়া ডাক্তারীও কবিরাজী চিকিৎসার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেন। তাহার পর আমি তাঁহার সেই সকল কথার প্রতিবাদ করিয়া একটী প্রবন্ধ লিখি। তাহার পর আবার হরনাথ বাবুও কিঞ্চিৎ উত্তর লিখেন। এই পর্য্যন্তই বিবাদ শেষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সম্প্রতি "হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক" মাঝে পড়িয়া ঝগড়া করিতে আসিয়া আমার উপর অকারণ কতকগুলি গালিবর্ষণ করিয়াছেন। ঢিল মারিলেই পাট্‌কেল খাইতে হয়, তাহা আমি জানি। আমি যখন হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করি, তখনই আমি জানিয়াছি যে, আমি বোল্‌তার চাকে খোঁচা মারিয়াছি। বলি ভাই যদি সামান্য অঙ্গুলিহেলনে অটল অচল কম্পিত হয় না, তবে আর কোমর বাঁধিয়া ঝগড়া করিতে আসার কি প্রয়োজন ছিল? আমি হোমিওপ্যাথিকে গোটাকতক ঠাট্টা করিয়াছি মাত্র, সুধু আমি বলিয়া নহে, হোমিওপ্যাথির রোগী পর্য্যন্ত হোমিওপ্যাথিকে ঠাট্টা করে, তবে আর এত রাগ কেন? আমি যদি

সামান্য সপ্তমবর্ষীয় বালকের ন্যায় ভুল কথা বলিয়া থাকি, তবে তাহা হাঁসিয়া উড়াইয়া দিলেই হইত। "হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক" ঠিকই বলিয়াছেন, যে তর্ক বিদ্যাবুদ্ধির ফল। আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে, হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসক তাঁহার উত্তর নামক প্রবন্ধে তাদৃশ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন নাই, কেবল এক গলাবাজিই সার করিয়াছেন।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মহাশয়ের প্রবন্ধটী পাঠ করিলে যেন বোধ হয় যে, উনি চক্ষু মুদিয়া বক্তৃতা করিতে বেশ পটু। আমি হোমিওপ্যাথিককে শুধু একটু ঠাট্টা করিয়াছি কিন্তু সে ঠাট্টার মধ্যেও যুক্তিতর্ক আছে, হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসকের সাধ্য নাই যে তাহার প্রতিবাদ করেন। আমি কি বলিয়াছি অগ্রে তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া তবে তাহার প্রতিবাদ করা উচিত ছিল, যদি তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই অথবা বুঝিয়াও বোঝেন নাই, তবে তাহার প্রতিবাদ না করাই উচিত ছিল।

আমি Similia Similibus অর্থে সমানে সমান করিয়াছি। আপনি বলিলেন তা নয়, কথাটা "সদৃশে সদৃশ"। এটী সামান্য কথার মারপেচঁ মাত্র। বাঙ্গালা ভাষায় অনেক স্থলে সমান কথা সদৃশ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আপনি সদৃশ অর্থে যাহা বুঝিয়াছেন আমিও সমান কথাটী সেই অর্থেই ব্যবহৃত করিয়াছি। যে হেতু আমি পরেই বলিয়াছি যে বিন্দুমাত্র অহিফেনে শরীরের ভিতর কি করিয়া নিদ্রা আসার ন্যায় রোগ উপস্থিত করিবে? ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব আমি সমান কথাটী Similar বা like অর্থেই ব্যবহার করিয়াছি। আর না হয় আমার ভ্রম স্বীকার করিলাম, আপনার কথাই থাকিল। এখন জানিলাম যে হোমিওপ্যাথির থিওরি বা Law হচ্ছে Similia Similibus (like cures like and not "Ooqualia Ooqualibus" (ISopathy) তাহা হইলেই বা হয় কই? আমি লিখিয়াছি সিনা নামক ঔষধে কখনও ক্রিমি নামক জন্তু সৃষ্ট হয় না। আপনি লিখিয়াছেন পুলিন বাবুর যেমন হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, তেমনি তর্ক যুক্তি ও রসিকতা * * * কোন ঔষধ কর্ত্তৃকই কোন রোগ সৃষ্ট হয় না" ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার হোমিওপ্যাথিতে গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন নাই, যেহেতু আমি হোমিওপ্যাথ নই। কিন্তু আপনার হানিমান কি বলেন দেখুন। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়া বুঝাইবার সময় হানিমান বলেন—

And thus in the process of a homœopathic cure, by administering a medicinal potency chosen exactly in accordance with the similitude of symptoms, a somewhat stronger, similar artificial morbid affection is implanted upon the vital power. This artificial affection is substituted as it were for the weaker natural disease &. &.

অর্থাৎ হানিমানের মতে যে ঔষধে যেরূপ লক্ষণ উপস্থিত হয়, তৎসদৃশ লক্ষণাক্রান্ত রোগে সেই ঔষধ প্রয়োগ করিলে শরীরের ভিতর স্বাভাবিক রোগের সদৃশ আর একটী অধিকতর বলবান্ রোগ উপস্থিত হয়। ঐ বলবান্ ঔষধজনিত রোগ (drugdisease) স্বাভাবিক দুর্ব্বল রোগকে বিনাশ করে। এখানে উভয়রোগে পরস্পব যুদ্ধ হয় কি না? অতএব হোমিওপ্যাথি মতে রোগ আরাম করিতে হইলে সদৃশ ঔষধ দ্বারা আর একটী রোগ উৎপন্ন করা চাই। এই জন্যই আমি লিখিয়াছি। সিনা নামক ঔষধে ক্রিমি নামক জন্তু সৃষ্ট হয় না।

* এক্ষণে ক্রিমি ভিন্ন অন্য কোন জন্তুতে ক্রিমির ন্যায় লক্ষণ উৎপন্ন করিতে সমর্থ নহে। বিশেষ ক্রিমি নানা জাতীয় আছে। এর মধ্যে দুই রকম অর্থাৎ সুতার ন্যায় ক্রিমি এবং কেঁচোর ন্যায় বড় ক্রিমি এক জাতীয় সুতরাং তাহারা Similar বা সদৃশ। সুতরাং ছোট ক্রিমিজনিত পীড়া হইলে হোমিওপ্যাথির নিয়মানুসারে বড় ক্রিমি রোগীকে খাওয়াইলে ছোট ক্রিমির প্রতিকার হইতে পারে, যেহেতু বড় ক্রিমি (লম্বা ক্রিমি বা round-worm) ছোট ক্রিমি (thread-worm) অপেক্ষা stronger (বলবান) অথচ উহার similar বা সদৃশ। ভরসা করি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মহাশয় এই নূতন ঔষধ আবিষ্কারের জন্য আমাকে ধন্যবাদ দিবেন। যদি ইহাতেও আপত্তি থাকে, তবে ক্রিমি রোগে কেঁচ খাওয়াইলে মন্দ হয় না, যেহেতু কেঁচ (Earth worm) ও ক্রিমি সদৃশ জন্তু। হানিমান বলেন

In the living organism a weaker dynamic affection is permanently extinguished by a stronger one if the latter (deviating in kind) is very similar in its manifestations to the former.

* Organon on the art of healing 5th American Edition, page 184.

হানিমান কথাগুলি ঠিকই বলিয়াছেন কিন্তু হানিমান শিষ্যেরা similia similibus অর্থাৎ সদৃশ বিধান অত্যন্ত বিস্তৃত অর্থে খাটাইতে গিয়া অনেক স্থলে গোলযোগ বাধাইয়াছেন। ক্রিমির দংশনজনিত লক্ষণ ও সিনার লক্ষণ সদৃশ নহে, প্রত্যুত অত্যন্ত বিসদৃশ পদার্থ। বিরাল ও বনবিরাল সদৃশ জন্তু, অতএব যদি বন বিরালে হাত কামড়াইয়া ধরে, তবে বনবিরালটী মারিয়া বা ছাড়াইয়া না ফেলিয়া কি গৃহবিরালের টাংচায় খাওয়াইতে হইবে? না তাহাতে বন বিরাল হাত ছাড়িয়া দিবে!

কি চমৎকার যুক্তি! হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বলেন "পুলিন বাবু লিখিয়াছেন হোমিওপ্যাথি মত সত্য হইতে গেলে "কোন স্থান অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া গিয়া যদি বেদনা উপস্থিত হয় তবে সেই স্থলে অল্প অল্প দা দিয়া কাটিলে রোগীর অবশ্যই রোগ উপশম হওয়া উচিত। তারপরেই আমাকে তিরস্কার করা হইয়াছে যে, পুলিন বাবুর হোমিওপ্যাথি পড়িয়া বুঝি এই জ্ঞান হইয়াছে ইত্যাদি। পুলিন বাবু এমন কথা বলেন না, পুলিন বাবু তার পর কি বলিয়াছেন দেখুন—"যেহেতু অল্পদায়ের আঘাতে কখনও Vital power জীবনী শক্তি নষ্ট হয় না। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক আমার ধৃষ্টতা দেখিয়া অবাক হইয়াছেন। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক আমার বক্তব্য বিষয়ের প্যারাগ্রাফের মাঝখান হইতে দুই লাইন তুলিয়া দিয়া আমার ভ্রম বলিয়া সাধারণের চক্ষে ধরিয়া দিয়াছেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের এব্যবহারকে ভদ্রলোকে কি বলে? মহাশয়ের জ্ঞান যদি তত গভীর হইত তবে সব কথা গুলি তুলিয়া প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের জ্ঞান যদি তত গভীর নয়, যদি অতদূর বুঝিয়া প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা যোগাইয়া উঠে নাই, তবে সাধারণের চক্ষে ধুলা দিবার কি প্রয়োজন ছিল?

এলপ্যাথির Principle বা ভিত্তি আছে না আছে সে কথায় প্রয়োজন নাই। এলপ্যাথির নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। কিন্তু হোমিওপ্যাথির ত principle আছে। শুধু Principle বলিলে যদি বিজ্ঞান হইত, তবে আর ভাবনা ছিল না, বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা করিবেন Why like cures like? হোমিওপ্যাথরা তাহার উত্তর দিতে সক্ষম হন নাই। ইংলণ্ড ও আমেরিকার হোমিওপ্যাথি মতের বিরুদ্ধে অনেক গলাবাজী হইয়া গিয়াছে স্বীকার করি,

কিন্তু হোমিওপ্যাথরা এলপ্যাথদিগের গলাবাজির একটীও যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক উত্তর দিতে পারেন নাই। হোমিওপ্যাথির একটীবই Principle নাই। ঐ Principleএর মূলে বিলক্ষণ গোলযোগ আছে; এজন্যই হানিমানের অনুবাদক একজন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক এম, ডি মহাশয় বলিয়াছেন "As for the rule similia similibus curanter, physicians agree that it is the most practical guide to aid us in the selection of most, perhaps of all medicines. We accept it as an empirical fact, not as a theory or hypothesis. The explanations of its workings are as numerous and as varied as they are unsatisfactory from Hannemann to the recent expounder" অর্থাৎ এপর্য্যন্ত কোন হোমিওপ্যাথ বলিতে পারেন না যে, কেন সদৃশে সদৃশ রোগ আরাম করে? এইত হোমিওপ্যাথি, তবে আর তাহা লইয়া প্রতিবাদ কেন? আমাকেই বা গালি দেওয়া কেন? এলপ্যাথির থিওরি Contraria Contraries নহে। এই নামটী এলপ্যাথিকে হানিমান প্রদান করিয়াছেন। হানিমানের সময়ে এলপ্যাথি চিকিৎসা প্রায়ই Contraria Contraries নিয়মে সম্পন্ন হইত। এখন আর সেদিন নাই। But what is allopathy, ask nature and she will answer you?

কুকুরের বা বিরালের উদরের অসুখ হইলে তাহারা আপন আপন ঈশ্বরদত্ত প্রকৃতির বশ হইয়া ঘাস খাইয়া বোমি করে। চক্ষে আঘাত লাগিবার পূর্ব্বেই আমরা চক্ষু মুদিয়া ফেলি, গাত্রে মশা বসিলে আমাদের অজ্ঞাতসারে হাতটী গিয়া মশাটী মারিয়া ফেলে, কুকুর গ্রীষ্মে উত্তপ্ত হইলে জলে নামিয়া পড়ে, ইহাই এলপ্যাথি চিকিৎসা এবং এই স্বভাবদত্ত ঔষধ সকল পাইবার জন্যই এলপ্যাথরা সেই চরক ও সুশ্রুতের আমল হইতে এপর্য্যন্ত চেষ্টা করিতেছেন। এলপ্যাথির একটা থিওরি নাই। উহার অনেক থিওরি আছে, একটা থিওরি থাকিলেই সায়েন্‌স্ (Science) হয় এবং অনেক থিওরি থাকিলে সে বিজ্ঞান নয়, এমন কোন কথা নাই। লডার ব্রন্টন অনেক হোমিওপ্যাথিক ঔষধ লইয়াছেন, কিন্তু হোমিওপ্যাথরা কিসে আরাম হয়, তাহা বুঝিতে পারিতেছিলেন না; লডার ব্রন্টন তাহাই চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, লডার ব্রন্টন কোন স্থানেই

হোমিওপ্যাথিক বিন্দুমাত্র মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগের উপদেশ দেন নাই। কেন আরাম হয় তাহা জানি না, তবে করিয়া দেখ ফল পাইবে, এই ভিন্ন হোমিওপ্যাথির স্বাপক্ষে আর কোন কথা বলিবার নাই। এলপ্যাথি ত জগা খিচুড়ি, হোমিওপ্যাথিই কোন্ কম। বেশ কথা কুইনাইন কম্পজ্বরের হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, তবে অন্যান্য ঔষধ যেমন বিন্দুমাত্রায় প্রয়োগে ফল দর্শে; কুইনাইন সেইরূপ বিন্দুমাত্রায় প্রয়োগ করিলে কেন জ্বর বন্ধ হয় না? তার বেলায় Potency পোটেন্সি বাড়ে না কেন? Potency বাড়ে ইপিকাকের বেলা। যাক আর বিবাদে কায নাই। আমি যখন হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধে লিখি, তখন আমি সম্মিলনীর একজন লেখক মাত্র ছিলাম। এখন আমাকে সম্মিলনীর সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। আমাদের উদ্দেশ্য কোন বিষয়ে গোঁড়ামি করিব না, অতএব আমাদের আর ইচ্ছা নয় যে, হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করি। অতএব হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মহাশয় মাপ করিবেন। সম্পাদক।

দেশীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।

আহারতত্ত্ব।

গত দুই বারে মধুরাম্লাদি ছয় প্রকার রসের কেবল অসংখ্য গুণকাহিনী বর্ণন দ্বারাই আমরা পাঠকবর্গের তৃপ্তিসাধন করিয়াছি। কিন্তু এবারে আর তাহা পারিতেছি না। অম্লমধুরাদি পৃথক্ পৃথক্ রসপ্রিয় পাঠকগণ আমাদের রসকাহিনী পাঠ করিয়া হয়ত অবশ্যই আনন্দে গদ্‌গদ হইয়াছেন, এবং জিহ্বার পরিমাণও যে কিছু বৃদ্ধি না পাইয়াছে এমন নহে, কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, মধুরাদিদ্রব্য জিহ্বাসংলগ্নমাত্রেই যেমন অপার আনন্দদায়ক এবং উদরে প্রবেশ করিয়া পুষ্টিকরাদি অসংখ্য গুণদায়ক হয়, পক্ষান্তরে এই সমস্ত রস এহেন গুণশালী হইলেও নিরন্তর অধিক মাত্রায় সেবিত হইলে ইহারা ভয়ানক অনিষ্টজনক হইয়া থাকে। আচার্য্যগণ বলিয়াছেন "সর্ব্বরসাভ্যাসই শ্রেষ্ঠ" অর্থাৎ ভোজনকালে হোমিওপ্যাথি মতের বিরুদ্ধই প্রবৃত্তি অনুযায়ী কিঞ্চিৎ [illegible]

সেবন করিবেক। এস্থলে প্রবৃত্তিগত কথা বলায় তাৎপর্য্য এই যে, ব্যক্তিবিশেষে রসগতস্পৃহার পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কেন না এমন অনেক লোক দেখিয়াছি যে, যাহার জিহ্বা মধুর রসের নামে নাচিয়া না উঠে। পক্ষান্তরে গর্ভিণী এবং বিধবা স্ত্রীলোকদিগের কটুরস অর্থাৎ ঝাল ভক্ষণেই নিতান্ত স্পৃহা। আবার কেহ কেহ বা ভোজনের সময় কেবল অম্লরসেরই শ্রাদ্ধ না করিয়া ছাড়েন না। সুতরাং এইরূপ প্রবৃত্তিগত স্পৃহারস্থলেই কিঞ্চিৎ অল্পবিস্তরের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অর্থাৎ যাঁহার মধুররসে নিতান্তই স্পৃহা, তিনি না হয় অপেক্ষাকৃত একটু মধুর রস অধিক খাইতে পারেন, সেইরূপ কটু অর্থাৎ ঝাল কিংবা তিক্ত বা অম্লাদি রসের সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া নিরন্তর আকণ্ঠ মধুর বা অম্লাদিরস ভক্ষণে যে মহৎ অনিষ্ট ঘটিতে পারে, তাহা প্রতিপন্ন করাই উপস্থিত প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। অতএব নিরন্তর একরসপ্রিয়পাঠকগণের চৈতন্যের জন্য ইহাও এস্থলে বলা আবশ্যক যে, এসংসারে কেবল মধুরাদি রস বলিয়া নহে, অপিচ যে কোনও দ্রব্য যে পরিমাণে সুখ বা আনন্দদায়ক হয়, ব্যবহার দোষে তাহাই আবার অশেষ কষ্টের কারণ হইয়া থাকে। যাহা হউক, অতঃপর দেখা যাউক, মধুরাদি রস নিরন্তর অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইলে তদ্দারা কিরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হইতে পারে।

(১) স এবং গুণোঽপ্যেক এবাত্যর্থমুপযুজ্যমানঃ স্থৌল্যং মার্দ্দবমালস্যমতিস্বপ্নং গৌরবমনন্নাভিলাষমগ্নের্দৌর্ব্বল্যমাস্যকণ্ঠয়োর্মাংসাভিবৃদ্ধিং শ্বাসকাসপ্রতিশ্যায়ালসশীতজ্বরানাহাস্যমাধুর্য্যবমথুসংজ্ঞা-স্বরপ্রণাশগলগণ্ডগণ্ডমালাশ্লীপদগলশোফবস্তিধমনীগুলোপলেপাক্ষ্যাময়ানভিষ্যন্দমিত্যেবং প্রভৃতীন্ কফজান্ বিকারানুপজনয়ন্তি।

(১) অর্থাৎ মধুররস পূর্ব্বোক্ত প্রকার গুণদায়ক হইলেও যদি একমাত্র মধুর দ্রব্য অধিক পরিমাণে সর্ব্বদা ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে শরীরের স্থূলতা, মৃদুতা, আলস্য, অতিনিদ্রা, গুরুতা, অন্নে অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, মুখ এবং কণ্ঠের মাংসবৃদ্ধি, শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায় (মুখ নাসিকা হইতে জলস্রাব) অলসক (অজীর্ণরোগ বিশেষ) বিসূচিকা (অজীর্ণরোগ বিশেষ) শীতজ্বর, আনাহ (মলমূত্রের বদ্ধতা), মুখের মধুরতা, বমন, জ্ঞান এবং

স্বরের ধ্বংস, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, শ্লীপদ (গোদ) গলশোথ, বস্তিস্থানে, ধমনীতে এবং মলদ্বারে উপলেপ, চক্ষুরোগ এবং ক্লেদবিশিষ্ট নানাবিধ কফজ ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

(২) স এবং গুণোঽপ্যেক এবাত্যর্থমুপযুজ্যমানো দন্তান্ হর্ষয়তি তর্পয়তি সংমীলয়তি অক্ষিণীসংবীজয়তি লোমানি কফং বিলাপয়তি পিত্তমভিবর্দ্ধয়তি রক্তং দূষয়তি মাংসং বিদহতি কায়ং শিথিলীকরোতি ক্ষীণক্ষতকৃশদুর্ব্বলানাং শ্বয়থুমাপাদয়তি। অপিচ ক্ষতাভিহতদষ্টদগ্ধভগ্নশূলচ্যুতাবমৃদিতপরিসর্পিতমর্দ্দিতচ্ছিন্নবিদ্ধোৎপিষ্টাদীনি পাচয়ত্যাগ্নেয়স্বভাবাৎ পরিদহতি কণ্ঠমুরোহৃদয়ঞ্চ।

(২) অর্থাৎ অম্লরস পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত হইলেও যদি একমাত্র অম্লরস অধিক পরিমাণে সর্ব্বদা ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে দন্তহর্ষ, চক্ষুর নিমীলতা, লোমহর্ষ, কফের তরলতা, পিত্তবৃদ্ধি, মাংসের বিদগ্ধতা, রক্ত দূষিত, শরীরের শিথিলতা এবং ক্ষীণরোগী, ক্ষতরোগী, কৃশরোগী ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের শোথ উৎপন্ন করে। অপর অম্লরসের আগ্নেয়স্বভাব হেতু ক্ষত, অভিহত, সর্পাদিদষ্ট, দগ্ধ, ভগ্ন, শূল, প্রচ্যুত (ছিঁড়ে যাওয়া) মৃদিত (ডলে যাওয়া) পরিসর্পিত, ছিন্ন, ভিন্ন, বিদ্ধ এবং উৎপিষ্ট প্রভৃতি স্থানের পক্বতা উৎপাদন করে। পরন্তু কণ্ঠস্থান, বক্ষঃস্থল ও হৃদয়স্থানে জ্বালা উৎপাদন করে।

(৩) স এবং গুণোঽপ্যেক এবাত্যর্থমুপযুজ্যমানঃ পিত্তং কোপয়তি রক্তং বর্দ্ধয়তি, তর্ষয়তি, মূর্চ্ছয়তি, তাপয়তি, দাহয়তি, কুষ্ণাতি মাংসানি, প্রগালয়তি কুষ্ঠানি, বিষং বর্দ্ধয়তি, শোফান্ স্ফোটয়তি, দন্তান্ শ্চ্যাবয়তি, পুংস্ত্বমুপহন্তি, ইন্দ্রিয়াণ্যুপরুণদ্ধি, বলীপলিতখালিত্যমাপাদয়তি চ লোহিতপিত্তাম্লপিত্তবীসর্পবাতরক্ত বিচর্চ্চিকেন্দ্রলুপ্তপ্রভৃতীন্ বিকারানুপজনয়তি।

(৩) অর্থাৎ লবণরস পূর্ব্ব কথিতরূপ গুণদায়ক হইলেও যদি একমাত্র লবণরস অধিক পরিমাণে সর্ব্বদা ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে পিত্ত প্রকুপিত হয়, রক্তের বৃদ্ধি হয়, তৃষ্ণা জন্মায়, মোহ উপস্থিত হয়, মূর্চ্ছা জন্মে, শরীরের উত্তাপ জন্মে, দাহ উপস্থিত হয়, মাংসের অভ্যন্তরে কণ্ডু জন্মে, কুষ্ঠ গলিত করে, বিষের শক্তি বৃদ্ধি করে, শোথস্থান বিদারিত করে, দন্তসমূহ শ্যাবর্ণ বিশিষ্ট হয়, পুরুষত্বের হানি করে, ইন্দ্রিয়গণের উপরোধক হয়,

অসময়ে চর্ম্মের শিথিলতা, কেশের পক্কতা, খালিত্য (টাক রোগ) উৎপন্ন করে। অপর রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত, বিসর্প, বাতরক্ত, বিচর্চ্চিকা (কুষ্ঠরোগ বিশেষ) এবং ইন্দ্রলুপ্ত (টাকরোগ) রোগ উৎপাদন করে।

(৪) স এবং গুণোঽপ্যেক এবাতত্যর্থমুপযুজ্যমানো বিপাকপ্রভাবাৎ পৌংস্ত্বমুপহন্তি রসবীর্য্যপ্রভাবান্মোহয়তি গ্লাপয়তি সাদয়তি কর্ষয়তি, মূর্চ্ছয়তি, নময়তি তময়তি ভ্রময়তি কণ্ঠং পরিদহতি শরীরতাপমুপজনয়তি বলং ক্ষীণোতি তৃষ্ণাং জনয়তি বায়ুগ্নিবাহুল্যাদ্ভ্রমমদদবথুকম্পতোদভেদৈশ্চরণভুজপার্শ্বপৃষ্ঠপ্রভৃতিষু মারুতজান্ বিকারামুপজনয়তি।

(৪) অর্থাৎ কটুরস (ঝাল) পূর্ব্বোক্ত প্রকার গুণযুক্ত হইলেও যদি একমাত্র কটু অর্থাৎ ঝালরস সর্ব্বদা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে কটুরসের তীক্ষ্ণবিপাকহেতু পুরুষত্বের হানি হয়, রস এবং বীর্য্যের প্রভাবে মোহ জন্মায়, গ্লানি উৎপাদন করে, শরীরের অবসন্নতা জন্মায়, কৃশতা উৎপাদন করে; মূর্চ্ছা জন্মায়, ভ্রম উপস্থিত করে, কণ্ঠস্থানে জ্বালা উৎপাদন করে, শরীরের তাপ জন্মায়, বলক্ষয় করে, তৃষ্ণা জন্মায়, এবং ইহাতে বায়ু ও অগ্নি বাহুল্যহেতু হস্ত, পাদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, এবং ত্রিক প্রভৃতি স্থানে ভ্রম, উত্তাপ, কম্প, বেদনা এবং ভেদ (ভেদনবৎ পীড়া) প্রভৃতি বায়ুজনিত রোগ উৎপাদন করে।

(৫) স এবংগুণোঽপ্যেক এবাত্যর্থমুপযুজ্যমানো রৌক্ষ্যাৎ খরবিষদস্বভাবাচ্চ রসরুধিরমাংসমেদোঽস্থিমজ্জাশুক্রাণ্যুচ্ছোষয়তি স্রোতসাং খরত্বমুপাদয়তি বলমাদত্তে কর্ষয়তি মোহয়তি ভ্রময়তি, বদনমুপশোষয়তি অপরাংশ্চ বাতবিকারামুপজনয়তি।

(৫) অর্থাৎ তিক্তরস পূর্ব্বোক্তরূপে গুণদায়ক হইলেও যদি একমাত্র তিক্তরস নিয়ত অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে রুক্ষতাহেতু এবং খর ও বিষদস্বভাবহেতু রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র এই সপ্ত ধাতুকে শুষ্ক করে, শিরাসমূহের খরতা উপস্থিত করে, শরীরের বল জন্মায়, কৃশতা উৎপাদন করে, গ্লানি জন্মায়, মোহ উৎপাদন করে, ভ্রম জন্মায়, মুখের শুষ্কতা উৎপাদন করে, এবং অন্যান্য নানাবিধ বাতজরোগ উৎপাদন করে।

(৬) স এবংগুণোঽপ্যেক এবাত্যর্থমুপযুজ্যমানঃ আস্যং শোষয়তি হৃদয়ং

পীড়য়তি, উদরমাধ্মাপয়তি, বাচং নিগৃহ্লাতি, স্রোতাংস্যববগ্নাতি, শ্যাবত্ব-মাপাদয়তি, পৌংস্ত্বমুপহন্তি, বিষ্টভ্যজরং গচ্ছতি, বাতমূত্রপুরীষাণ্যবগৃহ্লাতি, কর্ষয়তি গ্লাপয়তি তর্ষয়তি স্তম্ভয়তি খর,বৈষদরুক্ষত্বাৎপক্ষবধ গ্রহাপতানকার্দ্দিত-প্রভৃতীংশ্চ বাতবিকারানুপজনয়তীতি।

(৬) অর্থাৎ কষায়রস পূর্ব্বোক্ত প্রকার গুণযুক্ত হইলেও যদি একমাত্র কষায়রস অধিক পরিমাণে সর্ব্বদা ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে মুখের শুষ্কতা, হৃদয়ের পীড়া, উদরাধ্মান, বাক্যের জড়তা, শিরাসমূহের বদ্ধতা, শরীরের শ্যাববর্ণতা, পুরুষত্বের হানি, অজীর্ণরোগ, অসময়ে বার্দ্ধক্য, বায়ু, মূত্র এবং পুরুষের বদ্ধতা, শরীরের কৃশতা, গ্লানি, তৃষ্ণা এবং স্তম্ভতা উপস্থিত করে। অপর ইহার খরত্ব বৈষদ্য এবং রুক্ষতাহেতু পক্ষবধ (বাতব্যাধি বিশেষ) অপতানক (বাতব্যাধি বিশেষ) এবং অর্দ্দিত প্রভৃতি নানাবিধ বাতজ রোগ উৎপাদন করে।

ছয়প্রকার রসের মধ্যে কাহার কি গুণ এবং কাহার বা কি দোষ, তাহা ক্রমশঃ দেখান হইল। মধুরাদিরস নিয়মিতরূপে ব্যবহৃত হইলে শরীরের পক্ষে যেরূপ অত্যাশ্চর্য্য গুণদায়ক হয়, পক্ষান্তরে নিয়ত অযথামাত্রায় ব্যবহৃত হইলেও যেরূপ অনিষ্ট ঘটে, তাহা বুদ্ধিমান্ পাঠক বোধহয় বিশেষ-রূপেই বুঝিতে পারিয়াছেন। ভোজ্যদ্রব্যের মধ্যে কোন্ দ্রব্য মধুর রস-বিশিষ্ট এবং কোন্ দ্রব্যই বা অম্লরসবিশিষ্ট, ভোজনকালে দ্রব্য সকল জিহ্বাতে সংলগ্নমাত্রেই তাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে। তথাপি মধুরাদি পৃথক্ পৃথক্ রসের যেরূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহা নিম্নে কথিত হইতেছে। যথা—

(১) মধুর রস—মুখের স্নিগ্ধতা, প্রীতি, আহ্লাদ এবং মৃদুতা দ্বারা মধুর রসের অনুভব হইয়া থাকে। অপর মধুর রস মুখে রাখিলে ইহা দ্বারা মুখব্যাপ্ত হয় এবং বোধ হয় যেন মুখ লিপ্ত হইয়াছে।

(২) অম্লরস—দন্তহর্ষ, মুখ হইতে লালানিঃসরণ, ঘর্ম্ম এবং মুখের উদ্বোধন (বিকাশ) দ্বারা অম্লরসের অনুভব হইয়া থাকে। অপর ভোজন কালে অথবা মুখ এবং কণ্ঠের জ্বালা দ্বারা অম্লরসের জ্ঞান হয়।

(৩) লবণ রস—যাহা মুখে স্পর্শ করাইবামাত্রই সংলগ্ন বোধ

হয়, মুখ হইতে ক্লেদস্রাব করায়, শীঘ্রই মুখের মৃদুতা সম্পাদন করে, এবং যাহা মুখে জ্বালা উৎপাদন করে, তাহার নাম লবণরস।

(৪) কটুরস—যে রস জিহ্বাতে সংলগ্ন হইয়া জিহ্বার উদ্বেগ উপস্থিত করে, মনের তৃপ্তি সম্পাদন করে, মুখ, নাসিকা এবং চক্ষের জ্বালা উৎপাদন করে ও ঐ সমস্ত স্থান হইতে লালা নিঃসরণ করায়, তাহার নাম কটু অর্থাৎ ঝালরস।

(৫) তিক্তরস—যে রস জিহ্বাতে সংলগ্ন করিবা মাত্রেই জিহ্বার অত্যন্ত যন্ত্রণা উপস্থিত হয় এবং যাহা মুখে রুচিকারক হয় না এবং যাহা মুখের বৈষদ্য, শোষ এবং প্রহ্লাদ কারক হয়, তাহার নাম তিক্তরস।

(৬) কষায়রস—যে রস জিহ্বার বৈষদ্য, স্তম্ভতা ও জড়তা উৎপাদন করে এবং কণ্ঠস্থানের বদ্ধতা জন্মায়, তাহার নাম কষায়রস। ক্রমশঃ—

সূতিকার তরুণ জ্বর বা প্রসূতির পচা জ্বর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রসূতির প্রসবদ্বারের কোন ক্ষতাদি পচিয়া একরূপ বিষ উৎপন্ন হয়। সেই বিষ প্রসূতির রক্তে প্রবিষ্ট হইয়া এই রোগ উৎপন্ন করে। বলা বাহুল্য যে, এখনকার চিকিৎসকদিগের মতে এই বিষ কোন বিশেষ বিষ হইতে সমুদ্ভূত নহে। যে কোন আঘাত হইতে এই বিষ জন্মাইতে পারে। কোন স্থানে আঘাত বা অস্ত্রকার্য্য দ্বারা ক্ষত হইলে তাহাতে একরূপ বিষ সমুদ্ভূত হইয়া কোন কোন রোগীর গুরুতর পীড়া জন্মাইয়া থাকে, তাহাতে রোগীর অতিশয় জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গ ঘটিয়া থাকে। সেই আঘাতজনিত পীড়াকে চিকিৎসকগণ পাইমিয়া বা সেপ্‌টিসিমিয়া শব্দে অভিহিত করেন। প্রসূতিদিগের এই পাইমিয়া বা সেপ্‌টিমিয়া রোগ হইলে তাহাকেই পিউয়ার পিরাল ফিবার বা সূতিকার তরুণ জ্বর বলে। সুতরাং সূতিকাজ্বর প্রসূতিদিগের কোন বিশেষ পীড়া নহে।

সূতিকাজ্বরের বিষ প্রসূতির শরীরের ভিতরও জন্মাইতে পারে। বাহির হইতেও আসিতে পারে। শরীর হইতে কিরূপে জন্মায় তাহা

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বাহির হইতে কিরূপ ভাবে এই বিষ প্রসূতির শরীরে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। অন্য কোন পীড়াগ্রস্থ রোগীর সংস্পৃষ্টে এই রোগ আসিতে পারে। (২) যে কোন ধাত্রী বা চিকিৎসক কোন উক্ত পীড়াগ্রস্থ রোগীণীর চিকিৎসা করিয়াছে তাহার সংস্পর্শে এই রোগ জন্মাইতে পারে। (৩) কোন পাইমিয়া বা সেপ্‌টিসিমিয়াগ্রস্থ রোগী হইতে এই বিষ আসিয়া প্রসূতির শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারে।

তারপর এই রোগ হইলে কি কি লক্ষণ উপস্থিত হয় দেখা যাউক। সূতিকাজ্বর সচরাচর কম্প হইয়া আরম্ভ হয়। ঠিক ম্যালেরিয়া জ্বরে যেরূপ কম্প হয়, ইহাতেও সেইরূপ কম্প হয় এবং ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর ছাড়িয়া যায়। পুনর্ব্বার কম্প হইয়া জ্বর আসে, আবার ছাড়িয়া যায়। শরীরের উত্তাপ সচরাচর ১০৩ হইতে ১০৭° ডিগ্রী পর্য্যন্ত হয়। কখন কখনও ১১০° ডিগ্রীও হইতে দেখা যায়। অনেক সময় রোগ প্রচ্ছন্নভাবে আরম্ভ হয়। এবং কম্প হয় না বা অতি যৎ সামান্য কম্প হয়। নাড়ীর দ্রুতত্ব কিন্তু সকল স্থলেই বৃদ্ধি হয়। ১০০ হইতে ১২০ বা ১৪০ বা ততোধিক বার দ্রুত হয়। কোন কোন স্থলে নাড়ী ১৬০ পর্য্যন্ত প্রতি মিনিটে স্পন্দিত হয়। সচরাচর নাড়ী ক্ষীণ ও ক্ষুদ্র হয়। জ্বরের বিরামকালেও নাড়ী সহজ নাড়ী অপেক্ষা দ্রুত থাকে। এই বিশেষ লক্ষণটীর দ্বারাই সামান্য কম্পজ্বর হইতে এই রোগটী চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে। মুখমণ্ডল মলিন ও কষ্টযুক্ত বোধ হয়। মুখ দেখিলেই যেন বোধ হয় রোগী অতি কষ্টে আছে। জিহ্বা সচরাচর পরিষ্কার থাকে অথবা পাতলা শ্বেতবর্ণ ময়লাযুক্ত থাকে। কখনও কখনও রোগীর শেষাবস্থায় জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ ও শুষ্ক হয়। রোগীর জ্ঞান মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রায় অক্ষুন্ন থাকে। এই রোগে রোগীণীর প্রায় প্রলাপ হয় না। কখন কখন কচিৎ অল্প মৃদু প্রলাপ দৃষ্ট হয়। এরূপ হইলে রোগী রাত্রিকালে বিড়বিড় করিয়া বকিতে থাকে। কাহারও কাহারও উদরাময় ও বমন হইয়া থাকে। উদরাময় সচরাচর হইতে দেখা যায় কিন্তু বমন সচরাচর দেখা যায় না। প্রসবের পর প্রসূতির জরায়ু হইতে কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত একরূপ রক্ত রস নিঃসৃত হয়। সূতিকার পচাজ্বর হইলে এই রস নিঃসরণ বন্ধ হয়। অথবা সামান্য মাত্রায় হয়। এবং তাহাতে অতিশয় দুর্গন্ধ থাকে।

স্তনদুগ্ধ নিঃসরণ বন্ধ হয়। উদর প্রদেশে চাপ দিলে বেদনা অনুভূত হয়। কিন্তু এই ঘটনা জরায়ুর তরুণ প্রদাহ বর্ত্তমান থাকিলে হয়, নচেৎ নহে। কখন কখন উদরাধ্মান হয়। এবং পেরিটোনাইটিস্ হইয়া সমস্ত উদর প্রদেশে বেদনা হয়। ক্রমশঃ রোগী দুর্ব্বল হইয়া মারা যায়। সচরাচর এক সপ্তাহের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু হয়। দশম দিবস কাটিয়া গেলে আর তত আশঙ্কা থাকে না। কোন কোন স্থলে দুই তিন দিনের মধ্যেই রোগী মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এই গুলি গেল সাধারণ লক্ষণ। তারপর নানারূপ যান্ত্রিক বিকৃতি বশতঃ লক্ষণের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। যথা, তরুণ জরায়ু প্রদাহ (মেট্রাইটিস্) হইলে তলপেটে অতিশয় বেদনা হয়। পেরিটোনাইটিস্ বা অন্ত্রাবরণ প্রদাহ হইলে সমস্ত উদর প্রদেশ ব্যাপিয়া বেদনা হয়। পেরিটোনাইটিস্ হইলে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক উদরাধ্মান হয় এবং রোগীণীর উদরে হস্তস্পর্শ মাত্র সাতিশয় বেদনা অনুভব করে এবং রোগী বেদনাভয়ে গা গুটাইয়া থাকে। কারণ পদদ্বয় প্রসারণ করিলে উদর প্রদেশের চর্ম্মে টান পড়িয়া রোগীর যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়, এ কারণ তরুণ পেরিটোনাইটিস্ বা অন্ত্রাবরণ ঝিল্লির প্রদাহ হইলে রোগিণী পা মেলিয়া শয়ন করিতে পারে না। পেরিটোনাইটিস্ হইলে বমন ও অতিসার হয়। কখনও কখনও যকৃত ও মূত্রযন্ত্র প্রদাহান্বিত হয়। এবং ঐ সকল যন্ত্রে স্ফোটক হয়। কখনও কখনও সূতিকাজ্বরের সঙ্গে, ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ (নিউমোনিয়া) ফুষফুষাবরণ প্রদাহ (প্লিউরেসি) প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে।

কোন কোন স্থলে রোগ পুরাতন প্রকৃতি ধারণ করে এবং কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, কিন্তু অনেকে এই শেষোক্ত রকমের পীড়াকে প্রকৃত পিউয়ার্ পিরাল ফিবার বলেন না। ক্রমশঃ—

আয়ুর্ব্বেদ।

আয়ুর্ব্বেদ কাহাকে বলে, কিছুকাল পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় লোকে, এমন কি আয়ুর্ব্বেদব্যবসায়ী অনেক কবিরাজেও তাহা জানিতেন না। মাধব করের "নিদান" পুস্তকের নামই যে আয়ুর্ব্বেদ ইহাই অনেকের সংস্কার ছিল। অনেক,

কবিরাজের মুখেও শুনা গিয়াছে যে তিনি নিদান মতে চিকিৎসা করেন। কিন্তু ফলতঃ নিদান রোগ-নির্ণয়ের সংগ্রহ গ্রন্থ, উহাতে চিকিৎসার নাম প্রসঙ্গও নাই। অথচ অধিকাংশ লোকে নিদান শব্দে আয়ুর্ব্বেদ বুঝিয়া থাকে, ইহার তাৎপর্য্য কি? বিবিধ কারণে দীর্ঘকাল ধরিয়া এতদ্দেশে আয়ুর্ব্বেদ সংক্রান্ত প্রধান প্রধান পুস্তক সকলের এবং আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চার অভাবই ঐরূপ সংস্কারের কারণ বলিয়া বোধ হয়।

প্রকৃতপক্ষে আয়ুর্ব্বেদ অতি প্রামাণিক বেদ শাস্ত্র। উহা অথর্ব্ব বেদের অঙ্গ বিশেষ; এক লক্ষ শ্লোকে এবং এক সহস্র অধ্যায়ে রচিত।

যেমন প্রধানতঃ ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদকে অবলম্বন করিয়া মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান ২০টী ধর্ম্মসংহিতা বা স্মৃতিশাস্ত্র † রচিত হইয়াছে, সেইরূপ আয়ুর্ব্বেদকে অবলম্বন করিয়া সুশ্রুত সংহিতা, চরক সংহিতা প্রভৃতি ১৮টী ‡ আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা রচিত হইয়াছে। সময় বিশেষে ধর্ম্ম-সংহিতা সকল অবলম্বনপূর্ব্বক যেমন শূলপাণি-সংগ্রহ, রঘুনন্দন-সংগ্রহ প্রভৃতি বহুতর স্মৃতি-সংগ্রহ প্রস্তুত হয়, সেইরূপ আয়ুর্ব্বেদীয় সুশ্রুত-সংহিতা প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া বাগ্ভট সংগ্রহ, শার্ঙ্গধর-সংগ্রহ, সিদ্ধযোগ, আয়ুর্ব্বেদসার প্রভৃতি বহুতর বৈদ্যক-সংগ্রহ প্রস্তুত হয়। ক্রমশঃ আরও সংক্ষেপ করিবার নিমিত্ত আয়ুর্ব্বেদীয়-সংগ্রহ গ্রন্থ সকলও দুই একটী সংহিতা অবলম্বন করিয়া ক্ষুদ্রতর সংগ্রহ প্রস্তুত হইয়াছে। যথা—মাধবীয় নিদান, চক্রদত্ত-সংগ্রহ, সারকৌমুদি, দ্রব্যগুণ, পরিভাষা ইত্যাদি।

পরমজ্ঞানী মহর্ষিগণ আয়ুর্ব্বেদীয়-সংহিতা সকলে রোগের ও আরোগ্যের স্বরূপ, চিকিৎসা ও ঔষধের লক্ষণ এবং প্রকারভেদ, তাহাদিগের শ্রেণী-বিভাগ ও সংখ্যা, রোগনির্ণয় এবং চিকিৎসার সূত্র ও বিবৃতি সাধ্যতা

---

* ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ব বেদস্য * * * শ্লোক শত সহস্রম্ অধ্যায় সহস্রঞ্চ কৃতবান্ স্বয়ম্ভুঃ। (সুশ্রুতসংহিতা)

† মন্বত্রিবিষ্ণুহারিতা যাজ্ঞবল্ক্যোশনেহঙ্গিরাঃ। যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতি ॥ পরাশর ব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষ গোতমৌ। শতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজকাং ॥

‡ ঔপধেন্ব, বৈতরণ, ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত, করবীর্য্য, গোপুর, রাক্ষিত, সুশ্রুত অগ্নিবেশ, ভেল, জতূকর্ণ, পরাশর, হারীত, ক্ষারপাণি, নিমি, কাঙ্কায়ণ, গার্গ্য ও গালব এই ১৮ জন ঋষির প্রণীত ১৮টী সংহিতা গ্রন্থ। (সুশ্রুত, সূত্র, ১ম অ)

ও অসাধ্যতার চিহ্ন, মনুষ্য শরীরের অস্থি, মাংস, শিরা, স্নায়ু প্রভৃতির সংখ্যা ও উপযোগিতা, রক্ত সঞ্চালনের বিবরণ, আহারীয় দ্রব্যের পরিপাক ও পরিণতির নিয়ম, শবদেহ বিচ্ছেদ করিয়া তাহাতে আমাশয় যন্ত্র, পক্বাশয় যন্ত্র, হৃদয় ও ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতি দেখাইবার ব্যবস্থা ইত্যাদি সহস্র সহস্র বিষয় অতি সংক্ষিপ্তাকারে এমন পূর্ণভাবে কহিয়াছেন যে, চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও তাহাকে মনুষ্যের কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না।

ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণ সাধারণ মনুষ্য নামে পরিগণিত হইবার নহেন। আধুনিক মনোমোহন বিজ্ঞানশাস্ত্র লক্ষাধিক বর্ষ পরিচালিত হইলেও আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় প্রাণীশরীরের নিগূঢ়তত্ত্ব সকল অভ্রান্তরূপে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে কি না সন্দেহস্থল। হিমালয়ের উন্নত শিখরস্থিত সোমলতার রস, মহাসাগর কুক্ষিগত মুক্তার গুণ, মনুষ্য কপালাস্থির চূর্ণ, হীরকভস্মের উপযোগিতা, এবং বিকট কালকূটের রোগঘ্ন ক্ষমতা এ সমস্তের কিছুই আয়ুর্ব্বেদের নিকট গুরুতর নহে।

আধুনিক কিমিয় বিদ্যার (কেমিষ্ট্রী) গৌরবস্থল, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি অপেক্ষা সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম্ এবং মনুষ্য জঠরস্থিত পাচকাগ্নির স্বরূপ নির্ণয় আয়ুর্ব্বেদের পক্ষে অতি সহজ কথা।

পরম কল্যাণকর আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র পৃথিবীস্থ যাবতীয় মনুষ্যের নিমিত্ত রচিত হইলেও ইহা যে ভারতবর্ষীয় ব্যক্তিদিগের জীবনরক্ষার অদ্বিতীয় উপায়, তাহা পণ্ডিত মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, ভূগোলশাস্ত্র ও ইতিহাস শাস্ত্রের আমূল অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, ভারতবর্ষই পৃথিবীর আদিম ভূভাগ, ভারতবর্ষীয় মনুষ্যদিগেরই বংশ পরম্পরা কালক্রমে সমস্ত পৃথিবীতে উপনিবেশ করিয়াছে। সুতরাং অনির্দ্দেশ্য পূর্ব্বকালজাত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র মুখ্যকল্পে ভারতবর্ষীয় ব্যক্তিগণের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াই যে ভারতবর্ষীয় দ্রব্য সকলের গুণাগুণ ও উপযোগিতা নির্ণীত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ হইতে পারে না। অতএব, প্রতিপন্ন হইতেছে যে ভারতবর্ষীয় ব্যক্তিদিগের সুস্থতা রক্ষা এবং রোগের শান্তি বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদ যেমন উপকারী পৃথিবীর আর কোনও চিকিৎসাশাস্ত্রই সেরূপ হইতে পারে না।

কালচক্রের পরিবর্ত্তনক্রমে এতাদৃশ মহান্ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রও দুরবস্থায়

পতিত হইয়াছে। ইতিহাসবেত্তারা অনুমান করেন যে, প্রায় সাত শত* বৎসর হইল, হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী যবন জাতীয় অত্যাচারে বঙ্গপ্রদেশে আয়ুর্ব্বেদীয় সুশ্রুত-সংহিতা ও চরক-সংহিতা প্রভৃতি মূলগ্রন্থ সকল বিলুপ্ত হয়, তারপর পুস্তকের অভাবে আয়ুর্ব্বেদের প্রধান প্রধান সংহিতা ও সংগ্রহ পুস্তক সকলের অধ্যয়ন অধ্যাপনাও কাজেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। ক্রমে মাধব কর ও চক্রপাণি দত্ত প্রভৃতির সংগৃহীত "নিদান" প্রভৃতি ক্ষুদ্রতর সংগ্রহ গুলিই এতদঞ্চলে বৈদ্যদিগের আয়ুর্ব্বেদ বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকে। আয়ুর্ব্বেদ যে অতি প্রকাণ্ড ও প্রামাণিকতর বিজ্ঞানশাস্ত্র, জনসাধারণের অধিকাংশই তাহা জানিতে পারেন নাই। সমাজের প্রকৃতি ও রুচি অনুসারেই দেশে বিদ্যাবিশেষের প্রাদুর্ভাব বা তিরোভাব হইয়া থাকে। যখন সমাজের অধিকাংশ লোকের এরূপ সংস্কার হইয়া গেল যে, আয়ুর্ব্বেদ গুরুতর শাস্ত্র নহে, তখন সেই শাস্ত্রপাঠ ও তদ্‌ব্যবসায়ী ব্যক্তিদিগের সম্মান ও অর্থোপার্জ্জনের হীনতা হইতে লাগিল। এদিকে দেবভাষা বলিয়া সংস্কৃত ভাষার আদর বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। বিশেষতঃ ব্যাকরণ, সাহিত্য ও ন্যায়শাস্ত্রের সমাদর হিন্দুসমাজে দীর্ঘকাল ধরিয়া সমভাবেই আছে। ইহা দেখিয়া অপেক্ষাকৃত সুবোধ কবিরাজেরা আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে কেবল "মাধব নিদানের" কিয়দংশ মূল এবং নৈয়ায়িক বিজয় রক্ষিতের রচিত "ব্যাখ্যা মধুকোষ" টীকার পঞ্চ নিদানের অংশ কণ্ঠস্থ ও ন্যায়শাস্ত্রের ২। ৪ পাতা ও নৈষধ প্রভৃতি কাব্যের কিয়ৎ কিয়ৎ অংশ অধ্যয়ন করিয়া সমাজে মহোপাধ্যায় কবিরাজ বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন। প্রকৃত আয়ুর্ব্বেদের সুগভীর তত্ত্ব সকল মূল পুস্তকের সহিত লুক্কায়িত হইয়া গেল।

প্রায় একশতবৎসর হইল † এতদ্দেশে ইয়ুরোপীয় এলোপ্যাথী (ডাক্তারি)

---

* ১২০৩ খৃঃ অব্দে, "বক্তিয়ার খিলিজি" বঙ্গ প্রদেশ অধিকারপূর্ব্বক এখানে নবাবী করিতে আরম্ভ করেন। তদবধি এতদঞ্চলে মুসলমানদিগের জাতীয় হেকিমী চিকিৎসার প্রাদুর্ভাব হয়। তৎকালেই আর্য্যজাতির বিজ্ঞান প্রধান আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সকল ভস্মীকৃত ও বিলোপিত হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব।

† ১৬৫০ খৃ, ডাক্তার বৌটন্ দিল্লীপতি সাহাজান বাদসার কন্যার চিকিৎসা করেন। তদবধি ডাক্তারি চিকিৎসা প্রচলিত নহে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে, বিদ্যমান মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়, ইহার কিছু পূর্ব্বাবধিই ডাক্তারি চিকিৎসার প্রচলন গণ্য করা উচিত।

চিকিৎসার প্রচার হয়। এতদ্দেশে দীর্ঘকাল আয়ুর্ব্বেদীয় অস্ত্র চিকিৎসা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল এবং বিষঘটিত অতি তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ সকলের ব্যবস্থাও বিবিধ কারণে স্থগিত ছিল। সুতরাং বিদ্যমান সময়ে প্রভাবতী ইয়ুরোপীয় শাস্ত্রচিকিৎসা এবং কুইনাইন প্রভৃতি দ্বারা আশুফলদায়িনী জ্বরচিকিৎসা এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগকে বিমোহিত করিয়া তুলিল। তখন এতদ্দেশের জঘন্যাবস্থাপন্ন হাতুড়িয়া কবিরাজদিগের চিকিৎসা একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালীর চরম দুরবস্থা উপস্থিত করে। কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটি অপেক্ষাকৃত যোগ্য বৈদ্যচিকিৎসক জনসাধারণের অজ্ঞানতা ও অনাস্থারূপ ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যেও হীরক সদৃশ আয়ুর্ব্বেদের স্বতঃসিদ্ধ প্রভার দুই একটী শিখা প্রদর্শন করিতে থাকেন।

যে পদার্থে যে শক্তি তাহা সেই পদার্থেই বিদ্যমান থাকিবে। দেশ, কাল, পাত্র ও দ্রব্যগত পরিমাণাদি ভেদে সেই পদার্থ দ্বারা যে কার্য্য সাধিত হওয়া সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রেত তাহা সেইরূপই হইবে এ নিয়মের ব্যত্যয় হইবার নহে। মানবগণ জ্ঞানচর্চ্চার দ্বারা সেই বিষয় অবগত হউন অথবা না হউন, ঐশ্বরিক ঘটনার অন্যথাচরণ হইবে না। অজ্ঞান শিশু অগ্নির দাহিকাশক্তি অবগত নহে বলিয়া অগ্নি তাহার হস্ত দাহ করিতে ক্ষান্ত হয় না। অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্ব্বেত্তারা এবং নব্যকালে ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত নিউটন্ আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়াই যে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষিণী শক্তি বৃক্ষ হইতে বিশ্লিষ্ট ফলকে পৃথিবী পৃষ্ঠে পাতিত করিতেছে এরূপ নহে। প্রত্যক্ষ, অনুমান, যুক্তি ও শাস্ত্র দ্বারা যখন প্রতিপাদিত হইতেছে যে, শীতপ্রধান দেশে উৎপন্ন ঔষধ দ্রব্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সর্ব্বদা হিতকর হইতে পারে না, এবং এই নিমিত্তই ত্রিকালদর্শী জগদীশ্বর ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ প্রাণীর শরীর রক্ষার্থ রোগনাশক দ্রব্য সমূহ তত্তৎ দেশেই উৎপন্ন হইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন দক্ষিণ আমেরিকায় উৎপন্ন কুইনাইন বঙ্গদেশীয় লোকের শরীরে প্রযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা হিতকর হইবার সম্ভাবনা কি? ঐশ্বরিক নিয়মের অভ্রান্ততা দেখাইবার নিমিত্ত ক্রমশঃ এতদ্দেশে বিদেশীয় চিকিৎসার বিষময় পরিণাম স্বরূপ যখন লোকের নানাবিধ রোগের উৎপত্তি এবং একবিধ রোগের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব প্রত্যক্ষীভূত হইতে লাগিল, তখন দেশীয় লোকদিগের চৈতন্য জন্মিল। কাজেই চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ,

তখন পুনরায় এতদ্দেশীয় ব্যক্তি সমূহের পরম হিতকারক এবং হিতসাধনোপযোগী আয়ুর্ব্বেদীয় দিকে কটাক্ষপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপেই ঘটনাপ্রযুক্ত ১৪।১৫ বৎসরের অধিক কাল এতদঞ্চলে মৃতপ্রায় সুমহান আয়ুর্ব্বেদের পুনশ্চর্চ্চারম্ভ এবং ক্রমে ক্রমে উন্নতি সাধনের লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে।

১। আয়ুর্ব্বেদসংক্রান্ত সুশ্রুত ও চরক এই দুইটি মূলসংহিতা, অষ্টাঙ্গহৃদয় নামক অতি প্রামাণিক আদিম সংগ্রহ এবং ভাবপ্রকাশ, চক্রদত্ত সংগ্রহ, শার্ঙ্গধর, মাধবনিদান, ভৈষজ্যরত্নাবলী, প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে ও হইতেছে।

২। সাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত বঙ্গভাষায় কয়েক ব্যক্তি অতি দুরূহ সংস্কৃত ভাষা হইতে আয়ুর্ব্বেদের অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন।

৩। কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদের অবনতির সময়ে প্রায়ই নিরুপায় ও নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ ঐ শাস্ত্রের কিঞ্চিন্মাত্র শিক্ষা ও ব্যবসায় করিতেন, এক্ষণে অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাবান্ ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এমন কি দুই একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান ও বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞ এবং স্কুল কলেজের সুশিক্ষিত ব্যক্তিও আয়ুর্ব্বেদের যথারীতি অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি করিতেছেন।

৪। সুযোগ্য ব্যক্তিদিগের যত্ন, চেষ্টা ও ব্যয়ে এক্ষণে অনেক স্থলে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ সকল যথারীতি প্রস্তুত ও অনেক অব্যবহৃত ঔষধের গুণবত্তার আবিষ্কার হইতেছে।

৫। এক্ষণে অনেক স্থলে, ডাক্তারি, হোমিওপ্যাথি ও হেকিমদিগের চিকিৎসায় যে রোগের শান্তি হয় নাই, সুযোগ্য বৈদ্যের চিকিৎসায় তাহার সম্পূর্ণ শান্তি হওয়া দৃষ্ট হইতেছে।

৬। সুযোগ্য ব্যক্তিগণ আয়ুর্ব্বেদ অবলম্বন করায় তাঁহাদিগের মহামূল্য চিন্তার ফলে এক্ষণে দেশ কাল, পাত্রের উপযোগী করিয়া সংস্কৃত ভাষায় নূতন সংগ্রহ গ্রন্থ ও নূতন রচিত সংস্কৃত টীকা প্রস্তুত হইতেছে।

কিন্তু পৃথিবীতে চিরকালই সুখের সঙ্গে দুঃখ, মঙ্গলের সহিত অমঙ্গল, সুবিধার পশ্চাৎ অসুবিধা ধাবমান হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র ও তৎসংক্রান্ত চিকিৎসার উন্নতির লক্ষণ দেখিবামাত্র সত্বরেই উন্নতির বাধাজনক অমঙ্গল ও অসুবিধার ছায়া দেখা দিয়াছে। যথা—

১। বিদ্যমান সময়ে এতদ্দেশীয় বহুতর ব্যক্তি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মূল-সংহিতা ও সংগ্রহ পুস্তক সকলের বিবরণ জানিতে কৌতূহলী হইয়াছেন, এই সুযোগ দেখিয়া কতকগুলি অল্প শিক্ষিত ব্যক্তি দশ টাকা উপার্জ্জন করিবার কল্পনায় প্রকৃত আয়ুর্ব্বেদের ভাববিরুদ্ধ, তাৎপর্য্য বিরুদ্ধ এবং অতি অশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় ও ভাষান্তরে ইহার অনুবাদ প্রচার করিয়া সাধারণের ইষ্টাপেক্ষা অনিষ্টের ভাগ অধিক করিতেছেন, এবং অধিকাংশ অনুবাদের প্রতি সুযোগ্য লোকদিগের অশ্রদ্ধা উপস্থিত হওয়াতে প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিদের চিন্তাসম্ভূত সুন্দর অনুবাদেরও গুণ বিচার হইতেছে না।

২। রাজধানী কলিকাতা আড়ম্বরপ্রিয় স্থান; এই ভাবিয়া অশিক্ষিত ইতর লোকেরাও কিছু মূলধনের জোরে বৃহৎ অট্টালিকা ভাড়া লইয়া, গাড়ী জুড়ী, প্রকাণ্ড সাইন্‌বোর্ড এবং সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের ঘটা দেখাইয়া কবিরাজ হইয়া বসিতেছে। সুতরাং শিক্ষিত অশিক্ষিত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক বাছিয়া লওয়া ভার হইতেছে।

৩। ইংরেজী প্যাটেণ্ট মেডিসিনের অনুকরণ করিতে গিয়া কতকগুলি সামান্য লোকে আয়ুর্ব্বেদীয় যে সকল ঔষধ অধিককাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই (যথা অনন্তমূল প্রভৃতির ক্বাথ) তাহাতে স্পিরিট প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া ডাক্তারি আরকের ন্যায় বোতল বিক্রয়পূর্ব্বক প্রকৃত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার কলঙ্ক করিতেছে।

আমাদিগের পরম হিতকর ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসার এই অন্তরায় নিবারণের উপায় কি, ইহা এক্ষণে সর্ব্ব সাধারণের বিবেচ্য হইয়াছে। নানা লোকে নানা উপায়ের কথা বলিবেন বা বলিতেছেন, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় সাধারণের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদীয় পুস্তক, ঔষধ ও চিকিৎসকের গুণ দোষের বিচার ও পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ বা পরিত্যাগ করেন। ইহাতেই কতকটা গুণের পুরস্কার ও দোষের তিরস্কার হইতে পারে বলিয়া বোধ হয়; নহিলে, আর যা উপায়, তাহাতে বিশেষ কাজের বড় একটা সম্ভাবনা দেখি না।

শ্রীঈশানচন্দ্র বিশারদ।

হোমিওপ্যাথি ঔষধতত্ত্ব।

আইওডিয়ম।

সমগুণ—ইপিকাক, আইরিস, পডোফাইলম।

বিষমগুণ—এন্টিম-টার্ট, হিপার-সল, সলফার, মার্ক, বেল, ওপিয়ম, আর্সেনিক।

সমবেদন স্নায়ু মণ্ডলীদ্বারা এই ঔষধ শরীরের নানাস্থানে কার্য্য করিতে সক্ষম।

১। গ্রন্থিমণ্ডলী—প্রথমে উহাদিগের সিক্রসনের আধিক্য, অবশেষে গ্রন্থি শুষ্ক হইয়া উহাদিগের ক্রিয়া বিনষ্ট হয়।

২। স্তনদ্বয়—(ক) অতিরিক্ত দুগ্ধ সঞ্চার, (খ) সম্পূর্ণ অপকর্ষতা ও শুষ্কতা প্রাপ্ত হওয়া।

৩। ডিম্বকোষ ও অণ্ডকোষ—(ক) উহাদিগের উত্তেজনা, (খ) সম্পূর্ণ শুষ্কতা ও অপকর্ষতা।

৪। জরায়ু মধ্যস্থ গ্রন্থিসকল—(ক) সিক্রসনের আধিক্য, (খ) অপকর্ষতা।

৫। গলার থাইরয়েড গ্রন্থি—অতিশয় বিবৃদ্ধি।

৬। অন্ত্রের ল্যাক্‌টিয়েল গ্রন্থি এবং লসিকাগ্রন্থি—(ক) উহাদিগের উত্তেজনা, (খ) শিথিলতা ও অপকর্ষতা।

৭। লালাগ্রন্থি—দুর্গন্ধ ব্যতীত লালাস্রাব।

৮। উদরের প্যাংক্রিয়া গ্রন্থি—(ক) উহাদিগের সিকৃসনের আধিক্য, (খ) অপকর্ষতা ও ক্রিয়া বিনষ্ট হওয়া।

৯। যকৃত—(ক) উত্তেজনা, (খ) অপকর্ষতা, দেহশীর্ণ, ও নেবা অর্থাৎ কামল।

১০। মূত্রযন্ত্র (কিড্‌নি)—উহার প্রদাহ, এলবিউমিনুরিয়া পীড়া।

১১। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি—রক্ত সঞ্চার, প্রদাহ, শ্লেষ্মাক্ষরণ।

১২। ত্বক—মুখে ব্রণের ন্যায় চর্ম্মরোগ, আমবাত, পামা (একজিমা) সর্ব্বাঙ্গে শোথ।

১৩। রক্তাম্বুঝিল্লি—প্রদাহ ও রসক্ষরণ।

১৪। রক্ত—দৈহিক রক্তের স্বল্পতা, রক্তের ফাইব্রিণ নামক পদার্থের আধিক্য।

১৫। ধমনী—অধিকক্ষণস্থায়ী ধমনীর আক্ষেপ।

গ্রন্থিমণ্ডলী—সমবেদন স্নায়ু মণ্ডলী দ্বারা এই বিষাক্ত ঔষধ শরীরের সকল স্থানের লসিকাগ্রন্থি এবং অন্যান্য গ্রন্থি নির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ, থাইরয়েড্, স্তনদ্বয়, ডিম্বকোষ এবং অণ্ডকোষদ্বয় প্রবলরূপে অধিকার করে। প্রথমে ইহাতে ঐ সকল গ্রন্থি উত্তেজিত হইয়া ক্রিয়াধিক্য উৎপাদন করে। যথা-ডিম্বকোষে রক্তসঞ্চার হইয়া জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব, অণ্ডকোষের ক্রিয়াধিক্য বশতঃ অতিশয় সঙ্গম ইচ্ছা, লালাগ্রন্থির লালাস্রাব, যকৃতের ক্রিয়াধিক্য বশতঃ অতিরিক্ত পিত্ত সঞ্চার ইত্যাদি। এই প্রকার অতিরিক্ত উত্তেজনার পর উহাদিগের বিশেষরূপ ক্রিয়াশৈথিল্য প্রকাশ হয় এবং এই ঔষধের প্রধান ধর্ম্ম দৈহিক শীর্ণতা উৎপাদন করা, তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়; এইহেতু আইওডিনকে পেশীসূত্র বলকারক ঔষধ বলিতে পারা যায়।

স্তন—আইওডিন ব্যবহারে শরীর বিষাক্ত হইলে স্তন ও অণ্ডকোষ অগ্রে আক্রান্ত হয়। তৎপরে মুখ, অবশেষে সর্ব্বাঙ্গ ক্রমে কৃশ হইতে থাকে। ডাক্তার জোর্গ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ক্রমে দুইগ্রেন মাত্রা ব্যবহার করিলে সর্ব্বাঙ্গে উত্তাপ অনুভব ও জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হইতে দেখা যায়, ডাক্তার ষ্টিলি বলেন যে, ইহাতে ঋতুকালীন অধিক পরিমানে রক্তঃস্রাব হয়, এবং গর্ভ অবস্থায় ব্যবহারে গর্ভস্রাব হওয়ার সম্ভব।

ডাক্তার হিউজ লিখিয়াছেন যে, জননেন্দ্রিয়ের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া থাকায় উহাদিগের পীড়ায় আইওডিন সচরাচর ব্যবহার হইয়া থাকে। বিশেষ গণ্ডমালাপীড়িত ব্যক্তিদিগের জননেন্দ্রিয়ের পীড়ায় উৎকৃষ্ট ফল দর্শায়। পুরুষের প্রষ্টেট্ গ্রন্থির প্রদাহজনিত স্ত্রীলোকের রজস্তম্ভ ও শ্বেতপ্রদর এবং স্তনে অতিরিক্ত দুগ্ধসঞ্চার হেতু পীড়া হইতে আরোগ্য হইয়াছে।

আইওডিন ব্যবহারে অনেক সময় স্তনে, ডিম্বকোষে ও জরায়ুর টিউমার আরোগ্য হইয়াছে। ডাক্তার এস্‌ওয়েল্ এ সম্বন্ধে বলেন যে, আইওডিন দ্বারা জরায়ুর গ্রীবাদেশে সারতিক্ষ যে সকল টিউমার হয়, তাহাই আরোগ্য হইতে দেখা যায়। ঐ স্থানের প্রদাহ ও কাঠিন্যতায় আইওডিন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ দেখা যায় না। গলার থাইরয়েড্ গ্রন্থির (যাহার বিবৃদ্ধিতে গলগণ্ড হয়) ন্যায় ডিম্বকোষে কার্য্য করিতে সক্ষম, কারণ ডিম্বকোষে এক কোষ নির্ম্মিত যে অর্ব্বুদ সচরাচর দৃষ্ট হয়, তাহা গলগণ্ডের অনুরূপ, এইহেতু ডিম্বকোষের সিষ্টিকটিউমারে আইওডিনের পিচকারী দ্বারা তন্মধ্যে প্রবেশ করাইতে পারিলে সেবন অপেক্ষা সত্বর আরোগ্য হইতে পারে। গুটিকা ও গণ্ডমালা ধাতুর বন্ধ্যারোগে ইহাতে ফল দর্শিতে পারে।

প্রধান প্রধান প্রয়োগলক্ষণ।

সার্ব্বাঙ্গিক লক্ষণ—গণ্ডমালাধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনী-শক্তির অভাব, প্রগাঢ় দুর্ব্বলতা এবং সর্ব্বাঙ্গ শীর্ণ ও কৃশ। উপরে উঠিতে শ্বাস-কৃচ্ছ্র এবং অসম্ভব দুর্ব্বলতা অনুভব হয়। (গা) গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত স্ত্রী-লোকের স্তনদ্বয়ের শুষ্কতা। (গা)

জননেন্দ্রিয়—পুরুষ—অণ্ডকোষের বিবৃদ্ধি ও সঙ্গম ইচ্ছার উত্তেজনা। অণ্ডকোষের অপকর্ষতায় সহিত সম্পূর্ণ ধ্বজভঙ্গ। সঙ্গম ইচ্ছার সম্পূর্ণ অভাব আইওডিন ব্যবহারের একটী প্রধান লক্ষণ।

জননেন্দ্রিয়-স্ত্রী—স্তনদ্বয় মেদশূন্য, শিথিল ও ভার অনুভব হয়। (গা) স্তনের প্রখর বেদনা জরায়ুর প্রদাহ হেতু উৎপন্ন। (গা) ঋতুকালীন অতিশয় দুর্ব্বলতা বিশেষ উপরে উঠিতে গেলে অধিক অনুভব। (গা) ডিম্ব-কোষের, জরায়ুর বিবৃদ্ধি ও কাঠিন্যতা। জরায়ু হইতে অধিক দিবস স্থায়ী-রক্তস্রাব। (গা) প্রতিবার মলত্যাগ অন্তে জরায়ু হইতে রক্তস্রাব এবং উদরে, পৃষ্ঠে, কুচ্‌কিতে কর্ত্তনবৎ বেদনা। (গা) গলগণ্ডের সহিত নিয়মিত সময়ের অগ্রে প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব, স্তনদ্বয়ের শুষ্কতা এবং উপরে উঠিতে গেলে দুর্ব্বলতা অনুভব। (গা) শ্বেত প্রদর ঋতু কালীন বৃদ্ধি। (গা)

দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ডিম্বকোষ হইতে ঠেলিয়া ধরার ন্যায় বেদনা আরম্ভ হইয়া জরায়ুতে আইসে দেহ অতিশয় কৃশ। (হে) ডিম্বকোষে শোথ ও উহাতে চেপে ধরার ন্যায় বেদনা জরায়ু পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়।

* শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্র—স্বরযন্ত্রে বেদনার সহিত স্বরভঙ্গ বা সম্পূর্ণ বাক্‌রোধ। স্বরভঙ্গের সহিত অনবরত খক্‌খকে কাসি বোধ হয়, যেন গলায় কিছু রহিয়াছে। স্বরযন্ত্রে সঙ্কোচন অনুভবের সহিত স্বরভঙ্গ। গণ্ডমালাধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির স্বরঘ্ন। স্বরঘ্ন, শুষ্ককাসি, স্বরযন্ত্রে এবং বায়ুনলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি শুষ্ক এবং কঠিন ও শক্ত শ্লেষ্মা সঞ্চার (ডাঃ স্মল) কৃত্রিম ঝিল্লিবিশিষ্ট স্বরঘ্নের সহিত ঘর্‌ঘরে এবং সাঁই সাঁই শব্দযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস, কাসি শুষ্ক ও কুক্কুট ধ্বনিবৎ, বালক হস্ত দ্বারা কণ্ঠ ধরে।

আইওডিন ভিন্ন অন্য কোন ঔষধ দেখা যায় না যাহাতে প্রবল কণ্ঠ প্রদাহ জন্মে। ডাক্তার বাট বলেন যে, স্বরভঙ্গের সহিত স্বরঘ্ন পীড়া এবং স্বরযন্ত্রের প্রখর পুরাতন প্রদাহ আইওডিন ব্যবহারে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া থাকে। ডাঃ বেয়ার বলেন যে, স্বরঘ্নে আইওডিন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ আর দেখা যায় না। ডাঃ ট্রিনাক্ দুই প্রকার স্বরঘ্নের প্রখর ও মৃদু স্বরঘ্ন পীড়ার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আইওডিন এ উভয় পীড়ায় অমোঘ। তিনি একোনাইট ও হিপার্ সল্‌ফারের সাহায্য কোন অবস্থায় আবশ্যক বলিয়া বোধ করেন না। উচ্চ মাত্রায় অর্থাৎ অল্প ঔষধ প্রয়োগে পীড়ার প্রবলতা হ্রাস না হইলে তিনি পুনঃ পুনঃ অধিক মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করাইতে উপদেশ দিয়াছেন। সেবন ব্যতীত আইওডিন তপ্ত জলে মিশ্রিত করিয়া আঘ্রাণ লইলে ফল দর্শে।

অতিশয় শ্বাসকৃচ্ছ্র, হৃৎকম্পন এবং উপরে উঠিতে গেলে শ্বাস অবরোধ। স্বরযন্ত্রে শুড়শুড়ানিহেতু প্রাতে শুষ্ক কাসি এবং বক্ষে জ্বালা। দুর্ব্বল ও গণ্ডমালাধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির বায়ুনলী ফুস্‌ফুস্ মধ্যে রক্ত সঞ্চার এবং রক্তস্রাব। কাসির সহিত প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা উৎক্ষেপ বা মুখে লবণ অথবা অম্ল স্বাদ। বক্ষে অতিশয় দুর্ব্বলতা অনুভব। শ্বাসপ্রশ্বাসে বাধা, শ্বাস গ্রহণ কষ্টকর। সামান্য পরিশ্রমে অতিশয় শ্বাসকৃচ্ছ্র। ক্ষয়-কাসের সহিত কণ্ঠে ও বায়ুনলীতে অনবরত শুড়শুড়ানি হেতু কাসিতে ইচ্ছা; কাসির সহিত রক্ত মিশ্রিত স্বচ্ছ শ্লেষ্মা উৎক্ষেপ, প্রাতে ঘর্ম্ম, দেহ কৃশ

ও দুর্ব্বলকর। দেহ শুষ্ককর জর, নাড়ী দ্রুত, উদরাময় এবং স্ত্রীলোকদিগের রজস্তম্ভ। এ অবস্থায় আইওডিন ব্যবহারে উক্ত লক্ষণ সকল শান্তি হইতে পারে। কিন্তু নূতন গুটিকা প্রকাশ হওয়া নিবারণ করিতে পারে না। (হিউজ) ডাঃ জোসেট বলেন, আইওডিনের কাসি সল্‌ফারের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী থক্‌থকে ও সরল এবং কাসির সহিত পূঁজের ন্যায় গাঢ় শ্লেষ্মা উৎক্ষিপ্ত হয়, অথবা রক্ত উৎক্ষেপ হয়। ডাক্তার হারকেল লিখিয়াছেন যে, আইওডিন, ব্রমিন, স্পঞ্জিয়ার এস্থলে কতকগুলি সদৃশ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। যথা শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের উদ্ধাংসের যে কোন পীড়ায় সর্দ্দিজাত প্রদাহ উদ্ভূত অথবা যান্ত্রিক বিকার হেতু শুষ্ককাসি ইত্যাদি। স্বরযন্ত্রে বহুদিবসস্থায়ী সর্দ্দি ইহাতে আরোগ্য হইতে পারে। যক্ষ্মা রোগে ইহা একটী প্রধান উপসর্গ-নিবারক ঔষধ। স্বরয় পীড়ার স্পঞ্জিয়া ও ব্রমিন ব্যবহারে কোন ফল না দর্শিলে ইহাই একমাত্র ঔষধ। ঐ সকল রোগে এই তিনটীর মধ্যে কোনটী উপযুক্ত তাহা নির্ণয় করা অনেক সময় কঠিন হইয়া উঠে। মোটা মুটি যে স্থানে উৎক্ষিপ্ত শ্লেষ্মা চট্‌চটে বোধ হইবে, সেখানে আইওডিন ব্যবহারে উপকার দর্শিবে।

প্রচণ্ড হৃৎব্যাপন সামান্য পরিশ্রমে বৃদ্ধি। ফুস্‌ফুস্‌ আবরক ঝিল্লি অর্থাৎ প্লুরায় জল সঞ্চার।

নাসিকার পীড়া—নাসিকার শুষ্ক সর্দ্দি, বহির্ব্বাতাসে গেলে নাসিকা হইতে জলস্রাব, ঘ্রাণশক্তির অভাব, নাসিকা শুষ্ক এবং আবদ্ধ। নাসিকা হইতে বহুকালস্থায়ী দুর্গন্ধ শ্লেষ্মাস্রাব, নাসারন্ধ্র বেদনাযুক্ত ও স্ফীত।

পরিপাক যন্ত্র—জিহ্বা গাঢ় লেপযুক্ত। মুখ হইতে লালাস্রাব বিশেষ পারা সেবনান্তে। মাড়ি কম্প ও উহা হইতে রক্তস্রাব। মুখে অনবরত লবণস্বাদ। (গা) প্রাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে মুখ গহ্বর শ্লেষ্মাপূর্ণ থাকে। (হে) মুখ গহ্বরে ক্ষত, মাড়ি আরক্ত ও স্ফীত। কণ্ঠের প্রদাহ, উহাতে জ্বালা ও বেদনা। কণ্ঠে ক্ষত এবং গ্রীবার গ্রন্থি সকল কঠিন ও স্ফীত। অন্নবহা নলীতে ক্ষত হেতু গলাধঃকরণে কষ্ট। অতিরিক্ত অস্বাভাবিক ক্ষুধা কিছুতে নিবৃত্তি হয় না। অনবরত শূন্য উদ্গার, বোধ হয় যেন কিছু আহার করা হইয়াছে তাহা সমস্তই বায়ুতে পূর্ণ হইয়াছে। (গা) অনবরত প্রচণ্ড

বমন, আহারের পুনরুদ্রেক। বামপার্শ্বে যকৃত স্থান কঠিন ও চাপিলে বেদনা। যকৃতের বিবৃদ্ধি ও স্ফীততা। উদরে বায়ু আবদ্ধ হইয়া অতিশয় আধ্মান। দাস্ত ঈষৎ কাল ও জলবৎ, ফেণাময় রক্ত মিশ্রিত, ঈষৎ সাদা শ্লেষ্মা মিশ্রিত। (বেল) দাস্ত আম ও রক্ত মিশ্রিত, পুরাতন অধিক দিবস স্থায়ী দুর্ব্বলকর উদরাময় রোগে বিশেষ উপকারী, অর্দ্ধেনিকের ন্যায় অনবরত সংস্থান পরিবর্ত্তন করে। (বেল) রোগী এত অস্থির হয় যে, কিছুতেই স্থিরভাবে শয়ন করিতে বসিতে বা নিদ্রা যাইতে পারে না। ইহাই আইওডিনের বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ। অন্ত্রের মেসেট্রিকগ্রন্থির পীড়া হেতু দেহ শীঘ্র শীর্ণ হয়। রাত্রে ঘর্ম্ম, মৃদুজ্বর, স্বরযন্ত্রের শুষ্ক কাসি, উদরাময় ইত্যাদিতে ইহা প্রধান ঔষধ। (হিউজ) মল কঠিন ও কাল।

মূত্রযন্ত্র—পুনঃ পুনঃ প্রচুর মূত্রত্যাগ। প্রস্রাব ঘোর গাঢ় ও এমোনিয়ার গন্ধবিশিষ্ট, ঈষৎ পিত্ত মিশ্রিত, সবুজ, উগ্র, দুগ্ধের ন্যায় সাদা ও উপরে স্বরের ন্যায় পদার্থ ভাসে। মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ (ব্রাইটস্ পীড়া) ও এলবিউমেন মিশ্রিত প্রস্রাব, দেহ অতিশয় কৃশ ও সামান্য পরিশ্রমে শ্বাস অবরোধ।

মস্তকের পীড়া—অতিশয় বিমর্ষ ও বিষাদ। অনবরত বোধ হয় যেন কিছু ভুলিয়াছি। (হে) খিট্‌খিটে স্বভাব ও অতিশয় স্নায়বীয় উত্তেজনা। ধারণাশক্তির সম্পূর্ণ অভাব, কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা হয় না। মস্তিষ্কের উত্তেজনা হেতু কোনক্রমে স্থিরভাবে থাকা যায় না, অনবরত শিরঃপীড়া, উষ্ণ বায়ুতে বৃদ্ধি নড়িলে দপ্‌দপানি শিরঃপীড়া। শির ঘূর্ণনের সহিত প্রচণ্ড দপ্‌দপে শিরঃপীড়া, অতিশয় দুর্ব্বল ও দেহ কম্পিত, উঠিলে বৃদ্ধি। সামান্য নড়িলে মস্তকে দপ্‌দপানি, উষ্ণ বায়ুতে বৃদ্ধি। বৃদ্ধদিগের মস্তকে রক্ত সঞ্চার হেতু স্থায়ী শিরঃপীড়া। মুখমণ্ডল স্ফীত ও রক্তশূন্য, ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ ও শিরা সকল স্ফীত। সর্দ্দিজাত বধিরতা।

চক্ষু—দৃষ্টির বিকৃতি, দৃষ্টিহানী বোধ হয় যেন দৃষ্টিপথে জলবৎ পদার্থ সর্ব্বদা রহিয়াছে। কনিনিকা প্রশস্ত, পাতাদ্বয় স্ফীত ও শোথযুক্ত। গণ্ডমালাজনিত অভিষ্যন্দ, অর্থাৎ চক্ষুপ্রদাহ গ্রন্থি সকল কঠিন।

গ্রন্থি—গলগণ্ড যত দিবস কোমল থাকে, (কঠিন হইলে বিশেষ

উপকার দর্শে না)—গ্রীবার গ্রন্থি স্ফীত ও কঠিন। গণ্ডমালা ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির দেহের সমস্ত গ্রন্থির বিবৃদ্ধি।

ত্বক—কর্কশ ও শুষ্ক। অপরিষ্কার, পীতবর্ণ, স্ফীত ত্বক। রাত্রে প্রচুর ঘর্ম্ম, অতিশয় দুর্ব্বলতা ও দেহ শীর্ণ, সামান্য কারণে সর্দ্দি, বিশেষ উষ্ণ বায়ুতে। নানাপ্রকার চর্ম্মরোগে যথা—আমবাত, ব্রণ, হাম উপদংশ-জাতচর্ম্মরোগও চর্ম্মক্ষত। স্ফোটকও ব্রণপ্রবল দেহ।

জ্বর—যে জ্বর শীত প্রধান। পর্য্যায়ক্রমে শীত ও উষ্ণতা অনুভব। দুর্ব্বলতা, অল্পঘর্ম্ম বিশেষ প্রাতে।

হস্ত ও পদ—অতিশয় দুর্ব্বলতা হেতু হাত পায়ের ক্লান্তি বোধ। হাত পা অস্বাভাবিক শীতল। পায়ের পাতায় উগ্র ঘর্ম্ম। পায়ের শোথ। হাত পায়ের অতিশয় কম্পন। যে সকল পীড়ায় আইওডিন ব্যবহার হয়, তাহাতে রোগী অতিশয় কৃশ হওয়া ইহার একটী প্রধান লক্ষণ। সন্ধিস্থলের পুরাতন বাত এবং পারার ভাবিফল ইহাতে আরোগ্য হয়।

বৃদ্ধি—মস্তক আবৃত করিলে, উষ্ণ বায়ুতে, নড়িলে, রাত্রে।

শান্তি—শীতল বাতাসে, শীতল জলে ধৌত করিলেও আহারান্তে।

১২৯৫ সাল,
ফাল্গুন।

ডাক্তার শ্রীশিখর কুমার বসু
এল্, এম্, এস্,
হোমিওপ্যাথিক্ প্রাক্‌টিসনার।

সদাচার ও কদাচার।

স্নান।

(উদ্ধৃত)

পূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে যে, ধ্বংস ও গঠন লইয়াই জীবদেহ। ইহা একটী দীপ-শিখা বিশেষ। প্রতি মুহূর্ত্তে দেহাংশ ধ্বংস হইয়া পুনর্ব্বার গঠিত হইতেছে। এই নষ্ট পদার্থ দেহ হইতে বিনির্গত করিবার নানা

উপায় আছে, তন্মধ্যে ঘর্ম্ম একটী মহদুপায়। "ত্বক্ ঘর্ম্মোৎপাদক গ্রন্থি-সমূহে পরিপূর্ণ এবং ঐ সকল গ্রন্থি হইতে অহোরাত্র স্বেদ নির্গত হইতেছে। এই ঘর্ম্মের জলীয় ভাগ বাষ্পাকৃত হইয়া উত্থিত হওয়ায় অবশিষ্ট কঠিন মল ঘর্ম্মগ্রন্থির দ্বার সকল রুদ্ধ করে। ত্বক্ নির্ম্মল না থাকিলে গাত্রকণ্ডু, স্ফোট প্রভৃতি বহুবিধ ত্বাচ রোগের উৎপত্তি হয়। ডাক্তার ইরাস্‌মস্ উইল্‌সন্ অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিয়াছেন যে, করতলে এক ইঞ্চ মধ্যে ৩৫২৮টী ঘর্ম্ম-প্রণালীর দ্বার আছে ও প্রত্যেক ঘর্ম্ম-প্রণালী ¼ ইঞ্চ দীর্ঘ। তিনি এই সূত্রে গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, সাধারণ উচ্চ ও স্থূল শরীরের ত্বকে যে সকল প্রণালী আছে, তাহাদের দৈর্ঘ একত্র করিলে প্রায় ২৮ মাইল বা ১৪ ক্রোশ লম্বা হইবে। সকল স্থানের ত্বকে সমান সংখ্যক প্রণালী নাই ও তাহাদের দৈর্ঘ্যও সমান নহে। তবে উপরি উক্ত প্রণালীনিচয়ের একত্রী-ভূত লম্বা গড়পড়্‌তা ধরা হইয়াছে। এত বৃহৎ মলনির্গমের পথ অবরুদ্ধ হইলে যে, কত অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা বলা যায় না। অতএব শরীরের ত্বক্ নির্ম্মল রাখা প্রয়োজন।" *

তৈলমর্দ্দনে ঘর্ম্ম-মল তরল ও দ্রবীভূত হয়, কিন্তু তাহা ধৌত না করিলে দ্বার সকল দৃঢ়তর রুদ্ধ করে। বাল্যকালে যে, অনেকের স্ফোটাদি ত্বাচরোগ জন্মে, তাহা কেবল ত্বক্ নির্ম্মল না থাকা হেতু।

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, স্নান-ক্রিয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। একটী সাধারণ কথায় বলে, "শরীরের নাম মহাশয়, যাহা সহাবে, তাহাই সয়," এই জন্য প্রথম প্রথম ইহাদের বিলক্ষণ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে।

স্নান দ্বারা দেহের একটী গুরুতর ভাবান্তর উপস্থিত হয়। এক্ষণে আমরা সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি। শরীরের বিবিধ উপকরণ মধ্যে স্নায়ু একটী প্রধানাঙ্গ। ইহা সর্ব্বস্থল ব্যাপ্ত হইয়া আছে এবং যদি কোন স্থলে স্নায়ুর ক্রিয়া বিনষ্ট হয়, তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। বিবিধ বাহ্য বস্তুর সংস্রবে স্নায়ুর উত্তেজনা ও অবসান হইয়া থাকে। সুতরাং শীতল বা উষ্ণজল সংলগ্নেও উক্ত ভাবান্তর হইতে দেখা যায়। অতএব স্নান করা সম্বন্ধে এই একটী গুরুতর আপত্তি। এক পক্ষে স্নান না করিলে দেহ পরি-

---

* মৎকৃত শিশুপালনের ৮৬ পৃষ্ঠা।

ক্ষত হয় না, দ্বিতীয় পক্ষে স্নান দ্বারা দেহের অবসাদ বা উত্তেজনা হইয়া থাকে। উভয়েই সতত ভাল নহে।

অনেকেই দেখিয়াছেন যে, যাহারা মদিরা পান করে, তাহাদের শরীর প্রথমে উত্তেজিত, পরে অবসন্ন হইয়া থাকে। ইহাকেই প্রতিক্রিয়া বলে। এই প্রতিক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্নান কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে কোন ক্ষতি হওয়া দূরে থাক, বরং উপকারই হইয়া থাকে। শরীরকে যদি নাস্তা নাবুদ না করিতে চাহ, তাহা হইলে স্নান কার্য্য অতি সাবধানে করিবে। অতএব ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবগাহন করিলে যে যে দোষ গুণ হয়, তাহা ক্রমশঃ বর্ণিত হইতেছে।

১। প্রাতঃস্নান।—এই স্নান ঠিক সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে করিতে হয়। প্রাচীন কালাবধি এইরূপ অবগাহন অতিপ্রচলিত ছিল এবং এক্ষণেও অনেকে এই প্রকার অবগাহন করিয়া থাকেন। রাত্রিকালে নিদ্রার সময় সমস্ত দেহ অবসন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়াই যদি অবগাহন করা যায়, অনিষ্ট ব্যতীত তাহাতে ইষ্ট সাধন হয় না। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ প্রত্যূষে স্নান করিতেন সত্য, কিন্তু নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া ঈশ্বরের নাম লইতে ও গঙ্গাস্নান করিতে যে পথ চলিতে হইত, তাহাতে রাত্রির অবসন্নতা দূর হইত। স্রোতের জল পক্ষান্তরে প্রত্যূষে উষ্ণ হয়, সেই জন্যও অবসন্নতা তত অধিক হয় না। যাঁহারা প্রত্যূষে অবগাহন করিতে চাহেন, তাঁহারা যেন অগ্রে রাত্রির অবসন্নতা দূর করেন।

২। একপ্রহর বা দ্বাদশ দণ্ডের সময় স্নান।—ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই সময়ে রাত্রির অবসন্নতা সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়, দৈহিক উষ্ণতা অধিক থাকে না, সূর্য্যের প্রখর করভাবে জল অতিশয় শীতল বা অতি উষ্ণ থাকে না, ফলতঃ এই সময়ে শরীর যেরূপ প্রকৃতিস্থ হয়, জলও তদুপযোগী হইতে দেখা যায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ দেশী বিদেশী আচার মিশ্রিত হওয়ায় অবগাহন দ্বারা বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। এই অনিষ্ট কিরূপে হইতেছে, তাহা বুঝিবার জন্য পাঠকগণ স্নানের সময় শরীরের অবস্থা কিরূপ হয়, তাহা একবার চিন্তা করিবেন। মনে করুন, পৌষ কি মাঘমাসে কোন নদী, কি পুষ্করিণীতে স্নানার্থে গমন করিয়া শীতের ভয়ে জলে অবতরণ করিতে পারিতেছেন না। কিছুক্ষণ চিন্তার পর সাহসাবলম্বনে জলে নিমজ্জন হইলে শৈত্যের প্রখরতায়

কম্প উপস্থিত হইলে যদি সহ্য করিয়া আকণ্ঠ জলে কিয়ৎকাল নিমজ্জিত হইয়া থাকিতে পারেন, তাহা হইলে ক্রমশঃ ঐ জলমধ্যেই শরীর উষ্ণ বোধ হইবে। এই উষ্ণতা বোধের সময় জল হইতে উত্থিত হওয়া উচিত, যেহেতু তাহা না করিলে অল্পকাল মধ্যে দেহ অবসন্ন হয়।

এক্ষণে পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন, স্নান দ্বারা দেহের কতদূর ভাবান্তর হইয়া থাকে। অতএব অবগাহনের অব্যবহিত পরে কোন প্রকার আহার করা উচিত নহে, করিলে পরিপাকের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

ইংরাজদের আগমনে অনেকানেক দেশীয়রীতির, বিশেষতঃ কথিত আচারের যে অত্যধিক ব্যভিচার জন্মিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। বিদ্যালয়ের বালক, উকিল, মোক্তার, সরকারী কর্ম্মচারী সকলকেই স্নান করিয়াই আহার করিতে দেখা যায়, এবং সেই জন্য পরিপাকের ব্যাঘাতহেতু অম্লের পীড়া, অজীর্ণতা ও তদ্ধেতু অকালে দন্ত-পতন এবং অকালবার্দ্ধক্য হইয়া থাকে। ফলতঃ এই একমাত্র ব্যভিচারে দেহ যেরূপ জীর্ণ শীর্ণ হইতেছে, যদি বিশেষ বিবেচনা করা যায়, অন্যান্য যত কারণ আছে, তাহা একত্রীভূত করিলেও ইহার সমতুল্য হইবে কি না সন্দেহ। পূর্ব্বকালে স্নানান্তে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ সন্ধ্যাপূজাদিতে যে কাল অতিবাহিত করিতেন, তন্মধ্যে অবসন্নতা ও উত্তেজনার পর দেহে সুতরাং তাঁহাদিগের এত পীড়াও হইত না।

দেহের অনেক অবস্থাতে স্নান অহিতকর। আয়ুর্ব্বেদে

"স্নানং জরেঽতিসারে চ নেত্রকর্ণানিলার্ত্তিষু।
আধ্মানপীনসাজীর্ণভুক্তবৎসু চ গর্হিতম্॥"

জ্বরে, অতিসারে, নেত্র ও কর্ণরোগে, বায়ুরোগে (উন্মত্ততায়), উদরাধ্মানে, পীনসে, অজীর্ণতায় এবং আহারান্তে স্নান করিতে নিষেধ আছে।

আবার কোন কোন অবস্থায় শীতল জলের পরিবর্ত্তে উষ্ণ ও সামান্য উষ্ণ জলে স্নান করিতে হয়। চিকিৎসা গ্রন্থে ও স্বাস্থ্যরক্ষায় বিবিধ অবগাহের বিষয় বর্ণিত আছে, এস্থলে তাহা পুনঃ পুনঃ বিবৃত করা প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয় না।

দন্তশোধন চূর্ণ।

ইউরোপীয় মতানুযায়ী দন্তশোধন-চূর্ণাদির বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হই-

তেছে। নিম্নে দন্তধাবন-চূর্ণাদির যে সমস্ত আর্ব্যা প্রদত্ত হইতেছে, তন্মধ্যে অধিকাংশ "পেটেণ্ট" ঔষধরূপে বিক্রীত হয়। চিকিৎসা-দর্শনের গ্রাহকগণ ইচ্ছা করিলে উহা ঐ ভাবে ব্যবহার করিতে পারেন। এস্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে, সকল প্রকার চূর্ণই অতি সূক্ষ্ম হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন, যেহেতু কাঁকর বা কঠিন বস্তু থাকিলে দন্তের উপরিভাগ ক্ষয় হইতে পারে ও তৎসঙ্গে দন্তমাড়ি আহত হয়। এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন চূর্ণ অগ্রে মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে।

১। বেল্‌টন-কৃত দন্তশোধন চূর্ণ।

(Belton's Dentifrice.)

কটল্ ফিস্ (Cuttle Fish) চূর্ণ	... ...	৪ পাং
পরিষ্কৃত চা-খড়িচূর্ণ	... ...	১ পাং
অরিস্ রুটচূর্ণ	... ...	৪ পাং
মৃগনাভি	... ...	৮ গ্রেণ্
ল্যাভেণ্ডার অয়েল (ভাল)	... ...	৪৮ টোপ
গোলাপের আতর	... ...	৪৮ টোপ
কামাইন নং ৪০	... ...	২ ড্রাং
একোয়া এমনি	... ...	৫ ড্রাং
জল	... ...	৬ আং

একোয়া এমনি ও জল মিশ্রিত করতঃ তৎসহ কামাইন মর্দ্দন কর; তৎপরে চা-খড়ি ও কটল্ ফিস্ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ঐ জলে ভিজাইতে দাও। কিয়ৎক্ষণ বিস্তার করিয়া রাখিলে ঐ রঞ্জিত চূর্ণ বিলক্ষণ শুষ্ক হইবে। অরিস্ রুট সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিয়া তাহাতে সুগন্ধি দ্রব্য সকল সংযোগ কর এবং এক্ষণে সমস্ত একত্র করিয়া শিশিতে উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া রাখ। ইহার প্রতি আং চারি হইতে আট আনায় বিক্রয় হয়।

২। স্যালিসিলিক্ টুথ্ পাউডার।

(Sallicilic Tooth-powder.)

আর্মিনিয়ান্ বোল	...	৪ আং
মার্হ (myrrh) চূর্ণ	...	১ আং
স্যালিসিলিক্ এসিড্	...	২০ গ্রেণ্

দগ্ধ ফট্‌কিরি	...	১ আং
অরিস্ রুট্ চূর্ণ	...	৪ ড্রাম্
ল্যাভেণ্ডার অয়েল্	...	৮০ ফোঁটা
রোজমেরি অয়েল্	...	৮০ ফোঁটা

একত্র মিশ্রিত কর।

৩। পেরিশিয়ান্ ডেণ্টিফ্রাইস্।

(Peritian Dentifrice.)

পরিষ্কৃত চা-খড়ি	...	২৪ আং
মার্হ চূর্ণ	...	২ আং
বার্ক চূর্ণ	...	৮ আং
অরিস্-রুট্ চূর্ণ	...	৮ আং
রোজ-পিঙ্ক্ চূর্ণ	...	৮ আং
দারুচিনির তৈল	...	৩২ ফোঁটা
লবঙ্গের তৈল	...	২৫ ফোঁটা

একত্র মিশ্রিত কর।

৪। ক্যামিলিয়ন্ টুথ্-পাউডার।

(Camelion Tooth-powder.)

কোচিনিয়েল্	...	১৫ গ্রেণ্
ফট্‌কিরি	...	৩০ গ্রেণ্

সযত্নে মিশ্রিত করিয়া নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির সহিত সংযোগ কর।

অরিস্ রুটচূর্ণ	...	১ আং
ক্রিম্ অব্‌টার্টার্	...	১০ ড্রাম্
কার্বনেট্ অব্ ম্যাগ্নিসিয়া	...	১½ ড্রাম
কটল্-ফিস্ পাউডার	...	৫ ড্রাম্
অয়েল্ অব্ রোজ্	...	৫ ফোঁটা

সমস্ত একত্র করিলে শ্বেতবর্ণ হইবে; কিন্তু ঐ চূর্ণে জলাদি লাগিলে উহা আরক্তবর্ণ ধারণ করে। চিকিৎসাদর্শন।

শ্রীহরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এল্, এম্, এস্,

নিদ্রাকারক ঔষধ।

(এলোপ্যাথিমতে)

(হিপ্নটিক্ বা সপোরিফিক্।)

যে ঔষধ সেবনে নিদ্রা উপস্থিত হয়, তাহাকেই হিপ্নোটিক্ বা নিদ্রাকারক ঔষধ বলা যায়। প্রধান প্রধান নিদ্রাকারক ঔষধগুলি এই; যথা;—

অহিফেণ	ব্রোমাইড্ অব্ পোটাসিয়ম্
মরফিয়া	ব্রোমাইড্ অব্ সোডিয়ম্
ক্লোরাল হাইড্রেট	ক্যামফর মনোব্রোমাইড্
ক্রোটন্ ক্লোরাল	হপ্
হাইওসিয়ামস্	লেটুস্
ক্যানাবিস্	সল্‌ফোনাল।

নিদ্রাকারক ঔষধ দুইপ্রকারের আছে। কতকগুলি ঔষধ এমন আছে, যাহারা নেশা উপস্থিত করিয়া নিদ্রাকারক হয়, যথা;—অহিফেণ এবং ব্রাণ্ডিসরাব নেশা উপস্থিত করে এবং নিদ্রাও আনয়ন করে। আর কতকগুলি নিদ্রাকারক ঔষধ আছে, যাহারা কেবলমাত্র নিদ্রা আনয়ন করে, কিন্তু নেশা উপস্থিত করে না। যথা ব্রোমাইড্ অব্ পোটাসিয়ম্ কেবল নিদ্রাকারক কিন্তু নেশা উপস্থিত করে না। নেশাকারক ও নিদ্রাকারক ঔষধে ইতরবিশেষ এই যে, নিদ্রা আনয়ন করিবার উপযুক্ত মাত্রায় কেবলমাত্র নিদ্রাকারক ঔষধ প্রয়োগ করিলে, রোগীর নিদ্রামাত্র হয়, কিন্তু নেশাকারক ঔষধ সেই মাত্রায় প্রয়োগ করিলে মনের সহিত বাহ্যপ্রকৃতির যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে তাহা ভঙ্গ হয় এবং রোগীর মন অপ্রকৃতিস্থ হয়। নেশার ঝোঁকে রোগীর মনে নানা কল্পনা উপস্থিত হয়। ব্রাণ্ডি খাইলে স্মরণশক্তি কম পড়ে। কিন্তু মনে নানাবিধ নূতন ভাবসকল উপস্থিত হয়। বাহ্যবস্তুর সহিত মনের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে তাহা ভঙ্গ হয়, মনের দমনশক্তি থাকে না, সুতরাং মনে যাহা উদয় হয় তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হয়। মন ও স্বভাব ঠিক্ শিশুর ন্যায় হয়। স্বভাবতই আমাদিগের মনে নানা কল্পনা উপস্থিত হয়, লোকে কথায় বলে মনের কথা খুলিয়া বলিলেই

লোকে পাগল বলে। কিন্তু বাহ্যিক নানাকার্য্য ও কারণপরম্পরার সহিত মনের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য আমরা মনকে সংযত করিতে শিক্ষা করি। যথা ;—হঠাৎ মনে, যদি হাস্য করিবার খেয়াল উপস্থিত হয়, অথচ সে সময় যদিসমবয়স্ক কেহ নিকটে উপস্থিত থাকে তবে মন খুলিয়া হাস্য করি। কিন্তু কোন গুরুতর ব্যক্তি নিকটে থাকিলে হাস্য করিতে নিরস্ত হই। কিন্তু নেশার বশ হইলে মনের এইরূপ সংযমপ্রবৃত্তি একেবারেই থাকে না, সুতরাং মনে যে খেয়াল উপস্থিত হয় রোগী তাহাই কার্য্যে পরিণত করে।

নিদ্রার সময় মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুসকলের ক্রিয়া অনেক পরিমাণে স্থগিত থাকে এবং মেডুলা অব্ লঙ্গেটা (Medulla oblongata) ব্যতীত সমস্ত মস্তিষ্কের ক্রিয়া স্থগিত থাকে। মেডুলার ক্রিয়া যদিও চলিতে থাকে, কিন্তু উহার শ্বাসপ্রশ্বাসের কেন্দ্র (মেডুলার যে অংশে শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য নিষ্পন্ন হয়) এবং ভাসো মোটর কেন্দ্রের * কার্য্য কিয়ৎপরিমাণে কমিয়া যায়। এই নিমিত্ত নিদ্রাকালীন শ্বাসপ্রশ্বাস ধীরে ধীরে বহিতে থাকে এবং শরীরের উপরিস্থিত শিরা সমুদয় প্রসারিত হয়।

কিন্তু নিদ্রাকালেও স্নায়ুযন্ত্রের কোন কোন কার্য্য চলিতে থাকে যথা, নিদ্রিতব্যক্তির নাকে বা কাণে পালকদ্বারা সুড়্সুড়ি দিলে নিদ্রাভঙ্গ না হইলেও মুখের মাংসপেশীর কার্য্য চলিতে থাকে এবং মুখ নড়ে। রোগী নাকে ও কাণে হস্তার্পণও করে। নিদ্রার সময় মশায় দংশন করিলে, নিদ্রা না ভাঙ্গিলেও নিদ্রিতব্যক্তির হাতপায়ের কার্য্য চলিতে থাকে এবং রোগী পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করে। তদ্ব্যতীত মস্তিষ্কেরও কোন কোন অংশের ক্রিয়া চলিতে থাকে সুতরাং রোগী নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখে। এবং নিদ্রাভঙ্গে ঐ স্বপ্নঘটিত কথা সকলও মনে করিয়া বলিতে পারে। স্বপ্ন দেখিবার সময় শরীরের অঙ্গ বিশেষও চালিত হয়, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে হয় না। নিদ্রার সময় ব্যাঘ্রে ধরিতে আসিতেছে এরূপ স্বপ্ন দেখিলে সামান্য অঙ্গ-

* মস্তিষ্কের পশ্চাদ্ভাগের অংশবিশেষকে মেডুলা কহে। এই মেডুলার নানা কার্য্য। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য মেডুলার ভিন্ন ভিন্ন অংশদ্বারা নিষ্পন্ন হয়। তন্মধ্যে যে অংশদ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস নির্ব্বাহ হয়, তাহাকে শ্বাসপ্রশ্বাসের অংশ কহে। এবং যে অংশের দ্বারা শরীরের শিরা সমুদয় সঙ্কুচিত হয় তাহাকে ভাসো মোটর সেন্টার কহে। এই শিরাসঙ্কোচক অংশের ক্রিয়া কম পড়িলেই সুতরাং শরীরের বাহ্যিকশিরা সকল প্রসারিত হয়।

চালনা হয় মাত্র। এবং দৌড়াইয়া পালাইবার ইচ্ছা থাকিলেও স্বপ্নদর্শনকারী দৌড়াইতে অক্ষম হয়। নিদ্রিতকুকুর কোন স্বপ্ন দেখিলে এরূপ ভাবে পা নাড়িতে থাকে যে বোধ হয় যেন কুকুর দৌড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, অথচ কুকুর সেই একপার্শ্বেই শুইয়া থাকে, দৌড়াইতে পারে না। অতএব নিদ্রাকালীন যদিও স্নায়ুযন্ত্রের কোন কোন অংশবিশেষের ক্রিয়া চলিতে থাকে, কিন্তু সমস্ত অংশের এক যোগে ক্রিয়া করিবার ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং সমস্ত স্নায়ুর ক্রিয়া এক যোগে চলিতে থাকিলে যেরূপ শরীরের ও মনের সমুদয় কার্য্য সমানভাবে চলিতে থাকে, নিদ্রিতাবস্থায় সেরূপ সমানভাবে সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না। অনেকে বলেন, নিদ্রাকালে মস্তিস্কে ও মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুমূলে রক্ত কম পড়ে; এই কারণেই এরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়।

নিদ্রাকালে মস্তিস্কের ধমনী (আর্টারি) সকল সঙ্কুচিত হয়, সুতরাং মস্তিষ্ক হইতে রক্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া মস্তিস্কে রক্তের ভাগ কম পড়ে। সুতরাং মস্তিষ্ক আয়তনে কিঞ্চিৎ ছোট হয়। নিদ্রাভঙ্গ হইলে মস্তিস্কের ধমনী সমুদয় পুনশ্চ প্রসারিত হয়, সুতরাং চতুর্দ্দিক হইতে রক্ত আসিয়া পুনরায় মস্তিস্কে উপস্থিত হয় এবং মস্তিষ্কও সুতরাং কিঞ্চিৎ বড় হয়। নিদ্রাকালীন স্বপ্ন উপস্থিত হইলে মস্তিস্কের কোন কোন অংশের কার্য্য চলিতে থাকে, সুতরাং সেই সেই অংশেই কেবল রক্ত ধাবিত হয়।

নিদ্রাবস্থায় মস্তিস্কের ধমনী ও শিরা উভয়ই সঙ্কুচিত হয় এবং মস্তিষ্ক রক্তশূন্য হয়। চিকিৎসকগণ নানাবিধ জন্তুর মস্তকের অস্থি আংশিক উৎপাটন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে নিদ্রার সময় (এই নিদ্রা স্বাভাবিকই হউক বা কোন ঔষধদ্বারাই আনীত হউক) সমস্ত মস্তিষ্ক রক্তশূন্য হয় এবং জাগ্রতাবস্থায় মস্তিষ্ক রক্তপূর্ণ হয়। কোমা অর্থাৎ মোহ অবস্থায় মস্তিস্কের শিরা (ভেইন) সকল প্রসারিত ও রক্তপূর্ণ হয়। সুতরাং কোমা (অচৈতন্যাবস্থা) উপস্থিত হইলে মস্তিস্কে রক্তাধিক্য হয়। অন্যবিধ রক্তাধিক্য ও কোমাজনিত রক্তাধিক্যে তফাৎ এই যে, কোমার সময় কেবল মস্তিস্কে ভেইন (শিরা) সকলে রক্ত জমা হয়। যদি ভেইনে রক্ত না জমিয়া কেবল মস্তিস্কের ধমনীতে রক্তসঞ্চিত হয়, তাহা হইলে রোগীর চক্ষু লালবর্ণ হয় এবং রোগীর নিদ্রা ত হবই না অধিকন্তু প্রলাপ বকিতে থাকে।

অতএব দেখা যায় (১) স্বাভাবিক নিদ্রায় মস্তিকের শিরা ও ধমনী উভয়ই সঙ্কুচিত হইয়া মস্তিষ্ক রক্তশূন্ত হয়। (২) কোমা বা রোগবশতঃ অচৈতন্তাবস্থায় মস্তিষ্কের ধমনী সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু ভেইন বা শিরা সকল প্রসারিত হয় সুতরাং মস্তিষ্কের ভাল লালরক্ত (ধামনিকরক্ত) চলিয়া যায় এবং ভেইন সকল প্রসারিত হওয়াতে মস্তিষ্কে শিরার কালরক্ত (শৈরিকরক্ত) আসিয়া জমে। এই শৈরিকরক্ত মস্তিষ্কের কোন পোষণকার্য্যে লাগে না। অধিকন্তু মস্তিষ্কে অধিক পরিমাণে কালরক্ত জমা হওয়াতে মস্তিষ্কের স্নায়ু সকলে চাপ পড়িয়া উহাদিগের ক্রিয়া করিবার আদৌ ক্ষমতা থাকে না, সুতরাং অচৈতন্তাবস্থা (কোমা) উপস্থিত হয়।

সুনিদ্রা আনয়ন করিতে হইলে দুইটী বিষয়ে মনোযোগ করিতে হইবে।

(১) মস্তিষ্কে যাহাতে রক্ত কম পড়ে তাহার উপায় বিধান করা।

(২) মস্তিষ্কের কার্য্য যাহাতে স্থগিত থাকে তাহার উপায় বিধান করা।

শরীরের অন্ত কোন স্থানের ধমনী সকলকে প্রসারিত করিতে পারিলে মস্তিষ্কের রক্ত সেই দিকে ধাবিত হইয়া নিদ্রা আনয়ন করে। দুর্ব্বল ব্যক্তিরা যখন বেড়াইয়া বেড়ায়, বা দাঁড়াইয়া বা বসিয়া থাকে, তখন তাহাদিগের নিদ্রা উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহারা শয়ন করিলে আর নিদ্রা আসে না, যেহেতু তাহাদিগের মস্তিষ্কের শিরা সমুদয় দুর্ব্বল ও প্রসারিত অবস্থায় থাকার জন্ত শরীরের অন্তান্ত স্থান হইতে রক্ত আসিয়া মস্তিষ্কের শিরা সকলে উপস্থিত হয়। এই সকল লোকে যদি খুব পুরু বালিশ দিয়া শরীর অপেক্ষা মাথা কিঞ্চিৎ উচ্চ করিয়া শয়ন করে তাহা হইলে শীঘ্রই নিদ্রা আসে। এই সকল দুর্ব্বলশিরাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে ধমনীর বল বিধান করে এইরূপ উত্তেজক ঔষধ যথা—ডিজিট্যালিস্ প্রভৃতি সেবন করিলে উহাদিগের নিদ্রা আসিতে পারে।

শরীরের সকল স্থান অপেক্ষা অন্ত্রে (পেটের নাড়ীভুঁড়ি) অধিক পরিমাণে ধমনী আছে। এই সকল অন্ত্রস্থ ধমনী প্রসারিত করিতে পারিলে শীঘ্রই মস্তিষ্কের রক্ত ঐ সকল ধমনীতে গমন করে এবং নিদ্রা উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে অন্ত্রস্থ ধমনী সকল সঙ্কুচিত হইলে নিদ্রা একেবারেই অসাধ্য হইয়া উঠে, কারণ ঐ সকল ধমনী সঙ্কুচিত হইলে তাহাদিগের

রক্ত মস্তিষ্কাভিমুখে ধাবিত হইয়া মস্তকে রক্তাধিক্য হয়। শীতের সময় মনুষ্য ও পশুদিগের পেটে শীত লাগিয়া ঐ সকল আন্ত্রিক ধমনী সকল সঙ্কুচিত হইয়া নিদ্রার ব্যাঘাত করে, এজন্য মনুষ্য ও পশুগণ শীত লাগিলে আপনা হইতেই পেটের মাংসপেশী সঙ্কুচিত করে এবং শয়নকালে পা জড় করিয়া শোয় তাহাতে পা বা উরুদেশ দ্বারা পেট ঢাকা পড়ে এবং তাহা-তেই পেট গরম হয়। সুতরাং নিদ্রার সুবিধা হয়। এই নিয়মবশতঃ উদরের উপর স্বেদ বা পোল্‌টিস্‌ প্রয়োগ করিলে নিদ্রার সুবিধা হয়। অথবা উদরপ্রদেশে ফ্লানেল আবৃত করিলেও নিদ্রা আসিতে পারে। একখণ্ড ফ্লানেল শীতলজলে ভিজাইয়া নিঙড়াইয়া পেটে বাঁধিয়া দিয়া তার উপর অয়েলক্লথ বা এবম্বিধ কাপড় দিয়া সর্ব্বোপরি আর দুইখানি শুষ্ক ফ্লানেল স্থাপন করিয়া পেট বাঁধিয়া দিলে নিদ্রা আসে। এই ব্যবস্থা শিশুদিগের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

ঈষৎ উষ্ণ দ্রব্য সকল ভোজন করিলে পাকস্থলী উষ্ণ হইয়া নিদ্রা উপ-স্থিত হয়। কিন্তু অত্যধিক উষ্ণ দ্রব্য, যেমন খুব গরম দুধ প্রভৃতি খাইলে হৃদয় যন্ত্র উত্তেজিত হইয়া নিদ্রার ব্যাঘাত করে। অতএব সুনিদ্রা আনয়ন করিতে হইলে শয়নের পূর্ব্বে অল্প অল্প গরম জিনিষ খাওয়াইলে নিদ্রার সুবিধা হইতে পারে। পদদ্বয় শীতল থাকিলে নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এজন্য শয়ন করিবার পূর্ব্বে পা দুইখানি ধৌত করিয়া শুষ্ক কাপড় বা তোয়ালে দিয়া মুছিলে পা উষ্ণ হয়, অথবা পদদ্বয় ধৌতনন্তর মোজা ব্যবহার করি-লেও চলিতে পারে। জ্বর বিকারের সময় মস্তিষ্কে অত্যন্ত রক্তাধিক্য হইয়া রোগীর প্রলাপ উপস্থিত হইলে, দুইটী বড় বড় মোজা (ফ্লানেলের মোজা হইলে ভাল হয়) গরম জলে ভিজাইয়া নিঙড়াইয়া পদদ্বয়ে পরাইয়া দিলে প্রলাপ ভাল হয় এবং রোগী নিদ্রিত হয়।

যদি হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া অত্যধিক হইয়া নিদ্রার ব্যাঘাত করে, তাহা হইলে হৃদয় যন্ত্রকে প্রকৃতিস্থ করে এরূপ ঔষধ সেবন করান বিধেয়। সমস্ত শরীর শীতল হইলে হৃদয় প্রকৃতিস্থ হয়, এজন্য রাত্রে নিদ্রার অভাব হইলে, কিয়ৎ-কাল বাহিরের শীতল বাতাসে ভ্রমণ করিয়া শরীর শীতল হইলে নিদ্রা আসে। অথবা সমস্ত শরীর শীতল বা উষ্ণ জল দিয়া ধৌত করিয়া পায় শুষ্ক তোয়ালে দিয়া মুছিলে নিদ্রা হইতে পারে।

মস্তিষ্কে তৈল ও জল প্রদান করিলে মস্তিষ্কের রক্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া সুনিদ্রা হয়।

সমুদয় নিদ্রাকারক ঔষধ মধ্যে অহিফেণ অথবা মরফিয়া শ্রেষ্ঠ। অহিফেণে মস্তকের ক্রিয়া হ্রাস করে এবং মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যতা দূর করে। কোনরূপ যন্ত্রণার জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত হইলে অহিফেণ দ্বারা যন্ত্রণা দূর হইয়া সুনিদ্রা হয়। ব্রোমাইড্ অব্ পোটাসিয়মে মস্তিষ্কের উত্তেজনা দূর করিয়া নিদ্রা আনয়ন করে। ক্লোরাল্ হাইড্রেট্ শরীরের শিরা প্রসারিত করিয়া নিদ্রাকারক হয়।

যদি একটীমাত্র নিদ্রাকারক ঔষধে উপকার না হয়, তবে দুই তিন রকম ঔষধ মিশাইয়া দিলে নিদ্রা হয়। যথা, কাহারও কাহারও সুধু অহিফেণে মস্তিষ্কের উত্তেজনা উপস্থিত করিয়া নিদ্রার ব্যাঘাত করে; এই সকল স্থলে অহিফেণ এবং ক্লোরাল মিশাইয়া দিলে উপকার হয়। নিম্নলিখিত প্রেস্‌ক্রপসনটী অনিদ্রার অত্যন্ত উপকারী যথাঃ—

টীং ওপিয়ম্— ১০ ফোটা
ক্লোরাল হাইড্রেট্— ৫ গ্রেণ
ব্রোমাইড্ অব্‌পোটাসিয়ম্—২০ গ্রেণ
জল— ১ আউন্স

একত্র মিশ্রিত করিয়া একমাত্রা সমুদয় শয়নকালে সেবন করাইবে।

ক্রমশঃ—

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ ঔষধ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৬। গোলমরিচ ও আমসি (আমশুঁঠ)—সমপরিমাণ লইয়া উত্তমরূপে পেষণ করতঃ কিঞ্চিৎ গব্যঘৃতের সহিত একত্র করিয়া মাকড়সার দষ্টস্থানে ক্ষতমুখে প্রলেপ দিলে অতি শীঘ্র বিষদোষ নষ্ট হয়।

৭। কুকুরে কামড়াইলে তাহার বিষনাশক ঔষধ। আকন্দের আঠাতে কাপাসতুলা ভিজাইয়া দষ্টস্থানে ক্ষতমুখে দিয়া রাখিবেক,

সর্ব্বদা ঐ তুলা আঠাতে ভিজা থাকা আবশ্যক, কোন প্রকারে শুষ্ক হইতে না পারে, এইরূপ কিয়দ্দিবস তুলা ক্ষতমুখে থাকিলে ঐ ক্ষত পাকিয়া পুঁযের সহিত বিষ নির্গত হইয়া যাইবেক। আর কোন সন্দেহ থাকিবেক না। এই ঔষধী শৃগাল দংশনেও বিশেষ কার্য্যকারী হয়।

৮। অন্ত্রব্রণ বসিয়া যাইবার ঔষধ। সুসুনিশাকের বীজ, শ্বেতবেড়েলার মূল সমপরিমাণে লইয়া কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অন্ত্রব্রণ বসিয়া যায়।

৯। নালিঘার ঔষধ। মামালাড়ুর পাতা, ক্ষুদ্‌কেশুরিয়ার ডগী, সমপরিমাণে লইয়া মনসা সেজের পাতার রস দিয়া মাড়িয়া নালিঘার মুখে দিলে ঘা আরোগ্য হইবেক। ৪।৫ দিন দেওয়া আবশ্যক। সেজের পাতা অগ্নিতে কিছুক্ষণ ছাকিয়া লইতে হয়।

১০। চেলা কিম্বা বিছায় কামড়াইলে তাহার জ্বালা নিবারণের উপায়।

কামড়াইবামাত্র সেই স্থান এমত টিপিয়া কিম্বা মাংস ও চর্ম্মের সহিত চেম্‌টি কাটিয়া ধরিতে হইবেক যে, তদ্দ্বারা বিশিষ্ট বেদনা লাগে। উক্তরূপে অর্দ্ধঘণ্টা পর্য্যন্ত রাখিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবেক। পরে আর জ্বালা বোধ হইবেক না।

১১। ফিঁক্‌বেদনার ঔষধ। ঘাড়ে কিম্বা মাজায় শয়নাদিদোষ নিমিত্ত ফিকেঁ বেদনা হইলে শিস্‌ আকন্দের পাতার রস সেই স্থানে মর্দ্দন করিলে হঠাৎ নিবৃত্তি হয়।

১২। আমাশয়ের ঔষধ।

আমাশয় কিম্বা রক্ত আমাশয় হইলে পেঁয়াজের রস শাঁতলাইয়া অথবা কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া পান করিলে শীঘ্র আরোগ্য হয়। ব্যক্তি বিবেচনায় পানের মাত্রা সাব্যস্ত করা আবশ্যক।

১৩। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তের ঔষধ।

মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে লাগিলে একখানা শামুক অথবা ঐরূপ অন্য কোন

পাত্রে কিঞ্চিৎ শীতল জল লইয়া গরুতে নাদিবামাত্র তাহা হইতে কিঞ্চিৎ গোবর লইয়া স্থূলভাবে পাত্রস্থজলের মধ্যে কিঞ্চিৎকাল রাখিলে শজা রঙ্গের কল্‌তানি যে বাহির হইবেক, ঐ কল্‌তানি রোগীকে ২।১ বার পান করাই-লেই রক্তউঠা বন্ধ হইয়া আশু প্রতীকার বোধ হইবেক।

১৪। শিরঃপীড়ার ঔষধ।

পদ্মফুল, রক্ত নাইলফুল, মুচুকুন্দফুল, রক্তচন্দন, আমলকী, এই কয়েক দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্রে শীতল জল দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলেই উপকার বোধ হইবেক।

১৫। মহা পৌষ্টিক ক্বাথ।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ.. মরিচ, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, জাঙ্গি-হরীতকী, জ্যেষ্ঠমধু, বেতাড়ক, ভূমি কুষ্মাণ্ড, শোনাইল, দারুচিনি, মোটা-এলাইচ, লবঙ্গ, অনন্তমূল, শালসা, কাবাবচিনি, রৈউচিনি, জায়ফল, জৈত্রী,।

উল্লিখিত একুশপ্রকার দ্রব্য সমভাগে দুইতোলা পরিমাণ গ্রহণ পূর্ব্বক বত্রিশতোলা জলে পূর্ব্ব দিবস রাত্রে কিঞ্চিৎ ছেঁচিয়া ভিজাইয়া রাখিয়া তৎপর দিবস মৃদু মৃদু জ্বালের দ্বারা চতুর্থাবশেষ অর্থাৎ আটতোলা রাখিয়া ক্বাথ নামাইতে হইবেক ও কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিতে ঐ ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

এই ঔষধ ব্যবহার কালীন ঘৃতপক্ক দ্রব্য এবং মাংস প্রভৃতি বলকর পথ্য সেবন বিধি।

এই প্রকার দুই সপ্তাহকাল কি প্রয়োজন মত অতিরিক্ত কাল ঔষধি সেবন করিলে রোগমুক্ত কৃশ ব্যক্তি অথবা স্বাভাবিক কৃশব্যক্তিও হৃষ্টপুষ্ট এবং বলিষ্ঠ হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। ক্রমশঃ—

শ্রীরামনিরঞ্জন রায়চৌধুরী।

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

(সম্পাদকীয়)।

প্রমেহ বা ধাতের পীড়া।

(৩) সপূয় ধাতুনিঃস্রাব ও কাপড়ে দাগলাগার অবস্থায়।

এই রোগে অগ্রে রোগীর প্রস্রাবকালীন জ্বালা যন্ত্রণা এবং টন্‌টনানি প্রভৃতি উপসর্গের শান্তি করিয়া রোগী অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলে পরে সপূয় ধাতুনিঃস্রাব ও কাপড়ে দাগলাগা প্রভৃতি আসলরোগের শান্তির জন্ম যত্ন করিতে হইবেক। কেমন করিয়া কি কি উপায়ে জ্বালা যন্ত্রণাদির শীঘ্রশীঘ্র নিবৃত্তি হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, অতঃপর ধাতুনিঃস্রাবাদির নিবৃত্তির উপায় বলা যাইতেছে। কিন্তু প্রমেহরোগে এই সপূয় ধাতুনিঃস্রবের নিবৃত্তি সম্বন্ধে সকলেরই জানা আবশ্যক যে, যদি কোন তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধাদির দ্বারা সহসা এই ধাতুনিঃস্রাব বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রায়ই রোগীর গ্রন্থিস্থানে (গাঁইটে) ভয়ঙ্কর ফুলা ও বেদনাযুক্ত বাত রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। এবং এইরূপে এই শ্রেণীস্থ বাতরোগ একবার শরীরে প্রবেশ করিলে আর তাহা শরীর হইতে সম্যক্‌রূপেদূর করা অসাধ্য হইয়া উঠে। অতএব প্রমেহরোগে ধাতুনিঃস্রাব যাহাতে অতি শীঘ্র বন্ধ না হয়, তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। পক্ষান্তরে এই ধাতুনিঃস্রাব যদি দীর্ঘকাল স্থায়ী ভাবে থাকিয়া যায়, তাহা হইলে ইহা দ্বারা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, মানসিক শক্তির হানি, ধাতুদৌর্ব্বল্য, এমনকি, ধ্বজভঙ্গ পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে। এই ধাতুনিঃস্রাব নিবৃত্তির জন্ম নিম্নলিখিত ঔষধগুলি বিশেষ উপকার দর্শে।

(ক) চারা শিমুলবৃক্ষের মূলের রস প্রাতে ২ তোলা ও বৈকালে ১ তোলা লইয়া অত্যল্প চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অত্যল্প দিনেই ধাতুনিঃস্রাবের নিবৃত্তি হইতে পারে; অথচ বন্ধ করার নিমিত্ত কোন অনিষ্টও ঘটে না। অনেকে এই শিমুলমূল ইক্ষুর ন্যায় টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া তাহা ইক্ষুচিনির সহিত খাইয়া থাকেন এবং ইহা দ্বারাও অচিরাৎ ধাতপড়ার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া শিমূলের আঠাও এই অব-

স্থায় বিশেষ উপকারী। ফলতঃ ধাতক্ষরণ অবস্থাতে শিমূলবৃক্ষকে মহৌষধের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে।

(খ) একতোলা মসিনা একছটাক আন্দাজ জলে ৪।৫ ঘণ্টা ভিজাইয়া সেই জল প্রত্যহ পান করিলেও এই রোগের ক্রমশঃ শান্তি হইতে পারে।

(গ) যজ্ঞডুমুরের রস কিংবা যজ্ঞডুমুরের বীচীর গুঁড়া এবং যজ্ঞডুমুরের তরকারী কিংবা ঘৃতে যজ্ঞডুমুর ভাজিয়া তাহা ভক্ষণ করিলেও ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শে।

(ঘ) প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে /০ এক আনা আন্দাজ কাবাব্‌-চিনির গুঁড়া অল্প মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলেও তাহার দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে।

(ঙ) প্রত্যহ প্রাতে শতমূলীর (অন্যনাম শতাবরী) রস কাঁচা দুগ্ধের সহিত অথবা গুলঞ্চের পাল (সার) মধুর সহিত কিংবা কাঁচাদুধে ও জল একত্রে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে এ অবস্থাতে বিশেষ উপকার দর্শে। এতদ্ভিন্ন বঙ্গাষ্টক ও বৃহদ্বঙ্গেশ্বর রস প্রভৃতি বড়ৌঔষধগুলি অনুপান বিশেষের সহিত ব্যবহার করিলে তদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

উপরে যে সমস্ত ঔষধের বিষয় বলা হইল, প্রায় ধাতুনিঃস্রাবের নূতন অবস্থায় এগুলি দ্বারা বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতঃপর এই রোগের পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ যখন আর সপূয় ধাতুনিস্রাব এবং কাপড়ে দাগলাগা কিংবা জ্বালা যন্ত্রণা ইত্যাদি কিছুই না থাকে, কেবল দাস্তের সময় বেগ দিলে দুই এক ফোঁটা ধাতু নির্গত হয়, অথবা পুং অঙ্গ টিপিলে অত্যল্প ধাতু নির্গত হয়, সেই সেই অবস্থাতে যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আগামী বারে বলিব।

ক্রমশঃ—

আয়ুর্ব্বেদীয়-অস্ত্রচিকিৎসা।

উপক্রমণিকা।

অস্ত্রচিকিৎসা অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশে প্রচলিত আছে। আর্য্যগণের মস্তিষ্ক হইতেই প্রথমে এই অদ্ভুত বিদ্যার উৎপত্তি হয়। এবিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, কারণ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের সমস্ত গ্রন্থ মধ্যে সুশ্রুত এবং

চরক অতি প্রাচীন গ্রন্থ। এই দুইখানি গ্রন্থ মধ্যে সুশ্রুত-সংহিতাতে কেবল অস্ত্রচিকিৎসাই বর্ণিত হইয়াছে। এই সংহিতা যে কত পুরাতন তাহাও একপ্রকার নির্ণীত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন, এখন আমরা যে সুশ্রুত-সংহিতা দেখিতে পাই, তাহা ২৪০০ চব্বিশ শত বৎসরের পুরাতন। পুরাতন সুশ্রুত-সংহিতা অন্যূন ১০০০০ দশ সহস্র বৎসর হইল রচিত হইয়াছে। এখন আমরা যে সংহিতা পাঠ করি, তাহা সেই পুরাতন সুশ্রুত-সংহিতা প্রতিসংস্কৃত হইয়া নাগার্জ্জুন মুনি কর্তৃক ২৪০০ বৎসর হইল প্রচারিত হইয়াছে। যদি পুরাতন সুশ্রুতের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও বর্ত্তমান সুশ্রুত কম দিনের নহে। সুতরাং অস্ত্রচিকিৎসা যে অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই।

অস্ত্রচিকিৎসা যে আর্য্যগণের অতি আদরের বস্তু ছিল, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ সুশ্রুতে পাওয়া যায়। এহেন সুশ্রুত-সংহিতা থাকিতেও আমরা শুনিতে পাই, অদূরদর্শী, নিন্দাপ্রিয় দেশহিতৈষী যুবকগণ বলিয়া থাকেন, "আয়ুর্ব্বেদে অস্ত্রচিকিৎসা নাই। এখন যেরূপ ডাক্তারেরা অস্ত্রচিকিৎসা করেন, বৈদ্যগণ কোনকালেই তদ্রূপ করিতেন না। এদেশে নাপিতের উপরই এই কার্য্যের ভার ছিল।" যাহারা সুশ্রুত-সংহিতা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা একথা শুনিয়া দুঃখ রাখিবার স্থান পাইবেন না। যে আর্য্যগণের মুখ হইতে—

"ছেদ্যাদিষনভিজ্ঞো যঃ স্নেহাদিষু চ কর্ম্মসু।
স নিহন্তি জনং লোভাৎ কুবৈদ্যো নৃপদোষতঃ॥

অর্থাৎ যে বৈদ্য, শস্ত্রক্রিয়া এবং স্নেহাদি ক্রিয়া না জানেন, তিনি লোভ বশতঃ রোগীকে বিনাশ করেন। রাজার অমনোযোগ বশতই এরূপ কুবৈদ্য হইয়া থাকে।—এই কথা নিঃসৃত হইয়াছে, তাঁহারা অস্ত্রচিকিৎসা জানিতেন না একথা শুনিলে বড়ই দুঃখ হয়।

যে পুস্তকে অস্ত্রচিকিৎসার বিষয় বর্ণিত থাকে, আর্য্যগণ তাহাকে শল্য-তন্ত্র বলেন। একস্থলে ধন্বন্তরি সুশ্রুতাদি মুনিগণকে কহিতেছেন :—

"অষ্টাস্বপি আয়ুর্ব্বেদ তন্ত্রেম্বেতদেবাধিক-
মভিমতমাশুক্রিয়া করণাদ্যন্ত্রশাস্ত্র ক্ষারাগ্নি—
প্রণিধানাৎ সর্ব্বতন্ত্রসামান্যাচ্চ।"

অর্থাৎ শীঘ্র ফললাভ হয় বলিয়া এবং যন্ত্র শস্ত্র ক্ষার ও অগ্নি প্রস্তুত করিবার উপদেশ আছে বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ তন্ত্রের অষ্টখণ্ড মধ্যে এই (শল্য) খণ্ডই অত্যন্ত আদরণীয়।

এই সমস্ত কথা গুলি পাঠ করিয়া এবং মূল সংহিতাখানি পাঠ করিয়া কে বলিবে, আর্য্যগণের সময়ে অস্ত্রচিকিৎসার আদর ছিল না আর্য্যগণের মস্তিষ্কোদ্ভব অস্ত্রচিকিৎসাই আধুনিক ইউরোপীয় অস্ত্রচিকিৎসার মূলভিত্তি ইহা প্রমাণিত ও স্বীকৃত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্রকে আদর্শ করিয়া ইউরোপীয়গণ তাহার এতদূর উন্নতি করিয়াছে এবং করিতেছে, আর আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছি এবং বলিতেছি আমাদেরকিছুই নাই। কি লজ্জার কথা! যাহাতে আমাদের দেশীয় অস্ত্রচিকিৎসার উন্নতি হয়,তাহার চেষ্টা করা কি উচিত নয়? কিন্তু হায়! বড়ই দুঃখের বিষয় যে আজ পর্য্যন্তও কেহ এবিষয়ে হস্তার্পণ করেন নাই; বরং যাহাতে লোপ পায়,তাহারই চেষ্টা করিতেছেন। দেশীয় বিদ্বান্ ভ্রাতাদের কর্ত্তব্য যাহাতে আর্য্যকীর্ত্তি সমূহ ঠিক থাকে এবং আরও উন্নতির পক্ষে অগ্রসর হয় তাহার চেষ্টা করা। কিন্তু কেহ কি তাহা করিবেন ? যাহা হউক, বৃথা কথায় আর আবশ্যক নাই। এক্ষণে আমরা যথাসাধ্য মূল বিষয় বর্ণনে প্রবৃত্ত হইব।

চিকিৎসাবিদ্যা মধ্যে অস্ত্রচিকিৎসাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। কেবল পুস্তক পড়িয়া অস্ত্রচিকিৎসার কিছুই শিক্ষা করা যায় না। রীতিমত অভ্যাস করা আবশ্যক। ব্যাধির প্রকৃতি, কারণ, নির্ণয়, বিস্তৃতি ইত্যাদি এবং কি উপায়ে তাহা আরোগ্য হইতে পারে, এই সমস্ত বিষয় পুস্তক পাঠে জানা যায়। কিন্তু সেই উপায় কার্য্যকারী করিতে হইলে কেবল পুস্তকস্থ বিদ্যায় হয় না, তাহা অভ্যাস করা আবশ্যক। চিকিৎসককে এই দুইটীই শিক্ষা করিতে হয়। যিনি কেবল পুস্তক পাঠ করেন, কিন্তু অভ্যাস করেন না তাহার সমস্ত পরিশ্রমই বৃথা। ধন্বন্তরি বলিয়াছেন তাহার "খরস্য চন্দন ভারইব কেবলং পরিশ্রম করং ভবতি।" অর্থাৎ গর্দ্দভের চন্দনভার বহনের ন্যায় কেবল পরিশ্রমই সার হয়।

রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রোগ পাঠ করা, লক্ষণ সমস্ত শিক্ষা করা এবং একপ্রকারের দুই ব্যাধিতে তুলনা দ্বারা প্রভেদ করা উচিত। কোন্

রোগে শরীরে কি পরিবর্ত্তন হয় তাহা মৃত শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখা উচিত। শিক্ষার্থীকে জীবিত এবং মৃত উভয় শরীরই পাঠ করিতে হয়, নতুবা যথার্থ শিক্ষা হয় না। রোগীর শরীরে রোগ পাঠ করিলে যত সহজে যত গভীর জ্ঞান জন্মে, তত আর কিছুতেই হয় না।

শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত চিকিৎসকে প্রভেদ কি? যিনি শিক্ষিত, তিনি কোন একটী রোগ দেখিলেই তাহার আদ্যন্ত বুঝিতে পারিবেন। আর যে অশিক্ষিত সে কেবল বাহ্যিক লক্ষণই কতক কতক বুঝিতে পারিবে কিন্তু আভ্যন্তরিক লক্ষণের কণামাত্রও বুঝিতে পারিবে না। কেবল বাহ্যিক লক্ষণ দেখিয়া চিকিৎসা হয় না। সুতরাং অশিক্ষিত চিকিৎসক বা ছাত্রের কর্ত্তব্য যে রোগীর শরীর দেখিয়া তাহার রোগ পাঠ করা। অনেকে বলেন অমুক চিকিৎসক রোগী দেখিয়া কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়াই তাহার রোগের বিবরণ বলিতে পারেন। যিনি অশিক্ষিত তিনি মনে করেন তাঁহার কোন দৈবি ক্ষমতা আছে, সেই জন্যই এরূপ করিতে পারেন। কিন্তু বুঝিয়া দেখেন না যে উক্ত কবিরাজ কেবল পুস্তক পাঠ করিয়াই বিদ্যা উপার্জ্জন করেন নাই। রোগীর শরীরে রোগ পাঠ করিয়াছেন, সেই জন্যই রোগীর শরীর ও চেহারা দেখিলেই বলিতে পারেন তোমার অমুক রোগ হইয়াছে।

কোন রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে অগ্রে রোগ নির্ণয় করা আবশ্যক। রোগ নির্ণয় করিতে না পারিলে চিকিৎসা করা বৃথা। কারণ রোগের উপযুক্ত ঔষধ দেওয়া যায় না। রোগ নির্ণয় করা যত কঠিন, চিকিৎসা করা তত কঠিন নহে। সুতরাং রোগ নির্ণয় করিবার ক্ষমতা চিকিৎসকের থাকা বিশেষ আবশ্যক।

কেবল বাহ্যিক লক্ষণ দেখিয়া রোগ নির্ণয় করিতে অনেক সময় চিকিৎসককে ভ্রমে পতিত হইতে হয়। সুতরাং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক সমস্ত লক্ষণ জ্ঞাত হইয়া অন্যান্য কোন রোগের সহিত যদি ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই সেই রোগের লক্ষণের সহিত তুলনা করিয়া রোগ নির্ণয় করা উচিত। এইরূপ করিয়া যিনি রোগ নির্ণয় করিতে পারেন তিনিই যথার্থ সুচিকিৎসক।

মনে করুন একটী রোগী আসিয়া বলিল আমার পেটব্যথা করিতেছে। চিকিৎসক তৎক্ষণাৎ একটী বেদনা-নিবারক ঔষধ দিলেন, কি কারণে

হইল, কিরূপ বেদনা ইত্যাদিকিছুরই অনুসন্ধান করিলেন না, সুতরাং রোগী ভাল না হওয়াই সম্ভব। অথবা একটা গুরুতর ব্যাধি মনে করিয়া তদ্রূপ ঔষধ দিলেন, সুতরাং তাহাতে রোগীর ফল হইবে কেন? এস্থলে কারণানুসন্ধান করিলেই রোগের নির্ণয় হয়। যদি তিনি ঐ রোগীকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "তোমার কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় কি না?" তবে হয়ত সে বলিত, "হয় না।" সুতরাং মূলব্যাধি নির্ণয় হইল, চিকিৎসক তাহাকে কোষ্ঠ পরিষ্কারের ঔষধ দিলেন। কএকবার দাস্ত হইয়া তাহার রোগ ভাল হইয়া গেল। এস্থলে কাহাকে রোগ বলিব, বেদনাকে না কোষ্ঠবদ্ধকে? যদি বেদনাকে রোগ বল তবে তুমি ঠকিলে, তোমার হস্তে রোগ ভাল হইবে না। আর যদি বল কোষ্ঠবদ্ধই রোগ এবং বেদনা উহার একটী লক্ষণ, তবেই তোমার জয় হইল, তোমার হস্তে রোগী আরোগ্য হইল। সুতরাং রোগনির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করা যে অত্যাবশ্যক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। চিকিৎসা অপেক্ষা রোগনির্ণয় অতি কঠিন এবং বুদ্ধি ও বিবেচনা-সাপেক্ষ।

এইজন্য প্রথমতঃ কিরূপে রোগনির্ণয় করিতে হয় তাহাই বলিব। চিকিৎসক চিকিৎসার্থে আহূত হইয়া প্রথমতঃ রোগীর আপাদমস্তক সূক্ষ্ম-ভাবে নিরীক্ষণ করিবেন। তারপর রোগীকে জিজ্ঞাসা করিবেন শরীরের কোন্ স্থানে ব্যাধি হইয়াছে? ব্যাধি কোন সময়ে হইয়াছে? অথবা সে কোন্ সময় বুঝিতে পারিয়াছে? যদি রোগী কোন আঘাত পাইয়া থাকে, তবে সে আঘাত কিরূপে পাইয়াছিল, কিরূপ অস্ত্র দ্বারা আঘাত পাইয়াছে। কত জোরে আঘাত লাগিয়াছে। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাইলে চিকিৎসক রোগনির্ণয় সম্বন্ধে সাহায্য পাইবেন। যদি কেহ বলেন কোন স্থানে আঘাত লাগিলে চিকিৎসক তাহা দেখিতেই পান, তবে আর কত জোরে আঘাত লাগিয়াছে, কিরূপ অস্ত্র ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক কি? আঘাত প্রাপ্ত স্থান দেখিলেই বুঝা যায়। যে, চিকিৎসা-বিদ্যা না জানে, তাহার মুখেই একথা সাজে, কিন্তু সুচিকিৎসক কখনই এ প্রশ্ন করিবেন না। কারণ ঐ দুটী প্রশ্নই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান এবং রোগনির্ণয় সম্বন্ধে চিকিৎসককে অনেক সাহায্য করে। মনে করুন এক ব্যক্তির মস্তকে আঘাত লাগিয়াছে। এই আঘাত যদি জোরে লাগিয়া থাকে, তবে মস্তকের অস্থি ভগ্ন হইবার

অধিক সম্ভাবনা। যদি যথার্থই অস্থি ভগ্ন হয়, তবেই রোগ কত ভয়ানক তাহা চিকিৎসকেই জানেন। কিন্তু যদি আঘাত তত জোরে না লাগিয়া থাকে, তবে অস্থি ভগ্ন হয় নাই, সুতরাং রোগও তত ভয়ানক হয় নাই, ইহা জানিতে পারা যায়। অস্থি না ভাঙ্গিলে আঘাতিত স্থানই প্রকৃত ব্যাধির স্থান। কিন্তু যদি অস্থি ভগ্ন হয়, তাহা হইলে আঘাতিত স্থান কারণস্বরূপ হইয়া এরূপ ভয়ানক ব্যাধির সৃষ্টি করে যে, তাহাতেই রোগীর জীবনলীলার শেষ হয়। মস্তিষ্কে আঘাত লাগিলে মস্তিষ্ক বিকম্পন, প্রদাহ, পূয়োৎপত্তি ইত্যাদি হইয়া রোগীর মৃত্যু হয়। যদি কেহ বলেন যে, যদি এরূপ আশঙ্কাই থাকে, তবে মস্তকের অস্থি ভাঙ্গুক আর নাই ভাঙ্গুক, অন্য বিপদ না হইতে পারে, প্রথম হইতেই তাহার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু সুচিকিৎসকের মুখে একথা শোভা পায় না। কারণ একটী সামান্য আঘাতকে আমি বিশেষরূপে না দেখিয়া ভয়ানক আঘাত কল্পনা করিয়া রোগীর বৃথা কতকগুলি ব্যয় করাইলাম, তিলকে তাল করিয়া ফেলিলাম, তবে আমি সুচিকিৎসক কিরূপে হইলাম?

যথার্থ ব্যাধি নির্ণয় করিয়া তাহারই চিকিৎসা করা সুচিকিৎসকের কার্য্য। সুতরাং যিনি সুচিকিৎসক তিনি সমস্ত কথাই বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহা হইলেই যথার্থ রোগনির্ণয় করিতে পারিবেন। কেবল ব্যাধির স্থানের অনুসন্ধান করিয়াই ক্ষান্ত হওয়া চিকিৎসকের কর্ত্তব্য নহে। অন্যান্য স্থানও অনুসন্ধান করা এবং অন্যান্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া জ্ঞাত হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শরীরের যন্ত্র গুলির কার্য্য নিয়ম মত হইতেছে কি না, অন্য কোন স্থানে কোন ব্যাধি আছে কি না, এসমস্ত বিশেষ করিয়া দেখা উচিত। কারণ একস্থানে কারণ-স্বরূপ একটী ব্যাধি হইয়া অন্যস্থানে আর একটী গুরুতর ব্যাধির সৃষ্টি করে। যেমন মস্তকের উপরে আঘাত লাগিলে তাহার তল প্রদেশের অস্থি ভগ্ন হইয়া রোগীর মৃত্যু হয়। আঘাতিত স্থানের অস্থি উত্তম আছে কিন্তু ঠিক তাহার নিম্নে মস্তকের তলদেশের অস্থি ভগ্ন হইয়াছে, এরূপ প্রায়ই হয়। আবার উদরের নিম্নভাগে স্ফোটক হইয়া নালীতে পরিণত হওতঃ বরাবর নীচে গিয়া গুল্‌ফসন্ধির নিম্নে ফুলিয়াছে, কিন্তু চিকিৎসক দেখিলেন, গুল্‌ফসন্ধির নিম্নে একখানি ক্ষত হইয়া পুয়স্রাব হইতেছে। তিনি সামান্য ক্ষত মনে করিয়া মলমের পটীর ব্যবস্থা করিলেন, ইহাতে কি রোগ আরোগ্য হয়?

এই সমস্ত কারণে কেবল ব্যাধির স্থান দেখিয়া নিশ্চিন্ত না হইয়া শরীরের অন্যান্য স্থানও পরীক্ষা করা উচিত। কোন রোগী দেখিতে গিয়া কেবল সেই রোগের বিবরণ শুনিয়া ক্ষান্ত না হইয়া পূর্ব্ব বিবরণ যত সংগ্রহ করা যায় ততই রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। কারণ মনে করুন আপনি একটী রোগী দেখিতে গিয়া দেখিলেন তাহার নাক হইতে রক্ত পড়িতেছে। আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কতদিন হইতে পড়িতেছে, কি পরিমাণ পড়িতেছে, মাথার কামড়াদি কিছু আছে কি না ইত্যাদি। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাইয়াই আপনি সন্তুষ্ট হইলেন এবং সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন, রোগ ভাল করিতে পারিলেন না। কিন্তু যদি রোগীর পূর্ব্ব বিবরণ জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহা হইলে হয়ত জানিতে পারিতেন যে, রোগীর পূর্ব্বে অর্শ ছিল, তাহা হইতে রক্ত পড়িত, দুই তিন মাস হইল হঠাৎ রক্তপড়া বন্ধ হইয়াছে। এখন আপনার চিকিৎসার উপায় সহজ হইয়া দাঁড়াইল। আপনি সহজেই রোগ আরোগ্য করিতে পারিলেন। তখন আপনি বুঝিলেন যে, পূর্ব্বে এই কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া কত মূর্খতা করিয়াছেন। এইজন্য যে রোগই হউক না কেন, রোগীর পূর্ব্ব বিবরণ জ্ঞাত হওয়া উচিত। তাহা না হইলে যথার্থ রোগ নির্ণয় হয় না। রোগী যদি অজ্ঞান থাকে, তবে তাহার যথার্থ বিবরণ পাওয়া কঠিন, তবে যাহারা সর্ব্বদা নিকটে থাকে, কি তাহার বিষয় জানে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া কতক কতক জানা যায়। কিন্তু যদি রাস্তার উপর একটী লোক অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে, আর তাহার মাথায় এক আঘাতের চিহ্ন থাকে এবং তাহার নিকট কেহই না থাকে, এরূপ অবস্থায় তাহার বিবরণ পাইবার কোন উপায় নাই। এরূপ রোগীর চিকিৎসা করিতে হইলে কি করিতে হইবে?

এরূপ রোগী দেখিয়া চিকিৎসকের মনে উদয় হয় যে, আঘাত মূর্চ্ছা হইয়া পড়িবার পূর্ব্বে হইয়াছে, কি পরে হইয়াছে। কেহ তাহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়াছে তাহাতেই আঘাত লাগিয়াছে, কি আঘাত লাগাতেই মূর্চ্ছিত হইয়াছে। কোন রোগে মূর্চ্ছিত হইয়াছে কি অন্য কোন কারণে মূর্চ্ছিত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা জন্য অতি সাবধানে বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু এই প্রকারে রোগীর রোগ নির্ণয় করা বড় কঠিন। এরূপ স্থলে কোন কঠিন রোগ হইয়াছে বিবেচনা করিয়া কোন লক্ষণ

প্রকাশ হয় কি না তাহা দেখিবার চেষ্টা করা উচিত। যদি আর কোন লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ হয়, যদ্দারা রোগ নির্ণয় হয়, তাহা হইলে চিকিৎসা কতক সহজ হইল, নতুবা রোগ নির্ণয় করিতে না পারিলে আর কি চিকিৎসা হইবে ?

ফল কথা চিকিৎসকের কর্ত্তব্য, যথার্থ রোগ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করা। রোগ নির্ণয় হইলে চিকিৎসার পথও সরল হয়।

কোন সন্ধি পীড়ায়, অস্থিভঙ্গ বা বিচ্যুতিতে, কি কোন অস্থির বিবৃদ্ধিতে সুস্থ অঙ্গের সহিত পীড়িত অঙ্গের তুলনা করিয়া দেখিলে শিক্ষিত চক্ষু তাহা হইতে ব্যাধির অনেক তত্ত্ব বাহির করিতে পারে এবং তদনুসারে ব্যাধি নির্ণয় করিতে পারে। দেখিয়া যে সমস্ত সন্দেহ মনে উপস্থিত হয়, তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত হস্ত দ্বারা পরীক্ষা করা এবং অন্যান্য লক্ষণ দেখা ও রোগীর বর্ণিত বিবরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক। এইরূপে চক্ষু হস্ত এবং কর্ণ দ্বারা যে যে বিষয় পাওয়া যায়, তাহাই পরস্পর মিলিত করিয়া তুলনা করতঃ ব্যাধির নির্ণয় করিতে হয়।

অস্ত্র চিকিৎসা এবং কায় চিকিৎসাতে চক্ষু এবং হস্তকে অত্যন্ত শিক্ষিত করা আবশ্যক, কিন্তু এরূপ করা বড় সহজ নহে, অথবা ইচ্ছা করিলেও হয় না। চক্ষু এবং হস্তকে শিক্ষা দিতে না পারিলে কেবল পুস্তক পাঠে কিছুই হয় না। কোন আঘাতিত স্থান অথবা অস্থিভঙ্গ হওয়া বশতঃ কোন বিকৃতঅঙ্গ নির্ণয় করা কঠিন নহে, কিন্তু কোন্‌স্থানে ক্ষত হইলে কি হয়, কোন্ স্থানের অস্থি ভঙ্গ হইলে কি হয়, কত প্রকারের অনিষ্ট হয় এবং হইতে পারে ইত্যাদি বিষয় জানা বড়ই কঠিন ও কিঞ্চিৎ বুদ্ধিশক্তির আবশ্যক। শরীরের কোন একটী স্ফীত স্থান অশিক্ষিতচক্ষুতেও শীঘ্রই বলিতে পারা যায়, কিন্তু কি কারণে স্ফীত হইয়াছে, ইহার মধ্যে কি আছে, কোন্ প্রকারের স্ফীততা ইত্যাদি নির্ণয় করিতে শিক্ষিত চক্ষুর আবশ্যক। আয়ুর্ব্বেদের নাড়ী পরীক্ষার ন্যায় নাড়ী পরীক্ষা কোনমতেই নাই। এই নাড়ী পরীক্ষা শিক্ষা করা বড় সহজ নহে। এবং এতদ্বিষয়ে পরিপকতা লাভ করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। পুস্তক পাঠ করিয়া ইহার কিছুই বোধগম্য হয় না। কিন্তু শিক্ষিত হস্তের এমনই গুণ যে, তাঁহারা অনায়াসে নাড়ী পরীক্ষা করিয়া অবস্থা বলিয়া থাকেন। চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থীদিগের অতি যত্ন সহকারে

রোগীর নিকট বসিয়া, তাহার প্রত্যেক লক্ষণ দেখিয়া রোগ শিক্ষা করা উচিত। এইরূপে চক্ষু এবং হস্তকে শিক্ষিত করিলে তিনি সুচিকিৎসক হইতে পারেন। রোগ নির্ণয় করা তাঁহার পক্ষে সহজ হয়, এবং চিকিৎসা করিয়াও তিনি যশলাভ করিতে পারেন।

এবার বাজে কথায় সময় কাটাইলাম, আগামী বারে অস্ত্রাদির বিবরণ বিশেষরূপে বিবৃত করিব ইচ্ছা রহিল।

পোষ্ট তালন্দ, রাজসাহী।
ডাক্তার শ্রীবিনোদবিহারী রায় কবিরাজ
ভি, এল্, এম্, এস্।

পুরাতন প্লীহারোগীর চিকিৎসা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিগত জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় ও শ্রাবণের চিকিৎসা সম্মিলনীতে প্লীহারোগীর চিকিৎসায় ফ্লুয়োরাইড্ অব্এমনিয়ম্ নামক ঔষধ ছাপার ভুলক্রমে ক্লুয়োরাইড্ অব্এমনিয়ম্ হইয়াছে। ঔষধটী ফ্লুওরাইড্ অব্এমনিয়ম্, ক্লুওরাইড্ অব্এমনিয়ম্ নহে। পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠকালে সংশোধন করিয়া লইবেন।

প্লীহারোগীর পথ্যের বিষয়ে খুব ধরাধর করা উচিত তাহা পূর্ব্বেই একরূপ বলিয়াছি। সুধু লঘু আহারে অনেক দিন পর্য্যন্ত রাখিয়া বড় বড় প্লীহাগ্রস্ত রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি অনেক স্থলে ভাত বন্ধ করিয়া সুধু রুটী পথ্য দিলে উপকার হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, রুটী ভাত অপেক্ষা গুরুপাক অতএব দুধ ভাত প্রভৃতি লঘু আহার ত্যাগ করিয়া রুটী খাইতে দিলে উপকার হয় কেন? ইহার উত্তরে এই মাত্র বলা যায় যে, ভাত কিছু রসযুক্ত খাদ্য। আকণ্ঠ ভাত খাইলেই শরীর কেমন একরূপ ম্যাজ্ম্যাজ্ করিতে থাকে। ভাতআহারের পরেই শরীর যেন অবসন্ন হইয়া পড়ে। সকলেই বোধ হয় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, ভাত আহারের পর শরীর অল্প অবসন্ন হয়। ইহাতে অনুমান হয় যে, ভাতে কিছু মাদ-

কতা শক্তি আছে। তদ্ব্যতীত ইহাতে রসও বিলক্ষণ আছে। উগ্র শীতল গুণ-বিশিষ্ট। সুধু জল খাইলে সে জলটী শরীর হইতে তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া যায়, কিন্তু চালজল সিদ্ধ করিলে চালের ভিতর যে জল প্রবেশ করে, তাহা শরীরের ভিতর ভাতের সহিত পরিপাক হইয়া শরীরে অধিকক্ষণ থাকিয়া যায়। সহজ কথায় ভাতের রসটী শরীরে বসিয়া যায়। এই কথার স্বাপক্ষে আরও দেখা যায় যে, মেহেরপীড়া হইলে সুধু শীতল জল পানে তাদৃশ ফল দর্শে না। মিহিদানা, বাবুইতুলসীবীজ, গঁদ প্রভৃতি ভিজাইয়া খাইলে শীঘ্রই প্রস্রাবের জ্বালা কম পড়ে। এই সকল স্থলে যে বাবুইতুলসী বা গঁদের মেহ নিবারক কোন ক্ষমতা আছে তাহা নহে, তবে উহাদের দ্বারা গৃহীত জল শরীরে পরিপাক হইয়া মূত্রযন্ত্রের উপর স্থায়ী ক্রিয়া দর্শায়। এই কারণবশতঃই সুধু জল অপেক্ষা মিশ্রির সরবত বেশী স্নিগ্ধ গুনশালী। ভাতে শরীরের রসের ভাগ বৃদ্ধি করে, এজন্য পুরাতন রোগী ভাত পথ্য করিলে তাহার শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। জ্বর প্রভৃতিতে ভাত অপেক্ষা রুটী কম অপকারক, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, যে সকল লোকের অমাবস্যা অথবা পূর্ণিমা তিথিতে শরীর ভার বোধ হয় এবং হাত পা কামড়ায় তাঁহারা ঐ ঐ তিথিতে রাত্রে ভাতের পরিবর্ত্তে রুটী খাইলে ভাল থাকেন। আমরা একটী প্লীহা রোগীর বিষয় জানি। একটী কোন ধনাঢ্য লোকের দ্বাদশবর্ষীয় পুত্রসন্তান প্লীহাজ্বরে আক্রান্ত হয়। রোগীর পিতার অবস্থা ভাল এজন্য রোগ আরম্ভ হইতেই ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসিত হয়। কিন্তু রোগীর আহারের দিকে রোগীর অভিভাবক অথবা ডাক্তার মহাশয়ের তত মনোযোগ ছিল না। ধনী লোকের সন্তান এজন্য আহার বিষয়ে বেশ একটু অত্যাচার হইত। রোগী সন্দেশ প্রভৃতি খাইত। পরে ২।৩ জন ডাক্তার পরামর্শ করিয়া চিকিৎসা করেন তাঁহাতেও কোন ফল দর্শে না। বলা বাহুল্য ঐ ডাক্তারদিগের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। পরে কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসা করান হয় তাহাতেও কোন ফল ফলিল না। অব-শেষে কলিকাতার একজন নামজাদা ডাক্তার ছেলেটীর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। তিনি রোগীর জ্বর বন্ধ করিলেন কিন্তু প্লীহা না কমিয়া উত্তরোত্তর পেটটী বড় হইতে লাগিল। এই সময় রোগী পাঁওরুটী, দুধ ভাত প্রভৃতি পেট ভরিয়া খাইত। তদপর ক্রমে আবার জ্বর দেখা

দিল। তারপর নাকি একজন সামান্য ডাক্তারের হাতে রোগীটী সম্পূর্ণরূপে আরাম হইয়া গেল। তিনি কেবল পথ্যের ধরকাট করিয়া রোগীকে আরাম করিয়া তুলেন। তিনি রোগীকে প্রথমতঃ ২ তোলা মুগের ডাল ও দুই তোলা খই মাত্র দৈনিক আহার দিতেন। এইরূপ পথ্যে ২০ দিন রাখিলে দেখা গেল রোগীর প্লীহা অনেক ছোট হইয়াছে এবং টিপিতেও খুব নরম হইয়াছে। কিন্তু রোগীর শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা শীর্ণ দেখা গেল কিন্তু শরীরের বল হ্রাস হইল না। তখন রোগী ক্ষুধার যাতনায় অস্থির হইতে লাগিল। তারপর রোগীর পথ্য ঐরূপই থাকিল তবে পরিমাণে আরও কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া দেওয়া গেল। তারপর মাসখানেক পরেই রোগীর প্লীহা একবারে অন্তর্হিত হইল। পরে ভাত প্রভৃতি পথ্য অল্প অল্প ধরাইয়া দেওয়া গেল। এই ঘটনার পর হইতে আমিও দুই চারিটী কঠিন প্লীহাগ্রস্ত রোগী কেবল এক পথ্যের গুণে আরাম করিয়া তুলিয়াছি। আবার অনেক স্থলে ইহার ঠিক্ বিপরীত প্রথাও অবলম্বন করিতে হয়, অর্থাৎ রোগীর পথ্য মাঝে মাঝে বদলাইয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, সর্ব্বদা একই রকমের পথ্যের উপর রোগীকে রাখিলে রোগীর ঘোর অরুচি উপস্থিত হইয়া রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কোন কোন প্লীহাগ্রস্ত জীর্ণরোগীর কোন এক বিশেষ জিনিষের উপর অত্যন্ত স্পৃহা হয়, এইরূপ স্থলে সেই পথ্য অল্প পরিমাণ দেওয়ায় উপকার ভিন্ন অপকারের সম্ভাবনা নাই। এরূপ স্থলে এই বুঝিতে হইবে যে, রোগীর যে দ্রব্যের উপর স্পৃহা বেশী, তাহার শরীরে সেই বস্তুর অন্তর্গত কোন ধাতুর অভাব হইয়াছে এবং সেই অভাব পূরণ জন্য সে ব্যাগ্রভাবে ডাকিয়া বলিতেছে "আমাকে সেই বস্তু দেও।" শরীরে কোন্ ধাতুর অভাব হইয়াছে, তাহা চিকিৎসক সকল সময়ে পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারেন না। কারণ শরীরের রাসায়নিক উপাদান ও তাহার সংযোগ বিয়োগ প্রভৃতি অদ্যাবধিও চিকিৎসকগণ সম্যকরূপে জানিতে পারেন নাই। জীবগণের দেহে যে বস্তুর অভাব হয়, জীবগণের শরীরে সেই বস্তুর ক্ষুধা আসিয়া উপস্থিত হয়। অত্যন্ত জ্বরের সময় রোগী যখন তৃষ্ণায় ছট ফট করে, তখন রোগীকে জল খাইতে না দেওয়া যেমন অন্যায় করে, সেইরূপ জীর্ণরোগীর কোন বস্তুবিশেষে বিলক্ষণ স্পৃহা দেখা গেলে তাহাকে সেই

বস্তু সাবধানতা অবলম্বন পূর্ব্বক কিয়ৎ পরিমাণে না দেওয়া নিতান্ত অন্যায়। তবে এ সকল স্থলে চিকিৎসকের পক্ষে বিশেষ বিবেচনা আবশ্যক। যেমন জ্বররোগীকে অতিরিক্ত পরিমাণে শীতল জল খাইতে দিলে নিউমোনিয়া প্রভৃতি হইবার সম্ভাবনা, সেইরূপ জীর্ণরোগীকে অতিরিক্ত পরিমাণে কোন পথ্য দিলে রোগী তাহা পরিপাক করিতে না পারিয়া আরও পীড়াগ্রস্ত হইয়া থাকে। এস্থলে একটী রোগীর কথা বলি। কলিকাতা সহরের কোন এক ভদ্র লোকের পুত্রের প্লীহাজ্বর হয়। কলিকাতায় ডাক্তারের অভাব নাই, এজন্য ডাক্তারের উপর ডাক্তার আসিয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। পথ্য সেই এক দুধ আর সাগু। তার পর দিন কতক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা হইল। পথ্য সেই এক রকমের। পরে রোগের ত কিছুই হইল না বরঞ্চ রোগীর একবারে পথ্যের উপর অরুচি হইল। তখন রোগী চিকিৎসা ও ঔষধের জ্বালায় অস্থির হইয়া কলিকাতা হইতে মফস্বলে তাহার মাতুলালয়ে পলায়ন করিল। সেখানে সমস্ত চিকিৎসা ছাড়িয়া দিয়া যে সকল জিনি-ষের উপর তাহার অত্যন্ত লোভ হইল, সেই সকল দ্রব্য আপন ইচ্ছামত কিছু কিছু ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল এবং প্লীহাও আরাম হইয়া গেল।

ক্রমশঃ—

প্লীহারোগ।

বৈদ্যমতে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৭৫ পৃষ্ঠার পর)

সম্ভবতঃ কি কি কারণে কেমন করিয়া প্লীহারোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রমতে গতবারে কিঞ্চিৎ বলিয়াছি। এখন কথা এই যে, পূর্ব্বকাল অপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে প্লীহাদিরোগের যেরূপ বাড়াবাড়ি দেখা যাইতেছে, তাহাতে বর্ত্তমান প্লীহাসঙ্কুল দেশীয় লোকের পক্ষে সে কালের লিখিত সেই অতি সংক্ষিপ্ত কারণকে যেন কারণ বলিয়াই গণ্য করা যাইতে পারে না। বাস্তবিকও উপর উপর বিবেচনা করিতে গেলে কথাটা ঠিক্ এইরূপভাবেই বিবেচিত হয় বটে, কিন্তু একটু গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টতই উপলব্ধি হইবে যে, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, আয়ু-

র্ব্বেদশাস্ত্র এককথায় বহুকাল পূর্ব্বে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে প্লীহা-রোগের তাহাই আসলকারণ। কেন যে আসলকারণ, তাহা প্রতিপন্ন করাই উপস্থিত প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"বিদাহ্যভিষ্যন্দরতস্য জন্তোঃ"

অর্থাৎ যে সমস্ত ব্যক্তি প্রতিনিয়ত বিদাহী ও অভিষ্যন্দ অর্থাৎ ক্লেদজনক দ্রব্যাদি ভক্ষণ করে, তাহাদিগেরই প্লীহারোগ জন্মিয়া থাকে। আবার সচরাচর মেয়েলী কথায় বলে যে, "জ্বরে কুপথ্য করিলে প্লীহা, পাত, ও অগ্রমাংসের বৃদ্ধি হইয়া থাকে," বাস্তবিকও হিন্দু আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র বহুকাল পূর্ব্বে এক কথায় প্লীহারোগের কারণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আজ্ বিভিন্ন দেশীয় চিকিৎসকেরা নানা রকম বিজ্ঞানের দোহাই দিয়াও তদপেক্ষা নূতন কিছুই বলিতে পারেন নাই।

নূতন জ্বরেই হউক আর পুরাতন জ্বরেই হউক, আহারাদির অত্যাচার জন্যই যে, প্লীহা যকৃতাদি রোগের আজ্কাল এত অধিক বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। মনে করুন সে কালে লোকের জ্বর হইলে কেবল যে অষ্টাহ উপবাস দিয়া জ্বরের শান্তি করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন, তাহা নহে; জ্বর নিবৃত্তির পরে যাহাতে আর জ্বরের পুনরাগমন অথবা প্লীহাদির বৃদ্ধি না হয়, আবশ্যক মত ততদিন তাঁহারা কুপথ্যের নাম মাত্রও করিতেন না। কাজেই এখনকার মত প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি রোগ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হইত না। কিন্তু সে কাল আর নাই; বিদেশীয় রাজত্বে সকলবিষয়েই যথেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে দেশের লোকে নূতন জ্বর সারার পর একটু ঠাণ্ডা জলপান করিতেও আপনাকে সঙ্কুচিত বোধ করিতেন, আজ্ সেই দেশের লোকেই কিনা প্রবল জ্বরের উপর মাংস দুগ্ধাদি পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন। সে যাহা হউক, প্লীহা রোগের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে একমাত্র আহারাদির অত্যাচারই যে প্রধান কারণ, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্লীহারোগের চিকিৎসা।

প্লীহারোগের চিকিৎসা সাধারণতঃ দুইপ্রকার, এক আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ যথা—গোমূত্রাদি ভক্ষণ, আর দ্বিতীয়তঃ বাহ্যিক প্রলেপ ও রক্ত-

মোক্ষণাদি। ইহার মধ্যে কোন কোন স্থলে একমাত্র আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগেই প্লীহার নিবৃত্তি হইতে পারে, আবার স্থলবিশেষে বা আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উভয়বিধ ঔষধেরই আবশ্যক করে। কিন্তু কেবল বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগে যে প্লীহারোগের নির্দ্দোষ শান্তি হইতে পারে, সে সম্ভাবনা অতি অল্প।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে প্লীহারোগের শান্তির জন্য যে, অসংখ্য ঔষধের উল্লেখ আছে, এবং সেই সমস্ত ঔষধ দ্বারা যে, অনেক সময়ে অনেক রোগীই নির্দ্দোষরূপে আরোগ্যলাভ করিয়া থাকে, সে বিষয়ে বোধ হয় কোন কথা না বলিলেই চলে। আর ইহাও বোধ হয় সকলেই জানেন যে, পেটের মধ্যে একটা বড় গোচের প্লীহা থাকিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটু জ্বর না থাকিয়াই যায় না। কেহ কেহ বলেন যে, এই জ্বরটুকুই প্লীহা রোগীর পক্ষে কালস্বরূপ। কেননা যতদিন পর্য্যন্ত এই জ্বরের নিবৃত্তি করা না যায়, ততদিন কোন মতেই প্লীহার শান্তি হইতে পারে না। আবার কাহারও বা বিশ্বাস যে, প্রকাণ্ড প্লীহাতে জ্বর না থাকিতেও পারে, অথবা অল্প জ্বর থাকিলেও তাহাতে প্লীহার শান্তির পক্ষে কোনরূপ বাধা আসিতে পারে না। পক্ষান্তরে কাহারও বা মত এই যে, প্লীহার সহিত অল্প জ্বর থাকে থাকুক, ঔষধ দ্বারা জ্বর ও প্লীহা উভয়েরই একদা শান্তির চেষ্টা করা উচিত। প্লীহারোগের চিকিৎসাসম্বন্ধে এইরূপে নানা মুনির নানা মত প্রচলিত আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এত মতদ্বৈধেও কিন্তু আসল কার্য্যের অর্থাৎ যিনি যে মতলবেই কেন চিকিৎসা না করুন, প্রায় কেহই কোন মতলবে বিফল হন না। কেবল প্লীহারোগ বলিয়া নহে, সকল রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধেই এইরূপ ভয়ানক মতদ্বৈধ্য দেখিতে পাওয়া যায়। যে নূতন জ্বরের পক্ষে শীতল জলপান একজনের মতে বিষবৎ বলিয়া ধারণা, অন্য চিকিৎসক সেই খানে রোগীকে শীতল জলে অবগাহন পর্য্যন্ত করাইয়া তাহার জ্বরের নিবৃত্তি করাইয়া থাকেন। তাই বলিতেছিলাম যে, প্লীহারোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে কাহার কোন্ লক্ষ্য যে প্রকৃতপক্ষে খাঁটী লক্ষ্য, তাহা বোঝাই দুষ্কর। যাহা হউক, প্লীহা রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে আমাদের যতদূর জ্ঞান আছে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মতে তাহাই ক্রমশঃ বলিতে চেষ্টা করিব। ক্রমশঃ—

আয়ুর্ব্বেদে শোথ রোগ।

শোথ চিকিৎসায় বাঁধাঔষধ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৭১ পৃষ্ঠার পর)

অজীর্ণ বা গ্রহণীদোষ অথবা তজ্জনিত শোথাদিরোগে আয়ুর্ব্বেদীয় বাঁধা-ঔষধ যে কতদূর গুণশালী, তাহা গত দুইবারে শতমুখে বলিয়াছি। কিন্তু এত বলিয়াছি, তবুও যেন এখনও বলিয়া সম্যক্ তৃপ্তি বোধ হয় নাই। বস্তুতঃ আন্তরিক ভাল বাসার চক্ষু এই রকমই বটে; হয়ত আমি যাঁহার গুণরাশির বিষয় চিন্তা করিয়া আজ্ মুক্তকণ্ঠে এতদূর গাহিতেছি, অন্যে হয়ত বাঁধা ঔষধের একটী কোন বিশিষ্ট দোষ বিবেচনা করিয়া আমাকে নিতান্তই পাগলের ন্যায় অসার বিবেচনা করিয়া আসিতেছেন, তা আসুন, তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখ বা লজ্জা নাই, ফলকথা যাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসি, প্রতি নিয়ত যাহার অসংখ্য গুণরাশির পরিচয় পদে পদে পাইয়া আসিতেছি, প্রাণ-খুলিয়া তাহার গুণরাশি সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত করিব, তাহাতে আর দুঃখ বা লজ্জার বিষয় কি আছে? কোনরূপ দুঃখ বা লজ্জা নাই বলিয়াই আজ্ আবার বাঁধাঔষধের একটী অত্যাশ্চর্য্য গুণকাহিনী পাঠকবর্গের কর্ণগোচর করিতেছি। বিবরণটী এই—

কলিকাতা হাটখোলাস্থ গোষ্ঠবিহারীদাস নামক একটী পাটের ওজন সরকার, বয়স আন্দাজ ৫৬ বৎসরের কম নহে। লোকটী হাতে বহরে খুব্ লম্বা চৌড়া এবং চেহারা কিছু পূর্ব্বে ঠিক্ ভীমের ন্যায় ছিল। এবং বয়সের আধিক্য জন্য শরীরের বলাদির কোন ব্যত্যয় ঘটে নাই। বরঞ্চ ত্রিশ-বৎসরের একজন যুবার অপেক্ষাও তাহাকে অধিক্ বলশালী বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু এহেন অসুরবৎ প্রভূত বলশালী ব্যক্তিকেও রোগের জ্বালায় শীঘ্রই অবসন্ন হইতে হইল। প্রায় ২ বৎসর অতীত হইল, প্রথমে তাহার সামান্য অম্ল ও অজীর্ণ রকমের অসুখ জন্মে, কিন্তু শারীরিক বলগর্ব্বে সে তাহাতে কিছুমাত্র মনঃসংযোগ করে নাই। ক্রমে সেই অবস্থা হইতে তাহার অর্শরোগের সূত্রপাত হয়, অর্থাৎ প্রত্যহ মলদ্বার দিয়া প্রচুর রক্তপাত হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক দুর্ব্বলতা, রক্তহীনতা ও অরুচি প্রভৃতি নানাবিধ অসুখ আসিয়া তাহার ক্রমশঃ গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে লাগিল,

শুধু তাহা নহে, দেখিতে দেখিতে এহেন বলশালী পুরুষ অস্থি-চর্ম্মসার হইয়া একবারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তখনও পর্য্যন্ত রোগী কোনরূপ বিশেষ ভীত বা চিন্তিত হয় নাই, তবে আত্মীয় স্বজনের নিতান্ত অনুরোধে মধ্যে মধ্যে দুই একটা টোট্‌কা ঔষধ ব্যবহার করিত, এবং আবশ্যকীয় বিষয়কার্য্য করিতেও সাধ্যমত পরাঙ্মুখ হইত না। লোকে তাহাকে রীতিমত ঔষধ খাইতে বলিলে সে নাকি উত্তর করিত যে, "মরি মরিব সেও ভাল, তথাপি কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া বিশেষতঃ আহারাদির ধরাকাট করিয়া ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিব না।" বাস্তবিক ও সে যত দিন চলাফেরা করিতে পারিত, ততদিন কাহারও কথা শুনে নাই। এবং আহারাদিরও কিছুমাত্র নিয়ম প্রতিপালন করে নাই, কিন্তু এরূপ আর কত দিন চলে? ঠিক্ এই অবস্থা হইতে ক্রমশঃ তাহার ভয়ানক অরুচি, সঙ্গে মৃদুজ্বর, তৎপরে হাতে ও পায়ে অল্প অল্প ফুলা, অল্প অল্প কাসি এবং অবশেষে শয্যাগত হইয়া একবারে উত্থানশক্তি রহিত হইয়া গেল। অতঃপর অনন্যোপায় হইয়া সে একখানি পাল্কী করিয়া স্থানীয় একজন উপযুক্ত কবিরাজের নিকট চিকিৎসার জন্য গমন করে। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য-ক্রমে কবিরাজ মহাশয় তাহাকে দেখিয়া আদেশ করেন যে, তোমাকে দুধভাত খাইয়া স্বর্ণপর্পটী প্রভৃতি মহামূল্যবান্ বাঁধা ঔষধ সেবন করিতে হইবেক, এবং তাহাতে তোমার নিতান্তপক্ষে একশত টাকার কম খরচে হইবে না। একে সর্ব্বপ্রকার আহারবিসর্জ্জন, তাহাতে আবার রোক একশত টাকা খরচ, এই উভয় সুমধুর শব্দে রোগীর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত পড়িল, রোগী তৎক্ষণাৎ একবারে জীবনের প্রতি হতাশ হইয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিল, বাটীতে আসিয়া সেই অবস্থার উপরেই যথেচ্ছ আহারাদি করিতে লাগিল এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই যেন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

রোগীর এইরূপ আসন্নমৃত্যু ভাবিয়া তাহার মণিব অথচ আমারও পরম-বন্ধু কলিকাতা শুকীয়াষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক-দিন প্রাতে আমার নিকট আসিয়া রোগীর আদ্যোপান্ত অবস্থাগুলি বর্ণন করিলেন।

বলা বাহুল্য যে, ইতিপূর্ব্বে আমি আর কখনও উক্ত রোগীকে দেখি নাই অথবা তাহার বিষয় কখনও কিছু শুনি নাই। আমি প্রথমে রোগীর বয়-

সের পরিমাণ বিশেষতঃ রোগের বর্ত্তমান অবস্থার কথা শুনিয়া একটু পরিহাসচ্ছলে রোগীর প্রভুকে কহিলাম যে, আর চিকিৎসা কেন, এখন কাষ্ঠ ও কলসীকাচার সংগ্রহ করিতে বলুন, কিন্তু আমার একথাতেও তাঁহার মন টলিল না, অবশেষে তাঁহার নিতান্ত পীড়াপীড়িতে আমি সেই দিনেই রোগীকে দেখিতে যাইলাম। রোগীর গৃহে যাইয়া রোগীকে যে অবস্থায় দেখিয়াছিলাম, তাহা মনে করিলে এখনও শরীর শিহরিয়া উঠে। বিশেষতঃ আমার সঙ্গীবাবু যিনি আমাকে অত আগ্রহের সহিত লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি দূর হইতে রোগীর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়াই একটু ত্রস্তভাবে আমাকে কহিলেন; "কবিরাজ মহাশয়, আপনার রোগী গিয়া আপনি দেখুন, আমি এই বাহিরে একটু বসি।" আমি রোগীর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিয়াছিলাম, যাহা শুনিয়াছিলাম. সে পরিচয় পাঠকবর্গকে কিছু বলি—পূর্ব্ববর্ণিত লম্বাচৌড়ার কথা বোধ হয় পাঠক এখনও ভুলেন নাই, অধিক কি বলিব, সেই ভীমাকৃতিতে এখন প্রভূত জলসঞ্চয় হইয়া রোগীর দেহ বিশেষতঃ উদর এত স্ফীত হইয়াছে যে, সহসা দেখিলে যেন বোধ হয় ঠিক্ একটা মরা হাতী পড়িয়া রহিয়াছে, কেবল তাহা নহে, এতদ্ভিন্ন দণ্ডে দণ্ডে তাহার আম ও রক্তমিশ্রিত দাস্ত হইতেছে, অর্শের দরুণ মলদ্বারে ভয়ানক যন্ত্রণা আছে। জলপিপাসা ও ভয়ানক চীৎকার ইত্যাদি নানাবিধ লক্ষণ দেখিয়া রোগীর প্রকৃত রোগ যে কি, তাহাই সহসা স্থির করিতে পারিলাম না। অবশেষে অনেক কষ্টে শেষটা ইহা বুঝিলাম যে, উপসর্গ যাহা যাহাই থাকুক্ না কেন, কিন্তু মূলরোগ অবশ্যই গ্রহণী ও অজীর্ণ ধরিতে হইবেক। এই বিবেচনা করিয়া সেই দিন হইতেই রোগীকে পূর্ব্বলিখিত বাঁধাঔষধ অর্থাৎ কেবল রসপর্প্পটী (রসপর্প্পটীর প্রস্তুত সম্বন্ধে সম্মিলনীর সুযোগ্য লেখক শীতলবাবু ইতিপূর্ব্বে সম্মিলনীতেই লিখিয়াছেন) কিছু অধিক মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে দুইবার সেবন করিতে দিলাম এবং গরম জল ইত্যাদি সমস্তই একবারে বন্ধ রাখিয়া কেবল নির্জ্জলা খাঁটী দুগ্ধ পিপাসার সময় পান করিতে দিতে বলিয়া আসিলাম। তাহার পরদিবস আবার রোগীকে দেখিবার কথা ছিল বটে কিন্তু কার্য্যগতিকে যাইতে না পারিয়া সে দিন অবস্থা শুনিয়া ঐ ঔষধই খাওয়াইতে বলিয়া দিলাম। তৃতীয়দিবস প্রাতে রোগীর লোক আসিয়া আমাকে যে সংবাদ দিয়াছিল, তাহা যখন আমার নিজেরই

বিশ্বাস হয় নাই, তখন আর তাহা বলি কিরূপে? বস্তুতঃ তৃতীয়দিবসের প্রাতে রোগীর লোক আসিয়া কহিল যে মহাশয়, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে. রোগীর অনেক উপকার দর্শিয়াছে, আমি কহিলাম, কি উপকার বাপু; তখন সে কহিল,—"গতকল্য দুই প্রহর হইতে রোগী পিপাসার টানে কেবল দুগ্ধপান করিতে আরম্ভ করে, এমন কি রাত্রি ১১ টা পর্য্যন্ত প্রায় দুই সের খাঁটী দুগ্ধ পান করে, তাহার পর রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় হইতে তাহার এত অধিক ভেদ হইতে আরম্ভ হয় যে, ১০।১২ বার ভয়ানক ভেদের পর শেষরাত্রে রোগী নিতান্তই অবসন্ন হইয়া পড়ে, এমন কি সেই অবসন্নতা দেখিয়া আমরা মৃত্যুর আশঙ্কা পর্য্যন্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে, রাত্রি ৪ দণ্ড থাকিতে রোগী কহিতে লাগিল যে, আমি বেশ আছি, আমার শরীর যেন খুব্ হালকা বোধ হইতেছে। ইতি-মধ্যে রাত্রি প্রভাত হইলে আমরা বেশ বুঝিলাম যে, রোগীর বাহ্যিক ফুলার যেন অনেকটা কম পড়িয়াছে অতএব আপনি একবার চলুন।" যাহার মৃত্যু সংবাদ শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত আছি, সে রোগীর সম্বন্ধে এরূপ সংবাদ চিকিৎসকের পক্ষে যে একটু আহ্লাদের কথা, তাহা বোধ হয় আর অধিক বলিতে হইবে না। যাহা হউক, আমি তৎক্ষণাৎই রোগীর গৃহে উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম বাস্তবিকই রোগী পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু সুস্থ আছে, বিশেষতঃ তাহার শোথের প্রায় চারি আনা আন্দাজ কম পড়িয়াছে। যদিও রোগীর এই সামান্য উপকার দেখিয়া মনে বিশেষ কিছু ভরসা না জন্মুক, কিন্তু ঈশ্বরকৃপায় সপ্তাহমধ্যেই রোগীর আরোগ্য সম্বন্ধে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এইরূপে দুই সপ্তাহ ঔষধ সেবনে যখন রোগীর আর কিছুমাত্র শোথ দৃষ্ট হইল না, তখন পপ্‌টী ঔষধের মাত্রা ক্রমশঃ কম দিতে থাকিলাম। এইরূপে প্রায় এক মাসের মধ্যেই রোগীর সমস্ত রোগ দূর হইয়া সে সম্পূর্ণ নীরোগ হইয়া উঠিল। তবে অবশ্য তাহার শরীরের দুর্ব্বলতা আরাম হইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইতে প্রায় দেড় মাসের অধিক কাল লাগিয়া ছিল।

যদিও বাঁধাঔষধ ব্যবহার করাইয়া অনেক কবিরাজ মহাশয়ই শত শত রোগীকে আসন্নমৃত্যু হইতে নিয়ত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, এবং আমা-দের হস্তেও বহুল রোগী এইরূপে আরোগ্যলাভ করিতেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে

পূর্ব্ববর্ণিত রোগীর বাঁধাঔষধ সেবনে যেরূপ অত্যাশ্চর্য্যরূপে জীবন রক্ষা হইয়াছে, ঐরূপ ভাবে আরোগ্য হইতে আমি আর কখনও দেখি নাই। দেখি নাই বলিয়াই আজ একটী রোগীর উপলক্ষে পাঠকগণকে এত বিরক্ত করিলাম। কিন্তু গভীর দুঃখ ও আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই বাঁধাঔষধটী এরূপ অসাধারণ গুণশালী হইলেও দেশের কোন কোন লোক এরূপ নির্ব্বোধ যে, গৃহস্থিত এই অমূল্য রত্ন চিনিতে না পারিয়া ভিখারীর ন্যায় দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে ধনীসম্প্রদায়ের মধ্যেই আবার এ শ্রেণীর ভিক্ষুক অধিক কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায়ই শোনা যায়, অমুক মহারাজা গুরুতর অজীর্ণ বা গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হইয়া রোগ আরোগ্যজন্য ভারত ছাড়িয়া একদমে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে হাওা দ্বীপে গমন করিয়াছেন, অমুক জমীদার এইরূপ পীড়াগ্রস্ত হইয়া একবারে তিন হাজার মাইল দূরে হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য গমন করিয়াছেন। অবশ্য প্রচুর ঐশ্বর্য্যবলে বলীয়ান্ প্রভুরা তাঁহাদের ধনরাশি সমুদ্রে নিঃক্ষেপ করুন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু আমরা বলি যে, যে কার্য্য অত্যল্প অর্থব্যয়ে স্বদেশীয় স্বজাতীয় কালাআদমীর পরামর্শদ্বারা অতি সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে, সেই কার্য্য সম্পন্নের জন্য ভিন্ন দেশীয় শাদা আদমীর পরামর্শে বহুল অর্থের শ্রাদ্ধ করিয়া সাত সমুদ্র তের নদীপার অথবা পাহাড় জঙ্গল ভেদ করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া লাভ কি আছে? হয়ত অনেকে বলিবেন যে, লাভ আছে বৈ কি, লাভ না থাকিলে কি আর সাধ করিয়া লোকে এত কষ্ট সহ্য করিতে যায়? দেশীয় দ্বারা দেশে থাকিয়া কার্য্য সম্পন্ন হইলে কি আর বিভিন্ন দেশে গিয়া বিদেশীয়ের আশ্রয় লইয়া থাকে? কিন্তু আমরা খুব্ সাহসপূর্ব্বকই বলিতে পারি যে, হাঁ এ শ্রেণীর রোগ দেশে বসিয়া দেশীয় কবিরাজ দ্বারাই উত্তমরূপে আরোগ্য হইতে পারে। কোনমতেই ভিন্নদেশে গিয়া ভিন্ন দেশীয়ের আশ্রয় লইতে হয় না। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? যে সব্ লোকের কথা আমরা তুলিতেছি, ধান্যগাছের আকারপ্রকারাদি জ্ঞান সম্বন্ধেই হয়ত তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তা রসপর্প্পটী বা স্বর্ণপর্প্পটী প্রভৃতি বাঁধাঔষধের গুণাগুণ জ্ঞান ত বহুদূরের কথা। বস্তুতঃ এইরূপ স্বাবলম্বন-শূন্য ও অন্তঃসারহীন কোন কোন লোকের দ্বারা দেশের যে কতদূর গভীর অনিষ্ট

সাধন হইতেছে, তাহা চিন্তা করিলে চক্ষে জল না আসিয়া যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কেবল অর্থবলে এই সমস্ত লোকই কি না আবার সমাজের নেতা, শাসনকর্ত্তা ও হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতারূপে অনায়াসে বিরাজ করিয়া আসিতেছেন। হিন্দুসমাজ! এক তুচ্ছ বাঁধাঔষধের কথা তুলিয়া ইহাপেক্ষা তোমাকে আর অধিক কি বলিব? বস্তুতঃ ধর্ম্মবন্ধনের শিথিলতা জন্য আমাদের দেশের যে সকল বন্ধনই ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছে এবং এই শিথিলতা জন্য কালে কালে ভারতবাসীর যে কি শোচনীয় বিষময় পরিণাম ঘটিবে, তাহা সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানই বলিতে পারেন। আর কিছু পারেন-দুই একজন যাঁহারা অন্নবস্ত্রহীন অথচ প্রচুরজ্ঞানশালী এবং আড়ম্বর বর্জ্জিত লোক। কেননা তাঁহাদের সময় ত আর অযথা ধনগর্ব্বে ব্যয়িত হয় না, সুতরাং শাকান্নের সংস্থানের পর যাহা একটু অবসর ঘটে, তাঁহারা সেই অবসরেই জগতের হিতাহিত বিষয়ে কতকটা বিচার করিতে পারেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ক্রমশঃ—

চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ।

(হিষ্টিরিয়া)

এমন কোন রোগ নাই, হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত স্ত্রীলোকে নকল করিতে না পারে, এমন কোন উপসর্গ নাই যাহা তাহারা না আনিতে পারে। সাধে কি আর লোকে এই রোগকে "ভূতে পাওয়া" বলে? এই সকল স্থলে চিকিৎসক বিশেষ সাবধান না হইলে প্রকৃত রোগ নির্ণয়ে সমর্থ হইতে পারে না। ভ্রমে পতিত হইলে অনেকস্থলে মশা মারিতে কামান পাতা হইয়া থাকে। গত বৎসর মাঘ মাসে রাত্রি আন্দাজ দশটা-এগারটার সময় কোন একটী ভদ্র বংশীয় স্ত্রীলোকের চিকিৎসার্থ আহূত হই। এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, "মহাশয়" অমুকের স্ত্রী অহিফেণ খাইয়াছে, প্রাণ সংশয়, আপনি ঔষধাদি লইয়া শীঘ্র চলুন।" আমি ষ্টমাক্ পম্প ও ঔষধের বাক্স লইয়া তাড়াতাড়ি রোগিণীর বাটীতে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম একটী স্ত্রীলোক গৃহে শায়িত রহিয়াছে, এবং মাঝে মাঝে হাত পা খেঁচিতেছে, ডাকিলে সাড়া শব্দ নাই, অজ্ঞান=অচৈতন্য। নিশ্বাস ধীরে ধীরে বহিতেছে; ঠিক যেন অহিফেণ খাইয়াছে। রোগিণীর পূর্ব্ব ইতিহাস এইরূপ। রোগিণীর বয়ঃক্রম ২৫।২৬ বৎসর। নিঃসন্তান। মাঝে মাঝে হিষ্টিরিয়ার আক্ষেপ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু সে সব আক্রমণ আর এক ধরণের হইত। ঐ দিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় বাটীর কাহারও সহিত সামান্য বচসা হয়। সে জন্য সে তারিখে রোগিণী ভাল করিয়া আহারাদি করেন নাই। সমস্ত দিন বিষন্ন ভাবে থাকেন। তার পর বাটীর কোনও দাসীর সাহায্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অহিফেণ ক্রয় করিয়া আনেন (পরে এ কথা প্রকাশ হইল)। বৈকালে জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "আমার বাঁচার সুখ নাই, মরণই ভাল"। তার পর সন্ধ্যার সময় যে গৃহে শয়ন করেন, সেই গৃহে গিয়া অপর গৃহস্থিত একটী বিষাক্ত ঔষধপূর্ণ শিশি আনান। ঐ ঔষধ তাঁহার স্বামী কোন পীড়ার জন্য আনয়ন করিয়া তাঁহার নিজ গৃহে রাখিয়াছিলেন। শিশির

গায়ে ' বিষ " বলিয়া লেখা ছিল। সে ঔষধ কি আমি বুঝিতে পারি নাই। তার পর সেই শিশি আনিয়া ঔষধ মাটিতে ছড়াইয়া ফেলেন। আর অহি-ফেণের কতকটা লইয়া তৈল সংযোগে গুলিয়া খাওয়ার ভান করিয়া শয্যার নিকটেই ভূমিতে ছড়াইয়া ফেলেন, এবং অবশিষ্ট অহিফেণ সেই বিছানার উপরেই থাকে। রোগিণীর স্পষ্টই মতলব ছিল যে, অপরে যেন অতি সহজেই ঔষধ ও অহিফেণ খাওয়ার বিষয় বুঝিতে পারে। পরে অনুসন্ধানে আরও জানা গেল যে, রোগিণীর বালিশের নীচে একখানি বাঙ্গালা পুস্তক রহিয়াছে। তাহার কোন স্থানে কথাপ্রসঙ্গে অহিফেণ দ্বারা বিষাক্ত হইলে কি কি লক্ষণ হয়, তাহার কতকটা লেখা ছিল। রোগিণী সে দিন ঐ পুস্তক খানি পড়িয়াছিলেন, এবং বোধ হয় ঐ পুস্তক হইতেই অহিফেণ খাওয়ার লক্ষণ দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তার পর রোগিণী গৃহের দ্বার ভেজাইয়া দিয়া শয্যায় অচেতন হইয়া থাকেন। পরে বাটীর সকলে গৃহে গিয়া শিশি ও অহিফেণ দেখিয়া মনে সন্দেহ হওয়াতে আমাকে সংবাদ দেন। আমি গিয়া সমস্ত দেখিয়া ষ্টমাক-পম্প-প্রয়োগ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম; পরে মধ্যে মধ্যে রোগিণীর হিষ্টিরিয়া হইত শুনিয়া বিশেষ রূপে পরীক্ষায় মনোনিবেশ করিলাম। দেখিলাম, নাড়ী স্বাভাবিক বহিতেছে। চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম, কনীনিকা সঙ্কুচিত হয় নাই। কেবল নিশ্বাস ধীর ও গম্ভীর। হাত পা থাকিয়া থাকিয়া খেঁচিতেছে। তার পর এমোনিয়া শিশি লইয়া রোগিণীকে শুঁকাইলাম। প্রথমে একবার শুঁকিল; কিন্তু পুনর্ব্বার শুঁকাইতে যাওয়াতেই রোগিণী হাত দিয়া শিশি ঠেলিয়া দিতে লাগিল, এবং মুখ লুকাইতে লাগিল। তখন আমি জানিলাম, ইহার হিষ্টিরিয়া আক্ষেপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। পাঠকগণ জানিবেন, হিষ্টিরিয়ার মূর্চ্ছা হইলে রোগিণীর ভিতর ভিতর জ্ঞান থাকে, কি হইতেছে না হইতেছে তাহা রোগিণী বেশ টের পায়। প্রায়ই দেখা যায় হিষ্টরিয়ার ফিট হইলে রোগী সহজে এমনিয়া শুঁকিতে চায় না, অথচ ইহাকে নষ্টামিও বলা যায় না। কারণ নষ্টামি বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। তবে হিষ্টিরিয়া রোগী রোগের ধর্ম্মবশতঃ নষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া থাকে। তার পর জলের ছাট দেওয়াতে এবং জোর করিয়া ২। ১ বার এমোনিয়া প্রয়োগে রোগীর অল্প চেতনা

হইল, এবং ডাকিলে দুই একটা কথা কহিলেন। পরে ধরিয়া তুলিলে উঠিয়া বসিয়া যেন অতি শোকভরে তাঁহার স্বামীর গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তার পরক্ষণেই আবার অজ্ঞান হইলেন। পরে কিয়ৎকাল শুশ্রূষার পর আবার জ্ঞান হইল; তখন অল্প দুধ ও জল খাওয়াইয়া দেওয়া গেল এবং অল্প হিঙ্গু ও এরোমেটিক স্পিরিট অব্ এমনিয়া একত্রে মিশাইয়া খাওয়ান গেল। রোগিণী পুনর্ব্বার অচেতন হইলেন, কিন্তু দুই চারিবার ডাকিলে একবার উত্তর দিলেন। আমি রোগিণীর কোন ভয় নাই বলিয়া গৃহান্তরে শয়ন করিতে গেলাম। প্রাতে দেখিলাম রোগিণী অনেক সজ্ঞান হইয়াছেন; ডাকিলে কথা কহিতেছেন;—তবে বেশী নহে। আমি একবার উঠাইলাম, এবং কিঞ্চিৎ দুধ খাওয়াইলাম। এইরূপ অবস্থায় রাখিয়া আমি বাটী চলিয়া আসিলাম। পরে বেলা প্রায় নয়টা-দশটার সময় একজন আসিয়া খবর দিল যে, রোগিণী মৃত্যুপ্রায়, উঠানে নামাইলেই হয়। আপনার অপেক্ষায় ঘরে রাখা হইয়াছে। শীঘ্র চলুন। আমি পথে ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম। গিয়া দেখি এ কি! এ যে অদ্ভুত ব্যাপার! রোগিণী চিত হইয়া শুইয়া আছে। ডাকিলে সাড়াশব্দ নাই; হাত পা অবশ, যেখানে রাখ সেই খানেই থাকে; শ্বাস প্রায় রুদ্ধ; মাঝে মাঝে বন্ধ থাকিয়া একবার পড়িতেছে; পেট ফুলিয়া উচ্চ হইয়াছে; মুখ যেন ফ্যাকাশে হইয়াছে; শরীরও যেন ঠাণ্ডা; সমস্তই যেন মৃত্যু লক্ষণ; নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম সহজ অবস্থা। তখন আমার, আশঙ্কা গেল। ভাবিলাম এও হিষ্টিরিয়ার অন্যতর লক্ষণ বই আর কিছুই নহে। পাঠকগণ জানিবেন এইরূপ অবস্থাকে চিকিৎসকেরা ট্রান্স (Trance) কহেন। হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত রোগী ঠিক মৃত্যু ব্যক্তির ন্যায় ভান করিতে পারে। অনেক স্থলে এইরূপ রোগীকে মৃত্যুবোধে সৎকার পর্য্যন্ত করিতে লইয়া যাওয়া হয়। আর ভ্রম হইবেই বা না কেন? ঝাড়া অর্দ্ধ ঘণ্টা নিশ্বাস বন্ধ প্রায়; আবার তার উপর পেট ফুলা, এবং মুখশ্রী পাণ্ডুবর্ণ। এই অবস্থায় অনেক রোগীর নাড়ীও পাওয়া যায় না। তবে আমার রোগীর নাড়ী বেশ সহজ ছিল। আমি চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিলাম; নানারূপ তদ্বির করিলাম, তখন রোগিণী সহজ ভাবে শ্বাস ফেলিতে লাগিল এবং পেট ফাঁপাও ভাল হইয়া গেল। রোগিণী নিশ্বাস বন্ধ

করিয়া পেট ফুলাইয়াছিল.)। তার পর কিছুক্ষণ বাদেই রোগিণী উঠিয়া বসিল। এবং সেই অবকাশে কিছু দুধ ও জল খাওয়ান গেল। পরে সেই তারিখ হইতেই রোগ ভাল হইয়া গেল। এই স্থানে পাঠকেরা বলিতে পারেন, রোগিণী ইচ্ছা করিয়া এই সকল করিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগী রোগের ধর্ম্ম বশতঃ নষ্ট-বুদ্ধি সম্পন্ন হয়। তাহাদের ইচ্ছাশক্তি তাহারা মনের বশ করিয়া রাখিতে পারে না। মনে কোনও চিন্তা বা কল্পনার বেগ উদয় হইলে তাহারা দমন করিতে পারে না। সেই অদম্য মনোবেগ সম্বরণ না করিতে পারিয়া তাহারা কার্য্যতৎপর হয়; অথচ কেমন রোগের ধর্ম্ম আপনার কোন অনিষ্ট না হয় এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করে। হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগী ভূমিতে নিপতিত হইবার সময় এরূপ স্থানে এইরূপ ভাবে পতিত হয় যে, তাহাদের গাঁয়ে আঘাত মাত্র লাগে না। আবার বাটীর পরিজন ও আত্মীয় স্বজন নিকটে না থাকিলে আক্ষেপ উপস্থিত হয় না। হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত রোগী যেন জানিয়া শুনিয়া সতর্ক হইয়া সমস্ত কার্য্য করিতে থাকে। এই জন্যই লোকে হঠাৎ অনুমান করে যে, রোগীর সমস্তই নষ্টামি। এই জন্যই অনেকে রোগীকে নির্য্যাতন করিয়া থাকে। হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগী পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়, এবং আহারাভাব প্রভৃতি নানা শারীরিক কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। শুধু ইচ্ছা করিয়া কে এত নির্য্যাতন সহিতে সম্মত হয়? হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মনে যে কল্পনার উদয় হয়, তাহা তাহারা আন্দোলন করিতে করিতে মনের উদ্বেগ বশতঃ আসল রোগ আসিয়া আক্রমণ করে। তখন ইচ্ছা না থাকিলেও সেই কল্পনা বা চিন্তা কার্য্যে পরিণত করিতে বাধ্য হয়। বর্ণিত রোগিণী পুস্তক পড়িয়া অহিফেণ দ্বারা বিষাক্ত হইবার লক্ষণ জানিতে পারিয়াছিল। সে সময় অহিফেণ খাইয়া কিরূপ হয় সেইরূপ করিব, এইরূপ সক বা কল্পনা তাহার মনোমধ্যে উদয় হইয়াছিল, এই-রূপ অনুমান হয়। যে সকল রোগিণীর সচরাচর হিষ্টিরিয়ার ব্যাম হইয়া থাকে তাহাদের মনে সর্ব্বদা অদ্ভুত রকমের কল্পনার উদয় হইয়া থাকে। অথচ এই সকল রোগিণী কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার সময় নিজের কোন অনিষ্ট না হয়, অথচ বাটীর লোকে জানিতে পারে যে, আমি এইরূপ করিয়াছি এই প্রকার অভিনয় করিতে অগ্রসর হয়! এই সকল চিন্তা কার্য্যে পরিণত

করিতে যাইবার সময় মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়; সুতরাং প্রকৃত হিষ্টিরিয়ার আক্ষেপ উপস্থিত হইয়া রোগিণীকে বিলক্ষণ কষ্টে পাতিত করে। হিষ্টিরিয়া-গ্রস্ত রোগিণী প্রায়ই বাটীর পরিজনদিগের সহানুভূতিআকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে। হিষ্টিরিয়ার রোগিণীর নানান ভাব। নিম্নে আরও একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে;—কোনও ব্যক্তি পত্র লিখিলেন তাঁহার স্ত্রীর গলদেশে ভয়ঙ্কর বেদনা হইয়াছে। আজ ৫। ৬ দিন জলপর্য্যন্ত গিলিতে পারিতেছে না। আমি গিয়া দেখিলাম, রোগিণীর গলার উপর কোন ফুলা বা প্রদাহের চিহ্ন মাত্র নাই। গলার অভ্যন্তরে পরীক্ষা করিয়াও কোন কিছু বুঝিতে পারিলাম না, তবে পূর্ব্ব হইতেই আমি জানিতাম ঐ স্ত্রীলোকটির হিষ্টিরিয়ার ব্যাম আছে, এবং কখনও কখনও আক্ষেপ হইত। রোগিণীর স্বামীকে আদেশ করিলাম যে, এক চামচ জল খাওয়াইয়া দেখুন। তিনি অতি অল্প কাল মাত্র জল চামচে করিয়া গলায় ঢালিয়া দিলেন; কিন্তু রোগিণী গিলিতে পারিল না, সমস্ত জল পড়িয়া গেল। আপনার কোন্ স্থানে বেদনা? এই কথা জিজ্ঞাসা করায় রোগিণীর গলার উপর সিকি পরিমাণ স্থান দেখাইয়া দিল। সেই স্থানে অঙ্গুলি স্পর্শ মাত্র রোগিণী উঃ করিয়া চমকিয়া উঠিল। আমি সমস্তই বুঝিতে পারিলাম;এবং আমি যে রোগিণীর রোগ বুঝিয়াছি,তাহা জানাইবার জন্য বেলেডোনার প্রলেপ ব্যবস্থা করিলাম। এবং অতি সত্বরে রোগ সারিবে এইরূপ সাহস ও ভরসা দিলাম। সে দিনেই রোগিণী আহারাদি করিতে সমর্থ হইল। তারপর আমার কৌতূহল হইল, কিরূপে জল পর্য্যন্ত না খাইয়া রোগিণী ৫। ৬ দিন অতিবাহিত করিল; বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গেল, রোগিণী গোপনে কিছু কিছু আহার ও জল গ্রহণ করিত। এ স্থলে বেদনাও মিথ্যা, সকলই রোগের অনুকরণ মাত্র। কিন্তু রোগিণীকে প্রকৃত কথা বলিলে হয় ত রোগবৃদ্ধি হইত। এই সকল স্থলে চিকিৎসককেও মিথ্যার অভিনয় করিতে হইবে। তাঁহাকে দেখাইতে হইবে, তিনি যেন রোগীর দুঃখে দুঃখিত এবং তাহার রোগ আরাম করিতে সমর্থ। এই সকল স্থলে,কেবল মনের বিশ্বাসেই রোগ আরাম হয়। ধার্ম্মিকগণ উপদেশ দেন, কদাচ মিথ্যা কথা কহিও না অথবা মিথ্যা আচরণ করিও না। যাহা মিথ্যা তাহা মিথ্যা, যাহা সত্য তাহা চিরদিনই সত্য। [illegible] মিথ্যাও সত্য

হয়, সত্যও মিথ্যা হয়। তবে যা থাকে তাহাই থাকে, তাহার অন্যথা হয় না ইহাই প্রকৃত সত্য এবং তদ্বিপরীতই মিথ্যা। আমি বলিলাম এ স্থলে বৃক্ষ নাই, বাস্তবিক বৃক্ষ নাই। এ স্থলে বৃক্ষ না থাকাই সত্য। রোগী যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত, সকলে আশা ভরসা ছাড়িয়া দিয়াছে, আত্মীয়গণ শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অশ্রুজল ত্যাগ করিতেছে, চিকিৎসক সম্মুখে বসিয়া আছেন, রোগী কাতরস্বরে চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিতেছে, মহাশয়, আমি কি সত্য সত্যই বাঁচিব না?" এখন সত্যবাদী বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক কি উত্তর দিবেন? এমন কঠিনপ্রাণ কাহার আছে যে, রোগীকে মিথ্যা কথা বলিয়া আশ্বাসিত না করিবেন? কণ্ঠাগত প্রাণ পীড়িত বালক তাহার মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "মা আমি কি ভাল হইব না?' মা জানিতেছেন, আশা ভরসা মিথ্যা,—রোগ আরাম হইবার নহে। অথচ এমন পাষণহৃদয় মা কে আছেন, যিনি এ স্থলে মিথ্যা ও সত্যের গোলযোগ না বাধাইবেন? এই জন্যই দূরদর্শী হিন্দুশাস্ত্রকারগণ ব্যবস্থা দিয়াছেন, লোকহিতার্থ অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়, সে সকল স্থলে মিথ্যা আচরণে দোষ নাই। চিকিৎসকদিগকে লোকহিতার্থে নিয়োজিত হইয়া অনেক স্থলে মিথ্যা আচরণ করিতে বাধ্য হইতে হয়।

আজ কয় দিবস হইল, আর একটী স্ত্রীলোকের চিকিৎসার্থ আহূত হই। স্ত্রীলোকটীর পূর্ব্বে একবার হিষ্টিরিয়ার ব্যাম হইয়াছিল। কিন্তু এই ঘটনার পূর্ব্বে অনেক দিন পর্য্যন্ত আর ব্যাম হয় নাই। স্ত্রীলোকটী অল্পবয়স্কা, দুই সন্তানের জননী, স্বামী বর্ত্তমান, একটী শিশু তখনও স্তন খাইতেছে, শরীর সুস্থ—অন্য কোনও ব্যাম নাই। মনে বিশেষ কোন অসুখের কারণও নাই। তবে কেন উক্ত ব্যাধি হইল, বুঝা যায় না। তাহার পিতা মাতাও সুস্থ কোনরূপ বায়ু ব্যাধি দ্বারা কখনও আক্রান্ত হন নাই। এক দিন গিয়া দেখিলাম, স্ত্রীলোকটী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে, কেহ কিছু খাওয়াইতে পারিতেছে না ডাকিলে সাড়া শব্দ নাই। কিরূপ করিয়া হঠাৎ এরূপ অবস্থাপন্ন হইল, জিজ্ঞাসা করায় বাটীর মেয়েরা কহিল "বৌ মা খীড়কির দুয়ারের নিকট প্রাতঃকালে বাসন মাজিতেছিল। খিড়কির বাহিরে বাঁসবন। কোন কার্য্য ব্যপ[illegible]হিরে যায়, এবং তথা হইতে ভয় পাইয়া আসিয়া বলে যে,

কিসে যেন আসিয়া আমার গলার হার ছিঁড়িয়া লইয়া গেল এই বলিয়া আসিয়াই মূর্চ্ছা গিয়াছে। আর সাড়া শব্দ নাই" বাস্তবিক স্ত্রীলোকটীর গলায় অলঙ্কার ছিল; কিন্তু এক্ষণে গলা অলঙ্কার শূন্য। ইহাতে বাটীর মেয়েরা কাজেই অনুমান করিল যে, এ নিশ্চয়ই ভৌতিক ব্যাপার। আমি বাটীর মেয়েদের কহিলাম, যে স্থানে বাসন মাজিতেছিল, ঐ স্থান অনুসন্ধান করিলে হার পাওয়া যাইতে পারে। বাস্তবিক তাহার নিকটেই গলার অলঙ্কার ছিন্নাবস্থায় পাওয়া গেল। পাঠকগণ জানিবেন ইহাও হিষ্টিরিয়ার একটী অপূর্ব্ব অভিনয়। রোগিণী, বোধ হয়, নিজেই তাহার গলার হার খুলিয়া ঐ স্থানে রাখিয়াছিল, পরে অনুসন্ধান না পাওয়ায় ভূতে লইয়াছে এরূপ কল্পনা করিয়াছিল। যাই হউক, তৎপরে আমি রোগিণীর নাকের নিকট এমোনিয়া ধরিতেই মুখ লুকাইতে লাগিল। পরে কহিলাম, রাত্রি দুই প্রহরের পর রোগিণীর ভাল হইবার সম্ভাবনা! বাস্তবিক, রাত্রি দুই প্রহরের পর রোগীণী চেতনা পাইয়া আহার করিয়াছিল। তার পর কিয়দ্দিন বাদে একজন আসিয়া কহিল, সেই স্ত্রীলোকটী ভয়ঙ্কর হিক্কা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, প্রাণ যায় যায়। আমি গিয়া দেখিলাম জ্বর নাই, জ্বালা নাই, অন্য কোনও অসুখ নাই, অথচ ভয়ঙ্কর হিক্কা হইতেছে, এবং রোগীর সমস্ত শরীর হিক্কার জোরে ঝুঁকিতেছে রোগিণীর কথা কহিবার সামর্থ্য নাই কিন্তু বেশ অনুমান করিয়া দেখা গেল, আদত হিক্কায় যেমন পেট নড়ে এই হিক্কায় তেমন পেট নড়িতেছে না। এবং শব্দ যেন বুকের ভিতর হইতে না উঠিয়া শুধু গলা হইতেই উঠিতেছে। এই শব্দ যেন কিছু ভাসা ভাসা রকমের। এ ত আর সে প্রাণসংশয়কারী আদত হিক্কা নয়,—এ হচ্ছে হিষ্টিরিয়া। শুনিলাম, হিক্কা প্রায় ঝাড়া তিন ঘণ্টা সমান ভাবে হইতেছে;—তিলার্দ্ধ বিশ্রাম নাই। আমি একটা আক্ষেপনিবারক ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া আসিলাম। সেই ঔষধ বার কতক খাওয়ান মাত্র রোগ আরাম হইয়া গেল। আর এক দিন কোনও স্ত্রীলোকের স্বামী পত্র লিখিলেন, তাহার স্ত্রী চারি মাস অন্তঃসত্ত্বা, আজ হঠাৎ প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা হইতেছে। এও একটী পুরাতন হিষ্টিরিয়ার রোগী। আমি গিয়া গর্ভের কোন লক্ষণ বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া প্রসব বেদনার ন্যায় ভয়ঙ্কর বেদনা

আসিতেছে; অথচ পেটে হাত দিয়া দেখিলে পেট শক্ত কি কিছু তাহা বুঝা যাইতেছে-না। যাই হউক, আমি পূর্ণ মাত্রায় এক ডোজ অহিফেণ প্রয়োগ করিলাম। কিয়ৎকাল পরে রোগিণীর যেন চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করায় কহিল, বেদনার কিছুমাত্র উপশম বোঝা যাইতেছে না। তখন গর্ভবেদনা সমস্তই মিথ্যা-এ কথা জানিতে পারিয়া গৃহস্বামীকে নিশ্চিন্ত থাকিতে আদেশ করিয়া চলিয়া আসিলাম। পরে সে বেদনা আপনা আপনিই ভাল হইয়া গেল, পরে দিন গত হইতে লাগিল, অথচ গর্ভের লক্ষণ প্রকাশ হইল না।

হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগিণী তাহার স্বামীর ও বাটীর পরিবারদিগের সহানুভূতি পাইবার জন্য সময় সময় উৎকট রকমের অভিনয় করিয়া থাকে। এক দিন রাত্রে কোন আসন্নপ্রসবা স্ত্রীলোকের চিকিৎসার্থ আহূত হই। তাহার ১৫ দিন হইল একটি সন্তান হইয়াছে। তাহাকে সেই দিন ঘরে তুলিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে যেন দু এক দিন সামান্য জ্বর হইয়াছিল, এরূপ প্রকাশ। ঐ দিন গিয়া দেখিলাম রোগিণী যেন কত জ্বরে ভুগিতেছে, এবং বিকারের সমুদায় লক্ষণ বর্ত্তমান। হাত পায়ের অঙ্গুলি কুঞ্চিত হইতেছে; সময় সময় মুখের চেহারা বিকৃত হইতেছে। জিহ্বাটি পর্য্যন্ত বাহির করিবার ক্ষমতা নাই, যেন এতই দুর্ব্বল। ঔষধ খাওয়ান ত পরের কথা, বিন্দুমাত্র জল তলাইতেছে না। মুখে জল দিয়া চুয়াইয়া পড়িতেছে। বাড়ীতে ধূমধাম লাগিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে দাঁতি লাগিতেছে। আরও একজন কবিরাজ আসিয়াছেন। তিনিও গম্ভীরভাবে হাত দেখিতেছেন। আমি গিয়া প্রথমে ভাবিলাম (বিশেষ পূর্ব্বে জ্বর হইয়াছিল এ কথা শুনিয়া) খুব কঠিন ক্ষেত্র; এ স্থলে রোগিণীকে বাচানই দেখছি মুস্কিল, অসময়ে খবর দিয়াছ বলিয়া গৃহস্থকে কিঞ্চিৎ তিরস্কারও করিলাম। ও মা? শেষে থার্মমিটর বগলে দিয়া দেখি গায়ের উত্তাপ স্বাভাবিক। আবার, নাড়ী ধরিয়া দেখি এ ত সহজ নাড়ী সুতরাং চোরের উপর বাটপাড়ি আছে,রোগিণী এতদূর ভাবে নাই। আমি রোগিণীর অভিভাবকদিগকে কোন কথাই ভাঙ্গিয়া বলিলাম না; তবে বলিলাম, কোন চিন্তা নাই, রোগিণীর হাতে ও পায়ে অল্প অল্প আগুনের সেঁক দিন, এবং যখন জ্ঞান হইবে, তখন অমুক মিক্শ্চার (আমার দত্ত ঔষধ)

দিবেন এই বলিয়া চলিয়া আসিলাম এবং রোগিণীও সেই অবস্থায় থাকিল। তার পরদিন রাত্রে রোগিণী একবারে বিছানায় উঠিয়া বসিল এবং তিনি চারি গ্লাস জল খাইল। ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় আর কতক্ষণ থাকা যায়? তার পর রোগিণী রীতিমত আহারাদি করিল। পরে জানিলাম, তাহার আর কোনও অসুখ হয় নাই। চিকিৎসা-দর্শন।

শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্যাল, এম্, বি।

চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ।

নাসাজ্বর।

('হোমিওপ্যাথি মতে)।

নাসা—ইহা একটি বিশেষ পীড়া কি না? তৎসম্বন্ধে নানা লোকের নানা প্রকার মত, অনেক চিকিৎসকই নাসিকা হইতে রক্তস্রাবকালের মধ্যেই লিখিয়াছেন, "যে, দেহের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা পিতুঃটারি মেম্ব্রেন হইতে রক্তস্রাবপ্রবণ অধিক, এবং ইহা কোন বিশেষ হানিজনক নহে। জ্বরের সময় অথবা পূর্ব্বে যে অনেকের নাসা হইয়া থাকে, তাহা ঐ স্থলের মেম্ব্রেনের রক্তাধিক্যাবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে; আর নাসার রক্ত বহির্গত করার জন্য যদ্যপি বার বার ঐ মেম্ব্রেন ছেদন করা যায়, তথাচ উহার নির্ম্মাণের কোন ব্যতিক্রম আদৌ হয় না, ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যে তাঁহাদের মতে নাসা হইতে রক্তস্রাব কালে (Epistaxis) যদি দৈব ঘটনা ক্রমে কাহারও জ্বর হয়, তাহা হইলে উহাই নাসাজ্বর বলা যায়।

আমাদের বিবেচনায়, যদিও উভয় ব্যাধিতে (নাসা হইতে রক্তস্রাব ও নাসা) কোন কোন অংশে সমতা দেখা যায়, কিন্তু সর্ব্বাংশে ঐক্যতা না হওয়ায় এই রোগের বিশেষ নিদানাদি বর্ণন আবশ্যক; তজ্জন্য এই বিবরণী যথাযথ নির্ণয় জন্য সম্মিলনীরসম্পাদক ও বিজ্ঞতম পাঠকদিগের করে নিষ্পত্তি ভার অর্পণ করিলাম।

আমাদের বহুদর্শিতায় ইহাতে যেসকল লক্ষণ দর্শিত হয়, তাহা নাস্ত রক্ত-স্রাবে প্রায়ই দেখা যায় না, আবার নাস্ত রক্তস্রাবের চিকিৎসা যেরূপ নাসা-জ্বরের চিকিৎসা (সকল মতেই) অন্যরূপ, যাহাহউক, নিম্নে ইহার নিদান লক্ষণ ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা, যাহাতে উক্ত নাসাজ্বরের আদৌ আর কখনো পুনরাগমন হয় না, এবং যাহা বহুসংখ্যক নাসাজ্বরের চিকিৎসায় পরীক্ষা করিয়া অভিজ্ঞান হইয়াছে, তদনুরূপ ব্যবস্থা বিশদরূপে বিবৃত হইতে চলিল।

নিদান।—পিটুটারি মেম্ব্রেণের গঠন, অন্য স্থানের শ্লৈষ্মিকঝিল্লি অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং যে সকল ধমনীদ্বারা উহা পরিপোষিত হয়, রক্ত সঞ্চালনের সামান্য পরিবর্ত্তন হইলে তাহাতে রক্তাধিক্য হইয়া থাকে। শিশুদিগের এবম্প্রকার হইলে রক্তস্রাব দ্বারা ধমনীর রক্তাবরোধ অপনীত হয়, কিন্তু অধিক বয়স্কদিগের পিটাউটারি ঝিল্লি ও তৎপরিপোষণ উপযোগী নাড়ী সমূহ দৃঢ়কায় হওয়ায় রক্তস্রাব সহজে হয় না, তজ্জন্য সেই স্থানের স্নায়ুমণ্ডলীর এক প্রকার উদ্দীপনা হইয়া উঠে এবং ইহাতেই জ্বর হয়, ক্রমশঃ রক্তাবরোধ যত অধিক হয়, জ্বর তত প্রবল হয়। নাসা হইলে সকলেই, উক্ত ঝিল্লি নানা উপায়ে ছেদন করেন, এই জন্য ক্রমশঃই দৃঢ়তর হইয়া আসে, এবং তাহাতে রক্ত বহির্গমনের ব্যাঘাত হয়, কিন্তু এদিকে আবার রক্ত বাহির না করিলে দেহের নানা প্রকার বিশৃঙ্খল ও উপদ্রব প্রবল হয়, এমন কি দেখা ও শুনা গিয়াছে যে নাসা লাট খাইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে; কেন যে শোণিত প্রবাহের ব্যতিক্রম, রক্ত অবরোধ হইতে জ্বরের উৎপত্তি, কিম্বা জ্বর হইলে শোণিতের যে বেগ বৃদ্ধি হয়, তাহাতে উক্ত ঝিল্লির রক্তাধিক্য হয়, ইহার কিছুই আমরা সবিশেষ বলিতে পারি না। কিন্তু বোধ হয় ইহাতে ম্যালেরিয়া সম্ভূত, এবং দেহপ্রকৃতির বিশেষ হেতু, পিটুটারি মেম্ব্রেনে রক্তাধিক্য হয়, এবং তাহাতে স্নায়বীক উদ্দীপনা বশতঃ জ্বর বৃদ্ধি হয়। নাসাজ্বরের বিবরণ কোন পুস্তকে পাওয়া যায় না, এই জন্য ইহার নিদানাদি বিষয়গুলি অসম্পূর্ণ রহিল। নাসারোগে চিকিৎসা করিয়া যেরূপে সুফল অর্থাৎ যেরূপে উক্ত নাসার মূল উৎপাটন করিতে সমর্থ হইয়াছি, তদ্বিষয়ক সার সার লক্ষণ ও উপযুক্ত ঔষধ ক্রমশঃ বিবৃত করিতে ইচ্ছা রহিল।

ICTERUS NEONATORIOM

শিশুদিগের যকৃত ও নেবার চিকিৎসা।

আজ কাল অনেক দুর্ব্বল শিশুর (Chachectic Child) জন্মগ্রহণের ২। ১ মাস পরেই যকৃত ও পিত্তশিলার (Gall Ducts) কার্য্যকারিতার ব্যাঘাত বশতঃ জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধ বা উদরাময়, প্রভৃতি হইয়া পরে (Yellow Conjunctive) চক্ষু হলুদ বর্ণ, ক্রমশঃ সমস্ত দেহ, মুখের ভিতর, কানের ভিতর প্রভৃতি হলুদবর্ণ, এমন কি প্রস্রাব, বাহ্যে প্রভৃতি শারীরিক স্রাব সকল এত হরিদ্রাবর্ণ হয়, যে কাপড় বিছানায় বেশ হল্‌দে রং ধরিয়া যায়। এ অবস্থায় অনেক শিশুকেই আমরা অনেক প্রকার হোমিওপ্যাথি ঔষধ যথা, ব্রাই, মার্ক, নক্স, চায়না ক্যালকেরিয়া প্রভৃতি ঔষধে ডাক্তারি ও কবিরাজি চিকিৎসকেরাও কোন উপকার করিতে না পারায় অচীরে কালের করাল গ্রাসে পতিত হইতে দেখিতেছি। কিন্তু আপাততঃ গত মাহার দুইটী ৪ ও ৬ মাসের শিশু এখানে চিকিৎসাধীন হয়, যাহাদের উপরোক্ত সকল প্রকার লক্ষণই ঘটিয়াছিল, এবার আমি তাহাদিগকে অন্য কোন ঔষধ না দিয়া কেবল চেলিডোনিয়াম ৬ (Chelidonium Maj.) প্রত্যহ ৪ বার ½ ফোঁটা মাত্রায় ও অন্য অন্য আবশ্যকীয় আহারের বন্দবস্তের সহিত ব্যবস্থা করিলাম। উভয়কেই ১ মাহার মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিতে পারিয়াছিলাম। উক্ত ঔষধে যকৃত ও উহার ক্রিয়ায় ঐক্যতা থাকায় বোধ হয় এত শীঘ্র সুফল প্রদ হইল।

এক্ষণে সাধারণকে ঐ ঔষধ এ প্রকার এক প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরীক্ষা ও ইহার ফলাফল ইহাতে লিখিতে অনুরোধ করি, আগামী বারে উক্ত ঔষধের ভৈষজ্য গুণ ও ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতে ইচ্ছা রহিল।

শ্রীগগণচন্দ্র নন্দী।

ডাক্তার ইনচার্জ্জ হরিসভা দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়

চন্দননগর।

শিশুচিকিৎসা।

হোমিওপ্যাথি মতে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৭৯ পৃষ্ঠার পর)

(অফ্‌থ্যাল্‌মিয়া)

১৩। শিশুদিগের চক্ষুরোগ। এ অবস্থায় চক্ষুর শ্লৈষ্মিকঝিল্লির প্রদাহ ঘটিতে পারে। ইহাতে সচরাচর পাতাদ্বয় অতিরিক্ত স্ফীত হইয়া অনেক সময় চক্ষু গোলকের ও পাতার মধ্যে পূঁজ সঞ্চার হয়। যে সকল সন্তানের সদা অসুস্থতা হেতু শরীর রুগ্ন থাকে, তাহাদের এ রোগ ঘটিতে পারে। কখন কখন প্রখর বা স্ফোটজ্বর উভয় কালিন চক্ষু আক্রান্ত হইতে পারে। যে সকল ঔষধ ইহাতে ব্যবস্থা তাহাদিগের প্রয়োগ লক্ষণ নিম্নে দেওয়া হইল।

একোন। চক্ষু প্রদাহের প্রথমাবস্থায় পূঁজ সঞ্চার হইলে কোন উপকার দর্শে না। ইহার ৩ ক্রমের ৩টী বটিকা অর্দ্ধ গ্লাস জলে মিশ্রিত করিয়া দুই ড্রাম পরিমাণ তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে উপকার দর্শিবে।

এপিস। চক্ষের পাতায় শোথ ও উহার অতিশয় স্ফীতাবস্থা, চক্ষে বেদনা ও আলোকাতঙ্ক, চক্ষু হইতে অনবরত জলস্রাব হইতে থাকিলে ব্যবস্থা।

আর্জেণ্টাম-নাই। চক্ষু হইতে প্রচুর পূঁজস্রাব, পাতার নিম্নে পূঁজ সঞ্চার ও চক্ষু স্ফীত হইলে ব্যবহারে উপকার দর্শে।

ক্যালকে-কার্ব। চক্ষের পাতার শোথ ও চক্ষু হইতে ক্ষতকারক প্রচুর জলস্রাব, কর্ণিয়ার ক্ষত দৃষ্ট হইলে ইহাই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ইউফ্রেসিয়া। চক্ষু হইতে প্রচুর পরিমাণে উগ্র জলস্রাব, অথবা চক্ষু হইতে যে স্রাব হয় উহা গাঢ় হরিদ্রা বর্ণের পূঁজের ন্যায়, এবং উগ্র হেতু পাতায় ও গণ্ডে ক্ষত প্রকাশ হওয়া ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

মার্ক-সল। চক্ষু হইতে পাতলা ক্ষত কারক নিস্রাব, মাতার উপদংশ রোগ থাকায় সন্তানের চক্ষু প্রদাহে উপকার দর্শে।

রাস্‌টক্স। হিম লাগায় পীড়ার উৎপত্তি, পাতাদ্বয় আরক্ত, স্ফীত এবং আপেক্ষা সহকারে সংযুক্ত, চক্ষু হইতে হরিদ্রা বর্ণের পুঁজের ন্যায় প্রচুর নিস্রাব অথবা নিস্রাব অল্প কিন্তু মধ্যে মধ্যে প্রচুর জলের ন্যায় পদার্থ বেগে নির্গত হয়। রুগ্ন শিশুদিগের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ।

সাল্‌ফার। পীড়া পুরাতন হইলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ, চক্ষু চুলকান ও উহা হইতে শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ নিস্রাব, চক্ষের কোন্ রক্তবর্ণ।

উপরোক্ত ঔষধ সকল ৬ বা ১২ ক্রমের ২টী মাত্র বটীকা কিম্বা ৬টী বটীকা জলে মিশ্রিত করিয়া তাহার দুই ড্রাম পরিমাণ রোগের প্রখরতানুসারে দিবসে দুই তিন বা চারিবার সেবন করাইতে হইবে। শীতল জল দ্বারা মধ্যে মধ্যে চক্ষু ধৌত করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

কেফালিমেটোমা। মস্তকে রক্তবর্ণের আবের ন্যায় স্ফোট—ইহার প্রধান ঔষধ ক্যাল-কার্ব, আর্ণিকা ও রাস-টক্স; উহা হইতে পূঁজস্রাব হইতে থাকিলে অথবা অস্থিক্ষয় ও শিশু নিস্তেজ হইয়া পড়িলে চায়না ও সিলিসিয়া ৩০ ক্রমের দুইটী করিয়া বটীকা দিবসে তিনবার সেবন করাইলে আরোগ্য হইবে।

১৪। শিশুর অন্ত্রবৃদ্ধি। অর্থাৎ অন্ত্রের একটী পাক (ফোল্ড) অণ্ড-কোষ রজ্জুর (স্পার্মেটিক কর্ড) পাশ দিয়া নামিতে পারে, কিম্বা নাভির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। এই দুই প্রকার অন্ত্রবৃদ্ধি ভিন্ন অন্যান্য প্রকারের অন্ত্রবৃদ্ধির বর্ণনা আছে কিন্তু তাহা সন্তানদিগের এ অবস্থায় প্রায় দেখা যায় না। যে প্রকার অন্ত্রবৃদ্ধি হউক, চিকিৎসা প্রায় একই। ঔষধের প্রয়োগ লক্ষণ———

একোন। অনবরত জ্বর ও কষ্টসূচক মুখভঙ্গি, আক্রান্ত স্থান স্পর্শ করিলে বেদনা বোধ।

এণ্টিম-ক্রুড। অনবরত অতিশয় ক্রন্দন, জিহ্বা সাদা, বমন, উদরাময় ও কাশি থাকা ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

বোরাক্স-ভেন। শিশু দোলায় শয়ন করিয়া থাকিলে দোলাইতে গেলে

ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে আসিবার সময় ভয় ও ক্রন্দন, অতিশয় স্নায়ুবীয়তা, সামান্ত গোলমালে নিদ্রা ভঙ্গ ও ক্রন্দন, ধূষর বর্ণের পাতলা দাস্ত, ইত্যাদিতে ব্যবস্থা।

ক্যাল-কার্ব। স্থূলকায় সন্তানের মস্তকের যোড় (ফণ্টানেল) অসম্পূর্ণ, মস্তকে অতিশয় ঘর্ম্ম হওয়া ও সর্ব্বদা ক্রন্দন, ২। ৩ স্থানে অন্ত্রবৃদ্ধি হইলেও এই ঔষধ দ্বারা শীঘ্রই আরোগ্য হইবে।

ক্যামমিলা। অনবরত উদরাময়ের দাস্ত, শিশুর খিট্ খিটে স্বভাব হেতু সর্ব্বদা লইয়া বেড়াইলে সুস্থ থাকে।

সিনা। সন্তানের দেহ বৃদ্ধি পায় না ও কখনই স্থির ভাবে নিদ্রা যায় না, সর্ব্বদাই এমন কি নিদ্রাবস্থাতেও অস্থির থাকে এবং জাগ্রত হইলে ক্রন্দন করে ও কোন দ্রব্য লইয়া খেলা করিতে ইচ্ছা করে না।

লাইকোপোডিয়াম। শিশু সমস্ত দিবস ক্রন্দন করে ও রাত্রে গাঢ় নিদ্রা যায়, মূত্র ত্যাগ কালিন চিৎকার করে ও প্রস্রাবে রক্ত বর্ণের বালুকা কণার ন্যায় পদার্থ নিম্নে পতিত হয়, উদরে গড় গড়ানি শব্দ, অন্ত্রশূল ও ক্রন্দন ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

নাক্সভমিকা। অণ্ডকোষে বা অন্যত্র বৃহৎ টীউমারের ন্যায় অনুভব, মধ্যে মধ্যে অতিশয় ক্রন্দন ও ক্রন্দন কালিন পদদ্বয় একবার সঙ্কুচিত করিয়া পুনরায় প্রসারণ করা, রাত্র দুই প্রহরের পর ও প্রাতে অন্ত্রশূল জনিত উদরে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ, মল কঠিন ও আকারে বৃহৎ এবং কদাচিৎ ত্যাগ হয়, অথবা অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ নিঃস্মরণ, অনিদ্রা, অক্ষুধা ইত্যাদি ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

ওপিয়াম। মুখ মণ্ডল আরক্ত, উদর স্ফীত ও কঠিন, সর্ব্বদা নিদ্রাবল্য বা নিদ্রা কর্ষণ হইলে ইহাই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিলিসিয়া। অন্ত্র বৃদ্ধির চতুস্পার্শ্ব স্পর্শ করিলে বেদনা অনুভব, স্তনদুগ্ধ সেবনান্তে প্রচুর দুগ্ধ বমন, শিশু সম্পূর্ণ স্থির ভাবে থাকিতে ভাল বাসে, নাভি কুণ্ডলে শূল বেদনার ন্যায় যন্ত্রণা হেতু ক্রন্দন এবং দুর্গন্ধ বায়ু নিঃস্মরণ হইলে বেদনার শান্তি হওয়া ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

ষ্টেনাম। উদর চাপিলে বেদনার ও ক্রন্দনের শান্তি হওয়া ইহার প্রধান

লক্ষণ। উপরোক্ত ঔষধের ৩০ ক্রমের ১টী বটীকা দিবসে দুই তিন বার সেবনে উপসর্গের শান্তি হইয়া পীড়া আরোগ্য হইবে।

১৫। স্তনের কাঠিন্যতা। শিশুদিগের স্তন স্ফীত হইলে আর্নিকা, ব্রাইওনিয়া, ক্যামমিলা, হিপার সালফার বা সিলিসিয়া অবস্থানুসারে দুই এক দিবস ব্যবহারে আরোগ্য হইবে।

১৬। স্তন্যপায়ী শিশুর মুখগহ্বরের ক্ষত। এই ক্ষত ভিন্ন ভিন্ন তিন প্রকারে প্রকাশ হইতে পারে। উহাদিগের কারণ, অবস্থা ও লক্ষণ পরস্পর বিভিন্ন। যথা—

১। থ্রাস্। ইহাতে মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির মধ্যে কৃত্রিম ঝিল্লির ন্যায় এক প্রকার সাদা পদার্থ সঞ্চার হয়। শিশুর পরিপাক যন্ত্রের বিকৃতি ও পাকাশয়ে অম্ল হইলে এই প্রকার ক্ষত প্রকাশ হইতে পারে; উহাতে স্তন পান করিতে বেদনা বোধ হয় ও ওষ্ঠে, জিহ্বায় এবং তালু ইত্যাদি স্থানে সাদা গোলাকার চিহ্ন প্রকাশ হইয়া ক্রমে বর্দ্ধিত হয় এবং অবশেষে পতিত হইয়া নিম্নে অক্ষত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি বাহির হয়। এ অবস্থায় স্তনপান বা দুগ্ধ সেবনান্তে শিশুর মুখগহ্বর পরিষ্কার জলে বস্ত্র শিক্ত করিয়া প্রতিবার ধৌত করান উচিত। যদিও এ পীড়ায় জীবনের কোন আশঙ্কা থাকে না তথাচ উপযুক্ত ঔষধ ব্যবহারও প্রত্যহ পরিষ্কার না করিলে শীঘ্র আরোগ্য না হইয়া অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে।

২। এপ্‌থা (জাড়ি ক্ষত)। এই সকল ক্ষত পাকাশয়ের বা অন্ত্রের বিকৃতি হেতু বা হাম জ্বরের সহিত প্রকাশ পায়, ইহার সহিত জ্বর, অস্থিরতা ক্ষুধামান্দ্য, অপাক দাস্ত বা উদরাময়, মুখ হইতে অনবরত লালাস্রাব এবং লালাগ্রন্থি স্ফীত ও বেদনাযুক্ত ইত্যাদি লক্ষণ প্রায়ই দৃষ্ট হয়। মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আরক্ত ও উষ্ণ হয় এবং উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপূর্ণ স্বচ্ছ স্ফোট প্রকাশ হইয়া ক্রমে ক্ষতে পরিণত হয় এবং ঐ সকল ক্ষত সাদা বা ঈষৎ পীত বর্ণের পর্দ্দা দ্বারা আবৃত থাকে। জিহ্বায়, ওষ্ঠে ও ওষ্ঠের দুই প্রান্ত ভাগে সচরাচর দৃষ্ট হয়। এ পীড়াও সাংঘাতিক হওয়ার সম্ভব নহে, তবে হাম জ্বরের সহিত যোগ থাকিলে অনিষ্ট ঘটিবার কিঞ্চিৎ সম্ভাবনা।

৩। প্রকৃত ক্ষত। ইহা প্রায়ই শিশুদিগের শারিরীক অসুস্থতা হেতু

প্রকাশ হয়; এবং ইহাতে মাড়ীদ্বয় আরক্ত, স্ফীত ও কোমল ধার হইয়া সকল অপরিষ্কার সাদা বা ধূবর বর্ণের পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে এবং উহার নিম্নের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি বিনষ্ট হইয়া রক্তস্রাব হয়। নিম্ন মাড়ীর সম্মুখ অংশ অগ্রে আক্রান্ত হয়; যেমন পীড়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে তেমনি ঐ সকল ক্ষত দন্তের পার্শ্ব ও মধ্য দিয়া মাড়ীর অপর পার্শ্বে ব্যাপ্ত হয়; কখন কখন কণ্ঠের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আক্রমণ করে।

একোনাইট। শিশুর ত্বক শুষ্ক ও উষ্ণ, মস্তকে অধিক উত্তাপ, অনবরত অস্থিরতা ও ক্রন্দন, হাত কামড়ান, সবুজ জলবৎ দাস্ত এবং অতিশয় চৈতন্যাধিক্য হইলে উপকার দর্শিবে।

আর্সিনিক। জিহ্বার ধারে ক্ষত প্রকাশ, মাড়ী স্ফীত ও উহা হইতে সহসা রক্তস্রাব, মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ ও নীলবর্ণ দৃষ্ট হওয়া, অতিশয় অস্থিরতা, সবুজ বর্ণের জলবৎ দাস্ত ও নির্জ্জীবাবস্থার সহিত মুখে পচা দুর্গন্ধ থাকিলে ইহাই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

আরম-ট্রিফাইলাম। কণ্ঠে ও মুখে জ্বালা, চর্ব্বন করার ইচ্ছা, প্রখর পীড়া, ওষ্ঠদ্বয়ের ও মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি প্রচণ্ডরূপে স্ফীত হয়, পরে উহাতে ক্ষত প্রকাশ ও অনবরত লালাস্রাব হইতে থাকে, পারা দ্বারা দূষিত দেহে ইহাই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ব্যাপটিসিয়া। দন্ত ও মাড়ীতে বেদনা ও রক্ত চোঁয়াইয়া পতিত হওন, জিহ্বা স্ফীত ও অসাড়, মুখ মধ্যে ক্ষত, মাড়ী শিথিল, স্ফীত, ও বিবর্ণ, প্রচুর লালাস্রাব ও শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ হওয়া ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

ক্রমশঃ

কলিকাতা } শ্রী শিখরকুমার বসু, এল, এম, এস,
হোমিওপ্যাথি প্রাক্টিসনার।

গ্রাহকগণের দ্রষ্টব্য।

চিকিৎসা-সম্মিলনীর ৭ম, ৮ম ও ৯ম সংখ্যা একত্রে প্রেরিত হইল, ১০ম, ১১শ ও ১২শ এই তিন সংখ্যার একত্রে মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

স্ত্রী ও পুরুষ।

এলোপ্যাথিমতে।

যাবতীয় জীবজন্তু দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতি। এই দুই জাতি একই নমুনায় গঠিত হইলেও ইহারা পরস্পর বিভিন্ন। কতকগুলি পুরুষের মধ্যে একটী পুরুষবেশধারী স্ত্রীলোক থাকিলে একজন বুদ্ধিমান্ লোক কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ দ্বারা স্ত্রীলোকটীকে বাছিয়া বাহির করিতে পারেন, আবার ঐরূপ স্ত্রীদিগের মধ্যে স্ত্রীবেশধারী একজন পুরুষকে কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ দ্বারা চিনিতে পারা যায়।

জগদীশ্বর প্রত্যেক প্রাণীকে তাহার নিজের নিজের অবস্থা অনুযায়ী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অথবা তাহারা একই নমুনায় সৃষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় স্থাপিত হওয়াতে তাহাদের স্বভাব ও আকৃতি বিভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে। এইসংসারে স্ত্রী ও পুরুষের কার্য্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একের কার্য্য সন্তানধারণ ও পালন করা, অপরের কার্য্য স্ত্রীজাতি ও সন্তানগণকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা। সভ্য মনুষ্যসমাজে স্ত্রী ও পুরুষের কার্য্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। একজন ঘরে বসিয়া সন্তানপালন ও গৃহকার্য্য করিবেন, অপরে কঠোর পরিশ্রম করিয়া আপনার ও পোষ্যবর্গের প্রয়োজনীয় দ্রব্য আহরণ করিবেন। ইতরশ্রেণীর জীবগণ মধ্যে যদিও পুরুষ জাতিকে স্ত্রীজাতিয়ের আহার যোগাইতে হয় না, কিন্তু অন্যান্য অনেক বিষয়ে পুরুষজাতিকে স্ত্রীজাতির সাহায্য করিতে হয়। সন্তান ধারণের সময় ইতর জন্তু মধ্যেও কার্য্য বিভাগ দেখা যায়, যথা পক্ষীগণের সন্তান হইবার সময় স্ত্রী ও পুরুষ একত্রে নীড় নির্ম্মাণ করে এবং ডিম্ব প্রসব করিলে পুরুষটী আসিয়া স্ত্রীজাতিকে আহার দেয়, স্ত্রী ডিম্বের উপর বসিয়া থাকে। কুক্কুরী প্রসব হইলে রাত্রিকালে পুরুষটী আসিয়া শাবকদিগকে পাহারা দেয়। হস্তিযূথের পুরুষহস্তীগুলি আগে পাছে থাকিয়া সন্তানগুলি ও স্ত্রীদিগকে আগুলিয়া লইয়া যায়। মনুষ্যের অতিঅসভ্য আদিম অবস্থাতেও দেখা যায়—পুরুষজাতি তীর ধনু হস্তে শিকারে বহির্গত হয় এবং স্ত্রীজাতি বৃক্ষতলে বসিয়া থাকে। অন্ততঃ কঠিন কঠিন কার্য্যগুলি পুরুষ-

জাতিকেই করিতে হয়। শত্রুহস্ত হইতে স্ত্রীজাতিকে পুরুষজাতি রক্ষা না করিলে তাহারা প্রায়ই আত্মরক্ষা করিতে পারে না। অসভ্যেরা সর্ব্বদা তাহাদিগের অবিবাহিতা কন্যাগুলি ও স্ত্রীদিগকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। যুদ্ধকার্য্যে পুরুষেরাই গমন করে। কোন কোন অসভ্য দেশে স্ত্রী-যোদ্ধারও কথা শুনা যায়, কিন্তু তাহা নিতান্ত অল্প। আফ্রিকা মহাদেশে আশাণ্টি দেশে ডাহোমি প্রদেশের অসভ্য রাজার ৫০০০ হাজার স্ত্রী-যোদ্ধা আছে। কিন্তু এইরূপ ব্যাপার খুব্ বিরল।

পূর্ব্বকালে ইউরোপে যে ব্যক্তি কোন বিপদ্‌গ্রস্তা ললনাকে উদ্ধার করিতেন, তিনি বীর বলিয়া গণ্য হইতেন। মোটের উপর পুরুষজাতিই সংসারের যাবতীয় গুরুতরভার বহন করেন। এবং স্ত্রীজাতি কেবল পুরুষের উপভোগ্য বস্তুর ন্যায় হইয়া আসিতেছে। অসভ্য জাতির মধ্যে বিবাহপ্রথা থাকিলেও অনেকস্থলে স্ত্রী কাড়িয়া লইয়া যাওয়ার প্রথা আছে। অথবা অনেকস্থলে বিবাহের পূর্ব্বে যেব্যক্তি স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক লইয়া যায়, স্ত্রী তাহারই হয়। ইতর জন্তুর মধ্যেও এইরূপ দেখা যায় যে বলবান্ পুংজন্তু অপর পুরুষদিগকে তাড়াইয়া দিয়া স্ত্রী কাড়িয়া লইতে পারে, স্ত্রী তাহারই নিকট গমন করে। স্ত্রী কোন কালেও আত্মরক্ষার্থে সমর্থ নহে, এজন্য স্ত্রীজাতির মনে এই স্বাভাবিক সংস্কার বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে, যে পুরুষ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে, স্ত্রী তাহারই নিকট স্বতঃ-প্রবৃত্তা হইয়া গমন করিবে। ইতর জীবের স্ত্রীগণ বলবান্ পুরুষ বর্ত্তমানে দুর্ব্বলের নিকট প্রেমদানার্থী হয় না। একরূপ পতঙ্গজাতি আছে, তাহা-দের বিবাহের সময় পুরুষগণ পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়, এবং স্ত্রীগণ দূর হইতে বসিয়া দেখে, যে পুরুষটী যুদ্ধে জয়ী হয়, স্ত্রী-পতঙ্গটী তাহরই সহিত মিলিত হয়। পূর্ব্বে ইংলণ্ডে স্ত্রীলাভার্থ পুরুষগণ পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হইত। সকল জীবজন্তু মধ্যে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীজাতি ভীরু। অসভ্যদিগের মধ্যেও স্ত্রীগণ ভীরু-স্বভাবা ও লজ্জাশীলা। যখন ক্যাপ্‌টেন্ লর্ড জর্জ ক্যাম্পবেল সাহেব "চ্যালেঞ্জার" নামক জাহাজ হইতে নিউগিনির তীরে অবতীর্ণ হন, তখন ঐ দ্বীপের পুরুষগণ নির্ভয়ে তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য তাঁহাদিগের নিকট আসিল, কিন্তু তাঁহারা একটীও স্ত্রীজাতিকে দেখিতে পাইলেন না। কারণ তাহারা উহাদিগকে দেখিয়া ভয় পাইয়া পূর্ব্বেই কুটীরে আশ্রয়

লইয়াছিল। ক্যাপ্‌টেন্ কুকের "ভয়েজ্‌রাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড্" নামক গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, অসভ্যের দ্বীপ সকলে যেখানে যেখানে ক্যাপটেন্ কুক জাহাজ লাগাইয়াছেন, সেখানে পুরুষজাতি ক্যানু নামক বোটে চড়িয়া তাঁহাদিগের জাহাজে আসিয়াছিল, স্ত্রীগণ গৃহের বাহির হয় নাই।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্ত্রীপুরুষের গঠন ও প্রকৃতিতে এই বিভেদ-গুলি লক্ষিত হইবেক। স্ত্রীলোকের পাছা (পেল্‌ভিস্) পুরুষের পেল্‌ভিস্ অপেক্ষা প্রশস্ত। উহার অস্থিগুলি পাতলা ও কিছু চওড়া। স্ত্রীজাতির পেল্‌ভিসের গহ্বর বা বস্তিপ্রদেশ অপেক্ষাকৃত বড় ও প্রশস্ত। স্ত্রীজাতিকে সন্তানধারণ করিতে হয় এজন্য পেল্‌ভিস্ প্রশস্ত হইয়াছে। পশ্চাদ্ভাগ হইতে দেখিলে দেখা যায়, স্ত্রীজাতির কটি ও উরুদেশের মধ্যস্থান অত্যন্ত প্রশস্ত। এই প্রশস্ততা আফ্রিকামহাদেশের নিগ্রো রমণীদিগের মধ্যে অত্যন্ত অধিক। ঐ দেশে যে স্ত্রীর পশ্চাদ্ভাগ অত্যন্ত বড় হয়, সেই বেশী সুন্দরী বলিয়া গণ্য হয়। স্ত্রীলোকের অস্থিগুলি পুরুষের অস্থি অপেক্ষা পাতলা, ফাঁপা ও বেশী ছিদ্রযুক্ত এবং কম পরিমাণে বাঁকা। স্ত্রীলোকের উরুদেশ ও বাহুর অস্থি পাতলা এবং সরু। স্ত্রীলোকের মস্তকের কঙ্কাল পুরুষের মস্তক অপেক্ষা ছোট, বেশী ডিম্বাকার এবং দুই পার্শ্ব কিঞ্চিদধিক বিস্তৃত মুখের কঙ্কাল বেশী ডিম্বাকার, চোয়ালের অস্থি ক্ষুদ্র এবং চিবুকাস্থি কম উচ্চ। পাঁজরের অস্থি পাতলা এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। কিন্তু পাঁজ-রের উপাস্থিগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। স্ত্রীলোকের মস্তিষ্কও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাবয়ব এবং ওজনে কম। তদ্ভিন্ন পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীজাতির দুইটী অতিরিক্ত যন্ত্র আছে যাহা পুরুষজাতিতে নাই। সেই দুইটী সঙ্গমযন্ত্র এবং জরায়ু বা গর্ভাশয়। পুরুষের মূত্রনির্গমনের যন্ত্রই সঙ্গমযন্ত্র কিন্তু স্ত্রীলোকের মূত্রনির্গ-মনের পথ ও সঙ্গমযন্ত্র স্বতন্ত্র। গর্ভাশয় বা যোনিদ্বারের অনুরূপ কোন যন্ত্র পুরুষজাতিতে নাই। কিন্তু পুরুষজাতির সঙ্গমযন্ত্রের অনুরূপ, অতি ক্ষুদ্র একটী অঙ্গ স্ত্রীজাতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, উহাকে ক্লাইটরিস্ কহে। পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের অনুরূপ সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই সামান্যাকারে স্ত্রীজাতিতে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুরুষজাতিতে নাই। যথাঃ—স্ত্রীলোকের ক্লাইটোরিস্ পুরুষের পেনিস্ বা লিঙ্গের সমান, স্ত্রীলোকের বস্তিদেশে পেল্‌ভিস্‌গহ্বরে জরায়ুপার্শ্বে দুইটী অণ্ড আছে, ঐ

অণ্ডদ্বয়কে ওভেরি কহে। উহারা পুরুষের অণ্ডদ্বয়ের সমান, কিন্তু স্ত্রীজাতির যোনি ও জরায়ুর অনুরূপ কোন যন্ত্র পুরুষজাতিতে দেখা যায় না। স্ত্রীজাতির জননেন্দ্রিয়ের অতি সামান্য পরিবর্ত্তন ঘটিলেই পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের সমান হয়। যথাঃ—স্ত্রীজাতির ওভেরিদ্বয় বস্তি হইতে নিম্নে নামিয়া আসিলে এবং ক্লাইটরিস্ সছিদ্র ও অপেক্ষাকৃত বড় হইলে তথা যোনিদ্বার ছিদ্রবিহীন হইলেই পুংজননেন্দ্রিয়ের সমান হয়। আবার পুংজননেন্দ্রিয়ের অপেক্ষাকৃত অধিক পরিবর্ত্তন ঘটিলেই স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের ন্যায় দেখায়। যথাঃ—পুরুষের অণ্ডদ্বয় উদরমধ্যে প্রবিষ্ট থাকে, লিঙ্গ ক্ষুদ্র ও ছিদ্রবিহীন হয়, মূত্রদ্বার লিঙ্গের গোড়ায় সংযোজিত হয় এবং দুই অণ্ডের মধ্যস্থলে যে খাঁজ আছে, ঐ খাঁজ আরও অপেক্ষাকৃত গভীর হইয়া যোনিদ্বার পরিবর্ত্তিত হইতে পারে এবং মুষ্কদ্বয়ের চর্ম্ম দুই দিকে সঙ্কুচিত হইয়া স্ত্রীজাতির যোনির উভয়পার্শ্বের ওষ্ঠদ্বয়ের ন্যায় হইতে পারে। এই সকল বিবিধ পরিবর্ত্তনবশতই হিজিরা বা হার্‌মাফ্রোডাইটের উৎপত্তি হয়।

জননেন্দ্রিয়ভিন্ন স্ত্রী ও পুরুষের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একই। তবে বিভিন্ন কার্য্যসাধন জন্য কোন কোন অঙ্গ বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের বক্ষস্থলে দুইটী স্তন আছে, কিন্তু পুরুষের স্তন আজীবন ক্ষুদ্র থাকিয়া যায়, স্ত্রীজাতির স্তন যৌবন বয়সে বৃহদায়তন হয়। তার পর পুরুষের গোঁফ ও দাড়ি উঠে, কিন্তু স্ত্রীলোকের গোঁফদাড়ি উঠে না। ছাগ জাতীয় জন্তুর মধ্যে স্ত্রীজাতির সামান্য দাড়ি উঠে। পুরুষজাতির প্রায় সকলেরই বক্ষস্থলে চুল জন্মে, স্ত্রীজাতির তাহা হয় না। স্ত্রীলোকের মাথার চুল পুরুষের চুল অপেক্ষা দীর্ঘ। পুরুষের মাথার চুল রাখিয়া দিলেও স্ত্রীলোকের চুলের সমান হয় না। স্ত্রীজাতির হাতপায়ের গঠন, মুখের গঠন সমস্তই পুরুষের হাত পা ও মুখ হইতে বিভিন্ন। স্ত্রীজাতির হস্তপদ ছোট এবং অঙ্গুলিগুলি পাতলা ও খাট, স্ত্রীলোকের বাহু, পুরুষের বাহু অপেক্ষা গোলাকার। পুরুষের গোঁফদাড়ি বাদ দিলেও তাহার মুখের গঠন স্ত্রীর মুখ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। স্ত্রীজাতির মুখের একরূপ ভাবভঙ্গী আছে, যাহা পুরুষের দৃষ্টিগোচর হয় না। এই ভাবকে সহজ কথায় মেয়েলিভাব বলে। স্ত্রীলোকের গলদেশ সম্পূর্ণ গোলাকার হয় কিন্তু পুরুষজাতির গলার মধ্যস্থলে দুই এক খানি উপাস্থি উচ্চ হইয়া গলা-

বন্ধুর দেখায়, স্ত্রীলোকের কর্ণ অপেক্ষাকৃত ছোট, নাসিকার ছিদ্র কম প্রশস্ত এবং চিবুক ক্ষুদ্র। স্ত্রীলোকের দন্তপাতি পুরুষের দন্তপাতি অপেক্ষা ক্ষুদ্রাবয়ব। পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকের শরীরে বেশী মেদসঞ্চয় হয়। স্ত্রীলোক মাত্রেরই চর্ম্মের নিম্নে অধিকতর মেদসঞ্চয় হয়। এই মেদসঞ্চয় স্তনদ্বয়ে, উদরে এবং পাছায় বেশী হয়। এইরূপ সমস্ত শরীরে চর্ম্মের নিম্নে মেদসঞ্চয় জন্যই স্ত্রীলোকের শরীর যৌবনবয়সে এক অপরূপ খোলখাল-রহিত গোলাকার ভাবধারণ করে, যাহা পুরুষজাতিতে কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই মেদসঞ্চয় জন্যই স্ত্রীলোকের গাত্র কোমল হয়। এ ভিন্ন স্ত্রীজাতির বর্ণ অপেক্ষাকৃত পাতলা হয়। পুরুষের গলার স্বর গম্ভীর, কিন্তু স্ত্রীজাতির গলার শব্দ পাতলা ও মিহি। ক্রমশঃ—

(উদ্ধৃত)

সদাচার ও কদাচার।

অভ্যঙ্গ।

ব্যায়ামান্তে শরীরের গ্লানি অপগত হইলে স্নান করা প্রয়োজন। এ দেশে অতি পূর্ব্বকাল হইতে অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিয়া স্নান করার পদ্ধতি আছে। অধুনা ইংরাজদিগের আগমনে অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করা অসভ্যতার চিহ্ন হইয়া দাঁড়াইতেছে। তৈলের স্থান সাবান অধিকার করিতেছে। এই পরিবর্ত্তিত আচার আমাদের ভাল বোধ হয় না। সাবান দেহ পরিষ্কার ও ত্বকের কোমলতা সম্পাদন করিতে উৎকৃষ্ট পদার্থ সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল সাবান সমান নহে; অনেক সাবানে অনিষ্টোৎপত্তি হয়। বিশেষতঃ যাহাতে ক্ষার ভাগ অধিক, তাহা ব্যবহারে ত্বকের নানাপ্রকার ব্যাধি জন্মে।

ক্ষারাধিক্য জন্য সাবানের জলাকর্ষণী শক্তি (Affinity for water) এবং যবক্ষারজানীয় পদার্থ দ্রবকরণ শক্তি (Solvent action on the Nitrogenous tissues) থাকায় ত্বকের শুষ্কতা জন্মে ও অনেক স্থলে তাহা ধ্বংস হইয়া যায়*। বিশেষতঃ যে সকল সাবানে ক্ষারভাগ অধিক, তাহাতে শারীর বিধান অধিকপরিমাণে বিনষ্ট হয়। অবশ্য আমরা এমত বলিতেছি না যে, কেবল ক্ষারে যত অনিষ্ট হয়, ক্ষারসংযুক্ত সাবানে তদ্রূপ হইতে

পারে। বাজারে সচরাচর যে সকল সাবান পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ ক্ষারাধিক্যবিশিষ্ট। পূর্ব্বে যে অপকারিতা গুণ প্রদর্শিত হইল, তাহা কেবল ক্ষারজনিত। যাঁহারা রসায়ন-বিদ্যায় পারদর্শী নহেন,* তাঁহারা কোন্ সাবান ক্ষারাধিক্যবিশিষ্ট ও কোন্‌টী নহে জানিতে পারেন না; সেই জন্যই সাবান ব্যবহার এত অনিষ্টকর বলা যাইতেছে। নচেৎ দেহের অবস্থা-বিশেষে বিশেষ বিশেষ সাবান মহোপকারী। যথা—যে সকল ত্বাচ্‌রোগে শল্কল উত্থিত হয় এবং দদ্রু, পাঁচড়া, চুলকানি ইত্যাদি।

আমাদের পূর্ব্বকালের প্রদর্শিত প্রথায় (অভ্যঙ্গ) কোন দোষ দেখা যায় না। বরং তদ্বিপরীতই দেখিতে পাওয়া যায়।

"অভ্যঙ্গং কারয়েন্নিত্যং সর্ব্বেষ্বঙ্গেষু পুষ্টিদম্।
শিরঃশ্রবণপাদেষু তং বিশেষেণ শীলয়েৎ॥"

শরীর পুষ্টির জন্য প্রত্যহ সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দনকরিবে, বিশেষতঃ মস্তকে, কর্ণ ও পদদ্বয়ে তৈল মর্দ্দন অতি কর্ত্তব্য।

*Owing to their affinity for water, and their solvent action on the nitrogenous tissues, several of these substances (alkalies) will destroy the skin or other structures to a considerable depth. "The caustic alkalies possess a greater affinity for water and therefore a more solvent and destructive action on the tissues than the remaining members of this group."—*S. Ringer's Therapeutics.*

অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিলে শরীরের পুষ্টি কিরূপে হইবে? অনেকে হয়ত এ কথা সহসা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না।

তৈল ও বসা উদ্ভিদ্ ও জীব-দেহে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, উদ্ভিদ্ ও জীব-দেহ নির্ম্মাণের জন্য তৈল ও বসা অতি প্রয়োজন। জীব-দেহে ইহারা অগ্ন্যুদ্দীপক, শক্তিপ্রদ ও পুষ্টিকারক; এবং শরীর নির্ম্মাণের জন্য তৈল ও বসা অপরিহার্য্য। অবশ্যই আমরা স্বীকার করি, তৈল ব্যতীত পুষ্টি হইতে পারে; কিন্তু তাহা অতি সামান্য ও অসম্পূর্ণ, তৈলাদি দগ্ধ হইয়া যবক্ষারজানীয় পদার্থের শক্তি প্রদান করে, যথা—

পৈশিক সঞ্চালন, নানাপ্রকার দৈহিক নিঃস্রবণ, স্নায়বিক শক্তি সঞ্চালন ইত্যাদি—তৈল বসা দগ্ধ হইয়া অগ্নির উৎপত্তি হয়।

ত্বক্ শুষ্ক, কঠিন ও ভঙ্গপ্রবণ হইলে তৈলমর্দ্দন দ্বারা উহাকে কোমল ও মসৃণ করা যায়। অনেক সময়ে ঘর্ম্ম ও মলমূত্রাদি উগ্রগুণবিশিষ্ট হওয়ায় চর্ম্মে ক্ষত ও স্ফোটক জন্মে। তৈল এই উগ্রতা নিবারণের সহজ উপায়। কখন কখন ক্ষয়কাসাদি দৌর্ব্বল্যকর পীড়ায় যে প্রভূত ঘর্ম্ম হয়, সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিলে তাহা হ্রাস হইয়া থাকে। যাহারা কায়িকশ্রম অধিক করে, সর্ব্বাঙ্গে তাহারা তৈল মর্দ্দন করিলে, ঘর্ম্ম ও বলহানি অপেক্ষাকৃত অল্প হয় ও স্নায়বিক শক্তি বৃদ্ধি পায়।

"Fats have been rubbed into the skin with a view to their absorption, so as to minister to the nutrition of the body."—*Sydney Ringer.*

দেহে তৈল মর্দ্দন করিলে তাহা আশোষিত হইয়া পুষ্টি সাধন করে এবং অনেক ঔষধ এতৎসহ আশোষিত হইয়া নানাপ্রকার ব্যাধি প্রশমিত হয়। বৈদ্যশাস্ত্রে যে নানাপ্রকার ঔষধসংযুক্ত তৈল আছে, তদ্দ্বারা বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৈল সেবন করিলে জীর্ণ হয় না এবং অনেক ঔষধ সেবন করিলে পাকাশয়ের উদ্দীপনা হয়। অতএব ঔষধসংযুক্ত তৈল অঙ্গে মর্দ্দন করিলে যে কত উপকার হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।—দৈহিক পুষ্টি, যবক্ষারজানীয় পদার্থের শক্তিবৃদ্ধি, ঘর্ম্মাদি দৌর্ব্বল্যকর নিঃস্রবণের হ্রাস, ত্বকেরউদ্দীপনা অপগত, উহার কোমলতা ও মসৃণতা বৃদ্ধি, নানা-প্রকার ব্যাধির শান্তি ইত্যাদি।

হায়! এত মহোপকারী তৈল এ দেশে ক্রমশঃ ঘৃণিত হইয়া আসি-তেছে! পাঠকগণ দেখুন, মহামতি শ্রীমদ্ভাব মিশ্র কি লিখিয়াছেন :—

"অভ্যঙ্গো বাতকফহৃচ্ছ্রমশান্তিবলং সুখম্।
নিদ্রাবর্ণমৃদুত্বায়ুষ্কুরুতে দেহপুষ্টিকৃৎ॥
অভ্যঙ্গঃ শীলিতো মূর্দ্ধ্নি সর্ব্বেন্দ্রিয়তর্পকঃ।
দৃষ্টিপুষ্টিকরোহন্তি শিরোভূমিগতান্ গদান্॥
কেশানাং বহুতাং দার্ঢ্যং মৃদুতাং দীর্ঘতাং তথা।

কৃষ্ণতাং কুরুতে কুর্য্যাচ্ছিরসঃ পূর্ণতামপি ॥
ন কর্ণরোগান্ন মলং নচ মন্যা হনুগ্রহঃ।
নোচ্চৈঃ শ্রুতির্ন্ন বাধির্য্যং স্যান্নিত্যং কর্ণপূরণাৎ ॥
রসাদ্যৈঃ পূরণং কর্ণে ভোজনাৎ প্রাক্ প্রশস্যতে।
তৈলাদ্যৈঃ পূরণং কর্ণে ভাস্করেঽস্তমুপাগতে ॥
পাদাভ্যঙ্গশ্চ তৎ স্থৈর্য্যং নিদ্রাদৃষ্টিপ্রসাদকৃৎ।
পাদসুপ্তিং শ্রমস্তম্ভসঙ্কোচস্ফুটনপ্রণুৎ ॥"

অভ্যঙ্গ দ্বারা বায়ু, কফ ও শ্রম বিনষ্ট হয় এবং তাহাতে বল, সুখ, নিদ্রা, দৈহিক বর্ণ ও কোমলতা ও পরমায়ু বৃদ্ধি এবং শরীরিক পুষ্টি হয়। মস্তকে যথোচিত তৈল মর্দ্দন করিলে সকলেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, দর্শনশক্তি ও পুষ্টি বৃদ্ধি হয় ও শিরোগত রোগ নষ্ট হয়। কেশের বাহুল্য, কোমলতা ও দীর্ঘতা, কেশমূলের দার্ঢ্য, তাহার কৃষ্ণবর্ণত্ব এবং মস্তকের পূর্ণতা অর্থাৎ মস্তিষ্কের বৃদ্ধি পায়। কর্ণে প্রত্যহ তৈল পূরণ করিলে, কর্ণরোগ, কর্ণে মল, মন্যা, ও হনুগ্রহ, উচ্চশ্রুতি বা বধিরতা হয় না। কর্ণে কোন রসাদি পূরণ করিতে হইলে ভোজনের পূর্ব্বে এবং তৈলপূরণ সূর্য্যাস্তের পর উপকারক। পাদদ্বয়ে তৈল মর্দ্দন করিলে উহার স্থিরতা এবং নিদ্রা ও দৃষ্টির প্রসন্নতা হয় এবং পাদসুপ্তি (পাদস্পর্শজ্ঞানরহিত*), স্তব্ধতা, শ্রম, সঙ্কোচ ও স্ফুটন নিবৃত্তি পায়।

অভ্যঙ্গজন্য নানাবিধ তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সার্ষপ তৈল সর্ব্বোৎকৃষ্ট; *যেহেতু ইহাতে ত্বক্ সামান্য* উদ্দীপিত হওয়ায় তথায় অপেক্ষাকৃত অধিক শোণিত সঞ্চালন হয় এবং চর্ম্ম তজ্জন্য ব্রণ ও ক্ষতহীন হইয়া থাকে। মস্তকে সার্ষপ তৈল মর্দ্দন করিলে, শিরস্ত্বকের উদ্দীপনা হইয়া কেশ-মূলের দার্ঢ্য ও কেশের কোমলতা, মসৃণতা ও কৃষ্ণবর্ণত্ব বৃদ্ধি পায়। অন্য তৈলও ব্যবহার করা যাইতে পারে; বিশেষতঃ সুগন্ধিযুক্ত তৈল মর্দ্দন করিলে দৈহিক পুষ্টি ও মর্দ্দনে আনন্দ বোধ হয়।

---

* অধ্যাতে বা অধিক চলাচল করার পর পদদ্বয়ের স্নায়বিক উদ্দীপনায় স্পর্শশক্তি বৃদ্ধি পাইয়া পা জালা করে।

"সার্ষপং গন্ধতৈলঞ্চ যত্তৈলং পুষ্পবাসিতম্।
অন্যদ্রব্যযুতং তৈলং ন দূষ্যতি কদাচন॥"

ফলতঃ দুর্ব্বল দেহে পুষ্টিসাধনজন্য ও জীর্ণরোগে তৈল যেমন মহোপকারী, সংসারে তদ্রূপ পদার্থ অতি অল্পই আছে। পাঠকগণ সকলেই দেখিয়াছেন, যে সকল জীর্ণরোগ ইউরোপীয় চিকিৎসাপ্রণালীতে সহজে প্রশমিত হয় না, আয়ুর্ব্বেদোক্ত তৈল ঐ সকল রোগে মহোপকার সম্পাদন করে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, তৈল ও বসা দেহাভ্যন্তরে অগ্নি উৎপাদন করে; অতএব দৈহিক উষ্ণতা হ্রাস হইলে তৈল যেমন মহোপকারী, তরুণ ব্যাধিতে উহা তদ্রূপ অপকারী জানিতে হইবে। তরুণ ব্যাধিমাত্রেই দৈহিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় এবং তৈল মর্দ্দনে ঐ সকল পীড়ার সহায়তা করা হয়।

"নবজ্বরী অজীর্ণী চ নাভ্যক্তব্য কথঞ্চন।
তথা বিরিক্তো বান্তশ্চ নিরূঢ়ো যশ্চ মানবঃ॥"

নবজ্বরাক্রান্ত, অজীর্ণরোগী, এবং যাহাকে বিরেচন, বমন ও নিরূহ-বস্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহার অভ্যঙ্গ ক্রিয়া অকর্ত্তব্য।

পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ক্ষয়কাসরোগে যে ফুস্ফুসাদিতে গুটী সঞ্চিত হয়, তাহার একটী কারণ শোণিতে তৈলের অভাব। তৈল থাকিলে অণ্ডলালবৎ পদার্থ (Albumen) দ্রব থাকে, তদভাবে উহা ঘনীভূত (স্ত্যানীভূত) হইয়া গুটিকাকারে সঞ্চিত হয়। সেই জন্য ঐ সকল ব্যাধিতে তৈলের বিশেষ প্রয়োজন।

অভ্যঙ্গতৈলের যে কার্য্য, এস্থলে আমরা তাহারই উল্লেখ করিলাম। সেবনে তৈল কিপ্রকার উপকার করে, তাহা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় উক্ত হইল না। চিকিৎসাদর্শন।

শ্রীহরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এল্, এম্, এস্,

ঔষধপ্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শোধিত পারদ, শোধন করা গন্ধক এবং জারা সোনা এই দ্রব্য ত্রিতয়-যোগে স্বর্ণপর্পটী প্রস্তুত হয়। পারা শোধনের কথা ও গন্ধক শোধন-প্রণালী বলিয়াছি, সোনা জারিবার প্রক্রিয়া বলা হয় নাই, এই স্থলে সুবর্ণ-ভস্ম করিবার ক্রমপারম্পর্য্য বলা যাইতেছে।

স্বর্ণ।—ঔষধার্থে বিশুদ্ধ সুবর্ণ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যে স্বর্ণে অন্য কোন ধাতব পদার্থের ভাঁজ না থাকে, তাহাকে বিশুদ্ধ বা খাঁটি সোনা বলে। সোনা খাঁটী কি না তাহা চিনিবার একটী সহজ উপায় আছে,—প্রথমতঃ কষ্টি পাথরে সোনা কষিয়া লও। এমন কষিবে যেন সোনার দাগ গাঢ় ভাবে পড়ে। তারপর সেই সোনার দাগের উপর ষ্ট্রং নাইট্রিক্ এসিড্ ঢালিয়া দেও। যদি সোনার দাগ গাঢ় পীতবর্ণে পরিণত হয়, তাহা হইলে বুঝিবে সোনা খুব খাঁটী। যদি কষের দাগ কতক কতক উঠিয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সোনায় ভাঁজ আছে। আর যদি দাগ এককালে উঠিয়া যায় তাহা হইলে বুঝিবে যে যাহা কষিয়াছ তাহা সোনা নহে।

বিশুদ্ধ সুবর্ণ আগে শোধন করিয়া লইতে হয়। তারপর যথাবিধানে জারিয়া লইয়া ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। শোধন করিবার প্রণালী এইরূপ—আগে সোনার খুব পাতলা পাত করাইয়া লও। সূক্ষ্ম সূচের দ্বারা অনায়াসে ভেদ করা যায় এরূপভাবে পাত করাইবে। সেই পাত ২। ৩ অঙ্গুল খণ্ড করিয়া তাম্র শোধনের যে প্রকার প্রণালী বলিয়াছি, সেই প্রকার প্রণালীতে শোধন করিয়া লইবে। তারপর কাতুর দিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম করিয়া কাটিয়া লও।

জারণ প্রণালী।—পূর্ব্বোক্তরূপে শোধিত ও কর্ত্তিত সুবর্ণ ওজন করিয়া লইতে হইবে। ওজন করিয়া যতটুকু হয়, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ বিশুদ্ধ পারদ সহ দৃঢ় পাথরের খলে যে কোন অম্লদ্রব্য সহ মর্দ্দন করিতে হইবে। মাড়িতে মাড়িতে যখন সোনায় পারায় একীভূত হইয়া যাইবে, অঙ্গুল দিয়া টিপিয়া দেখিলে সোনার কুচি অনুভব করা যাইবে না, পারদের তারল্য ঘুচিয়া বেশ কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে এবং গোলক বাঁধা যাইবে, তখন

একীভূত পদার্থকে জল দিয়া বেশ করিয়া ধুইয়া লইবে। পাথরের খল এবং দণ্ড যতই দৃঢ় হউক না কেন, অম্লরসযোগে পারার সঙ্গে সোনা মাড়িতে মাড়িতে অবশ্যই কিয়দংশ ক্ষয় হইয়া যাইবে। সেই ক্ষয়িত অংশ দূর করিবার জন্য ধৌত করার প্রয়োজন। খলে পরিষ্কার জল ঢালিয়া দিয়া খল খানির চারিদিক ধুইয়া আনিয়া একীভূত গোলকটী আঙ্গুল দিয়া মর্দ্দন করিয়া উপরের ঘোলা জল আস্তে আস্তে ঢালিয়া ফেলিবে। ধোয়া শেষ হইলে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে।

এখন পারায় ও সোনায় ওজনে যত হইয়াছে, ততখানি চূর্ণীকৃত গন্ধক দিয়া কজ্জলী করিবে। কজ্জলী করা শেষ হইলে সেই কজ্জলী ঘৃত কুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া গোলক বাঁধিবে। সেই গোলক উপযুক্ত মূষা-পুটের মধ্যে রাখিয়া মূষাপুট সূত্রাদি দ্বারা বাঁধিয়া লইবে। মূষার সন্ধিস্থানে তরল পঙ্ক দিয়া তদুপরি ২। ১ অঙ্গুল প্রশস্ত নেকড়া বেষ্টন করিয়া দিবে। তারপর সমুদায় মূষাটীতে পাতলা কাদা মাখাইয়া দিবে। তদুপরি অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পুরু করিয়া ভাল আঠালে মাটি ছানিয়া লেপ দিবে। লেপ শুষ্ক হইলে গজপুটে ঘুঁটের আগুণে পোড়াইতে হইবে। গজপুটে পাক করিবার প্রণালী পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মূষা শীতল হইলে লেপ খুলিয়া মূষার অভ্যন্তর হইতে সোনা বাহির করিয়া লইবে। আবার পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে পারদগ্রস্ত করাইয়া কজ্জলী করতঃ গোলক বাঁধিয়া পোড়া দিবে। এইরূপে তিন চারিবার পাক করা হইলে স্বর্ণ চূর্ণ হইয়া আসিবে। যখন সুবর্ণ খুব্ গুঁড়া হইয়া আসিবে, তখন আর পারদ দ্বারা গ্রাস করান আবশ্যক করে না। সোনার তুল্য পরিমাণ পারা এবং দ্বিগুণ পরিমাণ গন্ধক দ্বারা কজ্জলী করিয়া সেই কজ্জলীর সহ সোনা মিশাইয়া লইবে। তৎপর ঘৃত কুমারীর রস যোগে গোলা বাঁধিয়া গজপুটে পাক করিলেই হইবে। এই-রূপ ক্রমানুসারে চৌদ্দবার পোড়া দিলে সুবর্ণ ভস্ম হইবে।

রসপর্পটীর ন্যায় স্বর্ণপর্পটীরও মৃদু, মন্দ এবং খরপাক নির্ণয় করিয়া তন্ত্রোক্ত উপদেশ অনুসারে ব্যবহার করিবে। ক্রমশঃ—

মাগুরা খুলনা। } কবিরাজ শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন।

তৈলপাক ও প্রয়োগপ্রণালী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কল্কপাকের পরেই কাথপাক। কেমন করিয়া কল্কপাক করিতে হয়, তাহা গতবারে বলিয়াছি, এবারে কাথপাকের বিষয় বলিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কল্কপাকের পর তৈলে কিঞ্চিৎ জল অবশেষ থাকিতে নামাইয়া তদবস্থায় কিছু দিবস রাখিয়া দিবে। কিন্তু ঠিক্ কত দিন তদবস্থায় রাখা উচিত, সে সম্বন্ধে বৈদ্যশাস্ত্রে নিশ্চিতরূপে কিছুই উপদেশ নাই। তবে অবশ্য কল্কপাকের পর কিছু অধিক দিবস তৈলটী পচাইয়া রাখিতে পারিলে যে তৈলের গুণ অধিক জন্মে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কল্কপাকের পর কাথপাক সম্বন্ধেও আবার ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ কেহ কেহ কল্কপাকের কিছু দিবস পরে তৈল হইতে কল্কদ্রব্য উত্তমরূপে ছাকিয়া তৎপরে কাথপাক দিয়া থাকেন, আবার কেহ বা কল্কদ্রব্য না ছাকিয়া তদবস্থাতেই কাথপাক করিয়া থাকেন। আমার এসম্বন্ধে যতদূর বিশ্বাস, তাহাতে এই উভয়বিধ মতের কোনটীই হানিজনক বলিয়া বোধ করি না। কেননা কল্কপাকের পর যদি তাহাতে কাথ দিয়া তৈলপাক করিতে অর্থাৎ খুন্তী দিয়া নাড়িতে চাড়িতে বিশেষ কোনরূপ কষ্ট বোধ না হয়, তবে সে অবস্থায় তৈলগর্ভে কল্কদ্রব্য রাখিয়া তাহাতে কাথ দিয়া পাক করিতে আর হানি কি আছে? কিন্তু যদি তৈলগর্ভে কল্কদ্রব্য থাকাতে তাহাতে কাথ দিয়া তৈল নাড়াচাড়ার অসুবিধা বোধ হয়, তবে অবশ্য সেস্থলে অগ্রেই কল্কদ্রব্য উত্তমরূপে ছাকিয়া লইয়া পরে কাথ পাককরা আবশ্যক। ফলতঃ এসম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবেক যে, কল্কদ্রব্য গুলি যত অধিককাল তৈলে অবস্থিতি করিতে পারে কিংবা তৈলের সহিত একত্রে পাক হয়, ততই মঙ্গলের কথা বলিয়া আমার বিশ্বাস। কিন্তু তাহা বলিয়া দুগ্ধাদি পাকের সময় যেন কেহ কল্কদ্রব্য তৈলে রাখিয়া দুগ্ধপাক না করেন।

কাথপাকের সাধারণ নিয়ম এই যে, কাথ্যদ্রব্য যে পরিমাণে লইতে হয়, (গুলঞ্চাদি যে দ্রব্যের কাথ করিতে হয়) তাহার চারিগুণ জলের সহিত পাক করিয়া চতুর্থাংশ অর্থাৎ সিকিভাগ অবশেষ থাকিতে নামাইয় ছাকিয়া

লইয়া পরে সেই কাথের সহিত তৈলঘৃত পাক করিবে। পরন্তু এইকাথের পরিমাণ যত হইবে, ঘৃত বা তৈলের পরিমাণ তাহার চতুর্থাংশ অর্থাৎ সিকিভাগ হওয়া আবশ্যক। বিষয়টী আরও কিছু পরিষ্কারকরিয়া বলা যাউক। মনে কর কোনও তৈলে বা ঘৃতে গুলঞ্চের কাথ দিতে হইবেক, অতএব সেস্থলে যদি চারিসের তৈল লওয়া হয়, তবে গুলঞ্চের পরিমাণ যোলসের মাত্রায় লইয়া গুলঞ্চ গুলি উত্তমরূপে কুটিয়া উক্ত কাথ্যদ্রব্য অর্থাৎ গুলঞ্চের চতুর্গুণ চৌষট্টি সের জলের সহিত একত্রে সুসিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অর্থাৎ ১৬ সের শেষ থাকিতে নামাইয়া পরে সেই কাথ তৈলে প্রদান করিয়া পাক করিবে। সুতরাং পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কাথের পরিমাণ যত, ঘৃত তৈলের মাত্রা তাহার সিকি হইবেক, অতএব এস্থলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইল, কেননা যোলশের কাথের মাত্রা হইল, এদিকে তৈলের মাত্রাও ঠিক্ তাহার চতুর্থাংশ অর্থাৎ চারিসের লওয়া হইয়াছে।

কিন্তু কাথ্যদ্রব্য যে সর্ব্বত্রই চারিগুণ জলে পাক করিতে হইবেক, এমন নহে, যেহেতু কাথ্যদ্রব্যের কঠিনতার তারতম্যানুসারে জলের ন্যূনাধিক্য হওয়া উচিত। অর্থাৎ কাথ্যদ্রব্য যদি নরম হয়, তবে সেই স্থলে তাহার চারিগুণ জল দিয়া পাক করা উচিত, নচেৎ কাথ্যদ্রব্য কঠিন বা শুষ্ক হইলে সেস্থলে আর চারিগুণ জলে পাক করা ঘটে না। কাজেই সেই স্থলে জলের মাত্রা অবশ্যই অধিক দেওয়া আবশ্যক। যাহা হউক, কাথ্যদ্রব্য কোমল বা অত্যন্ত কঠিন হইলে তাহাতে জলের মাত্রার কিরূপ তারতম্য হওয়া আবশ্যক, তাহা আগামী বারে বলিব। ফলতঃ তৈল ঘৃত পাক সম্বন্ধে আমাদের এখনও অনেক বলিবার আছে। ক্রমশঃ—

কলিকাতা।
চৈত্র। } কবিরাজ শ্রীজগদ্বন্ধু সেন গুপ্ত।

পুরাতন প্লীহারোগীর চিকিৎসা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্লীহারোগীর একটী প্রধান উপসর্গ রক্তস্রাব। এই রক্ত সচরাচর দাঁত ও নাসিকা দিয়া স্রাব হয়। পুরাতন প্লীহারোগে রোগীর রক্তের অত্যন্ত

হীনাবস্থা ঘটিয়া থাকে। রক্তের লোহিত কণিকাসকল অত্যন্ত কমিয়া যায়। এই লোহিত কণিকা গুলিই রক্তের প্রধান উপকরণ। এই গুলি হইতেই দেহের পুষ্টিসাধন হয়। সুতরাং এই সকল কণিকা কম পড়াতে প্লীহারোগীর শরীর এরূপ রক্তহীন পাণ্ডুবর্ণ দেখায় এবং সমস্ত শরীর পোষণাভাবে ক্ষীণ ও শিথিল হইতে থাকে। দেহস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৈশিকা বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা বা ধমনীর ভিত্তি বা আবরণ সকল পোষণাভাবে অত্যন্ত যাতনা হয়, সুতরাং তাহাদের গাত্র ভেদ করিয়া রক্ত নির্গত হইতে থাকে। দাঁতের মাড়ী ও নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির শিরা সকল ভেদ করিয়া রক্ত পড়িতে থাকে। এই রক্তস্রাব সময় সময় অত্যন্ত অধিক হইতে থাকে। এত অধিক হইতে থাকে যে, রোগী ক্ষণকাল মধ্যেই অত্যন্ত দুর্ব্বল ও মুমূর্ষা-বস্থাপন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু এইরূপ রক্তস্রাবে দোষ ও গুণের ভাগ দুইই আছে। অতিরিক্ত রক্তস্রাব প্লীহারোগের চরমাবস্থায় ঘটিয়া থাকে। রোগের খুব বাড়াবাড়ী না হইলে আর রক্তস্রাব হয় না। রক্তস্রাব প্লীহা রোগীর পক্ষে একরূপ চূড়ান্ত মীমাংসাস্থল। হয়ত রোগী এই রক্তস্রাবের পরই মারা পড়িল, নচেৎ রক্তপড়ার পর হইতে ক্রমে ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল। অনেক প্লীহা রোগীর সম্বন্ধে এমত বলা যাইতে পারে যে, অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলেই রোগ ভয়ানক কঠিন আকার ধারণ করিল। কিন্তু আবার অনেক স্থলে ইহাকে আরোগ্যের চিহ্নও বলা যাইতে পারে। আমরা অনেক রোগীর বিষয় জানি—যাহাদের রক্তস্রাবের পর হইতেই প্লীহা ক্রমে ক্রমে ছোট হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং পরিশেষে রোগটী অতি সত্বর সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছে। প্লীহারোগীর প্লীহাতে অত্যন্ত অধিক রক্ত জমিয়া উহার স্থায়ী কনজেস্‌সন্ বা রক্তাধিক্য জন্মে। রোগীর কোন স্থান দিয়া শরীরের থানিকটা রক্ত বাহির হইয়া গেলে প্লীহার রক্তাধিক্যতা কম পড়ে এবং তাহাতেই প্লীহা ক্ষুদ্র হইয়া যায়। সাধারণ রক্তাধিক্য রোগে রক্তমোক্ষণ করিলে যে ফল হয়, প্লীহা রোগীর রক্তস্রাব হইয়া সময় সময় আপনা হইতেই সেই ফল হয়। প্লীহা সচরাচর অত্যন্ত বড় না হইলে রক্তস্রাব হয় না। কিন্তু যদি এইরূপ শুভ উদ্দেশ্য সাধনার্থ স্বভাবতঃ আপনা আপনিই প্লীহারোগীর রক্তস্রাব হয় এবং সময় সময় তাহা হইতেই রোগটী আরাম হইয়া যায়, তত্রাচ প্লীহারোগীর রক্তস্রাবকে বড়

সামান্য ব্যাপার জ্ঞান করা উচিত নহে। অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলেই চিকিৎসককে বুঝিতে হইবে রোগের যতদূর বৃদ্ধি হইবার তাহা হইয়াছে এবং রোগীর প্রাণ সংশয়, অতএব যতদূর সাধ্য উক্ত রক্তস্রাব নিবারণার্থ চিকিৎসকের যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ রক্তস্রাবের চিকিৎসা সাধারণ রক্তস্রাবের চিকিৎসার ন্যায় করিতে হইবে। নানাবিধ সংকোচক ঔষধ রোগীকে খাওয়াইতে হইবে। তন্মধ্যে গ্যালিক এসিড্ শ্রেষ্ঠ। টর্‌পেন-টাইন এবং আর্‌গট্‌ও কম উপকার করে না। টীংচার হ্যামামেলিস্ ও হ্যাজেলিন মন্দ ঔষধ নহে। গ্যালিক এসিড্, টর্‌পেনটাইন ও ডিজিট্যালিস্ একত্রে মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে কি আর রক্ত বন্ধ হয় না? এবং এই মিক্‌চারে যদি একটু ষ্ট্রীক্‌নাইন্ মিশ্রিত করিয়া দিলে তবেত আর কথাই নাই। টীংফেরিপার ক্লোরাইড্ রোগের অবস্থানুসারে ১০। ১৫। ২০ ফোঁটা মাত্রায় দুই ঘণ্টা তিন ঘণ্টান্তর খাওয়াইতে পারা যায়। গ্যালিক্ এসিড্, টীংচার অহিফেন এবং ডিজিট্যালিস্ একত্র মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে রক্তপড়া নিবারণ হয় এবং রোগীও সুস্থ হয়।

গ্যালিক এসিড্	১০ গ্রেণ
টীং অহিফেন	১০ মিনিম
টীং ডিজিট্যালিস্	১০ মিনিম
জল	১ আং

মিশ্রিত করিয়া ১ মাত্রা চারি ঘণ্টা, তিন ঘণ্টান্তর প্রয়োগ।

স্থানীয় ঔষধ প্রয়োগে বিলক্ষণ উপকার করে। দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়িলে নানাপ্রকার কষায় ঔষধের জলের কুলি করিলে উপকার হয়। সকল প্রকার কষ জল অপেক্ষা আমাদিগের দেশীয় বাবলার ছালের পাঁচন সহজ প্রাপ্য এবং উপকারী। কতকগুলি টাট্‌কা বাবলার ছাল খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া লইয়া জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া বেশ করিয়া ক্বাথ বাহির করিবে। ঐ ক্বাথে গুড়া ফট্‌কিরি মিসাইয়া (১ ছটাক ১০ গ্রেণ) ঐ জলে কুলি করিবে। ট্যানিক্ এসিড্ ও ফট্‌কিরি চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত ঐ গুড়া ঔষধ দাঁতের গোড়ায় টিপিয়া দিলে বা উহার মাজন ব্যবহার করিলে দাঁত দিয়া রক্তস্রাব ঝটিতি নিবারণ হয়। টীংচার ফেরিপার্ ক্লোরাইড্ একটু তুলিতে করিয়া দাঁতের মাড়িতে লাগাইয়া দিলে যেমন

কঠিন রক্ত পড়া হউক না কেন অতি সত্বর নিবারণ হয়। নাসিকা দ্বার দিয়া রক্তস্রাব হইলে অন্যান্য অবস্থায় নাক দিয়া রক্ত পড়িলে যে যে প্রথা অবলম্বন করিতে হয়, ইহাতেও তাহাই অবলম্বন করা উচিত। রোগীকে স্থিরভাবে শোয়াইয়া রাখিবে। ঘাড়ের লতায় ও পৃষ্ঠবংশে জলের ছাট দিলে রক্তপড়া নিবারণ হইতে পারে। শীতল জলের নাশ গ্রহণ করিলে রক্ত বন্ধ হয়। নানাবিধ কষায় ঔষধ যথা ফট্‌কিরি, ট্যানিক এসিড্ প্রভৃতি জলে গুলিয়া ঐ জলের নাস গ্রহণ করাইবে। এই সকল উপায় দ্বারা প্রতিকার না হইলে নাসিকার ছিদ্র "প্লগ্" করিবে। প্লগ্ করা কাহাকে কহে তাহা বলিতেছি। ছোট পাতলা ন্যাকড়ার টুকরা জলে ভিজাইয়া একটী প্রোব দ্বারা নাসিকার ছিদ্রের ভিতর উর্দ্ধদিকে বেশ করিয়া যুতবরাত করিয়া (যেন কোন আঘাত না লাগে) ঠেলিয়া দিবে। পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ন্যাকড়ার কানিটী প্রবিষ্ট করাইয়া নাসিকা দ্বার বন্ধ করিয়া দিবে। পরে বেস হইয়া রক্ত পড়া নিবারণ হইলে ঐ ন্যাকড়া বাহির করিয়া দিবে। বেলক্‌স্ সাউণ্ড নামক অস্ত্র দ্বারা নাসিকার পশ্চাদ্দিক দিয়া (অর্থাৎ টাকরার নিকটের ছিদ্র দিয়া) নাসিকার ছিদ্র প্লগ করা যাইতে পারে।

এইরূপ নাসিকা প্লগ করিলে যেমন রক্তপড়া হউক না কেন অতি সত্বর নিবারণ হয়। সময় সময় এইরূপ রক্তস্রাব নিবারণ করা একরূপ অসাধ্য হইয়া উঠে। সে সকল স্থলে রক্ত ঝরিয়া ঝরিয়া আপনা আপনিই থাকিয়া যায়। অনেক প্লীহা রোগীর দন্তমাড়ী শিথিল হয় এবং সামান্য কারণেই বিস্তর রক্তস্রাব হয়। যাহা হউক এইরূপ রক্তস্রাব বশতঃ রোগী দুর্ব্বল হইলে খুব পুষ্টিকর মাংসের যুষ প্রভৃতি খাদ্য এবং পোর্ট ওয়াইন খাওয়াইবে। রক্তস্রাবের পর রোগী একবারে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তখন রোগীকে পোর্ট ওয়াইন্ ব্রথ প্রভৃতি খাওয়াইয়া সতেজ করিয়া তাহার পর টিংচার ফেরিপার ক্লোরাইড্ বা ফেরিসলফেটিস্ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া খাওয়াইবে।

প্লীহা রোগীর সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর উপসর্গ মুখে ঘা হওয়া। এইরূপ মুখে ঘা হইলে প্রায়ই চিকিৎসককে আশা ভরসা ছাড়িয়া দিতে হয়। প্লীহারোগ জনিত মুখে ক্ষত দুই প্রকারের হইয়া থাকে। একরূপ ক্ষত দন্তমাড়িতে

আরম্ভ হয়, দাঁতের গোড়ায় ছোট ছোট ঘা হইয়া ক্রমেই ক্ষত বিস্তৃত হইতে থাকে, পরে মাড়ির হাড় শুদ্ধ পচিয়া যায় এবং দাঁতগুলি পড়িয়া যায়। এইরূপ ক্ষত আরম্ভ হইতেই চিকিৎসা করিলে প্রায়ই আরোগ্য হইয়া যায়, কিন্তু ক্ষত বৃদ্ধি হইতে দিলে আর রক্ষা নাই, ক্ষত সারিলেও দাঁত পড়িয়া যায় এবং মাড়ির হাড়ের "নিক্রোসিস্" হয় অর্থাৎ হাড় পচিয়া যায় এবং ওষ্ঠ খসিয়া পড়ে। ক্ষত উপরদিকে নাসিকা এবং নিম্নে থুতনি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এবং চিবুকের হাড় পচিয়া বাহির হইয়া পড়ে। আর একরূপ ক্ষত গালে আরম্ভ হয়। এই ক্ষত সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক এবং ইহা অতি শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। এই ক্ষতকে "গ্যাংগ্রিন্" বা দুষ্ট পচা ক্ষত বলা যায়। সর্ব্ব প্রথমে গালের উপরিভাগ চিকৃচিক্ করে এবং ফুলিয়া উঠে। গালের ভিতরদিকে একটী শক্ত ফুলা দেখা দেয়। পরে এই এক দিন মধ্যেই দেখা যায় গাল পচিয়া উঠিয়াছে এবং ফুটা হইয়া গিয়াছে। সমস্ত গালের মাংস পচিয়া ভস্মের ন্যায় বর্ণ ধারণ করে এবং উহাতে ভয়ানক দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। সঙ্গে সঙ্গে জ্বর (ইরিটেটিভ্ ফিবার) আরম্ভ হয় এবং রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই গালের ক্ষত ক্রমে বিস্তৃত হইয়া এক দিকের মুখের সমস্ত স্থান খসিয়া পড়িয়া যায়, চক্ষু ও নাসিকা ও হনু সমস্ত পচিয়া পড়িয়া যায়। এই অবস্থা হইতে প্রায় রোগীই উত্তীর্ণ হয় না। তবে দুই একজন বিনা চিকিৎসাতেও আপনা আপনি বাঁচিয়া যায়। যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের মুখ চিরদিনের জন্য বিকৃত হইয়া যায় এবং অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দেখায়। অনেক প্লীহা রোগী আরোগ্যমুখ হইয়াও মুখে ক্ষত হইয়া মারা যায়। এই গালে ঘা অনেক স্থলে হঠাৎ আরম্ভ হয়। দন্ত-মাড়িতে ক্ষত দেখা দিলে নিম্নলিখিত ঔষধ খাইতে দিবে। যথাঃ—

ক্লেরেট অব্ পোটাস্	৫—১০ গ্রেণ।
টীংচারফেরি পারক্লোরাইড্	১০—১৫ মিনিম।
ইন্‌ফিউসন্ কোয়াসিয়া	—১ আং।

একত্র মিশ্রিত করিয়া ১ মাত্রা ৩ তিন ঘণ্টান্তর ৪ চারি ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে এবং ক্ষতস্থানে গ্লিসেরিণ অব্ বোরাকস্ নামক ঔষধ তুলি দ্বারা প্রয়োগ করিবে। ক্লেরেট্ অব্ পোটাসের কুলি অতি উপকারক। কন্‌ডিস্ ফ্লুইড্ নামক ঔষধ দিয়া ঘা ধৌত করা বিধেয়। ক্ষত আরম্ভ হইতেই

এইরূপ চিকিৎসা করিলে প্রায়ই ক্ষত আরোগ্য হইয়া যায়। যদি কোন পচা হাড় বাহির হইয়া পড়ে, তবে তাহা শীঘ্র টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিবে না। কারণ এইরূপ জোর করিয়া পচা হাড় টানিয়া বাহির করিতে গেলে ভয়ানক রক্তস্রাব হইবার সম্ভাবনা; তবে হাড় খুব্ শিথিল হইলে তখন ফর্‌সেপ্ দিয়া টানিয়া বাহির করিয়া দিবে। ক্ষতে বেশী পচা মাংস জমিলে অল্প ডাইলুটেড্ নাইট্রিকএসিড ক্ষতে প্রয়োগ করিলে ক্ষত পরিস্কার হইয়া যাইবে। পরন্তু এইরূপ মুখে ক্ষতরোগে ক্লোরেট্ অব্ পোটাসিয়মের কুলি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। (ক্লোরেট্ অব্ পোটাসিয়ম ১ ড্রাম জল ৮ আং)। গালে ঘা হইবার উপক্রম হইবামাত্র ঐ ক্ষতের চতুর্দ্দিকে ষ্ট্রং নাইট্রীক্ এসিড্ লাগাইয়া দিয়া পোড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ক্ষতের পরিমাণ আর তত বৃদ্ধি হইবে না। কিন্তু অনেক স্থলে সমস্ত গাল বহুদূর লইয়া একবারে ধাঁ করিয়া পচিয়া খসিয়া যায়। এইরূপ ঘা হইলে কার্ব্বলিক লোসন্ কন্‌ডিস্ ফ্লুইড্ প্রভৃতির দ্বারা ক্ষত ধৌত করিয়া দিবে। নিম্বপত্র ও কয়লা একত্রে বাঁটিয়া তাহার পোল্‌টিস্ প্রয়োগ করিবে। লবণ মিশ্রিত জল দিয়া ক্ষত ধৌত করিলে উপকার হয়। কন্‌ডিস্ ফ্লুইডে দুর্গন্ধ নিবারণ করে। খাইবার ঔষধের মধ্যে বলকারী ঔষধ সমস্ত খাওয়াইবে। দিবারাত্র পুষ্টিকর খাদ্য এবং ঔষধ খাওয়াইবে। ব্রাণ্ডি, পোর্ট ওয়াইন্, দুগ্ধ এবং মাংসের কাথ অল্প অল্প করিয়া দিবারাত্র খাওয়াইবে। এইরূপ ক্ষতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণা নিবারণার্থ অহিফেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রাত্রে ডোভার্স পাউডার নামক গুঁড়া ঔষধি ৫—১০ গ্রেণ মাত্রায় এক ডোজ খাওয়াইবে। নিম্নলিখিত প্রেস্‌ক্রিপসন মত ঔষধ খাওয়াইলে অত্যন্ত উপকার হয়। যথাঃ—

পোর্ট ওয়াইন্	২ ড্রাম
টীং ফেরিপার ক্লোরাইড্	৫ ফোটা
ক্লোরেট্ অব্ পোটাসিয়ম্	৫ গ্রেণ
জল	১ আং

একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রতি দুই ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে।

ক্রমশঃ—

কয়েকটী ঔষধের গুণ ও প্রয়োগ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সূতিকাক্ষেপ রোগে সাইট্রেট্ অব্ ক্যাফিন্ (Caffeine) সম্প্রতি ফিজি দ্বীপের ডাক্তার বোলটন্ কর্নি কোন কোন সূতিকাক্ষেপ (Puerperal convulsion) রোগে সাইট্রেট অব্ ক্যাফিন্ নামক ঔষধ বিশেষ উপকারী বলিয়াছেন। তিনি ১৮৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের "প্রাক্টিসনার" নামক পত্রিকায় সূতিকাক্ষেপ রোগে সাইট্রেট্ অব্ ক্যাফিনের (Caffeine) ব্যবহার সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

সূতিকাক্ষেপ নামক রোগ সচরাচর দুই প্রকারের হইয়া থাকে। (১) মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য বশতঃ ইউরিয়া প্রভৃতি পদার্থ রোগীর রক্তে জমিয়া খেঁচুনি উৎপন্ন করে। (২) কতকগুলি সূতিকাক্ষেপ এরূপ ধরণের আছে, যাহাতে মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য বর্ত্তমান থাকে না, কিন্তু অন্যান্য কারণ বশতঃ হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত প্রকারের সূতিকাক্ষেপ রোগে ডাক্তার কর্নি সাইট্রেট্ অব্ ক্যাফিন ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন; তবে প্রথম প্রকারের সূতিকাক্ষেপ রোগে উক্ত ঔষধ উপকার করে কি না, তাহা তিনি বলিতে পারেন না, তবে সম্ভবতঃ উহাতেও উপকার হইতে পারে। সূতিকাক্ষেপ রোগে সচরাচর রক্তমোক্ষণ, ক্লোরফরম্ প্রয়োগ, মরফাইন, ব্রোমাইড্ অব্ পোটাসিয়ম্, ক্লোরাল প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য বশতঃ সূতিকাক্ষেপ রোগে পাইল কার্পিন নামক ঔষধ ঘর্ম্মাকারকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং অনেক স্থলে উপকারীও হইয়াছে। কিন্তু যে সকল সূতিকাক্ষেপ রোগে মূত্রযন্ত্রের কোন ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না, অথচ যে সকল সূতিকাক্ষেপ রোগ কোন স্নায়বিক কারণবশতঃ হইয়াছে, সেই সকল রোগে সাইট্রেট্ ক্যাফিন উপকারী। এই সকল রোগীতে মাথাধরা, মাথাঘুরণী, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে।

কোন একটী ২৩ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোকের ঠিক পূর্ণ সময়ে ২১ শে আগষ্ট তারিখে প্রাতে ৭ সাত ঘটিকার সময় একটী সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। উক্ত প্রসূতির সন্তান প্রসব করিতে কোন কষ্ট হয় নাই। তিন

ঘণ্টাকাল মধ্যেই প্রসব ক্রিয়া সমাপ্ত হয় এবং নিয়মিত সময়ে ফুল পড়িয়া যায়।

২১ শে আগষ্ট তারিখে রোগিণী প্রসবের পর জরায়ু সঙ্কোচনজনিত বেদনা (ভাদালের ব্যাথায়) কিছু কাতর হয়। দুই প্রহরের সময় রোগিণী প্রকাশ করে যে, তাহার মাথা ধরিয়াছে। এই মাথার বেদনাক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রাত্রি নয়টার সময় রোগিণী ক্রমাগত বোমি করে এবং রাত্রি এগারটার সময় রোগিণীর সূতিকাক্ষেপ রোগ (কন্‌ভলসন্) উপস্থিত হয়। রোগিণীর মৃগিরোগের ন্যায় খেঁচুনি হইতে থাকে এবং অচৈতন্য হয়। এইরূপ খেঁচুনি পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হইয়া দশঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। এইকাল মধ্যে উক্ত রোগিণীর ডাক্তার তাঁহাকে অর্দ্ধ আউন্স পোটাসিয়ম্ ব্রোমাইড্, সিকি আউন্স টিংচার হাইওসিয়ামস্ এবং ৪০ গ্রেণ ক্লোরাল হাইড্রেট্ সেবন করান। অল্পমাত্রায় ক্লোরফরম্‌ও শুখান হইয়াছিল।

রোগিণীর পদদ্বয়ে বা মুখে ফুলা ছিল না, অথবা তাহার মূত্রে এল্‌ব্যুমেন নামক পদার্থ পাওয়া যায় নাই। মূত্রযন্ত্রের কোন পীড়ার চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল না।

পরে তিন রাত্রি এবং দুই দিন পর্য্যন্ত রোগিণী গাঢ় অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়া থাকে। এই সময়ে ডাক্তার বোল্‌টন্ কর্নি উক্ত রোগিণীর চিকিৎসার্থ আহূত হন। এবং তাহার পর তিনিই উক্ত রোগিণীর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। রোগিণী অচেতন হইয়াছিল কিন্তু আহারার্থ তাহার মুখে যাহা ঢালিয়া দেওয়া হইত, তাহাই সে গিলিতে পারিত। তাহার ব্ল্যাডার (মূত্রাধার) অসাড় হইয়া যায়, এবং আপনা আপনি মূত্র নির্গত হইতে থাকে। দৈহিক উত্তাপ ১০১° ৫° বরাবর ছিল। নাড়ী মিনিটে ৩২ হইতে ১৩২ বার স্পন্দিত হইত। সময়ে সময়ে রোগীর মুখ রক্তশূন্য ও নীলবর্ণ হইয়া যাইত। শ্বাসপ্রশ্বাস মিনিটে প্রায়শঃ ত্রিশবার হইত। সময়ে সময়ে বেশী হইত। রোগিণী কাশিয়া কাশ তুলিত না, এজন্য তাহার শ্বাস নালীতে শ্লেষ্মা সঞ্চয় হইয়াছিল। কিন্তু এত অধিক সঞ্চিত হইয়াছিল না যাহাতে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত হইতে পারে। রোগিণীর ঔষধ ও পথ্য গিলিয়া খাইবার শক্তি বরাবর অব্যাহত ছিল। এবং বিস্কুট, দুগ্ধপ্রভৃতি মধ্যে মধ্যে খাইতে দেওয়া যাইত। কিন্তু রোগিণীর অবস্থা ক্রমেই

খারাপ হইতে লাগিল। এবং ২৩শে তারিখের বৈকালে রোগীর অবস্থা সাতিশয় ভীতিব্যঞ্জক হইয়া উঠিল। বামদিগের বাহু ও পদের পক্ষাঘাত উপস্থিত হইল।• এবং রোগিণী দক্ষিণ দিকের হস্ত দ্বারা বিছানা খুঁটিতে আরম্ভ করিল। বামদিগের সমস্ত অঙ্গের পক্ষাঘাত হইল, ঐদিকের ওষ্ঠের কোণ ঝুলিয়া পড়িল এবং ঐদিকের চক্ষের টোসিস্ উপস্থিত হইল (ঐদিকের চক্ষের পাতা ঝুলিয়া পড়িল সুতরাং ঐ চোখ মেলিতে অসমর্থ হইল)। রোগীর দন্ত ও জিহ্বা শুষ্ক এবং উহাতে কাল কাল ময়লা দেখা দিল। চক্ষের কণিনিকা স্পন্দনহীন হইল, রোগীর চক্ষুর চাউনি দৃষ্টে বোধ হইল যেন মৃত্যুর আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা নাই। কপালে, ওষ্ঠে এবং হস্তে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা গেল; রোগিণী অসাড়, অচৈতন্য, স্থিরদৃষ্টি হইল। নাড়ী ১১০, শ্বাস ৩২ হইতে ৩৬। হৃদয়ের ক্রিয়া দুর্ব্বল, উত্তাপ সেই ১০১°৫। প্রস্রাব আপনা আপনি নির্গত হইয়া বিছানা শিক্ত হইতেছিল। রোগীর মুখশ্রী নীলিমা বা পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। এইরূপ অবস্থায় ডাক্তার কর্ণি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিন গ্রেণ সাইট্রেট্ অব্ক্যাফিন, আড়াই গ্রেণ সোডিয়ম্ স্যালিসিলেট্ ও ১০ ফোটা চোয়ান জল সহিত গলাইয়া ঐ ঔষধের ইন্জেক্‌সন প্রদান করেন। তারপর আর ছয় গ্রেণ সাইট্রেট্ অব্ ক্যাফিন রোগিনীকে খাইতেও দেন এবং পরে প্রতি দুই ঘণ্টান্তর ২ গ্রেণ মাত্রায় সাইট্রেট্ অব্ ক্যাফিন্ খাইতে দেন। এইরূপ ২ গ্রেণ মাত্রায় ৬ বার দেওয়া হইয়াছিল। তারপর রোগিণীর অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু ভাল বোধ হইল। পক্ষাঘাতের লক্ষণ অনেক কম পড়িল এবং ২৪শে আগষ্ট প্রাতে হইতে রোগিণীর অল্প অল্প চেতন হইতে লাগিল। ২৪শে আগষ্ট ১০ টার সময় নাড়ী ৮২ বার হইল এবং উহা কঠিন ও পূর্ণ বোধ হইল, শ্বাস ২৬ বার পড়িতে লাগিল। শারীরিক উত্তাপ ১০১°৫ পূর্ব্ববৎ। এই সময় ক্যাফিন্ দেওয়া বন্ধ করা গেল। বেলা তিনটার সময় রোগিণীর অবস্থা কিছু খারাপ হয় কিন্তু আড়াই গ্রেণ মাত্রায় দুই ঘণ্টান্তর ক্যাফিন্ প্রয়োগ আবার রোগিণীর অবস্থা ভাল হইতে আরম্ভ হয়। ২৫শে আগষ্ট রাত্রি ১ টার সময় রোগিণীর চক্ষু পরিষ্কার দেখা গেল। জ্ঞান হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং অন্যান্য অবস্থাও ভাল দেখা গেল। প্রাতে ৬ টার সময় রোগিণীর বেশ চেতনা হইল। হাঁ কি না প্রভৃতি বলিতে পারিল না। নাড়ীর

স্পন্দন ১১০, উত্তাপ ১০৩৮, লোকিয়ার স্রাব বন্ধ, তলপেটে অল্প ব্যথা। গরম জলের স্বেদ ও কুইনাইন ব্যবস্থা হইল। ১৫ গ্রেণ কুইনাইন তৎক্ষণাৎ খাওয়ান হইল। ২৬শে তারিখে রোগিণী বেশ কথা কহিতে পারিল, উত্তাপ ১০৪°২, নাড়ী ১৩০। কুইনাইন ১৫ গ্রেণ দেওয়া হইল। গরম জল দিয়া রোগীর সমস্ত গাত্র মোছাইয়া দেওয়া হইল। ক্যাফিন্ বন্ধ করা গেল। তলপেটে গরম স্বেদ দেওয়া গেল।

২৭শে আগষ্ট প্রাতে লোকিয়া স্রাব যাহা বন্ধ হইয়াছিল, তাহা স্বাভাবিক হইল। উত্তাপ ৯৮০১ হইল এবং নাড়ী ৮৮ বার স্পন্দিত হইতে লাগিল। এরপর হইতে রোগিণী দিন দিন সুস্থ হইতে লাগিল। ইহার পরও এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত শিশুকে রোগিণীর স্তনপান করিতে দেওয়া হয় নাই। তারপর স্তন খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। একমাস পর্য্যন্ত রোগিণীকে ব্রোমাইড্ অব্ আয়রণ এবং ষ্ট্রীক্নাইন্ ঔষধ টনিকরূপে খাইতে দেওয়া হইয়াছিল।

এই রোগিণীতে ক্যাফিন্ অতি আশ্চর্য্যজনকরূপে উপকারী হইয়াছিল। এবং ক্যাফিন্ বন্ধ করার পর যখন পুনর্ব্বার রোগিণীর অবস্থা খারাপ হইতে থাকে, তখন আবার কাফিন্ প্রয়োগ মাত্র উপকার হইয়াছিল। কাফিন্ হৃদয়ের উত্তেজকরূপে পূর্ব্ব হইতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই রোগিণীতে কাফিনের দ্বারা অচৈতন্যাবস্থা দূরীভূত হইয়াছিল এবং শ্বাসপ্রশ্বাস ও হৃদয়ের ক্রিয়া সতেজ হইয়াছিল। ডাক্তার কর্নি অনুমান করেন যে, কাফিন্ সম্ভবতঃ কশেরুকা মজ্জার ও মাস্তিষ্কীয় স্নায়ু কেন্দ্র সকলে রক্ত চালনা করিয়া উপকারী হয়। বর্ণিত রোগিণীকে বেশী মাত্রায় ব্রোমাইড্ ও ক্লোরাল খাওয়ান হইয়াছিল। এবং সম্ভবতঃ ঐ কারণবশতঃ উহার মস্তিষ্ক ও কশেরুকা মজ্জা রক্তহীন হইয়াছিল এবং হৃদয়ও দুর্ব্বল হইয়াছিল। ক্রমশঃ—

পরীক্ষিতমুষ্টিযোগ ঔষধ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১৬। বক্ষস্থলে সর্দ্দি বসিয়া শুষ্ক কাসিসহ হাঁপানিভাব হইলে তাহার প্রতীকারক পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ—দশমূল পাঁচনের যাবৎ দ্রব্য দুই তোলা গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে আয়ুর্ব্বেদীয় প্রণালী ক্রমে বত্রিশ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাবশেষ (আটতোলা) থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইয়া সেই ক্বাথ অল্প একটু একটু উষ্ণ থাকিতে ও তৎসহ, কমলা, পাতী, অথবা কাগজি লেবুর রস একতোলা ও শ্বেতশর্করা ২ দুই তোলা মিশ্রিত করিয়া প্রাতে সেবন করিলে তিন দিনেই প্রতীকার বোধ হয়। সর্দ্দি বসিয়া শুষ্ক কাসিসহ হাঁপানি ভাবের সহিত উদরাময় অর্থাৎ উদরে, বায়ু বিষ্টম্ভ ও মলের তারল্য থাকিলে দশমূলের ক্বাথের পরিবর্ত্তে ২ তোলা পরিস্কৃত মিছরি চারিতোলা জলে ভিজাইয়া গলিয়া যাইবার পরে সেই জলের সহিত কথিত লেবু সকলের মধ্যে এক লেবুর রস এক তোলা ও মরিচ চূর্ণ একতোলা ও লবঙ্গচূর্ণ একতোলা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে উদরাময় সহ বসা শ্লেষ্মা তরল হইয়া উঠিয়া পড়ে।

এই প্রকার রোগীর আহারের সময় পুরাতন তেঁতুলের মিষ্ট অম্বল বিশেষ উপকারী, সেই অম্বলে (সাধারণ পাকপ্রণালী অনুসারে) সার্ষপতৈল ও আস্তসার্ষপ ফোড়ন দেওয়া না হয়, কেবল মাত্র অল্প ঘৃত সম্ভারিত করা আবশ্যক।

১৭। চক্ষু রক্তবর্ণ, অল্প বা অধিক বেদনাযুক্ত, স্ফীত ও তৎসহ মাথার যন্ত্রণা থাকিলে—প্রথমতঃ প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পরেই, ত্রিফলার জলের দ্বারা (হরীতকী, আমলকী, বহেড়া দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক চক্ষু ধৌতের পূর্ব্বদিন অর্দ্ধসের জলে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল ছাকিয়া লইয়া) চক্ষু ধৌত করা আবশ্যক। তৎপরে কাঁচা আমলকী বীজ রহিত করিয়া উত্তমরূপে পেষণ করতঃ পরিষ্কৃত বস্ত্রখণ্ডে পোঁটলা করিয়া রস টিপিয়া বাহির করণান্তে তদ্দ্বারা নেত্র পূরণ করা আবশ্যক। নেত্র পূরণের দুই ঘণ্টা পরে ফুলেল তৈলের নস্ত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

নস্তের পরে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত নিম্ন লিখিত প্রলেপ চক্ষুর পার্শ্বে দিতে হইবেক। প্রলেপ শুষ্ক না হয় এইটীই সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ৩।৪ তিন চারিবার উপর্য্যুপরি প্রলেপ দিবার পরে প্রলেপ স্থান ভার বোধ হইতে লাগিলে কর্পূরবাসিত বাসি পরিষ্কার জলে, কি গোলাপ জলের দ্বারা এক একবার চক্ষু ধৌত করা আবশ্যক।

প্রলেপ দ্রব্য যথা—

ঘৃষ্ট রক্তচন্দন ১ ভাগ, ঘৃষ্ট লোধকাষ্ঠ ১ ভাগ, শ্বেত পুনর্ণবার রস ১ ভাগ ও কর্পূর একরতি, মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ প্রস্তুত করিতে হয়।

চক্ষুতে ক্ষত থাকিলে আমলকী রস দ্বারা পূরণ করার পরিবর্ত্তে নিম্ন-লিখিত প্রণালী ক্রমে জাতি ঘৃত প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বদা তাহার দ্বারা চক্ষু ভিজাইয়া রাখিতে হইবেক—আবশ্যকমত পরিমাণে সদ্যোজাত গব্যঘৃত, কেবল পরিষ্কৃত জল দ্বারা মূর্চ্ছা দিয়া সংশোধন করিয়া লইয়া ঘৃতের চতুর্গুণ জাতীপুষ্পের কাথের দ্বারা পাক করিয়া লইতে হইবেক। পরিষ্কৃত পুষ্পের পরিমাণ যত, জলের পরিমাণ তাহার ষোলগুণ, জল পাদাবশেষ থাকিতে নামাইতে হইবেক। মাথার যন্ত্রণা অর্থাৎ মাথা কামড়ানি, মাথা-ধরা ও অল্প ভার ভার থাকিলে তৈলের নস্য বিশেষ কার্য্যকারী হয়, কথিত যন্ত্রণার পরিবর্ত্তে কেবল মাত্র মাথাঘোরা ও মস্তিষ্কের লঘুতা বোধ হইতে থাকিলে সদ্যোজাত গব্যঘৃতের নস্য দ্বারা আশু উপকার দর্শে।

আলোক, প্রবল বায়ু, রৌদ্র, ধূলা, ধূম, চক্ষে প্রবিষ্ট না হইতে পারে এজন্য সর্ব্বদা সবজা বা কাল পাথরের চশমা ব্যবহার্য্য—মস্তক মুণ্ডন করা বিশেষ প্রয়োজন। এই প্রকার ব্যবহার করিতে লাগিলে অতি কষ্টদায়ক চক্ষুরোগ সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্য হয়। ইহা বিশেষ পরীক্ষিত। ক্রমশঃ—

সাতক্ষীরা
চৈত্র। } শ্রীরামনিরঞ্জন রায়চৌধুরী।

আয়ুর্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

মহা। শুক্রশোণিতে যোনির আর্দ্রতা ও স্ফূর্ত্তি, সম্ভোগরতা, রমণীর শ্রমোদ্ভব, সক্থিসাদ, পিপাসা ও গ্লানি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নিশ্চয়ই গর্ভ হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে। আবার দুই একমাস অতীত হইলে গর্ভিণীর স্তনদ্বয়ের মুখ কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষুর পক্ষসম্মিলন, রোমসমূহের উদ্গম, আহারে অনিচ্ছা বা বমন ও শুভগন্ধে উদ্বেগ উপস্থিত হইয়া থাকে।

পার্ব্ব। ভাল হৃদয়বল্লভ! যে গর্ভিণী একবার পুত্র প্রসব করে, সেই আবার সময়ান্তরে কন্যা প্রসব করে কেন? পুত্রবতী গর্ভিণীরই বা লক্ষণ কি? এবং গর্ভে কন্যা থাকিলেই বা তাহা কিরূপে জানা যায়?

মহা। প্রকৃতিবশে সম্ভোগকালে শুক্রের পরিমাণ অধিক হইলে পুত্র এবং শোণিতের পরিমাণ অধিক হইলে কন্যা জন্মে। যুগ্মরাত্রিতে রমণীদিগের স্বভাবতঃই কিঞ্চিৎ শোণিতের অল্পতা ঘটিয়া থাকে, সুতরাং যুগ্মরাত্রিতে গর্ভ হইলে শুক্রাধিক্য বশতঃ তাহাতে পুত্র হয়; আবার অযুগ্মরাত্রিতে গর্ভগ্রহণোপযোগী শোণিত কিঞ্চিৎ অধিক হয় বলিয়া ঐ দিনে কন্যা জন্মে। একই রমণীর বারম্বার পুত্রকন্যা হইবার ইহাই একমাত্র কারণ। গর্ভে পুত্র হইলে দ্বিতীয় মাসে গর্ভিণীর উদরে একপ্রকার পিণ্ডাকার পদার্থ অনুভূত হয়; দক্ষিণ চক্ষু বৃহৎ, দক্ষিণ উরু সুপুষ্ট ও মুখের বর্ণ সুপ্রসন্ন হয়; অগ্রে দক্ষিণ স্তনে দুগ্ধ জন্মে এবং স্বপ্নেতেও প্রায়শঃ পুত্রাভিলাষ হয় বা আম্রপদ্মাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। কন্যাবতী গর্ভিণীর দ্বিতীয় মাসে পেশী কিঞ্চিৎ দীর্ঘাকৃতি হয়, অগ্রে বামস্তনে দুগ্ধ জন্মে, বাম চক্ষু বৃহৎ ও বাম উরু পুষ্ট হয় এবং মুখের বর্ণও ততো প্রসন্ন হয় না।

পার্ব্ব। আবার নপুংসক নামে যে একপ্রকার নাপুরুষ নামেয়ে জাতীয় সন্তান হইতে দেখা যায়, তাহার কারণ কি? এবং সেই গর্ভিণীর বা কিলক্ষণই বা কিরূপ হইয়া থাকে?

মহা। সম্ভোগকালে যদি ভাগ্যক্রমে শুক্রশোণিতের সমতা ঘটিয়া উঠে, তবে তাহাতেই নপুংসকের উৎপত্তি হয়। এতৎসম্বন্ধে আরও অনেক রহস্য আছে, তৎসমুদায় উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। নারীর

গর্ভে নপুংসক জন্মিলে গর্ভ অর্দ্ধাকৃতি (অর্থাৎ গোলাকার ফলের অর্দ্ধাংশ) হয়, উদরের পার্শ্বদ্বয় উন্নত ও সম্মুখভাগ বৃহৎ হইয়া পড়ে।

পার্ব্ব। হে সুরাসুরসেবিত শঙ্কর! একণে যমজসন্তানের উৎপত্তির বিষয় কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিলেই অধিনীর বাসনা পূর্ণ হয়।

মহা। তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। এইমাত্র যেরূপ উক্ত হইল, সেই মত পুরুষের বীর্য্য গর্ভাশয়ে যাইয়া ঘন হইবার পূর্ব্বেই যদি অন্তর্ব্বায়ু দ্বারা দুই অংশে বিভক্ত হয় এবং গর্ভধারণোপযোগী উপকরণের সহিত অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া আর একত্রিত হইতে না পারে, তবে তাহাতেই এক গর্ভে দুইটী সন্তানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহাতেও কোন কারণে পূর্ব্বের ন্যায় শুক্রশোণিতের তারতম্য হইলে একটী পুত্র এবং একটী কন্যা হইতে পারে। কেবল যমজ বলিয়া কোন কথা নাই, নিষিক্ত বীর্য্য যত অংশে বিভক্ত হইবে, এক গর্ভে ততটী সন্তানই হইতে পারে। কিন্তু তাহারা কখনও বাঁচিয়া থাকে না। দৈবঘটনায় যদিও কখনো কখনো বাঁচে কিন্তু তাহা হইলে প্রসবকালে প্রসূতিকে বড়ই শঙ্কটে পড়িতে হয়। ভূমিষ্ঠ হইতে বা ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পরেই সন্তানগুলি মরিয়া যায়। স্থানের সঙ্কীর্ণতা বশতঃ তাহাদের সমুদায় অঙ্গ পূর্ণ হইতে পারে না বলিয়াই এরূপ হয়। আবার দুর্ব্বলপ্রকৃতি লোকের যমজসন্তানও প্রায় বাঁচিতে দেখা যায় না।

পার্ব্ব। আচ্ছা, গর্ভমধ্যে সন্তান কি প্রকার অবস্থায় অবস্থিতি করে? এবং প্রসব হইবার সময়ই বা কিরূপ হইয়া থাকে?

মহা। কুক্ষিমধ্যে সন্তান সাধারণতঃ উর্দ্ধশির হইয়া অবস্থিতি করে এবং সেই ভাবেই দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া মাতৃদেহ হইতে দেহধারণোপযোগী পদার্থ ও ইন্দ্রিয়াদি সংগ্রহ করিয়া লয়। অষ্টম মাস উপস্থিত হইলে সন্তান গর্ভমধ্যে তীর্য্যক্‌ভাবে অবস্থিতি করে। পরে নবম বা দশম মাসে অধোমুখী হইয়া ঝুলিয়া পড়ে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে দূষিত গর্ভ বলিয়া জানিবে।

পার্ব্ব। তবে যমজসন্তানও কি ঠিক্ এই নিয়মেই অবস্থিতি করে এবং ভূমিষ্ঠ হয়?

মহা। না, যমজসন্তান সম্বন্ধে একটু পার্থক্য আছে। এক গর্ভে দুইটী

সন্তান হইলে তাহারা পরস্পর বিপর্য্যস্তভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়া কালসহকারে ভূমিষ্ঠ হয়।" অর্থাৎ একজনের মস্তক অপর জনের পদদ্বয় একদিকে থাকে; কিন্তু উভয়ের নাভিস্থান কখনও বিপরীতভাবে অবস্থিতি করে না। এইরূপে প্রসবের কাল আসন্ন হইলে যখন মুহুর্মুহুঃ বেদনায় প্রসূতি একবা[illegible] অস্থির হইয়া পড়ে; তখন জরায়ুর মুখ আল্গা হইয়া যায় এবং অধো[illegible] সন্তানটী প্রথমে ভূতলে পতিত হয়।

অনন্তর দ্বিতীয়টীও আবার সেই পথে ঘুরিতে ঘুরিতে অধোমুখ হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যেই দুরতিক্রম্য জঠরযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। [illegible] প্রসূতির দেহাভ্যন্তরীন বাতাদির প্রভাববশতঃ কাহারও কাহা[illegible] একটী প্রসব হইলেও অপরটী প্রসব হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়া থাকে। প্রসূতি খালাস হইবার পর ফুল পড়িয়া গেলে পূর্ব্বকথিত নিয়মানুসারে তাহাদের শুশ্রূষা করিতে হইবে।

আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যা।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্ব। গর্ভস্রাব, গর্ভপাত এবং অকাল প্রসব কাহাকে বলে? কোন্ কারণেই বা ঐ সকল ভয়াবহ ঘটনা সমূহ সংঘটিত হইয়া থাকে।

মহা। প্রিয়তমে! সে সকলই তোমার নিকট বিস্তারিতরূপে কহিতেছি। চতুর্থ মাসপর্য্যন্ত গর্ভ, দ্রব অবস্থায় অবস্থিতি করে, সুতরাং ঐ কালে গর্ভ নষ্ট হইলে তাহাকে গর্ভস্রাব কহে। পঞ্চম ও ষষ্ঠমাস মধ্যে গর্ভস্থ সন্তানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সুচারুরূপে গঠিত হয়, তখন গর্ভ নষ্ট হইলে তাহাকে গর্ভপাত কহা যায়। সপ্তম মাসে গর্ভস্থ সন্তানের জীবনসঞ্চার হয়, তাই এই সময় গর্ভপাত হইলে তাহাকে বিশুণজনন বা অকালপ্রসব কহে। অকালে প্রসব হইলে সেই সন্তান কখনো বাঁচে না। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বা উষ্ণদ্রব্য ভোজন এবং ভয় ও অভিঘাতই এই সকল উপদ্রবের একমাত্র কারণ। যে প্রকারেই হউক, গর্ভ নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে প্রথমে তলপেটে তীব্রবেদনা ও রক্ত স্রাব হইতে আরম্ভ হয়। ইহার প্রতিকারের বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আবার উচিত প্রসবকালে রীতি-

মত প্রসব না হইলে সেই গর্ভকে মূঢ়গর্ভ কহে। অত্যাচার দ্বারা কুপিত বায়ু দিন দিন প্রবল হইয়া যোনি জঠরাদিতে শূল এবং মূত্রবদ্ধতা জন্মাইয়া মূঢ়গর্ভ উৎপাদন করে।

পার্ব্ব। সেই মূঢ়গর্ভ কতপ্রকার? এবং প্রত্যেকের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণই বা কি?

মহা। প্রিয়ে! বিগুণীকৃত বায়ু দ্বারা গর্ভস্থ সন্তান নানাপ্রকার কুটিল গতিতে যোনিমুখে সমাগত হইতে পারে। তাহার এমন কোন সংখ্যা বা নিয়ম নাই যে, সন্তান ঠিক্ সেই প্রকারেই প্রসব দ্বারে উপস্থিত হইবে অথবা তাহার এমন কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বা নিয়ম হইতেও পারে না। তবে প্রসবের সময় যে কয়েক প্রকার অবস্থা সচরাচর দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে তাহাই উল্লেখ করিতেছি; যথা—

১। সন্তান, মস্তকদ্বারা যোনিদ্বারকে আচ্ছাদন করিয়া উহাতে সংলগ্ন থাকিলে অর্থাৎ কোন মতেই অগ্রসর হইতে না পারিলে সেই গর্ভকে বিপুল-মস্তক কহে।

২। সন্তান কখনো কখনো মস্তকের পরিবর্ত্তে জঠর দ্বারা যোনিমুখে অবরুদ্ধ হয়, তাহাকে জঠাবরোধক কহে।

৩। কখনো বা সন্তানের শরীর পরিবর্ত্তিত হইয়া পৃষ্ঠ দ্বারা যোনি-প্রবেশ করে, তাহাকে পৃষ্ঠাবরোধক কহা যায়।

৪। সন্তান তীর্য্যগ্‌ভাবে অপত্য পথে পতিত হইলে তাহাকে তীর্য্যগ্-পার্শ্ব কহে।

৫। আবার পার্শ্বভঙ্গহেতু দেহপার্শ্বে নত হইয়া রুদ্ধগতি হইলে তাহাকে বিপুলতীর্য্যগ্‌পার্শ্ব কহে।

৬। কখনো বা শিশুর একটী বা দুইটী হস্তই আগে বাহির হইয়া মস্তক বক্রভাবে পড়ে, তাহাকে মুণ্ডরিঘাতক কহা যায়।

৭। কোন শিশু অবাঙ্মুখ হইয়া অর্থাৎ মস্তকের পরিবর্ত্তে মুখমণ্ডল দ্বারা অগ্রসর হইয়া থাকে, ইহাকে বিপুল মুখাবরোধক কহা যায়।

৮। গর্ভস্থ সন্তানের মস্তক, হস্ত এবং পদদ্বয় একত্রে যোনিতে প্রবেশ করিয়া কীলের ন্যায় রুদ্ধ হইলে তাহাকে সংকীলক মূঢ়গর্ভ কহে।

৯। প্রতিখুর মূঢ়গর্ভে প্রথমতঃ শিশুর পদদ্বয় যোনিতে প্রবেশ করে।

১০। বীজক মূঢ়গর্ভে মস্তকের সহিত একটী বা দুইটী হস্তই প্রসব দ্বারে সমাগত হয়।

১১। এতদ্ভিন্ন আরও একপ্রকার মূঢ়গর্ভ আছে, তাহাতে সন্তান, যোনি-মধ্যে দ্বারের অর্গলের ন্যায় অনুপ্রস্থ অর্থাৎ আড়ভাবে অবস্থিতি করিয়া প্রসূতিকে নিতান্ত বিপদগ্রস্থ করিয়া ফেলে।

এই যে কয়েকটী অবস্থার কথা বলা হইল, মোটামোটী ধরিয়া দেখিলে ইহার সমস্তগুলিই কৃচ্ছ্রসাধ্য। তন্মধ্যে আবার সন্তানের মস্তকের সহিত পদদ্বয় যোনিমুখে সমাগত হইলে, অথবা একখানি পদ প্রসূতির গুহ্যদেশে আবদ্ধ থাকিয়া অপর খানি যোনি দ্বারে প্রবেশ করিলে তাহা অসাধ্য বলিয়া জানিবে। অসাধ্য মূঢ়গর্ভে প্রসূতির ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অভাব, আক্ষেপ, প্রসবদ্বার রোধ, বঙ্ক্ষণদ্বয়ের অবিরত কম্পন, শ্বাস, কাস এবং ভ্রম প্রভৃতি লক্ষণ যুগপৎ উপস্থিত হইয়া থাকে। এতাদৃশ অবস্থায় দয়া মায়া বিসর্জ্জন দিয়া নিতান্ত মূঢ়ের ন্যায় গর্ভভেদ করিলে সজীব সন্তান বাহির করা যাইতে পারে।

এই কথা শুনিয়া পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! আমি অবলা হইয়া অবলা-দিগের এই নিদারুণ শোচনীয় অবস্থা আর শুনিতে চাই না। এইক্ষণ যে যে উপায় অবলম্বন করিলে সরলা কুলবালাগণ এই আসন্ন বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পায়, তাহাই যথোচিত কীর্ত্তন করিয়া আমার শান্তিসাধন ও প্রজা-গণের মঙ্গল বিধান কর।

তচ্ছ্রবণে মহাদেব কহিলেন, প্রসবকালে গর্ভস্থ সন্তান কোন প্রকার বিকৃতভাবে যোনিমুখে সমাগত হইলে উত্তমরূপে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। যে ভাবে সন্তান অবরুদ্ধ থাকে, তাহা বেশ বুঝিয়া পেটের উপর হাত বুলাইয়া যদি সোজা করিয়া দেওয়া যায় তবে তাহাই দিবে, নতুবা যন্ত্র দ্বারাই হউক অথবা হাত প্রবেশ করিয়াই হউক ঘাতপ্রত্যাঘাতে সন্তানকে সোজা করিয়া দিতে চেষ্টা করিবে। কেবল এই উপায়ে সোজা করিয়া দিলেই যে সকল সময় উপকার হইবে এমন কোন কথা নাই। জঠরস্থ বায়ু পূর্ব্ববৎ কুপিত থাকিলে তদ্দ্বারা সন্তান আবার সেই ভাবে বা অন্য ভাবেও পড়িতে পারে। তাহাতে কখনও বা ভাল হয়, আবার কখনও বা পূর্ব্বা-পেক্ষা আরও মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। অতএব যাহাতে গর্ভস্থ বায়ু সাম্যভাবে

অবস্থিতি করে, প্রথমে তাহাই করিবে। এরূপ অবস্থায় প্রথমে স্বল্পবিষ্ণু তৈল মর্দ্দন করিবে। তাহাতে উপকার না হইলে মধ্য বিষ্ণু তৈল প্রয়োগ করিবে। ইহাতে জঠরস্থ বায়ু প্রকৃতিস্থ হইয়া অচিরে প্রসব ব্যাঘাত দূর করে। অনন্তর প্রসব-বাধা দূর করিবার জন্ম যে সকল ঔষধের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহারই মধ্যে বিবেচনা করিয়া প্রসূতির অবস্থানুসারে যাহা ভাল বলিয়া বোধ হইবে তাহাই প্রয়োগ করিবে।

পার্ব্ব। ভাল, এই যে যন্ত্র প্রয়োগের কথা কহিলে. সেই যন্ত্র কিরূপ? এবং কি প্রকার অবস্থায় কেমন করিয়াই বা তাহা প্রয়োগ করিতে হয়?

মহা। প্রিয়ে! মূঢ়গর্ভ প্রতীকারের জন্ম নানা প্রকার যন্ত্র প্রয়োগের কথাও আজ তোমার নিকট কহিতেছি। এতৎসম্বন্ধে যতগুলি যন্ত্র আছে, তন্মধ্যে ছয় প্রকার যন্ত্রই সমধিক প্রচলিত। তাহাদিগকে শঙ্কুযন্ত্র কহে। ১২ ও ১৩ অঙ্গুলী পরিমিত ফণী ফণার ন্যায় দুই প্রকার শঙ্কু আছে; তদ্দ্বারা যোনিমুখ প্রসারিত হয়, আগত সন্তান যে ভাবে অবস্থিতি করে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার পক্ষে এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পক্ষে কিঞ্চিৎ সহায়তা করে। আবার শরপুঙ্খের ন্যায় দুই প্রকার শঙ্কু আছে, গর্ভস্থ সন্তান বিকল অবস্থায় সমাগত হইলে তদ্দ্বারা তাহা সোজা করিয়া দেওয়া হয়। ইহা চালন কার্য্যের জন্ম ব্যবহৃত হয়। এতদ্ভিন্ন আরও দুই প্রকার শঙ্কু আহরণ কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে গর্ভশঙ্কু ও যোনি শঙ্কু কহে *।

* পাঠকদিগের বিশ্বাসার্থ কয়েকটী সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে। যথা—

শঙ্কবঃ ষড়ুর্দ্ধো তেষাং ষোড়শদ্বাদশাঙ্গুলো।
ব্যূহনেঽহিফণার্দ্ধবক্ত্রৌ দ্বৌ দ্বাদশদশাঙ্গুলৌ॥
চালনে শরপুঙ্খাস্যা বাহার্য্যে বড়িশাকৃতী॥
নতোঽগ্রে শঙ্কুনাতুল্যো গর্ভশঙ্কুরিতি স্মৃতঃ।
অ[illegible]নেন মূঢ়গর্ভং হরেৎ স্ত্রিয়াঃ॥
সংবদ্ধশঙ্কুযুগলো যোনিশঙ্কুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মূঢ়গর্ভাহৃতৌ সোঽপি প্রয়োজ্যো গর্ভশঙ্কুকঃ॥

গর্ভ শঙ্কু দীর্ঘে প্রায় ৮ অঙ্গুলী পরিমিত। ইহার অগ্রভাগ বড়িশের ন্যায়

এই সকল বচনদ্বারা স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে যে পূর্ব্বকালেও হতভাগ্য ভারতরাজ্যে এই সমুদায় বিষয়ে গভীর আলোচনা হইত এবং হ্যাট্ কোট্ বর্জ্জিত অসভ্য আর্য্যসন্তানদিগের ক্ষীণ মস্তিষ্ক হইতে নানাপ্রকার যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তবে কালের কুটিল-স্রোতে সেই সমুদায় ভাসিয়া গিয়াছে অথবা পরপদস্খলিত ধুলিরাশি স্তরে স্তরে সজ্জিত হইতে হইতে ভারতের রত্নরাশি আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। বহুকাল হইতে বৈদেশীক শিক্ষায় আজ কাল আমাদিগের প্রকৃতি এমনভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, আমরা ভ্রমেও একবার নিজ গৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত করি না। কেবল পরগৃহে প্রবেশ করিবার জন্যই দিবারাত্রি চেষ্টা করিতেছি। সুতরাং নিজ গৃহস্থিত অকৃত্রিম রত্নরাশি উপেক্ষা করিয়া পরগৃহস্থিত বা শ্বাপদ সঙ্কুল নিবিড় অরণ্যমধ্যস্থিত কৃত্রিম রত্নসংগ্রহ করিবার জন্য যে লালায়িত হইব তাহাতে বিচিত্র কি ? বলিতে কি, নব্য বাবুদিগের কাহাকেও যদি নিজ পিতামহের নাম জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে অমনি অবাক্ হইয়া পড়েন; কিন্তু কোথায় সাতসমুদ্র তেরনদী পারে কোন্ সামান্য দ্বীপে কতটী রাজপুরুষ কোন্ সময় সিংহাসন উজ্জ্বল করিয়া বসিলেন, কাহার কতটী পুত্র কন্যা হইল, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া বলিয়া দিতে পারেন! কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, এই শ্রেণীর লোকেরাই আবার "ভারতের কিছুই নাই, যাহা কিছু উন্নতির জিনিষ—যাহা কিছু বিজ্ঞানমূলক, তাহা ইউরোপ হইতেই হইয়াছে;" ইত্যাদি বলিয়া সর্ব্বদা অহঙ্কার করিয়া থাকেন। ভাল, নিজের যাহা আছে না আছে, তাহা একবার জানিয়া পরে এই কথা বলিলেও কতক শোভা পায়। এস্থলে আর একটী ঘটনার কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইতিমধ্যে বহুকাল পর আমার একজন পরম বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতে উভয়ে একত্রে বাস, একত্রে ভোজন এবং একই বিদ্যালয়ে একসঙ্গে ইংরাজী প্রবেশিকা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করায় আমাদের মধ্যে বিলক্ষণ সখ্যতা জন্মিয়াছিল। এইক্ষণ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্ব আচার ব্যবহার সমস্তই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। একদিন কথাপ্রসঙ্গে দেশীয় এবং বৈদেশীক চিকিৎসাতত্ত্ব সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হওয়ায় তিনি বলিয়া ফেলিলেন যে, "আমি জানি, সংস্কৃত পড়িলেই লোকে দিন দিন কুসংস্কারাপন্ন হইয়া দাঁড়ায়। প্রাচীন অসভ্য হিন্দুদিগের কাল্পনিক কথার উপরই তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে। এবং সভ্য ইউরোপীয়দিগের প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষ জন্মিয়া উঠে। একদেশদর্শী বলিয়াই তাহাদের এরূপ হয়।" এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই, যাহারা বাল্যকাল হইতে নিরত বিদেশীয় সংসর্গে বাস করিয়া, বিদেশীয় ভাষায় দীক্ষিত হইয়া, বিদেশের অনুকরণ প্রিয় হয়, অথচ দেশের কিছুই জানে না, তাহারাই একদেশদর্শী না যাহারা নিজ দেশের বিষয়ও জানে এবং বিদেশের বিষয়ও জানে, তাহারাই একদেশদর্শী সুবিজ্ঞ পাঠকগণই ইহার মীমাংসা করিবেন।

বক্র। তদ্দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানকে আকর্ষণ করিয়া বাহির করিতে হয়। সজীব সন্তান প্রসব করাইতে হইলে গর্ভশঙ্কু অপেক্ষা যোগ্যশঙ্কুই সচরাচর ব্যবহৃত করা যায়। ইহা দ্বারা যোনি-মুখ কিঞ্চিৎ প্রসারিত হয় বলিয়া সহজেই সন্তান আকৃষ্ট হইয়া ভূমিষ্ট হয়। এই যন্ত্র দেখিতে বেড়ীর ন্যায়। সাধারণের বুঝিবার জন্য নিম্নে দুইটী যন্ত্রের প্রতিকৃতি দেওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তাহা হইল না। এই সমুদায় যন্ত্র দ্বারা সন্তান প্রসব করাইবার কৌশল কখনো বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে না। উপযুক্ত সময়ে দৃষ্টান্ত দ্বারা সুন্দররূপে বুঝাইয়া না দিলে কেহই এবিষয় সিদ্ধজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। যিনি অনেক বার স্বচক্ষে প্রসব করাইতে দেখিয়াছেন, তিনি ব্যতীত অজ্ঞ বা হীন-সাহস ব্যক্তির পক্ষে যন্ত্রাদিতে হস্তার্পণ করা বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

পার্ব্ব। ভাল গর্ভমধ্যে সন্তানের মৃত্যু হইলে তাহাই বা কি প্রকারে জানা যায়?

মহা। গর্ভে সন্তানের মৃত্যু হইলে সেই গর্ভ কখনও স্পন্দিত হয় না এবং প্রসববেদনা ও ক্রমে ক্রমে লাঘব হইয়া থাকে। গর্ভিণীর নাসিকা হইতে সর্ব্বদা দুর্গন্ধ বাহির, তাহার অঙ্গে শোথ এবং শরীর শ্যাব বা পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায়।

পার্ব্ব। আচ্ছা, যে গর্ভিণী কিছুতেই বাঁচিবে না, তাহার অবস্থা কি প্রকার হইয়া থাকে?

মহা। যাহার অঙ্গ একবারে শীতল হইয়া যায় এবং কিছুমাত্র লজ্জা বোধ থাকে না, যাহার নাড়ী ক্ষীণ ও কুক্ষির উপর নীলবর্ণ শিরা সকল উদ্গত হয়, তাহার প্রাণ এবং গর্ভ উভয়ই বিনষ্ট হয়। যে গর্ভিণী যোনি-সম্বরণ নামা রোগে আক্রান্তা—যে রোগের কথা পূর্ব্বে কেহই বুঝিতে পারে না, যাহার গর্ভে কুক্ষিতে শক্ত হইয়া থাকে ও মকল্ল নামক রক্ত বাতশূলে মুহুর্মুহুঃ পীড়িত হয়, যাহার শ্বাস আক্ষেপাদি উপদ্রব সমূহ যুগপৎ উপস্থিত হয়, সেই মূঢ়গর্ভা স্ত্রীর মৃত্যুই নিশ্চয়।

পার্ব্ব। ভাল, যোনি-সম্বরণ নামা এই যে নূতন একটা রোগের কথা কহিলে সেই রোগ অবার কাহাকে বলে?

মহা। যে রোগ দ্বারা গর্ভিণীদিগের যোনি মার্গস্থিত বায়ু অত্যন্ত কুপিত

হইয়া যোনিদ্বারকে সঙ্কুচিত করে এবং পুনর্ব্বার ভিতরে প্রবেশ করিয়া গর্ভাশয়ের মুখও অবরোধ করে, তাহাকেই যোনি-সম্বরণ রোগ কহে। বায়ুবৃদ্ধিকর অন্নপানাদি সেবন, অতিশয় রাত্রিজাগরণ অথবা মৈথুনাদিই ইহার একমাত্র নিদান। এই রোগে গর্ভ মুহুর্মুহুঃ প্রপীড়িত হয় এবং তদ্রূপাবস্থায় গর্ভিণীর কৃচ্ছ্র শ্বাস ও হৃদয়াবরোধ হইয়া হঠাৎ প্রাণত্যাগ হয়। এই রোগের কথা অথবা এইরূপ মৃত্যুর কথা পূর্ব্বে কেহই বুঝিতে পারে না, সুতরাং গর্ভিণীকে বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও সবল থাকিতে মরিতে দেখিয়া অজ্ঞ লোকেরা সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া পড়ে।

পার্ব্ব। হৃদয়বল্লভ! এক্ষণে আরও একটী বিষয় শুনিবার জন্য আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। তুমি যে অসাধ্য মূঢ় গর্ভের কথা প্রকাশ করিলে, তাদৃশ অবস্থায় গর্ভিণীকে রক্ষা করিবার কি কোনই উপায় নাই? তবে কি হতভাগিনী দুঃসহ প্রসব যন্ত্রণায় অবিরত ছট্ ফট্ করিতে করিতে জীবনের খেলা সাঙ্গ করিয়া চলিয়া যাইবে? গর্ভগ্রহণের পরিণাম ফল যদি ইহাই হয়, তবে নারীজন্ম না হওয়াই ভাল। পাপিয়সী গর্ভিণীদিগের প্রসবযন্ত্রণার কথা শ্রবণ করিলে মনে হয়, তাহারা যেন কতই পাপের ফলে এমন দুর্দ্দমণীয় নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে!

মহা। প্রিয়তমে! সংসারে যতপ্রকার মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার মধ্যে উপযুক্ত সময়ে সতর্ক হইলে কালমৃত্যু ভিন্ন আর সকলগুলি হইতেই মুক্তি-লাভ করা যাইতে পারে। যখন দেখিবে গর্ভ নিতান্ত বিকৃতভাবে যোনি-মুখে আবদ্ধ রহিয়াছে এবং কিছুতেই নির্গত হইতে পারিতেছে না, অথচ প্রসবের বেগও বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং গর্ভকে যন্ত্রদ্বারা চালনা করিয়া সোজা করাও অসাধ্য, তখন প্রথমোক্ত সঙ্কুদ্বারা যোনি-মুখ যথাসম্ভব প্রসা-রিত করিয়া গর্ভসঙ্কুদ্বারা মূঢ়গর্ভকে আহরণ করিতে হইবে। যদি কোন স্থান বিশেষরূপে আবদ্ধ থাকে, তবে শস্ত্রদ্বারা তাহা ছিন্ন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এরূপ অবস্থায় যদি প্রসূতির কোন স্থানভেদ হয় বা সন্তানের নাভিরজ্জু ছিন্ন হইয়া যায়, তবে সমুদায় চেষ্টাই বিফল হইবে। প্রসূতিকে রক্ষা করিতে হইলে খুব সাবধানে এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে

হইবে। আবার সন্তান জীবিত থাকিতে শস্ত্র প্রয়োগ করিলেও নানা প্রকার বিপদ হইতে পারে। *

আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পার্ব্ব। ভাল, হৃদয়-বল্লভ! সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া গেলে, কোন্ কোন্ কর্ম্ম প্রসূতির পক্ষে একান্ত হিতজনক এবং সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যপ্রদ? এক্ষণে সেই সকল বিষয় বিশেষ করিয়া শুনিতে ইচ্ছা করি।

মহা। প্রিয়ে! প্রসূতি খালাস হইলে যে প্রকারে সুকুমারের সুশ্রূষা করিতে হইবে তাহা ইতি পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার হিতজনক আহার বিহারের বিষয় ও কহিতেছি। প্রসূতি দিনের বেলায় খালাস হইলে সে দিন আর তাহাকে কিছুই খাইতে দিবে না। প্রসবের সময় আমাশয়, পক্বাশয় প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্রগুলি একটু ভাবান্তরিত হয়, সুতরাং পরিপাক শক্তিও অনেকটা হ্রাস হইয়া থাকে। সেই দুর্ব্বল অগ্নিতে কোন বস্তু পতিত হইলে তাহা সম্পূর্ণরূপ পরিপাক হইতে না পারিয়া প্রসূতির নানা প্রকার পীড়া জন্মায়। তবে পোয়াতী নিতান্ত দুর্ব্বল প্রকৃতির হইলে বা সকালবেলা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে পেয়াদি পান করিবার পূর্ব্বেই খালাস হইলে, সুখপাচ্য মণ্ডাদি প্রস্তুত করিয়া দিবে। এইরূপে সে দিন অতীত হইলে পরদিন প্রথমে গুটীকয়েক মরিচ ও তৎপরিমিত শলুক (রান্ধনী জাতীয় শস্য বিশেষ) একত্রে পেষণ করিয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। অথবা কৃষ্ণ জীরা, মরিচ, রশুন ও শলুক উত্তমরূপে পেষণ করিয়া অন্নের সহিত খাইতে দিবে। ইহা বস্তি শোধক ও বেদনা নিবারক। উত্তম পুরাতন তণ্ডুলের সুসিদ্ধ অন্ন কেবল ঘৃত দ্বারাই ভোজন করিতে দিবে। এবং ক্রমাগত পাঁচ দিন পর্য্যন্ত এই মৃত্তায় ভোজন করি-

---

* পাঠকগণ মনে করিবেন না যে, এই সকল কথা আমি নিজে বলিতেছি। যে সকল তেজঃপুঞ্জ সাক্ষাৎ ভগবানসদৃশ মহর্ষিগণ দিবানিশি এতদ্বিষয় আলোচনা করিয়া এক সময় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদেরই পরীক্ষালব্ধ, আমার কল্পনা-সম্ভূত নহে। আমি কেবল পুনরুক্তি করিলাম মাত্র।

য়াই কুঁড়েঘরে থাকিতে হইবে। এতদ্দ্বারা প্রসব-জনিত দেহাভ্যন্তরীণ বিকৃত স্থানগুলি সত্বরেই দৃঢ় ও কার্য্যক্ষম হইয়া উঠে। আহারের প্রথমে মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বোক্ত শলুক ও মরিচ সেবন করিলে উপকার ভিন্ন অপকারের সম্ভাবনা নাই। ষষ্ঠদিন উপস্থিত হইলে আহার সম্বন্ধে প্রসূতি একটু স্বাধীনতা পাইতে পারে। সেই দিন অঙ্গশোধক, বায়ুসাম্যকারক, শ্লেষ্মাদোষ নিবারক এবং সুখপাচ্য ছয়টী আনাজ সংগ্রহ করিয়া তাহার ঝোল খাইতে পারে। স্ত্রীলোকগণ ইহাকে "ছয় আনাজের ঝোল" কহে।

নাড়ীকাটা জন্য যে সকল সাংঘাতিক পীড়া উপস্থিত হইয়া শিশুকে বিপদগ্রস্থ বা একবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলে, তাহা এই ছয় দিনের মধ্যেই হইয়া থাকে। ছয় দিন অতীত হইলে আর তদ্বিষয় আশঙ্কা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এই জন্যই ছয় দিনকে শিশুর পক্ষে একটী আনন্দের দিন বলিয়া কথিত হয়। এই দিনে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ শুদ্ধাচারী হইয়া শিশুর কল্যাণার্থ স্থতিকা ঘরের চতুর্দ্দিকে বেদোচ্চারণ করিবে, সর্ব্বদা স্তুতিস্তব করিয়া বিশ্বপতির নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে। এই দিনে সন্তান-রক্ষয়িত্রীর ষষ্ঠী দেবীর আরাধনা করা কর্ত্তব্য। রাত্রিকালেও জনয়িত্রীগণ সর্ব্বদা মিষ্ট আলাপনে পরস্পর তুষ্ট থাকিতে চেষ্টা করিবে।

প্রত্যহ স্নান করা প্রসূতির পক্ষে বড় হিতজনক নহে। দুই একদিন পর অথবা ক্রমান্বয়ে বাদল হইতে থাকিলে দুই তিন দিন পর গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া স্নান করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রতি দিনই ঈষদুষ্ণ জলে কটী, পার্শ্ব, বস্তি প্রভৃতি স্থান উত্তমরূপ প্রক্ষালন করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

ইতিপূর্ব্বে যে কুঁড়েঘরে আগুণ রাখিবার কথা বলা হইয়াছে, তাহা এই সময় কাজে আসিবে। বস্ত্রবদ্ধ বা বালুকাপূর্ণ পুটুলী সেই আগুণের উপর ধরিয়া ঈষৎ গরম থাকিতে থাকিতে বালকের মস্তক, মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ, নাভি ও গুহ্যদ্বারে সময় সময় স্বেদ প্রদান করিবে। তদ্রূপ প্রসূতির বস্তি, বঙ্ক্ষণ, যোনি প্রভৃতি স্থান স্ফীত বা তত্তৎ স্থান বেদনাযুক্ত হইলেও স্বেদ প্রদান কর্ত্তব্য। ইহা বায়ু সঞ্চালক ও শ্লেষ্মাপহারক। উপযুক্ত সময় বালককে তৈল মাখাইয়া প্রতিদিন উত্তমরূপে স্নান করাইয়া দিবে। এইরূপে দশদিন নিরাপদে অতিবাহিত হইলে একাদশ দিনে প্রসূতি নখাদি ছেদন ও বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া কুঁড়ে হইতে বাহির হইবে, এবং অন্ন প্রত্যাদি

বেশ করিয়া মার্জ্জন করতঃ একখানি স্বতন্ত্র ঘরে অবস্থিতি করিবে। সেই সময় আপনার এবং প্রসূত-সন্তানের যথোচিত সুশ্রূষা ভিন্ন প্রসূতিকে আর কিছুই করিতে হইবে না। অতিরিক্ত ব্যায়াম, ক্রোধ এবং শৈত্য ক্রিয়াদি সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। এইজন্যই স্বতন্ত্র ঘরে বাস করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সময় পোয়াতি সর্ব্বদা অশুচী থাকে বলিয়া সভ্য সমাজে তাহাকে কিছুই স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় না। অথবা তাহার সংস্পর্শ কোন বস্তুও কেহ আহার করে না। ইহাই সমাজের উৎকৃষ্ট নিয়ম। যাহারা এই সকল নিয়ম অবহেলা করিয়া কৃত্রিম সভ্যতার খাতিরে সেচ্ছা-চারিতার অনুষ্ঠান করে তাহাদিগকে অনেক সময় অনেকরূপ বিপদে পতিত হইতে হয়। তবে একাকিনী এক ঘরে নিয়ত বাস করা বড়ই কঠিন, তাই ইচ্ছা করিলে দুই একজন সহচরীও রাখা যাইতে পারে। ফলতঃ নিজ সন্তানকে নিজে পালন করিলে তাহা যতদূর সুশৃঙ্খলতার সহিত সম্পন্ন হয়, অন্য ধাত্রী দ্বারা কখনও ততদূর হইতে পারে না। এইরূপে তিন সপ্তাহ বা এক মাস অতীত হইলে যখন দেখিবে প্রসূতির শরীর বেশ সবল এবং পরিপাক শক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে, তখন তাহার আহার বিহার সম্বন্ধে অনেকটা স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া পুনর্ব্বার রজো দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত কখনও পতি সহবাস করিতে পারিবে না, অথবা অধিক পরিমাণে জলীয় বা গুরুপাকী বস্তুও আহার করিতে পারিবে না। প্রসবের পর হইতে পুনর্ব্বার রজোদর্শন পর্য্যন্ত যে কাল, সেই কালে অবৈধ আচরণ দ্বারা প্রসূতির কোন পীড়া হইলে তাহা প্রায়ই অসাধ্য বা কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। এই সময় যাহাতে কোন পীড়া না জন্মে তদ্বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত।

পার্ব্ব। ভাল, প্রসবের পর কতদিন পর্য্যন্ত প্রসূতিকে বিবেচনা করিয়া আহার বিহার করিতে হইবে?

মহা। শিরা, ধমনী প্রভৃতি যে সকল স্রোতোপথ গর্ভাবস্থায় অবরুদ্ধ হয়, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া গেলেও তৎসমস্ত দুই তিন মাস পর্য্যন্ত সেইরূপই থাকে। সুতরাং তখনও প্রসূতির মাসিক রজঃ স্রাব হয় না। পরে হিতজনক আহার বিহারে সেই সকল অবরুদ্ধ পথ পরিষ্কার হইলে নিয়মিতরূপে মাসে মাসে আর্ত্তব নির্গত হইতে আরম্ভ হয় এবং তদ্রূপাবস্থায়

আর তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় সাবধানে থাকিবার কোন প্রয়োজন হয় না। সাধারণতঃ চতুর্থ মাসের মধ্যেই এরূপ হইয়া থাকে।

পার্ব্ব। আচ্ছা, ভাগ্যদোষে কুঁড়ে ঘরেই যদি সন্তানের প্রাণ-বায়ু নিঃশেষ হয় অথবা প্রসব হইতেই যদি সন্তান মরিয়া যায়, তবু কি ঠিক্ এই নিয়মেই প্রসূতিকে চলিতে হইবে?

মহা। হাঁ, সন্তান মরিয়া গেলেও প্রসূতির নিজ দেহ রক্ষার জন্য আহার বিহার সম্বন্ধে সাবধান হইয়া থাকাই কর্ত্তব্য। তবে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সর্ব্বদা একাকিনী থাকিলে আরও অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, তাই দুই চারি জন সহচরীর সহিত মিষ্ট আলাপনে যথাসাধ্য অন্যমনস্ক থাকিবার চেষ্টা করাই উচিত। কিন্তু এইরূপ অবস্থাতে অশৌচ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন বিধান আছে।

পার্ব্ব। ভাল, মৃত্যুর পরই যেন সপিণ্ড জ্ঞাতিবর্গকে অশৌচ ভোগ করিতে হয়, জন্ম হইলে আবার তদ্রূপ করিবার প্রয়োজন কি?

মহা। প্রিয়ে! জননাশৌচ আর মরণাশৌচ ইহাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। কেবল সমাজের কার্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য বা সামান্য লোকদের ভুলাইবার জন্যই এই সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় নাই। বিবেচনা করিয়া দেখিলে মরণাশৌচ অপেক্ষা জননাশৌচেরই একটা বাঁধাবাঁধি সামাজিক আটুনী থাকা আবশ্যক। কেননা ইহার সহিত প্রসূতির স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। মরণাশৌচে মৃতব্যক্তির স্মরণার্থ অথবা তাহার প্রেতাত্মার স্মরণার্থ কয়েক দিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিতে হয়। তাহার সহিত ঐহিক পারত্রিকের মঙ্গল সম্ভাবনা থাকিলেও এস্থলে সেই সমুদায় উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এক্ষণে কেবল জননাশৌচ সম্বন্ধেই দুই একটী কথা কহিতেছি। সন্তান হইলে জ্ঞাতিবর্গকে যে অশৌচ ভোগ করিতে হয়, তাহাকে প্রকৃতপক্ষে অশৌচ না বলিলেও কোন ক্ষতি নাই। কেন না খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে তাহাদিগকে কোনও বিচার করিতে হয় না। কেবল প্রসূত সন্তানের সহিত সাপিণ্ড্যতা বা রক্ত গত সংস্রব আছে বলিয়াই উপাসনা প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য হইতে একটু অপসৃত থাকিতে হয়। সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে বিপ্র দশদিনে, ক্ষত্রিয় বারদিনে, বৈশ্য পোনের দিনে এবং শূদ্র একমাসে শুদ্ধিলাভ করে। কিন্তু যাঁহারা বেদা-

ধ্যায়ী এবং সাগ্নিক ব্রাহ্মণ, উপাসনা দ্বারা তাঁহাদের এক দিনেই অঙ্গশৌচ দূর হয়। কেবল বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের পক্ষে তিন দিন অশৌচ ভোগ করা কর্ত্তব্য। জননাশৌচ সম্বন্ধে প্রসূতির পক্ষে এই নিয়ম খাটিবে না। প্রসূতি যে জাতিই কেন না হউক, তাহাদের সকলকেই একই নিয়মানুসারে চলিতে হইবে। পুত্র হইলে প্রসূতি বিশ দিনে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। আর যদি কন্যা হয় তবে পূর্ণ এক মাসই অশৌচ ভোগ করা কর্ত্তব্য।

পার্ব্ব। কেন, পুত্র কন্যায় এরূপ তারতম্য হইবার কারণ কি?

মহা। পূর্ব্বেই ত কহিয়াছি, জননাশৌচে প্রসূতির স্বাস্থ্যরক্ষার সম্পূর্ণ সংস্রব আছে। কন্যা হইলে যতদিন পর্য্যন্ত জননীর দৈহিক বৈপরিত্য থাকে, পুত্র হইলে ততদিন থাকে না। ইহাই এরূপ তারতম্যের কারণ। বিশেষতঃ এই প্রকার নিয়ম থাকাতে প্রসূতিকে আর কোনও সাংসারিক কর্ম্ম দেখিতে হয় না, সুতরাং বাধ্য হইয়াই সন্তানের লালনপালনে যত্নবতী হইতে হয়।

পার্ব্ব। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সন্তানের মৃত্যু হইলেই বা কি প্রণালীতে অশৌচ ভোগ করা কর্ত্তব্য?

মহা। বালক গর্ভ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া কুঁড়েঘরেই হউক, অথবা কুঁড়ে হইতে বাহির হইয়া দন্তোদ্‌গমের পূর্ব্বে যে কোন সময়েই হউক, প্রাণ ত্যাগ করিলে তাহার জন্য আর কাহাকেও অশৌচ ভোগ করিতে হইবে না। অথবা ঐ বালকের জল ক্রিয়া বা অগ্নি সংস্কারাদিও কিছু করিতে হয় না। কিন্তু প্রসূতিকে পূর্ব্বোক্ত সময়ের মধ্যে স্বাভাবিক শরীরের ন্যায় আহার বিহার সম্বন্ধে যথোচিত স্বাধীনতা প্রদান করিলে তাহার নানাপ্রকার বৈগুণ্য জন্মিতে পারে, সুতরাং অশৌচের মধ্যে সন্তানের মৃত্যু হইলে প্রসূতিকে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারেই চলিতে হইবে। আবার গর্ভ হইতে মৃতসন্তান পতিত হইলে সকলকেই নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে পূর্ণাশৌচ ভোগ করা কর্ত্তব্য। যদি প্রকৃত প্রসব না হইয়া গর্ভস্রাব কি গর্ভপাত হয় তাহা হইলে যত মাসের গর্ভ বিনষ্ট হইল ততদিন পরেই গর্ভিণী শুদ্ধিলাভ করিতে পারে *।

---

* এতদিনে আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যার প্রথমার্দ্ধ পূর্ণ হইল, এইক্ষণ অপরার্দ্ধও ক্রমে ক্রমে

আয়ুর্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যা।

সপ্তম অধ্যায়।

সূতিকারোগ।

এক সময় পার্ব্বতী বিনয়সহকারে কহিলেন ভগবন্! সূতিকারোগ কাহাকে বলে? এবং কেনইবা ঐ সকল রোগের উৎপত্তি হইয়া অবলা-দিগকে সাতিশয় যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে?

তদুত্তরে মহাদেব কহিলেন, প্রিয়ে! পূর্ব্বেইত বলিয়াছি যে সন্তান ভূমিষ্ট হইলে সূতিনীদিগের দৈহিক কার্য্যের নানাপ্রকার ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠে। সেই সময় কোন কোন প্রসূতির জরায়ুমধ্যে কিছু না কিছু ক্লেদোময় পদার্থ সঞ্চিত থাকে, কাহারোবা সেইস্থান স্ফীত বা ক্ষত হইয়া কালসহকারে পাকিয়া উঠে, সুতরাং তদ্রূপাবস্থায় পরেও ক্লেদ সঞ্চয় হইতে পারে। তবেই দেখা যাইতেছে যে, প্রসবান্তে রমণীদিগের জরায়ু ও জননেন্দ্রিয়ের কার্য্য ঠিক্ নিয়মিতরূপে সম্পন্ন হয় না। আরও জরায়ুর বিকৃতি জন্যই তৎসংলগ্ন বা সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য দৈহিক যন্ত্রগুলীও ভাবান্তরিত হইয়া যায়, সুতরাং তাহাদের কার্য্যেরও ব্যাঘাত জন্মিয়া উঠে। আমাশয়, পক্কাশয়, বৃক্ক ও গ্রহণী প্রভৃতি আশয়গুলী আংশিক বা সম্পূর্ণরূপ বিকৃত হয় বলিয়াই প্রসূতির পরিপাকশক্তি হ্রাস হইয়া যায়। আবার শরীরের মধ্যে যে সকল স্রোতোপথ গর্ভাবস্থায় অবরুদ্ধ হয়, প্রসবের পরও তাহারা কিছুদিন সেই-রূপেই থাকে। এই সময় অন্যায়রূপে আহার বিহার করিলে উপরোক্ত যন্ত্রগুলি আরও বিকৃত অবস্থায় পরিণত হয় এবং পরিশেষে আপন আপন কার্য্যসাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া প্রসূতিকে একবারে জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে জ্বর, অতিসার, শোথ, শূল, আনাহ, অরুচি, তন্দ্রা

সুবিজ্ঞ পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি। এতদ্দ্বারা যদি কেহ একটুমাত্রও সাধা-রণের উপকার হওয়া বোধ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন অভিপ্রায় আমাকে লিখিয়া জানাইলে যারপর নাই বাধিত হইব এবং তদনুসারে ইহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া যথাসময়ে তাঁহাদের নিকট এক এক খণ্ড পাঠাইয়া দিব। নতুবা, পণ্ডশ্রম হইতে নিবৃত্ত হওয়াই উচিত। পুস্তকের মূল্য ১৸৹ দেড় টাকার অধিক হইবে না।

প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা প্রসূতি দিন দিন একবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে। কেহ বা এইরূপে দীর্ঘকাল কষ্টভোগ করিতে করিতে অবশেষে সংসার-কারা হইতে চলিয়া যায়, কেহ বা বাতব্যাধি দ্বারা চলচ্ছক্তি বিরহিতা হইয়া চিরকাল যন্ত্রণাই ভোগ করিতে থাকে। ফলতঃ প্রকৃতপক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিলে এস্থলে জ্বরাতিসারাদি এক একটী পীড়াকে স্বতন্ত্র কোন পীড়া বলিয়া অভিহিত করা যায় না। জরায়ু প্রভৃতি দৈহিক যন্ত্রগুলির বিকৃতভাবই প্রকৃত পীড়া। সেই পীড়াকেই সুতিকারোগ কহে। জ্বরাতি-সার-শোথশূলাদি তাহারই উপসর্গ মাত্র।

পার্ব্ব। এইযে আবার বাতব্যাধির কথা কহিলে, উহাও কি সুতিকা-রোগের উপসর্গ?

মহা। হাঁ, উহাও সুতিকারোগের একটি উপসর্গ ভিন্ন আর কিছুই নয়।

যে প্রকার অতল-জলধিতল হইতে তুষার-মণ্ডিত অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখা পর্য্যন্ত প্রত্যেক স্থানেই সদাগতি সর্ব্বদা প্রবাহিত হইয়া বিশাল ভূলোককে পরিপোষণ করিতেছে, সেইরূপ দেহীদিগের দেহমধ্যেও সদাগতি রস রক্তাদি নিয়মিতরূপে সঞ্চালন করিয়া সর্ব্বদা অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির অভাব পুরণ করিতেছে। তাহাতেই প্রাণীগণ ইচ্ছামত অঙ্গ চালনা করিতে সক্ষম হয়। কুৎসিত আহারবিহারে প্রসূতিদিগের দৈহিক বায়ু সঞ্চালনের পথ অবরুদ্ধ হইলে অল্পদিনের মধ্যেই তাহাদিগের সমস্ত বা কোন কোন অঙ্গ একবারে অবশ হইয়া যায়। কিন্তু সাধারণতঃ কটী হইতে তন্নিম্নস্থ স্থানেই এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে। এরূপ হইলে আর প্রসূতির উত্থানশক্তি থাকে না। ইহাকেই সুতিকারোগের উপসর্গ বলে। এতদ্ভিন্ন অন্য প্রকার হইলে তাহা স্বতন্ত্র বাতব্যাধি মধ্যেও পরিগণিত হইতে পারে।

পার্ব্ব। আরও শূলরোগের যে একটি কথা কহিলে তাহাই বা কিরূপ?

মহা। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর কোন কোন প্রসূতির বায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হইয়া ক্ষরিত রক্তকে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহাতেই তাহাদিগের হৃদয়, মস্তক এবং বস্তিতে এক প্রকার তীব্র বেদনা জন্মে, ইহাকেই শূল রোগ কহে। কেহ কেহ ইহাকে মকল্ল শূল ও কহিয়া থাকেন।

পার্ব্ব। তবে কি কি উপায় অবলম্বন করিলে এই সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়?

প্রাণ-প্রতিমা পার্ব্বতীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া জগৎপতি কহিলেন, ভবানি! ইতিপূর্ব্বে সূতিনীদিগের আহার-বিহার এবং অশৌচ সম্বন্ধে যে সকল নিয়মাদির বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, কোন প্রকার কুতর্ক না করিয়া অসন্দিগ্ধচিত্তে যাঁহারা সেই সকল নিয়ম রক্ষা করিতে প্রাণপনে যত্ন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে কখনও এই পীড়ায় যন্ত্রণা পাইতে হয় না। যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে সভ্যপদবাচ্য, যাঁহারা বহুকাল হইতে সংসারব্যাপারের প্রকৃতি নির্ণয় করিয়া সমাজকে বিনাসূতায় বন্ধন করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা অনন্ত ক্রিয়া-সমুদ্র মন্থন করিতে করিতে জ্ঞানামৃত পান করিয়া এক সময় আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিয়াছিলেন, যাঁহাদের আচার বিচার, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম, ভালমন্দ, খাদ্যাখাদ্য সমস্তই বিজ্ঞান শাস্ত্রের যুক্তিমূলক, কালক্রমে তাঁহাদের বংশেও যদি কোন ক্ষীণ মস্তিষ্কের জন্ম হয়, আর সে যদি সমাজ-ভয়ে বা শাস্ত্রের প্রতি অন্ধ ভক্তি প্রভাবে উল্লিখিত নিয়মাদি ভঙ্গ না করে, তবে তাহাকেও কখনো কোন প্রকার যন্ত্রণা পাইতে হয় না। বলিতে কি, এই বিশালজগতে কাহারও কোন প্রকার বিপদ না হয়, তজ্জন্যই আজ্ তোমার নিকট এই সকল কথা এমন করিয়া বলিতেছি। অথবা এবিষয়ে অধিক বাক্যব্যয় করাও নিষ্প্রয়োজন। ধরণীতলস্থিত প্রত্যেক সমাজের প্রতি একবার সমানভাবে দৃষ্টিপাত করিলেই জানিতে পারা যায় যে, ম্লেচ্ছ, কিরাত প্রভৃতি নিকৃষ্ট সমাজে সূতিকারোগের যতদূর প্রাদুর্ভাব, সভ্যসমাজে ততদূর নয়। আবার সভ্য বলিলেই যে প্রকৃত সভ্য হইল, এমন নয়। তাহাও দুই প্রকার লক্ষিত হয়। যাঁহারা বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহক কতকগুলি ধূর্ত্ততার সূত্র কণ্ঠস্থ করিয়া লৌকিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং শঠতা ও বঞ্চনা দ্বারা সর্ব্বদা নিরীহ লোকদিগের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকেন, যাঁহারা খাতায় নাম লেখাইয়া অথবা কপালে সভ্য নামাঙ্কিত চিহ্ন আটিয়া জন সমাজে সভ্য বলিয়া পরিচিত হইতে চেষ্টা করেন, যাঁহারা বাহিরে নিজ নিজ শরীরকে দিব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখাইয়া বস্ত্রান্তরালে ক্লেদপূর্ণ রুমাল লুকাইয়া রাখেন, সেই সকল সৃষ্টিছাড়া কিম্ভূত কিমাকার সভ্যদিগের সম্বন্ধে কোন কথাই খাটিবে না। আমি যে সভ্যের কথা কহিতেছি, তদ্রূপ লোক নির্ণয় করিয়া লওয়া একটু বিবেচনা-সাপেক্ষ। সূক্ষ্মরূপে ভাবিয়া দেখিলে ভূমণ্ডলে একান্ত হিতকর

বা একান্ত অহিতকর কিছুই লক্ষিত হয় না। একদিকে যদি কিছু ভাল হয়, অন্য দিকে তৎপরিমিত না হউক, কিছু না কিছু মন্দ অবশ্যই হইবে। তবে মোটের উপর তুলনা করিয়া যে সকল নিয়মাদিতে দোষ অপেক্ষা গুণের ভাগ অধিক বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, ধীশক্তিসম্পন্ন মনীষিগণ দীর্ঘকাল হইতে ঘোর আন্দোলনে তন্ন তন্ন মীমাংসা করিয়া তাহাই সমাজমধ্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। সেই সকল চিরপ্রচলিত নিয়মের মধ্যে সময় সময় যে দুই একটী কৃত্রিম নিয়ম প্রচারিত হইয়া সভ্য সমাজকে দিন দিন উচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে, তৎপ্রতি কেহই কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করেন না। কেবল পূর্ব্বতন নিয়মস্থিত সামান্য দোষকেই একমাত্র লক্ষ্য করিয়া তাহা সমূলে পরিবর্ত্তন করিতে যত্ন করিয়া থাকেন, অথচ সেই নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন নিয়ম প্রচলিত হইলে তাহাতে যে কি মহান্ অনিষ্ট সংঘটিত হইবে, তাহা একবারও কেহ মনে করিয়া দেখেন না। এই শ্রেণীর আত্মাভিমানী কুলকুঠারগণ সংসার হইতে অপসৃত না হইলে কোন সমাজেরই মঙ্গল নাই। এই সকল বিষয় অবলোকন করিয়া ক্ষুণ্ণমনে নীরব থাকিলে কখনও প্রকৃতিপুঞ্জের ইষ্ট সাধিত হইতে পারে না। কেন না সংসার যে ভাল মন্দ মিশ্রিত তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। সেই নৈসর্গিক নিয়মানুসারেই একাল পর্য্যন্ত সংসার চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বকালেও পরহিতৈষী পরম দয়ালু দেবগণ সাধারণের সুখ সুবিধার জন্য কোন বিষয় আবিষ্কার বা কোন নিয়ম প্রচলিত করিলে তখনি আবার বিপুল পরাক্রান্ত দানবকুল অন্যদিক হইতে খড়্গহস্তে অভ্যুত্থিত হইয়া তাহা সমূলে নির্ম্মূল করিতে প্রাণপণে যত্ন করিত। এইরূপে শম্খাসুর, বৃত্রাসুর প্রভৃতি শত শত অসুরগণ পবিত্র দেবরাজ্যকে সময় সময় বিধ্বস্ত করিয়া তুলিত। কিন্তু তাদৃশ অবস্থায় কখনও দেবগণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন নাই। তাঁহারা অটল ভাবেই আপন আপন কর্ত্তব্য সাধনে সাতিশয় যত্নবান্ হইতেন। তাই সময় সময় দিন কয়েকের জন্য দানবগণ উন্নত হইয়া উঠিলেও চিরকাল সমানভাবে থাকিতে পারে নাই। এস্থলে আরও একটী কথা মনে করিয়া দেখ, সেই যে অমিততেজা বলগর্ব্বিত অসুরগণ দেবতাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত উৎকৃষ্ট নিয়মাবলী অযথাদোষে দূষিত বলিয়া এক সময় অনন্ত ক্রিয়া-সমুদ্র মন্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; তখন স্বকৃত কর্ম্মসম্ভূত

সুতীক্ষ্ণ বিষের জ্বালায় দানব ভিন্ন আর কাহাদিগকে অভিভূত হইতে হইয়াছিল? সেইরূপ এই যে অভিনব সম্প্রদায় স্বাভিমানে বিমত্ত হইয়া উন্মাদের ন্যায় যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে, দেবতাদিগের পরীক্ষিত নিয়ম রাশি উপহাসে উড়াইয়া দিয়া স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় লইতেছে; বিধবা-বিবাহ, সধবাবিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রভৃতির একান্ত দাস হইয়া পড়িতেছে; বাসগৃহে সন্তানপ্রসব, প্রসবান্তে যদৃচ্ছা আহারবিহার, এমন কি ধর্ম্মভাবেও লোকের বিদ্বেষ জন্মাইতে ক্রটি করিতেছে না; এই সমুদয় কর্ম্মরাশির বিষময় ফলে তাহাদিগকেই এক সময় জড়িত হইয়া অবিরত ছট্‌ফট্ করিতে হইবে। এই সকল বিষয় পরিশিষ্টাধ্যায়ে বিস্তারিতরূপে প্রকাশ করিব। এক্ষণে কেবল এই মাত্র বলিতেছি যে, দেশ দেশান্তরিস্থ ভিন্ন ভিন্ন সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থা সুচারুরূপে পর্য্যালোচনা করিলেই এতদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ হইতে পারে, সুতরাং চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া না দিলেও কার্য্য সিদ্ধির ব্যাঘাত নাই। (ক্রমশঃ)

উমারপুর,
পোঃ নাকালীয়া
পাবনা।

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

কলেরা সম্বন্ধে গুটিকতক কথা।

এলোপ্যাথিমতে।

এই সাংঘাতিক পীড়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাজনের নানা মত দৃষ্ট হয়। অধুনাতন কালের অনেক বিজ্ঞ বিজ্ঞ ইউরোপীয় চিকিৎসকদিগের মত এই যে, কলেরা কোন এক বিশেষ জীবাণু (Cholera Bacilli) দ্বারা সংঘটিত হয়। এই সকল জীবাণু কলেরার মল ও বোমিতে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই সকল চিকিৎসকদিগের মতে খাদ্য ও পানীয় (দুগ্ধ ও জল) সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হইয়া চলিলে কলেরার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। এখনকার ডাক্তারেরা দূষিত পানীয়জলকেই কলেরার প্রধান কারণ বলিয়া অনুমান করেন। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি বড় বড় সহরে কলের ফিলটার করা পরিস্কৃত জল ব্যবহার হইয়াছে। বড় বড় সহরের মিউনিসিপালিটিও পানীয়

জলের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেছেন। বঙ্গের স্বাস্থ্যরক্ষক ডাক্তারগণও এইরূপ উপদেশ দিতেছেন। সম্প্রতি বঙ্গের সানিটারি কমিসনর মহোদয়ও পানীয় জল বিশুদ্ধ রাখার উপায় সম্বন্ধে এক সারকুলার জারি করিয়াছেন। পুষ্করিণী সকলের জল কিরূপে বিশুদ্ধ রাখা যাইতে পারে, তিনি তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম এই যে, পুষ্করিণীর চারিদিকে বেড়া দিয়া ঘিরিয়া রাখিতে হইবে, যে তাহাতে গরু মহিষ প্রভৃতি না যাইতে পারে, ঐ পুষ্করণীতে কেহ নামিয়া স্নান না করে। অথবা অন্য প্রকারে উহার জল কলুষিত না করে। পুষ্করিণীতে কেহ পাট, শন, বাঁশ প্রভৃতি না পচায়। পুষ্করিণীর পাড় এরূপ ভাবে ঢালু করিতে হইবে যে, পাড়ের জল আসিয়া পুষ্করণীতে না পড়ে। পুষ্করিণীর ধারে কেহ বিষ্ঠা প্রভৃতি ত্যাগ না করে। তিনি আরও বলেন-জলে কোন কোন উদ্ভিদ, যথা,—দাম শ্যাওলা প্রভৃতি জন্মাইতে দেওয়া ভাল। রক্তকম্বল প্রভৃতিতে জল বেশ পরিষ্কার রাখে। কিন্তু মৃত উদ্ভিদ গুলি তুলিয়া ফেলিতে হইবে। ইত্যাদি।

তবেই হইল দূষিত পানীয় জলই কলেরা পীড়ার প্রধান কারণ বলিয়াই এখনকার প্রধান প্রধান চিকিৎসকদিগের ধারণা। কিন্তু যদিও স্বীকার করা যায় যে, কোন জীবানুবিশেষ দ্বারাই কলেরা সৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য এই যে, কলেরার এই সকল জীবানু কোন স্থানবিশেষের ভূমি ও জল প্রভৃতিতে আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়, না কোন কলেরার দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিবিশেষের মল প্রভৃতি দ্বারা আগত হইয়া উক্ত ব্যাধি উৎপন্ন করে? যদি এমন স্বীকার করা যায় যে, কলেরার মল ও বোমি প্রভৃতি হইতেই কলেরার বীজ আনীত হয়, তাহা হইলে উপদংশের পীড়া যেরূপ ভাবে বিস্তৃতি লাভ করে, ইহাও সেইরূপ ভাবে একব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে সঞ্চারিত হয়। তবে উপদংশ বীজ যেরূপ ভাবে স্পর্শাক্রামক হয়, কলেরার বীজ সেরূপ ভাবে স্পর্শাক্রামক হয় না, এইমাত্র বিভেদ। কলেরার বীজ উদরস্থ না হইলে পীড়া উপস্থিত করে না। উপদংশ প্রথমে যেরূপ ভাবেই উৎপন্ন হউক না কেন, বহু প্রাচীনকাল হইতে উপদংশবীজ স্পর্শাক্রামক হইয়া এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে সঞ্চরণ করিয়া আসিতেছে। সুতরাং কোন কোন বিষয়ে একটু সাবধান হইলেই উপদংশের আক্রমণ হইতে

নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। কারণ এপর্য্যন্ত কোথাও দেখা যায় নাই যে, আপনা হইতেই কাহারও উপদংশ হইয়াছে। প্রথমে এই উপদংশ ব্যাধি কেমন করিয়া উৎপন্ন হইল তাহা কেহই বলিতে পারেন না। তবে বহু পূর্ব্বকাল হইতে ইহা স্পর্শাক্রামক হইয়া বহু ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়াছে। নূতন হইয়া আর সৃষ্ট হয় নাই। কলেরাও কি তবে এইরূপ উপদংশ পীড়ার ন্যায় একবার দৈবাৎ সৃষ্ট হইয়াছিল এবং তদবধি স্পর্শাক্রামক হইয়া দেশ বিদেশ ছড়াইয়া পড়িয়াছে? কিন্তু কলেরা যদি কেবল স্পর্শাক্রামক হইয়াই ব্যক্তি বিশেষকে আক্রমণ করিত, তবে বিশেষ সাবধান হইলে কলেরার হাত হইতে বাঁচিবার উপায় থাকিত। কিন্তু তাহা নহে। যদি অন্য অন্য দূরদেশ সকল বিশেষ সাবধান হইলে কলেরা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে, কিন্তু আমাদের এই পোড়া ভারতবর্ষে সিটি হইবার যো নাই। কোন কোন দেশে কোন কোন বিশেষ পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ কিংবদন্তি আছে যে, বাঙ্গলাদেশ হইতেই প্রথম কলেরা উৎপন্ন হইয়া অন্যান্য দেশে গমন করিয়াছে। ইউরোপ প্রভৃতি দেশে পূর্ব্বে নাকি কলেরা হইত না। এইজন্যই ওলাউঠা ব্যাধির অপর নাম "এসিয়াটিক কলেরা"। কলেরার বীজ (সে বীজ যাহাই হউক না কেন) বাঙ্গলাদেশের ভূমিতে বা জলে বা বায়ুতে আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়া এককালে বহু ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে পারে। এই রোগের বীজকে হাম ও বসন্ত প্রভৃতি পীড়ার বীজের সহিত এক অংশে তুলনা করা যাইতে পারে। হাম ও বসন্ত আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহার পর স্পর্শাক্রামক হইয়া অন্য ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে পারে। সুতরাং যদিও পরে সাবধান হইলে কতকগুলি ব্যক্তিকে হাম ও বসন্তের হাত হইতে বাঁচাইতে পারা যায়, কিন্তু সকল ব্যক্তিকে রক্ষা করা যায় না; কারণ, যাহাদের আপনা হইতে হাম জন্মাইল তাহাদের আর উপায় কি আছে? কলেরাও এইরূপ ব্যাধি। অনেক দেখিয়া শুনিয়া ইহাই অনুমান হয় যে, কলেরা আপনা হইতেই স্থান বিশেষে উৎপন্ন হইয়া কোন ব্যক্তিবিশেষকে বা কতকগুলি ব্যক্তিকে একেবারে আক্রমণ করে এবং তদ্পরে উহার বীজ খাদ্য পানীয় বা বায়ু সহকারে অন্য ব্যক্তিতে সঞ্চারিত হইয়া তাহারও পীড়া উৎপন্ন করিতে পারে। কিন্তু কলেরা ঠিক কিরূপ ভাবে অন্য ব্যক্তিতে সঞ্চারিত হয়,

তাহাও ঠিক করিয়া বলিবার যো নাই। কারণ এমন প্রায় দেখা যায়, যাহারা কলেরা রোগীর সুশ্রুষায় নিযুক্ত থাকে, তাহাদের হয়ত কাহারও উক্ত ব্যাধি হইল না। এইজন্যই অনেক আধুনিক বিজ্ঞ খিজ্ঞ চিকিৎসকগণ অনুমান করেন যে, কলেরার বীজ উদরস্থ না হইলে উক্ত পীড়া জন্মায় না। কলেরা সংক্রান্ত মল বা বোমি ইত্যাদি কোন প্রকারে খাদ্য বা পানীয় সহযোগে উদরস্থ হওয়া চাই। সুতরাং কোন স্থানে কলেরা দেখা দিলে খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হইলে যদিও অনেক ব্যক্তিকে কলেরার আক্রমণ হইতে বাঁচাইতে পারা যাইতে পারে কিন্তু প্রথম প্রথম কলেরার বীজ উৎপন্ন হইয়া যাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে রক্ষা করিবার উপায় কি? কি কারণসমষ্টি একত্র হইলে এই ভয়ানক বিষের সৃষ্টি হয়, তাহা অদ্যাপি ত কোন বিজ্ঞানবেত্তা ঠিক্ করিয়া বলিতে পারেন না।

কলিকাতা বহরমপুরপ্রভৃতি স্থানে বছর বছর কলেরার প্রকোপ হইয়া থাকে, সুতরাং এমন বলা যাইতে পারে যে, সেই একই কলেরার বীজ বৎসর বৎসর খাদ্য পানীয় প্রভৃতির দ্বারা কোনরূপে শরীরে নীত হইয়া উক্ত ব্যাধি উৎপন্ন করে। কিন্তু এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে কি কারণে কলেরা উৎপন্ন হইল তাহা কিছুই ঠিক করিয়া বলিবার যো নাই। বোধ হয় যেন সেই স্থানের ভূমি বা বায়ু হইতে বা ব্যক্তি বিশেষের শরীর হইতে আপনাআপনিই কলেরার বীজ সৃষ্ট হইল।

বহরমপুরের উত্তর পশ্চিম ২০ বিশ মাইল দূরে বাজিতপুর বলিয়া একখান গ্রাম আছে। ঐ গ্রাম হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যাবধানে শেয়াল-মারী নামক একটী ক্ষুদ্র নদী আছে। নদীটী বর্ষাকালে বহতা থাকে কিন্তু গ্রীষ্মকালে ইহার জল প্রায় শুকাইয়া যায় এবং সামান্য স্রোত থাকে। ঐ স্রোতও নদীর স্থানে স্থানে প্রস্রবন হইতে উৎপন্ন হয়, কারণ আশ্বিন মাসেই নদীর মোহানা বন্ধ হইয়া যায়। বাজিতপুর হইতে এক মাইল দূরে ঐ নদীর ধারে আজিমগঞ্জ বলিয়া একটা বাজার আছে। বাজিতপুর হইতে আজিমগঞ্জ পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে লোকালয় আছে, মধ্যে মধ্যে দুদশ হাত খালি জমি পড়িয়া আছে। বাজিতপুরের দক্ষিণ এক মাইল ব্যাবধানে ওয়াট্সন সাহেবদিগের একটা নীলকুঠী আছে, উহাকে ডোমকোলের কুঠী

কহে। বাজিতপুরের পশ্চিম উত্তর কোণে ঐ শেয়ালমারী নদীর ধারে প্রায় দেড় মাইল অন্তরে রমণা নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ডোম কোলের কুঠীর পশ্চিমে প্রথমতঃ সাতবেড়িয়া নামক গ্রাম, তারপর আরও পশ্চিমে কিয়দ্দূরে হেতানপুর নামক গ্রাম আছে। বাজিতপুর ও তন্নি-কটবর্ত্তী গ্রাম গুলি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। নিজ বাজিতপুর গ্রাম খানি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। গ্রামে জঙ্গল বা পচা জলাশয় বা ডোবা নাই। গ্রামের উত্তরদিকে একটী পুষ্করিণী আছে। পুষ্করিণীটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাহাতে এখানকার লোকে স্নানাদি করে এবং অনেকেই উহার জল পান করে। এই গ্রামের দক্ষিণপূর্ব্বে আর একটি পুষ্করিণী আছে। সেটী তত ভাল নহে এবং গ্রীষ্মকালে প্রায় তাহাতে জল থাকে না। বাজিতপুর, আজিমগঞ্জ, ডোমকাল প্রভৃতি গ্রামগুলি বর্ষাকালে জল প্লাবিত হয় না। এমন কি ১৮৮৬ সালের প্রবল বন্যাতেও (যে বন্যায় লাল্‌তেকুঁড়ির বাঁধ ভাঙ্গে) বাজিতপুর ও আজিমগঞ্জ জলপ্লাবিত হয় নাই। এখানকার প্রাচীন ব্যক্তিরা কহেন, এই বাজিতপুর গ্রামে ১২৫৭ সালে একবার ওলাউঠা হইয়া অনেকগুলি লোক মরিয়াছিল। সেই সময় হইতে ১২৯৪ সাল পর্য্যন্ত এই গ্রামে কখনও কলেরা হয় নাই। প্রবন্ধলেখক এই দেশ সম্বন্ধে পাঁচ বৎসরের খবর বলিতে পারেন। এই পাঁচ বৎসর কাল বাজিতপুরে একটীও কলেরা বা কলেরার অনুরূপ কোনও ব্যাম হয় নাই। ১৮৮৬ সালের কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে আজিমগঞ্জের বাজারে কলেরার প্রকোপ হইয়া ১৯ জন লোক মারা পড়ে। ঐ সকল মৃতদেহের সৎকার শিয়ালমারী নদীতেই হইত। শিয়ালমারীতে অনেকে মলিন বস্ত্রাদিও ধৌত করিয়া-ছিল। বাজিতপুরের দু একটী ভদ্র পরিবার আজিমগঞ্জের নিম্নস্থ শিয়াল-মারী নদী হইতে জল আনাইয়া ঐ জল পানার্থে ব্যবহার করেন। বাজিত-পুরের অপর সাধারণ সকল লোকেই আজিমগঞ্জের বাজার হইতে মাছ, তরকারি প্রভৃতি আনিয়া খায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এইযে, আজিম-গঞ্জে সেবার উনিশ জন লোক কলেরার দ্বারা মৃত হওয়া সত্বেও বাজিতপুর ও ডোমকোল প্রভৃতি স্থানে একটিও কলেরা হইল না। তারপর হইতে এপর্য্যন্ত আজিমগঞ্জেও আর কলেরা হয় নাই। বর্ত্তমান সনে অর্থাৎ ১৮৮৯ সালের মার্চ্চ মাসে রমণা ও বাজিতপুর গ্রামে হঠাৎ কলেরা হইয়া অনেক

গুলি লোক মারা পড়িয়াছে এবং এখনও দু একটী লোক মরিতেছে। আবার বাজিতপুরের নিকটেই ডোমকোল ও আজিমগঞ্জে একটীও কলেরা হয় নাই। শিয়ালমারীর ধারে রমনানামক স্থানে এবার এত লোক কলেরায় মরিয়াছে যে, লোকে বাধ্য হইয়া ঐ সকল মৃতদেহ না পোড়াইয়া শেয়ালমারীর নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছেন। রমণা হইতে আজিমগঞ্জের দিকে নদীর স্রোত আসিতেছে। আজিমগঞ্জের সমস্ত লোক ঐ শেয়ালমারীর জল ব্যবহার করা সত্ত্বেও তাহাদের কাহারও পীড়া হইল না, অথচ বাজিতপুর গ্রামে, যেখানকার সমস্ত লোকে স্থানীয় পুষ্করিণী ও কুপের জল ব্যবহার করে, এবং যেখানে পূর্ব্বে কখনও কলেরা হয় নাই সেখানে হঠাৎ কেন কলেরা জন্মাইল? এই বাজিতপুরে সর্ব্ব প্রথমে একটী মুসলমান বালকের কলেরা হয়, ঐ বালকটী নাকি পূর্ব্ব দিবস বাজিতপুরের পুষ্করিণীর পচা মৎস্য কিছু খাইয়াছিল। তারপর দুই চারি দিন পরে বাজিতপুরের অন্য পাড়ায় (যাহার সহিত মুসলমান পাড়ার সংস্রব মাত্র নাই) একটী পরিবারের একটী নবম বর্ষীয়া কন্যা কলেরায় আক্রান্ত হইয়া ১০ দশ ঘণ্টার মধ্যে প্রাণত্যাগ করে। এই বালিকাটী যে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, তাহারা গোয়ালার নিকট ক্রীত দুগ্ধ পান করেন না। তাঁহাদিগের বাটীতে গরু আছে সকলেই সেই সকল গো দুগ্ধ পান করেন। এবং কেহই কাঁচা দুগ্ধ পান করেন না। (বাঙ্গালীর মধ্যে প্রায় কেহই দুগ্ধ জ্বাল না দিয়া পান করেন না) সুতরাং দুগ্ধের সহিত কলেরার বীজ আসিয়া বঙ্গবাসী হিন্দুদিগকে কদাচিত আক্রমণ করে। ইহাতে স্পষ্ট অনুমান হয়, কলেরার বীজ স্থানবিশেষে আপনা আপনিই উৎপন্ন হইয়া এক বা ততোধিক ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে পারে, সুতরাং খাদ্য ও পানীয়সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হইলেও সকলে ইহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন না। বর্ষাকালে প্রায় কোন স্থানে কলেরা হইতে দেখা যায় না, এজন্য ডাক্তারগণ অনুমান করেন যে, বর্ষাকালে সমস্ত দেশ জলপ্লাবিত হইয়া কলেরার জীবাণু সকল ধৌত হইয়া বা মরিয়া যায়। কিন্তু একবার ধৌত হইয়া গিয়াও সেই স্থানে পুনর্ব্বার কলের দেখা দেয়, অথচ দূর হইতে খাদ্যাদি সহকারে কলেরার বীজ আনীত হইয়াছে এরূপ কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। আবার বাঙ্গালা দেশে কোন কোন স্থানে ঠিক্ যে সময় বর্ষার জল কম পড়িতে আরম্ভ হয়, সে

গেল। এই রাত্রিতে ঘণ্টাদেড়েক আন্দাজ রোগিণীর বেশ সুনিদ্রা হইল। তারপর এইরূপ চিকিৎসা-প্রণালীতে অতি অল্পদিন মধ্যেই রোগিণী ৪।৫ ঘণ্টা নিদ্রা যাইতে লাগিল। পূর্ব্ব বর্ণিত ষ্ট্রীক্নীয়া মিকচার বরাবর সেবন করিতে দেওয়া গিয়াছিল।

৩। রোগিণীর বয়ঃক্রম ৩৫ বৎসর, তিন সন্তানের জননী, কেবল একটী মাত্র সন্তান বাঁচিয়া আছে। এই সকল সাংসারিক দুর্ঘটনায় রোগিণীর মনে বিলক্ষণ অসুখের সঞ্চার হয়। তাহার পর রোগিণী মস্তক ঘূর্ণন পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হন। তারপর চক্ষে ঝাপসাদৃষ্টি, শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা, হস্ত পদের অসাড়তা প্রভৃতি লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়। রোগিণীর সুনিদ্রা হইত না, এবং বামদিকের উরুদেশ অসাড় ও উহার উপর যেন পিপীলিকা বিচরণ করিতেছে এইরূপ বোধ হইত। রোগিণীর বর্ণ মলিন, চক্ষুকণিনীকা প্রসারিত, নাড়ী প্রতি মিনিটে ৯৬ হইতে ১১০ বার স্পন্দিত হইতেছিল। রোগিণীর দাস্ত পরিষ্কার ছিল, কিন্তু মল কর্দ্দমবৎ বর্ণ বিশিষ্ট এবং শুষ্ক হইত এবং মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে বেদনা করিত। রোগিণীকে নিম্নলিখিত পিল খাইতে দেওয়া গেল।—

ব্লুপিল	১½ গ্রেণ
কুইনাইন	২ গ্রেণ
সল্‌ফেট্ অব্ আয়রণ	½ গ্রেণ

একসট্রাকট্ ট্যারাক্সেকম্ যথাপ্রয়োজন মিশ্রিত করিয়া একটী বটিকা।

পুর হই এই বটিকা দুইবার আহারের পর দেওয়া গেল। প্রত্যহ পূর্ব্ব বর্ণিত করিতে ...রে উষ্ণ জলে গাত্র মার্জ্জন করা যাইতে লাগিল। রোগিণীকে যথেষ্ট লামপুর ...ণে তরল পানীয় দেওয়া যাইতে লাগিল। এইরূপ চিকিৎসার ১৫ প্রবল নদী ...পরে উক্ত পিল বন্ধ করিয়া নিম্নলিখিত ঔষধ দেওয়া যাইতে লাগিল।

করে, অথচ এর্গোটিন	১ ড্রাম
সহরে কলের জল ষ্ট্রি নক্সভম	৫ গ্রেণ
কি প্রায় বারমাস কলের	১ ড্রাম

কয়েক বৎসর কলেরার করিয়া ৩০টী বটিকা প্রস্তুত কর। প্রত্যহ আহারের কলের জল যথেষ্ট পরিষ্কা সেবন করিতে দেওয়া গেল।

সুনিদ্রা হইতে লাগিল। মস্তকের পশ্চাদ্ভাগের শিরঃপীড়াও ভারবোধ কমিয়া গেল। কিন্তু এরূপ চিকিৎসায় নিদ্রা অতি সামান্যই হইতে লাগিল। তারপর প্রত্যহ দশ পনের মিনিট ধরিয়া শয়নকালে পূর্ব্ব বর্ণিত প্রকারে উষ্ণ জলে স্পঞ্জ ভিজাইয়া রোগিণীর পৃষ্ঠবংশ মার্জ্জন করিতে আরম্ভ করা গেল এবং শয়নের অব্যবহিত পূর্ব্বে উষ্ণ দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া গেল। এইরূপ চিকিৎসা করা মাত্র প্রথম রাত্রিতেই রোগিণীর বেশ সুনিদ্রা হইল। রোগিণী তার পরদিন ব্যক্ত করিল যে, কতিপয় মাস হইতে তাহার এরূপ সুনিদ্রা আর হয় নাই। ক্রমশঃ—

ICTERUS NEONATORUM.

(chelidonium maj.)

বাল্যাবস্থায় নেবা ও যকৃত বিবৃদ্ধির ঔষধ।

(চেলিডোনিয়াম মাজু।)

ডাইলুষণ।—নেবা ও যকৃত বিবৃদ্ধির (Biliary Cirrho-sis) পিত্তপ্রণালী-সম্ভূত যকৃতের আয়তনের হ্রাস; ও এই হ্রাস হইবার পূর্ব্বে যে আয়তন বিবৃদ্ধির পক্ষে চেলিডোনিযাম ১ হইতে তৃতীয় ডাইলুষণের অনেক স্থলে ব্যবহার করিয়া উপকার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

কার্য্যকারিতা।—এই ঔষধের কার্য্যকারিতা যকৃত ও ফুস্ফুসের উপরই অধিক, সুতরাং এই ঔষধের গুণ বর্ণন কালীন আংশিক ক্রিয়া বিশেষ না করিয়া সম্পূর্ণ ভৈষজ্যধর্ম্ম লিখিত হইল। ... যাবে,

প্রয়োগ।—ফুস্ফুস্ ও যকৃতের রক্তাধিক্য, উহাদের উত্তেজ... হাত প্রদাহে, পাণ্ডুরোগ, ও নিউমোনিয়া হইয়া ফুস্ফুস্ যখন শক্ত ও জমা ... স্থানে হইয়া যায়। ... , বর্ষাকালে

সমতুল্য ঔষধ।—ব্রাইওনিয়া, ফস্ফরাস্, নক্স ... হইয়া বা মরিয়া ও চায়না। ... ন পুনর্ব্বার কলেরা

জ্বর।—বৈকালে সমস্ত দেহ অপেক্ষা হাত ও প... বীজ আনীত হই- প্রাতঃকালে ঘর্ম্মবোধ, সমস্ত শরীর শীতল ও কম্প, অ... বাঙ্গালা দেশের

সময় ভয়ঙ্কর কলেরা আরম্ভ হয়। অতএব বর্ষাকালে কলেরার পুরাতন বীজ সকল নষ্ট হইয়া গিয়াও জল নামিবার সময় বাঙ্গালাদেশের স্থানবিশেষের ভূমিতে বা জলে কলেরার নূতন নূতন বীজ সকল সৃষ্ট হয় এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। এই সকল বীজ যে কেমন করিয়া উৎপন্ন হয়, কি উহা আদৌ কোন জীবাণু, কি অন্য কোন পদার্থ যাহা ভূমিতে বা জলে উৎপন্ন হয়, বা পরমাণুরূপে বাঙ্গালাদেশের স্থানবিশেষের হাওয়াতে উৎপন্ন হয়, তাহারই বা সঠিক্ প্রমাণ কি? দূষিত পানীয়জলের সঙ্গে কলেরার কতটুকু সম্বন্ধ আছে, তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলিবার যো নাই। ডোমকোলের কুঠির পশ্চিমে সাতবেড়িয়া নামে একখান মুসলমানের গ্রাম আছে। ঐ গ্রামের লোকে একটী পুষ্করিণীর জল ব্যবহার করে। ঐ পুষ্করিণীর জল কোনমতেই বিশুদ্ধ নহে। বাঙ্গালার সানিটরি কমিসনর মহোদয় যে যে কারণে পুষ্করিণীর জল দূষিত হয় বলিয়াছেন, তাহার সকল গুলিই ঐ পুষ্করিণীতে বিদ্যমান আছে। আবার দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ জলাশয়ে কোন জলোদ্ভিদ্ নাই, যদ্বারা উহার দূষিত জল কিয়ৎ পরিমাণে বিশুদ্ধ হইতে পারে। ঐ গ্রামের স্ত্রীলোক ও বালকগণ সর্ব্বদা ঐ জল ব্যবহার করিতেছে, অথচ বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে সাতবেড়িয়া গ্রামে একটীও কলেরা দেখা দেয় নাই। অন্ততঃ গতবৎসর ও এবৎসর কলেরার লেশমাত্রও নাই। আবার অত্যন্ত তেজবতী গঙ্গা (পদ্মা) নদীর ধারে রামপুরসহর স্থিত। ঐ রামপুরের সমস্ত লোকেই পদ্মার জল ব্যবহার করে। অথচ বিগত কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ মাসে রামপুরে ভীষণ কলেরা দেখা দিয়াছিল। সেই সময় রামপুর হইতে অনেক বিদেশী ভদ্রলোক ও স্কুলের ছাত্র রামপুর হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আবার বহরমপুর হইতে ১৬ মাইল দূরে ইস্লামপুর নামক একখান গ্রাম আছে। ঐ গ্রাম ভৈরব নামক একটী বৃহৎ ও প্রবল নদীর ধারে স্থিত। ঐ গ্রামের লোকে পানার্থে ঐ নদীর জলই ব্যবহার করে, অথচ ঐ গ্রামে এবার অত্যন্ত কলেরা দেখা দিয়াছে। কলিকাতা সহরে কলের জল ব্যবহৃত হইতেছে। কলিকাতাতেও বছর বছর এমন কি প্রায় বারমাস কলেরা লাগিয়াই আছে। কলের জল ব্যবহারে বিগত কয়েক বৎসর কলেরার প্রাদুর্ভাব কিছু কম পড়িয়াছিল, কিন্তু ১৮৮৩ সালে কলের জল যথেষ্ট পরিমাণে যোগানসত্ত্বেও ভয়ঙ্কর কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়া-

ছিল। এমন কি, কলিকাতার ডাক্তারগণ বলিয়াছিলেন, এমন ভয়ঙ্কর সাংঘাতিক মারাত্মক কলেরা কলিকাতায় বহুকাল হয় নাই। আবার এই ১৮৮৬ সালেই বহরমপুর, আজিমগঞ্জ এবং নদীয়া জেলা এবং সম্ভবতঃ অন্যান্য স্থানেও খুব কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। আবার যে কয়েক বৎসর কলিকাতায় কলেরা কম হইয়াছিল, সেই কয়েক বৎসর বাঙ্গালাদেশের অন্যান্য স্থানেও কলেরা কম ছিল। সুতরাং পানীয়জলের উন্নতির সহিত কলেরার কতটা প্রকোপ কম পড়িতে পারে, তাহা এখনও নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে না। আবার জ্বর প্রভৃতি পীড়া সম্বন্ধেও বিগত কয়েক বৎসর হইতে যেমন কলিকাতা সহর অনেক ভাল আছে, সেইরূপ ম্যালেরিয়া জ্বরের আগারস্বরূপ নদীয়া, কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, হুগলী, বর্দ্ধমান, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানও অপেক্ষাকৃত ভাল আছে। নদীয়া, হুগলী, মুরশিদাবাদ প্রভৃতি জেলার অনেক পল্লিগ্রামে যে সকল স্থানে বৎসর বৎসর ম্যালেরিয়া হইত, সে সকল স্থান বিগত কয়েক বৎসর হইতে বেশ ভালই আছে। এবার মেহেরপুর, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, রাণাঘাট, নদীয়া, উলো প্রভৃতি স্থানে জ্বরের লেশমাত্রও নাই। কলিকাতাও খুব সুস্থ আছে। বহরমপুরে যদিও পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবৎসর জ্বর কিছু বেশী হইয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্বে পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৮১।৮২ সালে ও তৎপূর্ব্বে যেরূপ ম্যালেরিয়া হইত সেরূপ অনেক দিন আর দেখা যায় নাই। বাঙ্গালাদেশের পল্লিগ্রামসকলে কুইনাইন ও ম্যালেরিয়া জ্বরের প্যাটেণ্ট ঔষধ যেরূপ অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইত, এখন আর সেরূপ হয় না। বাঙ্গালাদেশে যে সকল ডাক্তার স্বাধীনভাবে ব্যবসা চালাইতেছেন, তাঁহারা সমস্বরে বলিতেছেন, বাঙ্গালাদেশের জলহাওয়া ভাল হইয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমান, কাল্না, কাটোয়া প্রভৃতি স্থানেও আর বড় একটা জ্বর জাড়ি নাই। ১৮৮০-৮১ সালে ও তৎপূর্ব্বে অক্টোবর, নবেম্বর মাসে কলিকাতা সহরে ও সহরতলিতে এত জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইত যে, ডাক্তারগণ খাওয়াদাওয়ার অবকাশ পাইতেন না। কিন্তু এক্ষণে প্রায় কোন ডাক্তারেরই কলিকাতায় আর বড় একটা পসার নাই। কলিকাতার ঔষধালয় সকলেও আর সেরূপ ঔষধবিক্রয় নাই। হইতে পারে কলিকাতার মিউনিসিপালিটীর সুবন্দোবস্তে সহর হইতে জ্বর পলায়ন করিয়াছে, কিন্তু কলিকাতার ড্রেণও জলের কল অনেকদিন হইতে

সৃষ্ট হইয়াছে, অতএব ১৭৮০-৮২ সালে ও তৎপূর্ব্বে কলিকাতায় ওরূপ জ্বরের প্রকোপ হইয়াছিল কেন, এবং এখনই বা সেরূপ প্রকোপ নাই কেন? এবং নদীয়া, মেহেরপুর, রাণাঘাট, উলা, শান্তিপুর, হুগলী প্রভৃতি স্থানে ঐ ঐ বৎসর জ্বরের অত্যন্ত প্রকোপ হইয়াছিল। মুরশিদাবাদ জেলাতেও খুব জ্বর হইত। এক্ষণে যেমন কলিকাতার নিকটস্থ দেশসকলের জলহাওয়া ভাল হইয়াছে, সেইরূপ কলিকাতারও জলহাওয়া ভাল হইয়াছে। এবং যখন কলিকাতার নিকটস্থ স্থানসকলে জ্বর ও ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়, তখন এত কলের জল ব্যবহারস্বত্বেও কলিকাতা অব্যাহতি পায় না। পূর্ব্বে যখন পল্লিগ্রামে সকলের ম্যালেরিয়াজনিত কম্পজ্বর হইত, তখন কলিকাতায় কম্পজ্বর বেশী না হউক কিন্তু স্বল্পবিরাম জ্বর অত্যন্ত বেশী হইত। কিন্তু স্বল্পবিরামজ্বর অথবা রেমিটেণ্টফিবার কম্পজ্বরেরই প্রকারভেদ মাত্র।

নদীয়া জেলায় চূর্ণীনদীর ধারে রাণাঘাট নামক স্থান। পূর্ব্বে রাণাঘাট অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। সে সময় রাণাঘাট অঞ্চলে কলিকাতার লোকে হাওয়া খাইতে আসিত। পরে যখন সমস্ত বাঙ্গালাদেশ ম্যালেরিয়া জ্বরের আবাসভূমি হইল, তখন বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানের ন্যায় রাণাঘাটেও ম্যালেরিয়া প্রবেশ করিল। পূর্ব্বে যখন রাণাঘাটের খুব ভাল অবস্থা তখন রাণাঘাটে মিউনিসিপালিটী ছিল না। পরে রাণাঘাটে একটী ক্ষুদ্র মিউনিসিপালিটী হয়। রাণাঘাটের নীচের চূর্ণীনদী চিরকাল বহতা আছে। উহার কখনও মুখ বন্ধ হয় নাই। রাণাঘাটে ইষ্টারণবেঙ্গলরেলওয়ে বহু কাল হইতে আছে। এই রাণাঘাটে মিউনিসিপালিটী থাকাস্বত্বেও বহুদিন পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া জ্বরভোগ করিয়া এখন একবারেই ক্ষান্ত হইয়াছে। ১৮৮০ ৮১ সালে ভয়ানক ম্যালেরিয়া হয়, তৎপূর্ব্বেও ম্যালেরিয়া ছিল। তবে কতদিন ছিল, তাহা বলিতে পারি না। তারপর ৮৩ সাল হইতে ক্রমে কম পড়িয়া গত তিন বৎসর হইতে একবারেই ক্ষান্ত হইয়াছে। এবৎসর মোটেই জ্বর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অথচ মিউনিসিপালিটী যে স্বাস্থ্যরক্ষার কোন নূতন বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহাও করেন নাই। রেইলওয়ে দ্বারা জলনিকাশ বন্ধ হওয়া যে ম্যালেরিয়াজ্বরের কারণ, তাহাও মিথ্যা বলিয়া অনুমান হয়। অতএব ম্যালেরিয়া ও কলেরা বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে আপনা হইতেই উৎপন্ন হয় এবং কোন নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনহেতু আপনাআপ-

নিই তিরোহিত হয়। পূর্ব্বে ইংলণ্ডে ম্যালেরিয়া ছিল। এরূপ কথিত আছে যে, ইংলণ্ডের পচাজলা, বিল প্রভৃতি বোঁজাইয়া দেওয়ায় ঐ দেশ হইতে ম্যালেরিয়া জ্বর বিতাড়িত হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ প্রথা বাঙ্গালা-দেশের পক্ষে কতদূর কার্য্যকারী এবং আদৌ সম্ভবপর কি না, তাহার মীমাংসা হওয়া দুরূহ।

হোমিওপ্যাথি-ঔষধতত্ত্ব।

একোনাইট (উল্‌ফ বেন)।

একোনাইট নেফেলাষ নামক উদ্ভিজ্জের অরিষ্ট (প্রথম শ্রেণী)। মূলের অরিষ্ট (দ্বিতীয় শ্রেণী) বিষমগুণবিশিষ্ট ঔষধ বেল, কফিয়া, ভেরাট, সুরা ও উদ্ভিদ্ হইতে যে সকল ঔষধ প্রস্তুত হয়।

সমগুণবিশিষ্ট।—ব্রাই. সিমিসি, ক্যাকট্যাস্, নেজা, স্পিজি, সিকু।

মাত্রা।—১×,৩×,৩০. ক্রম।

যে যে যন্ত্রের উপর ইহার যে যে কার্য্য দৃষ্ট হয়, তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

১। হৃদ্‌পিণ্ড—উহার গতি ও বলের হ্রাস।

২। রক্তসঞ্চালন—ধমনীমধ্যস্থিত স্নায়ুর অল্প পক্ষাঘাত।

৩। দৈহিকউত্তাপ—তাপের হ্রাস ও ঘর্ম্ম।

৪। স্নায়ুশিরা ও স্নায়ুকেন্দ্র—পক্ষাঘাত।

৫। শ্লৈষ্মিকঝিল্লি—প্রদাহ।

৬। পাকস্থলি—রক্তসঞ্চার, স্নায়ুশূল ও বমন।

৭। ফুস্‌ফুস্—নিউমোগ্যাষ্ট্রিক (ভেজাই) স্নায়ু পক্ষাঘাত, ফুস্‌ফুসে রক্তসঞ্চার ও প্রদাহ।

৮। পেশি ও পেশিরজ্জু—বাতসংক্রান্ত প্রদাহ।

৯। রক্তাম্বুঝিল্লি—প্রদাহ।

এখন দেখা যাউক ঐ সকল যন্ত্রের উপর ইহা কি প্রকারে কার্য্য করে।

হৃদ্‌পিণ্ড ও কৈশিক ধমনী—বিষাক্ত মাত্রায় একোন ব্যবহারে হৃদ্‌পিণ্ডস্থিত স্নায়ুগ্রন্থির সর্ব্বাগ্রে পক্ষাঘাত উৎপন্ন হয়, ঐ স্নায়ুগ্রন্থির দ্বারা হৃদ্‌পিণ্ডের গতি*(সঙ্কোচন ও প্রসারণ) সম্পাদন হয়। এই হেতু ঐ গতির বা স্পন্দনের প্রথমে হ্রাস অর্থাৎ ১ মিনিটে যতবার স্পন্দন হইয়া থাকে তাহার কম হয়, তদপরে হৃদ্‌পিণ্ডপেশির শিথিলতাপ্রযুক্ত স্পন্দন বৃদ্ধি হয় এবং অবশেষে সঙ্কোচন ও প্রসারণগতির বৈষম্য হইয়া উভয়গতির মধ্যবর্ত্তী বিরামকালের দীর্ঘতা ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া হৃদ্‌পিণ্ডগহ্বর সকল রক্তপূর্ণাবস্থায় রোগীর মৃত্যু হয়। স্পন্দনের বল ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে যে পর্য্যন্ত মৃত্যু না হয়।

হৃদ্‌পিণ্ড দুইটী স্নায়ুদ্বারা পরিচালিত হয়। ১। নিউমোগ্যাষ্ট্রিকস্নায়ু। ২। স্নায়ুগ্রন্থি সিম্প্যাথেটিক বা সমবেদনস্নায়ু। প্রথম স্নায়ু কোন প্রকারে উত্তেজনা করিলে হৃদ্‌পিণ্ডের গতি হ্রাস হয় এবং উহার পক্ষাঘাত জন্মাইলে হৃদ্‌পিণ্ডের গতির অতিশয় বৃদ্ধি ও বিষম হয়। দ্বিতীয় স্নায়ুর উত্তেজনায় ও পক্ষাঘাতে ঠিক বিপরীত ফল উৎপাদন হয়। এই দুই প্রকার স্নায়ুদ্বারা হৃদ্‌পিণ্ড ও ফুস্‌ফুস্ পরিচালিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন পাকাশয়ে উত্তাপ বোধ, কখন কখন বিবমিষা ও বমন হয়। পাকাশয়ের উত্তাপঅনুভব ক্রমে সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইতে থাকে। জিহ্বায় ও ওষ্ঠদ্বয়ে স্পন্দন ক্রমে চতুষ্পার্শ্বে ব্যাপ্ত হয়। আল্‌জিহ্বা ও জিহ্বা স্ফীত ও বৃহৎ অনুভব হয় এবং পুনঃ পুনঃ গলাধরিতে বাধ্য হয়। মাত্রা কিছু অধিক হইলে ঐ প্রকার অনুভব অঙ্গুলীর অগ্রভাগে অল্প অল্প স্থানে হইতে থাকে। ইহার কারণ এই যে, রক্তশিরায় যে সকল স্নায়ু আছে তাহাদিকে ভাজোমোটরস্নায়ু বলে, ঐ সকল স্নায়ু ধমনী সকলের, বিশেষ কৈশিক ধমনী আয়তন সমভাবে রক্ষা করে। কিন্তু একোনাইট অধিক মাত্রায় ব্যবহারে ধমনীস্থিত ঐ স্নায়ু সকলের ক্ষণস্থায়ী পক্ষাঘাত জন্মে এইজন্য উহাদের আয়তন বৃদ্ধি এমন কি ঠিক ডবল হইয়া উঠে, কাজেই যন্ত্রস্থিত রক্তসকল বৃদ্ধিস্থান পূর্ণার্থে অধিক আয়তনবিশিষ্ট কৈশিকধমনী মধ্যে আসিতে থাকে। এই কারণবশতঃ কোন যন্ত্রের বা কোন স্থানের প্রদাহ জন্মিলে ঐ স্থানে যে অধিক পরিমাণে রক্তের সঞ্চার হয়, তাহা একোন ব্যবহারে কৈশিকধমনী প্রবেশ করায় প্রদাহের শান্তি হইয়া থাকে।

যে কোনপ্রকার প্রখর প্রদাহে, বিশেষ যে সকল প্রদাহ হঠাৎ বায়ুর সন্তাপ পরিবর্ত্তনে যথা—অতি উষ্ণতা হইতে শীতল; হঠাৎ কোন স্থানে রক্তসঞ্চার হইয়া প্রদাহ উৎপাদন, নাড়ীপূর্ণ ও বলিষ্ঠা, আক্রান্তস্থান অতিশয় উষ্ণ, অস্থিরতা, তৃষ্ণা, অতিরিক্ত স্নায়ুবিকউত্তেজনা এবং মানসিক উদ্বেগ বর্ত্তমান থাকে, তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শে। কিন্তু প্রদাহের প্রথমাবস্থা ভিন্ন ইহাতে কোন উপকার দর্শে না। প্রথমাবস্থা বলিলে এই বুঝাইবে যে. আক্রান্তস্থানে রক্তসঞ্চার হইয়া স্ফীত, আরক্ত, উষ্ণ বেদনাযুক্ত হইয়াছে। এই প্রথমাবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয়াবস্থা যথা—স্থানিক ক্রিয়াবিকার ও পেশী ধ্বংস হইয়া পূয় হইতে আরম্ভ হইলে ইহাতে কোন উপকার দর্শে না।

এ অবস্থায় ব্রাই, বেল, রাস-টক্স, হিপার, সিলিসিয়া বা মার্ক সল ব্যবহার হয়। ডাক্তার হানিমান বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন এবং ইহা সকলের মনেরাখা কর্ত্তব্য যে, মানসিক ও শারীরিক উদ্বেগ, অস্থিরতা এবং অশান্তি এই কয়েকটী প্রখর প্রদাহের প্রথম ও প্রধান লক্ষণ। কৈশিক ধমনীর উত্তেজনাই (প্রধানর পূর্ব্ব লক্ষণ) ইহার কারণ। প্রদাহ কোন স্থানে বদ্ধমূল হইয়া রক্ত হইতে রস (সিরাম) ক্ষরণ (যাহা পরিণামে পূয়রূপে পরিণত হয়) হইতে আরম্ভ হইলে মানসিক উদ্বেগ ইত্যাদির শান্তি হয়।

এই সকল কারণে যে কোন প্রখর প্রদাহের প্রথমাবস্থায় একোনাইটই প্রধান ঔষধ। আভ্যন্তরিক প্রদাহ উৎপন্ন হইলে আমরা কিরূপে জানিব যে কোন্ সময় উহার প্রথমাবস্থা ও কোন সময় বা দ্বিতীয়াবস্থা? তাহা জানিবার উপায় একোনাইটের স্বভাবসিদ্ধ লক্ষণ সকল মনে রাখা-যথা, দৈহিক উত্তাপ, অথবা বাহ্যিক শিথিলতা ও আভ্যন্তরিক উষ্ণতা, তৃষ্ণা, নাড়ীক্রুত ও উত্তেজিত, অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, ও প্রচণ্ড উত্তাপ, মানসিক উদ্বেগ ও অস্থিরতা, শয্যায় এপাশ ওপাশ করা, কিছুতেই শান্তি হয় না, ও মৃত্যুর ভয় এই সকল একোনের প্রদাহের প্রথমাবস্থার লক্ষণ।

ভয় হওয়া একটী সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ। ডাক্তার গারেন্সি বলেন যে, অতিরিক্ত ভয়, মানসিক উদ্বেগ, স্নায়ুবীয় উত্তেজনা, বাহিরে অথবা যে স্থলে অধিক লোক আছে এমত স্থলে যাইতে অথবা রাস্তার অপর পারে যাইতে ভয়, এই প্রকার সকল বিষয়ে অযথা ভয়হেতু তাহার জীবনে কিছুমাত্র সুখ থাকে

না, উহার মুখ দেখিলে সর্ব্বদা ভীত বলিয়া বোধ হয়। মৃত্যুভয়, যে দিবস মৃত্যু হইবে তাহা গণনা করিয়া বলা, নচেৎ অমুক তারিখে মৃত্যু হইবে তাহা ভাবিয়া অতিশয় ভয়, গর্ভাবস্থায় ভয়, মনে যেন সন্তান বিকৃতি হইবে অথবা প্রসবকালীন মৃত্যু হইবে এই আশঙ্কা (গা) কাতরস্বরে উদ্বেগ-গ্রস্ত হইয়া ক্রন্দন, সামান্য কারণে আপনাকে নিন্দা, প্রলাপ, বিশেষ রাত্রে, রাগ সহকারে অর্থহীন বাক্যব্যয়, শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া প্রস্থান, প্রাতে অতিরিক্ত ঘর্ম্ম (ডাক্তার হেরিং) অস্থিরতা, অসহনিয় যন্ত্রণা অনুভব, আন্ত-রিক উদ্বেগ, অতিশয় ব্যস্তসহকারে সকল কার্য্য সম্পন্ন করা, অনবরত অস্থির হইয়া বেড়ান বা স্থান পরিবর্ত্তন। (হে) গানবাদ্য অসহনীয়, উহাতে বিমর্ষতা প্রাপ্ত, কাহার প্রতি স্নেহ না থাকা বিশেষ গর্ভাবস্থায় (হে)

শয্যা হইতে উঠিলে আরক্তমুখমণ্ডল মৃত্যুবৎ রক্তশূন্য হওয়া, অথবা শিরঘূর্ণন, এবং পাতন, পুনঃরায় উঠিতে ভয়, মধ্যে মধ্যে দৃষ্টি বা জ্ঞানের লোপ (হে)

একোনের একপ্রকার শিরঘূর্ণন বর্ণনা আছে, উহাতে মস্তিষ্কে জলের ঢেউর ন্যায় অনুভব হয়। উহা শির নত করিলে, চলিয়া বেড়াইলে এবং হঠাৎ শয্যা হইতে উঠিলে বা হঠাৎ দাঁড়াইলে অতিশয় বৃদ্ধি হয়। কখন কখন দৃষ্টি তিমির হইয়া উঠে। ইহার সহিত মস্তক বিদীর্ণকারী শিরঃপীড়া, নাড়ী-দ্রুত, মস্তক মধ্যে উত্তাপ অনুভব এবং মস্তকেও বক্ষে ঘর্ম্ম প্রকাশ হয় (ড্রা) প্রচণ্ড শিরঃপীড়া, বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক উষ্ণ জলের ন্যায় ফুটিতেছে, মস্তকে পূর্ণতা ও ভয় অনুভব, বোধ হয় যেন ললাট মধ্য হইতে ঠেলিয়া বাহিরে আসিবে, মস্তকে রক্তসঞ্চার হেতু শিরঃপীড়া, আতপঘাত, বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক কেহ নাড়িতেছে ও উঠাইতেছে, চলিয়া বেড়াইলে, মদ্যপানে, কথা কহিলে অথবা রৌদ্রে থাকিলে অতিশয় বৃদ্ধি, মুখমণ্ডল উষ্ণ, আরক্ত অথবা রক্তশূন্য, কর্ণমূলের ধমনীদ্বয়ের (কেরটিড় ধমনী) প্রচণ্ড স্পন্দন, নাড়ী পূর্ণ ও বলিষ্ঠ, অথবা ক্ষুদ্র ও দ্রুত; সায়ংকালে বৃদ্ধি, সংন্যাস (হে)

একোনাইটের শিরঃপীড়ার লক্ষণ অন্য কোন ঔষধে দৃষ্ট হয় না, যথা ললাটে ভারি বোধ ও চাপ অনুভব, বোধ হয় যেন ভিতর হইতে কোন ভারি পদার্থ বাহিরে আসিতেছে, দপদপে শিরঃপীড়ার সহিত আভ্যন্তরিক কম্প অনুভব, শিরঃপীড়ার স্থান ললাট ও পার্শ্ব ললাট, চক্ষু ও উপর মাড়ী পর্য্যন্ত

ব্যাপ্ত হওয়া, চলিয়া বেড়াইলে, শির নত করিলে, শব্দে বৃদ্ধি, বিশ্রামে শান্তি, মস্তক ও মুখমণ্ডল উষ্ণ বিশেষ আভ্যন্তরিক ; ঐস্থানে ঘর্ম্ম। (ডাং)

চক্ষু—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রখর প্রদাহ, বাতজনিত চক্ষুঃপ্রদাহ, চক্ষুদ্বয় অতিশয় বেদনাযুক্ত, বোধহয় যেন উহাতে কোন বাহ্যিক পদার্থ রহিয়াছে, আলকাতঙ্ক বিশেষ রৌদ্রের আলোক, উজ্জ্বল আলোক অসহনীয়, কনিনিকা সঙ্কোচিত পরে প্রসারিত, চক্ষু গোলক বিবৃদ্ধি অনুভব। (হে)

চক্ষু গোলকের মধ্যস্থিত যান্ত্রিক প্রখর প্রদাহের প্রথমাবস্থা, ঐ সময় চক্ষুগোলক বোধহয় যেন বাহিরে আসিতেছে এবং স্পর্শ করিলে বেদনা বোধহয়। (হে)

বেদনা উত্তাপ ও জ্বালাযুক্ত প্রদাহে একোন প্রধান ঔষধ। চক্ষু শুষ্ক, কোন বাহ্যিক পদার্থ চক্ষের পাতায় ' শ্লৈষ্মিকঝিল্লি উত্তেজিত হইয়া উহার প্রদাহ, পাতার কোণ উল্টাইয়া ভিতরে যাওয়ায় প্রদাহ, সর্দ্দিজাত চক্ষুপ্রদাহ, শ্লৈষ্মিকঝিল্লির অতিরিক্ত প্রদাহহেতু বিবৃদ্ধি, যন্ত্রণা এত অধিক যে, রোগী মৃত্যুবাসনা করে, পাতাদ্বয়ের শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে গুটিকার ন্যায় পদার্থ সঞ্চার হইয়া উহার প্রদাহ, পাতায় ও চক্ষুগোলকের শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চার, উত্তাপ ও শুষ্কতা, যে স্থলে ঐ প্রদাহ আত্যান্তিক পরিশ্রম বা শুষ্ক, শীতলবাতাস চক্ষে লাগায় বা অনাবৃত থাকায় উৎপন্ন হয়। স্কেলরো-টিকের প্রকৃত প্রদাহ প্রথমাবস্থা, মণি সঙ্কোচিত, ছিঁড়েফেলার ন্যায় বেদনা, আলোকাতঙ্ক, কর্ণিয়ার চতুস্পার্শ্বে নীলবর্ণের চক্র, চক্ষু গোলকে কন-কনে বেদনা ইহার প্রধান লক্ষণ (এলেন) পাতাদ্বয় শুষ্ক অনুভব, জ্বালা ও বাতাস লাগিলে কষ্টবোধ পাতা কঠিন, স্ফীত, আরক্ত ও উহাতে টাটানি, প্রাতে বৃদ্ধি। (হে)

কর্ণ—কর্ণরোগের যে সকল লক্ষণ একোনাইটে দৃষ্ট হয়, তাহার মস্তিকের পীড়া হইতে উৎপন্ন, কতকগুলিন অধিকাংশ বা স্বয়ংভূত প্রকাশ হয়।

শব্দ ও গোলযোগ অসহনীয়, শব্দে হঠাৎ চম্‌কে উঠা, গানবাদ্য যেন শিরায় শিরায় প্রবেশ করিতেছে বোধহয় ও বিমর্ষতা উৎপাদন করে। কর্ণে ভোঁ ভোঁ শব্দ, গর্জ্জন বা ঘণ্টাবাদ্যবৎ শব্দ অনুভব (হার্টনিম্যান) কর্ণে হুল-[illegible] যন্ত্রণা, কর্ণকুহর আরক্ত ও স্ফীত প্রচণ্ড কর্ণশূল। এস্থলে অমিত্র

অরিষ্ট তপ্ত করিয়া এক বা দুই ফোঁটা কর্ণকুহরে দেওয়া ও ৩০ ক্রমের ঔষধ সেবনে আরোগ্য হইবে। (বার্ট)

কর্ণের বিসর্পের স্থায় প্রদাহ। (বা)

নাসিকা—ঘ্রাণশক্তির অতিশয় তীক্ষ্ণতা, বিশেষ দুর্গন্ধ সম্বন্ধে (হে) হঠাৎ বায়ু পরিবর্ত্তনে নাসারন্ধ্রের শুষ্ক সর্দ্দি, উহার সহিত জ্বর, তৃষ্ণা এবং অতিশয় অস্থিরতা, নাসারন্ধ্র আবদ্ধ, শ্বাস বহন হয় না, দেহ স্থূল ও নাসা (নাসিকা হইতে রক্তস্রাব) স্রাব উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ও শিরঃপীড়া। (বা)

মুখমণ্ডল।—উদ্বেগ ও ভয়সূচক মুখাকৃতি। মুখমণ্ডলে জ্বালা হইয়া আরক্ত ও স্ফীত হওন, বোধ হয় যেন আয়তনে অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। (হে)

মুখমণ্ডল রক্তশূন্য, উহার সহিত অস্থিরতা ও উদ্বেগগ্রস্ত, সংন্যাস রোগে মুখ ঘোর রক্তবর্ণ। (হে)

মুখের বামপার্শ্বে শূল, মুখমণ্ডল আরক্ত ও উষ্ণ, অস্থিরতা, উদ্বেগ ও চীৎকার। (হে) বাহ্য প্রয়োগে উপকার হইবে।

মুখগহ্বর—উহাতে জ্বালা ও শিরার স্পন্দনের স্থায় একপ্রকার অসুস্থতা অনুভব, উহা জিহ্বার পশ্চাৎভাগপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয় ও ক্রমে পাকাশয় পর্য্যন্ত যায়। অবশেষে ঐ প্রকার অনুভব ওষ্ঠে, জিহ্বায়, গলায়, অঙ্গুলিতে ও পৃষ্ঠে প্রকাশ পায়।

যে কোন দ্রব্য মুখে তিক্ত বোধ হয়, কেবল ঝাল ব্যতীত; অথবা মুখে পচা আস্বাদ বা বিবমিষা অনুভব। জিহ্বা সাদালেপ অথবা পুরু পীতবর্ণের লেপযুক্ত, অনিবার্য্য তৃষ্ণা।

জিহ্বা আরক্ত ও শুষ্ক, অতিশয় তৃষ্ণা, জিহ্বার মধ্যভাগে শুষ্কতা ও খস্‌খসে অনুভব। জিহ্বা স্ফীত। (হে)

জিহ্বা কাঁপা ও ক্ষণস্থায়ী তোতলামি। (হে)

দন্তশূল, যুবা স্থূলকায় ব্যক্তিদিগের হিম বা শুষ্ক বায়ু জনিত উৎপত্তি, মুখের একপার্শ্বে দপদপানি, শীতল বাতাস দন্তে লাগিলে কষ্টবোধ, গণ্ডদেশ অতিশয় আরক্ত, মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চার, অতিশয় অস্থিরতা। (হে)

চর্ব্বণ করার স্থায় অনবরত মাড়ী নড়ান। (হে)

মুখগহ্বর ও ওষ্ঠ শুষ্ক এবং জ্বালাযুক্ত, অতিশয় তৃষ্ণা।

কণ্ঠ—কণ্ঠের, তালুপার্শ্ব গ্রন্থির ও গলার শ্লৈষ্মিকঝিল্লির প্রদাহহেতু যে সকল লক্ষণ অনুভব হয় ও বাহিরে দেখা যায়, সে সমস্তই ঘটে, সমস্ত গলা আরক্ত ও আচ্ড়ান ও রুক্ষ অনুভব, কণ্ঠের প্রখর প্রদাহ, প্রচণ্ড জ্বর, আক্রান্তস্থান গাঢ় আরক্ত, গলায় জ্বালা ও শূল বেধনবৎ বেদনা, বোধ হয় যেন কাটা গলার একপার্শ্বে আবদ্ধ রহিয়াছে। কণ্ঠের যে কোন প্রখর প্রদাহে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। (হে)

ক্ষুধা।—অপরিহার্য্য তৃষ্ণা, কাহার কাহার স্থানিক প্রখর প্রদাহের প্রথমাবস্থায় অতিশয় ক্ষুধা।

সুরা, মদ, বিয়ার বা তিক্ত আস্বাদ বিশিষ্ট জলীয় পদার্থ সেবনে ইচ্ছা, ক্ষুধা রহিত, খাদ্য দ্রব্যে ঘৃণা। (হে)

অতিশয় তৃষ্ণা, এবং জলীয় দ্রব্য উদরে রাখিতে অক্ষমতাসত্বেও জলপান, এইরূপে পাকস্থলীতে অধিক জল সঞ্চার হইলে পম্পের ন্যায় জোরে হঠাৎ বহির্গত হয়। (গা)

পাকস্থলী—যে সকল লক্ষণ এস্থলে প্রকাশ হয়, প্রায় অনেক সময় সে সমস্তই অন্য কোন যান্ত্রিক ক্রিয়ার বিকার হেতু উৎপন্ন হয় যথা-মস্তিষ্কের পীড়া ও তিক্ত পিত্তবমনের সহিত উদ্বেগ ও শীতল ঘর্ম্ম। ক্রিমি বমন, পিত্ত, বা সবুজ পদার্থ বমন, সবুজ দাস্ত, আম, আম ও রক্ত মিশ্রিত দাস্তের সহিত উদ্বেগ ও অতিশয় তৃষ্ণা। সবুজ জলের ন্যায় পদার্থ বমন ও দাস্ত। (হে)

হঠাৎ অসহনীয় বেদনা, বাকরোধ, বিবমিষা, রক্ত বমন, ললাটে শীতল ঘর্ম্ম, পক্কাশয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে রক্তসঞ্চার, আরক্ত জ্বর, পক্কাশয় হইতে মুখ গহ্বর পর্য্যন্ত জ্বালা, পাকস্থলীতে পাথরের ন্যায় ভার বোধ। (হে)

পক্কাশয় ও যকৃত স্থানে ভার বোধ—পুনঃ পুনঃ বমনের পরেও বোধ হয় যেন পক্কাশয়ে একখানা শীতল প্রস্তর রহিয়াছে। (ডা)

পক্কাশয়ে ও নাভীমণ্ডলে জ্বালা সমস্ত উদরে ব্যাপ্ত হয়, দপদপে বেদনা কম্প ও জ্বর। (ডা)

যকৃৎ স্থান—যকৃতের প্রখর প্রদাহ হইতে জ্বালা ও ছুচ বেধনবৎ বেদনা, যকৃতে ভার ও সঙ্কোচন অনুভব, হাইপোকণ্ড্রিয়া (যকৃৎ স্থান) স্ফীত ও কঠিন, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, যকৃৎ হইতে পাকাশয়ে বেদনা ব্যাপ্ত হওন,

যকৃতে খিলধরা, কামল। গর্ভাবস্থায় কামল, ভয় বা হিম লাগা জনিত কামল, যকৃৎ প্রদাহের সহিত প্রখর জ্বর। (হে)

প্লীহার প্রদাহ এবং প্রদাহিক জ্বর।

উদর—অন্ত্র প্রদাহ বা অন্ত্র আবরকঝিল্লি প্রদাহের সহিত প্রখর জ্বর, উদরে কর্ত্তনবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা, সামান্য চাপিলে যন্ত্রণা বোধ, আরক্ত জ্বর অন্তে উদর স্ফীত ও সর্ব্বাঙ্গে শোথ। এস্থলে ইহার অরিষ্ট ব্যবহারে মূত্রগ্রন্থি সংক্রান্ত আরক্ত জ্বর অন্তে যে শোথ তাহা আরোগ্য হইবে।

"উদর অতিশয় উষ্ণ, কঠিন, স্ফীত, স্পর্শ করিলে বেদনা বোধ, কর্ত্তনবৎ বেদনা, জ্বরের সহিত উদ্বেগ, বমন, মূত্রত্যাগে অক্ষমতা, অন্ত্রআবরকঝিল্লি প্রদাহ, অন্ত্রশূল, কোন প্রকার অবস্থানে শান্তি হয় না, মূত্রাশয় আক্রমণ। (হে)

অনবরত মূত্রত্যাগে ইচ্ছা। (হে)

অন্ত্র বৃদ্ধি অল্প ও নূতন, অন্ত্র বাহিরে আসিয়া আটকাইয়া যাওয়া, পিত্ত বমন, শীতল ঘর্ম্ম, অগ্নি দাহবৎ জ্বালা। (হে)

দাস্ত—সবুজ জলবৎ উদরাময়। (গা)

স্তন্যপায়ীদিগের পীতবর্ণের উদরাময়, অন্ত্রশূল, কোন প্রকারে শান্তি লাভ করিতে পারে না। (গা)

অন্ত্রের কোন প্রকার প্রখর পীড়ার প্রথমাবস্থা, জলবৎ দাস্ত, কৃষ্ণবর্ণের আমসংযুক্ত; রক্ত মিশ্রিত, অল্প, পুনঃ পুনঃ; হঠাৎ শীতল বায়ু পরিবর্ত্তনে উদরাময়, অতিশয় তৃষ্ণা ও মৃত্যু ভয়।

আমাশয় পীড়ার সহিত প্রখর জ্বর, অতিশয় ভয় ও অস্থিরতা, উদরে ছিড়ে ফেলা, জ্বালাযুক্ত কর্ত্তনবৎ বেদনা; দাস্ত আম ও রক্ত সংযুক্ত। দিবা-ভাগে উত্তাপ ও রাত্রে শীত হেতু রক্তঅতিসার অথবা প্রদাহিক উদরাময় রোগ, দাস্তের বেগ আমাসাযুক্ত দাস্ত, রাত্রে মলদ্বারে অসহনীয় চুলকনা ও দপ্‌দপানি। (হে)

অর্শবলির প্রখর প্রদাহ, মলদ্বারে বেদনা, বলি হইতে উজ্জ্বল রক্ত-স্রাব, অন্ত্র হইতে উজ্জ্বল রক্তস্রাব।

মূত্রযন্ত্র—মূত্রযন্ত্রের শ্লৈষ্মিকঝিল্লির উগ্রতা ও প্রদাহ, প্রস্রাব রক্ত-বর্ণ, পরিমাণে অল্প কিম্বা মূত্রাবরোধের সহিত অতিশয় অস্থিরতা ও

উদ্বেগ, হিমজনিত বিশেষ শিশুদিগের মূত্রাবরোধ, অতিশয় অস্থিরতা ও ক্রন্দন। (গা)

মূত্রগ্রন্থি স্থানে স্পর্শ করিলে তিরবেধনবৎ বেদনা, মুত্রাশয়ে প্রচণ্ড জ্বালা, মূত্রাশয়ের প্রদাহ, অনবরত প্রস্রাবের বেগ, ফোটা ফোটা মূত্র নিঃসরণের সহিত জ্বালা, রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব অস্থির উপরে বেদনা ও উত্তাপ, মূত্রের বেগ কষ্টদায়ক, প্রস্রাব কালীন মূত্রমার্গে জ্বালা, বালক মূত্রত্যাগ কালীন জননেন্দ্রিয়ে হাত দিয়া ক্রন্দন করে, মুত্রমার্গ হইতে রক্তস্রাব। (হে)

জননেন্দ্রিয়—(পুঃ) উহার যে কোন প্রকার প্রথর প্রদাহে বিশেষ প্রমেহ রোগের প্রথম অবস্থায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। ইহার অমিশ্র আরক জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাহ্য প্রয়োগ এবং দুই তিন ঘণ্টা অন্তর এক ফোটা অমিশ্র আরক সেবন করিলে উপকার দর্শিবেক।

প্রখর অণ্ডকোষ প্রদাহ—প্রচণ্ড জ্বরের সহিত উহাতে ছিড়ে-ফেলা বা ছেচা ঘায়ের ন্যায় বেদনা, হিমলাগা বা প্রমহ রোগ হইতে উৎপন্ন হইলে ব্যবস্থা (বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ)।

অতিশয় সঙ্গমেচ্ছা—ঐ সকল বিষয় স্বপ্ন দর্শন অথবা সঙ্গমেচ্ছার অভাব, জননেন্দ্রিয় শিথিল। (হে)

স্ত্রিঃ—ভয় বা হিমলাগা হেতু ঋতু স্তম্ভ, বা হিমলাগা হেতু ডিম্ব-কোষের প্রদাহ।—

অতি বিলম্বে অল্প পরিমাণে এবং অধিক দিবস স্থায়ীঋতু। শীতল জলে গাত্র অথবা পদদ্বয় অধিক ক্ষণ সিক্ত থাকা হেতু ঋতু স্তম্ভ। স্থূলকায় যে কোন স্ত্রী লোকদিগের যে কোন কারণে ঋতু বন্ধ হইলে ইহা প্রয়োগে ঋতু প্রকাশ হইবেক। (হে)

স্থূলকায় স্ত্রীলোকদিগের রজঃস্রাব, জরায়ু হইতে প্রথর রক্তস্রাব, মৃত্যুভয়, এবং অতিশয় অস্থিরতা, স্থূলকায় স্ত্রীলোকদিগের রজস্তম্ভ, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হঠাৎ হৃদ্‌ব্যাপন।

জননেন্দ্রিয়ের প্রদাহ। বাহ্য জননেন্দ্রিয় শুষ্ক উত্তপ্ত ও বেদনাযুক্ত।—জরায়ুর অধঃপতন, উহার প্রথর প্রদাহের সহিত অতিশয় উদ্বেগ। জরায়ুতে প্রসবের ন্যায় বেগ, কষ্ট রজ।—

গর্ভাবস্থা—প্রসবকালীন অতিশয় অস্থিরতা ও মৃত্যু ভয়, মৃত্যু সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত, কষ্টকর অতিশয় অধিককাল স্থায়ী প্রসব, বাহ্য জননেন্দ্রিয় উষ্ণ ও শুষ্ক- জরায়ুর মুখ (অশ্) প্রশস্ত ও বেদনাযুক্ত।—

পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড বেগে প্রসব বেদনা, অসম্পূর্ণ জরায়ু সঙ্কোচন; মুখমণ্ডল আরক্ত ও ঘর্ম্মাক্ত ও উত্তপ্ত। (হে)

প্রসব অন্তে প্রখর বেদনা অধিকক্ষণস্থায়ী বেদনা, বেদনার সহিত অস্থিরতা, দুগ্ধজ্বর, স্তন,উষ্ণ, কঠীন ও উহাতে অল্প পরিমাণে দুগ্ধসঞ্চার, জ্বরের সহিত প্রলাপ ও অতিশয় উৎবেগ।—

প্রসব অন্তে জ্বর, রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া স্তন শিথিল, দুগ্ধশূন্য, ত্বক শুষ্ক ও উষ্ণ, নাড়ী কঠিন, দ্রুত ও সঙ্কোচিত, ভয়, চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল এবং উন্মাদের ন্যায় দৃষ্টি, জিহ্বা শুষ্ক, অতিশয় তৃষ্ণা, উদর স্ফীত, স্পর্শ করিলে উহাতে বেদনা। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ। (হে)

প্রসব অন্তে ভয়হেতু তড়কার ন্যায় আক্ষেপ, মস্তিষ্কের উত্তেজনা, ত্বক শুষ্ক ও উষ্ণ, অস্থিরতা এবং মৃত্যুভয়।—

প্রসব অন্তে অন্ত্রাবরকঝিল্লির প্রখর প্রদাহ (বাহ্যিক আভ্যন্তরিক)।

শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র—সন্তাপের হঠাৎ পরিবর্ত্তন বিশেষ উত্তাপের পরিবর্ত্তে অতিশয় শীত হেতু স্বরঘ্ন। উহার প্রথমাবস্থা, শ্বাস পরিত্যাগ কালীন শুষ্ক গলা ভাঙ্গাকাসী এবং গলায় ঘড় ঘড় শব্দ। শ্বাস গ্রহণ কালীন অনুভব হয় না।

প্রতিবার শ্বাস পরিত্যাগ কালীন গলাভাঙ্গা খকৃখকে কাসি, নিদ্রাবস্থায় কাসি বিশেষ বালকদিগের। (গা) গলাচুলকানর সহিত খুকৃখুঁকে শুষ্ক কাসি, প্রতিবার শ্বাস গ্রহণে কাসের বৃদ্ধি, কাসীর সময় শিশু হস্ত দ্বারায় কণ্ঠ ধরে। (গা) প্রথর জ্বরসত্ত্বে বায়ুনলীর প্রদাহ হেতু কাসি, এই ঔষধ শুষ্ক বা সরল উভয় অবস্থায় প্রয়োগ হয়, কিন্তু সচরাচর শুষ্ককাসি, রাত্রে বৃদ্ধি হইলে বিশেষ উপকার দর্শে। বায়ুনলীর শুষ্ক সর্দ্দি কিছুতেই উপশম না হইলে ইহাতে আরোগ্য হইবে। অধিকক্ষণস্থায়ী আক্ষেপিক শুষ্ক কাসি সন্ধ্যায় ও প্রাতে প্রকাশ হইলে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ আর দৃষ্ট হয় না।

বাম ফুসফুস্ অধিক আক্রান্ত হইলে উহার সহিত ঐ পার্শ্বস্থ ফুসফুস,

আবরক ঝিল্লি (প্লুরা) আক্রান্ত হইয়া শ্বাস গ্রহণে এবং কাসিলে খিল ধরার ন্যায় তীক্ষ্ণ বেদনা, পার্শ্ববেদনা হেতু কষ্টকর শুষ্ককাসী, কাসীতে কাসীতে যে সামান্য শ্লেষ্মা বাহির হয় উহা আঠার ন্যায়, গোলাকার খণ্ডবিশিষ্ট এবং ঈষৎ রক্তবর্ণ, এস্থলে ৩০ ক্রমো, একোনাইট উৎকৃষ্ট ঔষধ, (ডাক্তার পিয়ারসন্)। ফুস্‌ফুস প্রদাহ এবং ফুস্‌ফুস্ আবরক ঝিল্লি প্রদাহের সহিত প্রখর জ্বর, অতিশয় তৃষ্ণা, শুষ্ককাসী, স্নায়বির উত্তেজনা, উদ্বেগ শুষ্ক দ্রুত কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস, বক্ষে এবং পার্শ্বে খিলধরা বিশেষ শ্বাস প্রশ্বাসে, এবং কাসীলে অধিক বোধ, (লিপি) স্বরযন্ত্রের প্রদাহ, স্বরযন্ত্র স্পর্শ করিলে এবং শ্বাস গ্রহণে বেদনা, প্রদাহিকজ্বর এবং কথন কথন গ্লটীসের শ্বাস অবরোধক আক্ষেপ। (হে)

পরিষ্কার কাঁশর বাদ্যের ন্যায় অথবা শিশ দেওয়ার ন্যায় কাসী। জোরের সহিত খুক্‌খুকে শুষ্ক আক্ষেপিক কাসী অথবা শ্বাস অবরোধক কাসীর সহিত ঈষৎ রক্তবর্ণ রক্ত উৎগম। (হে)

বক্ষে খিলধরাজনিত শ্বাসকৃচ্ছ্র, শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর, বোধ হয় যেন ফুস্‌ফুস্ প্রসারিত হইবে না. শিশুদিগের বক্ষে যন্ত্রণা ও উদ্বেগ এবং কাসীতে অক্ষমতা। (গা)

মস্তিষ্কে এবং ফুস্‌ফুসিদ্বয়ে অতিশয় রক্ত সঞ্চারহেতু শ্বাসকাস, মুখ-মণ্ডল আরক্ত, দৃষ্টি স্থির, বোধহয় যেন বক্ষঃস্থল একটী ব্যাণ্ডেজ দ্বারা বেষ্টিত, বক্ষপেশী দৃঢ়, যন্ত্রণাহেতু শয্যায় উঠিয়া বসা, শ্বাস প্রশ্বাস অতিশয় কষ্টকর, নাড়ী সূত্রাকার, বমন, প্রস্রাব অল্প ও গাঢ়, ঘর্ম্মের সহিত উদ্বেগ, আক্ষেপ অন্তে পীত বা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা উদগম। (হে) ফুস্‌ফুস হইতে রক্তস্রাব, থক করিয়া কাসীলে সহজে রক্ত উদগম, রক্ত উজ্জল ও রক্তবর্ণ এবং পরিমাণে অধিক, শারীরিক পরিশ্রমে বা হিম লাগায় উৎপত্তি, অতিশয় ভয় এবং হৃৎব্যাপ্লন।

কাসীর সহিত রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা উদগম, কাসীর পর বক্ষে এক প্রকার অসুস্থতা অনুভব, বক্ষে এবং পার্শ্বে খিলধরা, উহা কথন কথন এত প্রবল হয় যে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করা অতিশয় কষ্টকর হইয়া উঠে। (গা)

বায়ুনলীর শ্লেষ্মা ঝিল্লির প্রদাহহেতু ফুস্‌ফুসে জ্বালা, ফুস্‌ফুস্ ও তদাবরক ঝিল্লি প্রদাহে রোগী চিত হইয়া শয়ন করিতে বাধ্য হয়।

রক্ত সঞ্চালন যন্ত্র—অতিশয় উদ্বেগ ও হৃৎব্যাপন, প্রদাহিক অবস্থায় নাড়ী কঠিন ও বলিষ্ঠ এবং পূর্ণ; অতিশয় তৃষ্ণা।

হৃৎপিণ্ড স্থানে উদ্বেগ, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুত ও সবল অথবা সূত্রাকার দ্রুত, কঠিন ও ক্ষুদ্র, অতিশয় মৃত্যুভয়। (হে)

সংন্যাস রোগে নাড়ী পূর্ণ ও কঠিন, কেরটিড ধমনীদ্বয়ের প্রচণ্ড স্পন্দন, অন্ত্রাবরক ঝিল্লি প্রদাহে নাড়ী দ্রুত, কঠিন ও ক্ষুদ্র, মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহে নাড়ী সবল, পূর্ণ ও দ্রুত; হৃদশূলে নাড়ী অতি সূক্ষ্ম, শীতল ঘর্ম্ম, অতিশয় মৃত্যুভয়, হৃদ্‌আবরকঝিল্লি প্রদাহে নাড়ী কঠিন, সবল এবং সঙ্কোচিত, বাতে হৃদ্‌পিণ্ড অতিশয় বেগে স্পন্দিত হয়।

জ্বর।—সাধারণ জ্বরে যদি নাড়ী পূর্ণ ও দপ্‌দপে, গাত্র অতিশয় উষ্ণ, অস্থিরতা, অধিক জলপানের অপরিহার্য্য তৃষ্ণা, স্নায়বীয় উত্তেজনা, জ্বরের অতিশয় যন্ত্রণা এবং শীতল জল সেবনের অত্যন্ত ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে ইহা প্রধান ঔষধ।

কম্প, ত্বক শীতল, স্পর্শ করিলে ঠাণ্ডা বোধ হয়, শীত পদদ্বয় হইতে বক্ষে আইসে, পৃষ্ঠে চুলকনা, অঙ্গুলির অগ্রভাগ শীতল, নখসমূহ নীলাভা-বিশিষ্ট, অতিশয় শীত বোধ ও কম্পন, ত্বক সঙ্কোচিত, স্থিরভাবে থাকিলে বৃদ্ধি, চলিয়া বেড়াইলে শান্তি। (হে)

রাত্রে পর্য্যায়ক্রমে শীত গ্রীষ্ম, অস্থিরতা, গাত্র আবরণে অনিচ্ছা অথচ শীতবোধ, মুখমণ্ডল উষ্ণ, হাত পা শীতল। (হে)

ত্বক শুষ্ক ও খস্‌খসে গরম, সন্ধ্যার সময় ও রাত্রে শয়ন করিলে জ্বরের বৃদ্ধি, অতিশয় তৃষ্ণা, নাড়ী কঠিন, দ্রুত ও পূর্ণ, রোগী উদ্বেগগ্রস্ত ও অসহিষ্ণু, শয্যায় অস্থির হইয়া এপাশ ওপাশ করে। (হে)

প্রদাহসহে জ্বর, গাত্র অতিশয় উষ্ণ, ত্বক শুষ্ক ও গাত্রদাহ, প্রচণ্ড তৃষ্ণা, শ্বাসকৃচ্ছ্র, অতিশয় স্নায়বীয় (যে কোন স্থানের প্রদাহের সহিত উক্ত লক্ষণ থাকিলে ইহাতে বিশেষ উপকার হইবে।) (হে)

অপর্য্যাপ্ত ও প্রচুর ঘর্ম্ম, আবৃত অংশে ও আক্রান্ত স্থানে অধিক ঘর্ম্ম, ঘর্ম্মকালীন বেদনার বৃদ্ধি কিন্তু ঘর্ম্মান্তে শান্তি, বাতজনিত প্রদাহে যে ঘর্ম্ম হয় তাহাতে প্রচুর ঘর্ম্মে বেদনার বিশেষ শান্তি, গাত্র আবরণে অনিচ্ছা।

ঘর্ম্মাবরোধ হইয়া যে কোন পীড়া উৎপন্ন হয়, তাহাতে এবং সর্দ্দি জ্বর ও স্থানিক যে কোন স্থানের প্রদাহিক জ্বরে একোন প্রধান ঔষধ।

ত্বক।—কোন স্থানের প্রখর বিসর্প (ইরিসিপেলাস) রোগের সহিত প্রচণ্ড জ্বর, ত্বক আরক্ত উষ্ণ ও স্ফীত, আক্রান্ত স্থানে অতিশয় বেদনা, অস্থিরতা ও উদ্বেগ।

আরক্ত জ্বর।—এই প্রকার জ্বরের সহিত গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরক্ত চিহ্ন, প্রখর জ্বর, অতিশয় অস্থিরতা, উদ্বেগ, বিবমিষা ও বমন, রোগের প্রথমাবস্থায় বিশেষ গাত্রে ঐ সকল স্ফোট (ইরাপসন্) বহির্গত হওয়ার অগ্রে ডাক্তার বার্ট বলেন যে, রোগের সকল অবস্থাতেই উৎকৃষ্ট কেবল কণ্ঠ আক্রমণের গুরুতর লক্ষণ সকল প্রকাশ হইলে বেলেডনা ও রাসটক্স ব্যবহার করা আবশ্যক হয়; এ. রোগের শেষফল যাহাদের উদরি, গাত্রের অন্য কোন স্থানে শোথ ও মুত্রগ্রন্থির (কিড্‌নির) রক্তসঞ্চার হয়, তাহাতে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ আর দৃষ্ট হয় না।

হামজ্বর।—সর্ব্বাঙ্গে হাম প্রকাশ, শুষ্ক কুক্কুটধ্বনিবৎ কাসী, চক্ষু-দ্বয় আরক্ত, আলোকাতঙ্ক, স্বরভঙ্গ, অস্থির হইয়া কাতরানি, জিহ্বা আরক্ত, জ্বর অতিশয় অধিক হইলে ইহাই উপযুক্ত ঔষধ। কামল (জনৃডিস) বিশেষ সর্ব্বাবস্থায় একোন প্রধান ঔষধ।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবাস্তম্ভ, উহাতে ছিড়ে ফেলার ন্যায় বেদনা, নাড়িলে বৃদ্ধি, গ্রীবা হইতে দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনা (হে) পৃষ্ঠবংশে কোন কীট হামাগুড়ি দিতেছে অনুভব, চুলকনা, প্রখর জ্বর, নিম্ন পৃষ্ঠ অসাড়, উহা জঙ্ঘায় ব্যাপ্ত হয়। মেরুদণ্ডআবরক ঝিল্লির প্রদাহ। পৃষ্ঠবংশের শেষ অস্থিখণ্ডে (ভার্টিব্রা) বেদনা, বোধহয় যেন আঘাত লাগিয়াছে, মেরুদণ্ডের প্রদাহহেতু আক্ষেপ। (হে)

বাহু—বাহুর অসাড়তা, পৃষ্ঠ, বাহুতে ও অঙ্গুলিতে শড়্ শড়্ অনুভব। বাম বাহুর অসাড়তা, উহা চালনা করা কষ্টসাধ্য। (গা)

বাহুদ্বয় বোধহয় যেন আঘাতহেতু পক্ষাঘাতের ন্যায় অবশ; মেরুদণ্ডের আবরকঝিল্লির প্রদাহ, হাতের করতলে পক্ষঘাত, অঙ্গুলিতে ঝনঝনে বাত, হাতের পাতা উষ্ণ, হাত বরফের ন্যায় শীতল, হাতের পাতায় ঘর্ম্ম ও শীতল। (হে)

গাত্রের কোন স্থান স্পর্শ করিলে বেদনা অনুভব, তজ্জন্য কেহ স্পর্শ না করে তাহাই ইচ্ছা, কেহ নিকটে আসিলে ভয় ও রাগ। (গা)

অধঃশাখা—হঠাৎ অতিশয় বলহানি হইলে এই ঔষধ সচরাচর ব্যবহার হয়, কিন্তু মনের অবস্থার সহিত মেলা চাই। যাহারা সদানন্দ ও সকল বিষয়ে সন্তুষ্ট, কিছুতেই ভয় না করে, তাহাদের পক্ষে ইহাতে কোন ফল দর্শে না, কিন্তু যাহারা শারীরিক বলক্ষয় হেতু অতিশয় চিন্তাগ্রস্ত হয়, তাহাদের পক্ষে ইহাই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বামপার্শ্বের জঙ্ঘাসন্ধি স্ফীত, উষ্ণ ও অতিশয় বেদনাযুক্ত, ঐ স্থান স্পর্শ করিলে বেদনা, ভয় ও অতিশয় তৃষ্ণা, এবং উদ্বেগ, প্রথর বাত। (হে)

পাদদ্বয় পক্ষাঘাতের ন্যায় অবশ, ক্লান্তি বোধ, জানু ও পায়ের সন্ধিস্থলে এবং অঙ্গুলিতে তীর বেঁধন ও ছিঁড়ে ফেলার ন্যায় বেদনা, অনিদ্রা। (হে)

সর্দ্দিজনিত পদদ্বয়ের অসাড়তা, পা এবং পায়ের পাতা অবশ, চলিয়া বেড়াইতে খিলধরা। (হে)

পায়ের পাতা শীতল, অঙ্গুলী সকল শীতল ও ঘর্ম্মযুক্ত। (হে)

যে কোন গ্রন্থির বাতজনিত প্রদাহে নিম্ন লিখিত লক্ষণ থাকিলে একোন উৎকৃষ্ট ঔষধ। আক্রান্ত স্থানস্ফীত, ঘোররক্ত বর্ণ, উজ্জল, স্পর্শ করিলে বেদনা, প্রথর জ্বর, সন্ধ্যায় ও রাত্রে উপসর্গের বৃদ্ধি; এতদ্ভিন্ন পেশীবাত, বালকদিগের তড়কা, বিশেষ দন্তোদ্গম কালীন, শিশু আপনার মুষ্টি আপনি কামড়ায়, অনবরত ক্রন্দন করে ও রাত্রে উপসর্গের বৃদ্ধি হয়। রক্তসঞ্চারযুক্ত স্নায়ুশূল, বিশেষ হিমলাগা, বা ঘর্ম্মাবরোধ হেতু উৎপন্ন হইলে একোন প্রধান ঔষধ। এস্থলে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উভয় প্রয়োগ প্রশস্ত।

যে সকল রোগে একোনাইট ব্যবহার হয়, তাহাদের নাম করিতে হইলে যে কোন স্থানের ও যন্ত্রের যে কোন প্রকার প্রদাহে ইহা অগ্রগণ্য, তন্মধ্যে বিশেষ রক্তাম্বুঝিল্লি ও শ্লৈষ্মিকঝিল্লি প্রদাহ, পেশীসন্ধি, ও পেশীরজ্জুর প্রদাহে বিশেষ উপকারের সম্ভব। সকল প্রকার রক্তস্রাবে, রক্তসঞ্চার হেতু স্নায়ুশূলে, প্রথর বাতরোগে ও স্ফোট সংক্রান্ত জ্বরে একোন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ দৃষ্ট হয় না।

উপসর্গের বৃদ্ধি—বেদনা সায়ংকালে ও রাত্রে, উষ্ণগৃহে, চলিয়া বেড়াইলে, শয্যা হইতে উঠিতে গেলে ও ধূমপানে বৃদ্ধি হয়। ফুস্‌ফুস্‌ সংক্রান্ত

পীড়ায় বামপার্শ্বে শয়ন করিতে অক্ষমতা, এবং দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ করা কষ্ট সাধ্য।

উপসর্গের হ্রাস—দিবাভাগে, বহির্ব্বাতাসে, ঘর্ম্ম হইলে, বাতসক্রান্ত পীড়ায়, স্থিরভাবে থাকিলে, শীতল জলে ধৌত কালীন। অম্ল, মদ ও কফি সেবনে শান্তি হইলে ব্যবস্থা। ক্রমশঃ—

শ্রীশিখরকুমার বসু এল্, এম্, এস্।
হোমিওপ্যাথি ডাক্তার।

লক্ষণতত্ত্ব।

এলোপ্যাথিমতে।

লক্ষণসকলই চিকিৎসাশাস্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ। লক্ষণ দ্বারাই রোগের জ্ঞান জন্মে। চিকিৎসকের সমস্ত বিদ্যা, বুদ্ধি এবং কৌশল এই লক্ষণজ্ঞানের উপরই নির্ভর করে। যেমন পালহীন জাহাজ এক পাও গমন করিতে পারে না; সেইরূপ রোগের লক্ষণ না জানিলে চিকিৎসক রোগ চিকিৎসায় এক পাও অগ্রসর হইতে পারেন না। যে চিকিৎসক এই রোগের লক্ষণ উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন, তিনিই সুচিকিৎসক বলিয়া গণ্য হন। যিনি যত রোগলক্ষণ অধ্যয়ন করিতে শিক্ষা করেন, তিনিই চিকিৎসাকার্য্যে তত দক্ষতা লাভ করেন।

লক্ষণ শব্দের অর্থ কি? যাহার দ্বারা যে বস্তু প্রকাশ হয়, তাহাই সেই বস্তুর লক্ষণ। যদ্দ্বারা রোগের অস্তিত্ব অনুভূত হয়, তাহাই রোগের লক্ষণ।

লক্ষণসকল অধ্যয়ন দ্বারা চিকিৎসক রোগসম্বন্ধে তিন রকমের জ্ঞান লাভ করিতে পারেন।

(১) রোগী কি প্রকারের পীড়া ভোগ করিতেছে এবং ঐ পীড়া রোগীর কোন্ স্থান আক্রমণ করিয়াছে, তাহা লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারা যায়।

(২) রোগের পরিণাম ফল কি? রোগ আরাম হইবে কি না এবং আরাম হইলে কত দিনে আরাম হইবে এবং বর্ত্তমান রোগের সহিত অন্য রোগ আসিয়া মিশ্রিত হইবে কি না? এ সমুদয় লক্ষণ দ্বারা জানিতে পারা যায়।

(৩) রোগ চিকিৎসা কেবল এক লক্ষণজ্ঞানের উপরই নির্ভর করে। লক্ষণ না জানিলে রোগের চিকিৎসা হয় না।

রোগ পরীক্ষা দ্বারা ঔষধ প্রয়োগের সুবিধা হয়। রোগটী উত্তমরূপে চিনিতে না পারিলে চিকিৎসককে আঁধারে বিচরণ করিতে হয়। অনেক সময় আমাদিগকে রোগ না চিনিয়াও ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়, কারণ এমন অনেক রোগ আছে, যাহা ঝটিতি বুঝিয়া উঠা যায় না, অথচ এমন একটী উপসর্গ বা লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে, যাহা নিবারণ না করিলে রোগীর সমূহ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। কিন্তু এই সকল স্থলে চিকিৎসককে সন্দেহমঞ্চে দোলায়মান হইয়া কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু যদি আমরা রোগটী উত্তমরূপে চিনিতে পারি, তবে আর ঔষধ প্রয়োগে আমাদিগের মনে কোনই সন্দহ থাকে না। রোগটীও অল্প ঔষধে অতি সত্বর আরাম হইয়া যায়। রোগ চিনিতে না পারিলে চিকিৎসককে অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার ন্যায় চিকিৎসা করিতে হয়। অনেক চিকিৎসক রোগ চিনিতে না পারিয়া দুই তিন বা ততোধিক রোগের ঔষধ এক সঙ্গে প্রয়োগ করেন। উদ্দেশ্য এই যে যেটিতে ফল পাওয়া যায়। কিন্তু যিনি সুচিকিৎসক হন এবং যাঁহার রোগ লক্ষণ বোধ আছে, তিনি সম্যক্ প্রকারে রোগটী নির্ণয় করিয়া ঠিক্ সেই রোগটীর প্রকৃত ঔষধ প্রদান করেন এবং রোগীরও ঝটিতি উপকার হয়। মনে করুন একটী রোগীর মুখে সময় সময় সামান্য ক্ষত হয়, এক্ষণে মুখে ক্ষত নানা কারণে হইতে পারে, যথা ;—অজীর্ণ রোগ বশতঃ মুখে ক্ষত হইতে পারে। আবার উপদংশের পীড়ার জন্যও মুখে ক্ষত হইতে পারে। কিন্তু এই দুই প্রকারের ক্ষত বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। এই দুই প্রকার ক্ষতে দুই প্রকারের চিকিৎসা প্রয়োজন। যদি অজীর্ণ রোগ বশতঃ মুখে ক্ষত হইয়া থাকে, তবে রোগী ক্ষুধা বৃদ্ধিকারী সামান্য সামান্য ঔষধ প্রয়োগেই আরোগ্য লাভ করিতে পারেন, কিন্তু উপদংশ জনিত ক্ষত হইলে রোগীকে অনেক দিন ধরিয়া আইওডাইড্ অব্ পোটাসিয়ম্ প্রভৃতি খাওয়াইবার প্রয়োজন হয়। যদি লক্ষণ না পরীক্ষা করিয়া অজীর্ণ জনিত ক্ষতে আইওডাইড্ অব্ পোটাসিয়ম্ প্রয়োগ করা যায়, তবে রোগীর রোগের উপশম ত কিছুই হয় না, বরঞ্চ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং আইওডাইড্ অব্ পোটাসিয়ম্ দ্বারা রোগীর পূর্ব্বে যাহা একটু ক্ষুধা ছিল তাহাও অন্তর্হিত হয়। অতএব রোগ চিনিয়া ঔষধ দিলে যেমন ঝটিতি উপকার হয়, রোগ না চিনিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে, উপকার ত হয়ই না, বরঞ্চ রোগীর

সমূহ অপকার হইবার সম্ভাবনা। এই রোগপরীক্ষা জ্ঞানের তারতম্য বশতঃই হাতুড়ে ও সুচিকিৎসকে আকাশ পাতাল প্রভেদ লক্ষিত হয়। চিকিৎসক যদি রোগের লক্ষণ বুঝিতে পারিলেন, তবে তিনি তখনই অৰ্দ্ধেক রোগ আরাম করিলেন।

ভেষজদ্রব্যের গুণ পরিজ্ঞাত হওয়া এবং তাহার নূতন নূতন প্রয়োগ-প্রণালী শিক্ষাও এই রোগজ্ঞানের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নহে। যে সকল বিশেষ বিশেষ রোগের বিশেষ বিশেষ ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা রোগের প্রকৃতিজ্ঞানের দ্বারাই হইয়াছে। মনুষ্য যখন দেখিল যে, কোন বিশেষ রোগ এইরূপ ধরণের হইয়া থাকে এবং যখন জানিতে পারিল যে, অমুক রোগে ঠিক্ ঠিক্ এই লক্ষণ উপস্থিত হয়, তখন তাহারা তাহার ঔষধ অন্বেষণে মনোনিবেশ করিল এবং তত্তৎ রোগে নানাবিধ ভেষজদ্রব্য প্রয়োগ করিতে করিতে একটিতে ফল ফলিল এবং বহুপরীক্ষার পর সেই দ্রব্যই সেই বিশেষ রোগের ঔষধ হইয়া দাঁড়াইল। এইরূপ ধরণেই কুইনাইনের কম্পজ্বরঘ্ন শক্তি এবং ইপিকাকের আমাশয় রোগ নিবারকশক্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল বিশেষ ঔষধ ব্যতীত সাধারণ ঔষধ দ্রব্যের গুণাগুণ আবিষ্কার রোগজ্ঞানের উপর নির্ভর করে না। রুবার্ব বা ক্যাষ্টর অয়েল খাইলে দাস্ত হয়, অহিফেণ খাইলে নিদ্রা হয়, এই সকল বিষয়ের আবিষ্কার রোগের প্রকৃতি দেখিয়া হয় নাই। তবে মনুষ্যদেহের উপর ঔষধ দ্রব্যের ক্রিয়া পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া এই সকল ঔষধের বিশেষ বিশেষ গুণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে সকল রোগের বিশেষ বিশেষ ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, অথবা যে সকল রোগের চিকিৎসা ঔষধদ্রব্যের উপর নির্ভর করে না, অপিচ চিকিৎসকের চেষ্টা ও কৌশলের উপর নির্ভর করে, সে সকল পরিজ্ঞাত হওয়ামাত্রই তাহার ঔষধ প্রয়োগ সহজ হইয়া দাঁড়ায়। যথা;—এইটী কম্পজ্বর ইহা জানিতে পারিলেই অমনি কুইনাইন দ্বারা তাহার প্রতিকার হইল। আবার কাহারও হস্তের হাড় নড়িয়া গেল, চিকিৎসক নিজবুদ্ধিবলে হাড়টী সোজা করিয়া দিলেন। কিন্তু এমন অনেক রোগ আছে, তাহা চিনিলেই যে, তাহার প্রতিকারের সুবিধা হইল তাহা নহে। তবে রোগটী বিশেষ করিয়া চিনিতে পারিলে চিকিৎসক মনোনিবেশপূর্ব্বক ঐ রোগের গতিবিধি

পরিদর্শন করিতে পারেন এবং ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ ঐ রোগের উপর পরীক্ষা করিয়া অবশেষে রোগটীর প্রকৃত ঔষধ নির্ণয়ে সমর্থ হইতে পারেন। এই-রূপে ক্রমে ক্রমে চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু রোগটী উত্তমরূপে পরীক্ষা না করিয়া তাহার উপর কোন বিশেষ ঔষধদ্রব্যের পরীক্ষার ফলাফল জ্ঞাত হওয়া না হওয়া সমান কথা। এমন অনেক রোগ আছে যাহা অন্য রোগের সহিত অনেকাংশে মিলিয়া যায়, সুতরাং এক রোগ অপর রোগ বলিয়া ভ্রম হয়। যিনি এইরূপ ভ্রমপূর্ণ পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়া ঔষধ দ্রব্যের গুণাগুণ চিকিৎসক সমাজে প্রচার করেন, তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতি না করিয়া বরঞ্চ তাহার অবনতি করেন। এমন অনেক চিকিৎসক আছেন, যাঁহারা রোগ চিনিতে না পারিয়া কোন দ্রব্যবিশেষ দ্বারা সামান্য ক্ষত আরাম করিয়া ক্যান্সার ক্ষতের ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া প্রচার করেন। আবার হয়ত দ্রব্য বিশেষ দ্বারা সামান্য উদরাময় আরাম করিয়া সেই দ্রব্যকে কলেরার ঔষধ বলিয়া প্রচার করেন। এইরূপ ভ্রমপূর্ণ দর্শনের উপর নির্ভর করিয়া ঔষধ প্রচার করিলে সে চিকিৎসক যে শুধু আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করেন তাহা নহে, অপর অপর চিকিৎসকবর্গের এবং অন্যান্য রোগীদিগেরও সর্ব্বনাশ করেন। আজ কাল অনেক হাতুড়ে প্যাটেণ্ট ঔষধ এইরূপ ধরণে আবিষ্কৃত হইয়া দেশের লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে। কিরূপ ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাঁহা একটী দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইয়া দি। কোন লোক যক্ষ্মা রোগ (থাইসিস্) দ্বারা পীড়িত হইয়া প্রবন্ধলেখকের নিকট চিকিৎসিত হইতে আইসেন, এবং কিছুদিন চিকিৎসার অধীন থাকিয়া রোগের কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হইল। বোধ করি ক্রমাগত সেই নিয়মেও চিকিৎসার বশবর্ত্তী থাকিলে তাঁহার রোগের সম্পূর্ণ প্রতিকার না হউক, রোগী বহুকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার দুরদৃষ্টবশতঃ তিনি কাহার মুখে শুনিলেন যে, অমুক প্যাটেণ্ট ঔষধ দ্বারা অনেক যক্ষ্মাকাস ভাল হইয়াছে। হয়ত প্যাটেণ্টওয়ালা গুটিকতক সর্দ্দিকাসি আরাম করিয়া ঐ ঔষধকে যক্ষ্মা রোগের অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া স্থির করিয়াছিল। বর্ণিতরোগী তিন সপ্তাহের ঔষধ আনাইলেন। প্রবন্ধলেখক বলিলেন, উক্ত ঔষধে আপনার বিশ্বাস হইয়া থাকে সেবন করিয়া দেখিতে পারেন কিন্তু আমি যে সকল

ঔষধ দিয়াছি তাহাও সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করিতে বিরত হইবেন না। কিন্তু প্যাটেণ্টওয়ালা লিখিয়া পাঠাইল যে, আমার ঔষধের সহিত অন্য ঔষধ খাওয়া চলিবে না। সুতরাং তিনি সমস্ত ঔষধ বন্ধ করিয়া সেই একমাত্র "অমৃত" ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মাসখানেক মধ্যেই রোগীর এতদূর বলক্ষয় হইল যে, তিনি শয্যাগত হইলেন, তখন নানা তদ্বিরে আর কোন ফল হইল না এবং অবিলম্বেই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

রোগলক্ষণ পরিজ্ঞানের দ্বারা রোগের ভাবিফল নির্ণয়ে সমর্থ হওয়া যায়। এইরূপ ভাবিফল নির্ণয় করা বহুদর্শনের ফল। অমুক রোগে অমুক লক্ষণ উপস্থিত হইয়া অমুক রোগী অবিলম্বে মারা গেল, তারপর ঠিক সেইরূপ পীড়াগ্রস্ত অন্য অনেক রোগীতে দেখা গেল যে, ঠিক সেই লক্ষণটী উপস্থিত হইয়া রোগীগুলি মরিয়া গেল। তখন চিকিৎসক বুঝিলেন যে, অমুক রোগে অমুক লক্ষণ দেখা দিলে রোগীর আর বেশী দিন অপেক্ষা থাকে না। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ যে, রোগীর ধাত পরীক্ষা করিয়া ঠিক কোন্ সময়ে মৃত্যু হইবে তাহা বহুদিন পূর্ব্বে বলিয়া দিতেন, তাহাও এইরূপ বহুদর্শনজনিত অভিজ্ঞতার ফলেই বলিতে পারিতেন। ডাক্তারী চিকিৎসা মতেও বহুদর্শনদ্বারা অনেক রোগের ভাবিফল নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে। যথা ;— ক্যান্সাররোগ হইয়াছে জানিলেই চিকিৎসক নিঃসংশয়ে বলিতে পারেন যে, রোগীর মৃত্যু অতি নিকট। কলেরারোগীর যে সময় সমস্ত গা ও হাত পা শীতল হয়, সেই সময় যদি উহার আভ্যন্তরিক উত্তাপের বৃদ্ধি হয়, তবে বুঝা গেল যে, রোগীর মৃত্যুর আর অধিকক্ষণ বিলম্ব নাই৲ বৃদ্ধবয়সে নিউমোনিয়া বা ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ হইলে প্রায়ই সাংঘাতিক হয়। প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত বিষম দ্বোকালীনজ্বর প্রায়ই আরাম হয় না। এই সকল কথা পরে ভাল করিয়া বলা যাইবে। রোগের ভাবিফল লাভ দ্বারা রোগ চিকিৎসার তাদৃশ সুবিধা হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও এই জ্ঞানলাভ চিকিৎসকদিগের পক্ষে বড় কম গৌরবের কথা নহে। এই রোগের পরিণাম ফল এইরূপ, বা এই রোগের অমুক দিনে এইরূপ অবস্থা হইতে পারে, এই সকল কথা ঠিক করিয়া বলিতে পারিলে চিকিৎসকের উপর রোগীর ও রোগীর অভিভাবকদিগের ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি হয়। কিন্তু এইরূপ ভাবিফল রোগীর অভিভাবকদিগকে বলিবার সময় বিশেষ সতর্ক হইয়া

বলিতে হয়। যে রোগের ভাবিফল ঠিক করিয়া জানা আছে এবং যাহা বহুপরীক্ষায় অব্যর্থ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, সেই ভাবিফলই সাহসপূর্ব্বক জ্ঞাপন করা উচিত। নচেৎ অধিকাংশ স্থানেই চিকিৎসককে বিলক্ষণ হাত রাখিয়া কায করিতে হয়. নচেৎ পদে পদে অপ্রতিভ হইবার সম্ভাবনা। যথা ;—সন্তান প্রসব হইবার প্রকৃত কাল কদাচ চিকিৎসক নির্ণয় করিয়া বলিবেন না। গর্ভিণীর ঘন ঘন প্রসববেদনা হইতেছে। গর্ভিণী বা গর্ভিণীর স্বামী চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিল, প্রসবের আর বিলম্ব কত ? এস্থলে চিকিৎসক কোনক্রমেই সময় নিরুপণ করিয়া ঠিক উত্তর দিবেন না, দিলেই অপ্রতিভ হইবেন। পানমুচি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, জরায়ুর দ্বার প্রশস্ত হইয়াছে, ভ্রূণের মস্তকও অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, বোধ হইতেছে যেন অর্দ্ধ-ঘণ্টার মধ্যেই প্রসব হইবে। ও মা! শেষে দেখি পাঁচঘণ্টাতেও প্রসব হইল না। চিকিৎসকের ভাবিফল নির্ণয়জ্ঞান অনেক সাংসারিক প্রয়োজনে লাগে। উইল করা, গঙ্গাযাত্রা প্রভৃতি সাংসারিক কার্য্যসকল সম্পূর্ণ চিকিৎসকের কথার উপর নির্ভর করে। অনেক স্থলে প্রকৃত বিষয় চিকিৎসককে গোপন করিতে হয়। অনেক স্থল এমন আছে যে, রোগী তাহার বিপদবার্ত্তা শ্রবণ করিলে যে দুদিন বাঁচিত তাহাও আর বাঁচে না। রোগী নির্ভরসা হইলে অনেক পুরাতন আরোগ্যোন্মুখ-রোগ সহসা গুরুতর আকার ধারণ করিতে পারে। ভাবিফল রোগীকে জ্ঞাপন করা অনেক স্থলে নিষ্ঠুরতার কার্য্য। প্রাণ কেহ দিতে পারে না, রোগীর জীবন শেষ হইলে একদিন বা একঘণ্টা কোন চিকিৎসক বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন না, অতএব যে দুদিন রোগী বাঁচিয়া থাকে, সে দুদিন তাহাকে বাঁচিতে দাও। তাহার মৃত্যুর বার্ত্তা তাহাকে পূর্ব্ব হইতে জানাইয়া কেন তাহাকে অসুখী কর ? নিতান্ত প্রয়োজনীয় স্থলে ভাবিফলের বিষয় চিকিৎসক তাঁহার আত্মীয়বর্গকে কৌশলে জ্ঞাপন করিবেন। যদি রোগী নিজেই বাটীর কর্ত্তা হয় এবং তাঁহাকে তাঁহার আসন্নমৃত্যুর বিষয় জ্ঞাপন করা নিতান্ত প্রয়োজন হয়, তবে চিকিৎসক একবারে শেষ জবাব না দিয়া, রোগীকে একবারেই ভরসা হীন না করিয়া এইরূপ হওয়া সম্ভব, তবে বাঁচিবার ভরসাও অবশ্য আছে, এইরূপ কথোপকথন করিবেন। যদি

এমন জানিতে পারা যায় যে, রোগী তাহার বিপদবার্ত্তা শ্রবণ করিলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে বা তাহার রোগ আরও বৃদ্ধি হইবে, তবে রোগীর বন্ধুগণকে উক্ত বিষয় জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতে হইবে যে, তাহারা রোগীর নিকট উক্ত বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করেন। আবার রোগী বা রোগীর অভিভাবকদিগকে বৃথা আশ্বাস প্রদান করাও উচিত নহে, তাহাতে চিকিৎসকের অপযশ হয় এবং রোগীরও ক্ষতি হয়। রোগী এই ক্ষণেই মরিবে, আমি হাত দেখিয়া বলিলাম ভয় কি, আরাম হইবে, ওদিকে চিকিৎসক ঘর হইতে বাহির না হইতে হইতে রোগীকে উঠানে নামাইতে হইল। এরূপ ঘটনা চিকিৎসকের পক্ষে সুখ্যাতির কথা নহে। ইহাতে রোগীর অভিভাবকদিগের মনে এই ধারণা হয় যে, চিকিৎসক মোটেই রোগ চিনিতে সক্ষম হন নাই।

আবার কঠিন রোগের বিষয় রোগীও অভিভাবকদিগের নিকট জ্ঞাপন না করিলে, অনেকস্থলে চিকিৎসকের উপর দোষ স্পর্শে। হয়ত রোগী তাহার বিপদবার্ত্তা জানিতে পারিলে অন্য কাহারও দ্বারা (যাহার উপর তাহার বিশ্বাস আছে) চিকিৎসিত হইত। এবং এই অবস্থায় কোন বিপদ হইলে তাহার ও তাহার আত্মীয়বর্গের মনে ঘোর সন্দেহ ও আক্ষেপ থাকিয়া যাইত যে, হয়ত, অগ্রে জানিতে পারিলে অমুককে দিয়া দেখাইলে রোগের প্রতিকার হইত। অতএব সরলভাবে রোগীর অবস্থা, রোগীর ও রোগীর আত্মীয়বর্গের নিকট জ্ঞাপন করা চিকৎসকের অতীব কর্ত্তব্য। আবার অকারণে হাল ছাড়িয়া দিয়া জবাব দেওয়া উচিত নহে। এই সকলস্থলে বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করাই উচিত। কোন স্থানেই হট্ করিয়া প্রকাশ করিবে না। আবার অনেক চিকিৎসক রোগ সহজ জানিয়াও রোগীকে বৃথা ভয় প্রদর্শন করেন, মতলব এই যে, কিছু বেশী আদায় হয়, অথবা আমি এমন শক্ত রোগ হইতে রোগীকে বাঁচাইয়াছি, এইটী রোগার মনে ধারণা হয়। কিন্তু এইরূপ আচরণ করিলে পরিণামে চিকিৎসকের পসারের বিলক্ষণ হানি হইবার সম্ভাবনা। মনে কর, আমি রোগীর সামান্য একটা পীড়া দেখিয়া বলিলাম তোমার রোগ অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে, রোগী হয়ত এই কথায় ভয় পাইয়া অপর কোনও চিকিৎসককে দেখাইল, তিনি আসিয়া বলিলেন, তোমার পীড়া অতি যৎসামান্য, এই দেখ আমি এক-

দিনেই ভাল করিতেছি। ঘটিলও তাহাই এবং রোগীরও মনে ধারণা হইল, অমুক চিকিৎসক কোনও কাযের নহে।

আসন্নমৃত্যুরোগীর নিকট রোগীর বিপদবার্ত্তা চিকিৎসক গোপন করিবেন। এবং মিথ্যা আশ্বাসপ্রদানে তাহার মনে শান্তিপ্রদান করিবেন। এক্ষণে এইরূপ মিথ্যা আচরণে চিকিৎসকের অধর্ম্ম হয় কি না? বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাতে অধর্ম্ম হয় না। নীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা উপদেশ দেন কদাচ মিথ্যা কথা কহিও না, বা মিথ্যা আচরণ করিও না। সাধারণস্থলে এইরূপ ব্যবহারই কর্ত্তব্য। কিন্তু সকল ধর্ম্মের মূল হইতেছে লোকের হিতসাধন করা। সময় সময় এই হিতসাধনার্থ কপট আচরণ করিতে হয়। এইরূপ কপট আচরণ ব্যতীত সংসারে থাকিবার যো নাই। সভ্যসমাজের আচরণমাত্রেই কপটতা-পরিপূর্ণ। নিতান্ত সরল হইলে লোক পশ্বাবস্থা হইতে এতদূর উন্নত হইত না। এবং এইরূপ সরল আচরণে মনুষ্য মনুষ্যবিশেষকে ঘোর নিষ্ঠুর অথবা রুক্ষভাষী বিবেচনা করিত। লোকব্যবহারে কতকগুলি বিষয়ে কপট আচরণ অপরিহার্য্য। লোকের বাটীতে কোন বিশেষ অতিথি উপস্থিত হইলে লোকে তাহাকে স্থান দিবার ইচ্ছা না থাকিলেও সভ্যতার খাতিরে থাকিয়া যাইতে বলেন। আবার আগত ব্যক্তির থাকিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকিলেও অথবা অত্যন্ত ক্ষুধিত থাকিলেও তাঁহার বাটীতে থাকিতে বা আহার গ্রহণ করিতে অনিচ্ছাপ্রকাশ করেন। পরন্তু চক্ষুলজ্জা বলিয়া যে একটা কথা প্রচলিত আছে, তাহা মনোভাব গোপন করিয়া কপট আচরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরন্তু এই সকল কপট আচরণ লোকহিতার্থে অবলম্বিত হয় বলিয়া মনুষ্যসমাজে এরূপ আচরণে দোষ নাই। যাহাতে কিছুমাত্র অনিষ্ট নাই বরঞ্চ অত্যন্ত অধিক উপকার, এরূপ মিথ্যাচরণ স্থলবিশেষে অধর্ম্মাচরণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। রোগী মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া চিকিৎসককে কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছে, মহাশয় আমি কি বাঁচিব না? এস্থলে সত্যবাদী এমন চিকিৎসক কে আছেন, যিনি মিথ্যা আশ্বাসে রোগীর সন্তোষসাধন না করিবেন? এবং এমন নিষ্ঠুর ও স্পষ্টবাদী সংসারে কে আছেন, যিনি রোগীর মুখের উপর বলিতে পারেন যে, তুমি আর বাঁচিবে না। এই জন্যই মহাভারতে কৃষ্ণোক্তিস্থলে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, লোকহিতার্থে অর্থাৎ যেখানে

মিথ্যাই সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সে সকল স্থানে মিথ্যা আচরণে দোষ নাই।

সকল লক্ষণে রোগীর সকলপ্রকার অবস্থা সমানভাবে জ্ঞাপন করে না। অনেক স্থলে, একটী বিশেষ লক্ষণ বা কতকগুলি বিশেষ লক্ষণসমষ্টি দেখিলেই রোগের প্রকৃতি, ভাবিফল ও ঔষধের বিষয় বুঝিতে পারা যায়। যথা;—একজন সুস্থব্যক্তির যদি হঠাৎ কম্প উপস্থিত হয় এবং তদ্‌পরে গাত্র উষ্ণ হয় এবং কিয়ৎকাল পরেই ঘর্ম্ম হইয়া গাত্র শীতল হইয়া যায় এবং পরে প্রায় ঠিক্ সেই সময়ে আবার কম্প ও গাত্রদাহ উপস্থিত হয়, তবে জানিতে পারা গেল যে, উহার কম্পজ্বর হইয়াছে, উহা কুইনাইন দিলেই আরোগ্য লাভ করিবে। এবং এইরূপে চিকিৎসিত হইলে রোগীর কোনই বিপদ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু জটিলরোগে এইরূপ একটী বা দুইটী লক্ষণ দেখিয়া রোগের সমস্ত অবস্থা চিকিৎসক জ্ঞাত হইতে পারেন না। এই সকল স্থলে বিশেষ বিশেষ লক্ষণে রোগীর বিশেষ বিশেষ অবস্থা জ্ঞাপন করে। কতকগুলি লক্ষণে মূলরোগটী কি, তাহা স্থির হইল। আবার কতকগুলি অন্যপ্রকার লক্ষণ দেখিয়া জানিতে পারা গেল যে, রোগীর ভাবিফল অমঙ্গলজনক। আবার অন্যরূপ লক্ষণদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, কিরূপ চিকিৎসাপ্রণালী রোগীর পক্ষে ফলদায়ক হইবে। মনে কর কোন ব্যক্তির গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুঁটি বাহির হইয়াছে, চিকিৎসক ঐ গুঁটিগুলি পরীক্ষার দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, উহা বসন্ত বাহির হইয়াছে। এক্ষণে এই সকল গুঁটির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় রোগীর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রকাশ করে। হয়ত, তাহার মুখের গুটিগুলি একত্র মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, অথবা তাহারা আলাহিদা আলাহিদা আছে। একটীতে রোগ কঠিন এবং অপরটীতে রোগের অবস্থা সহজ, ইহাই জ্ঞাপন করিবে। তার পর রোগীর জ্বরের অবস্থা বা দৈহিক উত্তাপ, নাড়ীর গতি, নিশ্বাসের দ্রুতত্ব প্রভৃতিতে রোগীর অন্যান্য অনেক অবস্থা জ্ঞাপন করিবে। এই বসন্তরোগীর দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, লক্ষণ সকল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) রোগ জ্ঞাপক লক্ষণ অর্থাৎ যদ্দ্বারা ঠিক্ কি রোগ হইয়াছে তাহা বুঝা যায়। (২) চিকিৎসা জ্ঞাপক লক্ষণ, অর্থাৎ যদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, কিরূপ চিকিৎসাপ্রণালী রোগীর পক্ষে প্রয়োজনীয় (৩) ভাবিফল নির্ণায়ক লক্ষণ অর্থাৎ

দ্বারা রোগী বাঁচিবে কি মরিবে, অথবা বাঁচিলে কতদিন ভুগিবার সম্ভব, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সকল চিকিৎসকেরই সকল প্রকার রোগের লক্ষণ সমুদয় এইরূপ বিভাগ করিয়া অধ্যয়ন করা উচিত। তাহা হইলেই তিনি রোগীটী দেখিবামাত্রই তাহার লক্ষণ সমষ্টি পৃথক পৃথক করিয়া লইতে পারিবেন। অধিকাংশস্থলেই একটীমাত্র লক্ষণ দ্বারা রোগের স্বরূপ পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। একটী রোগীর বক্ষঃস্থলে ষ্টীথেস্‌কোপ্ লাগাইয়া বুড়্‌বুড়ি শব্দ হইতেছে শুনিতে পাওয়া গেল। এই বুড়্‌বুড়শব্দটী একটী লক্ষণ। এইক্ষণে কেবলমাত্র এই বুড়বুড় শব্দটী শুনিয়া রোগের প্রকৃতিটী বুঝা গেল না। এই শব্দটীতে কেবল এইমাত্র সূচিত হইল যে, রোগীর বক্ষের ভিতর কোনরূপ তরলপদার্থ সঞ্চিত হইয়াছে. কিন্তু সে তরলপদার্থটী কি? উহা জল. কি শ্লেষ্মা কি পুঁজ তাহা ভাল বুঝা গেল না। এক্ষণে চিকিৎসক যদি জানিতে পারেন, যে, বর্ণিতরোগী দুই এক দিনমাত্র পীড়িত হইয়াছে এবং তাহার বক্ষঃস্থলে বেদনা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে জ্বর ও কাসী আছে এবং শ্বাস কষ্টও আছে, তবে চিকিৎসক বুঝিতে পারিলেন যে, রোগীটীর ফুস্ফুষপ্রদাহ (নিউমোনিয়া) হইয়াছে। এই নিউমোনিয়া রোগটী কেবল এক বুড় বুড় শব্দে বুঝিতে পারা গেল না, অথবা ঐ বুড়বুড় শব্দটী বাদ দিয়া যদি কেবলমাত্র জ্বর, শ্বাসকষ্ট ও কাসী থাকিত, তত্রাচ বুঝিতে পারা যাইত যে, ইহা নিউমোনিয়া নহে। অতএব এই রোগীসম্বন্ধে বুড়বুড় শব্দ তথা জ্বর কাসী, বুকে ব্যথা ও শ্বাসকষ্টের একত্র সমাবেশদ্বারা বুঝিতে পারা গেল যে, রোগী নিউমোনিয়ার দ্বারা পীড়িত হইয়াছে।

কতকগুলি রোগে কতকগুলি বিশেষলক্ষণ আছে, যাহা দেখিতে পারামাত্রই রোগটী নির্ণিত হইতে পারে। সেই লক্ষণ গুলিকে ইংরেজি ভাষায় "প্যাথিনোমিক্ সিম্‌টম্‌স্" কহে। যথাঃ—মূত্রে শর্করা দেখিলেই জানা গেল যে, রোগীরে ডায়েবেটিস্ (শর্করা মেহ) রোগ হইয়াছে। এস্থলে মূত্রে শর্করা বর্ত্তমানই ডায়েবেটিস্ রোগের প্যাথগ্‌নমিক বা বিশেষ লক্ষণ, কারণ অন্য কোনও রোগে এই লক্ষণটী দেখা যায় না। কিন্তু এইরূপ বিশেষ লক্ষণ খুব্ অল্পই দেখা যায়। অধিকাংশ স্থলেই অনেকগুলি লক্ষণের একত্র সমবেশ ব্যতীত রোগের বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। একটী সামান্য লক্ষণও অন্য অন্য কোন লক্ষণের সহিত একত্র হইয়া রোগের অবস্থার পরিচায়ক হইয়া উঠে।

রোগের বিশেষ লক্ষণব্যতীত, রোগীর আনুষঙ্গিক বিবরণও রোগ নির্ণয়ের পক্ষে অত্যন্ত কার্য্যকারী যথা,—কোন রোগীর বুকধড়্ফড়ানির (প্যাল্পিটেসন্) ব্যাম আছে জানিতে পারা গেল। এক্ষণে এই ব্যাধিটী কতদূর গুরুতর ভাবধারণ করিয়াছে, তাহা রোগীর আদ্যোপান্ত অবস্থা না জানিলে সহসা ঠিক্ করা যাইতে পারে না। এই প্যাল্পিটেসন্ হৃদয়ের কোন গুরুতর পীড়া হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, কি ইহা হৃদয়ের সামান্য ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য মাত্রের পরিচায়ক? যদি চিকিৎসক রোগীর বিবরণে জানিতে পারেন যে, রোগীর পুর্ব্বে তরুণ বাতব্যাধি (রিউম্যাটিজম্) হইয়াছিল, তবে চিকিৎসক নিঃসংশয়ে জানিতে পারেন যে, উহার প্যাল্পিটেসন্ বড় সামান্য নহে, প্রত্যুত হৃদয়ের গুরুতর পীড়ার পরিচায়ক।

লক্ষণ সকলের মধ্যে আর একরূপ প্রকার ভেদ আছে। যথা;—(১) ডাইরেক্ট বা যে লক্ষণ রোগপীড়িতস্থানেই ব্যক্ত হয় (২) ইন্ডাইরেক্ট, যাহা অপর স্থানে ব্যক্ত হইয়া কোন অঙ্গের পীড়া সূচিত করে যথা;—যকৃৎপ্রদেশে বেদনাবোধ যকৃৎপীড়ার ডাইরেক্ট লক্ষণ, আর যকৃৎযন্ত্রের প্রদাহ হইলে যে রোগীর স্কন্ধে বেদনা বোধ হয়, উহা যকৃৎপীড়ার ইন্ডাইরেক্ট লক্ষণ।

রোগনির্ণয়-পক্ষে অনেক সময় চিকিৎসককে রোগীর কথার উপর নির্ভর করিতে হয়। এই সকল স্থলে রোগীর বাচনিক বিবরণ চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষিতলক্ষণের সহিত একত্র করিয়া চিকিৎসক রোগ নির্ণয়ে সমর্থ হইবেন। যদি কেবলমাত্র রোগীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে অনেক স্থলে চিকিৎসককে প্রতারিত হইতে হয়। আবার অনেক রোগীর সম্বন্ধে রোগীর বাচনিক কোন কথাই জানিতে পারা যায় না। সেই সকল স্থলে চিকিৎসককে সম্পূর্ণরূপে আত্মীয়বর্গ ও নিজের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু, নির্ব্বোধ ও মূক এই শ্রেণীর রোগী। ক্রমশঃ—

আয়ুর্ব্বেদে রোগ ও মৃত্যুপরীক্ষা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বৈদ্যশাস্ত্রমতে এক নাড়ী টেপা ভিন্ন রোগ পরীক্ষার সুবন্দবস্ত আর কিছুই নাই, যাঁহাদের এরূপ বিশ্বাস, তাঁহাদের মত লোকের সেই ভ্রান্ত

বিশ্বাস দূর করিবার জন্য আমরা ইতিপূর্ব্বে বৈদ্যশাস্ত্র হইতে রোগ ও মৃত্যু পরীক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি অত্যাশ্চর্য্য ও সুগভীর উপদেশ পাঠকগণকে জানাইয়াছি. পাঠকগণ দেখিয়াছেন যে, নিঃসন্দেহরূপে রোগ পরীক্ষার জন্য প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপদেশ এই তিনটী প্রমাণের দ্বারা রোগীর বর্ণস্বরাদি কত কত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তবে রোগ ও মৃত্যুপরীক্ষা করিতে হয়। যাহা হউক, মৃত্যু পরীক্ষা সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বের ন্যায় আরও কতকগুলি প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

উত্থাপ্যমানঃ শয়নাৎ প্রমোহং যাতি যো নরঃ।
মুহুর্মুহুর্ন সপ্তাহং স জীবতি বিকত্থনঃ॥

অর্থাৎ যাহাকে শয্যা হইতে ধরিয়া উঠাইলেও যে মুহুর্মুহু মোহ প্রাপ্ত এবং কেবল নিন্দাপর (যাহা কিছু দেখে বা শুনে ইত্যাদি সমস্তই নিন্দা করে) হয়, সে ব্যক্তি সপ্তাহের অধিক দিন জীবিত থাকে না।

উপরুদ্ধস্য রোগেণ কর্ষিতস্যাল্পমশ্নতঃ।
বহুমূত্রপুরীষং স্যাদ্‌যস্যতং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত ও কৃশ হইয়া অল্পাহার করে, অথচ অধিক পরিমাণে মল মূত্র ত্যাগ করে, তাহাকে বর্জ্জন করিবে।

দুর্ব্বলো বহুভুংক্তে যঃ প্রাগ্‌ভুক্তাদন্নমাতুরঃ।
অল্পমূত্রপুরীষশ্চ যথাপ্রেতস্তথৈব সঃ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুর্ব্বল হইয়াও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভোজন করে, অথচ অল্প অল্প মল ও মূত্র ত্যাগ করে, সে মরিয়াছে জানিবে, অর্থাৎ তাহার মৃত্যু অব্যর্থ।

বর্দ্ধিষ্ণুগুণসম্পন্নমন্নমশ্নাতি যো নরঃ।
শশ্বচ্চ বলবর্ণাভ্যাং হীয়তে ন স জীবতি॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পুষ্টিকারক অন্ন ভোজন করিয়াও সর্ব্বদা বল ও বর্ণে ক্রমশঃ হীন হইতে থাকে, নিশ্চয় করিবে যে, সে আর বাঁচিবে না।

প্রকূজতি প্রশ্বসিতি শথিলিং চাতি সার্য্যতে।
বলহীনঃ পিপাসার্ত্তঃ শুষ্কাস্যো ন স জীবতি॥

অর্থাৎ যাহার কণ্ঠে কূজন, শ্বাস, মলশৈথিল্য (পাতলা মলের নির্গমন),

বলহানি, অত্যন্ত পিপাসা এবং মুখশোষ এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয়, সে মরিয়াছে বলিয়া নিশ্চয় করিবে।

হ্রস্বঞ্চ যঃ প্রশ্বসিতি ব্যাবিদ্ধং স্পন্দতে চ যঃ।
মৃতমেব তমাত্রেয়ো ব্যাচচক্ষে পুনর্ব্বসুঃ॥

অর্থাৎ যাহার শ্বাসের অল্পতা ও কুটিলভাবে শরীরের স্পন্দন হইতে থাকে, আত্রেয় পুনর্ব্বসু তাহাকে মৃত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ঊর্দ্ধঞ্চ যঃ প্রশ্চিসিতি শ্লেষ্মণা চাভিভূয়তে।
হীনবর্ণবলাহারো যো নরো ন স জীবতি॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্লেষ্মাভিভূত হইয়া ঊর্দ্ধদিকে শ্বাস ফেলে, আর যদি তাহার বল, বর্ণ ও আহারের অল্পতা দৃষ্ট হয়, তবে সে আর অধিক কাল বাঁচিবে না।

ঊর্দ্ধাগ্রে নয়নে যস্য মন্যে চানতকম্পনে।
বলহীনঃ পিপাসার্ত্তঃ শুষ্কাস্যো ন স জীবতি॥

অর্থাৎ যাহার নয়নদ্বয় ঊর্দ্ধমুখে উঠে (চক্ষু কপালের দিকে উঠা) এবং মন্যাদ্বয় থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিতে থাকে, তাহার যদি বলহানি, পিপাসা, ও মুখশোষ হয়, তবে সে আর বাঁচিবে না।

যস্য গণ্ডাবুপচিতৌ জ্বরকাসৌ চ দারুণৌ।
শূলী প্রদ্বেষ্টি চাপ্যন্নং তস্মিন্ কর্ম্ম ন সিধ্যতি॥

যাহার গণ্ডস্থল পরিপুষ্ট এবং নিদারুণ জ্বর ও কাস বিদ্যমান থাকে, তাহার যদি শূল এবং অন্নদ্বেষ হয়, তবে তাহার প্রতি কোন চিকিৎসাকার্য্য সফল হয় না।

ব্যাবৃত্তমূর্দ্ধজিহ্বাক্ষো ভ্রুবৌ যস্য চ বিচ্যুতে।
কণ্টকৈশ্চাচিতা জিহ্বা যথাপ্রেতস্তথৈব সঃ॥

যাহার মস্তক, জিহ্বা এবং চক্ষু উল্টাইয়া যায়, ভ্রূদ্বয় নামিয়া পড়ে, ও জিহ্বাতে কাঁটা কাঁটা গো জিহ্বাবৎ হয়, তাহাকে মৃত সদৃশ বলিয়া জানিবে।

শেফশ্চাত্যর্থমুৎসিক্তং নিঃসৃতৌ বৃষণৌ ভৃশং।
অতশ্চৈব বিপর্য্যাসঃ প্রকৃত্যা প্রেতলক্ষণং॥

অর্থাৎ যে পুরুষের শেফ (পুরুষাঙ্গ) অত্যন্ত অন্তঃপ্রবিষ্ট (অত্যন্ত ক্ষুদ্র) বৃষণদ্বয় (অণ্ডকোষদ্বয়) অত্যন্ত নিঃসৃত (অত্যন্ত ঝুলিয়া পড়ে) অথবা ইহার বিপরীত অর্থাৎ শেফ নিঃসৃত ও বৃষণদ্বয় অন্তঃনিবিষ্ট হয়, তবে সেই পুরুষকে মৃত বলিয়া জানিবে।

নিচিতিং যস্য মাংসংস্যাত্ত্বগস্থিন্যেব দৃশ্যতে।
ক্ষীণস্যানশ্নতস্তস্য মাসমায়ুঃ পরং ভবেৎ॥

অর্থাৎ যাহার মাংস, ত্বক্ এবং অস্থির ক্ষীণতা দৃষ্ট হয়, আরও সে যদি আহার করিতে অসমর্থ হইয়া ক্ষীণ হইতে থাকে, তবে সে রোগী যদি বড় বেশী বাঁচে একমাস পর্য্যন্ত।

অবাক্‌শিরা বা জাহ্মা বা যস্য বা বিশিরা ভবেৎ।
জন্তো রূপপ্রতিচ্ছায়া নৈনমিচ্ছেচ্চিকিৎসিতুম্॥

অর্থাৎ যাহার প্রতিছায়া উর্দ্ধপাদ, বক্র এবং মস্তকশূন্য হয়; তাহাকে চিকিৎসাকরা দূরে থাকুক, চিকিৎসা করিতে ইচ্ছাও করিবে না।

জটীভূতানি পক্ষ্মাণি দৃষ্টিশ্চাপি নিগৃহ্যতে।
যস্য জন্তোর্নতং ধীরো ভেষজে নোপপাদয়েৎ॥

অর্থাৎ যাহার পক্ষ্ম সকল জটা বাঁধিয়া যায় এবং দৃষ্টিশক্তিও কমিয়া আইসে, বুদ্ধিমান্ ভিষক্ ঔষধদ্বারা কখনই তাহাকে চিকিৎসা করিবেন না।

যস্য শূনানি বর্ত্মানি ন সমায়ান্তি শুষ্যতঃ।
চক্ষুষী চোপদিহ্যেতে যথা প্রেতস্তথৈব সঃ॥

অর্থাৎ যে শুষ্ক ব্যক্তির চক্ষের পাতা শোথযুক্ত হইয়া পরস্পর মিলিত না হয় এবং চক্ষুদ্বয়ও লেপা লেপা বোধ হয়, মৃতব্যক্তিও যেমন, সেই ব্যক্তিকেও সেইরূপ জানিবে।

ভ্রুবোর্ব্বা যদি মূর্দ্ধ্নি সীমন্তাবর্ত্তকান্ বহূন্।
অপূর্ব্বানকৃতান্ ব্যক্তান্ দৃষ্ট্বা মরণমাদিশেৎ॥

অর্থাৎ যাহার ভ্রূতে হউক, অথবা মস্তকে হউক, অপূর্ব্ব ও অকৃত নানাবিধ সীমন্ত (সিঁতি) এবং বর্ত্তক (চক্র) স্পষ্ট দেখিবে, তাহার মৃত্যু নিশ্চয় করিবে।

ত্র্যহমেতেন জীবন্তি লক্ষণেনাতুরা নরাঃ।
অরোগাণাং পুনস্ত্বেতৎ ষড্রাত্রং পরমুচ্যতে॥

অর্থাৎ যে কোন রোগী যদি পূর্ব্বলিখিত তিন লক্ষণের কোনও লক্ষণ-দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে সে তিনদিনের অধিক বাঁচিবে না। আর যদি অরোগীব্যক্তির ঐ সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়, তবে সেও বড় জোর ছয় রাত্র বাঁচিবে।

আয়ম্যোৎপাটিতান্ কেশান্ যো নরো নাববুধ্যতে।
অনাতুরো বা রোগী বা ষড্রাত্রং নাতি বর্ত্ততে॥

অর্থাৎ যাহার কেশ সকল উৎপাটন করিলে বা টানিলেও বুঝিতে না পারে, সে রোগীই হউক, বা অরোগীই হউক, ছয় রাত্রের অধিক বাঁচিবে না।

যস্য কেশা নিরভ্যঙ্গা দৃশ্যন্তে অভ্যক্তসন্নিভাঃ।
উপরুদ্ধায়ুষং জ্ঞাত্বা তং ধীরঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

অর্থাৎ যাহার কেশসমুদায়ে তৈল না থাকিলেও তৈলমাখা বলিয়া বোধ হয়, আয়ুঃশেষ হইয়াছে বলিয়া বুদ্ধিমানেরা তাহাকে পরিত্যাগ করেন।

গ্লায়তে নাসিকাবংশঃ পৃথুত্বং যস্য গচ্ছতি।
অশূনঃ শূনসঙ্কাশং প্রত্যাখ্যেয়ঃ স জানতা॥

অর্থাৎ যাহার নাসাবংশ স্থূল ও শোথযুক্ত না হইয়া ও শোথযুক্ত দেখা যায়, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকেন।

অত্যর্থ বিবৃতা যস্য যস্য চাত্যর্থ সংবৃতা।
জিহ্বা বা পরিশুষ্কা বা নাসিকা ন স জীবতি॥

অর্থাৎ যাহার জিহ্বা অত্যন্ত বিবৃত (বাহির হইয়া পড়া) বা অত্যন্ত সংবৃত (অত্যন্ত সঙ্কুচিত হওয়া) এবং নাসিকা পরিশুষ্ক হয়, যে জীবিত থাকে না।

মুখং শব্দশ্রবাবোষ্ঠৌ শুক্লশ্যাবোতিলোহিতৌ।
বিকৃতা যস্য বা নীলো ন স রোগাদ্বিমুচ্যতে॥

অর্থাৎ রোগের দ্বারা যাহার মুখ, কর্ণ এবং ওষ্ঠদ্বয় শুক্ল, শ্যাব, অতি লোহিত, অথবা নীলবর্ণ হয়, সে ব্যক্তি কখনই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না।

ক্রমশঃ—